সূচী পত্র।

মূল্য প্রাপ্তি।

মিশেস কে, বি, দত্ত মেদিনীপুর ৩৷৵০
বাবু চারুচন্দ্র মিত্র ঢাকা ৩৷৵০
„ হৃদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲
„ প্রসন্নকুমার বসু MA.BL. কৃষ্ণনগর ৩৷৵০
„ গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক গোলাঘাট ৩৷৵০
শ্রীমতীগিরিবালা দেবী ঐ ৩৷৵০
বাবু সূর্য্যকুমার দাস ব্যাঁটরা ৩৷৵০
„ গিরীশচন্দ্র দাস দক্ষিণময়না ৩৷৵০
„ কিশোরীমোহন রায় ভবানীপুর ৩৷৵০
„ কৃষ্ণগোপাল সান্যাল মৈনপুরী ৩৷৵০
„ চন্দ্রমোহন সেন চট্টগ্রাম ৩৷৵০
"বগুড়াপাবলিক লাইব্রেরীর" সম্পাদক বগুড়া ৬॥০
বাবু দীনেশচন্দ্র রায়চৌধুরী ধানকুট ৩৷৵০
„ কুলদাকিঙ্কর রায় কলিকাতা ৩৲
„ বন্দীপুর লিটারারী আসোসিয়েসনের" সম্পাদক ঐ ২৲
বাবু পশুপতিনাথ বসু ঐ ৩৲
„ হরিপদ ঘোষ চট্টগ্রাম ৫৲
„ ভূপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত কলিকাতা ৩৲
„ সুরেশচন্দ্র মিত্র ঐ ৩৲
„ কৃপানাথ দত্ত ঐ ১৷৵০
„ মন্মথনাথ মিত্র ঐ ৩৲
এন, এল, ব্যানার্জ্জি এস্কয়ার মৈনপুরী ৬৲
বাবু হেমচন্দ্র মিত্র কলিকাতা টাকশাল ২৲
„ সোমনাথ রায় মেদিনীপুর ৩৷৵০
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী রাণাঘাট ৩৷৵০
বাবুদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিং ৩৲
শ্রীমতী অমলা দাস ভবানীপুর ৩৲
বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘটক দিনাজপুর ৩৷৵০
„ নৃত্যগোপাল সিংহ দেবীপুর ৬৷০
„ নীলকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲
„ ভবানীচরণ দত্ত ভবানীপুর ৩৲
„ কালীমোহন ঘোষ উয়ারি ৫৲
„ হীরালাল রক্ষিত কলিকাতা ১৲
„ তারকনাথ বিশ্বাস বেনারসসিটি ৩৷৵০

মিশসী, এম, বসু M.A. কলিকাতা ৩৲
বাবু সুরেশচন্দ্র লাহা ঐ ১৲
শ্রীমতী সুশীলা দেবী চুঁচড়া ৩৲
বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা ঐ ৩৲
„ যাদবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঐ ১৲
„ পূর্ণচন্দ্র দেচৌধুরী রাণাঘাট ৪৲
„ দীননাথ বন্দোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲
„ কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় জব্বলপুর ১॥০
মিশেস ভাদুড়ী পাবনা ৩৷৵০
বাবু অমরেশ মুখোপাধ্যায় নলডাঙ্গা ২৷৵০
„ রামরঞ্জন পাঠক দিনাজপুর ১০৷৵০
শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী কলিকাতা ৩৷৵০
কুমার রামেশ্বর মালিয়া হাওড়া ৩৷৵০
বাবু নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৩৲
মিশেস পি, এম, গুপ্ত ফরিদপুর ৬৷০
বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ সুকিয়াষ্ট্রীট কলিকাতা ১৲
„ মহেন্দ্রনারায়ণ দেব কলিকাতা ৩৲
„ উমাকিশোর রায় ঢাকা ৩৲
রায় ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর বাশবেড়ে ১০॥৵০
বাবু রামকৃষ্ণ বসু কাথার ৬৷০
„ প্রসন্নকুমার মিত্র সিমলাপাহাড় ৬৲
এস, এম্, মিত্র এস্কয়ার হায়দারাবাদ ৬৷০
বাবু প্রাণধন বন্দোপাধ্যায় হুগলী ৩৷৵০
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহা কলিকাতা ১॥০
„ দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গয়া ৩৷৵০
„ সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ঢাকা ৷৵০
„ শশিভূষণ পালিত রসলকুণ্ড ৩৷৵০
„ অক্ষয়কুমার বসু কামঠানা ৩৲
„ অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় জয়নগর ১৮৷৵০
„ যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী গৌরীপুর ৩৷৵০
„ মুক্তাগাছা রিডিংক্লবের "সম্পাদক মুক্তাগাছা ১০৷৵০
বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় মাদারিপুর ৩৷৵০

বাবু নীলরতন মুখোপাধ্যায়	কুকুনপুর	৩।৶০
„ হেমন্তকুমার রায়	নড়াইল	৩৷৶০
„ রামানন্দ পাল	কলিকাতা	৩৲
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	ঐ	১৲
শ্রীমতী প্রেমীলা গুপ্তা	চুঁচড়া	৩।৶০
বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বহরমপুর	৩।৶০
„ নারায়ণচন্দ্র সেন	কটক	৩।৶০
রেভাঃ বিনোদবিহারী রায়	অম্বালা	৫৶০
বাবু নারায়ণচন্দ্র বসু	শিলচর	৩।৶০
শ্রীমতী হের্মলতা রক্ষীত	ঢাকা	৩।৶০
বাবু সতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	কলিকাতা	৩৲
কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর	ঐ	৩৲
বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৩/০
„ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বালিয়াডাঙ্গা	৩।৶০
শ্রীমতী সরোজিনী দাসী	যোরঘাট	৩।৶০
বাবু রমণবিহারী দাস	চন্দননগর	২৲
„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার নাগ	মেদিনীপুর	৬৸০
„ ক্ষেত্রমোহন ধর	কলিকাতা	১॥০
„ গোপেন্দ্রলাল দে	ঐ	৩৲
শ্রীমতী প্রিয়বালা চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩৲
বাবু সতীশচন্দ্র রায়	ঐ	৩৲
„ সুধীরকুমার নান	ঐ	৩৲
„ সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী	খাজুরা	৩।৶০
„ বিপিনবিহারী বসু	হাতোয়া	৩।৶০
„ নগেন্দ্রনাথ হালদার	পলতা	৩৲
„ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী	কলিকাতা	৩৲
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
„ নলিনাঙ্গ রায়চৌধুরী	বর্ম্মা	৩।৶০
„ রজনীকান্ত সেন	কলিকাতা	১।০
রাণী মাতঙ্গিনী দেবী	ভিতরবন্দ	৩।৶০
বাবু চারুচন্দ্র দাস	গোরক্ষপুর	৩।৶০
„ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	পূর্ণিয়া	৩৲
„ প্রসন্নকুমার সেন	কলিকাতা	৩৲
„ যোগেন্দ্রনাথ রায়	কাশীপুর	৩।৶০
„ কিশোরীলাল গোস্বামী	ভবানীপুর	৩৲
রেভাঃ বি, ভট্টাচার্য্য	কলিকাতা	৩॥০
বাবু শরৎচন্দ্র মিত্র	ঐ	৬৲
„ হৃদয়নাথ বিশ্বাস	শিলচর	৩।৶০
„ গোকুলচন্দ্র ধর	কলিকাতা	৩৲
„ প্রমথনাথ পাল	বর্ম্মা	৩।৶০
„ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	ভবানীপুর	৩৲
শ্রীমতী অমৃত বালা দে	ঐ	১॥০
বাবু জগৎবন্ধু দত্ত	লক্ষ্মীপুর	৩।৶০
„ হরকিঙ্কর দাস	শ্রীহট্ট	৩৲
„ তিনকড়ি চৌধুরী	কলিকাতা	১৲
„ প্রিয়নাথ মিত্র	ঐ	৩৲
শ্রীমতী হেমলতা রায়	ঐ	৩৲
কে, এম, চাটুর্যি এস্কয়ার	ঐ	৩৲
বাবু পান্নালাল মল্লিক	ঐ	৩৲
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী	ভবানীপুর	৩৲
কুমার রমেশচন্দ্র সিংহ	সুসঙ্গদুর্গাপুর	৩।৶০
মিশেস আর, এন, রায়	ভবানীপুর	৩৲
বাবু মণিলাল সিংহ	কলিকাতা	৩৲

ক্রমশঃ—

ভারতী।

গীর্ব্বাণী।

বিনি পয়সায় নাটক আমি প্রায়ই দেখিয়া থাকি। তবে একখানাও সমাপ্ত হয় না। সূত্রধারে সূচনা করিয়া দিয়া যায়, বাকীটা মনে মনে গড়িয়া লইতে হয়। একবার একখানি অসমাপ্ত নাটিকার শেষ খুঁজিতে গিয়া আমার জীবনের যা কিছু বিভ্রাট! শুনিলে বিস্মিত হইবে, আমার রঙ্গভূমি একটি ইয়ুরোপীয় সওদাগরের বৃহৎ বিপণি। দশটা হইতে পাঁচটা তাহার অর্থপ্রসূ বিপুল অনুষ্ঠানের একটি ক্ষুদ্র অংশ আমি বহন করি। ট্রেড্‌লর বাড়ী ঢুকিতেই দরজার পার্শ্বে, দক্ষিণদিকে, মেজ সম্মুখে রাখিয়া বিলযোগাই ও টাকা গুনিয়া লই। রাশীকৃত বস্ত্রস্তূপের মধ্যে—পশমীরেশমীসুতার, লালনীলগোলাপী, প্লেনডোরাফুলদার—অগণ্য ফিরিঙ্গী সন্তানের মধ্যে—মেটে তামাটে সাদাটে—একেশ্বর বাঙ্গালী নিঃশব্দে যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যাই। কাজে ভর্ত্তি হইবামাত্রই যে আমার নয়নসমক্ষে দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল তাহা নহে। প্রথম মাস ছয় দিনের পর দিন নির্ব্বৈচিত্র্য, নির্ম্মোহ, নীরস গদ্যে কাটিয়া যাইত। মানবজাতির যে অংশের সম্পর্কে আসিতাম তাহার সহিত আমার এতদূর অনৈক্য যে তাহার কোনখানটাই আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিত না। তাই কি, কার্য্যকালে, গরবিনী আহেলা বিলাতী ক্রেত্রীর পাদদাপ, কি অবসরকালে ফিরিঙ্গী যুবকযুবতীর প্রেমাভিনয় কিছুই আমায় আন্দোলিত করিত না। একদিন বর্ষাঋতুর অবসানে, কাজের ভিড়ের প্রারম্ভে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখি অপরূপ দৃশ্য! নবাগতা ধবলা, গাউনবিজড়িতা, আমার জীবনবহির্ভূতা ইংরাজললনা নহেন,—সুন্দর শ্যামাঙ্গী, শাড়ীপরিহিতা, বাঙ্গালীর চিরবিস্ময় বাঙ্গালী রমণী। মনে হইল আজ যেন দোকানের মধ্যে একটা কিছু বিপ্লব ঘটিয়া গেল। তাহার গদ্যমূর্ত্তি ঘুচিয়া গিয়া বড় কবিত্বের উচ্ছ্বাসে গৃহপূর্ণ হইল। মনে হইল যেন আমারই মত রমণী-হৃদয়েও এই অগাধ ফিরিঙ্গি সমুদ্রে তাঁহার ও আমার নিবিড় একতার প্রভাব অনুভূত হইবে। যেন রমণীর সুন্দর ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া এখনি কোন মহতীবাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। সেরূপ কিছুই হইল না।

তাঁহার পরিচর্য্যায় রত ফিরিঙ্গি যুবতীর কোন কথায় মৃদু হাসিয়া তাহারই ভাষায় তাহাকে প্রত্যুত্তর করিয়া আমার দিকে দৃক্পাত মাত্র না করিয়া তিনি দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। দোকান পরিভ্রমণ শেষ করিয়া যখন ক্রীতদ্রব্যের মূল্য প্রদানের সময় হইল পুনর্ব্বার আমার সম্মুখীন হইলেন। তোমরা মনে করিবে আমি এই রমণীর প্রেমে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমি জানি তাহা নহে। স্বজাতীয় ললনার অনভ্যস্তপূর্ব্ব সান্নিধ্যে আমি অভিভূত, তাই মন সপ্তমে চড়িয়াছিল। আমার উদ্ভ্রান্ত কল্পনায় মনে হইল এবার বুঝি কোন সম্ভাষণ শুনিতে পাইব, বুঝি তাহারই পূর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার দেহযষ্টি ঈষৎ নত হইয়াছে। নতাঙ্গী আমার হাত হইতে বিলগ্রহণ করিয়া তাহার উপর চোখ বুলাইতে লাগিলেন। আমি আগ্রহাতিশয্যে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না। কিছু পরে উদ্গ্রীব কর্ণকুহরে পতিত হইল—"I think there's a mistake here, I took only four yards of that brown stuff, you have put it down as five"

মোহ ছুটিয়া গেল—কথায় নয়, ভাষায়! আমি যে কুহকরাজ্য রচিয়া তুলিয়াছিলাম সেখানকার নারী সুমধুর মাতৃভাষা ব্যবহার করেন। বাঙ্গালীর চিরারাধ্যা বঙ্গরমণীর মুখে যে সুললিত গীর্ব্বাণী নির্গত হয় তাহারই জন্য কর্ণতৃষিত ছিল—ইহার জন্য নহে! আমার হৃদয়তন্ত্রীতে একটি তীব্র বেসুরা ঘা দিয়া রমণী অন্তর্ধান হইলেন!

(২)

যবনিকা খুলিয়া গেল। এখন হইতে বিচিত্র পোষাকের, বিচিত্র ভাবের বিচিত্র বয়সের বিচিত্র বঙ্গনারী আমার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতে লাগিলেন।

"কেউ বা অতি জ্বল' জ্বল'
কেউ বা ম্লান ছল ছল,

*　　*　　*

কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ
কেউ বা দিব্যি কালো"।

প্রথম দিনের ন্যায় নেশাভিভূত আর কখন হই নাই। কিন্তু যখনই তাঁহাদের কেহ বিপনিতে পদার্পণ করিতেন আমার কল্পনা ছুটি লইত। তাঁহাদের একটি ভাবে, একটু হাসিতে আধখানি কথায় এক একখানি সম্পূর্ণ নাটকের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইত। কোন-দিন সূত্র ধরিয়া রচনা নিজেই সমাপ্ত করিতাম, কোনদিন অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়াই প্রীতিলাভ করিতাম। দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, ষোড়শীর কলকল ছলছল আগ্রহচাপল্য, প্রৌঢ়ার গাম্ভীর্য্য, বালিকার সারল্য, যুবতীর মাধুর্য্য, কোন সুরূপার তেজস্বিতা, কাহারো নম্রতা, কোন সখির হৃদ্যতা, অন্যার তদভাব, কোন মাতার ব্যয়কুণ্ঠা, কন্যার অসংযম, কাহারো নানাভাবের খেলা, কাহারো কোন বিশেষভাবের অভাব—এই সকল আমার নাটকের উপকরণ।

আমি যে কেবলই নির্লিপ্ত, কূটস্থ দর্শক তাহাও নহে। এ রঙ্গভূমিতে আমার ভূমিকাও

ছিল। এই মানবীগণ-সংঘর্ষে আমার হৃদয়ে শুধু কল্পনার প্রসূন প্রস্ফুটিত হইত না, ভাবের পীড়নও আধিপত্য করিত। যখন সুসজ্জিতা, সুশিক্ষিতা, বাঙ্গালীর মূর্ত্তিমতী হিতস্বরূপিনী রমণী বিলের প্রতীক্ষায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন এবং পরম ঔদাস্যভরে টাকা ফেলিয়া দিয়া বিনাসম্ভাষণে অন্তর্ধান হইতেন, তখন অন্তরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। আমি যে শুধু কেরাণী নহি, আমি যে শুধু তাঁহাদের ঔদাসীন্যের বা কৃপার বা অবজ্ঞার পাত্র নহি তাহা প্রমাণ করিয়া দিতে ইচ্ছা যাইত। যে সুরেশ, নলিনী, সুরেন্দ্র নরেন্দ্রের প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিসুধা, হাস্যসুধা বর্ষণ করেন তাহাদের অপেক্ষা যে আমি মনুষ্যত্বে ন্যূন নহি তাহা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা যাইত। যাঁহারা দেশের নেতাগণের নেত্রী, তাঁহাদের "উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী" এমন নারীগণের নিকট শুধু কেরাণীপরিচয়ে আত্মপ্রসাদ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইত। আর তাহার জন্য অদৃষ্টকে দায়ী না করিয়া আমি তাঁহাদেরই উপর মনে মনে অভিমান করিতাম।

কিন্তু আর একটি গুরুতর বিষাদের কারণ উপস্থিত হইল। যাহাকে অনবদ্য মনে করিয়াছিলাম তাহাকে দোষস্পৃষ্ট জানিবার দুঃখ মনে বাজিল, আর আঘাত লাগিল অনাথিনী দুর্ভাগিনী মাতৃভাষার অবমাননায়। দেখিলাম যাহাকে ব্যতিক্রম মনে করিয়াছিলাম, তাহাই ইঁহাদের নিয়ম, পরস্পরের সহিত আলাপনে বিজাতীয় ভাষা ব্যবহার করাই স্বাভাবিক, মাতৃভাষা দৈবাৎ ব্যবহৃত হয়। হায় অনাদৃতা! মাতৃদুগ্ধের সহিত তোমার যে পীযূষ ইঁহাদের শিশুরক্তে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার কি যথেষ্ট সুমিষ্টতা নাই? তুমি কি তাঁহাদের সমস্ত ভাবের আধারের যোগ্য নহ? তুমি কি ক্রোধে স্ফীত, ভয়ে বিকম্পিত, দুঃখে বিগলিত, দ্বিধায় বিচলিত, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠ না? হে মাতঃ কাজের রাজ্যে তুমি অধিকারচ্যুত বলিয়া ভাবের রাজ্যে তোমার যে আসন তাহা হইতে তোমার দুহিতারাও তোমায় অকাতরে বঞ্চিত দেখিবেন ও করিবেন? মাতৃভাষাবিবর্জ্জিতা বঙ্গীয়রমণী নয়নানন্দকারিণী হইলেও আমার হৃদয়ে অশোভনত্বের বেদনা ফুটাইতে লাগিলেন। যখনই কোন যুবতীবৃন্দের "Oh my"! "Goodness gracious"! "What nonsense"! প্রভৃতি ভাষ্য ও সুমিষ্ট বাঙ্গলা নামের বিকৃত ইংরাজী রূপান্তর শুনিতাম যথা—Vasant (বাসন্তী), Lizzie (লতিকা), Milly (অমিয়া), আমার সমস্ত অস্তিত্ব পীড়িত ব্যথিত হইত।

এমনও কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা বিজাতীয় ভাষায় দ্রুত আলাপনে অপটুতা বশতঃই হউক বা যে কারণেই হউক সচরাচর পরস্পরের মধ্যে বাঙ্গলাই কহিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁহারাও আবশ্যকস্থলে আমাকে রাজভাষা ভিন্ন আর কিছুতে সম্ভাষণ করিতেন না। বিশেষ অপমানিত বোধ করিতাম তখন। আমি যেন সেই অসংখ্য ফিরিঙ্গির একজন। যেন একরক্ত আমাদের শিরায় প্রবাহিত হইতেছে না, যেন এক ভাষা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজ করিতেছে না। যেন মাতা বঙ্গভূমি তাঁহার একই স্নেহকোলে আমাদের

ধারণ করিয়া নাই; যেন এক আশা, এক দুঃখ, এক সুখ, এক লক্ষ্য আমাদের জীবন পূর্ণ করিয়া নাই, যেন অবস্থাগত শতহিমালয়ের ব্যবধানেও আমরা এক নহি।

এই বিপণি হইতে এক পা বাড়াইলেই আমার মাতৃভাষার ছড়াছড়ি। কিন্তু এই বিপণির চতুষ্কোনে তাহা একেবারেই দুঃশ্রোতব্য বলিয়া আমার শুশ্রূষা আরও প্রবল হইল। রোগবিশেষে যেমন জলাতঙ্ক হয় আমারও তেমনি পাশ্চাত্য ভাষাতঙ্ক উপস্থিত হইল। কোন স্বদেশীয়া মহিলাকে আমার নিকট অগ্রসর হইতে দেখিলেই ভয়ে কণ্টকিত হইয়া থাকিতাম কি শুনি! প্রত্যেকবার ইংরাজীই শুনিতাম, তবু প্রত্যেকবার আশা হইত বুঝি এবার অন্যথা হইবে।

দুরাশা! একটি শরৎ ঋতু ব্যাপিয়া বহু স্বদেশীয়া নারী এই ইয়ুরোপীয় বিপণিতে ও আমার হৃদয়মন্দিরে আনাগোনা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বরওষ্ঠে গীর্ব্বাণী শোনা আমার হইল না।

(৩)

কিন্তু শুনিবার আশাও আমায় কখন পরিত্যাগ করিত না। আমি কেবলই কল্পনা করিতাম এই মেয়েটির মুখে বাঙ্গলা কথা কেমন মানাইত, এই যুবতীর চারুওষ্ঠাধরে বাঙ্গলা কত সুললিত হইতে পারিত, এই সুন্দরীর এক অংশ যদি বিজাতীয়ভাষার কঠোর বর্ম্মে আবৃত না থাকিত তবে তাঁহার স্বচ্ছতা, হৃদয়ঙ্গমতা কত বৃদ্ধি পাইত। ইঁহাদের আর সবটা আয়ত্ত করিতে পারিতাম, কেবল একটা জায়গায় আসিয়া ঠেকিত, বারবার সেইখানেই পদস্খলন হইত। মূর্ত্তিমতী বঙ্গশ্রী সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহার সহিত আপনার ও মাতৃভূমির সর্ব্বতোভাবী মিলন অনুভব করিতেছি, এমন সময় স্বীয় অনাত্মীয়া বাণী প্রকটিত করিয়া তিনি হৃদয়কে সন্দেহের অতলহ্রদে নিমজ্জিত করিলেন। এ কে? এ কি আমার আত্মীয়া? একি আমার মাতৃভূমির দুহিতা? আমাদের সমস্ত সুখে দুঃখে ইনি কি সুখী দুঃখী? জননীর লাঞ্ছনায় ইনি কি পীড়িতা? জননীর গৌরবে ইনি কি প্রহৃষ্টা? তাঁহার সন্তানগণের সহস্র দুর্ব্বলতা সহস্র অক্ষমতার প্রতি অসহিষ্ণু ঘৃণাপরায়ণা না হইয়া ইনি কি ক্ষমাময়ী, করুণাময়ী?—বুঝিতে পারিতাম না।

একদিন সম্পূর্ণ সুবোধ ললনামূর্ত্তি দেখিলাম; স্বচ্ছ, সুন্দর, মর্ম্মান্তস্পর্শী। আমার গীর্ব্বাণী শুশ্রূষা পরিতৃপ্ত হইল, জগতের সমস্ত সঙ্গীততৃষা তাহাতে লীন হইল। যখন নব নব নিরাশায় আমি তাহার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম তখন একদিন অনবহিত-কর্ণে তাহারই মধুপ্রপাত হইল।

তখন ভারি কাজের ভিড়। গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় জনস্রোত বিপণি অভিমুখে প্রবাবিত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিলের প্রয়োজন। আমার চোখ তুলিয়া দেখিবার অবকাশ নাই কে প্রার্থী। একদিন গুটীছয়েক পরিচারক একত্রে আমার নিকট স্বল্প তত্ত্বাবধানে বিক্রীত দ্রব্যের তালিকা লইয়া উপস্থিত। আমার অব্যবহিত নিকটে জনতা ও মনুষ্যগুঞ্জন অপেক্ষা-

কৃত কম। একটী একটী হিসাব পরিষ্কার হইলেই আমি পরিচারককে জানাই, তাহার আহ্বানে ক্রেতা আসিয়া মূল্য দিয়া প্রস্থান করেন।

আমি একাগ্রচিত্তে কার্য্যে অভিনিবিষ্ট রহিয়াছি। হঠাৎ পার্শ্ব হইতে একটী কণ্ঠ অনুনয় করিল "মহাশয় অনুগ্রহ করে আমার বিলটি একটু আগে দিবেন? আমার অবিলম্বে বাড়ী ফিরার ভারি দরকার।" কথাগুলি একেবারেই শ্রুতিপথ হইতে আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। আমি একটা হিসাবে ঠিক দিতে দিতে মনুষ্যকণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিক্ষিপ্তমনা হইয়া স্বপ্নেশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় সদ্যশ্রুত কথাগুলি আপন মনে একবার আবৃত্তি করিলাম। হঠাৎ অর্থাগম হইয়া চৈতন্য হইল। এ জনতার মধ্যে আমার এতদিনের ঈপ্সিত বাণী কে উচ্চারণ করিল? এতদিন পরে কোন স্বদেশিনী আমায় আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলেন, আমায় মাতৃভাষায় সম্ভাষণ করিয়া সম্মানিত করিলেন? আমি বিস্মিত হইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চাহিলাম,—চোখ আর ফিরাইতে পারিলাম না। আমার সম্মুখে কে যেন যুনানী ভাস্করের একটী মানসী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি যে বঙ্গভাষা শ্রবণ লালসায় এতদিন লালায়িত ছিলাম বুঝি তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী! বাঙ্গালীর ঘরে এমনরূপ দেখিবার আশা কোনদিন ছিল না। ইঁহাকে দেখিবামাত্র প্রতিভাত হইল আমাদের দেশে ভারতীর যে বিষাদিনী মূর্ত্তি কল্পিত হয় তাহা কতদূর ভ্রান্তি, আজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলাম তাহা কিরূপ কল্পিত হওয়া উচিত। যে ভঙ্গীতে, যে গাম্ভীর্য্যে, যে মহিমান্বিতভাবে ইনি দণ্ডায়মানা, ভবিষ্যতের বাঙ্গালী যদি ভাস্কর হয় তবে বুঝি এমনি করিয়া তাহাদের দেবীকে মনন করিবে। ক্ষীণা, মুহ্যমানা, সরোদনা নহে; বিষাদছায়ান্বিতা, কিন্তু প্রশান্তা, গর্ব্বিতা; যেন পরাধীনা, তথাপি অক্ষুণ্নরাজভাবাপন্না। এতদিন এই জনসঙ্গমে আমি বহু সুন্দরী দেখিয়াছি কিন্তু ভাবের এমন অভিভবী মোহে কখন আত্মবিস্মৃত হই নাই। এতদিন যেন কেবল শরীরেরই সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম, আজ আত্মার রূপ দেখিলাম। আমি পুলকিতচিত্তে অনন্যমনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার পক্ষে দেবী হইলেও মানবী। নিজেকে আমার একাগ্রদৃষ্টির পাত্রী জানিয়া চঞ্চল হইলেন। আমি অপ্রতিভ হইয়া স্খলিতবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন্ জিনিষগুলি আপনার আমায় একটু বলে দেবেন?" নিজের কথা শুনিয়া নিজেরই যেন স্বপ্নবৎ বোধ হইল। তিনি আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া স্বক্রীত দ্রব্যগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বিলরচনা করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। ভৃত্য জিনিষ লইয়া তাঁহার গাড়ীতে উঠাইতে গেল। একটা ক্রহামের দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ শুনিলাম, তাহার পরই জুড়িঘোড়ার পাদদাপ ও দূরায়মান শকটের ক্রমক্ষীণ ধ্বনি। আমার পূর্ব্বনয়নানন্দ অন্য বঙ্গললনারাও এই জনতার মধ্যে রহিয়াছেন, কিন্তু আর তাঁহারা আমার চিত্তবিনোদন করিতে পারিলেন না। আমার মাতৃভূমির সমস্ত দুহিতাপ্রীতি তাঁহার একটী কন্যার প্রতি প্রীতিতে কেন্দ্রীভূত হইল, আর সকল কণ্ঠশুশ্রূষা নিবৃত্ত হইয়া একটী কণ্ঠ হৃদয়ে ধ্বনিতে লাগিল।

দোকানের ছুটি হইলে রাজপথে বাহির হইলাম। যেদিকে প্রভাতের সেই শকটশব্দ মিলাইয়া গিয়াছিল সেইদিকে মন আকৃষ্ট হইল। অবোধ! এই অনন্ত জীবপদচিহ্নিত অফুরাণ পথে তাহার অশ্বের পদচিহ্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? এই অসংখ্যপ্রাণীসমাকীর্ণ বিপুল নগরীতে একটী অজ্ঞাতনামধেয়া বালিকার সন্ধান আমায় কে বলিয়া দিবে?

(ক্রমশঃ)

বালুকেশ্বর।

(১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিলাত যাত্রা।)

পশ্চিম ভারতের রাজধানী বোম্বাই নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে "মালাবার হিল্" নামক শৈলে "বালুকেশ্বর" মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দির-মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গটি দেখিলে, সহসা বালুকা-স্তূপ বলিয়া ভ্রম জন্মে। বোধ হয়, এই কারণেই এই শিবলিঙ্গের ও তদধিষ্ঠিত শৈলের নাম "বালুকেশ্বর" রাখা হইয়াছে। প্রবাদ এই যে, রামচন্দ্রের নিয়ম ছিল, তিনি শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তিনি যেখানেই থাকিতেন, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার পূজার জন্য প্রত্যহ বারাণসী হইতে একটী করিয়া শিবলিঙ্গ আনিয়া দিতেন। লঙ্কাগমনকালে, রামচন্দ্র যে দিন এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী শৈলে আগমন করেন, দৈবক্রমে, সেই দিন লক্ষ্মণের শিবলিঙ্গ লইয়া আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল। লক্ষ্মণের বিলম্ব দেখিয়া রামচন্দ্র স্বয়ং একটী বালির শিব গড়িয়া পূজা করিলেন, এবং সেই স্থানেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, লক্ষ্মণ বারাণসী হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার আনীত লিঙ্গটী রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের কিছু দূরে স্থাপিত হইল। কালক্রমে রামচন্দ্রের স্থাপিত শিবলিঙ্গ যবনগণের (ফিরিঙ্গীগণের) উপদ্রবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বালুকেশ্বর দেবের বর্ত্তমান লিঙ্গটী পূর্ব্বোক্তরূপে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বালুকেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির ১৭২৪ খৃঃ রামাজী কামত নামক জনৈক "শেণবী" (সারস্বত) ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের নিকটে আর কয়েকটি দেবালয় আছে। তৎপার্শ্বে কতকগুলি ধর্ম্মশালা ও তন্মধ্যভাগে "বাণগঙ্গা" নামক একটী মধুরতোয়া পুষ্করিণী। বোম্বাইয়ের মহাজনগণের ব্যয়ে এই পুষ্করিণী নিখাত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। পুষ্করিণীর তটে চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির। তন্মধ্যে একটী গণেশের উদ্দেশে নির্ম্মিত; অপরগুলি "শিবালয়"। প্রাচীনগণের মুখে শুনা যায়, প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের যে অপূর্ব্ব শ্রী-সৌন্দর্য্য ছিল, এখন আর তাহা দৃষ্ট হয় না। বালুকেশ্বর শৈলের অনেক স্থান তখন কাননাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। চারিদিকের বনশ্রীর মধ্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির ও ধর্ম্মশালা পরিবেষ্টিত বাণগঙ্গার তীরবর্ত্তী বিহঙ্গকাকলীপূর্ণ বড় বড় বৃক্ষ ও তাহার মধ্যে

স্থানে স্থানে নির্ম্মিত সেকালের সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগণের শান্তিস্নিগ্ধ কুটীরসমূহ, পুরাণবর্ণিত পবিত্র তপোবনের ন্যায় শোভায়মান হইত। এখন সেই "ব্রাহ্মী শ্রী" অন্তর্হিত হইয়া, পাশ্চাত্য-পদ্ধতিক্রমে নির্ম্মিত বিলাসবিভ্রমময় গবাক্ষবহুল উন্নত সৌধ, বাংগ্লো ও প্রমোদো-দ্যানপূর্ণ অভিনব দৃশ্যে দর্শকগণের মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া দেয়।

বোম্বাইয়ে হিন্দুদিগের প্রায় দুই শতাধিক দেবমন্দির আছে। তদ্ভিন্ন কবীরপন্থী, নানকপন্থী, গুরুগোবিন্দপন্থী, রাধাবল্লভী, রামানুজীয়, প্রার্থনাসমাজ, আর্য্যসমাজ, ও ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতি বিবিধ মতাবলম্বিগণের উপাসনা-মন্দিরেরও অভাব নাই। শেষোক্ত সমাজ-ত্রয় ভিন্ন বোম্বাইয়ের প্রায় সকল দেবালয়ের সহিত দুই একটী করিয়া ধর্ম্মশালা সংযোজিত আছে। নানাদিগ্দেশাগত বিবিধ পন্থাবলম্বী সাধু-সন্ন্যাসিগণ সমস্ত দিন রাজপথে ভিক্ষা করিয়া রাত্রিকালে এই সকল ধর্ম্মশালায় আশ্রয়গ্রহণ করেন। বালুকেশ্বরের ধর্ম্মশালায় এইরূপ সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়। বোম্বাইয়ের সহস্র সহস্র বণিকজাতীয় ভক্তিপরায়ণ নরনারী ইঁহাদিগের দর্শনলাভ করিবার জন্য প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে (৪টার সময়) এখানে আগমন করেন। তাঁহাদিগের আগমনে বালুকেশ্বরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া সমগ্র শৈল যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। যে সকল ভাক্ত সাধু সন্ন্যাসী সমস্ত দিন নিশ্চেষ্টভাবে শুইয়া থাকেন, অথবা ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য যাঁহারা বিচিত্র বেশ-ধারণ করিয়া সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা এই সময়ে তাঁহাদিগের ভক্তগণকে দর্শন দিবার জন্য যথোপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করেন। দর্শকগণ তথায় আসিয়াই দেখিতে পান, কোন সন্ন্যাসী ধ্যানস্তিমিতনেত্রে নিষ্পন্দভাবে পদ্মাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে চর্চ্চিত করিয়া, দীর্ঘবিলম্বীজটাভার মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ বিবিধ রাগরাগিণীর সহিত পাঠ করিতেছেন। অপরে তারস্বরে "আলখ্," "বম্ বম্" ও "বম্ ভোলা মহাদেব" প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বিশিষ্টনেত্রভঙ্গী সহকারে, গঞ্জিকাধূম গলাধঃকরণ ও ধীরে ধীরে পুনরুদ্-গীরণ করিতেছেন। কোন স্থানে তীর্থঙ্কার বা সন্ন্যাসিবেশী জৈনাচার্য্যগণ ময়ূরপুচ্ছ হস্তে লইয়া, বায়ুমণ্ডলস্থিত অদৃশ্য জীবাণুসমূহের বিনাশাশঙ্কায় মুখবিবর বস্ত্রাবৃত করিয়া, "পরম-গুরু অর্হতের" নাম ঘোষণাপূর্ব্বক শ্রাবকগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। স্থানা-ন্তরে ভক্তিপরায়ণ শ্রাবকদিগের কিশোরবয়স্কা কুমারীগণ "যোগ" ও "বৈখানস" ব্রতের উপদেশ ও দীক্ষাগ্রহণের জন্য আচার্য্যগণের পাদসেবায় নিযুক্তা রহিয়াছেন। ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া বালুকেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে গমন করিলে দেখা যায় যে, সেখানে হরিসংকীর্ত্তন, পুরাণপাঠ, ধূপগন্ধ ও শঙ্খ-ঘণ্টা-ডমরু-ধ্বনি সহকারে সান্ধ্য ও প্রাভাতিক আরতির পূর্ব্বসূচনা হইতেছে। ভক্তিমান হিন্দুর চক্ষে এখানকার এই সায়ংপ্রাতর্দৃশ্য অতীব শান্তি ও তৃপ্তিপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।

প্রতি বৎসর শ্রাবণীয় অমাবস্যা ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে মেলা হয়। ৩০।৪০

বৎসর পূর্ব্বে মেলার সময় বোম্বাইয়ের পার্শিগণ শৈলবিহার করিবার জন্ম বালুকেশ্বরে গমন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক পাষণ্ড, তীর্থ-দর্শনার্থিনী হিন্দুললনাগণের প্রতি নানাপ্রকার পরিহাসপূর্ণ কুৎসিৎ বাক্যপ্রয়োগ ও অভদ্র ব্যবহার করিত দেখিয়া, বোম্বাইয়ের ধনশালী হিন্দুগণ বহু অর্থব্যয়ে বালুকেশ্বরের পুণ্যক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক্ উচ্চপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, তাঁহাদিগের আবেদনফলে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে এক্ষণে উক্ত প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে পার্সিগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বণিকগণ অনাথ ও দরিদ্রগণের জন্য এখানে কয়েকটি অন্নসত্র সংস্থাপন ও দরিদ্রগণের অভাব মোচনের জন্য সময়ে সময়ে অর্থবিতরণের ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

বালুকেশ্বর বহুদিন হইতে মহারাষ্ট্রদেশে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বালুকেশ্বর শৈলে যে সকল প্রাচীন দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার মধ্যে কোনও কোনও মন্দির খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন*। এই সকল প্রাচীন মন্দির যে এককালে উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন-স্বরূপ ছিল, তাহা তাহাদিগের সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরফলক, ভগ্নাবশিষ্ট বিশালস্তম্ভ-নিচয় ও প্রণষ্ট প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয়।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক স্থাপিত বালুকেশ্বরদেবের বর্ত্তমান মন্দিরটি অতি আধুনিক; উহা ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ১৭২ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের স্থাপিত বালুকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের চিহ্নমাত্র এখন আর বর্ত্তমান নাই। প্রবাদ এইরূপ যে, সেই মন্দিরটি কেবাজী রাণা নামক কোনও মারাঠা (মারহাট্টা) সর্দ্দার কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেবাজী রাণাকে উত্তরকঙ্কণের অধিপতি বিম্বরাজ বা ভীমরাজের (১২৯০ খৃঃ) অন্যতম সেনাপতি বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্বকথিত ফিরিঙ্গি-উপদ্রবে সেই মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কেবাজী রাণা যে স্থলে বালুকেশ্বরের পবিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কালচক্রের আবর্ত্তনে, সেইস্থানে এখন বোম্বাইয়ের লাট সাহেবের বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত সুরম্য প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই প্রাচীন মন্দিরের ভূগর্ভগত অংশের অবশেষ চিহ্ন দেখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তির উপর এক্ষণে এক প্রকাণ্ড বুরুজ নির্ম্মিত হইয়া, মহারাষ্ট্রীয় কীর্ত্তির—সর্দ্দার কেবাজী রাণার পুণ্যকীর্ত্তির—শেষচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে!

বালুকেশ্বর শৈলের উপর সমুদ্রতীরে পূর্ব্বে একটি অতি সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রযুক্ত প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ড ছিল। সেই শিলাখণ্ডের মধ্যগত রন্ধ্রকে সাধারণে "রুদ্রযোনি" বলিত। রুদ্রযোনি, পূর্ব্বে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। সাধারণের বিশ্বাস যে,

* Bombay Gazatteer. Description of Walkeswar.

রুদ্রযোনির মধ্য দিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিলে, সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়। এই কারণে তীর্থযাত্রিগণ পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে এই সঙ্কটপূর্ণ সঙ্কীর্ণ রন্ধ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপক ধর্ম্মাত্মা ছত্রপতি শিবাজী পুণ্যলাভ ও পাপক্ষয় কামনায় কয়েকবার বহুকষ্টে এই রন্ধ্র মধ্য দিয়া নির্গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বালুকেশ্বরের রুদ্রযোনি উত্তীর্ণ হইতে গিয়া তাঁহার জীবন দুই একবার অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। সমাজচ্যুত ব্যক্তিগণের পক্ষেও এই রন্ধ্র-নির্গমন পাপক্ষয়কর ও প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত। মুর্‌স্ "ওরিয়েণ্টাল ফ্রাগ্‌মেণ্টস্" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহারাষ্ট্র দেশের শেষ নরপতি পেশওয়ে বাজীরাওয়ের পিতা "শ্রীমন্ত রঘুনাথ রাও" খৃষ্টীয় ১৭৮১ অব্দে, ইংরাজদিগের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য দুইজন বিশ্বস্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে দূতরূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহাদিগকে রুদ্রযোনির মধ্য দিয়া নির্গমনপূর্ব্বক পবিত্র হইতে হইয়াছিল।

পেশওয়ে রঘুনাথ রাও-প্রেরিত ব্রাহ্মণদূতই বোধ হয় ভারতবর্ষের সর্ব্ব-প্রথম বিলাত-যাত্রী। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন্ ভারতসন্তান—বিশেষতঃ কোন ব্রাহ্মণসন্তান বিলাত গিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ভারতের এই সর্ব্বপ্রথম বিলাতপ্রবাসী ব্রাহ্মণসন্তানের বিলাত-ভ্রমণের বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন গ্রন্থেই এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এড্‌মণ্ড বর্কের জীবনচরিতে এ সম্বন্ধে যে অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, এ স্থলে কেবল তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে হইল।

এড্‌মণ্ড বর্কের জীবনচরিতের তৃতীয় খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় বর্কের নিম্নলিখিত পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্র সম্ভবতঃ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে লিখিত। রঘুনাথ রাওয়ের প্রেরিত ব্রাহ্মণ-দূত বিলাতে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন, ও স্বদেশীয় আচারের কঠোরতা পরিষ্কার জন্য কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, এই পত্র হইতে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। পত্রখানি রঘুনাথ রাওকে লিখিত। পত্রখানি এই—

"You set too much value on the few and slight services, that I have been able to perform for your agent, Hanumant Rao, and his assistant Maniar Parsi. It was nothing more than a duty one man owed to another. Hanumant Rao has done me the honour of being my guest for a very short time, and I endeavoured to make my place as convenient as any of us are able to do for a person so strictly observant as he was of all the rules and ceremonies of the religion to which he was born, and to which he strictly conformed, often at the manifest hazard of his

life. To this I have been witness. We have however, Sir, derived one benefit from the instruction he has given to us, relative to your ways of living; that whenever it shall be thought necessary to send Gentoos of a high *caste* to transact any business in this kingdom, on giving proper notice, and on obtaining proper licence from authority for their coming, we shall be enabled to provide for them in such a manner as greatly to lessen the difficulties in our intercourse and to render as tolerable as possible to them a country, where there are scarcely six good months in the year. The suffering these gentlemen underwent at first was owing to the ignorance, not unkindness of this nation.

I am sorry, Sir, to inform you that I can give you no sort of hope of your ever obtaining the assistance of the troops you require. It is best at once to speak plainly when it is not in our power to act.

Hanumant Rao is a faithful and an able servant of yours, and Maniar Parsi used every exertion to second him. If your affairs have not succeeded to your wishes, it is no fault of theirs."

এই পত্রে হনুমন্ত রাও নামক একজন মাত্র ব্রাহ্মণের বিলাতগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। হনুমন্ত রাওয়ের সহায় রূপে যিনি গমন করিয়াছিলেন, বর্ক তাঁহাকে "মণিয়ার পার্সী" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মুর্‌স্ "ওরিয়েণ্ট্যাল ফ্রাগমেণ্ট্‌স্" নামক গ্রন্থে লিখিত দুইজন ব্রাহ্মণের বিলাতগমণের কথা সম্পূর্ণ জনশ্রুতি মূলক, অথবা হনুমন্ত রাওয়ের পূর্ব্বে অপর কোনও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দূতরূপে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয় রূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। বিগত ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, পরলোকগত মহাত্মা জষ্টিস্ কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলঙ্গ মহাশয়ের রচিত "পেশওয়েগণের শাসনকালে মহারাষ্ট্র দেশের ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ, সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারাকর মহোদয় পুনার ডেকান কালেজে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে রঘুনাথ রাও প্রেরিত দুইজন ব্রাহ্মণের বিলাতগমনের উল্লেখ আছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রের পাদটীকায় বর্কের জীবনীলেখক নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"The object of this letter is incomplete, and one that of Ragunath Rao to which it is in reply, has not been found amongst Mr. Burke's papers. The origin of the correspondence appears to be this: early in 1781, Hanumant Rao, a Brahman of high caste and Maniar Parsi

arrived in England as agents of Raghunath Rao, who had some business to transact with East India Directors and British Government. They were found by Mr. Burke under very unpleasant circumstances, occasioned by their peculiar modes of life and the obligations of their religion. With the attention to strangers for which Mr. Burke was so remarkable, he took them down to Beaconsfield, and it being summer, gave them up a large green-house for their separate use where they prepared their food according to the rules of their *caste*, performed their ablutions and discharged such other duties as rites of their religion and their customs required, and circumstances permitted. They found great pleasure in Mr. and Mrs. Burke's society and where they were visited by many distinguished people while they sojourned at Beaconsfield. In autumn they set out on their return to India, and on their arrival there, Ragunath Rao wrote to thank Mr. Burke for his kindness to his agents. The fragments of Burke's reply which is here given was written probably at the end of the year 1782." *Burke's Life, vol. 3rd. pp. 46.*

হস্তীপৃষ্ঠে।

১৩০২ সালের আশ্বিন মাসের ভারতীতে কেডাষ্ট্রেল সর্ব্বেটা কি জিনিষ তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সর্ব্বের তজদিক কিরূপে সম্পাদিত হয়, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিব। ১৮৯৫-৯৬ সালে সারণ জেলার অন্তর্ভূত যে সকল গ্রামের খানাপুরী হইয়াছে সেই সমস্ত গ্রামের তজদিক্ গত অক্টোবর মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত গ্রামসমূহ তজদিক্ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এইবারে আটজন বন্দোবস্তের হাকিম প্রেরণ করিয়াছেন। সারণ জেলায় কয়েকটি পরগণা আছে, তন্মধ্যে বর্ত্তমান সালে কেবল কুয়াড়ী, সিপাহ, পচলখ, বারা, চৌবার, আঁদর, রহন্, ও বাল পরগণার অন্তর্ভূত গ্রামসমূহের তজদিক্ হইতেছে। এই জেলায় হাথুয়া রাজের যত গ্রাম আছে, তন্মধ্যে বেশীর ভাগই পরগণা কুয়াড়ী, সিপাহ ও পচলখের অন্তর্গত। ইহার অধিকাংশেরই বন্দোবস্ত ১৮৯৪-৯৫ সালে শেষ হইয়া গিয়াছে। কেবল পরগণা কুয়াড়ীতে প্রায় ৩০টি, সিপাহ পরগণায় ৬০টি ও পচলখ পরগণার অন্তর্ভূত ১৭টি গ্রামের জরিপ ও বন্দোবস্ত বাকী ছিল। তাহারই তজদিক্ বর্ত্তমান সালে হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অপর কয়েকটি পরগণায়ও হাথুয়া রাজের গ্রাম আছে কিন্তু উহার

সংখ্যা অতি অল্প। তজদিক্ করিবার জন্য যে আটজন হাকিম আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন পরগণা কুয়াড়ী ও সিপাহর অন্তর্গত গ্রামসমূহ তজদিক্ করিবেন। দুইজন পরগণা পচলখে আছেন। আর অবশিষ্ট পাঁচটি পরগণার প্রত্যেক পরগণায় এক একজন হাকিম আছেন।

পরগণা পচ্‌লখের ও চৌবারের অন্তর্গত যে কয়েকটি রাজের গ্রাম আছে তাহার কিরূপে তজদিক্ কার্য্য সমাধা হইতেছে ও তথায় রাজের সামলাগণ কিরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে তাহার তত্ত্বাবধারণ মানসে আমি ২২শে ডিসম্বর মঙ্গলবার প্রত্যুষে হাথুয়া হইতে রওনা হইলাম: যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবসেই শিবির ও আর আর মফস্বলে বাসের উপযোগী দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। গন্তব্য স্থানসমূহে যাইবার রাস্তা ভাল নয় বলিয়া আমি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, সেইজন্য "রামপ্যারী" নাম্নী একটি মন্থরগামিনী শান্তপ্রকৃতি হস্তিনী আমার বাহনস্বরূপ নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে ইংরাজেরা যেরূপ ঘোড়দৌড়ের অশ্ব, শিকারী কুকুর প্রভৃতির নাম রাখিয়া থাকেন, তদ্রূপ ফিল্‌বান্ (অর্থাৎ হস্তী পালকেরাও) হস্তীর নামকরণ করিয়া থাকে। অত্র রাজে যতগুলি হস্তী আছে সকলগুলির এক একটি নাম আছে— যথা চম্পাকলী, মোতীমালা, গজাধরপ্রসাদ, যমুনাপ্রসাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বে হাতুয়ার রাজগণ অনেক হস্তী রাখিতেন। সেইজন্য বাবু মহেশ দত্ত সাহী যখন হোঁসেপুর ত্যাগ করিয়া নূতন গ্রামে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন তাহার নাম হাতুয়া রাখিয়াছিলেন। যাহাহউক আমি ত অতি প্রত্যূষে "রামপ্যারী"-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম। হাতুয়ার পরিখাবেষ্টিত গড়টি অতিক্রম করিয়া "মাঝা মোহিবার গ্রামে" স্থাপিত শিবিরটিতে যাইবার পথে পড়িলাম। এই স্থলে হাতুয়ার গড়ের ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই গড়ের ভিতর মহারাণী ও অপরাপর রাজবংশীয়া রমণীগণ বসবাস করেন। এই প্রথা বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা সুবাত্রয়টির দেওয়ানি প্রদান করিলে, উক্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে যখন হোঁসেপুরের জমীদার রাজা ফতেহ সাহীর নিকট রাজস্ব চাওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি স্বীয় দেয় দিতে অস্বীকার করিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। কোম্পানী বাহাদুরও তাঁহাকে পরাজয় করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ফতেহসাহী লক্ষ্ণৌয়ের অধিপতি নবাব অসফাউদ্দৌলার রাজ্যভুক্ত গোরখপুরের জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। সুবিধা পাইলেই হোঁসেপুর রাজের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহে আসিয়া লুটপাট করিয়া লইয়া যাইতেন। এমন কি তাঁহার উপদ্রবে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির রাজস্ব সংগ্রহ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ফতেহ সাহীকে কোনরূপে দমন করিতে না পারিয়া পাটনার তৎকালীন প্রদেশীয় রাজসমিতি

(Provincial Council) তাঁহাকে এই মর্ম্মে লিখিলেন যে, কোম্পানী বাহাদুর তাঁহার ভরণপোষণার্থ কিছু কিছু টাকা প্রতিমাসে দিবেন, তিনি যেন কোম্পানী বাহাদুরের বিপক্ষে আর বিরুদ্ধাচরণ ও রাজস্ব সংগ্রহ কার্য্যের ব্যাঘাত না করেন। রাজা ফতেহসাহী কোম্পানী বাহাদুরের অঙ্গীকারে সম্মত হইয়া হোঁসেপুরে সপরিবারে আসিয়া নির্ব্বিরোধে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু দুইমাসকাল এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে থাকিয়া আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় হোঁসেপুর হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া গোরখপুরের জঙ্গলে আশ্রয় লই-লেন। মধ্যে মধ্যে জঙ্গল হইতে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আসিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ আক্রমণ করিতেন ও লুটপাট করিয়া লইয়া যাইতেন। এদিকে বিদ্রোহী ফতেহসাহীর পিতৃব্যতনয় বাবু বসন্তসাহী বড়ই রাজভক্ত ছিলেন। যাহাতে ফতেহসাহীকে গ্রেপ্তার করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিতে পারেন সেই বিষয়ে বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসের ৩রা তারিখে রাত্রিকালে বঙ্কযোগিনীর জঙ্গল হইতে সহস্রাধিক অশ্বারোহী সিপাহী লইয়া ফতেহসাহী হঠাৎ নিষ্ক্রমণ করিয়া যাদোপুর নামক গ্রামটি আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। সেই সময়ে বাবু বসন্ত সাহী বহু অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিতে-ছিলেন। কোম্পানী বাহাদুরের তহশীলদার সৈয়দ জমাল মহম্মদও সেই সময় তথায় রাজস্ব আদায় করিতেছিল। পূর্ব্বেই ফতেহসাহী বাবু বসন্ত সাহীকে এই স্তোকবাক্য বলিয়া নিঃশঙ্কচিত্ত করিয়াছিলেন, "যদিও ইংরাজ-রাজের সহিত আমার বিবাদ, তোমার প্রতি আমার কোনরূপ বিদ্বেষ নাই। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া কালযাপন কর। আমা হইতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই"। ফতেহসাহীর এই অলীক আশ্বাসবাক্যে নিশ্চিন্ত হইয়া বাবু বসন্তসাহী কালযাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ মে মাসের ৩রা তারিখে রাজদ্রোহী ফতেহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বসন্তসাহী ও মীরজমাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে ফতেহসাহী তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র পাইয়া তাঁহার, মীরজমালের ও বহুসংখ্যক অনুচরবর্গের প্রাণনাশ করিলেন।

গোপালগঞ্জের নিকটবর্ত্তী যাদোপুর গ্রামে যে স্থানটিতে বিদ্রোহী ফতেহসাহী বাবু মহেশ দত্ত সাহীর প্রাণবধ করেন সেই স্থানটি এখনও পর্য্যন্ত "মুর্দ্দকটিয়াবাগ" অর্থাৎ মাথাকাটার বাগান নামে বিখ্যাত। বাবু বসন্তসাহীর প্রাণবধ করিয়া বিদ্রোহী ফতেহসাহী তমকুহীরাজে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বাবু বসন্তসাহীর মহিষী যখন নিহত স্বামীর মস্তক অঙ্কে লইয়া চিতারোহণ করেন তখন এই মর্ম্মে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন যে, হাতুয়া রাজবংশের কোন বংশধর যেন কখনও তমকুহীরাজের ভিতর জলবিন্দু না পান করে। অদ্যাবধি গোরখপুরের অন্তর্ভূত তমকুহীরাজের ভিতর যাইলে হাতুয়ার মহারাজা কখন জলস্পর্শ করেন না।

বহুসংখ্যক মুদ্রা, অশ্ব ও উষ্ট্র লুট করিয়া ফতেহসাহী বঙ্কযোগিনীর জঙ্গলে স্বীয় গুপ্ত নিবাসে

লইয়া গিয়াছিলেন। বাবু বসন্তসাহীর আকস্মিক মৃত্যুর পর কোম্পানী বাহাদুর তাঁহার পুত্র বাবু মহেশ দত্ত সাহীকে সম্যক্ সম্মান ও সমাদর করিতে লাগিলেন। মহেশ দত্তও আপন পিতার পদানুসরণ করিয়া ইংরাজরাজের সহায়তা করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহিতাচরণের জন্য ফতেহসাহীর জমিদারী সম্পত্তি কোম্পানী বাহাদুর পূর্ব্বেই বাজেয়াফ্‌ত করিয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজভক্তি ও প্রভুবাৎসল্যের পুরস্কার স্বরূপ বাবু মহেশ দত্তকে হোঁসেপুর রাজটি দিবার মনস্থ করিতেছিলেন এমন সময়ে বাবু মহেশ দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। তাঁহার কেবল একটিমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিল। ইঁহারই নাম বাবু ছত্রধারী সাহী। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ দশসালা বন্দোবস্তের সূত্রপাত করিতেছিলেন সেই সময়ে রাজদ্রোহী ফতেসাহীর বাজেয়াফ্‌তীকৃত রাজটি বাবু ছত্রধারীসাহীকে প্রদান করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ বাবু ছত্রধারীসাহীকে মহারাজা বাহাদুর উপাধি দেন। মহারাজা ছত্রধারীসাহীই হাতুয়ায় আসিয়া গড় নির্ম্মাণ করেন ও এইখানে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। হোঁসেপুরেও অদ্যাবধি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। উহা এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ ও নানাবিধ হিংস্র পশুর আবাসভূমি। ফতেসাহীর উপদ্রব হেতু বাবু বসন্তসাহীও তদীয় পুত্র বাবু মহেশ দত্ত সাহী ও তৎপুত্র বাবু ছত্রধারীসাহীকে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইত। কখন্ আসিয়া মারিয়া ধরিয়া লুটপাট করিয়া লইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা ছিল না। সেই জন্য হোঁসেপুরে গড়নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহাদিগকে বসবাস করিতে হইয়াছিল ও তদনুকরণে হাথুয়ায়ও মহারাজা ছত্রধারীসাহী পরিখাবেষ্টিত গড়টি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হাথুয়ার গড় অতিক্রম করিয়া প্রতাপপুর নীলকুঠীতে যাইবার রাস্তায় পড়িলাম। শীতকাল বলিয়া চতুর্দ্দিকে আম্রকানন ক্ষেত্র, বংশবন, গ্রাম্য লোকদিগের কুটীর-গুলি ধূমবৎ হিমানীর আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। ক্রমে সূর্য্যদেব ঊষার কাঞ্চনঘটায় পূর্ব্ব-দিক রঞ্জিত করিয়া উদয়োন্মুখ হইলেন। সেই সঙ্গে নাট্যশালার যবনিকার মতন যেন একখানি পটোত্তোলন হইতে লাগিল। বালারুণকিরণ বৃক্ষশির উদ্দীপ্ত করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত কানন ও ক্ষেত্র এক অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত করিল। প্রকৃতির সহাস্য বদনে যেন এক অপূর্ব্ব মাধুরী ফুটিয়া উঠিল। বস্তুতঃ মাঠের মধ্য হইতে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের শোভা ও তজ্জনিত প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে অতীব নয়নমুগ্ধকর। আমি প্রকৃতির এই প্রাতঃসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে অনেক দূর যাইয়া পড়িলাম। রাস্তার দুইদিকে সপ্তপর্ণী, তূণ, কদম্ব, আম্র, জাম, অশ্বত্থ, বট, কদম্ব প্রভৃতি আরণ্য বৃক্ষের শ্রেণী ও তৎপরে দিগন্ত-ব্যাপী মাঠ ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হইতে লাগিল না। ক্ষেত্রসমূহে কেবল রবিশস্য বর্ত্তমান। কোথাও বা সর্ষপ, কোথায়ও বা যব ও গোধূমের কচি কচি চারাগুলি সমগ্র ক্ষেত্রগুলিকে হরিদ্বর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তন্মধ্যে সর্ষপের হরিদ্রাবর্ণ ফুল ফুটিয়া অধিকতর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। যেন হরিদ্বর্ণ পত্রের উপর কোন সুনিপুণ চিত্রকর স্বর্ণরেণু ছড়া-ইয়া রাখিয়াছে। কোন কোন মাঠ কেবলমাত্র অড়হর বৃক্ষের নিবিড় শ্রেণীগুলিতে

আচ্ছাদিত রহিয়াছে। গাছগুলি এত উচ্চায়তন ও নিবিড় যে বোধ হয় মানুষ তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলে প্রতীয়মান হয় না যে তাহার মধ্যে কেহ লুক্কায়িত আছে। অড়হরের বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য নাই বটে, তত্রাচ ইহা বেহার অঞ্চলের লোকসমূহের এক প্রধান খাদ্য সামগ্রী। এবারে সেই সমস্ত অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত গৃহস্থলোক অড়হরের শুঁটীগুলি সিদ্ধ করতঃ ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। গত বর্ষাকালে আদৌ বৃষ্টি না হওয়াতে ভাদোইশস্য একেবারে হয় নাই। তন্নিবন্ধন ভূমি একেবারে ঊষরপ্রবণ হইয়াছে। তৎ সত্ত্বেও রবিশস্য ষোল আনা হইবার সম্ভাবনা। শ্রমশীল কৃষকগণ অনন্যোপায় হইয়া দূরস্থ কূপ হইতে জল আনয়নকরতঃ শস্যের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে দেখিলাম। এমন কি যে ক্ষেত্রেতে আদৌ কূপ নাই তাহাতে জলসিঞ্চন করিবার জন্য রাস্তার অপর পার্শ্বস্থ কূপ হইতে জল আনয়ন করিবার জন্য রাস্তার উপর দিয়া পয়োনালা করিয়া জল আনিতে হইয়াছিল। আমি যাইতে যাইতে রাস্তার মধ্যে এইরূপ অনেক পয়োনালা পাইয়াছিলাম। আমার বাহিকা হস্তিনীটি এইরূপ পয়োনালা পাইলেই উদর পুরিয়া জলপান করিয়া লইত, কেননা রাস্তার পার্শ্বে কোনরূপ জলাশয় নাই। আমি যে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম তাহার পার্শ্বে যে দুই একখানি গ্রাম আছে তাহা প্রায় দূরে দূরে অবস্থিত। একটি গ্রাম হইতে অপর একটী গ্রামে যাইতে হইলে মধ্যে যে ব্যবধান পাওয়া যায়, তাহাতে প্রায় জনমানবের নিবাস নাই। কোন কোন স্থানে বা রাস্তার পার্শ্বে একটি "বাথান" অর্থাৎ গো-মহিষাদি বাঁধিবার স্থান। তাহাতে দুই একটি শীর্ণকায় বলদ অথবা বিশালশৃঙ্গ মহিষ নাদ্ হইতে জাবর খাইতেছে। কোথাও বা একটি "পালানীর" ভিতরে বসিয়া কৃষকটি স্বীয় গবাদির জন্য "লেদী" অর্থাৎ খড় প্রভৃতি কাটিতেছে। কোন স্থানেও বা "গোহরা" অর্থাৎ গোময় নির্ম্মিত শুষ্ক ইষ্টক রাশীকৃত রহিয়াছে। কৃষকগণ আবশ্যকমত সেইগুলি জ্বালানি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। কোন স্থানে বা রাশীকৃত শুষ্কপত্রের স্তূপ গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা "ভুজা" অর্থাৎ চাউল ছোলা প্রভৃতি ভর্জ্জন করিবার জন্য অতি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। বেহারের সর্ব্ব অঞ্চলেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বসন্তের প্রারম্ভে বৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র খসিয়া পড়িলে গ্রামস্থ প্রৌঢ়া ও বালিকারা সেইগুলি অতি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় ও বর্ষার সময় রন্ধন করিবার জন্য সেইগুলি জ্বালানিকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। বেহার অঞ্চলের সুজলা সুফলাভূমি এত বহুশস্যপ্রসবিনী ও কৃষকগণ এত পরিশ্রমী হইলেও তথাপি তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ইহা সত্ত্বেও তাহারা আপন আপন ভাগ্যে সন্তুষ্ট ও গার্হস্থ্য কর্ম্মে নিবিষ্টচিত্ত। আপনার ক্ষেত্র ও বাথান ও কুটীরগুলিতেই যেন ইহাদের সমগ্র জগৎ সন্নিবেশিত। ইহা ভিন্ন তাহাদের আর কোন চিন্তা নাই। কিসে ক্ষেত্রে যথোচিৎ জলসিঞ্চন হইবে, কিসে গোমহিষাদির যথাসময়ে জাবর দেওয়া হইবে ইহা লইয়াই তাহারা ব্যতিব্যস্ত—ইহাই যেন তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিপ্রহরে থালিকটা যবের অথবা ভুট্টার ছাতু ও একটা কাঁচা লঙ্কা ও একটু লবণ পাইলেই

বেহারী কৃষকের অতি উপাদেয় ভোজ হয় ও রাত্রিতে রক্তিমাভ তণ্ডুলের ভাত ও সিদ্ধ শাকের ব্যঞ্জন হইলেই সন্তুষ্ট। এবম্বিধ গ্রাম্য দৃশ্যাদি দেখিতে দেখিতে আমি বরীরায়ভান্ নামক গ্রামে উপনীত হইলাম। এই গ্রামে হাতোয়ারাজের অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ট আমলার বসতি। হাতোয়ারাজের অন্তর্গত গ্রামসমূহের নামকরণ অতীব প্রীতিপ্রদ। যেখানে নামৈকাভিহিত অনেকগুলি গ্রাম পাওয়া যায় সেইখানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক নামের শেষে এক একটি বৃহদায়তনব্যঞ্জক ফার্সি বিশেষণ থাকে, যথা—স্কুলোয়া কলা, মটি-হানিয়াকলা, হাতোয়া বুজুর্গ—অর্থাৎ বড় সুকুলোয়া, বড় মঠিহানিয়া, বড় হাতোয়া। পারস্ত-ভাষায় কলাঁ ও ---- অর্থৎ বড়। কখনও বা ক্ষুদ্রতাসূচক ফার্সি বিশেষণ পাওয়া যায়, যথা—মটিহানিয়া খুর্দ, সুকুলোয়া খুর্দ, সলারখুর্দ অর্থাৎ ছোট মটিহানিয়া; ছোট সুকু-লোয়া; ছোট সলার। ফার্সি শব্দ খুর্দের অর্থ ক্ষুদ্র। কখনও বা গ্রামটির নামের শেষে কোন পার্থক্যসূচক শব্দ যথা গ্রামের প্রতিষ্ঠাতার অথবা প্রধান রৈয়তের নাম সংযোজিত হয়। যথা বরীরায়ভান; বরীধনেশ; ডোমর নরিন্দ, ডোমরসুকুল; সোনৌলা গোকুল; সোনৌলা চন্দ্রভান; যাদোপুর সুকুল; যাদোপুর দুখহরণ; বংশী বতর্হা, পাঁড়ে বতর্হা ইত্যাদি ইত্যাদি। রায়ভান্, ধনেশ, নরিন্দ, গোকুল, চন্দ্রভান, দুখহরণ গ্রামের প্রতিষ্ঠা-তার অথবা কোন প্রধান রৈয়তের নাম এবং সুকুল ও পাঁড়ে বেহারী ব্রাহ্মণের পদবী। গ্রামগুলির নামের শেষে উক্ত নামগুলি সংযোজিত হইয়া বেশ পার্থক্যজ্ঞাপক হইয়াছে। তাহা না হইলে ভ্রম হইবার অনেক সম্ভাবনা। বরীরায়ভান্ গ্রাম অতিক্রম করিয়া মরীছীতে উপনীত হইলাম। এই গ্রামে আসিবার পথে মধ্যে মধ্যে রাস্তার ধারে দুই একটি "কলুহাড়" অর্থাৎ ইক্ষু-মাড়া কল দৃষ্টিগোচর হইল। কলিকাতায় সচরাচর যে কল দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে ইক্ষুদণ্ড দিয়া হস্তদ্বারা চরকাদ্বয় ঘুরাইলে নিষ্পেষিত ইক্ষুদণ্ড হইতে রস নিঃসৃত হয়। কিন্তু বেহারের এই অঞ্চলে যে সমস্ত কল দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ঠিক আমাদের দেশের কলুর ঘানীর মত; উহার মধ্যে দুইটি স্ক্রু অর্থাৎ প্যাঁচ পাশাপাশি থাকে। উহা বলদ কর্ত্তৃক ঘূর্ণিত হইলে প্যাঁচ দুটির মধ্যে খণ্ডীকৃত ইক্ষুদণ্ড দেওয়া হয়। উহা নিষ্পে-ষিত হইয়া রস নিঃসৃত হয়। কলুহাড়ের নিকটে এক একটি উনানের উপর বড় বড় কটাহ দেখিলাম। কোন কোন স্থানে দেখিলাম যে ঐ কটাহেতে রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত হই-তেছে। রসজ্বাল দিবার সময় এমন একরূপ সুমধুর গন্ধ নিঃসৃত হয় যে উহাতে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া ফেলে। মরাছী অতিক্রম করিয়া কভু গ্রাম্যপথ দিয়া কভু ক্ষেত্রের আইলের উপর দিয়া আমার হস্তী চলিল। এইখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই পাইলাম না। কেবল মধ্যে মধ্যে আম্র ও মহুয়া কানন ও চতুর্দ্দিকে দিগন্তস্পর্শী শস্যশ্যামল মাঠ। ক্রমে গম্ভীরপুরে উপস্থিত হইলাম। গম্ভীরপুর অতিক্রম করিবার সময় দুই একটি "নিমক-সায়র" অর্থাৎ যবক্ষার প্রস্তুত করিবার স্থান দেখিলাম। হাথুয়ারাজের অন্তর্গত অনেক গ্রামে উবরপ্রবণভূমিতে রেহ নামক একরূপ শ্বেত পদার্থ জমিয়া থাকে, উহা অতি

যত্নসহকারে সংগৃহীত হয়। উক্ত ভূমিগুলি নিমকসায়র নামে অভিহিত। সংগৃহীত রেহ জলসংমিশ্রিত হইয়া বড় বড় কটাহে সিদ্ধ হয়। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে কটাহের নিম্নে যবক্ষার জমিয়া থাকে। যবক্ষার প্রস্তুত করিবার সময় এমন একরূপ ক্ষার দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় যে, অনভ্যস্ত লোক উহার আঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না, নাসারন্ধ্র বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে হয়। গম্ভীরপুরের পরই নারায়ণপুর। পচলখ্ পরগণায় হাথুয়ারাজের যতগুলি গ্রাম আছে, কয়েকটি ব্যতীত উহার সবগুলিই প্রতাপপুর নীলকুঠীর নিকটে ইজারা দেওয়া। হাথুয়া ছাড়িয়া অবধি রাস্তার কোন স্থানে তামাকুর চাষ দেখিতে পাই নাই। এই নারায়ণপুরেই সর্ব্ব প্রথমে তামাকুর আবাদ দেখিলাম। কিন্তু উহা অতি অল্প। গ্রামের "বস্‌গীত" অর্থাৎ বসতিপল্লীর ভিতর দিয়া যাইবার সময় কোন কোন রৈয়তের গৃহস্থালীর সম্মুখস্থ "সহনে" অর্থাৎ প্রাঙ্গণে ছোট ছোট তামাকুর চারাগুলি রোপিত হইয়াছে দেখা গেল। এই গ্রামে তামাকুর এত অল্প চাষ দেখিয়া প্রতীয়মান হইল, যে দুই একটী প্রজা উহা রোপণ করিয়াছে উহারা বোধ হয় বিক্রয় করিবার জন্য করে নাই—স্বীয় গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্যই করিয়াছে। আমি যে সময়ে মফঃস্বলে ভ্রমণ করিতেছিলাম সেই সময়ে বন্দোবস্তের হাকিম মাঝামোতীবার নামক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার শিবিরটীও সেইখানে সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমার ফিলবান্ (হস্তীচালক) ঐ গ্রামে যাইবার পথ ঠিক না জানাতে আমাকে প্রথমে মাঝা মলউ গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম যে, নিকটবর্ত্তী গ্রামে আমার শিবির পড়িয়াছে। আমি মাঝা মলউ ত্যাগ করিয়া মাঝা মোতিবারাভিমুখে চলিলাম। শীঘ্রই শিবিরে উপস্থিত হইলাম।

এ সার্কেলের বন্দোবস্তের হাকিমটি আমাদের স্বদেশীয়। পূর্ব্বেই গম্ভীরপুর শিবিরে ইহাঁর সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সুতরাং মাঝা মোতীবার গ্রামে অবস্থানকালে ইহাঁর সহিত নূতন আলাপ পরিচয় করিবার আর প্রয়োজন হইল না। সু—বাবু আমাকে অতি সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বসাইলেন। তৎপরে মাঝা মলউ গ্রামের তসদিক সুরু হইল। পূর্ব্ব হইতেই হাকিম এই মর্ম্মে নোটিস্‌জারি করিয়াছিলেন যে, অমুক স্থানে অমুক তারিখে অমুক অমুক গ্রামের তসদিক্ হইবে ও নির্দ্ধারিত তারিখে তত্রস্থানে স্বয়ং জমীদারকে অথবা তাঁহার প্রতিনিধিকে ও প্রজা সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। নির্দ্ধারিত তারিখে জমীদার ও প্রজারা উপস্থিত হইলে মুন্সরিম্ অর্থাৎ বন্দোবস্তের আমলাগণ গ্রামের এক একখানি খতিয়ান লইয়া উহাতে যে সমস্ত বিষয় লিখিত থাকে, তাহা সমুদয় সমবেত প্রজাগণকে পড়িয়া শুনাইরা দেয়। ইহাও দেখিয়া লইতে হয় যে যে প্রজাগুলিকে শুনান হইতেছে উহাদের নাম খতিয়ানে লিখিত আছে কি না। যদ্যপি খতিয়ানে নামোল্লিখিত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত থাকে তাহা হইলে খতিয়ানে "স্বয়ং উপস্থিত" কথাটি লিখিয়া লওয়া হয়। যদ্যপি অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে অনুপস্থিত শব্দটি খতিয়ানে লিখিয়া লওয়া হয়। যদ্যপি দেখিতে পাওয়া যায় যে খতিয়ানে লিখিত প্রজাটি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া, একজন আত্মীয় স্বীয় প্রতি-

নিধিস্বরূপ তসদিক্ করাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহা হইলে খতিয়ানে প্রতিনিধির নাম, পিতার নাম ও অনুপস্থিত প্রজার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এই সবগুলি লিখিয়া লওয়া হয়। তৎপরে জমীদার উক্ত প্রজার নিকট হইতে কত খাজনা লইয়া থাকেন ও প্রজাও জমীদারকে কত খাজনা দিয়া থাকে, জমীদারের প্রতিনিধিকে ও প্রজাটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়। যদ্যপি জমীদার ও প্রজা কর্তৃক কথিত খাজনার পরিমাণ ঠিক সমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে খতিয়ানে খাজনার পরিমাণ সংখ্যায় ও কথায় লিখিয়া লওয়া হয়। প্রজাটি যদ্যপি কোন ক্ষেতের জন্য জমীদারকে নগদী খাজনা না দেয় অর্থাৎ যদ্যপি খাজনার পরিবর্ত্তে সেই ক্ষেতের ফসল জমীদার ও প্রজা স্বীয়প্রাপ্যানুসারে ভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে খতিয়ানে লিখিত খাজানার ঘরে সেই সেই ক্ষেতের সম্মুখে "ভাউলী" "অৰ্দ্ধ বাটাই" ইত্যাদি কথাগুলি লিখিয়া লওয়া হয়। যদ্যপি খতিয়ানে লিখিত জমীর পরিমাণ অথবা খাজানা সম্বন্ধে জমীদার অথবা প্রজার কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে খতিয়ানের নিম্নভাগে কত জমীর জন্য নগদী খাজনা দেওয়া হয়, কত জমীর ফসল বিভাগ করিয়া জমীদার ও প্রজা লইয়া থাকে ও কত জমী প্রজার নিষ্কর দখলে আছে, তাহার একটি তালিকা মুন্সরিম লিখিয়া লয়। তৎসঙ্গে জমীদারের জমাবন্দীতে যে সংখ্যায় প্রজাটির নাম লিখিত আছে সেইটিও লিখিয়া লয়। যদ্যপি প্রজার অথবা জমীদারের কোন বিষয়ে আপত্তি থাকে, উহা "ফর্দ্দতনাজা" অর্থাৎ "আপত্তির তালিকাতে" লিখিয়া লওয়া হয়। তৎপরে জমীদারের প্রতিনিধিকেও দরমিয়ানী হবন্দার অর্থাৎ মধ্য স্বত্বাধিকারীগণকে (Tenure-holder) মুন্সেরিম গ্রামের খেওটটি পড়িয়া শুনাইয়া দেয়। যদ্যপি খেওট্ সম্বন্ধে জমীদারের অথবা মধ্যস্বত্বাধিকারীর কোনরূপ আপত্তি থাকে, উহাও ফর্দ্দতনাজাতে লিখিয়া লওয়া হয়। এই সমস্ত কাগজ পড়িয়া শুনানর নাম "বুঝারৎ"।

বুঝারৎ সমাপ্ত হইলে মুন্সেরিম্ নথীটি বন্দোবস্তের হাকিমের নিকট পেশ করে। হাকিম সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত জমীদারগণকে ভূম্যধিকারী ও মধ্য স্বত্বাধিকারীগণের খেওটগুলি আপনার সম্মুখে পড়িয়া শুনাইয়া দেন। খেওট সম্বন্ধে যদ্যপি কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকে, সেইগুলি সংশোধন করাইয়া লন। তৎপরে স্বয়ং খেওটের উপর দস্তখৎ করেন ও উপস্থিত জমীদারগণকেও তদুপরি দস্তখৎ করাইয়া লন। তদনন্তর খতিয়ানগুলিতে যে সমস্ত জমীদারের নাম, প্রজার নাম, ক্ষেত্রের সমগ্রসংখ্যা, ক্ষেত্রের কতটুকু আবাদী ও কতটুকু পতিতভূমি, প্রজার দেয় খাজনা, ও প্রজার স্বত্বসম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা থাকে সেই সমস্ত পড়াইয়া শুনান। ইহার পর হাকিম খতিয়ানগুলির পর দস্তখৎ করিয়া দেন। তদনন্তর ফর্দ্দতনাজায় লিখিত আপত্তিগুলির নিষ্পত্তি করেন ও খতিয়ানে যদ্যপি কোনরূপ ভ্রম থাকে সেইগুলি সংশোধন করাইয়া লন—ইহারই নাম তজদিক্। তজদিক্ সমাপ্ত হইলে নথীগুলি সংশোধিত করিয়া নিয়মানুসারে সাজান হয়। তৎপরে বন্দোবস্তের হাকিম এই মর্ম্মে নোটিশজারী করেন যে, নোটিশ জারীর তারিখ হইতে একমাসের ভিতর জমীদার অথবা প্রজা যদ্যপি

ইচ্ছা করেন, বাকী খাজনার আইনের ১০৪ ধারানুসারে দরখাস্ত দিতে পারেন।

এইরূপে বেলা ১॥টা পর্য্যন্ত মাঝামলউ গ্রামের তজদিক্ সম্পন্ন হইল। তৎপরে স্নানাহার সমাপন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম। অপরাহ্নে আমাদের আমলাদের কার্য্যাদি ও নথীগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এইরূপে সে দিনকার কার্য্য শেষ হইল।

পরদিবস (২৩শে ডিসেম্বর) প্রাতে হস্তীযানে পরগণা চৌবারস্থিত ডাঁড়াইলি গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন সেই গ্রামে হে—বাবুর শিবির ছিল। তিনিও একজন বন্দোবস্তের হাকিম ও পরগণা চৌবারস্থিত রাজের গ্রামের তজদিক্ করিতেছিলেন। মাঝামোতিবার হইতে ডাঁড়াইলি গ্রাম প্রায় ১২ মাইল দূর। মাঝামোতিবার গ্রাম অতিক্রম করিয়া কবীরপুর গ্রামে উপনীত হইলাম। এই গ্রামে বহুপরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয় ও চিনির কারখানাও আছে শুনিলাম। এই গ্রামে অনেকগুলি কলুহাড় অর্থাৎ আখমাড়ার কল দেখিলাম। সবগুলিতেই দেখিলাম যে, ইক্ষু নির্যাসিত হইয়া রস হইতে সন্নিকটস্থ কটাহ সমূহে গুড় প্রস্তুত হইতেছে। কবীরপুর অতিক্রম করিয়া ক্ষেত্রের "ক্ষুরহুর" (অর্থাৎ মেটো রাস্তা) দিয়া আমার হস্তিনী চলিল। প্রায় তিন চার মাইলের পর ময়রোয়াতে উপস্থিত হইলাম। ময়রোয়াতে বেঙ্গল-নর্থওয়েষ্টারণ রেল কোম্পানীর একটি ষ্টেশন্ আছে। এই অঞ্চলের মধ্যে ময়রোয়া একটি বর্দ্ধিষ্ট স্থান। এখানে অনেক পণ্যদ্রব্যের গোলা ও আড়ৎ আছে। আমি রেলের লাইন অতিক্রম করিয়া ময়রোয়ার বিখ্যাত "বরহম্ আস্থান" নামক মন্দিরের নিকট পৌছিলাম। মন্দিরের নীচেই একটী ক্ষুদ্র নদী। উহা এক্ষণে নিদাঘবিশুষ্ক, বর্ষার সময়ে উহাতে বেশ জল থাকে। কখন কখন বর্ষাধিক্য নিবন্ধন জলপ্লাবিত হইলে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নৌকাযোগে পার হইতে হয়। যাহা হউক আমার বাহিকা হস্তিনী তাহার উপর দিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া গেল। বরহম্ আস্থানটি নদীর পশ্চিমকূলস্থ অতি সমুচ্চ জমীতে নির্ম্মিত। সময়াভাবে মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইয়া ব্রহ্মদেবের দর্শন করা আমার সৌভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। মন্দিরটি ইষ্টকনির্ম্মিত ও প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরটির শিরোভাগে তিনটি গুম্বজাকৃতি চূড়া আছে। বরহম্‌জী অর্থাৎ ব্রহ্মা এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই অঞ্চলের বেহারীদের ধ্রুববিশ্বাস যে বরহম্‌জী বড় জাগ্রত দেবতা। উৎকটপীড়াক্রান্ত হইলে লোকে ইঁহার মানৎ করিয়া থাকে ও রোগমুক্ত হইলে ব্রহ্মাজীর নিকট কেশ প্রভৃতি দিয়া থাকে। আমি মন্দিরটি ছাড়াইয়া ডাঁড়াইলী গ্রামে যাইবার পথে পড়িলাম। ঐ গ্রামে যাইবার দুইটি পথ আছে। একটি মাঠের উপর দিয়া খুরহুর অবলম্বনে সোজাসুজী যাওয়া যায় ও অপরটি দরৌলী যাইবার জন্য যে পাকা রাস্তা আছে ঐ রাস্তা দিয়া যাওয়া যায়। ময়রোয়া নিবাসী জনৈক লোক আমার হস্তীচালককে দরৌলীর রাস্তা দেখাইয়া বলিল যে ডাঁড়াইলী যাইবার এই পথ। কিন্তু এই রাস্তা দিয়া যাওয়াতে আমাদের অনেক ঘোর পড়িয়াছিল। যাহাহউক আমিত সেই রাস্তা দিয়া চলি-

লাম। হস্তী এত আস্তে আস্তে চলে যে আরোহীর সময়ে সময়ে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া যায়। হস্তী গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ২ মাইল চলিতে পারে। ডাঁড়াইলী যাইবার সময় বাহিকার গজেন্দ্র গমনে আমার এরূপ বিরক্তি হইতেছিল যে, রাস্তা ফুরাইবে না বোধ হইতে লাগিল। এসব অঞ্চলের লোকের দূরতামাপিকা বুদ্ধিটাও কিছু কম। যত্তপি কোন লোককে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, অমুক স্থানটি এইখান হইতে কতদুর, সে সচরাচর বলিয়া দিবে যে গন্তব্য স্থানটি এখান হইতে ২ অথবা ৪ ক্রোশ। কিন্তু বস্তুতঃ যাইতে হইলে দেখা যায় যে, গন্তব্য স্থানটি সেইস্থান হইতে ৪ অথবা ৮ ক্রোশ দূর। বাস্তবিক ডাঁড়াইলী যাইবার সময় ইহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছিলাম। যতলোককে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ডাঁড়াইলী কত দূর, তাহারা বলিয়াছিল যে ডাঁড়াইলী আর বেশী দূর নয়। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়াই অপর একটি লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে গন্তব্য গ্রামটি এখনও অনেক দূরে। প্রাচীন আখ্যায়িকা বর্ণিত ট্যাণ্টেলাসের ন্যায় এইরূপে একমুহূর্ত্তে আশামুগ্ধ ও পরক্ষণেই আশাতাড়িত হইয়া বেলা ২॥টার সময়ে আমি ডাঁড়াইলী গ্রামে পৌছিলাম।

ডাঁড়াইলীতে পৌছিয়াই হে—বাবুর মুখে শুনিলাম যে, বন্দোবস্ত বিভাগের মোহৎমিম্ গ—সাহেব তথায় আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাঁহার শিবিরে যাইলাম। সাহেবের সহিত জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইল। তৎপরে আমি সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া হে—বাবুর শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যার সময় কর্ণই গ্রামের তজদিক্ আরম্ভ হইল। এই গ্রামটি হাতোয়ারাজের সম্পত্তি ও প্রতাপপুরের কুঠিয়াল সাহেবের নিকট ইজারা দেওয়া। স্বল্লায়-তন প্রযুক্ত গ্রামটির তজদিক্ শীঘ্রই সমাপ্ত হইয়া গেল। এই গ্রামের তজদিকের সময় অনেক প্রজা খাজনা সম্বন্ধে ওজর আপত্তি করিল। মনে করুন রাজের জমাবন্দীতে প্রজার নামে ১০৲ টাকা খাজনা লেখা আছে। সেই অনুযায়ী প্রজাও জমীদারকে ১০৲ টাকা খাজনা দেয় ও রাজও তাহাকে ছাপা রসিদ দেয়। কিন্তু রাজের অনিষ্ট করিবার মানসে দুষ্ট প্রজা বন্দোবস্তের হাকিমের নিকট মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া দিল যে সে রাজকে ৮৲ টাকা খাজনাস্বরূপ দিয়া থাকে। আর ইহাও বলিল যে, ছাপা রসীদে যে ১০৲ টাকা লিখিত আছে উহা গ্রামের পাটোয়ারী মিথ্যা করিয়া লিখিয়া দিয়াছে। কিন্তু রাজপ্রদত্ত ছাপার রসীদ থাকাতে প্রজাদের অমূলক আপত্তি নামঞ্জুর হইয়া গেল। কর্ণই গ্রামের তজদিক্ হইয়াই অত্যকার কার্য্য শেষ হইল।

পরদিবস ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে স্নানাহারাদির পর আমি ডাঁড়াইলী শিবির ত্যাগ করিয়া পুনরায় মাঝামোতিবার গ্রামাভিমুখে চলিলাম। এবার আর পাকা রাস্তা দিয় আসি নাই। ক্ষেত্রের খুরছুরের উপর দিয়া আসা গেল। পরগণা চৌবারে দেখিলাম যে, এবারে অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও প্রচুরপরিমাণে ইক্ষু জন্মিয়াছে। বেহারাঞ্চলে যেমন অহিফেন বিক্রয় করিয়া প্রজারা বৈশাখমাসের কিস্তির খাজনা জমীদারকে দিয়া থাকে, সেইরূপ ইক্ষু হইতে

প্রস্তুত গুড় বিক্রয় করিয়াও জমীদারের প্রাপ্য কিয়ৎপরিমাণে শুধিয়া ফেলে। হস্তীরা এত ইক্ষুপ্রিয় যে, আমার বাহিকা হস্তিনীটি ইক্ষুক্ষেত্র দেখিলেই সেই ক্ষেত্রের উপর যাইয়া দুই এক গুচ্ছ ইক্ষু উৎপাটিত করিয়া লইত ও যাইতে যাইতে ভক্ষণ করিত। প্রজার জীবন-সর্ব্বস্ব ইক্ষু এইরূপে নষ্ট হইতেছে দেখিয়া ক্ষেত্রস্বামীরা হস্তিনীর পিতৃপুরুষের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। বলিতে পারি না যে বাহিকার দোষে আরোহীর উপরেও সেই সুধাবর্ষণ হইয়াছিল কি না। ময়রোয়ায় শীঘ্রই পৌঁছিলাম। ময়রোয়া থানার সম্মুখ দিয়া আসিবার সময় একটি কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়াছিল। সেই সময়ে পাটনার কমিসনার সাহেব ছাপরার পুলিস বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অপরাপর কয়েকটি সাহেব ময়রোয়াতে শীকার করিবার মানসে আসিয়াছিলেন। যে সময়ে আমি আসিতেছিলাম সেই সময়ে তাঁহারা ময়রোয়া থানার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। আমার হস্তিনীটিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা একজন পুলিসের কনষ্টেবল পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হস্তিটী কোথাকার। পুলিস কনেষ্টবলকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া আমার মনে ভয় হইল যে, যদ্যপি ইহারা আমার হস্তিটী কাড়িয়া লয় তাহা হইলে আমি কিরূপে শিবিরে পৌঁছিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি ফিল্‌বানকে বলিলাম যে হস্তীকে দ্রুতপদ চালাইয়া লইয়া চল ! কিন্তু গজেন্দ্রগমন ও অতিমন্থরগমন প্রায় একইরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমার বাহিকা কোনরূপে দ্রুতপদে চলিতে পারিল না। ইতিমধ্যে কনষ্টেবলটি আসিয়া পৌঁছিয়া গেল ও জিজ্ঞাসা করিল যে হস্তিটী কোথাকার। প্রত্যুত্তরে ফিল্‌বান বলিল যে হস্তীটি হাথোয়ারাজের। এই প্রত্যুত্তর পাইয়া ত কনষ্টেবল ফিরিয়া গেল ও আমিও থানা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলাম। এক আপদ অতিক্রম করিয়া আসিলাম বটে কিন্তু আবার এক নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইল। ডাঁড়াইলী শিবিরে যাইবার সময় যখন ময়রোয়ার ক্ষুদ্র নদীটি পার হই, তখন খেওয়াঘাটরক্ষকেরা কোনরূপ শুল্ক চায় নাই। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় রক্ষকেরা শুল্ক চাহিতে লাগিল। কিন্তু নিদাঘবিশুষ্ক নদী পার হইবার জন্য কে কবে শুল্ক দিয়া থাকে এই বলিয়া ত ফিল্‌বান হস্তিনীটিকে ক্ষিপ্রপদ চালাইয়া লইয়া চলিল। অপরাহ্নে আমি মাঝামোতিবার শিবিরে পৌঁছিলাম। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় সু—বাবু মাঝামলউ গ্রামের অবশিষ্ট যে কয়েকটি ফার্দ্দতনাজা লিখিত আপত্তি ছিল, সেই কয়েকটি আমার সম্মুখে নিষ্পত্তি করিলেন। পরদিবস ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে আমি হাথুয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

প্রকৃতি।

বঙ্কিম বাবু তাঁহার কোন এক লেখায়—যতদূর মনে পড়িতেছে কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবনীর ভূমিকায় বলিয়াছেন—একদিন তাঁহারা গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন, একজন মাঝি জলের উপর দিয়া গাহিয়া যাইতেছিল—

সাধ আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে।

মাতৃভাষার এই সরল সহজ গানটি শুনিয়া তাঁহার হৃদয় যেরূপ ভক্তিরসে উথলিয়া উঠিয়াছিল—এমন ইংরাজি কিম্বা আধুনিক বাঙ্গলার উচ্চতর মহত্তর ভাবযুক্ত কবিতাতে হয় নাই।

প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাব ঠিক এইরূপ।—প্রকৃতিতে যে সকল প্রাকৃতিক-জ্ঞানের কথা আছে তাহা কিছুই নূতন কথা নহে; পাশ্চাত্যজ্ঞানের সারসঙ্কলনমাত্র। এ সকল তত্ত্বের সহিত অল্পবিস্তর পরিমাণে ইতিপূর্ব্বেই যে আমাদের আলাপ পরিচয় না হইয়াছে এমন বলিতে পারি না। অথচ সেইসব কথাই এই বইখানিতে পড়িতে যতখানি আনন্দ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিলাম, এমন পূর্ব্বে করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কারণ আর কিছু নহে—কেবল ভাষার গুণে। বিদেশীয় ভাষায় এ সকল জ্ঞান আয়ত্ত করিতে যে শ্রম যে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল ইহাতে সে ক্লেশ নাই সে শ্রম নাই; আছে শুধু জ্ঞানলাভের আনন্দ—আর কাব্যপাঠের মুগ্ধতা। বস্তুতঃই প্রকৃতি পড়িতে এতই ভাল লাগে যে ভুলিয়া যাইতে হয় ইহা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ—মনে হয় যেন কাব্যপাঠ করিতেছি। লেখক ভূমিকায় হতাশভাবে বলিয়াছেন "বাঙ্গলাভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্য সাধনের চেষ্টা; সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না।" কিন্তু আমরা অসঙ্কোচে বলিতেছি—ইহা যদি অসাধ্য সাধন হয় ত তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। জগৎ-অভিব্যক্তি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, আলোক তাড়িৎ তরঙ্গ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিগূঢ় কঠোর তত্ত্ব সকল বাঙ্গলাভাষায় যে এমন সংক্ষেপে অথচ এত জলের মত পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করা যায় এ বইখানি না পড়িলে তাহা ধারণা করা যায় না। লেখকের ভাষার সরলতা ও প্রকাশ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি একস্থানে আক্ষেপ করিয়াছেন "দীনা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য; অন্যদেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে—এদেশে তাহা বর্ণনারও উপায় নাই।" একথা অস্বীকার করিবার নহে—কিন্তু প্রকৃতির ভাষা দেখিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আশা হয় যে লেখকের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যদি এইরূপ বিজ্ঞান প্রচার উদ্যমে জীবন উৎসর্গ করেন—তাহা হইলে তাঁহাদের যত্নে বঙ্গভাষার এ কলঙ্ক একদিন মোচন হইবে, বিজ্ঞানের কোন

* প্রকৃতি। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ প্রণীত।

কথা কহিতেই তখন আর শব্দের অভাব হইবে না।—নিউটনের বশীভূতা হইয়া প্রকৃতি যেমন তাঁহার নিকট আপনার যত্নলুক্কায়িত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন,—তেমনি বঙ্গভাষাও এইরূপ প্রতিভার নিকট আপন রত্নভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন। 'হেলম হোলমজের গণিত মূলক বিজ্ঞান'; 'কেলবিনের Vortex theory' যাহা এখন বঙ্গভাষায় বর্ণনা একরূপ অসাধ্যসাধন—তখন তাহাই সহজ সিদ্ধির বিষয় হইবে। আমাদের দেশে, বিজ্ঞানের নবচর্চ্চার যুগে এইরূপ বৈজ্ঞানিক লেখকের উদয় অত্যাবশ্যক; নিতান্ত সুখের বিষয়—সেই আবশ্যক সিদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাল অনুবাদ করা কম ক্ষমতার কাজ নহে। যশে ওরিজিনাল লেখকের সিংহাসন অনুবাদকের প্রাপ্য না হইলেও পরবর্ত্তী আসন তাঁহার, এবং উপকার কল্পে উভয়েই সমকক্ষ; বরঞ্চ স্থানবিশেষে অনুবাদকের দ্বারা অধিক উপকার সাধিত হয়;—প্রভেদ এই, একজন নিজের নিকট প্রকাশিত সত্যকে কলেবর দান করিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন—অন্যজন পরের ভাব আপনার রূপে আয়ত্ত করিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন। উভয়েরি প্রতিভার আবশ্যক, কাব্য অনুবাদ করিতেও কবির দৃষ্টি চাই; বিজ্ঞান অনুবাদ করিতেও বৈজ্ঞানিক হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেশে সাহিত্যক্ষেত্র কখনই মরুপরিণত হয় নাই, অল্প বিস্তর পরিমাণে কালে কালে তাহার কর্ষণ সম্পাদিত হইয়া আসিয়াছে—তাই আধুনিক যত্নকর্ষণে এত অল্পদিনে সাহিত্যের এমন মধুর শ্রী। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা এ কথাও বলিতে পারি না। প্রকৃত প্রস্তাবে এতকাল ধরিয়া আমরা বিজ্ঞানবর্জ্জিত, যে ভাস্করাচার্য্য আর্য্যভট্ট প্রভৃতি মনস্বী বৈজ্ঞানিকগণকে স্বজাতি বলিয়া গৌরব করিলেও সে মানুষে ও এ মানুষে আমরা ঠিক এক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহারা আমাদের শুধু ধ্যানধারণার বস্তু—স্বপ্নের কল্পনার দেবতা। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বিজ্ঞানে অনার্য্য বর্ব্বরই আমাদের প্রকৃত অভিধান। বহুযুগের বিজ্ঞানবর্ব্বর আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া অতি অল্পদিনমাত্র আবার বিজ্ঞান অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছি—কিন্তু এ অনুশীলনাও অতি অল্পক্ষেত্রে আবদ্ধ। ইহা সত্ত্বেও এত অল্পদিনের শিক্ষাতেই আমরা যে এখনি জগদীশ বাবুর মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাই ইহা আমাদের কম গৌরবের বিষয় নহে; এবং রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর মত কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিককে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করিতে দেখিতে পাই—ইহাও আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নহে। জগদীশ বাবু আমাদের গৌরবভাজন—কেননা তাঁহার প্রতিভা দূরবিস্তৃত—তাঁহার কার্য্য জগৎ সম্পর্কে, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর নিকট বঙ্গবাসী ঋণী অধিক কেননা তাঁহার কৃত উপকার কেবল আমাদিগতেই আবদ্ধ। পাশ্চাত্য জগৎ বহুকষ্টে এ কয় শতাব্দী ধরিয়া যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছে—তাহা যতক্ষণ সাধারণভাবে আমাদের দেশের আয়ত্তীভূত না হইবে ততক্ষণ তাহারি ধারাবাহিক উন্নতি স্রোতের নব নব স্পন্দলহরী দেখিয়া চিনিবার দিব্য দৃষ্টি সে পাইবে কোথা হইতে? সুতরাং বিজ্ঞান চর্চ্চার এই প্রথম যুগে যাঁহারা

দেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা করেন—এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন তাঁহারা আমাদের সমধিক কৃতজ্ঞতাভাজন; এবং এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশই প্রকৃতির প্রকৃত সমালোচনা। প্রবন্ধগুলির বিশেষ করিয়া সমালোচনা করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র,—কেননা আমরা বৈজ্ঞানিক নহি। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ন্যায় প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নির্ব্বাচন কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে, বঙ্গবাসীর প্রকৃতিতে বিজ্ঞানের প্রতি প্রীতিকারিতা বৃদ্ধির পক্ষে ইহা যথেষ্ট অনুকূল,—জ্ঞানলাভ ছাড়া ইহাতে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কল্পনারও যথেষ্ট অবসর আছে। প্রলয়, মৃত্যু, ক্লীকোর্টের কীট, জ্ঞানের সীমানা, প্রকৃতির মূর্ত্তি—প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে মস্তিষ্কের স্থূলাবরণ পর্য্যন্ত সহসা যেন অনুভূতিময় হইয়া পড়ে, তাহাতে জ্ঞানের তরঙ্গ কল্পনাবর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া নূতন দিব্য চিন্তা দিব্য দর্শন সৃজিত করে—সে অপূর্ব্বভাব আশা বিস্ময় জ্ঞান কল্পনার সমবায় চিত্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাইসম্যানের থিওরি সম্বন্ধে আমাদের মনের চিত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

বাইসম্যান বলেন—"জীবশরীরের স্থূলত দুইটা ভাগ। উহার অস্তিত্বের অন্য এইরূপ নির্দ্দেশ প্রত্যেক জীবের ও প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে খাটে। একটা ভাগকে বীজভাগ বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয় ভাগকে আবরণ ভাগ বলা যাইতে পারে। বীজ ভাগটাই প্রকৃত প্রাণী;—উহাই প্রকৃত জীব। প্রকৃতির নিকট উহারই মূল্য। আবরণ ভাগটার অস্তিত্ব কেবল বীজভাগকে রক্ষা করিবার জন্য, উহাকে আবরণ করিয়া ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। উহার অস্তিত্বের অন্য অর্থ বা উদ্দেশ্য নাই। নাক মুখ চোক কান, স্নায়ু অস্থি পেশী ত্বক শিরাধমণী,—প্রভৃতি লইয়া সাধারণত যেটা জীবের শরীর বা দেহ বলিয়া পরিচিত সেটা প্রায় সমগ্রই এই আবরণ কার্য্যের জন্য, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বীজভাগকে প্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান। এই আবরণ ভাগ আবার বীজ ভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। বীজ আপনার আবরণ আপনি প্রস্তুত করিয়া লয়। বীজ আপনাকে বিভক্ত করে; এক ভাগ বীজই থাকে; অপর ভাগ সেই বীজকে বাহ্য প্রকৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গঠিত ও নির্ম্মিত হয়। আবরণ শরীর বীজ শরীর হইতে উদ্ভূত হয়; কাজেই বীজের ধর্ম্ম আবরণে বর্ত্তমান। যে যেমন বীজ তদুৎপন্ন আবরণ তেমনি। গাছের বীজ হইতে গাছের দেহ—মানুষের বীজ হইতে মানুষের দেহ জন্মে। বীজকে রক্ষা করাই আবরণের কাজ। বহিঃস্থ প্রকৃতির সহিত আবরণের কারবার। বহিঃস্থ প্রকৃতির যাহা কিছু অত্যাচার উপদ্রব, তাহা আবরণের উপর দিয়াই যায়। আবরণ বাহ্য প্রকৃতির সহিত কারবারের ফলে পীড়িত, দলিত, বিকৃত, পরিবর্ত্তিত হয়। বাহ্য প্রকৃতি আবরণকে ভেদ করিয়া বীজের উপর আক্রমণ বা তাহার বিকার সম্পাদন সহজে করিতে পারে না। বীজ আবরণকে সৃষ্টি করে,—কিন্তু আবরণ হইতে বীজ জন্মে না। বীজ শস্য আবরণ তাহার খোসা মাত্র। আবরণের বিকারে বীজের বিকার হয় না। আবরণের

উন্নতিতে বীজের উন্নতি হয় না। জীবনের প্রথম বয়সে বীজ আবরণের সৃষ্টি করে—আবরণ উত্তরকালে বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজে পুষ্ট বিকৃত বা সংস্কৃত হইয়া বীজকে রক্ষা করে। জীবনে পূর্ণ বয়স উপস্থিত হইলে, বীজ জীবনের প্রধান কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। আপনি আপনাকে ভাগ করে, আপনার খানিকটা ভাগ আপন হইতে বিচ্যুত করে, এই ভাগটা পৃথক হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র জীবন লাভ করে; আপনার স্বভাবানুযায়ী নূতন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়া আপনার জীব লীলা আরম্ভ করে। এই ব্যাপারের নাম সন্তানোৎপাদন।

বীজ ভাগ ক ও আবরণ ভাগ খ। ক ও খ উভয় লইয়া সম্পূর্ণ জীব শরীর। ক হইতে খয়ের উৎপত্তি। খয়ের উৎপত্তি ককে রক্ষা করিবার জন্য; বাহিরে যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ককে বিনষ্ট করিতে উদ্যত আছে, তাহাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য। খ বাহির হইতে আহার সংগ্রহ করে, আত্ম পুষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে ককে নিভৃতে সুরক্ষিত ও অবিকৃত রাখে। কয়ে যে সকল ধর্ম্ম বর্ত্তমান, তাহাই জীবের সহজ ধর্ম্ম; খ বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবে যে সকল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে তাহাই জীবের অর্জ্জিত ধর্ম্ম। খ সহজে বিকৃত হয় কিন্তু ক সহজে বিকৃত হয় না। খ ক্রমশ পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করিয়া আপন সামর্থ্যের সীমায় বা পরিণতিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময় জীবের পূর্ণ বয়স বা যৌবনকাল। বাহ্য প্রকৃতির সহিত খয়ের যে সংগ্রাম তাহা চিরকাল চলিতে পায় না। যত দিন খয়ের জয় তত দিন উহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি। সে সময় আইসে যখন এই বৃদ্ধি ও পুষ্টি স্থগিত হয়। তখন বাহ্য প্রকৃতি খয়ের উপর জয় লাভ করিতে আরম্ভ করে। আবরণ তখন ক্রমে জীর্ণ হইতে থাকে। খয়ের পুষ্টির ও বৃদ্ধির অবস্থা জীবের বাল্য। খয়ের পরিণত অবস্থা জীবের বার্দ্ধক্য। যৌবনে বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বে ক আপন বার্দ্ধক্যোন্মুখ আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চায়। তখন আর প্রাচীন বার্দ্ধক্যোন্মুখ জীর্ণ আবরণের উপর বিশ্বাস রাখিয়া থাকিতে পারে না। প্রাচীন আবরণ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসে; অথবা আপনারি খানিকটা অংশ বাহির করিয়া দেয়। ক প্রাচীন খয়ের আবরণ হইতে বাহিরে আসিয়া নূতন ঘর পাতিয়া নূতন সংসারযাত্রা নির্ম্মাণ করে। ক, খ হইতে এইরূপে মুক্তি লাভ করিয়া বাহিরে আসে ও নূতন আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। সেই নূতন আবরণের নাম যেন গ। পূর্ব্বতন পুরুষে খ যেমন ক হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী পুরুষে গ তেমনি সেই ক হইতেই নির্ম্মিত হয়। ক ও খ একত্রযোগে পিতা বা মাতা। জীবতত্ত্বে পিতা ও মাতা উভয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই; উভয়েরই সংসারে স্থান একরূপ, উভয়েরই জীবনের উদ্দেশ্য একরূপ। ক ও গ একত্রযোগে পুত্র বা কন্যা। ক ও খ উভয়ের সমষ্টি পূর্ব্বপুরুষ,—ক ও গ উভয়ের সমষ্টি পরপুরুষ। সহজ ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বপুরুষে বর্ত্তমান ছিল তাহা পরপুরুষেও দেখা দেয়। কেননা সহজ ধর্ম্ম কয়ের ধর্ম্ম; এবং পূর্ব্বপুরুষের ক অবিকৃত অবস্থায় পরপুরুষে যায়। পূর্ব্বে ক ছিল এক আবরণের ভিতর, এখন সেই ক আছে

অন্ত আবরণের ভিতর। পিতা ও পুত্রে এই মাত্র তফাৎ। পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ধর্ম্ম পর-পুরুষে যায় না। কেননা গয়ের সহিত খয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। বাহ্যপ্রকৃতি খয়ে যে পরিবর্ত্তন সাধিত করে তাহা কয়ে সংক্রামিত হয় না, কাজেই তাহা গয়ে যায় না। পর-পুরুষের ক এবং গ পূর্ব্বপুরুষের সহজ ধর্ম্ম পায় মাত্র। অর্জ্জিত ধর্ম্ম পায় না। তেমনি আবার গ যেসকল নূতন ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তাহা তৎপরবর্ত্তী পুরুষে যায় না; আপন জীবনেই তাহার সমাপ্তি হয়।

বীজ ক প্রাচীন জীর্ণ আবরণ খ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নূতন আবরণ গকে নির্ম্মাণ করে, ক মুক্তিলাভ করিয়া নূতন স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিলে খয়ের কাজ ফুরাইল। গয়ের কাজ যখন আরম্ভ হইল খয়ের কাজ তখন শেষ হইল। প্রকৃতির আর তখন খয়ের উপর অনুমাত্র মমতা নাই। পুত্র জন্মিলে পিতা বৃদ্ধ। পিতার জীবনের উদ্দেশ্য এখন সিদ্ধ হইয়াছে। এখন তাহার অস্তিত্ব ধরার ভারস্বরূপ। তাহার অস্তিত্ব এখন জীবন সংগ্রামের তীব্রতা বাড়ায় মাত্র। শিশু স্ফূর্ত্তি ও আগ্রহ সহকারে নূতন জীবন আরম্ভ করিয়া নূতন উৎসাহে জীবনসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বৃদ্ধের জীবন এখন উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক। প্রকৃতি তাহাকে একপন্থা দেখাইয়া দিতেছেন। সে এখন সেই পন্থায় চলুক। সেখানে সে শান্তি লাভ করিবে। সেই পন্থার নাম মৃত্যুর পন্থা। বৃদ্ধের মরণই মঙ্গল। বৃদ্ধ যেন জীবিত থাকিয়া ভবের বোঝা ভারি না করে।"

দেখা গেল জীবে বীজভাগই যথার্থ প্রাণী, এবং এই প্রাণীভাগ এক আবরণ হইতে অন্য আবরণে স্বাধীন জীবন আরম্ভ করিলে জীবের কাজ ফুরাইল; 'প্রকৃতির আর তখন তাহার প্রতি অনুমাত্র মায়া মমতা নাই; পুত্র জন্মিলে পিতা বৃদ্ধ।' মৃত্যুই তখন তাহার একমাত্র পন্থা।

ইহাই যদি,—যদি প্রাণী উৎপাদনেই মাত্র ব্যক্তিগত প্রাণীর উদ্দেশ্য সাধন হয়, এমন কি সে তখন প্রকৃতপক্ষে প্রাণীহীন আবরণসর্ব্বস্ব মাত্র হয়, তাহা হইলে জীবের সন্তানোৎপাদন-রূপ উদ্দেশ্য শেষ হইবামাত্র, অন্য কথায় এক আবরণ হইতে ভিন্ন আবরণে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ শেষ করিবামাত্র, সেই উদ্দেশ্যহীন প্রাণীহীন আবরণসার জীব প্রকৃতি কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ কেননা ধূলিসাৎ হয়? বৃদ্ধ বৃদ্ধরূপে বাঁচে কেন? কেবল তাহাই নহে—তাহার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই বা কেন আর বৃদ্ধের প্রতি সংসারেরই বা দয়া মমতা কেন দেখা যায়?

বোঝা গেল সন্তানে আত্মরক্ষার জন্যই পিতা মাতার মনে স্নেহ মমতার উদয়, কিন্তু বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা দয়ামায়ায় প্রবৃত্তিও ত জীবের স্বভাবধর্ম্ম;—যদি বৃদ্ধের জীবনের কোন উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে সন্তানের বৃদ্ধ পিতামাতাকে রক্ষা করিবার অথবা বৃদ্ধের নিজেরই আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তির অর্থ কি? প্রকৃতিই বা জীবকে বৃদ্ধরূপে ক্রোড়ে আশ্রয়দান কেন করেন? কিন্তু দেখিতে গেলে বাঁচে কে? শৈশব কতটুকু? যৌবন কতটুকু? বার্দ্ধক্যই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ু। বার্দ্ধক্যই বাঁচে অধিক। ক্ষুদ্র শৈশব আপন

আবরণ পুষ্টি বৃদ্ধি করিতে করিতে অজ্ঞানে যৌবনে আসে, যৌবন আত্ম ভুলিয়া সংসারের কাজ করে, বার্দ্ধক্যই কার্য্যশেষে আপনাকে উপভোগ করে, নিজের অস্তিত্ব সুখে নিজে ভোর হইয়া থাকে, এইরূপে বার্দ্ধক্যই সর্ব্বাপেক্ষা আত্মভোগী। যাহা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম তাহার বিপরীতে সমাজধর্ম্ম টিঁকিতে পারে না; যদি বার্দ্ধক্যের জীবন নিরর্থক হইত, তাহা হইলে সমাজে বৃদ্ধ হত্যাই পুণ্যরূপে গণ্য হইত, বৃদ্ধও আত্মরক্ষার ইচ্ছা করিত না, কেননা যাহার আত্মা নাই তাহার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি আসিবে কেন? তাহার আত্মা তাহার প্রাণ ত অন্য আবরণে। কিন্তু আসলে বৃদ্ধের জীবনের মায়া কিছুমাত্র কম নহে; বরঞ্চ বেশী। কি শৈশব কি যৌবন কি বার্দ্ধক্য সর্ব্ব অবস্থাতেই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জীবের প্রধানতম প্রবৃত্তি। এমন কি পিতা মাতার সন্তানস্নেহ হইতেও ইহা প্রবল। জীবন সংগ্রামে স্বার্থ লইয়া দ্বন্দ্ব বাধিলে সন্তানকেও পিতামাতা বলিদান দিয়া থাকেন। জীবের জীবনের কেবল সন্তানগত উদ্দেশ্য সন্তানগত প্রাণ হইলে এরূপ হইত কি? প্রাকৃতিক নিয়মে বর্জ্জিত বিধি নাই। একটি বিপরীত দৃষ্টান্তে বহু যত্ন গঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও অর্থহীন হইয়া পড়ে।

আর এক কথা, এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইলে—যৌবনরক্ষা—করতলস্থ আমলকীবৎ মনুষ্যের ইচ্ছাধীন হইত না কি? কিন্তু—"যত্নে তৃণকাষ্ঠখান—রহে যুগ পরিমাণ
বহু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ।"

কোন যতি ব্রহ্মচারী—কোন চিরকুমারী বার্দ্ধক্য হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন কি?

বাইসমান এ সকল সমস্যার পূরণ কিরূপে করিয়াছেন—জানিতে ইচ্ছা হয়। অথবা ইহা এমনি অবৈজ্ঞানিক মনের প্রশ্ন যে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলাই তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই?

হিন্দু দার্শনিকেরা পিতা, পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াও জীবের জীবন রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হইল না বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদিগকে পরজন্ম পূর্ব্বজন্মের কল্পনা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ যুক্তির বিষয় নহে তাহা অগ্রাহ্য। তখন ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রত্যক্ষ বিজ্ঞানও জ্ঞানগম্য বলিয়া ধারণা ছিল,—অন্তরিন্দ্রিয়ের x rays আবিষ্কার করেই সেই জন্য তখনকার বৈজ্ঞানিকগণ জীবনপাত করিতেন।—এখন সেকাল নাই, এখন x rays ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া চাই; অন্তরিন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বিজ্ঞানকেও প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের অধীনে আনা চাই; তবেই তাহা জ্ঞানের বিষয় বিশ্বাসের বিষয় হইবে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সেই সূক্ষ্ম শৃঙ্খল প্রকৃতি কাহার নয়নে খুলিবেন?

লেখক তাঁহার প্রাচীন জ্যোতিষে বলিতেছেন—"পূর্ব্বে এদেশে যে প্রণালীতে গ্রহগণের অবস্থিতি গণিত হইত, এবং এত জটিলতা সত্ত্বেও যেরূপ সূক্ষ্মভাবে ফল নিষ্কাশিত হইত তাহাতে বিলক্ষণ বাহাদুরি ও ওস্তাদি আছে।" সেই বাহাদুরি ও ওস্তাদি দেখিলে একদিকে বাহবা না দিয়া থাকা যায় না, ও অপরদিকে যখন দেখা যায় তাঁহারা অসীম পরিশ্রমে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া পাহাড় কাটিয়া সহস্র পদস্খলন এড়াইয়া বিপুলবিক্রমে

ভূর্যর শৈলশিখরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কেবল আর একটা লাফ দিতে পারিলেই শৈল-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিরেখাবর্ত্তী ও আলোকিত দেখিতে সমর্থ হইতেন, তখন আর পরিতাপের ইয়ত্তা থাকে না।”

এখানেও সেই একটি লাফের মাত্র যেন শুধু বাকী। বিজ্ঞান জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছে, তাহার আকর্ষণ বিকর্ষণ গতিবিধি কুটপ্রণালী কত না আবিষ্কার করিতেছে, অথচ এত জ্ঞানের উন্নতিতে আসিয়া স্তম্ভিতভাবে অজ্ঞানের মত কহিতেছে—“মন কি তাহাও জানি না, জড় কি তাহাও জানি না। একই পদার্থের দুই ভাব—একদিকে জড়ত্ব একদিকে চৈতন্য। সঙ্কেত লইয়া কারবার। টেলিগ্রাফের কেরাণী যেমন সঙ্কেত লইয়া কারবার করে, বিদেশের বন্ধুর মনের কথা টানিয়া আনে, চৈতন্য তেমনি কতকগুলা সঙ্কেত লইয়া কারবার চালাইতেছে। জড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই কল্পনা জীবনরক্ষার একটা উপায় ও কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন—যথা নিযুক্তবৎ করিতেছে। জড়জগৎ আছে কি নাই মহা সমস্যা।”

এমন দিন কি আসিবে না যখন এই সমস্যার পূরণ হইবে? কোন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি জড় ও চৈতন্য জগতের অন্তর্বর্ত্তী শৃঙ্খল আবিষ্কার করিয়া ইহাদের যথাযথ স্বরূপ—যথাযথ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন? আশা হয় বিজ্ঞানের সেই নবযুগ আসিবে,—পতঞ্জলি, কপিল, নিউটন, কাণ্ট একই আবরণে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই তত্ত্বকে এক করিয়া দেখাইবেন। বুঝি বা ভারতভূমিই আবার বিজ্ঞানের সেই অপূর্ব্ব আলোকবর্ত্তিকা হস্তে জগৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। জানি না ইহা বাতুলের আশা কিনা—এইমাত্র জানি, বাতুলতা হইলেও ইহা আমার আজিকার বাতুলতা নহে; আমার সত্যযুগের প্রপিতামহ ক স্বকীয় বাতুল কল্পনা আমাতে বিকশিত তাঁহারই ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ধ্বনিত করিতেছেন।

উপসংহারে একটি কথা এই—বইখানির মধ্যে দুই এক স্থল সাধারণ পাঠকের পক্ষে একটু যেন জটিল বোধ হইল। “জ্ঞানের সীমানা” নামক প্রবন্ধে—“স্ত্রী পুরুষ ভেদ স্বভাবের নিয়ম নহে; স্ত্রী পুরুষ ভেদ সৃষ্টিরক্ষার একমাত্র উপায় নহে। ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী বা ব্যক্তিমাত্রই পুরুষ, অথবা ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী ও পুরুষ; কাহারো স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়ই অবিকশিত; কাহারও বা উভয়ভাবই সমান পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত, কোন পুরুষে স্ত্রীভাব পুরুষত্বে লীন কোন ব্যক্তিতে পুরুষত্ব স্ত্রীভাবে আচ্ছাদিত।

“মৃত্যু স্বভাবের ধর্ম্ম নহে, জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে, জাতীয় জীবন বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিজীবনের উপার্জ্জিত, ব্যক্তিজীবনে অভিব্যক্ত ধর্ম্মমাত্র।”—এই সকল অংশের আর একটু ব্যাখ্যা করিলে ভাল হইত।

স্বরলিপি।

সংকেতের ব্যাখ্যা।

স, র, গ, ম, প, ধ, ন = শুদ্ধ সুর।

রো, গো, ধো, নো = কোমল সুর।

মী = কড়ি মধ্যম।

মধ্য সপ্তকের সুরে কোন চিহ্ন থাকে না। উপরের সপ্তকের সুরের মাথায় রেফ্ এবং নিম্ন সপ্তকের সুরের নীচে হসন্ত থাকে যথা, স, স্, র্স।

সহজে একটী অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহাকে একমাত্রা কাল কহে। একটি সুর যতগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে, তাহার মাথার উপর সেই চিহ্নিত অঙ্ক দেওয়া যাইবে। যথাঃ—স১ এই সুরটী একমাত্রা কাল স্থায়ী অর্থাৎ শুদ্ধ সা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই সময় পর্য্যন্ত সুরটী স্থায়ী।

স২—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর এক আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে। যথা সা—আ।

স৩ = ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর দুই আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে। যথা সা—আ—আ ইত্যাদি।

আবার কোন মাত্রা চিহ্নিত সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী সুরে কিম্বা সুরগুলিতে যদি মাত্রাচিহ্ন না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মাত্রাচিহ্নিত স্বরের কাল-মধ্যেই ঐ সব সুরগুলি উচ্চারিত হইবে। যথা ঃ—

সর১।—এখানে একমাত্রাকালের মধ্যে দুটি সুরই বাজাইতে হইবে।

সরগ১।—একমাত্রা কালের মধ্যে তিন সুরই বাজাইতে হইবে।

আবার সর-গ১, ও সরগ১এ বিশেষত্ব আছে। সর-গ১, এ স্থলে কশির বাম পার্শ্বস্থিত সুরের মাত্রা কাল তাহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সুরের মাত্রা কালের সমান, অর্থাৎ 'সর' ইহা অর্দ্ধ মাত্রা কাল স্থায়ী এবং 'গ' ইহা অর্দ্ধ মাত্রা কাল স্থায়ী। কিন্তু সরগ১ এর প্রত্যেক সুরের মাত্রাকাল সমান, স একতৃতীয়াংশমাত্রিক, র একতৃতীয়াংশমাত্রিক, ও গ একতৃতীয়াংশমাত্রিক, তিনে মিলিয়া পূর্ণ এক মাত্রা সম্পন্ন।

সর১—এ স্থলে বাম পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র 'স'কে ভূমিকা বলা যায়, তাহা মীড়ের কাজ করে। সর১ ও সর১ ইহাদের প্রভেদ এই যে সর১র প্রত্যেক অক্ষরের মূল্য আছে, 'স'র মূল্য অর্দ্ধমাত্রা ও 'র'র মূল্য অর্দ্ধমাত্রা, উভয়ে মিলিয়া একমাত্রা। কিন্তু সর১র 'স'য়ের কোন মূল্য নাই, এখানে শুধু 'র১'ই পূর্ণ একমাত্রা। 'স'কে শুধু কোনমতে তাড়াতাড়ি স্পর্শমাত্র করিয়া প্রধান সুর র১ বাজাইতে হয়।

দেড়মাত্রা নিম্নলিখিত উপায়ে বুঝাইতে হয়; প১পম১। এখানে প্রথম 'প'র মূল্য একমাত্রা, দ্বিতীয় 'প'র মূল্য অর্দ্ধমাত্রা, উভয়কে বন্ধনীতে আটক করাতে উহারা বিভিন্ন 'প' না হইয়া একটী দেড়মাত্রা কাল স্থায়ী 'প' হইল। বন্ধনী না থাকিলে উহারা দুই স্বতন্ত্র 'প১ হইত, একটীর মূল্য একমাত্রা অপরটীর মূল্য অর্দ্ধমাত্রা। এখন উহাদের স্বতন্ত্ররূপে দুইবার করিয়া না বাজাইয়া শুধু প্রথম প বাজাইয়া দেড়মাত্রা পর্য্যন্ত তাহাকে টানিয়া রাখিতে হয়।

[ ] এই ব্র্যাকেট পুনরাবৃত্তির চিহ্ন, যে অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে তাহা দুইবার বাজাইতে হইবে।

{ } দ্বিতীয়বার আবৃত্তিকালে কতকগুলি সুর বাদ দিতে হইলে তাহারা এই বন্ধনীতে আটক থাকে, ইহার অন্তর্ভুক্ত সুরগুলিকে দ্বিতীয়বারের বেলা না বাজাইয়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে।

কলির শেষে আ—প্র থাকিলে প্রথম কলির আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন বুঝায়।

শেষ = আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গান যেখানে শেষ করিতে হইবে।

আ—আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কোন কোন স্থলে প্রথম দুই একটী সুর বাদ দিয়া আরম্ভ করিতে হয় সেই স্থলে যে সুরের মাথায় 'আ' থাকিবে সেই সুরে ধরিতে হইবে।

কখন কখন স্বরশ্রেণীর কোন সুরের মাথার উপর আর এক শ্রেণী স্বর থাকে। তখন বুঝিতে হইবে যে পুনরাবৃত্তির কালে গানের পদে নীচের সুরের বদলে সেই উপরের সুর সংযোজন করিতে হইবে। নিম্নে যে গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

প্রত্যেক তাল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বিভক্ত যেমন কাওয়ালি চতুর্মাত্রিক, একতালা ত্রিমাত্রিক ইত্যাদি। চতুর্মাত্রিক তালযুক্ত গানের স্বরলিপিতে প্রত্যেক চারিমাত্রা অন্তর এক একটি দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে। সেইরূপ অন্য কোন তালযুক্ত গানের স্বরলিপিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পর তালের পূর্ণ আবৃত্তি বুঝাইবার জন্য এক একটি দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে।

যে স্থলে মাত্রা চিহ্নিত কশির নীচে গানের পদের স্থানে কশি টানা থাকিবে সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের সুরের রেশ চলিতেছে কিন্তু যে স্থলে নীচে কোন কশি নাই, সে স্থলে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কাল পর্য্যন্ত বাজনা বা গলা ছাড়িয়া রাখিতে হইবে।

মগ১ । ম১ নো১ ধ১ । ধন১ ন১ র্স১০। নর্সর্র১ র্সন১ ন১ । র্স৩ ।—১ র্স২ ।
ঝুরু ঝু রু ঝু রু বা য়ু ব — হে যায় তার

ন৩ র্স১ ন১ । র্সর্র১ র্স১ র্সনো১ । ধনো১ ধনোর্স১ নো১ । ধ৩ ।—১ ধ২ ।
কা নে কা নে কি যে ক — হে যা য় তাই

"ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়" "কানে কানে কি যে কহে যায়" এই দুই স্থলে প্রথম "যায়" তিন মাত্রা কাল টানিয়া রাখিয়া তাহার পরে একমাত্রা কাল ছাড়িয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় "যায়" সে ককমাত্রা কালও টানা থাকে।

চিত্রে যেমন আলো ও ছায়ার সমাবেশে চিত্রটী আরো ফুটিয়া উঠে, সুরের সেইরূপ মৃদু ও প্রবল আওয়াজের তারতম্য রক্ষা করিয়া গাহিলে গানের ভাবটী সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠিয়া গানকে আরও সুমিষ্টতর করে।

সুরের আওয়াজের চিহ্ন এইরূপ :—

প্রবল আওয়াজ	...	...	(ব)
মৃদু আওয়াজ	...	...	(মৃং)
অতি প্রবল আওয়াজ	...	...	(বব)
অতি মৃদু আওয়াজ	...	...	(মৃমৃ)
মধ্য বলের চিহ্ন	...	...	(ম)
আওয়াজ বৃদ্ধির ঐ	...	...	(বৃ)
হ্রাসের ঐ	...	...	(হ্র)
ক্রমশঃ বৃদ্ধির ঐ	...	...	(ক্র বৃ)
ক্রমশঃ হ্রাসের ঐ	...	...	(ক্র-হ্র)

এই অক্ষরগুলি সুবিধা বুঝিয়া পদের নীচে কিম্বা সুরের মাথায় বসিবে।

কোন বিশেষ চিহ্নের পর যত দূর এইরূপ বিন্দুশ্রেণী..................থাকিবে তত দূর পর্য্যন্ত সেই চিহ্নের কার্য্য চলিবে।

গানের স্বরলিপির আরম্ভে গানটীর প্রত্যেক ঘরের মাত্রাসংখ্যা উভয় পার্শ্বে ডবল দাঁড়ির মধ্যে লিখিয়া দেওয়া যাইবে। যথা ॥৪॥, বা ॥৩॥, বা ॥২॥ ইত্যাদি।

টোড়ি—কাওয়ালী।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুর—ঐ

নব আনন্দে জাগো, আজি
নব কিরণে।
শুভ্রসুন্দর, প্রীতি উজ্জ্বল,
নির্ম্মল জীবনে।
উৎসারিত নব জীবন নির্ঝর
উচ্ছ্বসিত আশা গীতি
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে
আজি এই শান্তি পবনে।

আ

নো১ নোধো২

॥৪॥ স১ ধো১। ধো১ ধো২ ধো১। পম১ প১ মগোর১ গো১। —২
ন ব আ ন ন্দে জা — গো — —

পম১ প১। ধো৪। —১ প১ প১ ম১। প১ প১ প১ প১। নোধো৩
আ — জি — — ন ব র বি কি র ণে

শেষ।

পম১। প৩ মগো১। গো২ গো১ গো১। —১ র১ স২। —২ গো২। গো১ গো২
— — — শু ভ্র সু — ন্দ র — প্রী তি উ

র১। স৪। ধো২ ধো১ ধো১। প১ ম১ নোধো২। —২ র্সনো১ র্স১॥
জ্জ্ব ল নি র্ম্ম ল জী ব নে — ন ব

(আ—প্র)

[ধো২ ধো২। প১ ধো১ প১ ম১। ধো২ ধো১ ধো১। র্সন১ র্স১ র্স১ র্স১।
উৎ সা রি ত ন ব জী ব ন নি — র্ঝ র

ধো২ ধো২। র্সন১ র্স২ র্স১। র্রো৩ র্স১। র্স১ ন১ ধো১ প১।]" প১ র্গো১
উ চ্ছ্ব সি — ত আ শা গী — তি — অ মৃ

র্গো১ র্গো১। —১ র্গো১ র্গো১ র্রো১। র্রো১ র্স১ র্স২। ন১ ন১ র্স২।
ত পু — ষ্প গ — ন্ধ ব হে আ জি এই

র্রো৩ র্স১। নো১ র্স১ নোধো২। —২ প১ নো১।
শা ন্তি প ব নে — ন ব

(আ—প্র)

কাহাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্য সকলে চলিয়া গেলে ভগিনীপতি ডাক্তারকে ডিনারে থাকিতে বলিলেন। সন্ধ্যার পর আমরা গৃহ কর্ম্ম সারিয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি একাকী টেবিলের নিকট বসিয়া আমার সেই পরিত্যক্ত নভেলখানি লইয়া পড়িতেছেন। আমরা একেবারে নিকটে আসিতে তাঁহার যেন হুঁস হইল, বইখানি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দিদি বলিলেন, "বসুন। এমন অজ্ঞান হয়ে কি পড়্‌ছিলেন? মিডলমার্চ্চ? আমরা এসে ত আপনার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গালুম না?"

আমরা উপবিষ্ট হইলে ডাক্তারও বসিলেন—বসিয়া ঈষৎ উৎগ্রীব হইয়া তাঁহার সুকোমল পাণ্ডুবর্ণ, বালোপম মসৃণ চিবুক ও কপোল প্রান্তে, কর্ণমূল বিলুণ্ঠিত আকুঞ্চিত বিরল শ্মশ্রু লহরীর ক্ষুদ্র এক গুচ্ছ বামহস্তের অঙ্গুলী বিজড়িত করিতে করিতে, সূক্ষ্ম স্বর্ণরজ্জু গ্রথিত আইগ্লাসের মধ্য হইতে আমাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"মাপ করবেন, সত্যিই এ একটা আমার ভারী weakness; জর্জ্জ এলিয়টের নভেল একখানি হাতের কাছে পেলে আর লোভ সামলাতে পারি নে। দেখুন না এই বইখানা কতবার পড়েছি—তার ঠিক নেই,—তবুও এখন মনে হচ্ছিল,—যেন নতুন বই পড়ছি, নতুন জ্ঞান নতুন আনন্দের মধ্যে ডুবে আছি। আপনি অবশ্য পড়েছেন বইখানি?"

দিদি। পড়েছিলুম অনেকদিন আগে; মন্দ লাগেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে যে লম্বা লম্বা লেক্‌চার—সেইগুলোতে কেমন যেন প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

ডাক্তার। হ্যাঁ তাতে গল্পের interest তেমন নেই বটে কিন্তু লেখকের ideal তা থেকে বেশ স্পষ্ট মনে বসে। বলতে কি, তাঁর একটি লাইনও আমার বাদ দিতে ইচ্ছা করে না, অনাবশ্যক বা অপ্রীতিকর বলে মনে হয় না; যে পাতই ওলটাই—যেখান থেকেই পড়ি—পড়তে পড়তে একটা অনন্ত সহানুভূতির ভাবে হৃদয় যেন সতেজ হয়ে ওঠে—পৃথিবীর জীবন সমষ্টির মধ্যে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হয়—এবং সেই মহাসমষ্টিতে আপনার সুখদুঃখ বিসর্জ্জন দিয়ে সুখী হতে ইচ্ছা করে।

দিদি। আপনি কি বলেন! মিডলমার্চের হিরোইন ত দু দুবার বিয়ে করেছিল? আত্মত্যাগের কি চূড়ান্ত আদর্শই তাতে দেখালে!"

ডাক্তারের ওষ্ঠাধরে একটু যেন হাসির রেখা দেখা দিতে না দিতে মিলাইয়া পড়িল,—তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন "আপনারা হয়ত ভুলে যান নভেলিষ্ট আর নীতিশিক্ষক এক নন। তিনিও নীতিশিক্ষা দেন বটে—কিন্তু তাঁর প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি চিত্রকর। বিশ্বের অভঙ্গ অব্যর্থ নিয়মের মধ্যে, সমাজের ভঙ্গপ্রবণ ক্ষণিক নিয়মের মধ্যে নিয়তির এবং স্বভাবচক্রের

গতিতে চরিত্র ভেদে অবস্থাভেদে মানুষ কিরূপ বিচিত্র মূর্ত্তিতে ফুটে ওঠে—তাই ছবির মত এঁকে দেখানই নভেলিষ্টের কাজ। জর্জ্জ এলিয়ট মানুষের মানুষত্ব ছুঁতে চান না, তাকে জড় বা দেবতা করতে চান না। সেই মানুষত্বের পূর্ণবিকাশ করতে চান, সহানুভূতিতে, ভাল বাসাতে। ডরথিয়া ideal রাজ্যেই বাস করে, তার আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই অসাধারণ; সত্য জগতের সংস্রবে এরূপ স্বভাবের লোক কিরূপ ভুল করে লেথক তার ছবিতে তাই দেখিয়েছেন। তার জীবনের এই failure এর মধ্যেও কি খুব একটা pathos নেই?"

দিদি। তার উপর মমতা হয় বটে—কিন্তু ভারি রাগ ধরে—আবার শেষেও অমন একটা অপদার্থকে ভালবাসলে?

আমি বলিলাম—"কেউ কেউ বলেন, ডরথিয়া, ম্যাগি, নাকি লেথিকারি চরিত্রের ছায়া?"

ডাক্তার বলিলেন—"এইরূপ শোনা যায় বটে। তাঁর জীবনের উচ্চতর আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শে তিনি যেমন বিফল"—

ভগিনীপতি আসিয়া পড়ায় কথাটা থামিয়া গেল। দিদি বলিলেন "এত দেরী যে!"

ভগিনীপতি বলিলেন—"মক্কেলটাকে আর কিছুতে তাড়াতে পারি নে। কি discussion চলেছে হে—জর্জ এলিয়ট? Oh! she is a great creator,—we must admit that, I am sorry to say."

ডাক্তার। What a reluctant admission! Does not your man's nature take delight in glorifying such genius in a woman? What a grand intellect she had,— combined with the sympathetic heart and subtle instinct of a true woman! মানুষের সামান্য অসামান্য প্রত্যেক কার্য্যটি, তার অন্তর স্বভাবের কিরূপ নিগূঢ় উদ্দেশ্য কিরূপ সূক্ষ্মতম ভাব থেকে প্রসূত তিনি যেমন তা চুল চিরে দেখিয়েছেন এমন কোন পুরুষ নভেলিষ্টে পেয়েছেন কি?"

ভগিনীপতি। There I quite disagree with you. Do you mean to say she is as great a genius as Shakespeare, or even modern—

ডাক্তার তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই খুব সতেজে বলিলেন—"Of course,— why not? Though at first I spoke of novelists only,—yet if you choose to bring in Shakespeare's name I have not the slightest hesitation in pronouncing her to be as great in her sphere as Shakespeare is in his."

এমনতর আস্পর্দ্ধাপূর্ণ মূর্খামির কথায় ভগিনীপতিকে নিতান্তই বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "What a monstrous proposition!—quite a blasphemy to my mind. I never heard of such a ridiculous comparison! She is no more a Shakespeare than you are my dear fellow—however cleverly she might have written her novels."

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"Of course she isn't—how could she possibly be Shakespeare! Did I really say such a foolish thing? What I meant to say, and would go on repeating till the end of my life is this—that the genius shown in the works of George Eliot is in no way inferior to that of any renowned poet or novelist of England, dead or alive."

ভগিনীপতি। But it comes to the same thing. Well, prove in what way she is as great a creative genius as Shakespeare?

ডাক্তার বলিলেন—"But the burden of proof lies on you my friend!"

এই সময় ডিনারের ঘণ্টা পড়িল, আমরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাঁহাদের বাক-যুদ্ধ যে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়—এই ভাবিয়া আমরা মহাভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম।—দিদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"তর্কটা এখন রেখে দিলে হয় না—ডিনারের ঘণ্টা পড়েছে।"

তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কিন্তু ভূতে পাইলে সে যেমন মানুষকে ছাড়িতে চাহে না তর্কে পাইলে মানুষ তেমনি তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। উঠিয়া দাঁড়াইয়াও ভগিনীপতি বলিলেন—"You must give me good reasons my dear fellow, or else you must admit that she was not a Shakespeare."

ডাক্তার বলিলেন—"All right, that I admit heartily and sincerely. As she was a woman and called George Eliot she could not be a man or Shakespeare either!"

ভগিনীপতি হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"The premisses being granted the conclusion must follow as the night the day, that her genius also could not be on a par with Shakespeare's. Now let us shake hands in the name of Shakespeare, who was the principal cause of this never-ending discussion which has however ended happily to the satisfaction of all parties. Vive le Shakespeare the great man!"

ডাক্তার ভগিনীপতির হাত সজোরে ঝাঁকাইয়া বলিলেন—"Vive la George Eliot the great woman!"

ভগিনীপতি। All right! I have no grudge against her you will see, Three cheers for Shakespeare—Three cheers for George Eliot!

ডাক্তার। And *vice versa.* Three cheers for George Eliot,—Three cheers for Shakespeare!

দুজনে মিলিয়া ইহার পর একসঙ্গে হুরে হুরে করিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—"আর আমাদের লেখকেরা বুঝি বাকী থাকিবেন? জয় বঙ্কিম চন্দ্রের জয়,—জয়—"

ভগিনীপতি সুর করিয়া গাহিলেন—

"জয় every ladyর জয়, জয় every gentlemanএর জয়,
জয় জয়, জয় ভারতের জয়।"

কে জানিত রুদ্ররস এমন হাস্যরসে পরিণত হইবে, তাঁহাদের উক্ত গানের কোরাসে আমাদের ক্ষীণ হাসির কোরাস তেমন ফুটিল না কিন্তু আমরা হাসিতে হাসিতে ভোজন গৃহে সমাগত হইলাম।—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সে তর্কের ঐখানেই সমাপ্তি। টেবিলে বসিয়া অন্য নানা কথা—বেশীর ভাগ বিলাতের গল্পই চলিল।—প্রথমে উঠিল ইংলণ্ডের শীতের কথা তাহা হইতে বরফে স্কেট করার বর্ণনা। শুনিয়া দিদি বলিলেন—"আমাদের নিতান্তই কৃপার পাত্র মনে করবেন না, এদেশে বসেও আমরা জমাট বরফ দেখেছি। সেই নইনিতালে—কেমন মণি?"

দিদি ডাক্তারের গল্পের উত্তরে একথা বলিলেন,—আমিও তাঁহার উত্তর স্বরূপ বলিলাম—"কিন্তু আপনি যে রকম বলছেন, এ সে রকম অবশ্য নয়—এ শুধু বরফের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ। দুই পাহাড়ের মাঝখানে, শীতের সময় যে বরফ পড়েছিল—তারি খানিকটা মাটি চাপা পড়ে গরমি কালেও আর কি গলতে পায়নি। একটা পাশ গলে গিয়ে মস্ত একটা বাড়ীর মত দেখতে হয়েছে—সে দিকটা যেন তার খোলা দরজা। এক জায়গায় নীচের থেকে বরফ গলে সুন্দর বরফের সেতু হয়ে আছে!

দিদি। জায়গাটি কি নিরিবিলি। কেবল ঝরনার শব্দ ধরে ধরে আমরা সেখানে পৌঁছেছিলুম।

আমি। বাস্তবিক জায়গাটি বড় সুন্দর। লতাপাতা, ফুল, পাহাড়, ঝরনা, নদী, বরফ,—প্রভৃতি প্রকৃতির যত কিছু সুদৃশ্য—কবির যত কিছু বর্ণনার বস্তু—সব যেন একত্র জোট বেঁধে লোকচক্ষু এড়াবার অভিপ্রায়ে সেই একটুখানি অপ্রশস্ত স্থানে ঘেঁসাঘেসি করে আপনাদের সৌন্দর্য্য ছড়াচ্ছে। সেই নিভৃত সবুজ পাহাড়ের কুঞ্জে শাদা বরফের ঘরবাড়ী যখন সহসা চোখে পড়ে—মনে হয় এ কোন পরীর রাজ্যে এসে পড়লুম!

দিদি। ঠিক বলেছিস! মণি বেশ বলে? আমি কিন্তু এমন বর্ণনা করে বলতে পারিনে!" এই অযাচিত অকাল-প্রশংসায় লজ্জিত বিরক্ত হইয়া আমি চুপ হইয়া গেলাম,—ভগিনীপতি দিদিকে বলিলেন—"তোমার আর কি আমারি মত দশা, যা দেখেছ, তা এক রকম ভুলে বসে আছ তা বর্ণনা করবে কি বল?

দিদি। আমার মনে ত আর দিনরাত মক্কেলের ভাবনা জাগছে না, যে অন্য সব ভুলে বসে থাকব?

ভগিনীপতি। আচ্ছা বল দেখি বরফটা কেমন দেখতে!

দিদি। না তাকি বলতে পারি? কিন্তু তোমাকে ত আর আমি পরীক্ষা দিতে বসিনি।

ভগিনীপতি। তবে আমিই পরীক্ষা দিই। কি চমৎকার শাদা ধবধবে! The sublimest, beautifullest, grandest—

দিদি। আর চালাকি করতে হবে না!

ডাক্তার বলিলেন—"২৪ ঘণ্টা হাতে পেয়েও তোমার যে আশ মেটে না দেখছি হে; এই আধঘণ্টা ফাউটুকুও দখল করতে চাও। সমস্ত গল্পটা নিতান্তই যে একচেটে করে নিচ্ছ।"

ভগিনীপতি। I beg your pardon. I shall keep as quiet as a dummy.

দিদি। সেই ভাল। তুমি চুপ করে থাক আমরা গল্প করি। বরফটা জানেন দেখতে আমাদের খাবার বরফের মত মোটেই নয়। বাইরেটা ঠিক যেন তার নুনের গুঁড় জমাট বাঁধা—আর ঘরের ভিতরের দেয়ালগুলো নোমের মত চমৎকার মোলায়েম আর একটু কাল কাল। মাটির সঙ্গে মিশেছে কি না।

ভগিনীপতি। গিন্নিদের আবার তখন খেয়াল হোল—বরফ খানিকটা ভেঙ্গে বাড়ী আনতে হবে!

দিদি। তা তুমি ত আর ভাঙ্গনি—তবে সে কথা আবার তোলা কেন? আমরা দুবোনে ভাঙ্গতে চেষ্টা করলুম তা পারব কেন! হাতে কেবল নুনের মত গুঁড় উঠে আসতে লাগলো।

ডাক্তার। আমি থাকলে নিশ্চয়ই আপনাদের হুকুম তামিল করতুম—বরফ খানিকটা ভেঙ্গে সঙ্গে আনতুম!

দিদি। (ভগিনীপতিকে) দেখলে! এঁর কাছে শেখো মেয়েদের কেমন ক'রে প্রসন্ন করতে হয়।

ভগিনীপতি। Good gods! ওঁর কাছে আমি শিখতে যাব! আমি কি আর আমার সময় ওসব করিনি? বিয়ের আগে হাতে কত কাঁটা বিঁধিয়ে গোলাপ ফুল তুলে দিয়েছি—এরই মধ্যে সে সব ভুলে গেছ?

দিদি। (সলজ্জে) আচ্ছা বেশ থাম থাম। (ডাক্তারের প্রতি) তাপর আপনি গল্প করুন। বাস্তবিক নদীনালা বরফে জমাট বেঁধে মাটীর মত শক্ত হয়েছে,—তার উপর দলে দলে সব সুন্দর সুন্দরীরা পরীর মত স্কেট করছে—সে না জানি কি চমৎকার দেখতে! আপনি বোধ হয় দেখে খুবই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন?

ভগিনীপতি। কি দেখে! স্কেটিং না বরফ,—না সুন্দর সুন্দরী?

দিদি। সমস্তই। কিন্তু তোমাকে ত আর জিজ্ঞাসা করছিনে।

ডাক্তার। হ্যাঁ মুগ্ধ হয়েছিলুম বোধ হয়,—হবারি ত কথা,—তবে সেদেশের ভিতরের সৌন্দর্য্য আমাকে এতই মোহিত করেছিল, যে বাইরের কোন দৃশ্য আর তেমন আশ্চর্য্য মনে হয়নি! কি জলন্ত জীবন্ত স্বাধীনতা, কি অদম্য উদ্দাম উৎসাহ সেখানে। আমাদের দেশের মত অলস বিশ্রাম যেন তারা জানে না। একজনে দশজনের কাজও করে,

দশজনের আমোদও করে। আমার কলেজের প্রায় প্রত্যেক ছোকরাকেই দেখতুম—যথা সময়ে লেকচার শোনে—surgical operation শেখে;—patient দের dutyতে থাকে, রাত জেগে পড়াশুনাও করে,—আবার ফুটবল, হকি, বোটরেস—সকল রকম খেলাতেই যোগ দেয়, ডিনার পার্টি, বল্‌, থিয়েটার ঘুরতেও বাকী রাখে না—আমিত তাদের energy দেখে প্রথম প্রথম অবাক হয়ে যেতুম!

ভগিনীপতি। নইলে আর ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় তফাৎ হবে কেন বল?

ডাক্তার। সেদেশে সব কাজেরই এমন একটা সুচারু শৃঙ্খলা যে তাতে ক'রে কাজও ঢের সহজ হয়ে আসে—আর বেশী কাজও করা যায়। জীবনগুলো সেদেশে যেন ঠিক ঘড়ির কাঁটার চালে চলে। নিমন্ত্রণ খেতেই যাও—দেখাশুনা করতেই যাও, বা কাজের জন্যই কারো কাছে যাও, সব তাতেই যেন ট্রেণ ধরতে যাচ্ছ—এমনিভাবে সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। কোন একটা engagement থাকলে প্রথম প্রথম আমি এমন অস্থির হয়ে পড়তুম, late হবার ভয়ে হয় ত বা আধঘণ্টা আগে থাকতে হাজির হয়ে দরজার কাছে পাচালি করে বেড়াচ্ছি।

আমি। বিলাতের গল্প শুনলে আমার এমন সে দেশে যেতে ইচ্ছা করে।

ডাক্তার। আমার ত মনে হয় শিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ সকলেরি একবার করে অন্ততঃ সে দেশে যাওয়া উচিত। সেখানকার সেই মুক্ত স্বাধীন বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করলে আমাদের মত নির্জীব জীবও নতুন জীবন পায়, তারও যেন জীর্ণ সংস্কার হয়। যে সব Idea এ দেশে বসে ভাবনার পক্ষেও নিতান্ত foolish অসম্ভব, সে দেশে বসে সেই সবই সত্য সাধনার বিষয় বলে মনে হয়। এখন বলতেও লজ্জা করে, কিন্তু আমারই তখন মনে হোত আমি একলাই যেন এ দেশটাকে ওলট পালট করতে পারি। এদেশের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলোকে দুট কথায় জোরে—বারুদের মত তোড়ে ওড়াতে পারি। এখন দেখছি নিজের বিশ্বাস রক্ষা করাই কত কঠিন—তা দেশশুদ্ধ reform করব!

ভগিনীপতি। বিধাতা আমাদের মেরেছেন—তার উপায় কি? ইংলণ্ডের মত ক্লাইমেট যদি ইণ্ডিয়ার হোত তাহলে কি আর আমাদের এমন দশা হয়?

দিদি। না এমন কাল রূপই হয়? এক কালে ত আমরাও সুন্দর ছিলুম—যখন প্রথমে পঞ্চনদ পার হয়ে এদেশে বাস করতে এলুম! বাস্তবিক যখন এই সামনের মাঠটায় ইংরাজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মোমের পুতুলের মত মুখগুলি দেখি—তখন আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না,—আর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে—ভগবান আমাদের জাতকে কেন অমন সুন্দর করলেন না? তারা যেখানে থাকে যেন তারা কোটায়!

ভগিনীপতি। এত দুঃখ কেন? কালোরূপেও ত ভুবন মজছে, তোমাদের—

দিদি। সুন্দররূপে আরো মজে!

ভগিনীপতি। তা বলা যায় না। কি বল হে? সে সূর্য্যের দেশ থেকেও ত রিমা-ফোকায়

তাজা ফিরে এসেছ, এখন দেখ এদেশে এসে চাঁদের আলোতে স্থির থাক কি না? আমার দশা ত দেখতেই পাচ্ছ।

দিদি। তা নয়গো তা নয়। সূর্য্যের আলোতে যখন ঝলসে ওঠ,তখনি চাঁদের আলোতে ঠাণ্ডা হতে আস। নইলে কি আর দেশকে মনে পড়ে? বাস্তবিক সেদেশে যেতে যেতেই সবাই কি ক'রে তার নিজের দেশ—আত্মীয়স্বজন সব ভুলে যায়—আমার ভারী আশ্চর্য্য মনে হয়।

ভগিনীপতি। আমার কি মনে হয় জান? সেদেশের এত charm সত্ত্বেও তবুও যে তারা একেবারে দেশ ভোলে না, তবুও যে বাঙ্গালী থাকে,—দেশে ফেরে—বিয়ে না করে ফেরে আর ফিরেই বিয়ে করে—এইটেই বেশী আশ্চর্য্য!

দিদি। তা যাওনা তোমাকে ত কেউ বারণ করে নি, কেউত পা বেঁধে রাখেনি।

ভগিনীপতি। এই এই! জানছেন কি না তা হবার যো নেই—একেবারে শিকলি বাঁধা।

তাঁহাদের মানাভিমান চলিল,—আমি বলিলাম—"তাপর আপনার আর কি ভাল লাগতো সেদেশে!

ডাক্তার। সব চেয়ে আমার কি ভাল লাগত শুনবেন? সেদেশের স্ত্রীলোকদের—

ভগিনীপতি। সৌন্দর্য্য! Good heavens! আমি যে আর একরকম বোঝাচ্ছি!

দিদি। আপনি ত দিব্যি! আমাদের মুখের উপর ও কথাটা বলতে বাধলো না আপনার?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—"মাপ করবেন,—কিন্তু ও কথাটা আমি বলিনি,—আপনার স্বামী বলেছেন। আমি বলছিলুন—আমার সব চেয়ে ভাল লাগত, সেদেশের মেয়েদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর ভাব। দিন দিন সেদেশে স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র বাড়ছে—এমন কি পলিটিক্সে পর্য্যন্ত তারা হস্তক্ষেপ করছে। পুরুষরা এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করে—ঠাট্টা তামাসা করে—অথচ আসলে এজন্য তাদের সম্মানের চক্ষেই দেখে, তাদের হাতেই কলের পুতুলের মত নাচে। দেশের উপর, সমাজের উপর, প্রতিজীবনের উপর স্ত্রীলোকের কিরূপ influence এবং এই influence সমাজের পক্ষে কিরূপ আবশ্যক, কিরূপ হিতকর, এবং এর অভাবে আমরা এদেশে কিরূপ পশুজীবন বহন করি—সেদেশে না গেলে তা বোঝা যায় না।"

আমি। কিন্তু আমাদের দেশের লোক ত আর এদেশে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেশে না; সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন রকম অবস্থায় প'ড়ে—প্রথমটা তাদের কি রকম অবস্থা হয় না জানি?

ডাক্তার। অন্যেদের কিরূপ হয় জানিনে। আমার কথা আমি বলতে পারি। আমার বড় শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। যে সামান্য ভাসতে পারে—তাকে যদি সরু দড়িতে বেঁধে মাঝগঙ্গায় ছেড়ে দেওয়া হয় তাতে সে যেমন হাবুডুবু খেতে খেতে তীরে ওঠে—এ ও আর কি অনেকটা সেই রকম ব্যাপার?

দিদি হাসিয়া বলিলেন—"কি রকম!"

ডাক্তার। না জানি তাদের চাল চলন, ধরণধারণ, আদব কায়দা, এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত। আমরা শিখেছি বয়ের ভাষা; ফিলজফি পড়েছি, সায়েন্স পড়েছি, হিষ্ট্রী পড়েছি, সে সম্বন্ধে কথা উঠলে বরঞ্চ একঘণ্টা বকে যেতে পারি; কিন্তু ছোট ছোট সেণ্টেন্সে, প্রশ্নের উপর উত্তরে, কথার উপর কথা ঘুরিয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে—রসিকতা করে গল্প চালান, তাত আর শিখিনি। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে এমন nervous এমন awkward feel করতুম! কি কথা কব ভেবেই পেতুম না। শুধু তাই নয়, এত দিন দেশে ডিক্সনারী দেখে দেখে সামান্য একটা অ্যাক্‌সেণ্টের বিশুদ্ধতা ধরে এত হেঙ্গাম করে যে ইংরাজি উচ্চারণ শিখেছি—তাতে দেখি লাভ হয়েছে এই যে, ইংরাজি মুখের ইংরাজি উচ্চারণ ভাল করে সব বুঝতেই পারিনে। আর এক জ্বালা, থেকে থেকে শুনতে পাই—'তুমি অমুককে cut করেছ—সে তোমাকে রাস্তায় nod করেছিল—তুমি টুপি ওঠাও নি।' Good heavens! কে আমাকে কখন nod করলে! আমিত কিছুই দেখিনি। প্রতিদিন এই রকম excuse করতে করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। আসল কথা একে রাস্তার কোন দিক না দেখে চলাই আমার অভ্যাস—তাপর শাদা মুখগুলো সবই এমন একসা বলে মনে হয়—যে বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকলে এক আধবারের দেখা সাক্ষাতে মুখ চিনে নেওয়া সেও একটা অভ্যাসের কাজ। অন্য রকম বিপদও আবার আছে। দোকানে একপেনির একটা বো কিনতে গিয়ে, ঘরে ফিরে এসে টাকা মিলিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি এক পেনির জায়গায়—অনুরোধের দায়ে ৫ পাউণ্ড খুইয়ে এসেছি। বেশ gracefully 'না' বল্‌তে শেখাটা সেখানে বিশেষ আবশ্যক। নইলে আর বিপদের শেষ নেই। এই রকম প্রতিপদে কত পড়ে উঠে—তবে সে দেশের মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছি—তা কি আর কহতব্য?

দিদি। শেষে আর কি, সব বিষয়েই খুব পাকা হয়ে উঠেছিলেন?

ডাক্তার। তা ঠিক্ বলতে পারিনে,—আমার বাঙ্গালী বন্ধুরা শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বলতেন—নেহাৎ কাঁচা।

ভগিনীপতি। তুমি সেখানে 'জি'কে কতদিন থেকে জানতে?

ডাক্তার। তিনি দেশে ফেরার অল্পদিন আগে মাত্র আমার সঙ্গে আলাপ হয়—আমাদের একটি বন্ধুর বাড়ী।"

ভগিনীপতি। সত্যি কি সে engaged হয়েছিল?

ডাক্তার একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—"সেই রকম শুনেছিলুম,—কিন্তু আমি নিশ্চয়—but I am afraid it is not a fit subject for the dinner table!"

ভগিনীপতি তাঁহার সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন, "you are right, let us keep it for some other time. I have certain reasons of course for asking you about him.'

সে কথা থামিল,—আমি বাঁচিলাম।

সে দিন আকাশে পূর্ণচাঁদ,—জ্যোৎস্নায় দিগদিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছিল—আহারান্তে আমরা তাই ছাতে বসিলাম। দিদি বলিলেন—"ইংলণ্ডে ত আপনার সবই ভাল,—কিন্তু এমন চাঁদের আলো কি পেতেন?

ডাক্তার। সেটা rare ছিল বটে,—সেই জন্যই বোধ হয়—যখন জ্যোৎস্না ফুটত, বড় যেন বেশী সৌন্দর্য্য ছড়াত।"

দিদি। আপনি দেখছি—একবারে মজে গেছেন। ইংলণ্ডের সুন্দরীরাই ভাল আমরা তাই জানতুম, আবার চাঁদের আলোও এদেশের চেয়ে বেশী সুন্দর! আপনি যে সেই চাঁদের দেশ থেকে তার অনন্ত আকর্ষণ এড়িয়ে ফিরেছেন—এ একটা আশ্চর্য্যই বটে!

তিনি তাঁহার কপোল প্রান্তের শ্মশ্রুগুচ্ছ অঙ্গুলি বিজড়িত করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"জানেন যে সংসারে আশ্চর্য্যই বেশী ঘটে! যেখানে সম্ভাবনা যত প্রবল সেখানে দেখবেন প্রায়ই নৈরাশ্য, আর যেখানে আপনি least সম্ভাবনা আছে ভাবছেন, least প্রত্যাশা করছেন—সেইখানেই দেখবেন তা ঘটছে।"

বলিতে বলিতে তিনি যেন চকিত নয়নে আমার দিকে চাহিলেন, জ্যোৎস্না বাহিত সেই নীরব দৃষ্টি হইতে কি এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুর রব ধ্বনিত হইল, তাহার পুলক কম্পনে হৃদয়ের অন্তঃপুর স্তরে স্তরে কম্পিত আলোড়িত করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস উথলিয়া উঠিল।

মীরকাসিম।

[আমরা বঙ্কিমভক্ত ইহা আমাদের পাঠকসমাজের অগোচর নাই। সে ভক্তি যে অমূলক নহে তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যগুরু। তিনি আমাদের ন্যায় সাহিত্যব্রতী নবীন লেখকদিগকে সাহিত্য মহাবেণীর নানাপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গেছেন। তিনি কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক নহেন; বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাজ্যে—ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, শাস্ত্র, রহস্য, বিশুদ্ধ-সাহিত্য—তিনি বাঙ্গালীর নিশানস্থাপনার পথপ্রদর্শী। তিনি যে বিষয়ে স্বয়ং বা হস্তক্ষেপ করেন নাই, সে বিষয়ে অন্য লেখক-কৃতীর যোগ্য সমালোচনায়ও বঙ্গীয় পাঠকের ও ভবিষ্য লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এরূপ গুরুর প্রতি অন্ধবিশ্বাসপরায়ণ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। মীরকাসিম লেখক সেই বিশ্বাসের মূলে আজ সন্দেহের প্রথম আঘাত নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনি দেখাইতেছেন ঐতিহাসিক সত্যের অনুশীলনক্রমে তিনি যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে সত্যভক্তির সহিত অন্ধব্যক্তিভক্তির সামঞ্জস্য হয় না। লেখক অকাট্য প্রমাণাস্ত্রধারী, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই। বঙ্কিম জ্ঞাতসারে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন জানিয়া, ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা অর্পিত হইয়াছিল তাহা অংশতঃ প্রত্যাহরণ করিতে হওয়াতে আমরা নিতান্ত পীড়িত। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতি ভক্তি আমাদের প্রগাঢ় হইলেও

সত্যের প্রতি ভক্তি প্রগাঢ়তর। সেই সত্যের নির্ম্মম অনুজ্ঞায় যে পত্রিকাপৃষ্ঠায় বঙ্কিমের অজস্র স্তুতিবাদ গাহিয়াও মনে হয় না যথেষ্ট হইল, তাহাতেই বঙ্কিমের অপবাদরটনার স্থান দিতে হইল। সত্যের শাসন অতি কঠোর,—বঙ্কিমের মৃত আত্মার প্রতি আমাদের ইহা ছাড়া আর কিছু বক্তব্য নাই। ভাং সং]

ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কন করিতে হইলে চিত্রকরের প্রথম কর্ত্তব্য সাধারণের নিকট সে চিত্র যে মিথ্যা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহার সংশোধন করা। সংশোধন করিতে হইলেই কলঙ্কলেপনকারীদের কথা আসিয়া পড়ে। মীরকাসিমের সত্যমূলক জীবনচরিত লিখিতে বসিলে প্রথমেই তাঁহার সম্বন্ধে অসত্যের প্রশ্রয়দাতা একজন গুরুতর অপরাধীর নাম লেখনী অগ্রে বাহির হয়। তিনি বিদেশী, বিধর্ম্মী, ইংরাজ বা ফরাসী নহেন, আমাদেরই ঘরের লোক, পরম শ্রদ্ধাভাজন, নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু—৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান কত উচ্চে, তাঁহার আসন কত অটল, উপন্যাসরচনায় তিনি কিরূপ অতুল, ভাষা প্রয়োগকৌশলে কিরূপ সিদ্ধহস্ত তাহা জানি কিন্তু ইহাও জানি বঙ্কিমের যে সকল ঐতিহাসিক উপন্যাস এখন সমাদর লাভ করিতেছে, তাহা চিরকাল সমাদর লাভ করিবে না; কারণ তাহা অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক বিষয়ে এদেশের লোক অজ্ঞ, উদাসীন, উৎসাহশূন্য; যতদিন সে অজ্ঞতা, সে ঔদাসীন্য, সে নিরুৎসাহ থাকিবে ততদিন বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদরও থাকিবে,—তাহার পর নহে। ভাবিয়া দেখ আজ যাহারা জীবিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁহাদের লইয়া কাল্পনিক কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া উপন্যাস রচনা করিলে কেহ তাহার সমাদর করিবেন কি? এ দেশের ইতিহাস নাই, লোকেরও তদ্বিষয়ে অনুরাগ নাই;—এরূপ অবস্থায় যিনি যেরূপে পারিয়াছেন, ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছেন। ইহা কুরুচি। সত্যানুরোধে বলিতে হইবে বঙ্কিম ইহার শিক্ষাগুরু। ইতিহাসচর্চ্চা থাকিলে তিনি যাহা লিখিতে কদাচ সাহসী হইতেন না, ইতিহাস অনেকের পক্ষে দুর্লভ বলিয়া, তিনি তাহা জানিয়া শুনিয়াও বিকৃত করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান কেন,—হিন্দুকেও তিনি উপন্যাসের খাতিরে এইরূপে কত নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। মীর কাসিম যে দেশের শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব, সে দেশে মীরকাসিমের ইতিহাস অল্প দিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন "ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা" প্রতাপ ও শৈবলিনীর শৈশবপ্রণয়োন্মেষের উপন্যাসে উঠিয়া বাঙ্গালীর বৈঠকখানায়—পুস্তকালয়ে—অন্দর মহলে—রঙ্গমঞ্চে—সর্ব্বত্র সাদরে আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন!

উপন্যাসের 'বিজ্ঞাপনে' লিখিত আছে,—"ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মুতক্ষরীণ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে, কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্ল্লভ; ঐ গ্রন্থ পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।"

চন্দ্রশেখরের বিজ্ঞাপনে যাহা আছে তাহার ... নয় ? (১) এই গ্রন্থের কোন কোন ঐতিহাসিক বিষয় সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে পাওয়া যায়, (২) কোন কোন বিষয় তাহা পাওয়া যায় না (৩) যাহা পাওয়া যায় না, তাহা মুতক্ষরীণ নামক দুর্লভ গ্রন্থ হইতে লইলাম (৪) এই গ্রন্থে যদি সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসের বিপরীত কিছু দেখিতে পাও ত কিছু মনে করিও না, তাহাও ইতিহাস, তবে তোমার দুর্ভাগ্য বলিয়া 'দুর্লভ' ইতিহাস পড় নাই ! !

এখন দেখা যাইতেছে (১) বঙ্কিম হয় মুতক্ষরীণ পড়েন নাই (২) না হয় পড়িয়াছেন। না পড়িয়া থাকিলে পড়ার ভাণ করিয়াছেন। পড়িয়া থাকেন ত দেখা যাউক, উঁহাতে তিনি কি পড়িয়াছিলেন, আর উপন্যাস লিখিবার সময়ে সেই বিষয়ে কি সাজাইয়াছেন ? দেখিতেছি মুতক্ষরীণে পড়িয়াছিলেন—তকি খাঁ বিশ্বাসী, প্রভুপরায়ণ, মহাবীর, কাটোয়ার যুদ্ধে বীরের ন্যায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর চন্দ্রশেখরে দেখিতেছি সেই তকি খাঁ বিশ্বাসহন্তা ; প্রতারক, প্রভুপত্নীলোলুপ, সুতরাং মীর কাসিমের স্বহস্তনিক্ষেপিত অসি-বিদ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত ভোগার্হ ! ! মুতক্ষরীণে পড়িয়াছি—মীর কাসিম স্বদেশভক্ত বীর ; চন্দ্রশেখরে পড়িলাম, তিনি স্ত্রৈণ, কাপুরুষ ; কহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইবার জন্যও প্রস্তুত,—কেননা দলনীর শোক নিতান্তই অসহনীয় ! প্রকৃত তথ্য না জানিয়া এরূপ লিখিলেও বিশেষ দুঃখ হইত ; জানিয়া শুনিয়া এরূপ লেখায় সে দুঃখ কি অধিকতর হয় না ? সত্যানুরোধে বলিতে হইবে যে, বঙ্কিম মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন ! ! "নেড়ে বেটারা" "গোহত্যাকারী ক্ষৌরিত চিকুর" "আত্মজাতি গৌরবান্ধ হিন্দুদ্বেষী মিথ্যাবাদী মুসলমান"—এই সব তাঁহার উক্তি। সুতরাং তিনি ইতিহাস লিখিলে যে কি লিখিতেন, বুঝিতেই পারা যায়। অবসর হয় নাই বলিয়া ইতিহাস লেখা ঘটে নাই, অবসর হইয়াছিল বলিয়া উপন্যাস লেখা ঘটিয়াছিল ;—সুতরাং "নেড়ে বেটাদের" শ্রাদ্ধটা তাহাতেই সুসম্পন্ন করা হইয়াছে !

"নেড়ে বেটারা" যতই নিন্দার্হ হউক তাহারাও বাঙ্গালী। চন্দ্রশেখর যে সময়ের উপন্যাস, বাঙ্গলাদেশ তখন হিন্দু মুসলমানের দেশ। সে দেশ স্বাধীন ছিল,—কেননা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জাতিগত ক্ষমতাপার্থক্য ছিল না ; গভর্ণর হিন্দুও হইত, মুসলমানও হইত, স্বদেশের জন্য অসিহস্তে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেও মরিতে ছুটিত। আজ আমাদের সে দিন নাই বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া যাহাদিগকে "নেড়ে বেটারা" বলিতেছি, সে কালের ইতিহাসে তাহারা সেরূপ অবজ্ঞার পাত্র ছিল না। হিন্দুরা দল বাঁধিয়া সিরাজ দ্দৌলাকে জবাই করাইয়া কীর্ত্তি সংস্থাপন করেন ;—তাঁহারা সকলেই গঙ্গাস্নান করিতেন, ত্রিসন্ধ্যা জানিতেন, দোল দুর্গোৎসবে বহুলক্ষ টাকা উড়াইতেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বদেশ প্রেমের বলিহারি ! ইংরাজেরা তাহার কল্যাণে দেশীয় শিল্প বাণিজ্য নষ্ট করিয়া লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতেছিল। মীর কাসিম দেশীয় শিল্প বাণিজ্য রক্ষার জন্য (সুতরাং

এ দেশের হিন্দু মুসলমানের উদরান্নের জন্য) লড়িয়াছিলেন; তকি খাঁ তাঁহার সংকল্প সাধনের সহায় হইয়া জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহারা "নেড়ে" হইলেও পূজার পাত্র। তাঁহাদিগকে এমন করিয়া মাটি করা হইল কেন?

বঙ্কিম বাবু "এক সময়ে বাঙ্গালার ঐতিহাসিকত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিবার" ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং নানা ঐতিহাসিক প্রবন্ধে "মুতক্ষরীণ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ" বলিয়া উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখনী মুতক্ষরীণ হইতে কোথাও কোথাও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহের বিজ্ঞাপন দিয়া, উপন্যাস রচনা করায়, অনেকে তাঁহার উপন্যাসকেই ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই "সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসের" বিপরীত বলিয়া, কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সকল কথা হয়ত মুতক্ষরীণ হইতে গৃহীত; এবং সেই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া সাহিত্য-সমাজে প্রচার করিয়া দিয়াছেন—মুতক্ষরীণ একখানি নিতান্ত "ঝুঁটা" ইতিহাস!*

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাই মীরকাসিমের সিংহাসনারোহণের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য।† তিনি সেই গুপ্ত সংকল্প সাধন করিবেন বলিয়া যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাতে এক সময়ে ইংরাজেরাও সবিশেষ আতঙ্কপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন!‡ তথাপি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। প্রথমে কাটোয়া তাহার পরে গিরিয়া—তাহার পরে উধুয়ানালা—এই তিনটি ইতিহাসবিখ্যাত সমরক্ষেত্রে মীরকাসিমের সকল ভরসা চূর্ণ হইয়া গেল! তিনি নিজে ইহার কোন যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন না। যাঁহারা তাঁহার সংকল্পসাধনের সহায় হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মুসলমানবীরকেশরী মহম্মদ তকিখাঁর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তকিখাঁ বীরভূমে ফৌজদারী করিতেন। তিনি মীরকাসিমের সিংহাসনরক্ষার্থ কাটোয়ার যুদ্ধে বীরের ন্যায় অসিহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করিয়া দিব্যলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। সেদিন তকিখাঁর বীরদর্পে ইংরাজসেনা রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া নদীতটের আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একটি অশ্ব নিহত হইবামাত্র অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া—দ্বিতীয় অশ্ব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবামাত্র তৃতীয় অশ্বে কশাঘাত করিয়া—মহম্মদ তকি বিদ্যুৎপ্রবাহের ন্যায় সর্ব্বত্র শত্রুদলন করিতেছিলেন। ইংরাজেরা

* শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র রক্ষিত "বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম" নামক সমালোচনা পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"চন্দ্রশেখর বঙ্কিমের সোণার গাছে মুক্তার ফল বিশেষ। এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কেন যে তিনি সৈয়র মুতক্ষরীণের ঝুঁটা ইতিহাসের ছাঁচে ঢালিতে গিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি না!" মুতক্ষরীণের মলাট দেখিয়া বা নাম শুনিয়া তাহাকে "ঝুঁটা ইতিহাস" বলিয়া সমালোচনা করিলে, এ রহস্য বুঝিতে পারিবার কথা নাই।

† He had from the very first resolved to be master in his own house.—Col. Malleson's Decsiive Battles of India, p. 141.

‡ The policy which followed *imperilled*, and went very far towards undoing the great work of Clive.—Ibid, p. 113.

বায় বায়—এমন সময়ে সহসা মস্তিকে গুলি প্রবিষ্ট হইয়া মহম্মদ তকিখাঁ বাহাদুর পরলোক-গমন করেন। ইহা উপন্যাস নহে—ইতিহাস। কোন কোন "সচরাচর প্রচলিত ভারত-বর্ষীয় বা বাঙ্গালার ইতিহাসেও" এ সকল কথা স্থানলাভ করিয়াছে!* সয়ের মুতক্ষরীণ নামক পারস্যগ্রন্থে এবং তাহার দুর্লভ ইংরাজী অনুবাদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত পারস্যগ্রন্থের উর্দ্দু এবং ইংরাজী অনুবাদপুস্তকে কাটোয়ার যুদ্ধের কথা এইরূপ লিখিত রহিয়াছে:—

"মহম্মদ তকিখাঁ বাহাদুর দুস্‌রে ইয়া তিস্‌রে রোজ পঞ্চম্ মাহে মোহরম্ সন ১১৭৭ হিজ্‌রীকো আপ্‌নে জমিয়াৎ হাম্‌রাহিকে সাৎ সওয়ার্ হো কর্ ময়দান্ কার্‌জার্‌মে বা আজ্‌মে ওস্তওয়ারি যো ইস্ আজিজ্ ইয়া গায়রাৎকি উমর্ সোবক্ রপ্তার থি আয়া। **** ইসি আর্‌ছামে মহম্মদ তকিখাঁকে পায়ের্‌মে গোলী লাগি; ঘোড়া কর্স আদম্ পর্ লোট্ গয়া। ইয়া জওয়ামর্দ্দ দুস্‌রে রাহওয়ার্ পর্‌সওয়ার্ হুয়া। নেহায়েৎ মস্তাসেল্ মোখালেফ্‌সে যা পহুঁচা। গানিম্‌কি ফৌজ আহেস্তা আহেস্তা পিছে হট্‌তি থি। লেকিন্ হস্‌বে জাবেতা জঙ্গ্‌কোণা তা আঁকে দোস্‌রী গোলী মহম্মদ তকিখাঁকে ঘোড়ে কে আ লাগি; আওর্ উস্ রাহওয়ার্‌ণেভি আর্‌ছা আদম্‌কা কদম বাঢ়ায়া! আব্ তেস্‌রে ঘোড়েকি বারি আয়ি। আওর্ আগেকো বাঢ়া। কাজারা খাঁ মজকুর্‌কে পাহালুই সিনামে গোলী আ কর্ নিকল্ গেয়ি। উস্ দেলাওর্ বাহাদুর্‌ণে দামান্ কাহারম্ কর্‌কে কন্ধে পর্ ডালা; নজর্ মোখা-লেফ্‌সে পর্দ্দা কিয়া, আগেকো কদম্ বাঢ়ায়া! ইয়া ইংলিসিয়োঁনে আইন্ পস্‌পায়মে ফৌজ্‌কো নালাসে বাতওর্ কমিকে কায়েম কিয়া। আওর্ মহম্মদ তকিখাঁ নালাকে সেরি পর্ মতওয়াজ্জা ইউরস্ থা। চুঁকে দরিয়াচা মজকুর্ পর্ ওবুর্ না হুয়া; ইয়া কোই ঘাত তর্জবিজ্ কর্ রহা থা; উসি ওয়াক্তমে গানিম্‌নে বহুত মজ্‌মুয়ি হো কর্ একবারগী বাঢ় মারি। ইস্ বাঢ়মে আক্‌সার্ হাম্‌রাহি মহম্মদ তকিখাঁকে জান্ নেশার্ হুয়ে!!" †

Two or three days after, that is, fifth of Mohurrum, in the year 1177 of the Hijira, Mahammed-taky-qhan came out with resolution to oppose the enemy's march. Putting the foot of courage in the stirrup of steadiness, he mounted a horse whose motions were as fleet as the moments of his unfortunate rider's existence. * * * * The moment was becoming critical, when a ball of cannon wounded Mahammed-taky-qhan in the foot, and killed his horse, which fel

* The next day Mahammed Takky Khan attacked them. Success was for some time doubtful. He had two horses killed under him, and had mounted a third, when a ball lodging in his forehead, he expired.—Scott's History of Bengal.

† Urdu Mutakherin published by Munshi Newl Kisore of Lucknow.

sprawling on the ground. The General, without betraying any anguish, mounted another, and continued to advance, and to exhort his men ; and he was now very near the ranks of the English, who on their side advanced. **** At this moment, a musket-ball entering at his shoulder came out on the opposite side. That brave man, without betraying any motion, assembhd the hem of his garment, and throwing it ovcr his shoulder, to conceal his wound from his men, still advanced. The English were on the point of retreating ; but they had placed an ambuscade at the bottom of a little river which was full on his passage ; and the General being arrived there, was looking out for a passage to come to handblows with them, when the ambuscademen, rising at once, made a sudden discharge full in his face, overthrew numbers of his followers, and lodging a bullet in his forehead, that incomparable hero, who was the main props of Mir-cassim-qhan's fortune hastened into eternity in the middle of his slaughtered soldiers,"*

ইহাই তকিখাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,—ইহাই মীরকাসিমের সর্ব্বনাশের প্রথম সোপান! সয়ের মুতক্ষরীণেই হউক, আর অন্যান্য "সচরাচর প্রচলিত" ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গালের ইতিহাসেই হউক,—সর্ব্বত্রই এই কথা। কেবল উপন্যাসে উঠিয়া এই কথা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!

ইতিহাসের মীরকাসিম স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ না করায় এবং তকিখাঁর ন্যায় প্রভুভক্ত প্রধান সেনানায়ক প্রথম যুদ্ধেই পরলোকগমন করায়, ইংরাজদিগের পক্ষে মীরকাসিমের পরাজয়সাধন করা সহজ হইয়াছিল।† উপন্যাসের মীরকাসিম কিন্তু উধুয়ানালার সমর-শিবিরে সশরীরে বর্ত্তমান। কেবল তাহাই নহে,—ইংরাজেরা যখন নবাব-শিবির আক্রমণ করে, সে সময়ে "তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া" রহিয়াছেন।

তার পর কি হইল? উপন্যাসে লিখিত রহিয়াছে,—"সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোসিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।"

* Mustapha's Mutakherin, vol II, Section XI. ইহাই বঙ্কিম বাবুর উল্লিখিত দুর্ল্লভ গ্রন্থের বর্ণনা।

† গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাসিমের পরাজয় হইল কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য একজন লিখিয়াছেন;—

"It wanted but one man, a skilful leader, such a man as the Mahammed Taki khan whom they had lost at Katwa, to make success, humanly speaking, absolutely certain. It had not that man, it was not even inspired by the presence of the Prince for whom it was fighting.—Col. Malleson's Decisive Battles of India, p. 160.

বলা বাহুল্য, ইহার এক বর্ণও সত্য নহে,—সর্ব্বৈব স্বকপোলকল্পিত! মহম্মদ তকির মত প্রভুভক্ত বীরপুরুষের নামে এমন অকীর্ত্তিকর অলীক কল্পনার অবতারণা করা হইল কেন? মীরকাসিমের মত স্বদেশবৎসল মুসলমান নরপতির নামে এমন দুরপনেয় কলঙ্কলেপন করা প্রয়োজন হইল কেন? উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা না হইলে, উপন্যাসবর্ণিত অনেকগুলি সরস কল্পনা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িত! বোধ হয় সেই জন্য—উপন্যাসের খাতিরে—সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অনুরোধে—ঐতিহাসিক পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইতিহাস পরিত্যক্ত হউক, উপন্যাস বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—দৌলত উন্নিসা ওরফে "দলনী বেগম" নাম্নী মীরকাসিমের এক "সপ্তদশবর্ষীয়া" সহধর্ম্মিনী নাকি সহসা ইংরাজ-হস্তে বন্দিনী হইয়াছিলেন। তকিখাঁ নাকি সে সময়ে মুর্শিদাবাদের রাজকর্ম্মচারী। * তাই তাঁহার উপরেই নাকি সীতা উদ্ধারের ভারার্পণ হয়। উপন্যাসের তকিখাঁ অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহেন। তিনি নবাবের নিকট সরফরাজ থাকিবার জন্য, দলনীর সন্ধান না করিয়াই মিথ্যা করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন,—"সন্ধান ত মিলিয়াছে, কিন্তু বেগমকে আর রাজসদনে পাঠাইব কি? বেগম আমিয়টের উপপত্নীস্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এ সকল কথা স্বীকার করিতেছেন।" কাসিম আলি আর ইহার পর কোন্ লজ্জায় বেগমকে পাঠাইতে লিখিবেন? তিনি লিখিলেন,—না, এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; পাপীয়সীকে বিষদান করিও। ইতিমধ্যে পতিগতপ্রাণা সরলা বালিকা ঘটনাক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া নানাক্লেশে অবশেষে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়া তকিখাঁর শরণাপন্না হইলেন। তখন তকির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! দলনী একবার কাসিম আলির সম্মুখবর্ত্তিনী হইবামাত্র তকিখাঁর পূর্ব্বপ্রতারণা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে;—এখন উপায়? উপায় উদ্ভাবন করিতে বিলম্ব হইল না। তকিখাঁর হস্তে দলনীবেগমের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরোয়ানা ছিল; তিনি সেই রাজাজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজাজ্ঞা পালনের জন্য রাজাজ্ঞা পালন নহে;—দলনীকে হত্যা করিয়া আত্মাপরাধ গোপন করিবার জন্যই তকিখাঁ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। "গো-হত্যাকারীক্ষৌরিতচিকুর" † মুসলমানদিগের আমলেও ফৌজদারগণকে

---

* তকি খাঁ মুর্শিদাবাদের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন না; যিনি এই সময়ে উক্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার নামস্বয়ের মুতক্ষরীণ-পাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে।

† বঙ্কিম বাবু ঐতিহাসিক-প্রবন্ধ লিখিবার সময়েও মুসলমান ইতিহাসলেখকের নমোল্লেখ করিতে হইলেই লিখিয়া গিয়াছেন, "গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর" অথবা "আত্মজাতি গৌরবান্ধ হিন্দুদ্বেষী মিথ্যাবাদী মুসলমান!" তাঁহার লিখিত "বঙ্গদর্শনে" মুদ্রিত বহু প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এ দেশের মুসলমান নবাবগণকে অকর্ম্মণ্য খিচুড়ীভোজনপটু নরাকার পশুবিশেষ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন; বোধ হয় সেই বিশ্বাসে, মীরকাসিম এবং মহম্মদ তকি খাঁয়ের কাহিনী ইচ্ছামত গঠন করিয়া লইয়াছেন! যে দেশের পাঠক সমাজের ধারণা আছে, কাব্যে বা উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র ইচ্ছামত বিকৃত করিলে দোষ হয় না,—কবিতা বা কাহিনী মুখরোচক হইলেই হইল,—সে দেশের কবি এবং উপন্যাস-লেখকগণের উৎপীড়নে ইতিহাস যে এইরূপ বিপর্য্যস্ত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

স্বহস্তে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে হইত না; তাহার জন্য ঘাতকের প্রয়োজন হইত। কিন্তু তকিখাঁ উপন্যাসের রসভঙ্গ না করিয়া, "স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকট উপস্থিত" হইলেন!

তকিখাঁ জানিতেন না, দলনী কি অপূর্ব্ব সুন্দরী! তাই দলনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তকির হৃদয়ে এক নূতন প্রতারণা জাগিয়া উঠিল ?—

"মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিলেন। সুন্দরী—নবীনা—সবেমাত্র যৌবনবর্ষায় রূপের নদী পূরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গমুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে। * * এই সে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ নৌকা—ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব ? সয়তান আসিয়া তকির কাণে কাণে বলিল—"হৃদয় মধ্যে"।

"তকি বলিল, শুন সুন্দরি—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।

"শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন। মহম্মদ তকির বিষদান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে, ধীরে, ধীরে, ফিরিয়া গেল।"

দলনী কিন্তু বাঁচিল না। সে উপন্যাসের নায়িকা—রঙ্গমঞ্চের নয়নানন্দদায়িকা—পাঠক পাঠিকার বিস্ময়োৎপাদনকারিকা—সুন্দরী, নবীনা, যুবতী, অথচ "কাতরা বালিকা!" বিশেষ সে যখন এত বড় একজন মোগল মহাবীরকেশরীকে কুসুমলোভনীয় পদপল্লবমুদারং তুলিয়া লাথি মারিতে সাহস পাইয়াছিল, তখন সে কি না পারিত ? সে গোপনে বিষ আনাইয়া ভোজন করিল। দলনী মরিল!

এ সকল কথা অধিক দিন গোপন রহিল না। বাঁদী কুল্‌সম সময় পাইয়া আমদরবারে সর্ব্বজনসমক্ষেই এক এক করিয়া সকল কথা নবাবের কর্ণগোচর করিয়া দিল। নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

"তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষনীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব"—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহ মধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীরকাসেম বলিতে লাগিলেন, "শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সিরাজদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজে বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞাপালন কর—আমি সেই তকিখাঁকে একবার দেখিব—

আলি হিব্রাহিমখাঁ!"

হিব্রাহিমখাঁ উত্তর দিলেন, নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকিখাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

ইহার পর উপন্যাসের হিসাবে মীরকাসিমের স্বহস্ত-নিষ্কোষিত অসিবিদ্ধ হইয়া তকিখাঁর অপমৃত্যু সংঘটন কিছুমাত্র অসাজন্ত হয় নাই। উপন্যাস বেশ মুখরোচক হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া সহস্র করতালিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। "গো-হত্যাকারী ক্ষৌরিত-চিকুর" মুসলমানের প্রতি হিন্দুহৃদয়ের আন্তরিক অবজ্ঞাও সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হায়! তকিখাঁ বা মীরকাসিম,—কাহাকেও আর ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইতেছে না!

বৃটীশবীরকেশরীদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জয়ঘোষণা করিবার জন্য ইংরাজ সাহিত্যসেবকগণ কাব্যে ইতিহাসে সাহিত্যে উপন্যাসে সর্ব্বত্র—তাঁহাদের ঐতিহাসিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদের আদর্শে জাতীয় জীবন সমুন্নত করিয়া তুলিতেছেন। নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু তকিখাঁর ন্যায় বঙ্গবাসী মুসলমানবীরের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মবিসর্জ্জনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পাঠ করিয়াও, উপন্যাস রচনা করিবার সময়ে, সে ঐতিহাসিক চরিত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া ফেলিয়া, তাহাতে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাপুরুষত্বের কলঙ্ক কালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন! ফরাসি সম্রাট মহাবীর নেপোলিয়ন দেশবহিস্কৃত ও চিরনির্ব্বাসিত হইলেও তাঁহার স্বদেশের সাহিত্যসেবকগণ তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন মুসলমান নরপতি দশচক্রে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু তাঁহাকে স্ত্রৈণ কাপুরুষ সাজাইয়া বিদায়দান করিয়াছেন!

হায়! আমাদের রুচিবিকার। আমরা বিচার করিয়া দেখি না যে ইতিহাস লইয়া কাব্য উপন্যাস যাহা ইচ্ছা রচনা করিতে পারি কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য রক্ষা করিতে আমরা চিরদিন বাধ্য। জীবিতব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসারটনাও যেমন অন্যায়, মৃতব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসারটনাও তেমনি অন্যায়—কাহারও সেরূপ অধিকার নাই।

রামরাজার মুলুক।

তৃতীয় প্রস্তাব।

Neutral zone নামক যে ভয়ঙ্কর পথের কথা বলিয়াছি, সেই পথের কিয়দ্দূরমাত্র অতিক্রম করিয়াই আমরা অভ্রভেদী "মোহেনা" পর্ব্বতের কোলে সূর্য্যদেবকে অস্ত যাইতে দেখিলাম। অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের ক্ষীণতরা সুবর্ণ প্রভায় তাল, তমাল ও 'তপাস্থ' [Rhododendron de Topassia] তরুবরের উচ্চতম শাখাসমূহ হিরণ্ময় রশ্মিতে হাসিতে লাগিল, ভূধরের শিখায় যেন সুবর্ণের অত্যুজ্জ্বল কিরীটমালা জ্বলিতে লাগিল এবং রোগশয্যামুক্ত ক্ষীণরোগীর ন্যায় এক একটা মহীরুহের শাখায় শুষ্কপত্রপুঞ্জের অভ্যন্তরে সূর্য্যের ক্ষীণ রশ্মি লুকাইয়া লুকাইয়া শেষে দেখিতে দেখিতে বিদায়গ্রহণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত; পথে অন্ধকার,

লোকের যাতায়াত বন্ধ। অৰ্দ্ধপথ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই কালিদাসের 'ঘন অন্ধকার ভরা রজনী সখীর' সহিত সাক্ষাৎ হইল; হিমালয়ের হিমানী জমিয়া বরফ হয়, এ পথে দক্ষিণাবর্ত্তের তামস জমিয়া যেন অনন্ত শূন্যের কোলে কালোরঙ্গের মোটা বরফ জমিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল; সে ঘন অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যায় না, পতিব্রতা সতীও আপনার সন্নিহিত প্রাণনাথের মুখশ্রীদর্শনে বঞ্চিতা থাকেন। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার এত ঘনরূপে জমিয়া উঠিল যে, সূচীদ্বারাও যেন তাহা বিদ্ধ করা যায় বলিয়া বোধ হইল। সমস্ত দিন দিবালোকে রৌদ্রে আসিয়াছি. গাড়ীর ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজের ছায়াও পথে দেখিয়াছিলাম; যতক্ষণ আলোক ছিল ততক্ষণ নিত্যসহচরী ছায়াও আমাদের সঙ্গে ছিল। আলোক নিবিয়া গেল, অন্ধকার আসিয়া দেখা দিল, সমস্ত দিনের অনুগামিনী ছায়া দাসীও লুকাইল। ভাবিলাম, ভবভূতি সত্যই বলিয়াছেন "মন্দাবস্থার অন্ধকার আসিলে, নিত্যসহচরী ছায়াও পলাইয়া যায়।" সংসারের এই বিচিত্র ভাব, মানব সমাজের এই অকৃতজ্ঞ ভাব, বসন্তের কোকিলের ন্যায় মনুষ্যের অস্থায়ী প্রেম-প্রবণতা, প্রভৃতি চিন্তা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম; কিন্তু সে দুর্গম পার্ব্বতীয় পথে আত্মহারা হইয়া থাকা নির্ব্বুদ্ধিতামাত্র; কারণ এই যে, প্রাণরক্ষার পদে পদে যত্ন না করিলে সে পথে সে অন্ধকারে পথিকের বাঁচিবার আশা নাই। শকটবান বলিয়া উঠিল "আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন না; অস্ত্রশস্ত্র যদি কিছু থাকে তাহা লইয়া এ সময়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করুন এবং নিরাপদে এই ভয়ঙ্কর পথকে অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করুন।" এই কথা শুনিয়া আমরা বলদশকট হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে নামিলাম; হিন্দুস্থানী এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েই কোমর বাঁধিল। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি তাঁহার শয্যার অভ্যন্তরে একখানি সুতীক্ষ্ণ বিলাতী তরবারী লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তাহা জানিতাম না, এ সময়ে তিনি তরবারী খানি বাহির করিয়া পত্নীর হাতে দিলেন। তরবারী লুকাইয়া রাখিবার কারণ এই যে, ইহার ব্যবহার জন্য আইনানুসারে যে "পাস" ছিল, সেই পাসের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, পাসটিকে বদলাইয়া লওয়া হয় নাই, সুতরাং গোপনে গোপনে এই মূল্যবান অস্ত্রখানি তিনি বিছানার অভ্যন্তরে রক্ষা করিতেছিলেন। সেই গোপনে অথচ সযত্নে রক্ষিত এবং নারিকেল তৈলে চিক্কণিত শানিত তরবারীখানি আপনার স্ত্রীর হাতে দিয়া হিন্দুস্থানী বলিলেন "যদি মরিতে হয় সিংহিনীর ন্যায় মরিও, স্ত্রীধর্ম্ম রক্ষা করিও এবং মেষের ন্যায় মরিও না।" সেই তলোয়ার হাতে লইয়া ব্রাহ্মণ কন্যা 'বিপত্তে মধুসূদন' না বলিয়া 'বিপত্তে তরবারী' বলিয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শিক্ষিতা রমণী রাজপুতনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সুতরাং রাজস্থানের মৃত্তিকার গুণ ইহাঁর দেহে বিশেষরূপে বর্ত্তমান ছিল। মহিষাসুরমর্দ্দিনীর ন্যায় সেই হিন্দুস্থানী রমণী গাড়ীর অগ্রে অগ্রে, এবং হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি কণোজের বংশনির্ম্মিত একটা মোটা লাঠি কাঁধে লইয়া গাড়ীর পশ্চাতে দ্বারবান বা পালোয়ানের ন্যায় বীরসাজে চলিতে লাগিল। আমি

গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম, আমার হাতে বেতের মোটা ছড়ি এবং শকটবানের হস্তে অশ্বত্থ বৃক্ষের একটা বৃহৎ শাখা রহিল। আমরা গাড়ী চালাইতে চালাইতে একটা বৃহৎ ও উচ্চ পর্ব্বতের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এই পর্ব্বতের সমুদয় স্থান জঙ্গলে আবৃত; পর্ব্বতের এক স্থান দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে সেই বিভক্ত স্থানের নাম Neutral Mountain Pass, এই স্থান পার হইলেই পথিকেরা ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার সীমায় পৌঁছিতে পারেন। এই বিভক্ত পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়াছে, এই রাস্তা অতি সঙ্কীর্ণ, একেবারে একখানি গাড়ীর অধিক চলিতে পারে না, এই পার্ব্বতীর পথকে দেখিলে উদয়পুরের 'হল্‌দিঘাট' স্মরণ হয়। এই Mountain Pass এর দ্বারে পৌঁছিয়াই, শকটবান বলিল "এইখানে একটু বিশ্রামলাভ করুন। পথের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া লই, তাহার পরে গাড়ি চালাইব।" আমরা সম্মত হইয়া তথায় বসিয়া পড়িলাম, সঙ্গে মুড়িমুড়কী ছিল তাহাই খাইতে লাগিলাম; ক্ষুধায় পেট এমন জ্বলিতেছিল যেন পর্ব্বতটাকে খাইয়া ফেলিলেও সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। আমরা কয়েকটা বোতলে একটা দিঘীর সুস্বাদু জল ভরিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, এবং দুইটা বোতলে দুগ্ধ ভরিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই জল ও দুগ্ধ পান করিতেছি এমন সময়ে অল্প দূরে অকস্মাৎ একটা আলোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোক জ্বলিয়াই আবার নিবিয়া গেল। শকটবানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আলোক কোথা হইতে জ্বলিয়া উঠিল?" গাড়োয়ান বলিল "আস্তে আস্তে কথা কহুন"। আমি বলিলাম "আস্তে আস্তে কেন?" সে উত্তর করিল "মহাশয়! কথা বলিলে আপনারা বুঝেন না, তাহাতেই সাবধান করিয়া দিতেছি। ঐ সম্মুখে এক মহাপ্রাচীন ও পবিত্র এবং প্রশস্ত শ্মশানক্ষেত্র আছে, এত বড় পবিত্র ও প্রশস্ত শ্মশানভূমি জগতে বুঝি আর নাই। এখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও মৃতদেহ দাহ বা সমাধি হয় না, এখানে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রে আসিবারও অধিকারী নহে। অসংখ্যাসংখ্য পরমহংস, যতি, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণবর্গ এখানে মৃত্তিকাস্থ হইয়াছেন, এই পবিত্রভূমিকে পবিত্রতম জ্ঞান করিয়া এখানকার হিন্দু জমিদার ও রাজারা অতি যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখানে ভূতের এমনই ভয় যে, দিবসেও লোকে এস্থানে আসিতে কম্পিতকলেবর হয়। ব্রহ্মদৈত্যেরা এখানে বাস করেন। এই শ্মশান এরূপ মাহাত্ম্য পূর্ণ যে, এখানকার মৃত্তিকার ফোঁটা দিয়া অসংখ্যাসংখ্য মহারোগীকে বৈদ্যেরা আরোগ্য করিয়াছেন। তাহাতেই বলিতেছি, চুপ করুন, ভূতের নাম লইবেন না, অকারণে বিপদের উপর বিপদ আনিয়া পথযাত্রাকে কণ্টকপূর্ণ করিবেন না।" এই কথা বলিয়া শকটবান কাঁপিতে লাগিল, হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটি মুড়িমুড়কী চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন "পর্ব্বতের একদিকে দস্যুভয়, অপর দিকে ভূতের ভয় এখন কি করা যায়? আরও কিছু ভয় আছে না কি?" এই কথার কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমত সময়ে সেই অন্ধকার ভরা কালো রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, নৈশসমীরণের শন্ শন্ শব্দতরঙ্গের সঙ্গে মিলিয়া

মিলিয়া, ঘনতামসের মধ্যস্থল যেন ভেদ করিয়া, দিগদিগন্ত মধুরতায় পূর্ণ করিয়া, সেই অন্ধকারময় প্রশস্ত শ্মশানক্ষেত্রের মধ্য হইতে মনোমুগ্ধকারিণী কালেংড়া রাগিনীতে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিল—

"ভক্তিভরে ডাক্ দেখি মন! কেমন হরি থাক্‌তে পারে।
দয়াময় নামে তিনি, বিদিত এ চরাচরে॥"

গীতের ভাষা বাঙ্গালা, গায়কের কণ্ঠস্বর কোনও বঙ্গবাসী গায়কের অভ্যস্ত কণ্ঠস্বর। আমি আত্মহারা হইলাম। সেই দেব-দুর্লভ কণ্ঠস্বর থামিল না, আবার গাহিল—

"প্রহ্লাদ এ নামের বলে, মরে নাই অনলে জলে,
পান করি সে হলাহলে,
অমর হোলেন ত্রিসংসারে।
ভক্তিভরে ডাক্ দেখি মন! কেমন হরি থাক্‌তে পারে॥"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলাম, বহির্জগত হারাইয়া অন্তর্জগতে প্রবেশ করিলাম। সে মধুর কণ্ঠে সে সময়ে যাহা শুনিয়াছিলাম, সমস্ত জীবনে তাহা আর কখনও শুনি নাই। সে স্বরের নিকট অর্ফিউশের বাঁশরী, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী অথবা নারদের বীণা হারি মানে। সেই অশ্রুাকুলবাঞ্জিত কণ্ঠ হইতে আবার শুনিলাম—

"ভক্তের অধীন ভগবান্, ভক্তের রাখেন মান,
ভক্তিভরে শ্রীচৈতন্য
বেঁধেছিলেন প্রেমডোরে।
ভক্তিভরে ডাক্ দেখিরে মন! কেমন হরি থাক্‌তে পারে॥"

গীত সমাপ্ত হইল কিন্তু রাগিনী থামিল না। কালেংড়া রাগিনীর সা, রি, গা প্রভৃতি শব্দ সাধন করিতে করিতে সেই অমৃতভরা কণ্ঠস্বর আকাশ পাতালকে মাতাইয়া তুলিল, দিগদিগন্ত একেবারে স্বর্গীয় লহরীতে ভরিয়া গেল। সে কণ্ঠস্বরের বর্ণনা হয় না, কল্পনারও তাহা অতীত। ভূতলে যদি কখনও স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকি তাহা হইলে রামরাজার মুলুকের এই পথে কয়েক মিনিটের জন্য ভোগ করিয়াছিলাম। সেই অন্ধকার রজনীতে, প্রশস্ত পবিত্র শ্মশানক্ষেত্রে, নৈশসমীরণের তালে তালে, নরাকারে এই দেবমূর্ত্তির কণ্ঠ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যদি স্বর্গেরধ্বনি না হয়, তাহা হইলে স্বর্গ বলিয়া কোনও স্থানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নাই, তাহা হইলে প্রত্যাদেশ প্রভৃতি স্বর্গীয় কথাও অভিধানের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, রাগিনীও ক্রমে থামিল, সে মধুভরা কণ্ঠ বিশ্রামলাভ করিল। রাগিনী সমাপ্ত হইবার মুহূর্ত্তকাল পরেই আমি পাগলের ন্যায় সেই শ্মশানের দিকে দৌড়িলাম; শকটবান এবং হিন্দুস্থানী বন্ধু নিষেধ করিলেন, আমি কাহারও কথা শুনিলাম না। সেই পবিত্র, প্রাচীন ও প্রশস্ত শ্মশানে যাইয়া আমার হৃৎকম্প হইল, যেন অসংখ্য মৃতাত্মার মধ্যে আমি দণ্ডায়মান আছি, এ কথা স্মরণ হইল। পায়ের জুতা

খুলিয়া ফেলিলাম, মাথার কাপড় অনাবৃত রাখিলাম, শেষে আপনা হইতেই ভক্তিভরে মস্তক নত হইল। ভাবিলাম তপঃপ্রভাবশালী, পুণ্যপুঞ্জের আকার স্বরূপ কতশত ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ এ স্থানে সমাধিস্থ হইয়াছেন, এ স্থানটিকে পবিত্রতর হইতে পবিত্রতম জ্ঞান করা উচিত। এমন সময়ে আবার সেই ক্ষীণালোক জ্বলিয়া উঠিল। আমি তীরের ন্যায় সেই আলোকের দিকে দৌড়িলাম। শ্মশানমধ্যস্থ একটা নিবিড় নিকুঞ্জবনের মধ্য হইতে ক্ষীণপ্রভায় একটা মোমের বাতি জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলাম, সেই মনোহারিণী প্রসূনলতাদি পরিবৃতা নিকুঞ্জ-মালার মধ্যে এক মৃণ্ময়বেদীও দেখিলাম, সেই বেদীর উপরে মৃগচর্ম্ম, তদুপরে শুভ্র বস্ত্রখণ্ড, তদন্তর—(এবারে আবার শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছে) যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনার অতীত। সেই যোগাসনের উপরে, যৌবন-ভরা, সৌন্দর্য্য-ভরা, স্বর্গের অমৃত-ভরা, সমস্ত স্বর্গের যেন সমগ্র সুখকে একচেটিয়া করিয়া, এক আলুলায়িতা কেশা পরমা-রূপবতী বাঙ্গালী যুবতী অদ্ধ নিমিলিত নয়নে ব্রহ্মোপাসনায় মগ্না !! সে দৃশ্য স্বর্গের দৃশ্য ; সে দৃশ্যের পূর্ণতা আধ্যাত্মিক পুরুষ ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না। তেমন রূপ, তেমন সৌন্দর্য্য, তেমন অমৃতময় ভাব, এই কলঙ্কিত মৃণ্ময় সংসারক্ষেত্রে সম্ভব কি না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কাহার সাধ্য যে, সে দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে অগ্রসর হয় ? সে অমৃতভরা মুখের জ্যোতিতে মহাযোগীরও চিত্তে আলোক পৌঁছিতে পারে সে জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি মানবকুলে সম্ভব কি না আবার তাহাই ভাবিলাম। সে সৌন্দর্য্যে চির-কলুষিত পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়, শত সহস্র জগাইমাধাইয়ের উদ্ধার হয়। সে রূপের সম্মুখে পাপ পলায়, চিত্তের বিকার নষ্ট হয়। অনন্ত বহ্নির সম্মুখে পতঙ্গ কতক্ষণ স্থির থাকে ? সেই সাধ্বীর স্বর্গীয় জ্যোতির তেজে মনের পাপ-পতঙ্গ জ্বলিয়া যায়। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে "মা" "মা" বলিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলাম। তখন তাঁহার উপাসনা শেষ হইয়াছিল, তিনি বলিলেন "কোথায় যাইবে ?" আমি বলিলাম "ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে।" মা বলিলেন "আমিও যাইতেছি ; এক সঙ্গে যাইব। সায়াহ্নেই রওয়ানা হইতাম, সন্ধ্যা আহ্নিক হয় নাই বলিয়া এই পরিচিত স্থানে উপাসনা শেষ করিয়া লইয়াছি। ভারত মহাসাগরের তটস্থিত ভারতের দক্ষিণপ্রান্তের রক্ষয়িত্রী স্বরূপা কন্যাকুমারীমাতাকে দর্শন করার অভিলাষ আছে ; কুমারী অন্তরীপের দিকে আমিও যাইতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি মৃগচর্ম্মাদি হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক, মোম বাতি নিবাইয়া, একটি সংস্কৃত স্তোত্র আওড়াইতে আওড়াইতে দণ্ডায়মানা হইলেন। ঘন কালো অন্ধকারের কোলে যেন স্বর্গের জ্যোতি চমকিল ; নিশম্ভুর যুদ্ধ কালে প্রাবৃটের ঘন মেঘের কোলে যেন জগৎজননী জগদম্বা দাঁড়াইলেন। আমরা ক্রমে সেই গাড়ীর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম।

ব্রহ্মচারিণী দেবীকে আমি দুগ্ধ পান করিতে দিলাম ; তিনি দুগ্ধ পান করিতেছেন এমন সময়ে ঘড়্ ঘড়্ করিয়া এক খানা বলদশকট, পর্ব্বতের আর এক দুর্গম প্রান্ত হইতে, তীব্র বেগে, আমাদের গাড়ীর নিকটে আসিয়াই থামিল। গাড়ীথামিবামাত্র সেই গাড়ীর অভ্যন্তর

হইতে এক বলবান ও রূপবান ব্রাহ্মণ যুবা এক শাণিত তরবারী হস্তে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিল এবং অবতরণ করিয়াই "রক্ষা কর" "রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই কাতরোক্তি শুনিয়া আমাদের হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটি অভয় দিবারচ্ছলে এমন চীৎকার করিয়া উঠিল যে, সে চীৎকারে গর্ভিনীর গর্ভপাৎ হয়। ব্রহ্মচারিণী মাতা বলিলেন "চীৎকার করিও না, যুবা কি বলে শুন।" যুবা বলিল "পথে আসিতে আসিতে শুনিলাম দস্যুরা পর্ব্বতের একস্থানে একত্রিত হইয়া কয়েকজন পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া প্রাণে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমরা লুকাইয়া লুকাইয়া ভয়ে ভয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়া গাড়ী চালাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি।" হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক বলিলেন "শোনা কথা শুনিয়াই এত ভয় খাইয়াছ, দস্যুরা বাস্তবিক আক্রমণ করিলে না জানি তুমি কতই ভীত হইতে!!" ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "ভয় পাইও না, কোমর বাঁধ।" এই অবসরে বাঙ্গালী ব্রহ্মচারিণীর নাম, বাসস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, নানা কারণে তখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে কথা পরে বলিব।

আমরা আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। সেই অন্ধকারময় "পার্ব্বত্য ঘাটের" মধ্যস্থিত অতি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। এখনে আমরা অনেক লোক, একটা সম্প্রদায় বলিলেই হয়। আমি, হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক, হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক, আমাদের শকটবান, ব্রহ্মচারিণী, ব্রাহ্মণ যুবা, ব্রাহ্মণ যুবার বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধা মাতা, যুবতী ভগ্নী, যুবতী সহধর্ম্মিণী, পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ সহোদর এবং তাহাদের শকটবান—মোটে ১২ জন লোক সঙ্গে আমরা বীরসাজে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে এই পথ পার হইলাম, দস্যু দেখিলাম না।. এই এক মাইল পথ পার হইতে যেরূপ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিল, চারি ক্রোশ পথ পার হইতে তেমন কেলেঙ্কারী হয় না। পার্ব্বত্যঘাট পার হইয়াই আমরা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলাম। এই পর্ব্বতের অপর প্রান্তে মহাবিস্তৃত ময়দান, ইহাকে একটা মরুভূমি বলিলেও বলা যায়। কোথাও বৃক্ষ, তৃণ বা জল নাই চারিদিক কেবল নিরবচ্ছিন্ন বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ। গাড়ী দুইটি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। প্রায় এক ক্রোশ পথ যাইয়াই একটা অসমতল স্থান দেখিতে পাইলাম, অকস্মাৎ তথা হইতে একদল দস্যু আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে, নক্ষত্রও স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছিল, আকাশের ক্ষীণালোকে দেখা গেল, আক্রমণকারীদের দুইজন মুসলমান, বাকি লোক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু। লাঠি ভিন্ন অন্য অস্ত্র নাই এবং দুইজন মুসলমান ভিন্ন বিশেষ বলবান কাহাকেও দেখিলাম না। আমরা পরামর্শের সময় পাইলাম না, সুতরাং একেবারেই যুদ্ধে যোগ দিতে হইল। আমাদের গাড়োয়ানেরা দস্যুদিগের নিকটে অনেক প্রকারের মিথ্যা কথা তুলিয়া বলিল "যাত্রীরা পুলিশের লোক, ইহাদের গাড়ী লুণ্ঠিত হইলে মহান্দোলন হইবে, ইত্যাদি।" কিন্তু দস্যুরা এ সকল পুরাতন কথায় কর্ণপাতও করিল না, সুতরাং আমরা যুদ্ধে যোগ দিলাম। আমরা Defensive party সুতরাং অধিকতর উৎসাহী, দস্যুরা

Offensive party সুতরাং. ভয়ে ভয়ে যুদ্ধে যোগ দিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহাকেও অসমসাহসিক বলিয়া বোধ হইল না, তাহারা যেন সসঙ্কোচে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, ইহা দেখিয়া আমরা মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মাভৈঃ মাভৈঃ রবে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। আমাদের নির্ভরতা ও উৎসাহের উৎস উথলিয়া উঠিল; সে সময়ে গজেন্দ্ররাজ ঐরাবৎ অথবা দেবকুলত্রাস হর্কিউলিষ আসিলেও আমরা পৃষ্ঠপদ হইতাম না। হিন্দুস্থানী ভায়ার লাঠির আঘাতে দুইজন মুসলমান ডাকাইতের মাথা ফাটিল, তাঁহার সহধর্ম্মিনীর তরবারী লাগিয়া একটা নিম্ন-শ্রেণী হিন্দুর উরুদেশে গুরুতর আঘাত হইল, ক্রমে দস্যুরা পলাইতে আরম্ভ করিল কিন্তু যাহাদের মাথা ফাটিয়াছিল তাহারা দৌড়িতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল, আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলাম। আমাদের পক্ষে একজন গাড়োয়ানের পৃষ্ঠে আঘাত লাগিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ যুবার একটা অঙ্গুলিতে সজোরে লাঠি পড়িয়াছিল, তদ্ভিন্ন আর কেহই আঘাতিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, যুবা ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন আমাদের পক্ষের সমুদয় স্ত্রীলোক, এবং পুরুষ একত্রে লড়িয়াছিল। আমরা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত দস্যুদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলাম কিন্তু ব্রহ্মচারিণীর নিষেধ বাক্য শুনিয়া আমরা নিরস্ত হই। দুইজন মাথা ফাটা দস্যুকে অবশেষে সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া আমরা আবার গাড়ী চালাইতে চালাইতে রাত্রি প্রায় একটার সময় একটা প্রকাণ্ড ফাটকের (Gate) সম্মুখে পৌঁছিলাম। এই ফাটকের প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বার অন্দর হইতে বন্ধ ছিল, লণ্ঠনের আলোকে দেখিলাম ঐ ফাটকের উপরে লেখা আছে "Frontier Gate" এই গেটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। আমাদের গাড়ীর শব্দ শুনিয়া একজন দারোগা কপাট খুলিয়া দিল এবং আমাদের সকলের নাম, নিবাস, কোথায় যাইতেছি, কি প্রয়োজন, সঙ্গে গাজা আফিম ইত্যাদি আছে কি না, ইত্যাদির খবর লইয়া আমাদিগকে ভিতরে যাইতে অনুমতি দিল। আমরা রাত্রি দুইটার সময় রামরাজার মুলুকে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, একখানি বড়গ্রামের একপার্শ্বে ঐ ফটক অবস্থিত। আমরা থানার নিকটে এক মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম, গাড়োয়ানেরা বলদ খুলিয়া দিয়া তরুতলে বিশ্রামসুখলাভ করিতে লাগিল। দারোগাকে ডাকাইয়া পথের ঘটনা আদ্যন্ত বলিলাম, দারোগা উত্তর করিল "এমন ঘটনা প্রায়ই হইতেছে; যে স্থানে লড়াই হইয়াছে তাহা ইংরেজের ও বটে, আমাদের রাজারও বটে। যাহা হউক ইহার মোকর্দ্দমা হইলে আপনাদিগকে এখানে অন্ততঃ একমাস কাল থাকিতে হইবে।" দারোগার কথা শুনিয়া আমি আর উচ্চবাচ্য করিলাম না, মোকর্দ্দমা করিতে সকলেই অসম্মত হইল, সুতরাং ঘটনাটি অপ্রকাশিত রহিয়া গেল।

যে গ্রামের কথা বলিতেছি, এই গ্রামটি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একপ্রান্তের প্রথম গ্রাম। এই গ্রামে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে আমি ভিন্ন সমুদয় যাত্রীরা চলিয়া গেলেন, ঐ গ্রামের জমিদারের বাটীতে কোনও কারণে আমাকে প্রায় এক সপ্তাহ কাল আতিথ্য গ্রহণ করিতে

হইয়াছিল। এই গ্রামটির পার্শ্বে একটা খুব বড় পর্ব্বত, এই পর্ব্বতে মহাবন এবং এই মহাবনে শার্দ্দুল, ভল্লুক, বন্যবলদ, মৃগ এবং সিংহ পর্য্যন্ত বাস করে। নিম্নে অনতিদূরে একটি প্রস্রবণ আছে, ঐ প্রস্রবণের জল অত্যন্ত নির্ম্মল, স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুস্বাদু। গ্রামের লোকেরা এই জল পান করে এবং এখানে স্নানও করিয়া থাকে। রাত্রে পিপাসিত পশুরা এই ঝরণার জল পান করিতে আসে সুতরাং রাত্রে এই পর্ব্বতের পার্শ্বে গ্রামের লোকেরা প্রায়ই যায় না। আমি এই গ্রামে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মুদ্রা দেখিতে পাইলাম, এই টাকার একদিকে শঙ্খমূর্ত্তি দেখিলাম, অন্যদিকে ত্রিবাঙ্কুরের ভাষায় এবং অক্ষরে কয়েকটা শব্দও দেখিলাম। ইংরাজী টাকাও এখানে চলে কিন্তু ইংরাজী পয়সা চলে না। একটা টাকা ভাঙ্গাইলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার রৌপ্যখণ্ড পাওয়া যায়, উহার নাম "চক্রম"। এই গ্রামে ত্রিবাঙ্কুরের ভাষা (মালয়ালম) চলে। ঐ ভাষার কথা পরে লিখিব, এখানে কয়েকটা মাত্র নমুনা দিয়া রাখিতেছি। উণ্ডু মানে আছে, নির্পু অর্থে অগ্নি, এল্লা মানে সমুদয়, ভ্যালেরা মানে অত্যুত্তম, ভেল্লম অর্থে জল, অপু অর্থে লবণ, নী অর্থে তুমি, আবানা অর্থে উহাঁরা, এন্দে মানে কোথায়, সোয়ামী অর্থে ঈশ্বর, পৎ অর্থে দশ, জনঙ্গল অর্থে সভা ইত্যাদি বুঝা যায়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের লোক "মালোয়ালী" নামে আখ্যাত। এই রাজ্যের প্রকৃত রাজা ব্রাহ্মণ, এখানে ব্রাহ্মণের অপরিমিত প্রভাব ও প্রভুত্ব। মালোয়ালী ব্রাহ্মণ বর্গ "নাম্বুরী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদেশে ব্রাহ্মণ অবধ্য এবং ব্রাহ্মণই হর্ত্তাকর্ত্তা।

এক সপ্তাহ কাল পরে আমি এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নাগোর কোয়েল নগরে (Nagercoil) পৌছিলাম। এই নগরে হিন্দুর ঘরে ঘরে মনসা পূজা দেখিয়াছি, এখানে বার মাস সাপের পূজা হয়। এই নগরের নামকরণ সম্বন্ধে কোনও মৌলিক ইতিহাস বা প্রবাদ পাইলাম না। নাগর কোয়েল, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটা বড় সহর, ইহা একটা প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রীক্ট। এখানে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেজ প্রভৃতি আছে। বহুসংখ্যক খৃষ্টানের এখানে বসতি; ইংরাজী ভাষার খুব চর্চা। আমি যখন নাগর কোয়েলে গিয়াছিলাম তখন রঘুনাথ রাও, বি, এ, ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন; ইঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা মৃতরাজা সার, টি, মাধব রাও বাহাদুরের সহধর্ম্মিনী। নাগর কোয়েল খুব সভ্য, শিক্ষিত এবং প্রাচীন নগর; এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ এবং নগরটি অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কয়েক দিবস এই নগরে বাস করিয়া আমি কুমারী অন্তরীপ দেখিতে গেলাম। নাগোর কোয়েল হইতে কেপ্ কোমোরীণ অধিক দূর নহে; প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন ৭ ঘটিকার মধ্যে দুইবার অন্তরীপে যাওয়া যায় এবং দুইবার তথা হইতে ফিরিয়া আসা যায়। এখানকার বলদশকট খুব দ্রুত চলে, পথ প্রশস্ত ও পরিস্কার এবং পথে কোনও ভয় নাই। এই পথে নিরন্তর লোকের যাতায়াত থাকে। আমি অপরাহ্নে বলদশকটযোগে কন্যা কুমারী দেখিতে রওয়ানা হইলাম।

মালঞ্চ।

বায়ু।

(হেমন্ত ঋতুর অবসানে ও বসন্তের প্রারম্ভে)

(১)

একি ভাব আজি বায়ু, সহসা না জানাইয়ে,
করিলি ধারণ ?
কন্ কন্ করে হিয়া, তবু যায় জুড়াইয়া,
কেমনেও হিমরাশি হইল চন্দন ?
ও তোর অসাড় প্রাণে, কোন্ অজানিত স্থানে,
এ সুন্দর ভাবরাশি ছিলরে গোপন ?
মাতিলি, মাতালি আজি চল সমীরণ !

(২)

মুকুতার হার যেন প্রকৃতির গলে রে
করিলি ক্ষেপণ !
উরসে শিশির বোধে, শোণিতের ধারা রোধে,
আবার তখনি তার জুড়ায় জীবন !
জরামরী লতা হ'তে, কোথা হ'তে, আচম্বিতে,
যুবতী-নিশ্বাস আজি হইল পতন ?
নিরাকার সমীরের এ যাদু কেমন !

(৩)

আধা হিম, আধা উষ্ণ, আজি সমীরণ রে
মরি কি মোহন !
ভয়ে জড়সড় হায়, অধরে মিলায়ে যায়,
তরুণীবালার যেন প্রথম চুম্বন !
অনুরাগ ব্রীড়া সহ, দ্বন্দ্ব করি অহরহ,
শিথিল হইয়ে শোয় ওষ্ঠের উপর !
তেমতি বায়ুর আজি আচার সুন্দর।

(৪)

বায়ু নয়—বুঝি আজি ফেলিছে নিঃশ্বাস
দিগঙ্গনা বালা !
শতছিদ্রে প্রাণ দিয়া, হিম যায় বাহিরিয়া,
তবু গো সুরভি ঘ্রাণে বসুধা আকুলা !
বিরহ-প্রমাদ গণি, কাঁদে দিগঙ্গনা ধনী,
স্বভাব-সুন্দরীদের সুন্দর সকল ;
উষা যথা কাঁদে, তবু ঝরে মুক্তাফল।

(৫)

বায়ু বটে—তাই ওই ধীরি ধীরি,
চোরের মতন,
লুটাইয়া প্রাঙ্গণেতে, পশি কক্ষ-ভিতরেতে,
ঝাপটি, বধূর হরে শিরের বসন !
কাছে গুরুজন হায়, বধূ ভাবে "একি দায়" !
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ, কর কেঁপে যায়,
বসন তুলিতে তার অলক লুটায় !

(৬)

দীপ্ত অনুরাগে গুণী, বহুদিন পরে,
করে লয়ে বীণা,
সহসা আঘাত করে ; করুণ চীৎকার-স্বরে
"কি কর" ? বলিয়া বীণা করে তারে মানা !
শ্রোতার চমক লাগে, গুণীর করুণা জাগে !
কঠোর মধুর যথা বীণার সে রোল,
তেমতি বায়ুর আজি বাসন্তী-হিল্লোল !

(৭)

শক্তি সাথে চারুতার হইলে মিলন
যেমন সুন্দর !
বিজ্ঞান ও কবিতায়, হ'লে সমাবেশ হায়,
ভাবের সমুদ্রে খেলে যেমন লহর !
বায়ু পুরোহিত হয়ে, বাসন্তীরে ক্রোড়ে লয়ে,
তেমতি বর্ষের করে করিল অর্পণ ;
হেসে সারা বঙ্গ-কবি হেরি এ মিলন !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

উষা।

লাবণ ঝরা
প্রেমের বয়ান,
রাঙ্গাবাসে ঢাকি;
তামস মাখা
কোয়াস আরে,
কে মারিছে উঁকি!
নীলিম ভরা
বিমান আসন,
কিরণ ভরা
কিরণ ভূষণ,
দ্যুতিভরা,
প্রীতি ভরা,
রূপের আভা ফোটে!
মনে মনে
শঙ্কা গ'ণে
তমা পলায় ছুটে।
রাঙ্গা আঁচল
পরছে লুটী
আলুথালু হ'য়ে,
উজল ভরা—
কিরণ তাতে
উঠ্‌ছে ঝকিয়ে;
বসন ফুটে
রূপের আভা
উঠ্‌ছে উথলি;
প'রছে যেন
ধরার বুকে,
মুক্তামতি ঝলি!
সরম পেয়ে
রূপ লাবণ্যে,

আকাশ কোনে গিয়ে,
ক্ষুভিত প্রাণে
কাঁদছে শশী,
ম্লান বরণ হ'য়ে!
তাই ধরণী
ভিজিয়ে গেছে,
শশীর আঁখি জলে!
প্রফুল্ল হেসে,
সমীর তাই—
ব্যঙ্গ করছে ছলে!

কে তুমি গো রাঙ্গা মেয়ে,
পুব গগণে বসি?
পরাণ জুড়া,
শীতল করা,
হাস মধুর হাসি!
তোমার হাসি দেখে
হয় যেন মনে,
জল হ'য়ে যায় গ'লে!
তোমার লাবণ ভরা
বদন দেখে,
আপনা যায় ভুলে।
জনমের পূর্ব্বেকার
শত বরষের,
পরে মনে কত কথা,
শত জীবনের!
স্মৃতিমূলে কি জানে যে—
আভাষ অভাষ!
প্রাণে যেন উঠে ভেসে,
স্বরগের বাস!

ব্যাপ্তি।

যখনি দেখিতে পাই পবিত্র কোমল
প্রণয়ের চিত্র কোনও কবিবর্ণনায়
ফুটিয়া উঠিছে ধীরে, অমনি আমার
চিত্তে উছলিয়া উঠে আগ্রহ প্রবল।
মনে হয় নায়ক যে, সে আমি আপনি;
আমারি সে প্রিয়তমা আপনি নায়িকা;
—ত্রাসে বুঝি আমাদেরি, শত বিভীষিকা;
হাষে বুঝি, আমাদেরি মিলনরজনী।
তা হলে ত একমাত্র আমরা দুজনে
মানবের কাব্যরাজ্যে রয়েছি ভরিয়া,
বাল্মীকির দিন হতে প্রচার করিয়া
মহাশুভ প্রেমনীতি অশেষ যতনে!
উন্মাদিয়া লক্ষকোটি কবির হৃদয়
করিয়াছি লক্ষকোটি প্রেম-অভিনয়!

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কবি।

সমস্ত সংসার মাঝে অনেক ঘুরেছি আমি
খুঁজে খুঁজে আপনার জন,
সেধেছি কেঁদেছি কত সমস্ত হৃদয় দিয়ে
পাই যদি তবু কারো মন,
কেউ যদি হাসি মুখে চাহে মোর মুখ পানে,
বলে দুটো স্নেহময় কথা,
দুদণ্ডের তরে যদি এক বিন্দু ভালবাসা
দূর করে দেয় এ শূন্যতা।
এত লোক, এত জন, এত প্রেম ভালবাসা,
কেহ মোর কেহ মোর নাই।
শতকোটী গ্রহময় বিপুল বিশ্বের মাঝে
কোন হৃদে নাহি মোর ঠাঁই!
অনন্ত আকাশ তলে, বিশাল বিশ্বের কোণে,
আজ তবে বাঁধিবরে ঘর,
আপনি করিব আমি জগত সৃজন মোর,
কাঁদিব না চাহিয়া অপর!
এই মধু রবিকরে, এই মুক্ত সমীরণে,
লয়ে এই মহা বিশ্ব শোভা!
আপন জগত মোর রচিবরে বসি বসি,
সাজাইব মোর মনলোভা!
হৃদয়েরে ভাঙ্গি ভাঙ্গি করিবরে নিরমাণ
মধুময়ী কবিতা ললনা,
শুভ পরিণয় ডোরে বাঁধিয়া আমার সাথে
আবাস রচিব দুইজনা,
শত শত লোকজনে ভরে যাবে গৃহ মোর
জগতের আসিবে সকলে,
সকলে আপন মোর স্নেহের সাধের ধন
প্রেমে মন ধীরে যাবে গলে!
থাক্ তবে অন্য কাছে সাধা কাঁদা ভিক্ষামাগা,
—প্রেম হীন জগতের ছবি—
নিজের জগৎ আমি রচনা করিব নিজে,
কি অভাব মোর! আমি কবি!

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ভোলা ময়রা।

দেখিতে দেখিতে আরব্যোপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক অশ্বের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার সুপ্রশস্ত ও রমণীয় উদ্যানের যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, দেশীয় ও বিদেশীয় বিবিধপ্রকার প্রসূণের লতা, ঝাড় ও বৃক্ষ দেখিতে পাইবে; ইংলণ্ড, আমেরিকা, গ্রীশ, রোম প্রভৃতি বহুদূরদেশস্থিত মনোহর ফলফুলের তরুলতা আনিয়া

বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্যানে কেমন আশ্চর্য্য কৌশল ও যত্ন সহকারে রক্ষিত ও পোষিত হইতেছে! অতি পুরাকালের দুষ্প্রাপ্য কয়েকটা মূল্যবান মহাদ্রুমও এখানে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সাবধানতার সহিত এরূপ সুন্দরভাবে রাখা হইয়াছে যে দেখিলে উদ্যানের মালীদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ ও প্রশংসাবাদ না দিয়া থাকা যায় না। গদ্যের কথা বলিতেছি না, পদ্যভাগ লইয়া বিচার করিলেও উদ্যানের অধুনাতন অনেক বড় বড় মালী ও মালাকারের নাম করিতে হয়। মেঘনাদ-প্রণেতা মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বড় বড় কবির নাম স্মরণ হয়; ইঁহাদের হস্তে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা কবিতা যথেষ্ট উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইঁহাদের প্রভাব বিস্তার হইবার অনেক কাল পূর্ব্বেও বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা কবিতা অন্যান্য কবিদিগের হস্তে প্রভূত সামর্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যকে পরম রমণীয় পরিচ্ছদে প্রশোভিত করিয়াছিল। ঘণরাম, ভারতচন্দ্র, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতি কবিকুলধুরন্ধরদিগের অসাধারণ কবিত্বশক্তি তাঁহাদের সুমধুর কাব্যমালার প্রতি পত্রে পত্রে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত ও প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা একধরণের কাব্যকার, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আর একধরণের কাব্যকার। এখনকার ইউরোপীয় সভ্যতা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইংরাজী শাসন, ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনচিন্তা প্রভৃতির সাহায্য পাইলে কবির মন যেরূপ দাঁড়ায়, অধুনাতন কাব্যকারদিগের রচনা ঠিক তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং এখনকার কবিকুল নানা কারণে বিদেশীয় কবিকুলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অংশে প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যকারেরা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যে অংশের অসাধারণ উৎকর্ষসাধন করিয়া তাঁহারা সমগ্র দেশ ও সমগ্র জাতির পূজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, সেই অংশকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করি; বাঙ্গালা কবিতার কালকে 'আদি' 'মধ্য' এবং 'অধুনাতন' এই তিন নামে ও ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আদিভাগে বৈষ্ণব কবিগণ, ঘণরাম, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, কীর্ত্তিবাস, কাশিদাস প্রভৃতি অনেক কবি মহোদয়ের নাম সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে; অধুনাতন ভাগে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতির নাম সন্নিবিষ্ট হইবার যোগ্য; তাহার পরে মধ্য কাল। এই মধ্য কালের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে, আদিকালের কিছু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য, আদিকালের কবি মহাশয়েরা সকলে সমসাময়িক ছিলেন না, সুতরাং ইঁহাদিগের কবিতামালাকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করি, তদ্যথা—

ভারতচন্দ্র—রসকবি।	কবিকঙ্কণ—পুরাণকবি।
বৈষ্ণব কবিগণ—প্রেমকবি।	কীর্ত্তিদাস, কাশিদাস—ঐতিহাসিক কবি।
ঘণরাম—বীরকবি।	ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উপরিউক্ত কবিকুল "আদিকাল" ভুক্ত; এখনকার কবিকুল "অধুনাতন কাল" ভুক্ত। অধুনাতন কালের কবি মহাশয়দিগকে আমি ইঙ্গ-বঙ্গ কবি নাম দিলাম; ইঁহাদের রচনায়

বিদেশীয় ভাব, বিদেশীয় ভাষার "বুথ্‌নী" এবং খাতকী অলঙ্কার সম্পূর্ণভাবে প্রকাশমান। মহাজনী ভাব নাই, ভাবগুলি যেন খাতকের (ঋণ করা) ভাব; ইহাদের রচনায় আদিমত্ব (originality) থাকিলেও তাহাতে 'বিদেশী বিদেশী' গন্ধ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনায় মৃত-মহাত্মা ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছিলেন Every modern poem smells the hand of an Englishman, ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। এখনকার কবির কেবল ভাবে নহে, ভাষাতেও আদিমত্ব নাই; খাঁটি খাস বাঙ্গালা খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই দুষ্কর, নানাভাষার মিশ্রণে বাঙ্গালা সাহিত্যের শোভা ও সামর্থ্য বাড়িয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু আদিমত্ব গিয়াছে। আদিকালের কবির কাব্যে বাঙ্গালা ভাষা খাঁটিভাবে পাওয়া যায়, অধুনাতন কালের কবির রচনায় বিদেশী ভাষার বুথনী মিশ্রিত বাঙ্গালার খুব প্রচলন। যাহা হউক এই দুই কালের মধ্যভাগে যে কালের কথা বলিতেছি তাহাই মধ্যকাল, এই কালে এক আশ্চর্য্য কবি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। কবিকুলধুরন্ধর ঈশ্বর গুপ্ত, আজু গোঁসাই, আণ্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, জগন্নাথ বণিক, সৌদামিনী বাই, উধোযোগী বা উদ্ধব দাস, মতি পসারী, লোকনাথ ঘোষাল, হোসেন সেখ প্রভৃতি এই কালের কবি। এক ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন ইহাদের কেহই পুস্তকাকারে আপনাপন কবিতা লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রতিপত্তি লাভের বাসনা ইহাদের অনেকেরই ছিল না; ভবিষ্য পুরুষদিগের আমোদ, শিক্ষা অথবা কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ইহারা আপনাদের 'ছড়া' বা 'কবিতা' মালা লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। অনেক কষ্টকর অনুসন্ধানে ইহাদের রচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের অন্য ইচ্ছা ছিল, তিনি উচ্চদরের কবি এবং উচ্চদরের কবিওয়ালা ছিলেন। যথার্থভাবে তিনি নিজে লিখিয়াছেন—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যপ্ত চরাচর। যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥"

ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় কবি বাস্তবিক "গুপ্ত" থাকিবার নহে। জগন্নাথ বণিক, আণ্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি ঈশ্বর গুপ্তের অবশ্য সমকক্ষ ছিল না। ইহারা সভায়, মজ্‌লিসে, আসরে, জেল্‌সায় গমন করিয়া আপনাদের কবিত্বশক্তি দেখাইত এবং যথাযোগ্য পুরস্কার ও প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে ধন্যজ্ঞান করিত। আমি এই মধ্যযুগের কবিত্বশক্তিশালীদিগকে "কবিওয়ালা-কবি" বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি। ইহাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশেষ আলোচনার যোগ্য, ইহারা সকলেই উপস্থিতবুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। প্রতিদ্বন্দ্বীতা না হইলে কবিওয়ালার লড়াই চলে না, সেই জন্য ইহাদের এক এক জনের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল; ঈশ্বর গুপ্তের আজু গোঁসাই, ভোলা ময়রার জগন্নাথ বেণে, আণ্টনি ফিরিঙ্গির সৌদামিনী এবং মতি পসারীর হোসেন সেখ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। হোঁসেন সেখের কবির দল তর্জ্জানামে খ্যাত হয়, এই তর্জ্জানাম হোসেন সেখ সর্ব্বপ্রথমে প্রচলন করেন। আমরা এই সকল কবিওয়ালাকবির মধ্যে ভোলা ময়রা সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। পাঠক ও পাঠিকাদিগের স্মরণ রাখা উচিত, কবিওয়ালা-কবিরা ঘর

হইতে প্রায়ই কিছু লিখিয়া বা বাঁধিয়া লইয়া যায় না ; মজলিষে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ যে প্রশ্ন করিবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর কবিত্বে বাঁধিয়া নিয়ম মত দিতে হইবে। যে যথাযোগ্য উত্তর দিতে না পারে, তাহার পরাজয় হয় "এবং তাহার ভাগ্যে কেবল কদলী মিলে।" অবশ্য অনেক সময়ে অনেক কথা ঘরগড়া থাকে কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের উপস্থিত-বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করা যায়। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ অবশ্য প্রশ্নের সমাচার, প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে প্রকাশ করে না, গোপনে রাখিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, উভয় দলের সঙ্গে যাত্রাওয়ালার মত অনেক লোক থাকে এবং ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বেহালা, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যোপকরণ বাজে। এ দৃশ্য দেখিবার যোগ্য বটে!!

ভোলানাথ মদক উর্ফ্ ভোলা ময়রা জাতিতে মদক ছিল। ইহার অনেক কবিতায় দেখা যায়—

আমি ময়রা ভোলা,
ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই।"

ইহাতে বোধ হইতেছে, বাগবাজারের কোনও স্থানে ইহার বাস ছিল। কলিকাতার বাগবাজারের কোন্ স্থানে ইহার দোকান বা বাসস্থান ছিল অথবা ইহার বংশধরের কেহ জীবিত আছে কিনা, অনুসন্ধান করিয়া আমরা দেখিনাই ; অনুসন্ধান করিলেও কিছু সত্য পাওয়া যায় কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ। ইহার জন্মস্থান কলিকাতায় কিম্বা অপর কোনও স্থানে ছিল, তাহাও জানিনা। কেহ কেহ বলেন, বাগবাজারের বসুপাড়ায় ইহার বাসছিল। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার কোনও গ্রন্থে ভোলাময়রার নামোল্লেখ করিয়া ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার জীবন-চরিত তিনিও দেন নাই। বাঙ্গালা ১৩০১ সালের প্রকাশিত "কবির ছড়া" পুস্তকেও ভোলা ময়রার জীবন চরিত নাই। হুগলী কলেজের মাননীয় প্রোফেসর (প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ) বাবু ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক দিন হইল আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "ভোলাময়রার জন্মস্থান গুপ্তীপাড়া, ত্রিবেণীতে তাহার বিবাহ হয়। ভোলার পিতার নাম কৃপারাম ; এই ব্যক্তি কিপু ময়রা নামে বিখ্যাত ছিল। মাতার নাম গঙ্গামণি। ভোলার বাস্তবিক বাগবাজারে দোকান ছিল ; তাহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এমন অনেক লোক এখনও জীবিত। ভোলার কনিষ্ঠ সহোদর হৃদয় নাথ মদক তালতলায় দোকান করিত, তাহার বংশ এখনও আছে। ভোলানাথ মদক বাল্যকালে পাঠশালায় পড়িয়া ছিল ; সামান্য হিসাব, তালপাতায় খরিদ দারের নাম লিখা এবং বড় বড় বানান শিখিয়াই সে পাঠশালা পরিত্যাগ করে। ভোলা প্রত্যহ রামায়ণ ও মহাভারত পড়িত এবং শুনিত ; সংকীর্ত্তণে প্রায়ই যোগ দিত ; বড় কৃষ্ণ-ভক্ত পুরুষ ছিল ; নিত্য গঙ্গাস্নান করিত এবং চরিত্র ভালছিল বলিয়াই বিশ্বাস। ভোলা বড় রসিক পুরুষ ; কণ্ঠস্বরও মন্দ ছিলনা।" ইত্যাদি। কিন্তু ভোলার কবিত্ব শক্তির

স্ফুরণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। ভোলানাথের কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার অনেক পূর্ব্বে ভোলার বিরচিত কতকগুলি কবিতা পাওয়া যায়। ঈশান বাবু অনুগ্রহ করিয়া যে কবিতাটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই—

"পাণকে তাম্বুল বলে, 'পর্ণ' সাধুভাষা।
বুরুজে বিরাজ করে, চাষার বড় আশা॥
বুড়োবুড়ি, * * * যুবক যুবতী।
পাণ পেলে সকলের বাড়য়ে পীরিতি॥
মোষের মত মুন্সী বাবু মসির ন্যায় কালো।
পাণ খেয়ে, ঠোঁঠ রাঙ্গায়ে, চেহারা খানা ভালো॥
পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য বলে পাণ খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া, বাসী মড়া, যার পাণের কড়ি নাই॥

তাম্বুল সম্বন্ধে ভোলা ময়রার এই কবিতা অতি অল্পবয়সে লিখিত। এই কবিতায় মুন্সী বাবু কোন্ ব্যক্তি প্রকাশ পায় নাই। ভোলার আর একটা কবিতা দিতেছি, এই কবিতাটি শ্রীরামপুর হইতে কোনও ভদ্রলোক পাঠাইয়া দিয়াছেন।

"বামুণ বলে 'আমি বড়', কায়েৎ বলে 'দাস'।
বদ্দি বলে 'ক্ষত্রি আমি' (ঢাকা জেলায় বাস)॥
যুগী বলে 'যোগী আমি' চাষা বলে বৈশ্য।
শূদ্রেতে শূদ্রত্ব ছাড়ে, যথা কালী ঘাটের নস্য॥
বলে 'উগ্র', নহি শূদ্র, রাখি তলোয়ার।
হোলে রাত্রি, উগ্র ক্ষত্রি, ভয়ে পগার পার!!
আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, ময়রাই বার মাস।
জাতি পাতি নাহি মানি, (ওগো) কৃষ্ণপদে বাস॥"

উলো গ্রামের প্রসিদ্ধ বারোয়ারী দলের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একটি কবিতা পাঠাইয়াছেন, তাহা এই—

"লাগ্‌লো ধুম, গুড়ুম গুড়ুম, শোভা বাজারের পূজা।
বড় ব্যয় (লোকে কয়) কর্ব্বে শোভা বাজারের রাজা॥

এবারে ভোলা ময়রার আমরা দিগ্বিজয়ের পরিচয় দিতেছি। মৃত মহাত্মা ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভোলা ময়রার কবিত্বের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন, ভোলার কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন "Bhola's Exodus!" তিনি আমাকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন "কোনও সময়ে শ্রীরামপুরে ভোলা গাহিতে গিয়াছিল, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী জগা বেণে উপস্থিত ছিল না, আণ্টণি ফিরিঙ্গীর দল মজুত ছিল। এক অসাধারণ গ্রাম্য বাঙ্গালা ভাষায় অথচ আশ্চর্য্য অর্থ ব্যঞ্জক অনুপ্রাসে, ভোলা প্রশ্ন করিল—

"নাটুর নীচে নাড়ু নড়ে লাড্ডু নয় ভাই।
বৃন্দাবনে বোসে দেখ, বন্ধু ঘোষের রাই॥
ঘোমটা খুলে, চোমটা মারে, কোমটা বড় ভারি।
তিন লম্ফে লঙ্কা পার; হাস্‌ছে শুক সারি॥
বাঁঝা মেয়ের বেটা হোলো, অমাবস্যায় চাঁদ।
আণ্টণি জবাব দিও, নইলে বাঁধবে বড় ফাঁদ॥"

প্রশ্ন শুনিয়াই আণ্টনি ফিরিঙ্গির কপালে হাত পড়িল। আর একবার মুর্শিদাবাদে ভোলা ময়রা, হোসেন সেখকে প্রশ্ন করিয়াছিল—

"জর্, জরু, জমীণ্, ক্যায়সে থৎরে আনে। হিজ্‌রী পীজ্‌রী কেন হজের সঙ্গে নাই॥
খুণ্, মুণ্ শুণ্, ক্যায়সে পৎরে জানে॥ যবনে ব্রাহ্মণে বল কোন্ ভেদ্‌টা দেখি।
জোওয়ালা, মোওয়ালা, কালা কেন ভাই। ভোলার টাকা সদাই খাঁটি, এবার হোসেনের মেকি॥

এই কবিতা বা ছড়ায় অতি আশ্চর্য্য রূপে উর্দ্দু, হিন্দী, পারস্য এবং আরব্য শব্দের যথারীতি সমাবেশ হইয়াছে। ভোলার এই ভাষাজ্ঞান কোথা হইতে হইল, অনুসন্ধান করিবার বিষয় বটে।

আমরা কেবল আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ভোলাময়রার পরিচয় সমাপ্ত করিব। এবারে তাহার সমকক্ষ ও সমসাময়িক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী জগন্নাথ বণিক বা জগাবেনের সহিত লড়াই!! মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাঁটাল মহকুমার এলাকাভুক্ত জাড়াগ্রাম অতি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই গ্রামে বহু পূর্ব্ব কাল হইতে "রায়" উপাধিধারী এক ধণাঢ্য ব্রাহ্মণ জমিদারবংশ বাস করেন। গ্রামে অনেক বাঁশের বন এবং অনেক চাষার বাস। জাড়ার নিকটে মাণিক কুণ্ডগ্রাম মূলার জন্য বিখ্যাত। এখানে তিন হাত চারি হাত লম্বা মূলা হয়, ওজনে ১০ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বড় দড় একজীবীশনে এখান হইতে মূলার রপ্তানি হয়। ভোলা ময়রা এবং জগা আপনাদের দলবল লইয়া জাড়ার জমিদার বাবুদের বাটীতে কবি গাহিতে গেল। আসরে লোকে লোকারণ্য, নানাগ্রাম হইতে দলে দলে গ্রামবাসীরা আসিয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছে। জগা বেণে খোষামুদে ছিল, একটা গীত গাহিয়া বলিল "জাড়া গ্রামটা ঠিক গোলোক বৃন্দাবন; বাবুরা যেন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।" ভোলার গায়ে অগ্নি জলিয়া উঠিল, তাহার আর সহ্য হইল না। ভোলা উঠিয়া গাহিল—

(ক)

"কেমন কোরে বল্‌লি জগা,
জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা,
চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন!!
কেমন কোরে বল্‌লি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন!

(খ)

জগা! কোথারে তোর শ্যাম কুণ্ড;
কোথারে তোর রাধা কুণ্ড;
সাম্‌নে আছে মাণিক কুণ্ড, কোর্‌গে মূলা দর্‌শন!!!
কেমন কোরে বোল্‌লি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন!
এখানে বামুণ রাজা, চাষা প্রজা, চৌদিকে দেখ্ বাঁশের বন!!

(গ)

"কৃষ্ণচন্দ্র" কি সহজ কথা ? কৃষ্ণ বলি কারে ?
সংসার সাগরে যিনি (জগা !) তরাইতে পারে॥

(ঘ)

বাবুতো বাবু লালা বাবু, কোল্‌কাতাতে বাড়ী।
বেগুণ পোড়ায় নুন দেয় না, সে ব্যাটাতো হাড়ী !!

(ঙ)

পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফ্‌তের মধু অলি।
মাফ করগো রায় বাবু, দুটো সত্যি কথা বলি॥
জগা বেণে খোসামুদে, অধিক বল্‌বো কি।
তপ্ত ভাতে বেগুণ পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি॥"   ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয় দেখিবেন, এই কবিতার একস্থানে কেমন আশ্চর্য্য রহস্যের সহিত গালি প্রয়োগ করা হইয়াছে। "বেগুণ পোড়ায় লবণ দেয় না" সম্বন্ধে শুনা যায়, ভোলার দলের লোকেরা বাবুদের বাটী হইতে যে "সিধা" পাইত তাহাতে প্রায় লবণ থাকিত না। 'পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়' অর্থে মহাকৃপণ ! 'মুফতের মধু-অলি' অর্থে বিনাপয়সায় মধুমক্ষিকার ন্যায় ফুলের মধু পান !

ভোলা কবিওয়ালা যে একজন সুরসিক পুরুষ ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উপস্থিত বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। সঙ্গীত বিদ্যা কখনও ভাল করিয়া ভোলা শিখে নাই বটে, কিন্তু নূতন গানের রাগ রাগিনী একবার শুনিলেই তাহা এমন সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়া লইত যে অভ্যস্ত গায়কেরা চমৎকৃত হইয়া যাইত। কথায় কথায় গান বাঁধা, ছড়া তৈয়ার করা, ছোট ছোট কবিতা মুখে মুখে বাঁধিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ভোলার বিশেষ দক্ষতা ছিল। পাঁচজন লোক একত্রে পাইলে তাহাদিগকে না হাসাইয়া ভোলা যাইত না; প্রবাদ আছে "ভোলার মুখে সদাই হাসি।" বাস্তবিক, বঙ্গসাহিত্যের মধ্যকালে ভোলা ময়রা এ দেশে একজন গণ্য মান্য লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; বারোয়ারি, পূজার বাটী, বিবাহ ইত্যাদি স্থানে ভোলার দল না আসিলে সে স্থানের "চয়ণ" থাকিত না ! পল্লীগ্রামের রাখালের মুখে, বাবুদের কুলবধূর মুখে, পাঠশালার ছেলেদের মুখে এবং বাজারে ও দোকানে এক সময়ে ভোলা ময়রার কবি ও ছড়া শুনা যাইত। ভোলার মৃত্যুর পরে অনেক কবিওয়ালার অভ্যুদয় হইয়াছিল কিন্তু বাগবাজারের ভোলাময়রাকে কেহই জিতিতে পারে নাই। বাঙ্গলা দেশে এখন আর "কবির লড়াই" অধিক নাই, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে ভোলা ময়রার যে একটী সুদৃঢ় আসন আছে, ইহাতে সন্দেহ কি ? দুঃখের বিষয়, পুস্তকাকারে ভোলার কবিতাদি কখনও প্রকাশিত হয় নাই, অনুসন্ধানে ভোলার কবিতাদি উদ্ধার হইবে এরূপ ভরসা করা যায়।

ভোলার মৃত্যু সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। কেহ বলেন কলিকাতায়, কেহ বলেন কাশীতে, কেহ বলেন ত্রিবেণীতে ভোলার মৃত্যু হইয়াছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "খর্ম্মাতাড়া বাঙ্গালা" গৃহে একবার বলিয়াছিলেন "ভোলার বৃন্দাবনে মৃত্যু হইয়াছিল।" কথাটা ঠিক কিনা জানি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্তায় বক্তা, হুতুম পেচার ন্তায় লেখক এবং ভোলা ময়রার ন্তায় কবিওয়ালার প্রাচুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশুক।"

এই প্রস্তাব সমাপ্ত হইবার পরে, ভোলা ময়রাপ্রণীত আর একটা কবিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এ স্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।

"আমি ময়রা ভোলা,
ভিঁয়াই খোলা,
(ওগো) সর্দ্দি গর্ম্মী নাহি মানি।
ফুরাইলে বার মাস,
ষড় ঋতুর হয় নাশ,
(ওগো) কেবল এই কথাটা জানি॥
শীত এলে লেপ লই,
গর্ম্মী এলে ঘোল মই,
যাহা কিছু হাতে আসে,
"কবির নেশায়" দিই ঢালি॥
কাল মেঘে বর্ষাকালে,
বক উড়ে দলে দলে,
ময়ূরের প্যাখমে বাহার।
নহি কবি কালিদাস,
(বাগবাজারে করি বাস)
পূজো এলে পুরী মিঠাই ভাজি।
বসন্তের 'কুহ' শুনে,
(ভক্তির চন্দন সনে)
মন-ফুল রাম-চরণে করি রাজি॥
শরতে হেমন্তে,
বৈশাখে বসন্তে,
ভোলার খোলা নাহি খালি।
ষড় ঋতু বার মাসে,
পেটের দায়ে জাতির ব্যাপার।
তবে যদি কবি পাই,
হটে কভু নাহি যাই,
হোক্ ব্যাটা যতই মন্দ।
জাহাজ, ডোঙ্গা, সোলা, নাও,
তাহাতে মিলাইয়া দাও,
ভোলা নহে কিছুতেই জব্দ!"

প্রত্যাহার।

বিবেকানন্দ স্বামী যখন পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান করিতেছিলেন সেখানকার সম্বাদপত্রে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারবৃত্তান্ত পড়িয়া আমাদের দেশের লোকের মনে একটা বৃহৎ আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তিনি এ দেশে পদার্পণ করিলে বুঝি একটা নূতন ধর্ম্মযুগ উপস্থিত হইবে। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন তিনি কেশব বাবুর উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণ করিবেন, সংস্কারের উত্তালতরঙ্গ তুলিয়া আমাদের যুবকদলদের আর একবার মাতাইয়া তুলিবেন, কতিপয় বাঙ্গলা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার কবল হইতে আমাদের ছাত্রদলকে উদ্ধার করিবেন। সে আশা বিফল হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস শীঘ্রই নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল।

আমাদের অভাব অনন্ত; তাহারই গুটিকত লইয়া পূর্ব্বতন মহৎলোকেরা নাড়াচাড়া করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধির নবীনতার অভাবে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম বিবেকানন্দ স্বামীও তাঁহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য সেই একই দিকে পরিচালনা করিবেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহৎলোকেরা আমাদের জাতীয় অভাবের যে দিকটা স্পর্শ করেন নাই, সে দিকটা ভাবিবার কথা আমাদেরও মনে আসে নাই; তাই অতি সহজেই ধারণা হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দ মহাতেজস্বী মহাবাগ্মী মহাপণ্ডিত হইলেও বুঝি যথেষ্ট স্বদেশবৎসল নহেন। প্রকাশ্যে এই মত ব্যক্ত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের সহায়তা করিয়াছি, অতএব অধুনা পরিবর্ত্তিতমত প্রযুক্ত প্রকাশ্যতঃ পূর্ব্বমত প্রত্যাহার করাও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশবাৎসল্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে, অপিচ সহস্র গুণে ব্যাপক ও কার্য্যকরী তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে প্রমাণ অধুনা আমাদের পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই। তাঁহার প্রতি অযথা সন্দেহারোপ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছি তাহার সম্যক্ সংশোধনের ক্ষমতা হইতে বিবেকানন্দ স্বামী আমাদের বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহাই হউক, সন্দেহ মাত্র নাই, স্বদেশের হিতকল্পে প্রারব্ধ অনুষ্ঠানে যথাকালে যথাযথরূপে বিবেকানন্দ স্বামী স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিবেন; আমাদের অধিক বলা নিষ্ফল। কেবল তাঁহার পত্র হইতে দুই একটি স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের কৌতুহল কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্ত ও আমাদের অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব;—

"আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্য দেশে গমন অনিশ্চিত, যদি যাই তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য,—এদেশে লোক বল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্ম ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? **** পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যেরা সহায়তা না করিলে আমরা যে উঠিতে পারিব না

ইহা স্থির ধারণা। *** জাপানে শুনিয়াছিলাম যে সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে যদি ক্রীড়া পুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায় সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কথনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে আমরও বিশ্বাস যে যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগা, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারত-বাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনশীল কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।”

কিষন্ কাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র ভাদুড়ী, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং ডিপুটি কলেক্টর মহাশয়, সফর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, বাঙ্গালা দেশের সুদূরপ্রান্তসীমাবর্ত্তী কোন অপরিচিত পল্লীগ্রাম হইতে, একজন উজ্জলচক্ষু এবং শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ বালক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাহার নাম কিষন্ কাম (কৃষ্ণকান্ত ?) ঘরিয়া।

বালকটি বিশেষ বিপদে পড়িয়াই ভাদুড়ী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিল।—ইহলোকে তাহার একমাত্র অবলম্বন—একটি বুড়া বাপ্ ছিল। ঐ বুড়া লোকতঃ সকলের সমক্ষে পর-লোক যাত্রা করিবার পর, গ্রামে এইরূপ একটা বিশ্বস্ত জনশ্রুতি প্রচার হয় যে, বৃদ্ধ ঘরিয়া মহাশয় নিরতিশয় অপত্য স্নেহের দরুণ আটক্ পড়িয়া, অদ্যাপি ইহলোকে ভূতরূপে অশরীরী অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন এবং পূর্ব্ববৎ আপনার প্রিয় পুত্রটির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত আছেন। এই জনশ্রুতিবশতঃ অনাথ বালকটির গ্রামে আশ্রয় পাওয়া অতীব দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ কোন গৃহস্থ প্রতিবেশী তাহাকে আশ্রয় দিয়া অবশেষে ভূতের কোপে পড়িয়া সবংশে নিধন হইবার ইচ্ছা করিত না। অগত্যা প্রবীণ ডিপুটী বাবু ঐ নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকুমারকে চাকররূপে গ্রহণ করিয়া হেড্ কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিপন্ন হইয়া পড়িল সেই বিশালনেত্র বলিষ্ঠ বালককে ভগবান্ আদৌ ভৃত্যোচিত উপাদানে নির্ম্মাণ করেন নাই।

ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভাদুড়ী মহাশয় বহুকালাবধি ব্রাহ্মভাবাপন্ন, এবং কয়েকটি গুরুতর অন্তরায়বশতঃই অদ্যাপি দীক্ষাগ্রহণে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে তিনি একজন পরম অমায়িক এবং দয়ালু ব্যক্তি। শত্রুপক্ষীয়েরাও তাঁহার বিরুদ্ধে বড় একটা কিছু বলেন না, তবে জেলার কোন কোন কূটবুদ্ধি উকীলের মতে হাকিম বাবুর বুদ্ধিটা নাকি ভঁৈষেবচ এবং ডেপুটীবাবুরই কোর্টের কোন কোন ত্রিসন্ধ্যা সেলামকারী আমলা মহোদয়েরা বলিয়া থাকেন যে বাবু নিজে কিছু তোষামদপ্রিয় এবং সাহেবসুবা-দিগকেও যৎকিঞ্চিৎ দোষাভ্রাতরূপে তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে।

গগনচন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম যখন চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র তখন তাঁহার পিতৃদেব অকালে কালকবলে পতিত হয়েন, এবং তদবধি তাঁহার জননী পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া সাত শত টাকার ডেপুটীগিরির উপযুক্ত করিয়া দেন। এই বর্ত্তমান হিন্দুজননীই ডিপুটি বাবুর দীক্ষা গ্রহণের প্রথম এবং প্রধান অন্তরায়। কারণ গগন বাবুর

এইরূপ ধারণা যে এবম্বিধ জননীর হৃদয়ে লেশমাত্র কষ্ট দেওয়া, সর্ব্বধর্ম্মবিগর্হিত, সর্ব্বদেব-সুহৃঃসহ, ইহলোক পরলোকব্যাপী মহাপাতক। কিন্তু এতদুপলক্ষে তদীয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ ডেপুটী বাবুর নৈতিক ভীরুতার উল্লেখ করিয়া সুমহৎ আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অন্তরায়, মূর্ত্তিমতীরূপে ডেপুটিভবনেই গৃহিণীভাবে অবস্থিত। বিধাতৃসৃষ্ট বিচিত্র নারীজগতে ডেপুটী গৃহিণীর ন্যায় অত্যদ্ভুত সৃষ্টি নিতান্ত বিরল। অবনীতলে অজস্র ভাদুড়ীবংশ বৃদ্ধি করা ভিন্ন, এই মনঃস্বিনী রমণীর পৃথিবীতে অপর কি প্রয়োজন ছিল তাহা পুরাবিৎ দার্শনিকগণ অদ্যাবধি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এবং তাঁহারা সমর্থ হইলেও সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবার জন্য উক্ত গৃহিণীরত্নের যে যথেষ্ট অবসর ছিল এ কথা ত সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ, কি শীত কি গ্রীষ্ম, তাঁহাকে কেহ বেলা নয়টার পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে দেখে নাই, বেলা বারোটার পূর্ব্বে কখনই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গুল্ এবং তামাকু পোড়া চর্ব্বন করা সমাধা হইত না। তদনন্তর স্নানাদি সম্পন্নপূর্ব্বক যখন তিনি ভাত খাইয়া উঠিতেন তখন পশ্চিমে সূর্য্যদেব প্রায় ডুবু ডুবু।

ইহজীবনে ডেপুটী গৃহিণীর যে কয়টি বিশেষ কর্ম্ম ছিল তাহার মধ্যে, গুল চর্ব্বন, নিত্য পুঁতিকাশাক ভক্ষণ, ত্রয়োদশঘণ্টাব্যাপী সুনিদ্রা, এক ঘণ্টা কালব্যাপি খড়িকা খাওয়া, শীতকালে উদয়াস্ত রৌদ্র পোহান, পান্তাভাতে প্লচামাছে এবং লঙ্কার ঝালে আত্যন্তিক মনঃসংযোজন এবং বারমাস রাত্রে কাঁথা কিম্বা লেপ গায়ে দিয়া শোওয়া এই কয়টি কার্য্য অতীব আবশ্যকীয় ছিল। তথাপি সেই কটাচর্ম্মবতী এবং কটাচক্ষুষ্মতী রমণী তদীয় শ্বশুর-বাটীস্থ গ্রামে পরম ঈর্ষ্যার কারণ ছিলেন এবং বাপের বাড়ীতে মহতী বরণীয়া ছিলেন; তাহার প্রথম কারণ তিনি ডেপুটীপত্নী; দ্বিতীয় কারণ, তিনি ভর্তৃভবনকে যথাসম্ভব আলো আঁধার করিয়া প্রায় দেড় ডজন্ সন্তান সন্ততি প্রসব করিয়াছেন!

অবশ্য বুঝিতে হইবে, গৃহিণীর অনবকাশ বশতঃ ডেপুটি বাবু স্বয়ং এবং চাকর বাকরেরা ভাগাভাগি করিয়া সেই পুত্রকন্যাগুলিকে পালন করিয়া তুলিয়াছেন এবং এখনও তুলিতেছেন।

ফলকথা, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে গগনচন্দ্রের মাতা এক "পাঁটী বেচা বামুনের ঘর" হইতে উক্ত রমণীরত্নকে, সুলভ মূল্যে নগদ ৪১৲ টাকায় ক্রয় করিয়া পুত্রের সহিত শুভ উদ্বাহে চির উদ্বদ্ধ করিয়া দেন। তদবধি আজ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে, করক্ষেত্রে অজস্র অমৃতবর্ষণবৎ, গগণ বাবু এই রমণীরত্ন উদ্দেশ্যে অসংখ্য উপদেশ, উদাহরণ, ভালকথা মন্দকথা প্রভৃতি বর্ষণ করিয়া অধুনা ক্ষান্ত আছেন। কারণ অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে কোন সহজ কথাকেও উপদেশ বলিয়া ভ্রম হইলে, গৃহিণীরত্ন কটা চক্ষু বিঘূর্ণীত করিয়া এবং কটাচর্ম্মাচ্ছাদিত ও পুষ্ট শিরাঙ্কিত হস্তখানি শূন্যমার্গে উত্তোলন করিয়া ভর্তৃদেবকে বলিতেন—"আরে যা—রে মিন্‌সে।"

[illegible] প্রত্যহ বালকবালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান করা ডিপুটী বাবুর জীবনের একটি

গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। সেইজন্য, জন্ হাওয়ার্ড এবং ফ্লোরা নাইটিংগেলের উদাহরণ দ্বারা তাহাদিগকে আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিতেন। থিওডর পার্কারের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞান বুঝাইয়া দিতেন। বীরত্বে নেপোলিয়নের এবং দেশহিতৈষায় ম্যাট্‌সিনির উপদেশ দিতেন। সত্যবাদিতার গুণ বুঝাইবার সময় ওয়াসিংটন্ শিশুর কথা তুলিতেন। বীরত্ব, ধীরত্ব, উদারতা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরতা নির্ভীকতা প্রভৃতি অশেষ গুণাবলীর উদাহরণ ও উপদেশসমুদ্রে সন্তানগণকে অহর্নিশি নিমজ্জিত রাখিবেন ইহাই তাঁহার অন্তরের ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু চিররহস্যপরায়ণ স্বভাব ও সংস্কার, অতি তুচ্ছ উপলক্ষেও ব্যক্ত করিয়া দিত, ম্যালেরিয়া জীর্ণ ডেপুটী সন্তানগণ, বলিষ্ঠ সত্যকে অতি সহজে-পরিত্যাগ করিয়া, হীন চাতুরীপূর্ণ মিথ্যাকেই আশ্রয় করিতে সমধিক সুপারক। সেই ব্যর্থশাসন বাল্য-পঙ্কিলতার পার্শ্বে, বলিষ্ঠ বর্ব্বর-বালক কিষণের, সরল, নির্ভয় অশিক্ষিত সত্যপরায়ণতা, প্রাতঃস্নাত প্রভাতকুসুমের ন্যায় শোভা পাইত। নেল্‌সনের উদাহরণ দিয়া ডিপুটী বাবু আপনার সন্তানগণকে নির্ভীকতা-তথ্য শিখাইতেন, কিন্তু তাহারা একটি নিরীহ গঙ্গাফড়িঙ্ দেখিলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। কিন্তু নীতিশাস্ত্র-অপারদর্শী বালক কিষণের সরল মেরুদণ্ড কেহ সহজে নোয়াইতে পারিত না। ডেপুটী সন্তানগণ পিতৃমুখশ্রুত নিরাকার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম যত না ভয় ও বিশ্বাস করিত, পিতামহীমুখশ্রুত, শৃঙ্খলঝঙ্কৃতা করালদশনা, লোলচর্ম্মা, বিকটনেত্রা জটাইবুড়ীতে অধিক ভয় ও বিশ্বাস করিত। কিষন্‌কে কেহ কখন নিগূঢ় ভাগবততথ্যে উপদেশ দেয় নাই, কিন্তু নিখিল বিশ্বচিত্র হইতে একটি অব্যক্ত অপূর্ব্ব রহস্যময় মাধুর্য্যধারা নামিয়া আসিয়া সেই অশিক্ষিত বালককে অভিষিক্ত করিয়া দিত। সেই জন্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের সময়ও কখন কখন তাহাকে একাকী, নিভৃত নদীতটে অথবা সুবিস্তৃত তরুচ্ছায়ে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। সে যেন জানিত সুবিস্তীর্ণ ছায়ালোক-উদ্ভাসিত স্তব্ধ দিগন্তের সহিত তাহার বিকাশোন্মুখ শূন্য হৃদয়ের কি একটা বিস্মৃতপ্রায় জন্মান্তর সৌহার্দ্য ছিল। ডেপুটী বাবুর দয়ার অবধি নাই; তিনি কিষনকে চাকরের কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া লইয়া আপনার পুত্র কন্যার সহিত পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ডেপুটী বাবুর নবম সন্ততি শ্রীমতী প্রার্থনাসুন্দরী দেবী; বয়ঃক্রম প্রায় নয় বৎসর। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শ্রীমতী শান্তি দেবী। শান্তির নাম অন্বর্থ নহে সে নিতান্ত প্রখরা—এবং আব্‌দার, রাগ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কার্য্যে সবিশেষ পক্ক। দুই ভগ্নীর বয়ঃক্রমের মধ্যে প্রায় দুই বৎসরের ব্যবধান।

কিষন্ দুই মাসের মধ্যে পড়ায় ছোটবোন্ প্রার্থনার লাগ্ ধরিল এবং আর একমাসে বড়বোন্ শান্তির সঙ্গে, এক সঙ্গে পড়া লইতে লাগিল। তখন তাহার পড়ার এক মহৎ অন্তরায় উপস্থিত হইল। ডেপুটী-কন্যা কিছুতেই "চাকর-ছোঁড়াকে" পাঠে আপনার অগ্রসর হইতে দিবে না? এবং ৫৲ টাকা মাহিনার সুলভ প্রাইভেট টিউটর মহাশয় প্রভু-কন্যার

অমতে ভৃত্য-বালককে পড়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় ডিপুটী বাবু স্বয়ং জ্যেষ্ঠকন্যার পঠনা ভার লইলেন। সেই জন্য কেবল কিষন্ এবং ছোট বোন্ প্রার্থনা দুইজনে, মাষ্টারের কাছে পড়িতে লাগিল।

প্রার্থনাটা অসম্ভব রকমের বোকা সেই জন্য পড়ায় ভারি গোলমাল করিয়া ফেলিত। [illegible] কে, [illegible] যাকে "ষাঁড়ের গন্ধ" বলে, সেখানটায় মাষ্টার পড়াইলেন "It is an ox— ইহা হয় এক ষাঁড় [illegible] y ইহা হয় শুকনো।" দু চারবার পড়া বলিয়া দিয়া, ঘড়িধরা মাষ্টার হুক্কা [illegible] কখানি বাঙলা নভেল বাহির করিয়া, পাতমোড়া স্থানটি হইতে আরম্ভ করিয়া [illegible] প্রণয় কাহিনীতে মনোনিবেশ করিতেন— [illegible] —"নে নে, পড়্ পড়্, [illegible] সময় [illegible] মাকালের একশেষ হইত।

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করি[illegible]" প্রার্থনা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে [illegible] এক শুকনা ষাঁড়!" বেচারীর মনের মধ্যে [illegible] এবং [illegible] "মাষ্টার" [illegible] গোলমাল [illegible] —

শুনিয়া মাষ্টার হুঙ্কারিয়া উঠিলেন—"ষ্টুপীড্।" প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া কৈ কার্য্য কিষন্ আস্তে আস্তে প্রকৃত মানেটা তাহাকে বুঝাইয়া দিত। মানে যে বুঝিতে পারে খণ্ডর- তাহার মনের অবস্থা তেমন নহে—কিন্তু ভৃত্য-বালকের সকরুণ সমবেদনায় তাহার চোখ দিয়া আরো খানিকটা জল বাহির হইয়া যাইত। সে সহস্রবার মনে মানিয়া লইত তাহার অপেক্ষা কিষন্ সকল বিষয়ে নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ।

যাহা হউক, নানা কারণে, পড়িবার সময় প্রায় প্রতি নিয়তই, সেই নির্ব্বোধ বালিকার মুখখানি শ্লেমাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া উঠিত। কিষন্‌ও প্রতিনিয়ত, মাষ্টার চলিয়া যাইবার পর, আশ্বাস বচনে ও সস্নেহ হস্তে সেই মুখখানিকে পুঁছিয়া আবার শুষ্ক করিয়া দিত। কিন্তু কারণে এবং অকারণে জ্যেষ্ঠাভগ্নী শান্তি কিষনের সঙ্গে ঝগড়া করিবার চেষ্টা পাইত। পিতা গগনচন্দ্র এতদুপলক্ষে সক্রেটীসের স্ত্রীর উদাহরণ দিয়া কলহ-প্রবৃত্তির নীচাশয়তা বুঝাইয়া দিতেন। ততক্ষণ শান্তি পিতৃসমীপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত যে কিষনের সহিত কলহের বিষয়ে সে সম্পূর্ণ, নির্দ্দোষ। অগত্যা ডিপুটী বাবুর কলহ সম্বন্ধীয় জেনেরাল প্রিন্সিপ্যালটা মাঠে মারা পড়িত। কিন্তু ছোট বোন্ প্রার্থনা; কখন কখন বিরলে ভিখারীর ন্যায় সকাতর কণ্ঠে, বড় বোনকে বলিত—"দিদি, ওকে ক্যা—ন অমন করিস্।"

মেয়েটার স্বভাব সকল কথাতেই চোখ ছলছল করা। তাই তাহার নিরাশ্রয় নির্ব্বোধতাজ্ঞাপক বড় বড় চক্ষু দুইটি বহিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িত, এবং কাণ দুইটা সম্পূর্ণ লাল হইয়া উঠিত। এইরূপে চারি বৎসর কাটিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মাবকাশে ছেলেমেয়েরা পিতামহী অধিষ্ঠিত পুরাতন পৈতৃক বাটিতে আসিয়াছে। ডিপুটী বাবু স্বস্থানে হাকিমি করিতেছেন।

বহু দিনের বাদলার পর যেমন সূর্য্য কিরণ হঠাৎ নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়,—তেমনি বহুমাসব্যাপী নিরানন্দ লেখাপড়া, সুকঠিন নীতিশাস্ত্র, এবং চাকর, আরদালি ও চাপরাশির অবিচ্ছিন্ন পাহারাপীড়িত ডিপুটীবংশ, হঠাৎ গ্রামের মধ্যে উদ্দামমুক্তি লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি অধৃষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঘাগ্‌রা, গাউন, সেমিজ্‌, কামিজ, ইজের [illegible] নিকর্‌বকর প্রভৃতি স্তূপীকৃত বস্ত্রাবরণের মধ্য হইতে একটী উলঙ্গপ্রায় অবাধ্য বাল চরিত্র, জ্যৈষ্ঠমাসের খরতর রৌদ্রে [illegible] উঠিয়াছিল তাই, নিশীথ-[illegible], বিজন পুকুরপাড়ে, কোন ডেপুটী-[illegible] পুকুর [illegible] একটি কাচা আম ভিক্ষা করিতে দেখা যা[illegible] সময় [illegible] চাকুরী হস্তে বঁশঝাড়ে কঞ্চি কাটিতে ব্যস্ত থাকিত। ডিপুটী বাবুর ত্রয়োদশতম সন্ততি—শ্রীমতী সত্য সুন্দরী, ঘোষকন্যা চারীর সঙ্গে রাঁধা বাড়া খেলায় এমনি মত্ত যে সর্ব্বাপেক্ষা যে দুইটি আবশ্যকীয় কর্ম্ম—সময়ে খাওয়া, এবং কদাপি না[illegible] না থাকা—তাহাও সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। নীতিশাস্ত্রেরও যৎপ[illegible] দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে কারণ যখন তাহারা, চারীর ভায়ের সঙ্গে, খ্যাংরার কাটিতে স[illegible] কালকাসিন্দা বনে পরমাহ্লাদে ফড়িঙ ধরিয়া বেড়াইত, এবং তৎপরে উক্ত নিরীহ পতঙ্গের ডানা কাটিয়া এবং ল্যাজে দড়ি বাঁধিয়া পোষমানাইবার চেষ্টা করিত, তখন তাহাদের মন হইতে, ভেকবধোন্মুখ পার্কারের শিশুর কথা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যাইত।

কিষনও সেখানে ছিল—তাহার লেখাপড়া হয় নাই। স্কুলে ঢুকিয়া অবগত হইয়াছিল, সে অঙ্কশাস্ত্রে ভারি কাঁচা। দুই তিন বৎসর চেষ্টা করিয়াও সেই কাঁচা ভাব পাকাইতে পারিল না। অগত্যা স্কুল ছাড়িতে হইল। ইংরাজি যাহা শিখিয়াছিল তাহাতে তাহার অতৃপ্ততৃষ্ণা মিটিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তবু কি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণপ্রভাবে, গগন বাবুর পূর্ব্বাধীত ইংরাজি গল্প এবং কবিতার বহিগুলি, আলমারি হইতে পাড়িয়া প্রত্যহ পড়িতে চেষ্টা করিত, সব বুঝিত না—যা বুঝিত তাহাও আবছায়া আবছায়া। কিন্তু কে বলিতে পারে সেই উজ্জ্বলনেত্র সাগ্রহ তরুণের, ত্রোটিতবন্ধ দুর্দ্দম কল্পনা পদে পদে শত বাধায় বিক্ষিপ্ত হইয়াও, কোন দিন কোন প্রতীচ্য কবির কোন অজয় কাব্যের অক্ষয় ভাবমূলে চুম্বন করে নাই?—কোন অস্পষ্টোপলব্ধ বৈদেশিক চিত্রের কল্পনোজ্জ্বল ভাবতরঙ্গ, সেই কিশোরের বুকের মধ্যে অদ্ভুত কিরণে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই? কিষনের কথা গুলা কেমন

বাঁকা বাঁকা, সেই জন্য তাহাকে ঠাট্টা করিয়া আমোদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা, সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে ছিল। দৃপ্ত বালক তাহা সহ্য করিতে পারিত না। সেই জন্য প্রায় চুপ করিয়া থাকিত, এবং বড় কাহারো সঙ্গে মিশিত না।

কখন কখন তপ্ত মধ্যাহ্ন, নিষ্কম্প বনরাজিনিঃসৃত চাতকের মর্ম্মভেদী দীর্ঘিকৃত শব্দলহরী একাকী কিষনের কানে আসিয়া লাগিলে, মনটা তাহার, বড় এক রকম কেমন করিয়া উঠিত। তাহাতে তাহার একটা অব্যক্ত রহস্য-চঞ্চল কৌতুহল যেন বুক হইতে উঠিয়া ঠোঁট অবধি ঠেলিয়া আসিত, কিন্তু ব্যক্ত হইত না। যখন আবার অনপেক্ষিত পবন হিল্লোলে মাথার উপরকার রৌদ্রক্লিষ্ট গাছপালাগুলা একবারে ঝর্‌ঝর্ শব্দে নাচিয়া উঠিত—তখন তাহার বেশ স্পষ্ট বোধ হইত যে নীলনভোমণ্ডল দিয়া একটা যোজনব্যাপী রুদ্ধ হাহাকার শব্দ বহিয়া যাইতেছে—তাহারই দুই একটা তরঙ্গ গাছে পালায় লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। প্রভাতের পতত্রীনিনাদিত প্রফুল্লতার মধ্য দিয়া, ঋভুলোকের ঐক্যতান সংযুক্ত একটা উজ্জ্বল হর্ষবারতা তাহার প্রাণের নিকট পর্য্যন্ত যেন পৌঁছিত। আবার সন্ধ্যা বেলায় ম্রিয়মান আলোতে, ধুসর বর্ণের আকাশ এবং কৃষ্ণ বর্ণের বনান্তের মধ্যে মিশাইয়া গিয়া কে যেন একজন অন্ধকারের অনুচর কিসের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে বলিয়া, তাহার ভারি সন্দেহ হইত। এই সকল অর্দ্ধবোধিত অস্পষ্ট রহস্যে তাহার মন তোলপাড় হইয়া উঠিত, এবং শিরায় শিরায় একটা বিফল রহস্যময় কৌতুহল সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করিয়া দিত।

আধুনিক দেশাচার মতে প্রার্থনার বিবাহকাল উপস্থিত। ইংরাজিতে সে যদিও বড় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু বাঙ্গালায় সে যে বিদ্যালাভ করিয়াছে তাহাতে নভেল সকল বেশ বুঝিতে পারে, এবং লেখকনির্ব্বিশেষে যাবতীয় নভেলই পড়িয়া থাকে। এ সকল নভেলের নজীর অনুযায়ী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে কিষন্‌কে না পাইলে নিশ্চয় সে মরিয়া যাইবে। এইরূপ সিদ্ধান্তের পর, পরিচিত নায়িকাকুলের দৃষ্টান্ত অনুসারে, সে তাহাকে মনে মনে যথারীতি শুদ্ধ বাঙ্গলায়, আত্মসমর্পণ করিয়াছে। নায়িকার অপরাপর লক্ষণও মনে মনে সাধিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ নীলাকাশের দিকে, ঠিক বিরহিণী নায়িকার ন্যায়ই চাহিয়া থাকিত। পুকুর ঘাটে, প্রকৃত হেমাঙ্গিনী, কমলিনী অথবা বিন্ধ্যবাসিনীর ন্যায় কালজলের দিকে চাহিয়া দেখিত এবং আকাশের তারা গুণিত। কিন্তু নায়িকা সকলের দুপুর রাত্রে ছদ্মবেশে পলায়নব্যাপারটা বড় পছন্দ করিত না এবং তাহার আশাও রাখিত না। কিন্তু, এইরূপে আত্মপ্রতারিত বালিকা, নিজের প্রণয় ব্যাপার কাহাকেও বলিতে সাহসী হইত না—কি জানি সে যদি শুনিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠে, এবং বাড়ী শুদ্ধ সকলকে শুনাইয়া দিয়া তদ্রূপ হাসাইয়া দেয়।

নির্ব্বোধ বালিকাটার মনে এমনি একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, যে সে কোন কাজ বড় যত্নেই করুক না কেন তাহার মধ্যে এমনি একটা অজ্ঞাত ছিদ্র থাকিবে, যে সেইখান

দিয়া পৃথিবীর তাবৎ চতুর মনুষ্যেরা হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া তাহার দুশ্চিকিৎস্য বোকামি রোগের প্রতি উপহাস করিতে পারে।

সে একদিন ভাবিল পৃথিবীর সমস্ত নায়িকারাইত স্ব স্ব প্রেমিককে পত্র লেখে—আমিও লিখি না কেন? অতএব সে 'প্রাণের কিষন্' এইরূপে আরম্ভ করিয়া—ভালবাসা, বেদন মরুভূমি, জীবন-মরীচিকা, নীলাকাশ, সন্ধ্যাতারা, নদীতট, জ্যোৎস্না, সাগরোর্ম্মি, বাপীতট, হিমালয় গিরি, মলয়সমীরণ, রজনীগন্ধা ফুল, বিহগ কূজন, অশ্রুজল এবং হতভাগিনী চির-দুঃখিনী, প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ, নভেলের পারিভাষিক শব্দ দ্বারা একখানি চিঠি লিখিল। কিন্তু প্রণয়ীকে পত্রখানি দিতে ভরসা করিল না; কি জানি, সেও যদি হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠে। অগত্যা দুক্‌ফাঁক করিয়া চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

দৈবের কলহাওয়ায় নড়ে—ছেঁড়া চিঠির একখণ্ড একদিন বড় বোন্ শান্তির হাতে পড়িল। ইহা চাকর ছোঁড়ার স্পর্দ্ধা ভাবিয়া সে মনে মনে গর্জ্জিয়া উঠিল। প্রতিজ্ঞা করিল সম্মার্জ্জনীর ভূমিকা দ্বারা আরম্ভ করিয়া, সকলের সমক্ষে ছোঁড়ার দুর্ভরসা প্রচার করিয়া দিবে। কিন্তু ভূমিকাতেই উপসংহার করিতে হইল। সম্মার্জ্জনী তুলিবামাত্র দৃপ্ত তেজস্বী বালক শান্তিকে নিদারুণ চপেটাঘাতে ভূমিশায়ী করিয়া, চিরজন্মের মত গগনবাবুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুদূর পশ্চিমে, এক নিভৃত পর্ব্বতের উপর জুয়ান নামক এক জাতীয় ভীলের বাস। সেই বলিষ্ঠ পর্ব্বতবাসিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যেরূপ অক্ষুন্ন প্রকৃতির রাজত্বের মধ্যে বাস করিত, আজ বহু শতাব্দী পরেও তাহারা তেমনি বাস করিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে, সেই পুরাতন শ্যামল ভূখণ্ড, পরম্পরাগত একটি অখ্যাত মানববংশের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া, চতুর্দ্দিক-পরিবেষ্টিত চঞ্চল স্রোতের মধ্যে অচল দ্বীপের ন্যায় নিভৃতে অবস্থান করিতেছে। সেই নীলিমাচ্ছন্ন অধিত্যকাভূমে জগতনাটকের কি এক ক্ষুদ্র আশ্চর্য্যময় গর্ভাঙ্ক অভিনীত হয় তাহা জগদ্বাসীদিগের সম্পূর্ণ অবিদিত।

দূরব্যাপী মেঘমালানিম্নে তাহাদের অস্ফুট কল্পনা প্রকৃতির কোনও দুরবগাহ রহস্যের মধ্যে প্রসূত হইয়া, যে সকল ভনিতা ও কাহিনী বিরচণ করিয়াছিল, তাহারই সহিত স্ব স্ব জীবন সংযুক্ত করিয়া দিয়া সেই বনসন্তানগণ আপনাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের, ক্ষুদ্রতম সুখ দুঃখকে ঘিরিয়া কত দেবতা এবং অপদেবতা, কত বিচিত্র যক্ষরক্ষ কিন্নর বসবাস করিয়া থাকে।

কিষন্ কাম, ডিপুটীতনয়ার গণ্ডস্থলে চপেটাঘাত করিয়া, পদব্রজে, বাল্যস্মৃতিমণ্ডিত জন্মভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। বহু কষ্টে সারা পথ অতিবাহন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে, গ্রামের মাতব্বর মোড়লেরা একবার বলিলেন সে 'খ্রীইস্তান,' তাহার জাতি নাই। কিষন্

সকলের সমক্ষে, এই সকল বিজ্ঞ প্রবীণদিগের উদ্দেশ্যে ভূমে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নীল পাদপাচ্ছাদিত গিরি উপত্যকায় উক্ত ভীলদিগের মধ্যে আশ্রয় লইল।

তাহারা আগন্তুককে আপনাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এক ভীলকন্যার সহিত বিবাহ দিল, এবং পরে তাহাকে দেবতার সিংহাসনে বসাইয়া "তরুতলে" আপনাদের রাজ্যেশ্বর করিয়া লইল। কিষনের দুই এক সন্তান সন্ততিও হইল।

ভীলদিগের সঙ্গে সেও ভীলই হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নীহারপ্রচ্ছন্ন বর্ত্তমানের মধ্যে তাহার উত্তপ্ত পূর্ব্বস্মৃতি সমস্ত তাপ বিকীর্ণ করিয়া দিল। স্মৃতি শরীরের এক অবয়ব হইতে অন্য অবয়ব বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। সেই জন্য সেই স্বপ্নপ্রবণ যুবকটির কাছে, ভূতপূর্ব্ব শষ্পশ্যামল নিদাঘতপ্ত সমতল বঙ্গভূমি, কখন কখন ক্রমলীন ছায়ারাজ্য বলিয়া মনে হইত; এবং বোধ হইত সেই ছায়া রাজ্যের মধ্যে কোথায় একটা উজ্জ্বল উদ্দীপনা যেন নৃত্যপ্রবণ বহ্নি শিখাসম জ্বলিতেছে।

ভীল-শাস্ত্রে অগণন ভূত প্রেত যক্ষ-রক্ষঃ কিন্নরের তথ্য নিরূপিত আছে। ভীলজীবনকে এই ভূতপ্রেতসঙ্কুল সংসারের মধ্য দিয়া চালনা করাই প্রৌঢ় ভীল সামাজিকবর্গের কঠিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। সংসারের তাবৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভীষিকার পশ্চাতে ভীলকল্পনা পরোক্ষ রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল, তাহারই মধ্যে বংশপরম্পরা বহুকাল হইতে সভয়ে বিচরণ করিতেছে। ভূত ঢের,—জিলুয়া, ফলুই ইত্যাদি। কাঠ কাটিতে কাটিতে, গাছ হইতে পড়িয়া গেলে, জিলুয়া ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। ফলুইএর ক্রোধেই মৃত্যু হয়। আর এক প্রকার শুভকর দেবতা আছেন—কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় কিছু কম। তাঁহাদেরই মধ্যে একজন দয়া করিয়া বনের বাঘ মারিয়া দেন। একজন চোরের অশেষ শাস্তি দেন।

কিষিয়া (কিষনের ভীলনাম) এই ভূতপ্রেতসঙ্কুল, এবং প্রসন্নদেবতাবিরল ভীলজগতে বাস করিয়া, শীঘ্রই একদল নূতন দেবতার আবিষ্কর্ত্তা হইয়া উঠিল। সেই সকল দেবতার অদৃশ্য সন্নিধিকে পরিবেষ্টন করিয়া, হয় ত এই মুহূর্ত্তেই, দলে দলে ভীলযুবক "হৈ হৈ চিল্‌লো হো" শব্দে কোন নিভৃত বনস্থলী কম্পিত করিয়া, অস্ফুট, অপটু, অবদ্ধ ভাষায় এক আনন্দময়ীর অঙ্গহীন বিধিহীন ও ব্যবস্থাহীন উপাসনা করিতেছে।

কিষিয়ার দেবতারা নরভাগ্যের সহিত নির্লিপ্ত। আমাদের হাহাকার অথবা হাস্যরোল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। তাঁহারা আপনারাই আপনাদের জন্য অমৃতরাশি মন্থন করিয়া আপনারাই পান করিয়া ফেলেন, দীন মর্ত্ত্যবাসী তাহার সংবাদও পায় না।

সে বলিত—যদি কেহ সেই সকল দেবতার নৃত্যগীত শুনিতে চাও, তবে পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল বিভাবরীতে, উপলমর্ম্মরিত, বিশীর্ণ নির্ঝরিণীর পার্শ্বে গোপনে লুকাইয়া থাকিও। দেখিবে উপরকার লতাকুঞ্জমণ্ডিত প্রস্থের মধ্যে চন্দ্রালোকে দুই একটা পাতা দৈবাৎ কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভিতরে যে সকল ক্ষুদ্র দেবতারা নাচিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের ক্ষিপ্র

অঙ্গসঞ্চালনই এইরূপ কাঁপিবার হেতু। বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিও—শুনিতে পাইবে নির্ঝরের ঝরঝর শব্দের সঙ্গে, কাহাদের কণ্ঠের আভাস, একবার যেন পাওয়া যায়, একবার যেন যায় না। কিন্তু অত্যল্প চীৎকার শব্দেই সে সঙ্গীতপুরী নিমেষে ভাঙ্গিয়া যায়; বন-পর্ব্বতকুঞ্জের মধ্য হইতে একটা রুদ্ধ সৌগন্ধ বাহির হইয়া পড়ে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতজাত বৃক্ষের নিবিড় শ্যামল পত্রিকার মধ্যে যে এক একটা ধবল পত্র আছে সেগুলা কাঁপিয়া উঠে, একটা কেমন যেন বাতাস বহার মত অশ্রুত প্রায় হুহু শব্দ হয়;—দেবতারা সরিয়া যান।

একদিন একজন ভীল যুবক বলিল, "হে কিষমা, কাল যখন গরু ছাড়িয়া দিয়া বাঁশি বাজাই, তখন বড় গাছটার উপর একটা পরগাছা আপনা আপনি দুলিতে লাগিল। বাঁশীর আওয়াজে কে যেন গাছের উপর ঘুম থেকে জাগিয়া উঠিয়া, আঙ্গুল নাড়িতেছিল। আমার বড় ভয় লাগলো।"

অন্ধকারপ্রায় স্মৃতিতল ভেদ করিয়া, কিষনের একটা শব্দ মুখে উঠিয়া আসিল—হ্যামাড্রাইড্ কিন্তু সেই শব্দের সঙ্গে কোথাকার কোন্ কবির কি কাহিনী জড়িত ছিল, তাহা মনে আসিতে আসিতে অর্দ্ধপথে মিলাইয়া গেল।

পরে এক দিন দ্বিপ্রহরে বার চৌদ্দ জন ভীল যুবক "হামা প্রিয়া" (spiritকে) গান শুনাইতে গেল। সেই সমুচ্চ শাখাবিরল প্রাচীন বনস্পতিতলে দুই দল মুখামুখি বসিলঃ—একদল গায়ক, একদল বাংশিক।

গায়ক দল "হে হৈ চিল্‌লো হো" শব্দে আরম্ভ করিয়া এক চরণ গাহিয়া থামিল।

বাংশিক দল সেই চরণ বংশীতে প্রতিধ্বনিত করিল। গায়কেরা আবার গাহিল বাংশিক দল আবার বাজাইল। এইরূপ অনেকক্ষণ হইল।

তাহাদের বিশ্বাস, ইহাতে, বৃক্ষোপরি একটি অলক্ষ্যশরীরা ক্ষুদ্রশক্তি বনদেবতা পরম আহ্লাদিত হইতেছেন। এইরূপে তাহাদের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে কিষনকামের প্রভাময় রক্তনেত্র জ্বলিয়া উঠিত।

একদিন দুইচারিজন যুবক গাছের উপর লক্‌ড়ি ভাঙ্গিবার সময় শুনিতে পাইল নিকটস্থ গিরিগহ্বরে চমৎকার আওয়াজ উঠিয়াছে। লতাগুল্মের মধ্যে সমস্ত শরীরটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, দু একটা হরিণশিশু উৎকর্ণ হইয়া গুহাদ্বারসন্নিকটে দাড়াইয়া রহিয়াছে দেখা গেল, তাহারা নামিয়া কিষিয়াকে সংবাদ দিল। কিষিয়া বলিল ও দেবসঙ্গীত।

কৌতুহল বশে, তাহারা কিষিয়াকে আগে করিয়া গহ্বরের দিকে যাইতে লাগিল। তাহা-দের সাড়া পাইতে না পাইতেই, মৃগশাবকদিগের শিহরিত কর্ণগুলি নিবিড় পল্লবের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেবসঙ্গীতও বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল।

গহ্বরের মধ্য হইতে মিষ্টার্ টি, পি, শ, মহাশয় ক্ল্যারিওনেট্ হস্তে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার পার্শ্বে যে রমণী ছিল তাহার নাম শ্রীমতী প্রার্থনা সুন্দরী শ (সাহা)। শ মহাশয় এই অঞ্চলে সেন্‌সস্ অর্থাৎ লোকগুনতি কার্য্যে আসিয়াছেন। তাঁহার পত্নীও পর্ব্বতদৃশ্য দেখিবার

জন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহারা বংশী হস্তে 'নির্জ্জন ভ্রমন' করিতেছেন—লোকজন সন্নিকটেই আছে।

প্রার্থনাকে দর্শনমাত্র কিষন মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহার সঙ্গীরা তাহাকে তুলিয়া লইয়া সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল।

মূর্চ্ছান্তে কিষন্ স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না।

অদ্যাপি তাহার সঙ্গীরা তাহাকে বনে বনে "হৈ হৈ" শব্দে ডাকিয়া বেড়ায়। কেবল একটা সাড়া পাওয়া যায় "এই এই", কিন্তু কোন মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সমাপ্ত।

নক্ষত্রের ক্ষমতা।

"অনন্ত আকাশের রাশির সহিত পৃথিবীর অগণ্য মানবের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা" এই মহাপ্রশ্ন বহুদিন হইল একবার উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উঠিয়াছিল। প্রত্ন-তত্ত্ববিদ মৃত মহাত্মা আনন্দরাম বড়ুয়া লিখিয়াছেন, এই সভায় ভোজরাজা উপস্থিত থাকিয়া মানবের ভাগ্যের উপরে নক্ষত্রের অসাধারণ ক্ষমতার কথা প্রভূত বাগ্মিতা ও যুক্তির সহিত প্রতিপন্ন করেন। (১) কিন্তু এই ভোজরাজা কে, তাহার মীমাংসা হওয়া দুষ্কর ; ইনি যদি জ্যোতিষ শাস্ত্রবিশারদ শ্রীহর্ষভোজ হয়েন তাহা হইলে ইহাঁর অভিমতি অবশ্য বিচারযোগ্য কেননা ইউরোপীয় পণ্ডিত কেপ্‌লারের ন্যায় বহুবর্ষকাল পর্য্যন্ত ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা তিন জন ভোজের নাম প্রাপ্ত হই, এতন্মধ্যে ধারানগরাধিপতি রাজা ভোজই অধিকতম প্রসিদ্ধ। ধারানগরের বর্ণনা করিতে করিতে কালিদাস লিখিয়াছেন "অথ ধারানগরে কোপি মূর্খো ন নিবসতি," অন্যস্থলে ধারা বা ধারাবার নগরের বিশেষণ স্থলে "শ্রীবিশালা" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিশালা নামে একটি প্রসিদ্ধা নগরীও ছিল, ইহা 'অমরাবতী' পুরীর অন্তর্গত। (২) অমরাবতী শব্দে সংস্কৃতে নানাস্থান বুঝা যায় ; ইন্দ্রের অপ্সরাপরিবৃতা মহাশোভাময়ী নগরীর নাম অমরাবতী, মধ্যদেশের প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের (নাগপুরের নিকট) রাজধানীর অপর নাম অমরাবতী, ইহা এখনও বর্ত্তমানা ; রাজপুতানার আবু

(১) The Raja (Bhoje) joined at issue with them, * * * but on the fourth day he believed and believed with all his heart"—A. M. Barua's Discourse on Bhoje.

(২) Indian Geological Survey. Vol. XII., ch. VI.

পর্ব্বতের নিকট প্রমারকুলসম্ভূত হিন্দুবীরেরা যখন বৌদ্ধ শ্রাবক ও শ্রমণদিগকে নির্য্যাতন করেন, তখন "শ্রমণেরা রাজস্থানের অমরাবতী নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন" বলিয়া কথিত আছে।(৩) মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীর অপর নাম অমরাবতী লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্যও এই নামে উজ্জয়িনীকে অভিহিতা করিতেন। প্রবাদ বাক্যে; প্রাচীন শ্লোকে উদ্ভট কবিতায় এবং মধ্যভারতে উজ্জয়িনী এখনও অমরাবতী নামে পরিচিতা।* সুতরাং কোন্ অমরাবতী বা কোন্ ধারা নগরীর রাজা ভোজ বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত থাকিয়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহার সরল মীমাংসা হওয়া সহজ নহে, এজন্য ভোজের অভিমতি সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ না করাই ভাল; কিন্তু একথা বলিয়া রাখা উচিত পণ্ডিতপ্রবর মিহির "নবরত্ন সভায় ভোজের পক্ষ সমর্থন করেন।" (৪) তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মানব জীবনের উন্নতি ও অনুন্নতির সহিত নক্ষত্রমণ্ডলের সম্বন্ধ আছে, একথা মিহির স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু মিহিরের সপ্তশত দ্বাবিংশ শ্লোকের মধ্যে কোথাও একথা লেখা নাই। একটি মাত্র শ্লোকে মিহির লিখিয়াছেন "এই সকল নক্ষত্র মহারোগের পরিচায়ক, * * * ধ্রুব নক্ষত্রের স্থানভ্রষ্টতা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে হইবে এবং চন্দ্রের ষষ্ঠকলা যদি বিশাখার ৩৫ অনুপাতের সমান্তরালে হীন প্রভঃ হইয়া যায় তাহা হইলে ৩৮ পদাঙ্কের উপনয় রেখায় মহাশনির প্রভুত্ব বিস্তার হইয়া ৩৯ অথবা ৪০ অনুপাতের প্রারম্ভ কালে মহাবাত্যার সূচনা হইয়া থাকে।" ইহাতে মানব ভাগ্যের সহিত নক্ষত্রের অধিকার বুঝাইতেছে না বরং কোন অদ্ভুত নাক্ষত্রিক সমাবেশের পঞ্চভূতের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীস দেশীয় নরপতি ফিলো রাজার রাজত্ব কালে তাঁহার "শতরত্ন" (Centerii) সভায় এই প্রশ্ন আর একবার উত্থিত হইয়াছিল। ফিলো রাজা মহাপণ্ডিত ও মহাবিদ্যোৎসাহী বলিয়া বিখ্যাত, ইঁহার নামানুসারে Philosophy (ফিলসফি) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মিথিলার রাজকুল-তিলক জনকের ন্যায় ইনি রাজদণ্ড ধারণ করিয়াও মহাযোগী ছিলেন, ইঁহার সভায় একশত সভ্য ছিল, এই সকল সভ্যমহোদয় আর্ম্মেনিয়া, পালেষ্টাইণ, সামেরিয়া পারস্য, আরব্য, চীন এবং হিন্দুস্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। কথিত আছে, "শতরত্ন" সভা স্থির করিয়াছিলেন যে, মানবের ভাগ্যের সহিত আকাশের নক্ষত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। (৫) কিন্তু আকাশের সহিত পৃথিবীর জীবের কি প্রকারে সম্বন্ধ সৃজিত হইয়াছে ফিলো তাহা বলিয়া দেন নাই, শতরত্নের বিবরণও আমরা সম্পূর্ণ ভাবে পাই নাই। গ্রীসে

(৩) Annals and antiquities of Rajasthan. By Todd.

* উজ্জয়িনীর অপর নাম "মায়া পুরী"।

(৪) Hindu Astronomy. Rev. E. G. Games. Intro. XIV. (Trubner & Co.)

(৫) "The stars govern the destinies of mankind was the good Philo's conclusion * * * and the Centerii subscribed to it."—History of Greece by Guike. Vol. I. PP. 203—207.

অতি পুরাকাল হইতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে, এখনও (খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে) সে বিশ্বাস কমে নাই। ইথিয়োপিয়ার পণ্ডিত সমেরিশ সর্ব্ব প্রথমে বলিয়া ছিলেন "The Man in the moon" আমাদের ভাগ্যের স্রষ্টা, সেই অবধি Man in the moon একটা প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সুইডেনবার্গ এইমত খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন "Man is the creature of his own circumstauces" ** the constitution of thius is the chance, ** there is no such thivg as fote" "অর্থাৎ অদৃষ্ট বা ভাগ্য কিছুই নয়, মনুষ্য সাময়িক অবস্থানুসারে সুবিধা অসুবিধা ভোগ করে।"

অনেক দিন হইল, বোগ্‌দাদের হারুণ রসিদের সভায় এই মহাপ্রশ্নের ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। এই প্রখ্যাতা বিচারসভায় রামচন্দ্র নামে এক সদ্বিদ্বান হিন্দু (ব্রাহ্মণ) উপস্থিত ছিলেন। আমরা এক প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে এই বিচারসভার এক মৌলিক বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠকেরা রামচন্দ্রের বক্তৃতা পাঠ করিয়া দেখিবেন, কেমন গম্ভীর যুক্তির সহিত ইংরাজীভাষায় অনভিজ্ঞ প্রাচীন হিন্দু (রামচন্দ্র) কবি ও শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের অভিমতি খণ্ডন করিতেছেন। * রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"জড়ের সহিত চেতনের বা চেতনের সহিত জড়ের সম্বন্ধ অনেক স্থলে ঘনিষ্ঠ এ কথা স্বীকার করা যায় ; জড় হইতে চেতন সম্পূর্ণ পৃথক.ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় জড় না থাকিলে চেতনেব চৈতন্য থাকিত না, চেতন না থাকিলে জড়ের গুণ প্রকাশ পাইত না। জড় সততই জড়, চেতন সততই চেতন ; উভয়ের গুণ, প্রকৃতি, ধর্ম্ম ও শক্তি স্বতন্ত্র হইলেও জড় এবং চেতন একত্রে কার্য্য করে। আত্মা জড় বা চেতন এতদুভয়ের অন্তর্গত নহে, ইহা এতদুভয় হইতেই পৃথক। 'কর্ম্ম' জড়, কর্ম্ম জড় হইলেও ইহার কুফল সুফল আছে, কিন্তু ফলদাতা কে ? জড়ের সহিত চেতনের সম্বন্ধ থাকিলেও, জড় কখন চেতনের কার্য্য করিতে পারে না। কর্ম্ম জড় হইয়া কেমনে ফলদাতা হইতে পারে ? যখন কর্ম্মের চৈতন্য নাই তখন স্বীকাব করিতে হইবে কর্ম্ম স্বয়ং ফলদাতা হইতে পারে না ; কর্ম্মজ বা কর্ম্মপ্রসূত ফলের দাতায় চৈতন্য আছে নতুবা 'দাতা' শব্দ ব্যবহার হওয়া অপ্রাসঙ্গিক। ইহাতে বোধ হইতেছে, এক ফলদাতা আছেন, যাঁহাকে সর্ব্বকুশলাকর পরমেশ্বর নামে আখ্যাত করা যায়। এই পরমেশ্বর আমাদের স্রষ্টা, রক্ষক, সংশোধক ও পালক এই পরমেশ্বরই ফলদাতা, ইনিই পাপ ও পুণ্যের দ্রষ্টা। শীতে শরীর অগুপ্ত (exposed) হইলে জ্বর হয় সুতরাং শীত জ্বরের কারণ ; অত্যন্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে অনাবৃত মস্তকে দাঁড়াইলে রৌদ্রাভিঘাত এবং তজ্জনিত জ্বর হয় সুতরাং প্রখর সূর্য্যাতপ যে ইহার কারণ তাহা

* অনেকের বিশ্বাস, রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তায়, "পৃস্" দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায়, বাবু কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম্ম পিপাসায়, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ উপ্ত ও বৃক্ষে পরিণত হয়। রামচন্দ্রের বক্তৃতায় দেখিবেন, ব্রহ্মধর্ম্মের সত্য লইয়া অতি প্রাচীন কালেও বিচার হইয়াছিয়াছে। রামচন্দ্রই এই সত্য সর্ব্ব প্রথমে ঘোষণা করেন।—লেখক।

বুঝা যায়, কিন্তু রাজা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন অথবা আমার ব্যবসায় ক্ষতি হইয়াছে কিম্বা আমি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকলের কারণ নক্ষত্রমণ্ডলের শক্তি বা গ্রহের অধিকার হইতে পারে না। ভাগ্য নামে যদি কোনও পদার্থ থাকে তাহা হইলে তাহার মূল আমি স্বয়ং, আমার নিজের স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহার ইত্যাদি আমার সুখ দুঃখের হেতু। মানবের সুখদুঃখের সহিত আকাশের সম্বন্ধ স্থিরীকরণ করা প্রগল্‌ভতা মাত্র। বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর সকল প্রকার শক্তির আধার ও মূল যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার শক্তিকে লোপ করিয়া নক্ষত্রাদিকে শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করা এক প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিতা বলিতে হইবে। নক্ষত্রাদিকে কোনও শক্তি (চৈতন্য শক্তি) তিনি দেন নাই, সকল শক্তি একমাত্র ঈশ্বরের একচেটিয়া করা। এই শক্তি চেতন, এই চেতন শক্তির পূর্ণতা আর কাহারও নাই, সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কেহ পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ ইত্যাদির বিচারক বা কর্ত্তা হইতে পারে না। মুসলমানের কোরাণ অথবা হিন্দুর শাস্ত্রের কোনও শক্তি নাই যেহেতু এ সকল ঈশ্বর প্রণীত নহে, অবতারগণ ঈশ্বরের আত্মা নহেন, সাধু বা যোগীগণ ঈশ্বর নহে, সুতরাং একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরই সকল প্রকারে আমাদের কর্ত্তা ও ধাতা। তিনি কাহাকেও আপনার মন্ত্রী বা দেওয়ান করেন নাই, তিনি আর কাহাকেও আপনারী শক্তি দেন নাই, সুতরাং এ সকল কুসংস্কার মাত্র। একমাত্র ঈশ্বরই কর্ত্তা ও আরাধ্য এবং তিনিই একমাত্র সকল শক্তির আধার। নক্ষত্রাদিকে ভাগ্যকর্ত্তা বলা অজ্ঞানতা মাত্র। বুৎগণের (অর্থাৎ ধাতু কাষ্ঠাদি প্রতিমূর্ত্তির) কোনও শক্তি নাই, ইহারা আরাধ্য নহে; ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, তিনি শান্তিময় এবং কেবল তাঁহাকেই সুখ ও দুঃখের সময় স্মরণ করিতে হইবে। গ্রহশান্তির কোনও ফল নাই, ইহা মূর্খতা।" * রাউলপিণ্ডি জেলান্তর্গত সিন্ধুতটস্থিত আটক নগরবাসী রামচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, আজি কালিকার অনেক ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারকের তাহাই মত।

বিলাতের Royal Astronomical Society নাম্নী সভায় এ তর্ক একবার উঠিয়াছিল; হিন্দুজাতির এ সম্বন্ধে কিরূপ বিশ্বাস তাহা দেখাইতে গিয়া পাদ্রী হেন্‌স্‌মান সাহেব বলিয়াছিলেন "The rising of a star beyond its usual sphere or any strange sidereal phenomenon is interpreted by the Hindoos as the signal of a coming or departing king or of an unusually good or bad event. This is in strict accordance with their orthodox Sastric belief based upon traditions handed down from generation to generation from time immemorial. Other

* এই অনুবাদ কোনও ইংরাজী গ্রন্থের নহে, ইহা আমি স্বয়ং প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছি, মূল শব্দগুলি যতদূর সম্ভব বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত করা গিয়াছে। এই প্রাচীন পারস্য গ্রন্থের নাম "সবুওজাত্তা-এ-অম্‌রাঃ। পণ্ডিত রামচন্দ্র সম্বন্ধে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; আবুল ফজলের গ্রন্থেও এক রামচন্দ্রের নাম আছে, ইনি গীতা ও মহাভারতের পারস্যানুবাদে সাহায্য করেন, কিন্তু যোগদাদের সভার সহিত এই রামচন্দ্রের সম্বন্ধ নাই।—লেখক।

ancient nations had similiarly considered that the birthday and deaths of great men were symbolised by the appearance and disappearance of heavenly bodies, and the same belief has continued down to comparatively modern times." সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পৃথিবীর যে সকল জাতি নক্ষত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করিত তাহাদের নাম দেওয়া যাইতেছে ; ইথিয়োপিয়ান, ইংরাজ, গ্রীক, জর্ম্মণ, আমেরিকান, ফরাসী, ভারতবাসী, মিশরবাসী, তিব্বতী, শ্যামদেশী, ইহুদী, সিংহলী, সমগ্র মুসলমান জাতি ইত্যাদি ; সপ্তদশ শতাব্দীর পরেও ইহাদের সেই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ আছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মহাপ্রভাবে সময়ে সময়ে বিশ্বাস টলে বটে কিন্তু মহাপ্রবল Materialistic ইংরাজ জাতিও নক্ষত্রের ক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কবি কুলশিরোমণি সেক্স্পীয়র লিখিয়াছেন—

"When beggars die there are no Comets seen ;
The heavens themselves blaze forth the death of princes."

(Jnlius Ceasar,)

তিনি আরও বলেন—

"Comets portending change of time and state,
Brandish yonr crystal tresses in the sky,
And with them scourge the bad revolting stars,
That have consented to our Henry's death."

(Henry VI)

অন্যতম প্রসিদ্ধ ইংরাজি কবি Beattie লিখিয়াছেন—

"How many a sonl sublime
Has felt the influence of malignant star."

(Ministrel ch-I)

ইহুদীদিগের Talmud গ্রন্থে নক্ষত্রমণ্ডলের অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতার কথা বিশেষ করিয়া লেখা আছে। মানব জাতির ভাগ্যের সহিত তারাগণের কি সম্বন্ধ তালমুদগ্রন্থে তাহার অনেক দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। ইহুদীদিগের Talmud এর ন্যায় মুসলমানদিগের "হদিস্ সরিফ" এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ, ইহাতে "সেতারার" (নক্ষত্রের) সহিত মনুষ্যের "তগদীরের" (অদৃষ্টের) সম্বন্ধাদি প্রমাণ করিতে মুসলমান লেখকগণ বহুল যত্ন স্বীকার করিয়াছেন। কোরাণের ইংরাজি অনুবাদক জর্জ্জ সেল সাহেব বলেন "Mahomed pointed to a comet as a portent illustrative of his pretensions". (Vide Sale's Koran, prel, disc.) মোগল সম্রাট আকবর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আপনাকে "নক্ষত্র সন্তান" বলিয়া পরিচয় দেন এবং নুরজাহান-প্রচলিত মুদ্রায় আমরা নক্ষত্রের আকার দেখিতে

পাই। এইরূপে নানা দেশের নানা জাতির মধ্যে নক্ষত্রের আধিপত্য স্বীকৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। * অতি অল্পদিন হইল একজন ইংরাজ "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" নামক বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ইংরাজী সম্বাদ-পত্রে লিখিয়াছিলেন যে "Many stars are said to govern the destinies of men and animals. Some special (particular) stars are regarded as haviug been prophetic of the fortunes of great men. The late lamented Rev. Dr. K. M. Banerjee proves by facts and figures that there were eclipses of the moon immediate before the birth of Luther, the Trojan war, the inaugural meeting of the "Diet of Worms" and the death of Alfred the Great."

বহুকালের পুরাতন বাঙ্গালা সমাচার পত্র পড়িতে পড়িতে দেখিলাম উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, বৈদ্যনাথের ভূমিকম্প এবং দ্বারবাসিনী গ্রামের মহামারী হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল। চৈতন্যের জন্ম এবং হরিদাস সাধুর বৈষ্ণবত্ব গ্রহণের সময়ে সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। নিম্নলিখিত ঘটনায় সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১। হেরদ (Herod) রাজার মৃত্যু।
২। রুস সম্রাট পিতরের মৃত্যু।
৩। বুদ্ধের তিরোধান।
৪। শঙ্করাচার্য্যের তিরোধান।
৫। রাজা রনজিৎ সিংহের জন্ম।
৬। লর্ড মেয়োর আন্দামানে হত্যা।

সুবিখ্যাত জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিক হেজেন্ সাহেব, জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ কেপলারের অভিমতির সমালোচনা স্থলে লিখিতেছেন Kepler, from his matchless acquaintance with astrology, attaches immense importance to the conjunction of stars. That the conjunction of stars does indicate the approach of some memorable event seems to admit of no denial. That the combination of stars preceds a 'great man's birth' or a 'great man's death' or the occurence of

* The Great Moghul Emperor Akbar of Delhi took the surname of the "Son of a star" and the renowned Nurjehan caused a star to be stamped upon the coinage which she issued. Stars are held sacred both by the Hindoos and the Mahomedans. Stars are believed to exercise benignant and malignaut influeuces upon the destinies of mankind. Every one will remember the allusions in Ramayana, Mahabharata, Hadis and other sacred books of the East." Panchasidhika by Barahamihir, English Translation by Captain Hopkins, Intro, P.XL.

a good or bad event has been verified by a number of independent and learned investigators ; indeed it is a phenomenon by no means so rare as to admit of any possible doubt.” বর্ণ্স বলিতেছেন “The true accounts of these remarkable planetary conjunctiom do help us in a good deal to trace out many ancient (and lost) historical years and dates. A good astrologer can build on a datum (capable of verification and enveloped with certainties) and enable a writer of history to find out many lost historical truths.” এ সকল কথার বাঙ্গালা অনুবাদের বোধ হয় আবশ্যকতা নাই, এপ্রবন্ধের যাঁহারা পাঠক তাঁহাদের ইংরাজি ভাষায় অধিকার আছে ইহা স্বীকার করা যায়। গত তিন শত বৎসরের মধ্যে নক্ষত্রের সাতবার সংযোগ হইয়া ছিল, প্রতিবারের সংযোগে এক একটা মহাঘটনা ঘঠে। তালিকা দেওয়া যাইতেছে:— ১ সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৬), ২ কর্ণাট যুদ্ধ, ৩ মোগল সম্রাটের অধঃপতন, ৪ চিলিয়ানালা সংগ্রাম, ৫ জয়পুরের রাজা রাম সিংহের জন্ম, ৬ ভরতপুরের যুদ্ধ, এবং ৭ আফ্গানি স্থানের বিদ্রোহ। অনেক দিন হইল, একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রে এসম্বন্ধে আমি ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলাম, সেই প্রবন্ধ হইতে আমার নিজের অভিমতির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক মহাশয়ের নিকট এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি লিখিয়াছিলাম, “I am in fact driven to the conclusion—as the astronomical researches have proved the realities and possibilities—that these remarkable planetary conjunctions do prepare the people for the early occurrence of some great event and make them confidently expectant * * No one at any rate need stumble over the supposition that an apparent sanction is extended to the combinations of astrology. Apart from astrology altogether it is conceded by many wise and candid observers, that great catastrophes and unusual phenomena in nature have, as a matter of fact synchronized in a remarkable manner with great events in human history. I do not therefore imply any prodigious folly on part of the orthodox people to regard the planetary conjunction as something providentially significant.”

ইউরোপীয় জ্যোতিষিকেরা রাশিচক্রকে Zodiac কহিয়া থাকেন, ইহাকে তাঁহারা চারি অংশে (Trigon) বিভক্ত করেন ; প্রথম অংশের নাম “অগ্নি,” এই অংশে Aries, Leo, এবং Sagittarius আছে। দ্বিতীয় অংশ “পৃথ্বী,” এই অংশে Taurus, Virgo এবং Copricornus থাকে। তৃতীয় অংশ “বায়ু,” ইহাতে Gemini, Libra এবং Aquarius

আছে। চতুর্থ অংশের নাম "সলিল," ইহাতে Concer, Scorpio এবং Pisces অবস্থিত।*

হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র "জোডিয়েক" কে দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত করিয়াছে, এই দ্বাদশ রাশি মণ্ডল "রাশি চক্র" নামে খ্যাত। মেষ, বৃষ, মিথুণ, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীণ, ইহারাই দ্বাদশ রাশি। এই বারটি রাশির মধ্যে এক "কুমারী-কন্যা" ভিন্ন মনুষ্যের সমাগম দেখিতেছিনা, কন্যার যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে তাহা কে মানবের মধ্যে গণনা না করিয়া অপরাপর রাশির প্রকৃতির সহিত গণনা করাই ভাল; তাহা হইলে এখন বুঝিতে হইবে, পশ্বাদি বা ইতর শ্রেণীর জীব কর্ত্তৃক কি মানবের ভাগ্য-চক্র পরিচালিত হয়? মীণ, সিংহ, বৃশ্চিক ইত্যাদি কর্ত্তৃক মানবের ভাগ্যচক্র পরিচালিত হওয়া জ্ঞান, যুক্তি ও বহুদর্শনের বিরুদ্ধ; তবে মনুষ্য জাতির ভাগ্যের সহিত দ্বাদশ রাশির সম্বন্ধ কেমনে প্রমাণিত হইতে পারে? প্রমাণিত হউক আর না হউক, সকল দেশে ও সকল জাতিতে বিশ্বাসটা বড়ই প্রবল ভাবে চলিয়া আসিতেছে। গ্রহ, দশা, অদৃষ্ট ইত্যাদির বড়ই প্রভাব দেখা যায়, এই প্রভাব কল্পিত কি বাস্তব তাহা পরে দেখান যাইবে। ইংরাজেরা ভারতের সংস্কার করিতে আসিয়াছেন বলেন, কিন্তু তাঁহারাই বলিয়া থাকেন "His stars are resplendant," "Her stars are higher up" ইত্যাদি।

বাইবেলের নিউটেস্টামেণ্টে মহামতি যিশুখৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, নক্ষত্রবিশেষের সহিত খৃষ্টের জন্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণিত হইতেছে। রামায়ণে রামচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্তেও একথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মথিলিখিত সুসমাচারের (St. Mathew) দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে "পূর্ব্বদেশ হইতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আগমন করিলে, রাজা হেরদ তাঁহাদিগকে লইয়া সভাস্থলে গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় খৃষ্টের জন্ম হইবে? জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিলেন, আমরা পূর্ব্বদিকে নক্ষত্র দেখিয়াছি। হেরোদ অনুসন্ধানে নক্ষত্রোদয়ের সময় জানিয়া লইলেন। যখন জ্ঞানী ব্যক্তিরা খৃষ্টের অনুসন্ধানে যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে নক্ষত্র আকাশের একস্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইল ইহাতে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, এই স্থানেই খৃষ্টের জন্ম হইয়াছে।" পুরাতন বাই-বেলের "নম্বর্শ" নামক গ্রন্থের ২৪ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে এই রূপ এক নক্ষত্রের উদয় হওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইউরোপীয় ও আমেরিকান খৃষ্টীয় পুরুষগণ এই সকল কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর বাণী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে খৃষ্টশাস্ত্রে নক্ষত্রের ক্ষমতা স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ নক্ষত্র দ্বারা মনুষ্য পরিচালিত হইতে পারে ইহা বুঝা যাইতেছে।

* Zodiac is a broad belt or Zone in the heavens, so called, because most of the constellations in it are the figures of *animals*. Zodiac (English) Zodiaque (French) ; Zodiakos, Greek ; Zodion, Hebrew, which means *animal* ; Zoon (Syrian) means *animal* ; Zao (life) in Chaldeek, and *Jiv* (living creature) in Sanskrit.

এখন শাস্ত্রাবলীর কথা ছাড়িয়া যুক্তি ও বিজ্ঞানের কথায় মনোনিবেশ করা যাউক। কোনও বিষয়ের স্থিতি বা অস্থিতি সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, প্রমাণের প্রথমেই আবশ্যকতা হয়; প্রমাণ সাধারণতঃ দ্বিবিধ, ১ম প্রত্যক্ষ, ২য় অপ্রত্যক্ষ। নক্ষত্রাদির সহিত, আকাশস্থ মণ্ডলের সহিত মানবের ভাগ্যের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, এই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা নানা জাতির প্রবাদবাক্যে, প্রাচীন গ্রন্থ, জনশ্রুতি ইত্যাদি দ্বারা প্রাপ্ত হই; প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের আপনাপন ইন্দ্রিয় অথবা বহুদর্শন জ্ঞান দ্বারা জন্মিয়া থাকে। বহুদর্শন সম্বন্ধে বলিতে হইলে, নিরপেক্ষ ভাবে একথা বলা যায় যে, আমাদের জীবনের প্রতিদিনে আমরা দেখিতে পাইতেছি, অনন্ত আকাশের সহিত বিশালা পৃথিবীর যেন কি একটা অব্যক্তব্য, অভেদনীয়, বুদ্ধির অগম্য সম্বন্ধ আছে; সে সম্বন্ধটার আদি বা অন্ত কোথায় তাহা আমরা জানিনা। কেবল একথা জানি যে, অনন্ত বিশ্ব মধ্যে মানব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব হইলেও, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা প্রতি অণু পরমাণু কর্ত্তৃক প্রভাবিত হইতেছি।

দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার।

সংক্রামক ব্যাধিসমূহের ন্যায় দুর্ভিক্ষও একটি দেশব্যাপী রোগ, এবং প্রথমাবস্থায় ইহা নিবারণ করিতে না পারিলে ইহাদ্বারা দেশের যে গুরুতর অনিষ্ট উৎপন্ন হয় অন্য কিছুতেই তত অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। সুস্থদেহধারী নরনারী আহারাভাবে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, এরূপ হৃদয়বিদারক এবং কষ্টকর দৃশ্য পৃথিবীতে অধিক নাই; বিশেষতঃ বিধাতার রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গও অভুক্ত অবস্থায় থাকেনা, তখন উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিলে সহজেই মনে হয় এই অস্বাভাবিক অভাবের কোন অপ্রতিহত কারণ বর্ত্তমান আছে; আমাদের ভারতমাতার স্তনে এপরিমান দুগ্ধের অভাব হয় নাই, যাহাতে তাঁহার সন্তানগণের অনাহারে প্রাণ-ত্যাগ ঘটিতে পারে, কিন্তু তথাপি প্রত্যহ বহু সংখ্যক লোকের জীবন দুর্ভিক্ষানলে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে এবং হবিপুষ্ট হুতাশনের ন্যায় ইহার লোলজিহ্বা বহুঊর্দ্ধে উত্থান করিতেছে। প্রাচীন বর্ষের অবসান হইয়া নববর্ষের আরম্ভ হইল, কিন্তু প্রাচীন বর্ষের শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রনার অবসান হইল না। বর্ত্তমানবর্ষে অনাবৃষ্টির যেরূপ সূচনা, এবং ভবিষ্যৎ শস্যোৎপাদনের সম্ভাবনা যেরূপ সুদূরপরাহত, তাহাতে একথা একবারও মনে হয় না যে কয়েক মাসের মধ্যেই এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে; সেই জন্যই অনুমান হইতেছে দুর্ভিক্ষের নিত্য সহচর মহামারী নিরন্ন ভারতসন্তানের অনাহারে শোচনীয় মৃত্যু নিবারণের জন্য দ্রুতগতিতে দেশের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে; স্ত্রীপুত্রাদি স্নেহভাজন আত্মীয়বর্গকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে দেখা অপেক্ষা রোগের হাতে মরিতে দেখা

অনেকটা শান্তিপ্রদ, কারণ একটাতে শুধু নিজের অক্ষমতার কথা মনে করিয়া জীবনের উপর সুতীব্র ঘৃণা জন্মে, পক্ষান্তরে অন্যটি অকাট্য বিধিলিপি বলিয়া মানুষ হতাশভাবে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত ক্ষেপন করিতে পারে।

বর্ত্তমান ভারতদুর্ভিক্ষের কারণ কি ও ভারতবাসীগণ কিজন্য তাহার প্রথম আক্রমণ নিবারণে অক্ষমে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন জর্জ্জহ্যামিল্টন তাহার প্রতিবাদ উপলক্ষে বলিয়াছেন ভারত গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী দুর্ভিক্ষের প্রভাব হ্রাসের জন্য সচেষ্ট আছেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যভার হইতে অবসর দান করিয়া বিস্তৃত গবেষণায় নিযুক্ত করা হউক, পার্লিয়ামেণ্টের কোন সভ্য যদি আশা করেন যে তাঁহার কল্পিত কোন উপায় দ্বারা দুর্ভিক্ষের কবল হইতে ভারতবর্ষ উদ্ধার লাভ করিবে তাহা হইলে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিতে হইবে।" এই প্রস্তাবে ভারতবর্ষের কল্যাণের প্রতি ঔদাসীন্যের আভাস বাক্যকৌশলের অভ্যন্তরে যে পরিমাণেই সংগুপ্ত থাক, জর্জ্জহ্যামিল্টন তাঁহার উল্লিখিত প্রস্তাব কোন যুক্তি কিম্বা প্রমাণের দ্বারা অত্যন্ত সসার বলিয়া প্রতিপন্ন করেন নাই এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভারতেশ্বরীর লক্ষ লক্ষ প্রজা এই যে অনশনে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, এবং বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহার ন্যায়সঙ্গত কারণ আবিষ্কারের বিরুদ্ধে জর্জ্জহ্যামিল্টনের মন্তব্য তীব্র সমালোচনার যোগ্য।

যে উপায়ে ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার কর যাইতে পারে তাহা আবিষ্কার করা অসম্ভব, জর্জ্জহ্যামিল্টনের এই মত যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস হইতেই একথা সপ্রমাণ করা যায়।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের ত্রয়োদশ বৎসর পরে ভারতবর্ষে যে কি ভয়ানক লোকক্ষয়কারী মন্বন্তর উপস্থিত হয় তাহা ইতিহাসের পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। ইহার অতি অল্পকাল পরেই লর্ডকর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরালরূপে ভারতবর্ষে পদার্পণ পূর্ব্বক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত করেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যাহারা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে এই প্রকার বন্দোবস্ত ভিন্ন তাহাদের মধ্যে সৌভাগ্য সঞ্চারের অন্য কোন প্রকার সদুপায় নাই। তাঁহার মত এই ছিল যে " There is this further advantage to be expected from a fixed assessment in a country subject to drought and innundation, that it affords a strong inducement to the landholder to exert himself to repair as speedily as posible the damages which his land may have sustained from those calamities. His ability to raise money to make these exertions will be proportionately increased by the additional value which the limitation of the public demand will stamp upon his landed property ; the reverse is to

be expected when the public assessment is subject to unlimited increase." Despatch, dated 3rd February 1790.

কিন্তু এই রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্তের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে প্রজা সাধারণের যদি অবস্থাগত উন্নতি সাধন করা যায় তাহা হইলে দেশকে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার করা অসম্ভব হয় না। বর্ত্তমানদুর্ভিক্ষে যতই লোকক্ষয় হউক বৃটীশ পবলিকের দৃষ্টি যে এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের সহিত আজ ইংরাজ জাতি কেন, সমগ্র সভ্য পৃথিবীর সহানুভূতি লক্ষিত হইতেছে, কারণ "দীন হীন অনাথ যাহারা বিশ্বের অতিথি তারা"—তাই ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে মুক্তি লাভের জন্য এপর্য্যন্ত কোটী টাকারও অধিক ভিক্ষা পাইয়াছে; পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলে ইংলণ্ড ভারত কে যে ভিক্ষা দিয়াছেন তাহাকি প্রচুর? ভিক্ষুকও দাতার দানশক্তির সমালোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের শুধু ভিক্ষুক ও দাতা সম্বন্ধ নহে, রাজা প্রজা সম্বন্ধ; প্রজা চিরদিন করদানে রাজার ধনভাণ্ডার স্ফীত করিয়া তোলে, কিন্তু কোন দুর্দ্দিনে যদি অভুক্ত দৈববিড়ম্বিত ক্ষুদ্ধপ্রজা করজোড়ে সাশ্রুনয়নে আবেদন করেন "হে ধর্ম্মাবতার, হে রাজচক্রবর্ত্তী, আমাদের প্রাণরক্ষাকর, আমরা মারাযাই," তখন সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার কাতর প্রজার মুখের উপর একমুষ্টি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া যদি বলেন যে "যা; ইহাই কুড়াইয়া লইয়া নিজের পথ দেখ্।"—তাহা হইলে সেটা কি রাজার উপযুক্ত কাজ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে?—এই শোচনীয় দুর্দ্দিনে ভবিষ্যতের আপদের পথ রুদ্ধ করিবার আশায় ভারতবাসী কি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট মুষ্টিপরিমাণ ভিক্ষা ভিন্ন কোন স্থায়ী মহৎ উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারেনা? এক সময়ে যে ভারতের খ্যাতির কথা সুদূর য়ুরোপের চিরতুষারবিরাজিত শুভ্রবক্ষে অর্থলিপ্সু বণিকদিগের হৃদয়ে অর্থোপার্জ্জনের উন্মাদকর তৃষা উৎপন্ন করিয়াছিল, এবং দূরতর আট্‌লান্টিকের প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রবিধৌতপদ, বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র আমেরিকা ধনজনগৌরবে সমগ্র পৃথিবীর রাজেন্দ্রাণীর স্থানীয়া হইয়াও যাহার স্বপ্নময় ঐশ্বর্য্যমরীচিকার অনুসরণ জীবনের অদ্বিতীয় সাধনা বলিয়া মনে করিত, আজ তাহাদের নয়ন সমক্ষ হইতে সেই ঐন্দ্রজালিক দণ্ড অপসৃত হইয়াছে, আজ বৈদেশিকগণ বুঝিতে পারিয়াছে কোহিনূর এবং ময়ূরসিংহাসনের ভারত এখন আর বর্ত্তমান নাই, যে ভারতের অতুল সমৃদ্ধি রূপসী ললনার লাবণ্যরজ্জুর ন্যায় মহম্মদ ঘোরীকে সপ্তদশবার তাহার শ্যামল অঙ্কে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল, যাহার ক্ষতবক্ষে ম্যাসিডনীর বীর আলেকজান্দার হইতে আহম্মদ সাহ আবদালী এবং নাদীর সাহ প্রভৃতি কোন বৈদেশিক দিগ্বিজয়ীই আপনার তীক্ষ্ণ তরবারী প্রবেশ করাইতে ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের সেই সমৃদ্ধি ও গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে—এখন ইহা সমগ্র পৃথিবীর দাতব্যশালার অতি অকিঞ্চিৎকর অতিথি; ধন নাই, মান নাই, উচ্চব্রতধারী মহৎ মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিবার অধিকার

পর্য্যন্ত নাই ;—আছে শুধু হীনক্ষুধা এবং কলঙ্কলাঞ্ছিত তুচ্ছ জীবন! সম্ভ্রান্তব্যক্তি অদৃষ্ট চক্রের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে দারিদ্র্য যন্ত্রনায় পড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিলে প্রত্যেক অবস্থাপন্ন সহৃদয় ব্যক্তিই তাহাকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন—ইহা পৃথিবীর নিয়ম,—ভারতবর্ষ না হইয়া অন্য কোন সামান্য দেশ হইলে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে কখনই কোটীর অধিক টাকা সংগৃহীত হইত না; কিন্তু অতীতের সুনাম ও গৌরবের কাহিনী যতই বিস্ময়কর হউক, ভিক্ষা দ্বারা চিরদিন কখন কোন দেশের দুঃখ কষ্ট বিদূরিত হইতে পারেনা। জাতীয় জীবনের অভ্যন্তর হইতে এই সুগভীর শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের অবসানেই যে বসুমতী অপর্য্যাপ্ত শস্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে তাহার কোন সম্ভাবনা কল্পনা করা যাইতেছে না, সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টি না হইলে ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় অথবা ইহা অপেক্ষাও ঘোরতর দুর্ভিক্ষে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন করিবে, তখন আমরা সমগ্র সভ্য জগতের সম্মুখে অবনত মস্তকে নতজানু হইয়া যুক্তকর প্রসারণপূর্ব্বক কি পরিমাণ ফললাভ করিব তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

অতএব দুর্ভিক্ষের মূলীভূত কারণ যাহাতে বিনষ্ট হইতে পারে তাহাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য। কৃষকসাধারণের অবস্থাগত উন্নতি না ঘটিলে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। প্রাচীনকালের ও বর্ত্তমানকালের কৃষকজীবন পর্য্যালোচনা করিলে কি ভয়ানক ব্যবধান লক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে, হিন্দুরাজত্বে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে খাজনা আদায় করা হইত, মনুর বিধানে জমীর খাজনা বাবদ শস্যগ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল, জমীর গুণানুসারে তৎকালে উৎপন্ন শস্যের $\frac{1}{12}$ বা $\frac{1}{8}$ অংশ রাজা করগ্রহণ করিতেন, জমী খুব উৎকৃষ্ট হইলে ষষ্ঠাংশ বা চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন, তাহার অধিক নহে; প্রজাও রাজার এই প্রাপ্যাংশ ধর্ম্মসঙ্গত প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করিত এবং তাহা হইতে রাজাকে বঞ্চিত করায় প্রত্যবায় আছে বলিয়া মনে করিত। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে দুর্ব্বৎসরে প্রজাকে অধিক পরিমাণে রাজকর দিতে হইত না, প্রজার জমীতে ফসল না হইলে তাহার কাছে কিছু আদায় করিবারও প্রথা ছিল না। কিন্তু একালে আর এই বিধান প্রচলিত নাই, শস্যের পরিবর্ত্তে জমীর উপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কর ধার্য্য করা হইয়াছে বলা বাহুল্য ইহার পরিমাণ উল্লিখিত করের হার অপেক্ষা অনেক অধিক। যে বৎসর সুজন্মা হয় সে বৎসর প্রজা কোন প্রকারে ঐ কর দিতে পারে, অনাবৃষ্টি বা অতি বৃষ্টি হেতু শস্য নষ্ট হইলে রাজস্ব যোগাইতে তাহাদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। যাহা হউক যদি শুধু রাজকর দিয়াই তাহাদের নিষ্কৃতি লাভ ঘটিত তাহা হইলে হয়ত প্রজাসাধারণের এত কষ্ট হইত না! কিন্তু ভারতীয় কৃষিজীবীগণের অবস্থা অতীব শোচনীয়, অধিকাংশ কৃষকই চাষ-বাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত মূলধনের জন্য গ্রাম্য মহাজনগণের শরণ গ্রহণ করে, এই টাকার সুদ অসম্ভব অতিরিক্ত, বিশেষতঃ যে সকল মহাজন প্রজাবর্গকে বিছন ধান প্রভৃতি কর্জ্জ দেয় তাহাদের দেনা কোন কালে শোধ হইবার কথা কদাচ শুনিতে পাওয়া যায়।

মহাজনের সহিত কৃষকগণের এই কারবার প্রথম দৃষ্টিতে তেমন অপকর্ম্ম কিম্বা অস্বাভাবিক বলিয়া অনুমান না হইতে পারে, কারণ যাহারা টাকা কর্জ্জ দিবে তাহারা সুদ ছাড়িবে কেন? কিন্তু তিনটি অবশ্যম্ভাবী কারণে এই সকল অধমর্ণ তাহাদের উত্তমর্ণগণের একেবারে ক্রীতদাস হইয়া পড়ে। প্রথম কারণ, ফসল হোক না হোক নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজাকে কর দিতেই হইবে, প্রজার হাতে অর্থ না থাকে, বর্দ্ধিতহার সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়াও রাজকর প্রদান করা আবশ্যক; দ্বিতীয় কারণ, ফসল পাকিবার পূর্ব্বেই ভারতের অনেক স্থানের প্রজাগণের নিকট খাজনার টাকা আদায় করা হয়, এই খাজনার টাকা পাইবার জন্য তাহাদের বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না বটে, কিন্তু ফসল, যে ফসলের জন্য সে টাকা কর্জ্জ লইয়াছে, রাজকর দিয়াছে এবং যদ্দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিবে বলিয়া ভরসা করিয়া আছে—তাহা আর তাহার ঘরে উঠে না। কাটাই মাড়াই করিয়া মহাজনই তাহা বিক্রয় করিয়া লয়, কৃষক তাহা হইতে কিছু বিছন ও খাদ্যোপযোগী কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহার কঠোর পরিশ্রমের অতি সামান্য প্রতিদান। যদি কিছুদিন শস্য ঘরে রাখিয়া তাহারা সুবিধামত বিক্রয়ের অধিকার পায় তাহা হইলেও অন্ততঃ কিছু উচ্চ মূল্যে তাহা বিক্রীত হইতে পারে, কিন্তু শস্য উঠিবামাত্র যে মূল্যে তাহাকে বাধ্য হইয়া উৎপন্ন শস্য ছাড়িয়া দিতে হয় তাহাতে তাহার সুদপুষ্ট ঋণের অতি অল্প অংশই পরিশোধিত হইয়া থাকে। তৃতীয় কারণটি অধিকতর শোচনীয়; তাহাদের পরিধানে বস্ত্র নাই, কুটীরের চালে খড় নাই, দুই বেলা পূর্ণমাত্রায় আহারের সংস্থান নাই, অথচ মহাজনের ক্ষুধিত উদর পূর্ণ করিবার জন্য তাহারা রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় লইয়া খাটিয়া মরিতেছে, ভবিষ্যতের বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া ছেলেপিলের মুখের দিকে চাহিয়া পরিশ্রম করিতেছে, তাহার পর যখন কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া কিম্বা দুশ্চিকিৎস্য ম্যালেরিয়া জলহীন, পঙ্কিল, পীতাভ শৈবলাচ্ছন্ন জলাশয় হইতে রুদ্রমূর্ত্তিতে উঠিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে তখন হতভাগ্যেরা ধীরে ধীরে চিরজীবনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করে, এদিকে তাহাদের রক্তবিন্দুর ন্যায় মূল্যবান শস্যকণা একত্র সংগৃহীত হইয়া মহাজনগণের গোলাজাত হয়, পরে তাহা তাহাতে বোঝাই হইয়া ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার অনুর্ব্বর দেশের অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের আহার যোগায়;—সেই সকল দেশের লোক সেই খাদ্যে পরিতৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করিয়া সোৎসাহে বলে "ভারতবর্ষ কি চমৎকার দেশ! কি অপর্য্যাপ্ত শস্যশালিনী!"—ভারতবর্ষ যে বাধ্য হইয়া নিজের নিতান্ত পরিমিত গ্রাস তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে প্রেরণ করিতেছে, তাহা তাহারা কি করিয়া বুঝিবে?

এইরূপে সহস্র সহস্র প্রজা এবং দরিদ্র কৃষকের রক্ত শোষন করিয়া এক একটি মহাজনের উদ্ভব হইতেছে। সহস্র সহস্র প্রজার প্রাণ হানি করিয়া একটি ক্ষুধার্ত্ত মহাজনের উৎপত্তির কোন সাফল্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু এই 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের' দিনে ইহা অবশ্যম্ভাবী, আমাদের দেশের বর্ত্তমান আইন এই সকল মহাজনের পৃষ্ঠপোষক; অপক্ষপাত

আইন দেখিতে সুন্দর বটে কিন্তু তাহার লৌহছাঁচে পেষিত হইয়া গরীব প্রজার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন। কৃষকগণ যখন দেখিতে পায় যে মহাজনের সাহায্য ভিন্ন আর কিছুতেই দিন-পাত হয় না তখন তাহারা শতকরা বর্ষিক ৬০। ৭০ টাকা এমন কি ততোধিক সুদেও টাকা কর্জ্জ লইতে বাধ্য হয়, সাইলকরূপী মহাজনের সেই টাকা ক্রমবর্দ্ধমান সুদসমেত পরিশোধ করা কি ক্ষুদ্র কৃষকের সাধ্য? যতদিন শস্য হইল মহাজন নিয়মিত কালে আসিয়া তাহার ঘরে তুলিয়া লইল, শেষে যখন দেখিল আর কিছু আদায়ের সম্ভাবনা নাই, তখন মকদ্দমা রুজু করিল, যাহাদের আহারের সংস্থান নাই তাহারা মকদ্দমা চালাইবে কি দিয়া আর মকদ্দমা চালাইয়াই বা ফল কি?—সুতরাং এক তরফা ডিক্রী হইয়া যায়, যমদূতরূপী মুন্সেফী আদালতের পেয়াদা আসিয়া হালের গরু ও লাঙ্গল বাদ দিয়া তাহার সর্ব্বস্ব নিলাম করিয়া লয়, এমনকি তাহারা কখন কখন পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেনা; অস্থাবর সম্পত্তির ত এই অবস্থা; শেষে দাঁড়াইবার আশ্রয়টুকু থাকিলে জমীদারের শনিদৃষ্টি তৎপ্রতি পতিত হয়, তখনো তাঁহার জমীর খাজনা বাকি রহিয়াছে, ছলে বলে তিনি সেই হৃতাবশিষ্ট হালের গরু ও লাঙ্গল এবং লুণ্ঠিতাবশিষ্ট ঘর খানি দখল করিয়া লইলেন, কৃষক বেচারীর 'ভিটামাটী' সর্ব্বস্ব গেল, এই বিশাল পৃথিবীতে স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এক স্থাবর দেহ ভিন্ন আর কোন সম্পত্তিই অবশিষ্ট রহিল না।

অধিকাংশ বঙ্গীয় এবং অনেক ভারতীয় কৃষকের ইহাই পরিণাম। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও একটা শোচনীয় পরিণাম আছে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই সময়ের পূর্ব্বে ক্রমাগত কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়াতে উক্ত প্রদেশের কৃষকেরা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই, ঘরে খাবার নাই সুতরাং পুনর্ব্বার তাহারা ঋণ করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু সুদে আসলে এই ঋণ এত বাড়িয়া উঠিল যে আর তাহারা কৃষকদিগকে টাকা ধার দিতে স্বীকার করিল না। কৃষকেরা যতদিন মহাজনের কাছে টাকা কর্জ্জ পাইয়াছিল ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক কোন রকমে সরকারী খাজনাটা দিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মহাজন হাত গুটাইলে তাহাদিগকে অগত্যা খাজনা বন্ধ করিতে হইল। গবর্ণমেণ্ট তখন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, খাজনা বাকি পড়া সহস্র সহস্র বিঘা জমী নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। পিতৃপিতামহের আমলের জমী জমা হস্তচ্যুত হওয়াতে সেই সকল নিরন্ন কৃষকের মৃতপ্রায় দেহও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং যাহারা টাকা কর্জ্জ না দেওয়াতে তাহাদের এই দুর্দ্দশা—সেই মহাজনদিগের বিরুদ্ধে তাহারা লোষ্ট্রাহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। মহাজনবর্গের স্থূলোদর এবং স্থূলতর গোলা সমূহ এই সকল জর্জ্জরীভূত নিপীড়িত প্রজার বল্লমের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গেল, তাহাদের গৃহ লুণ্ঠিত ও দলীলপত্র অগ্নিমুখে ভস্মীভূত হইল, অবশেষে অমোঘ রাজদণ্ড যমদণ্ডের ন্যায় এই চঞ্চল, বিদ্রোহোন্মুখ প্রজাবর্গের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইলে এই ক্ষুদ্র প্রহসনের শেষ যবনিকা পতিত হইল। গাভী দুগ্ধবতী, কিন্তু লোভান্ধ গোপপুত্র যখন তাহার স্তন হইতে ক্ষীরধারা

মাত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষান্ত না হইয়া অতিলোভে প্রাণপণ শক্তিতে রক্তধারা পর্য্যন্ত মোক্ষণ করিতে থাকে তখন সেই সহিষ্ণুতাময়ী, মাতৃস্বরূপিনী, নিরীহা পয়স্বিনী যন্ত্রনাকাতর ভাবে প্রাণ লইয়া উর্দ্ধপুচ্ছে পলায়ন করে এবং তাহার বেদনাচঞ্চল অসংযত পদাঘাতে লুব্ধ গোপনন্দনের দুগ্ধভাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া তাহার লাভের সামান্য সম্ভাবনাটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

রাজস্ব সম্বন্ধে নূতন কোন প্রকার বন্দোবস্ত অসম্ভব হইলে প্রজাসাধারণের দুরবস্থা বিদূরিত করিবার আর একটি মাত্র উপায় আছে এবং তাহাই দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া মনে হয়। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি অনাবৃষ্টির জন্য এক প্রদেশে শস্য না জন্মিলে, কি অতিবৃষ্টিতে তাহা বিনষ্ট হইলে এই বিস্তীর্ণ দেশের বিভিন্ন অংশে এতশস্য উৎপন্ন হয় যে তাহাতে সমগ্র দেশের লোকের উদরান্নের সংস্থান হইতে পারে, কিন্তু মহাজনবর্গের দেনা শোধের জন্য যদি তাহার অধিকাংশ বিক্রয় করিতে হয় ও তাহা জাহাজে বোঝাই হইয়া বিদেশে চলিয়া যায় তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। অতএব মহাজনদের কবল হইতে নিরাশ্রয় প্রজাগণের উদ্ধার সাধনই এই বিপন্নিবারণের প্রধান উপায়।

কিন্তু কিরূপে এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে?—কিছুদিন পূর্ব্বে যে এজন্য চেষ্টা হয় নাই তাহা নহে; ভারত হিতব্রত মহাত্মা সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ যে সময় বোম্বে সিবিল সার্ব্বিসে কাজ করিতেন সেই সময়ে দরিদ্র রায়তদিগকে মহাজনগণের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করা হয়, সার উইলিয়াম গত ফেব্রুয়ারী মাসের 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তাহা অতি পরিস্ফুট রূপে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন যদি অল্প সুদে রায়তগণকে জমীচাষ ও ফসল উৎপন্ন করার উপযোগী টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় তাহা হইলে, তাহারা যেরূপ পরিশ্রমপটু, উদ্যমশীল, মিতব্যয়ী এবং অধ্যবসায়ী, তাহাতে অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত ভারতবর্ষকে তাহারা নন্দনকাননে পরিণত করিতে পারে; তাহা হইলে ভারতবর্ষে আর কেহ দুর্ভিক্ষের কথা জানিতেও পারে না, এবং তাহারা অনায়াসে গবর্ণমেণ্টকে যে পরিমাণে রাজকর প্রদানে সক্ষম হয়, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এখন তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ করও বিশেষ চেষ্টা এবং কৌশলে সংগ্রহ করিতে সক্ষম নহেন।

কিন্তু শুধু একজনের চেষ্টায় এই কার্য্য সম্ভবপর নহে, অল্প চেষ্টাতেও হইবে না; এই চেষ্টায় সফলতা লাভ করিতে হইলে কৃষকদিগকে মূলধন প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র ধনভাণ্ডার স্থাপন করা আবশ্যক। এক জার্ম্মণীতে এইরূপ দুই সহস্র ব্যাঙ্ক আছে, তাহাতে প্রায় দেড়শত কোটী টাকা মূলধন খাটিতেছে, এই সকল ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রজাসাধারণের যে কত উপকার হইতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশও জার্ম্মণীর এই সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়াছে, রুসিয়াতে সাধারণ-হিতকর-কার্য্য জন্য এই প্রকার বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, এমনকি অসভ্য তুরস্কও এবিষয়ে উদাসীন নহে। বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও কেবল ভারতবর্ষে ইহা নিস্ফল-উদ্যমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, এই নিস্ফলতার জন্য ইণ্ডিয়া

আফিসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী তাঁহাদের অটল ঔদাসীন্যের জন্যই এই মঙ্গলকর বিধান আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এই প্রকার ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের জন্য বোম্বে অঞ্চলে কিরূপ প্রবল চেষ্টা হইয়াছিল, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। য়ুরোপীয় কৃষি ফণ্ডের আদর্শে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পুনায় একটি ধনভাণ্ডার সংস্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছিল, সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ ইহার অন্যতম নেতা ছিলেন। এই ভাণ্ডার হইতে রায়তগণের পুরাতন ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল; এমনকি রায়ত ও উত্তমর্ণগণের মধ্যে যাহাতে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় তাহারাও চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন কোন গুরুতর এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, বিশেষতঃ যে কার্য্যের সহিত সাধারণের স্বার্থ এবং বহুলোকের প্রচুর অর্থসংশ্রব আছে তাহার সহিত গবর্ণমেণ্টের সংশ্রব একান্ত প্রার্থনীয় এইজন্য এই ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতাগণ গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সাহায্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। রায়তগণ এই ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, গ্রাম্য মহাজনগণ ইহার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল এবং স্থানীয় অর্থশালী কুঠিয়ালগণ মুক্তহস্তে ইহার পরিপোষণ ভার বহন করিতে সম্মত হইল। অবশেষে ভারত গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়া এতৎ বিষয়ে তাঁহাদের অনুকূলমত ব্যক্ত করিলেন। মারকুইস অব রিপন এ সময় ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি, সার এলভিন বেয়ারিং (বর্ত্তমান লর্ড ক্রোমার) রাজস্ব সচীব, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর বোম্বে গবর্ণমেণ্ট সিমলাতে ৬৩৮ নং ডেসপ্যাচ্ প্রেরণ করিলেন, তাহাতে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছিল, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া পরীক্ষা স্বরূপে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের রায়তবর্গের ঋণমুক্তির অভিপ্রায়ে একটি কমিশন বসাইয়া সাড়ে ছয়লক্ষ টাকা মূলধন দান করিতেও প্রস্তুত ছিলেন; শুধু তাহাই নহে, উপসংহারে ভারত গবর্ণমেণ্ট বোম্বে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন যেন অতি সত্বর এই ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ করা হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মে ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ অনুকূল মত প্রকাশ পূর্ব্বক ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমোদনের জন্য এই ডেসপ্যাচ্ ইংলণ্ডে পাঠাইলেন, তখন ইণ্ডিয়া আফিসের সম্মতি অপেক্ষায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতাগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন, সকলেরই আশা হইল এই সম্মতি লাভে বিলম্ব ঘটিবে না; কারণ এই ডেসপ্যাচ্ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে, মৃত মহাত্মা ব্রাইট, সার জেমস্ কেয়ার্ড প্রভৃতি ইংলণ্ডস্থ ভারত-হিতৈষীগণ এই প্রস্তাব অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিলেন। জর্জ্জ লর্ডের সভাপতিত্বে ল্যাঙ্কেসায়রের 'বাণিজ্য সমিতি' এই ধনভাণ্ডারের সহিত যোগ দানের সংকল্প প্রকাশ করিলেন, এমন কি এই সৎ উদ্দেশ্যে লর্ড রথচাইল্ডও সম্যক সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে যদি কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে এই ধনভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী মূলধনের অভাব হইবে না।

সমস্ত আয়োজন ঠিক এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল প্রস্তাবিত ধনভাণ্ডার স্থাপনে ইণ্ডিয়া আফিসের সম্মতি নাই। সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ এবং উচ্ছৃঙ্খল ঝঞ্ঝাবাত অতিক্রম করিয়া তীরদেশে আসিয়া পোত নিমজ্জিত হইলে নাবিকের হৃদয়ে যেরূপ দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়, এই মঙ্গলকর নিয়মের প্রতিষ্ঠাতাগণের হৃদয়ও ইণ্ডিয়া আফিসের এই উপেক্ষায় সেইরূপ বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল! কিন্তু নিরুপায়! রাজার সামান্য তর্জ্জনী সঞ্চালনে এমনি করিয়াই দুর্ব্বল প্রজার দীর্ঘকালব্যাপী প্রবল চেষ্টা ও একান্ত যত্ন সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট 'হাউস অব কমন্স' সভায় কিরূপ লজ্জাজনকভাবে এই দেশহিতকর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল 'ব্লুবুকে' তাহা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের বীজ উৎপাটন করিবার অভিপ্রায়ে ভারতীয় রায়তদিগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অদৃষ্টাকাশে ঊষার উজ্জ্বল আলোক ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অভিশপ্ত, নিপীড়িত ব্যথিত জীবনে কিঞ্চিৎ আরাম সঞ্চারের জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহাত্মা যে প্রকার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা কিরূপ হাস্যকর প্রহসনে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার আমরা উল্লেখ করিলাম। ভারতের এই ঘোরতর দুর্ভিক্ষের দিনে আমাদের দেশের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিতেছেন ইংলণ্ডে এরূপ সহৃদয় ইংরেজের সংখ্যা অতি অল্প। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষাদান পূর্ব্বক আমাদের অভুক্ত প্রতিবেশীর, অনাহারে মৃতপ্রায় ভ্রাতাভগিনীর জীবনদানে সহায়তা করিতেছেন; তাঁহাদের এই করুণার কথা, এই সহৃদয় দানশীলতার বিষয় আমরা কখন বিস্মৃত হইব না, কিন্তু দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কে বলিতে পারে এই দুর্ভিক্ষ অন্তর্হিত হইতে কতকাল লাগিবে! দুই বৎসর পরে আবার যদি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহা হইলে আমরা কি বলিয়া তোমাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব?—তোমরা একবার সাহায্য করিয়াছ, না হয় মনুষ্যত্বের অনুরোধে, কর্ত্তব্যজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রজা, ভক্ত, অধীন ভারতবর্ষকে আর একবার আর এককোটী টাকা দিয়া সাহায্য করিবে, কিন্তু অগণ্য ক্ষুধিত ভারত সন্তানের তাহাতে কয়দিন অন্নের সংস্থান হইবে? যাহাতে রোগের বীজ বিনষ্ট হয় তাহা করাই কর্ত্তব্য; আমরা রাজস্ব কমাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেণ্টের অর্থকষ্টের দিনে হয়ত তাহা সিদ্ধ হইবে না, খাজনা আইনের আমূল সংস্কারও সহজ মধ্যে নহে। কিন্তু এই সময় আমাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করা হউক যাহাতে ভারতীয় সমগ্র কৃষিজীবীর চিরস্থায়ী কল্যাণসাধিত হইতে পারে। কোটী কোটী মুদ্রা সাহায্য অপেক্ষা ইহাতে প্রত্যক্ষরূপে অধিক ফললাভ করা যাইবে, অধিকন্তু এজন্য ইণ্ডিয়া আফিস কিম্বা হাউজ অব কমন্সকে কোন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে না।

তবে বর্ত্তমান সময়ে লর্ড এলগিনের রাজত্বকালে আমরা অধিক কিছু আশা করিতে পারি না; লর্ড এলগিন রাজপ্রতিনিধি হইতে পারেন কিন্তু তিনি দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা কি না সে কথা বলা শক্ত! তিনি ত সিমলা শৈলে শৈত্য সুখ উপভোগ করেন, এই দুঃখ

তাপদগ্ধ সমতলক্ষেত্রে তাঁহার অগণ্য প্রজার আকুলক্রন্দন, অনাথের করুণ আর্ত্তনাদ, অভুক্তের উচ্চ-দীর্ঘশ্বাস কি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবার অবসর পায়? আর সে লর্ড রিপন নাই, যাঁহার নিকট মনোবেদনা প্রকাশ করিয়া ভারতবাসী রাজার সান্ত্বনা ও সহানুভূতি লাভ করিত, তাই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধারের কোন পথই আমরা দেখিতে পাইতেছি না; দুর্ভিক্ষের তুলনায় প্লেগে অতি অল্প লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কিন্তু প্লেগের দমনের জন্য যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন চলিতেছে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যদি তাহার চতুর্থাংশও চেষ্টা হইত তাহা হইলে বহুসংখ্যক, অনাহারক্লিষ্ট, অন্নজলহীন দরিদ্রের প্রাণরক্ষা পাইত; প্লেগে শুধু দেশীয় নহে, ইংরেজও মরিতেছে এই জন্যই তাহা নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের এরূপ উৎকণ্ঠা! আর দুর্ভিক্ষে যাহারা মরিতেছে, তাহাদের চামড়া কালো এবং তাহাদের দুইশত লোকের জীবন অপেক্ষা একটি শ্বেতপুরুষের জীবন মূল্যবান! কিন্তু প্রজায় প্রজায় সাদা ও কালোর মধ্যে যাহারা এতটা তফাৎ করে তাহাদের রাজোচিত গুণ যে বড় বেশী আছে এ কথা বিশ্বাস হয় না। ভারত-দুর্ভিক্ষ বিদূরিত করিবার জন্য যে দাতব্যঅর্থ সংগৃহীত হইতেছে তাহার সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না সে বিষয়েও আমাদের প্রগাঢ় সন্দেহ আছে; আমরা অবগত হইয়াছি, এতদ্দেশীয় কোন রাজকর্ম্মচারী দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে শ্রমজীবীবর্গকে 'রিলিফে' খাটাইবার জন্য প্রত্যহ প্রত্যেককে অর্দ্ধ আনা হিসাবে পারিশ্রমিক প্রদানের আদেশ করিয়াছেন!—অথচ এই কর্ম্মচারিটি একজন বাঙ্গালী এবং পদে ও গৌরবে একজন ডেপুটী; ইহাকেই বলে "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত!" একজন শ্রমজীবীর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের মূল্য যে অর্দ্ধ আনা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে—এমন অসম্ভব কথা বোধ হয় ইনি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। অন্যত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের আরও দুই একজন "খয়ের খাঁর" পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, পুনাজেলায় 'পাটান' নামক স্থানে প্রায় দুই সহস্র লোক 'রিলিফে' কাজ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের দুরাবস্থার কথা শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, পরিশ্রমে অপটু রমণীগণ এবং খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় পুরুষের দল প্রাণের দায়ে খাটিতে আসিয়াছে, রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য সমস্ত দিন ধরিয়া পাথর ভাঙ্গাইয়া তবে তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করা হইতেছে। তাহাদিগকে এরূপ কঠিন পরিশ্রমে বাধ্য করা হইতেছে যে পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অনেকেরই হাত ফুলিয়া গিয়াছে, বেশীদিন তাহারা যে খাটিতে পারিবে সে আশা নাই, তথাপি এই নিরাশ্রয় অনাথগণের মুখের দিকে চাহিয়া কাহারো দয়া হইতেছে না! অতঃপর কর্ম্মে অক্ষম হইয়া পড়িলে হয়ত তাহারা ক্ষুধিত তৃষিত অকর্ম্মণ্য কুক্কুরের ন্যায় দূরে বিতাড়িত হইবে, তখন তাহাদের কি উপায় হইবে? আমাদের দেশের অর্থ, অথচ আমাদের দেশের লোকই অনাহারে মরিতেছে; কিন্তু শৈলবিহার, হোমচার্জ্জ, সৈন্যব্যয়ভার, দেনার সুদ, পেনসন প্রভৃতিতে যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে তাহার কি অতি সামান্যমাত্র প্রতিদানও আমরা পাইতেছি! পাওয়া দূরের কথা সে কথা মুখে উচ্চারণ করিলে বৃটীশ সিংহের ক্রুদ্ধ চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে এংলো ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজের সম্পাদকগুলা ক্ষুধিত 'টেরিয়ারের' মত তীক্ষ্ণ দন্তে আমাদের খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হয়! এই ত দেশের অবস্থা! কিন্তু দেশীয় রাজ্যের প্রজাবর্গ যে সুসভ্য বৃটীশ শাসিত দেশের প্রজাবৃন্দ অপেক্ষা অধিকতর সুখী তাহা সহৃদয় এবং চিন্তাশীল ইংরাজ রাজনৈতিক মিঃ ডিগবী "India for the Indians and for England"—নামক পুস্তকে অতি দক্ষতার সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন। 'বৃটীশ পাবলিক' আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন এবং করিতেছেন সে নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; জ্ঞান ও সভ্যতালোকিত বৃটীশরাজ্য ভিন্ন কোন অসভ্য দেশের লোক এই পরাধীন, অর্দ্ধসভ্য, কৃষ্ণকায়, নগ্নপ্রায় জাতির জন্য এতখানি সহানুভূতি প্রকাশ করিত না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, তাই অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশ এই মহৎ কার্য্যে বৃটীশ রাজ্যের অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু এ কথা অত্যন্ত সত্য যে কি করিলে এ দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, অগ্নি প্রধূমিত অবস্থায় না রাখিয়া কি করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হওয়া সম্ভব, ভারতবর্ষের স্থায়ী সুখ এবং অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য কোন মহৎ কার্য্যের উপর নির্ভর করে এবং তাহার সহিত ইংলণ্ডের মহত্তর গৌরব ও সুচিরকালব্যাপী শান্তির কি সম্বন্ধ তাহা এই বৃটীশরাজতরণীর কর্ণধারবর্গের চিন্তা করিবার অবসর অতি অল্প। সেই জন্যই যখন আমাদের বড়লাট শ্রীশ্রীমাতিশয্যে শৈলবিহারের আনন্দ ও সুখ-শান্তিতে নিমগ্ন হইয়া রেজলিউসন ও ডেসপ্যাচে দুর্ভিক্ষ দূর করিবার কল্পনায় কর্ত্তব্য পালন জনিত তৃপ্তিলাভ [illegible] তখন অগণ্য ক্ষুধার্ত্ত, অসহায়, জীর্ণ, শীর্ণ মৃতপ্রায় ভারতবাসীর অশ্রুসম্বদ্ধ, কাতর [illegible] হাসের অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাসমুদ্র প্রান্তবর্ত্তী সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে [illegible] সেক্রেটারী যে সহানুভূতিসূচক আশার কথা বলিতেছেন—"It is in times of dire distress and calamity that the true instincts of affinity are shown: the ties of sympathy, of common interest and kindly feeling which *more than the Power of the sword and the prestige of our name, constitute the strength and stability of our rule in India*"—ইহা শুনিয়াও আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না, জানিনা রোগ নিবারণের জন্য প্রকৃত ঔষধের ব্যবস্থা কবে হইবে।

কাহাকে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যেমন হইয়া থাকে, ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর তাঁহাকে লইয়া আমাদের মধ্যে সমালোচনা চলিতে লাগিল। দিদি বলিলেন—"লোকটাকে লাগল মন্দ না।"

ভগিনীপতি বলিলেন—Yes—he's not a bad fellow—hasn't got much common sense though,—too much of a woman worshipper I should say."

দিদি। সেত ভালই।

ভগি। মন্দ কে বলছে? Poor fellow I pity him—he's quite lost in admiration for the fair sex. Fancy an intelligent and educated man like him firmly believing in the possibility of a woman's ever coming up to Shakespeare in intellectual power!

দিদি। সেটা কি এমনি অসম্ভব ব্যাপার?

ভগি। And what is worse still—feeling no hesitation whatever in expressing this outrageous opinion of his before others and making a fool of himself. The man has absolutely no sense of the ludicrous.

আমি বলিলাম—"তাঁর যে strength of conviction খুব আছে—এতে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"You are right, it shows his sincerity and to tell you the truth I like him all the better for this outspoken foolish enthusiasm of his."

দিদি। লোকটা বেশ সহৃদয়।

ভগি। He has the manners of a perfect gentleman—

তাহার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা মণির সঙ্গে তার বিয়ে হলে কেমন হয়?

দিদি। সেত engaged!

ভগি। Good gods! কে বল্লে! আমি ত ভাবছিলুম he was rather sw—never mind what, but—কে বল্লে?

দিদি। চঞ্চলের মা বলছিলেন।

ভগি। এর মধ্যে পাকড়া করলে কে? কথাটা ত গুজবও হতে পারে?—

দিদি। না ডাক্তারের মায়ের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, গুজব হবার নয়। তবে পাত্রীটি যে কে তা আর আমি জিজ্ঞাসা করিনি, অন্য কথা এসে পড়লো, আর জেনেই বা আমার লাভ কি বল?

ভগি। Bad luck everywhere, eh! তবে চল এখন শুতে যাওয়া যাক, স্বপ্নে এই happy pairকে congratulate করার ইচ্ছা রইলো!

কি ভাগ্য ইহা রাত্রিকাল; তাই আমার সহসা পরিবর্ত্তিত বিবর্ণ মূর্ত্তি ইঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

শয়নগৃহে আসিয়া জানালার ধারে কোচে বসিলাম। বিছানায় যাইতে ইচ্ছা হইল না।

নয়নপথে মুক্তাকাশখণ্ডে শ্বেত কৃষ্ণ মেঘের উপর দিয়া স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে, তর তর বেগে পূর্ণ শশধর ভাসিয়া যাইতেছিল; তাহার দিকে চাহিয়া আমার সন্ধ্যার সেই সুখ সেই মুখ মনে জাগিতে লাগিল; আর ব্যথিত অশ্রুধারা হৃদয় ভেদ করিয়া নয়নে উথলিয়া উঠিতে লাগিল!

সবই কি আমার কল্পনা! আমার ভ্রম! তাঁহার নয়নে যে সুমধুর দৃষ্টি দেখিলাম, তাঁহার সাধারণ কথার মধ্যে যে অসাধারণ হৃদয় কথা পড়িলাম, তাহার মধ্যে কি সত্য কিছুই নাই? সমস্তই কি আমার মনের ছায়া;—আমার মনের ভাব মাত্র? সন্দেহ নাই। আমি কে? আমি কি? নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত অযোগ্য, মুহূর্ত্তের জন্যই বা কিরূপে অতদূর আত্মহারা হইলাম! এ দুরাশা মনে উঠিল! তাহা কখনো নহে; কখনো হইবারো নহে,—সমস্তই আমার ভ্রম! আমার কল্পনা!

বাহিরে তেমনি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না; অন্তরে তেমনি মধুর দৃষ্টি, কেবল সন্ধ্যার সেই আনন্দের পরিবর্ত্তে সমস্তই এখন নিরানন্দ বিষাদ ম্লান; হৃদয়ের নবজাগ্রত মধুর বসন্ত মুহূর্ত্তে মরুবিলীন।—

তাঁহাকে মনে পড়িল; যাহার ভালবাসা উপেক্ষা করিয়াছি তাঁহাকে মনে পড়িল। শুনিতে পাই সংসার কর্ম্মফলে চলিতেছে, ইহাও কি কর্ম্মফল? তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি তাই এ কষ্ট! কিন্তু আমি কি তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া কষ্ট দিয়াছি? সে অবস্থাচক্রের উপর কি আমার হাত ছিল? আমি যে তাঁহার প্রতি ভালবাসা হারাইলাম সেকি আমার ইচ্ছায়? সহস্র চেষ্টাতেও কি আর সে প্রেম ফিরাইতে পারি? না আমার ইচ্ছাক্রমেই এই নবপ্রেম আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে? সাধ্য থাকিলে এই মুহূর্ত্তে কি ইহাকে বিলোপ করিতাম না! যে কর্ম্মের উপর আধিপত্য নাই, তাহারো ফল আছে? সে জন্যও মানুষ দায়ী! তাহার নিমিত্ত এই ভয়ানক শাস্তি! তবে মানুষকে এত ক্ষুদ্র এত তুচ্ছ, এত দুর্ব্বল করিয়া গড়িয়াছ কেন প্রভু! দুর্ব্বল অসহায়ের প্রতি তোমার করুণা কোথায় তবে? অবশ্যই আছে! কেবল কর্ম্মফলে সংসার চলিলে এতদিন ইহা ধ্বংস পাইয়া যাইত। আমিই বা আজ কোথায় থাকিতাম! "যে করুণায় বাল্যে কৈশোরে অসংখ্য রোগশোক দুঃখ তাপের অবসান করিয়া জীবনে সুখ শান্তি বিধান করিয়াছ, হে নাথ-করুণাময় তোমার সেই অনন্ত করুণাবারি বর্ষণে—" প্রার্থনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল; কি ভিক্ষা করিতে যাইতেছি! ঈশ্বরের করুণা আহ্বান করিয়া যাহাকে ভালবাসি তাহাকে পাইতে চাহি! আমার সুখের জন্য অন্যের সুখে অভিশম্পাৎ প্রার্থনা করিতেছি! প্রার্থনার সহজ উচ্ছ্বাস সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল, করপুট শিথিল হইয়া পড়িল, আমি সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া অধীর বেদনায় মনে মনে কহিলাম— "তোমার করুণা প্রভু; তোমার করুণা! আমার মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট যে দুঃখ বিধান করিতে চাহ আমি যেন ধীরভাবে তাহা সহ্য করিতে পারি; করুণা করিয়া এই বল দাও নাথ।" কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে সেই

অবস্থাতেই কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানিনা। যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন পূর্ব্ব রাত্রের সেই বেদনাময় অনুভূতি লইয়াই জাগিয়া উঠিলাম। সেই ছবি সেই দৃষ্টি মনোনেত্রে দেখিতে দেখিতেই জাগিয়া উঠিলাম।—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

একই রকমে দিন কাটিতে লাগিল। প্রতিদান পাইবার আশা নাই, ভরষা নাই, ইচ্ছাও নাই, নিরাশার মধ্যেও তথাপি অন্তঃশীলা আশা প্রবাহিতা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসনা বিদ্রোহী, মনের বিরুদ্ধে মন সংগ্রামরত, নিজের সহিত অনবরত যুদ্ধে হৃদয় রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত। এমন অবস্থায় তোমরা কেহ কি কখনো পড়িয়াছ! জানিনা; কিন্তু মনে হয়, এ বিশাল সংসারে এ জ্বালা শুধু আমিই জানি।

ভাবিতে গেলে মহা বিস্ময়ের মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়ি;—কেবল দুই চারি দিনের দেখা; কেবল দুই চারিটা কথা বার্ত্তা; তাহাতেই কিরূপে আমাকে এমনতর পাগল করিয়া তুলিল! সেই ক্ষণিক মিলনের মধ্যে জগতের যত কিছু সৌন্দর্য্য মধুরতা আনন্দ উচ্ছ্বাস, যত কিছু হলাহল ভরা অভাব বেদনার অভিজ্ঞানে জীবনের অভিজ্ঞতা যেন সম্পূর্ণ।

তাঁহাকেও ত ভালবাসিয়া ছিলাম; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে এ রকমের অনুভাব নহে।—সে শুধু গানের মোহ, স্মৃতির ব্যথা; এমন মর্ম্মবিজড়িত আকুল আকাঙ্খাময় আত্মদান নহে। সে শুধু বিশ্বাসের উচ্ছ্বাস, প্রীতির অনুভবে মর্ম্মান্তিক সহানুভূতি, তাই যখন বিশ্বাস ফুরাইল, মনে হইল তাঁহার ভালবাসা সত্য নহে তখন সে ভালবাসাও ফুরাইল। কিন্তু এ সন্দেহে, এ অবিশ্বাসে সে ক্রোধ কোথা? সে বিরক্তি কোথা! সে বিস্মৃতিই বা কোথা? নৈরাশ্যসিঞ্চনে এ প্রেম আরো কেবল দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া বসিতে লাগিল।

প্রাণের মধ্যে সারাদিন কি যে আগুণ জ্বলিতেছে, কাজে কর্ম্মে গল্পে কথায় তাহার নিবৃত্তি নাই। যতই ভাবি 'আর না আর না' ততই তাঁহাকে ভাবি; ভুলিতে চেষ্টা করিয়া দর্শনতৃষায় আরো ব্যাকুল হইতে থাকি; বায়ুর শব্দে নিরাশ মনে বাতুল আশা জাগাইয়া তোলে—মোহভঙ্গে দগ্ধ হৃদয়ে বেদনাধ্বনি ওঠে—"একবার একবার কি আর দেখা পাইব না! আর কিছু না; যদি শুধু মাঝে মাঝে দেখা পাইতাম! তাঁহার হৃদয় ভাগিনী নহে—সামান্য বন্ধুত্বভাগিনীও হইতে পারিতাম! তাহা হইলেই কি আমার জীবন জন্ম সার্থক হইত না?" কোথায় সে গর্ব্বিত অপমান বোধ!

এইরূপ দাবানল হৃদয়ে বহিয়া দিন কাটে। ভবিষ্যতে কি হইবে, কে জানে, কালে ইহার শান্তি আছে কিনা জানি না, কিন্তু পুড়িতে পুড়িতে জ্বলিতে জ্বলিতে এখন মনে হয়—এমনি নিরাশাময় আশা, বেদনাময় আকুলতায় জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া যখন ভস্মসাৎ হইবে তখনি মাত্র ইহার শান্তি! সুদীর্ঘ জীবনের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠি। ইহাই কি প্রেম? যে তৃষ্ণায় তৃপ্তি নাই, যে আকাঙ্খায় নিবৃত্তি নাই, যে আশায় সফলতা নাই, তাহাই কি প্রেম? কেজানে!

ইহার তিন চারিদিন পরে চঞ্চলের সহিত দেখা। তাহাদের বাড়ীতেই দেখা। আমাদের দুজনে খুব ভাব। বেশী না হউক অন্ততঃ পক্ষে সপ্তাহে একবার করিয়া দিনান্ত ধরিয়া আমরা দুজনে একত্র কাটাই। কোনবার বা সে আমাদের বাড়ী আসে—কোনবার বা আমি তাহাদের বাড়ী যাই। তাহার নজর এড়াইতে পারিলাম না; আমাকে দেখিবা মাত্র আমার শুষ্ক বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া সমবেদনার স্বরে বলিয়া উঠিল—"আর তুমি কিনা বল সেজন্য তোমার কিছুই আসে যায় না; একি চেহারা হয়েছে? আমার তার উপর এমন রাগ ধরছে! কি করে যে কাকারা দিদির সঙ্গে তার বিয়ে—

"দিলেই বা!"

"আচ্ছা ঠিক বলছ তুমি তাকে আর ভালবাসনা! বিয়ে ভেঙ্গে গেছে বলে দুঃখিত হওনি?"

"তুমি কি মনে কর তোমাকে আমি অঠিক কিছু বলব! কোন কথা তোমাকে বলতে না পারি, কিন্তু যা বলব তা বেঠিক বলব না,—এ বেশ জেনো।"

চঞ্চল খুসী হইয়া আমার গাল টিপিয়া বলিল "সইলো আমার, তোকে কিন্তু ভাই বড় কেমন কেমন দেখাচ্ছে। তা এতটা একজনকে বিশ্বাস করেছিলি,—সে বিশ্বাসটা ভাঙ্গলো, সে জন্যও ত কষ্ট হয়?"

"হয়েছিল অবিশ্যি; তাত জানই, কিন্তু তাই বলে যদি ভাব আমি সেই কষ্টে এখনো মারা যাচ্ছি—তা হলে—

"আমি হলে ত যেতুম! আমি যদি বিলাত থেকে এক হপ্তা চিঠি না পাই, এমন ভয় হয়, কি বলব।"

"তোর যে বিয়ে হয়ে গেছে, তোর স্বামী ভুল্লেও যে তোর ভোলার পথ বন্ধ, আর ভোলাটাই আমাদের পক্ষে যুক্তি—ও তাতেই আমাদের মুক্তি।"

চঞ্চলও হাসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা ঠিক! দিদিও (মিশ ক) ত দেখছি বেশ আছে! আমি নিজের ভাব থেকেই দেখছি উল্টো বুঝে মরি! শুনেছ অবিশ্যি দিদির বিয়েও ভেঙ্গে গেছে?"

"না। ভাঙ্গলো কেন?

"তাত জানিনে। তাঁরা ত আর আমাদের কাছে কিছু প্রকাশ করেন না। বাইরে বাইরে অমনি শুনছি যে হবেনা নাকি! বোধ করি জি—ই ভেঙ্গেছে, কেননা দিদির শুনেছি ইচ্ছা ছিল। লোকটার যাহক গুণপনা আছে—নইলে দিদি পর্য্যন্ত ভোলে?"

আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম,—একটা অনুতাপ গ্লানি হৃদয়ে বহিয়া গেল! এ বিবাহে তিনি অসম্মত হইলেন কেন! আমি কি তাহাতে লিপ্ত!

চঞ্চল বলিল—"কি ভাবছ?"

আমি বলিলাম—"তোমার দিদি কি সত্যি তাঁকে ভালবেসেছিলেন; আমার তাঁর জন্যে বড় মায়া করছে, সাধ্য থাকলে কোন রকমে বিয়েটা ঘটাতুম।'

"তোমাকে কে মায়া করে ঠিক নেই—তুমি মায়া করছ দিদিকে! আমি ত তার বড় একটা দরকার দেখছিনে। আমাদের দিদির যথেষ্ট আছে—নিজের মূল্য সে বেশ বোঝে, কেনই বা না বুঝবে? রূপগুণের কিছু কসুর নেই তার উপর টাকা। যে বিয়ে করবে, রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব এক সঙ্গে পাবে। কত লোক তার জন্য হা 'হুতাশ করে মরছে তার ত ঠিকই নেই, যদি দুঃখ করতে হয় ত তাদের জন্য বরঞ্চ কর। দিদির যদি সামান্য একটুকু আঁচড় লেগে থাকে ত এতদিনে তার দাগ বেশ মিলিয়ে পড়েছে।"

"তা কি করে জানলে? যারা সহজে ভালবাসায় পড়ে না তারা ভালবাসলে বরঞ্চ সহজে না ভোলারই কথা!"

"হ্যাঁ যদি তেমন ভালবেসে থাকে। কিন্তু সে রকমটা ত মনে হয় না। লোকটা একটু চটুকে রকম, কথাবার্ত্তায় খানিকটা চমক লাগাতে পারে—কিন্তু তার উপর যে গভীর ভালবাসা হবে তাত আমি মনে করতে পারিনে। নিদেন আমার হলেত হোত না, আর দেখা যাচ্ছে তোমারো হয়নি। তাহলে দিদিরই কি হবে?"

"বস! খুব ত লজিক দেখছি!"

"ইংরাজি নভেলে ঐজন্য first love কে ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না! সাধারণতঃ তা অনভিজ্ঞ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলেই মেনে নেয়! দিদিরও এটা খুব সম্ভব সেই রকম একটা উচ্ছ্বাস, উঠে জল বুদ্বুদের মত আবার মিলিয়ে পড়েছে। যথার্থ ভালবাসা হৃদয়ের একটা শিক্ষা,—সেটা শুধু আবেগ নয়; তার উপযুক্ত পাত্রও চাই। হ্যাঁ ডাক্তারের সঙ্গে love এটা বুঝতে পারি বটে। আজ কাল ত আমরা দিদিকে এইকথা নিয়ে ঠাট্টা করি,—তিনি কিনা তাদের ঘরাউ ডাক্তার হয়েছেন। আর মনে হয়—ডাক্তার বেশ একটু ধরা পড়েছে—"

আমার হৃৎপিণ্ডে শোণিত বেগে বহিল; মনে হইল মুখে চোকে তাহা উছলিয়া উঠিতেছে, বুঝিবা এখনি ধরা পড়ি। কিন্তু চঞ্চল লক্ষ্য করিল না—বলিয়া উঠিল—"এইযে দিদি! অনেক দিন বাঁচবে নাম করতে করতে হাজির।"

অনেক দিন পরে কুসুমের সহিত দেখা। মনে হইল, সে যেন পরিবর্ত্তিত। তাহার নয়নে সেই বিদ্যুদ্দাম প্রস্ফুরণ চাপল্যের যেন অভাব; অধরে আত্মম্ভরীময় সদা প্রস্ফুটিত আবেগ রেখা যেন নিমীলিত। আমার মায়া করিতে লাগিল। পাছে সে ভাবে আমি তাহার প্রতি অপ্রসন্ন—আর সেরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণও বর্ত্তমান; তাই আমি সহাস্য ভাবে আগেই বলিলাম; "এইযে! কুসুম! অনেক দিন পরে দেখা!"

কুসুম একটু চাপা ভাবে উত্তর করিল—

"হ্যাঁ কত দিন ভেবেছি দেখা করতে যাব—কিছুতেই কেমন ঘটে ওঠেনি। তোমরাই কোন্ আমাদের বাড়ী আস?"

ইহার উত্তর যোগাইল না—বলিলাম "আমি দেশে যাচ্ছি—"

"দেশে! কেন!"

চঞ্চল বলিয়া উঠিল, "মনের দুঃখে বনবাস আর কি !"

আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম ; ছি কুসুম কি ভাবিবে। চঞ্চলও বলিয়া বোধ হয় বুঝিল কথাটা কুসুমের মনে লাগিতে পারে। তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল—বলিল "তা পর দিদি ডাক্তারের খবর কি ?"

কুসুম বলিল—"তাঁর খবর আমি কি জানি। মণি সম্ভবতঃ বলতে পারে ; ওদের ওখানে না প্রায়ই যান ? কেন মনের দুঃখ কিসের ? মণির মত সৌভাগ্য আমাদের হ'লে আমরা ত বেঁচে যেতুম !"

উদ্দেশ্য অবশ্য ঠাট্টা, কিন্তু ইহার মধ্য হইতে সত্যের আভাষ প্রকাশ পাইল। বলিতে বলিতে কুসুমের চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। সে নিশ্বাসে ঈষৎ যেন ঈর্ষামাখা নৈরাশ্য বেদনা ব্যক্ত হইল। বুঝিলাম কুসুম ভালবাসে, সত্যই ভালবাসে ; কিন্তু কাহাকে ? তাঁহাকে না ইঁহাকে ? মিষ্টার জিকে;—না ডাক্তারকে ?

বরুণ।

[জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় ষোড়শ খণ্ড ভারতীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "গ্রহের নামকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে 'উরেনস্'কে 'ইন্দ্র' ও 'নেপচুন্'কে বরুণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মাধব বাবু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া প্রবন্ধের শিরোনামা হইতেই তদ্বিপরীত মতের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় অপূর্ব্ব বাবুর নামকরণই অধিকতর সমীচীন। অপূর্ব্ব বাবু লিখিতেছেন :—

"* * * ইতিপূর্ব্বে যে সকল গ্রহ মনুষ্যজ্ঞানগোচর ছিল তাহারা কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল জগতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব এই গ্রহই (Uranus) প্রথম মনুষ্যাবিষ্কৃত বিবেচনা করিয়া জনসাধারণ তাহাকে তদীয় আবিষ্কর্ত্তার নামে নামাঙ্কিত করিতে সংকল্প করে, এই হেতু উক্ত গ্রহ সাধারণের নিকট কখন কখন "হর্শেল" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্যোতিষী-মণ্ডলীর নিকট উপরোক্ত নামদ্বয়ের কোনটাই আদরণীয় হইল না ; গগনবিহারী জ্যোতিষ্ককে কোন মনুষ্যনামে নামাঙ্কিত করিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহারা উহাকে দেবনাম প্রদানে সচেষ্ট হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে একদল মনে করিলেন যে গ্রীক্ দেবদেবীদিগের মধ্যে অনেকেই গ্রহদিগকে স্বীয় নামে নামাঙ্কিত করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, কেবল জলাধিপ নেপচ্যুন ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন ; অতএব তাঁহারা উক্ত গ্রহকে নেপচ্যুন নাম দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু অপর একদল মনে করিলেন যে জগতে "সাত" এই সংখ্যাটি দেবাশ্রিত সংখ্যা, অতএব যখন সাতটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে তখন আর কোন গ্রহ বিদ্যমান নাই। এই কারণে তাঁহারা ইহাকে সৌরমণ্ডলের শেষ সীমায় অবস্থিত মনে করিয়া "সৌর মণ্ডলাধিপতি" বা "স্বর্গাধিপতি" নাম প্রদানে সঙ্কল্প করিলেন, বিচারে শেষোক্ত দলেরই জয় হইল ; লাটিনে Urania অর্থ "স্বর্গ" এবং Uranus অর্থ "স্বর্গপতি," অতএব গ্রহের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে "Uranus" রাখা হইল। কিন্তু জ্যোতিষীবর্গের এত বাদানুবাদ ব্যর্থ হইল ; "সাতের" উপর দেবাশ্রয় খণ্ডিত হইল, গ্রহসংখ্যা

"সাত" অতিক্রম করিয়া চলিল, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর উরেন্‌সের কক্ষ বহির্ভাগে অপর একটি গ্রহ ধরা পড়িল। * * * জ্যোতিষীবর্গ একবার গ্রহ নামকরণ বিষয়ে স্বীয় বাক্‌বিতণ্ডা দ্বারা জয়লাভ করিলেও প্রকৃতির নিয়তি দ্বারা পরাভূত হওয়াতে এক্ষণে আর নামকরণার্থ বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে ঐ গ্রহের নাম নেপ্‌চ্যুন রাখিলেন।" ভারতী ও বালক অগ্রহায়ণ ১২৯৯।

স্বর্গাধিপতির সহিত ইন্দ্র ও জলাধিপতির সহিত বরুণের নাম আমাদের মনে চিরসংস্পৃষ্ট। বঙ্গবালক স্কুল ও কলেজপাঠ্য পুস্তকে নেপচ্যুনকে চিরকাল বরুণ বলিয়া অনুবাদ করিতে শিখিয়া আসিয়াছে। কলেজ ছাড়িয়া মাতৃভাষায় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান অনুশীলনকালে সে দেখিবে তাহার এতদিনকার বদ্ধমূল সংস্কার উলট-পালট করিয়া নেপ্‌চ্যুনকে ইন্দ্রের পদাভিষিক্ত করিতে হইবে, এতদিন পরে ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বরুণাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। অথচ সেই প্রাচীন দেবতাকে কেন যে এরূপ নামবিপর্য্যয়-উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে তাহার যথেষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বরুণের সহিত 'উরেনস্'এর শব্দগত সাদৃশ্য থাকিলেও অর্থগত সাদৃশ্য যখন এখন নাই, অথচ নেপ্‌চ্যুনের সহিত উহার অর্থগত সাদৃশ্যই যখন আমাদের হৃদয়ে সংস্কার-রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে তখন জ্যোতিষিক পরিভাষায় নেপ্‌চ্যুনকে বরুণ ও উরেনস্‌কে ইন্দ্রাখ্যা প্রদান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আশা করি মাধব বাবু এই বিষয়টি আর একবার প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, ও ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালের উপর যাহাতে গ্রহের নামকরণ নির্ভর না করে, একই গ্রহ ব্যক্তিভেদে নামভেদ প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা উত্থাপিত করিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে যাহাতে একটি সাধারণ নাম স্থিরীকৃত হয় সে বিষয়ে যত্নশীল হইবেন। ভাং সং।]

উরেনস্ শব্দ। এই নবাবিষ্কৃত বরুণনামা গ্রহ, পাশ্চাত্য জ্যোতিষী জগতে উরেনস্ নামে অভিহিত হন। এই গ্রীক উরেনস্ শব্দটি সংস্কৃত অবিকল বরুণ; উ ব, রে রু, নস্ ণঃ। বরুণ আর্য্যদিগের নভোমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি সমস্ত নাভস ব্যাপার ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়; ইনি দিক্-পাল, ইনি ইন্দ্র। কিন্তু বরুণ আবার সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রাচীন গ্রীকদিগের জলদেবতা নেপ্‌টুন্। এই ষষ্ঠতারাগ্রহকে যদি বরুণ বলি তবে সপ্তম তারাগ্রহের ইউরোপীয় নাম নেপ্‌টুন্ অর্থতঃ বাঙ্গলায় বরুণ হইতে পারে না; অতএব আকাশের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে নেপ্‌টুনের অবস্থিতি প্রযুক্ত তাঁহাকে ইন্দ্র বলিলে ভাল হয়।

পঞ্চতারাগ্রহ হইতে বরুণের বৈলক্ষণ্য। বিজ্ঞান বিষয়ক ইতিহাস মধ্যে বরুণের এবং তদীয় আবিষ্কারের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর উপাখ্যান অতীব শ্রোত্রপেয়,—একান্ত হৃদয়গ্রাহী। সৌরজগতের আলোচনার অন্তর্গত এ একটি সম্পূর্ণ অভিনব প্রস্তাব। যদিও অন্যান্য গ্রহগণ সম্বন্ধে প্রাচীন কালাবধি অনেক ভ্রান্তিমূলক মত ছিল, তথাপি তাহা-দিগের মধ্যে জ্যোতিষ-জগতে কেহই অপরিচিত ছিলেন না। অন্যান্য গ্রহগণ সমধিক উজ্জ্বল; এবং নভোমণ্ডলনিরীক্ষণরূপ ব্রতপরায়ণদিগের নেত্রে, সে সমস্তের গতি অচিরেই অনুভূত হইত। এই বক্ষ্যমান্ মহান্ গ্রহ প্রাচীনদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিলেন; অতএব আদৌ ইঁহার আবিষ্কার; তদনন্তর ইঁহার ভৌতিক প্রকৃতির বিষয় বিবৃত হইবে।

হর্‌সেল। ১৭৬৫ অব্দে জনৈক জর্ম্মাণ তৈর্য্যত্রিকী জীবিকার্থে ইংলণ্ডে আসিয়া

অধিবাস করিলেন ; এবং সঙ্গীতের অনুশীলনাধীন গণিত অধ্যয়ন করিতে করিতে অচিরে দৃষ্টিবিজ্ঞানে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল। এক দিবস একটি সামান্য দূরবীক্ষণ হস্তগত হইলে, তিনি তদ্দ্বারা নভোমণ্ডলের বিচিত্র শোভা ও অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তারাগণ সংখ্যায় বাড়িল এবং নানারূপ উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিভাত হইল ; গ্রহগণ বৃহৎ, এবং ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিল ! নভোমণ্ডলের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব, এই বাস্তবী শ্রী সন্দর্শন করিয়া শ্রোত্রানন্দবিলাসী সংগীতজ্ঞ নেত্রানন্দ উপভোগে কৃতসংকল্প হইলেন।

আজ হইতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ; 'অন্তরীক্ষের অদ্ভুত শোভা আবিষ্কারের উপযোগী যন্ত্র কি করিয়া পাই' সতত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সঙ্গতি নাই যে যন্ত্র ক্রয় করেন। কিন্তু অধ্যবসায় যাঁহার সহায়, যিনি পরিশ্রমে অকাতর, যিনি উপায় উদ্ভাবনে পটু, তাঁহার কিসের অভাব ?—তাঁহার অসাধ্য কি ? তিনি স্বহস্তে দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিলেন। বিস্তর আয়াসে, নানা কৌশলে ১৭৭৪ অব্দে পাঁচফুট আধিশ্রয়নিক—ব্যবধানবিশিষ্ট এক দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হইল। প্রথম সাধ্যে সিদ্ধিলাভ দেখিয়া যথোচিত উৎসাহ সহকারে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর ও বৃহত্তর দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিলেন। অবশেষে শুদ্ধ স্বীয় পরিশ্রমে এবং নির্ম্মাণচাতুর্য্যে চল্লিশ ফুট দীর্ঘ চারিফুট ব্যাস এক প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ প্রকল্পিত করিলেন ; দূরবীক্ষণ দেখিয়া সমস্ত ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ ও দৃষ্টিবিজ্ঞানবিদ্ বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

বরুণের আবিষ্কার। রবি পরিতঃ যেমন পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন, তেমনই যুগল তারা দিগের মধ্যে একটি অন্যতরের চতুর্দ্দিকে ঘুরে কিনা তাহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৮১, ১৩ মার্চ তারিখে হরসেল মিথুনের পাদদেশস্থিত ইটানাম্নি তারার উপকণ্ঠ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রগত, তারানিচয়ের মধ্যে একটিকে বৃহত্তর দেখিয়া ভাবিলেন এটি তারা নহে, ধূমকেতু। অনন্তর উত্তরোত্তর যত অধিকতর তেজস্বী দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন উক্ত জ্যোতিষ্কের ব্যাস ততই বাড়িতে লাগিল ; তারাগণের ব্যাস বাড়িল না, তাহাদের জ্যোতিঃ কেবল উজ্জ্বলতর দেখাইতে লাগিল। দূরবীক্ষণের তেজ অধিকতর হইলে তারাগণের ব্যাস যে অধিকতর দেখায় না তাহা তাঁহার জানা ছিল। পক্ষান্তরে ধূমকেতুর আলোক এবম্ভূত যে প্রভূত তেজঃবিশিষ্ট দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে উহা অপরিচ্ছিন্ন ও কুহেলিকাবৎ দেখায় ; সুতরাং তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে এটি গ্রহ। অনন্তর উহার গতি টের পাইলেন এবং উহার কক্ষা যে ধূমকেতুর কক্ষার ন্যায় ক্ষেপণীবৎ খণ্ডবৃত্ত নহে পূর্ণবৃত্তাকার তাহাও অচিরে প্রকাশ পাইল।

এই নবাবিষ্কারের সংবাদ সহ তৌর্য্যত্রিকী জ্যোতির্ব্বিদের নাম সমস্ত ইউরোপে প্রচারিত হইল। সংবাদপত্রে, বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক-পত্রে সম্পাদকেরা অহমহমিকা পূর্ব্বক তদীয় নাম ভূয়োভূয়ঃ প্রকটিত করিতে লাগিলেন। নাম কেউ লিখিলেন হরশেল, তাঁহার স্বদেশীয়েরা কেউ লিখিলেন, হর্মস্থেল, কেউ বা লিখিলেন হরম্স্তেল, ফরাসিরা হোরোসেল ; নানা

লোকে নানারূপ বানান করিলেন। কিন্তু এই যশোধন যাঁহার অভ্যুদয়ে ভুবন আলোকিত হইল তিনি William Herschel বলিয়া স্বাক্ষর করিতেন।

তাঁহার যশোরাশি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া অতি সমাদরপূর্ব্বক আবিষ্কারবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। রাজা তাঁহার বৃত্তি বিধান করিলেন, এবং যথোপযুক্ত বেধালয় ও বাসস্থান নির্ম্মিত হইল।

নামকরণ। ফ্রেঞ্চ এবং ইউরোপের অন্যান্য লোকেরা প্রশংস্য ঔদার্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে এই নূতন গ্রহকে হরসেল বলিয়া অভিহিত করিলেন ; এবং তজ্জন্য অদ্যাপি তাঁহার নামের আদ্য অক্ষর হ ব্যঞ্জক এই ♅ সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা গ্রহটি নির্দ্দিষ্ট হয়। হর্‌সেল স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রহকে জর্জ্জতারা বলিতেন। কেহ বলিলেন উহার নাম ধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী আষ্ট্রীয়া থাকুক, কারণ এই পাপ নরলোকে ধর্ম্মতো স্থান পাইলেন না, অতএব উহাকে সুরলোকে অধিষ্টিত করা যাউক। কাহার মত হইল যে দেবমাতা সাইবেল (আমাদের অদিতি) নাম সুপ্রযোজ্য। প্রকৃটর বল্লিলেন প্রাচীন গ্রীকদিগের অমর জননী হ্রীযা নাম রাখিলেই ভাল হইত। কারণ হ্রীযা আর রাহু শব্দতঃ (এবং অর্থতঃ হইলেও হইতে পারে) একই। প্রকৃটর শুনিয়াছিলেন যে ব্রহ্মদেশে প্রবাদ আছে, রাহু নামে একগ্রহ আছে তাহাকে এখন আর দেখা যায় না ; অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সেই রাহু এই উরেনস্। প্রকৃটরের প্রাচ্য জ্যোতিষে কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বাস্তব রাহু যে কি তাহা আমাদের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। ক্রান্তিবৃত্তে চন্দ্রকক্ষার পাতদ্বয়কে রাহু আর কেতু বলে, ইহারা গ্রহ নহে, ইহাদের মূর্ত্তি নাই। অবশেষে স্থির হইল যে এই নূতন গ্রহের নাম উরেনস্ থাকুক, কারণ ইউরোপীয় পুরাণ মতে বৃহস্পতির পিতা শনি, শনির পিতা বরুণ ; এই তিনটি প্রকাণ্ড গ্রহের সম্বন্ধ অনুসারে ইহাদের উপর্য্যুপরি থাকা কর্ত্তব্য। বরুণ যখন নভোমণ্ডলের দেবতা তখন ইহারই সর্ব্বোপরি থাকা বিধেয়, কিন্তু পরে নেপ্‌টুনের আবিষ্কার হওয়াতে বরুণের সে মর্য্যাদা রহিল না।

আবিষ্কারের পূর্ব্বে দর্শন। এই নবীন জ্যোতিষ্ক গ্রহ বলিয়া অবধারিত হইলে পর বহুবিধ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহার কক্ষাদি নিরূপিত হইল, এবং অচিরে উহার গতির পরিমাণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে জানা গেল। বরুণ রাশিচক্রের কোন্ স্থানে পূর্ব্বে ছিলেন এবং পরে কোন্ স্থানে থাকিবেন তাহা বলা আর এক্ষণে দুষ্কর বলিয়া বোধ হইল না। পূর্ব্বঅবস্থান গণিত দ্বারা বাহির করাতে অবগতি হইল যে ফ্লামেষ্টিড্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত চারিজন সুদক্ষ জ্যোতির্বিদ ইহাকে উনিশবার বেধ করিয়াছিলেন। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ ১৬৯০ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা বর্ত্তমান গণিতের শুদ্ধত্বের আর সংশয় রহিল না।

ফ্লামিষ্টিড্ বরুণকে পাঁচ সময়ে পাঁচবার দেখিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেকবারই উহাকে

ষষ্ঠ শ্রেণীর তারা বলিয়া তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। লমোনিয়ের কপাল আরও মন্দ। তিনি বার বার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার গ্রহত্বের লক্ষণ কিছু ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার জ্যোতিষিক কাগজ পত্রের কিছু বিলি ব্যবস্থা ছিল না। তিনি বরুণের কথা একটা হেয়ার পাউডারের কাগজের ঠোঙ্গার গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

আবিষ্করণে হর্‌সেলের যোগ্যতা। প্রায় শতবর্ষ ধরিয়া ফ্লামিষ্টিড প্রভৃতি অনেক সুদূরদর্শী জ্যোতিষী উপর্য্যুপরি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও বরুণকে গ্রহ বলিয়া ঠাওরাইতে পারেন নাই; কিন্তু হরসেল দেখিবামাত্র বুঝিলেন যে, জ্যোতিষ্কটি স্থিরতারা নহে। হরসেল যদিও তৎকালে কোন অবিজ্ঞাত গ্রহ আবিষ্করণে প্রবৃত্ত ছিলেন না, তথাপি তিনি যখন অখিল নভোমণ্ডলের তারাগণকে এক এক করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তখন তারাগণ মধ্যে যেটি গ্রহ সেটি যে ধরা পড়িবে তাহা বিচিত্র নহে, অহেতুক নহে। আর এক কথা, তিনি তৎকালে যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতেছিলেন সে সমস্ত তাঁহারই প্রকল্পিত, তিনিই সেগুলির কারিগর, এবং তাঁহার যন্ত্র অপেক্ষা সে সময়ে আর কাহারও যন্ত্র এত ভাল ছিল না যে তৎসাহায্যে উক্ত আবিষ্কার সুসম্পন্ন হয়। তৃতীয়তঃ পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে হর্‌সেলের অতুল দূরদর্শিতা জন্মিয়াছিল; এই দূরদর্শিতা না থাকিলে বরুণ যে তারা নহে তাহা বুঝা সহজ হইত না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য, বেধযোগ্য যন্ত্র, এবং দূরদর্শিতা সকলই এই আবিষ্কারের অনুকূল ছিল। যশোভাগ্যের কথা ভিন্ন, কেবল পাত্রতাগুণে বরুণের আবিষ্কার করণে সক্ষম এমন জ্যোতিষী তৎকালে আর কেহই ছিলেন না।

দূরত্ব, ভগণ ইত্যাদি। সূর্য্য হইতে শনি যত দূর, শনি হইতে বরুণ তাহার অধিক দূর অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলকে অতিক্রম করিয়া শনি যত দূরে আছেন, এক বরুণ শনিকে অতিক্রম করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক দূরে আছেন। সূর্য্য হইতে শনির মধ্যম দূরত্ব ৮৮,৫০, ১৫,০০০ মাইল, বরুণের মধ্যম দূরত্ব ১৭৭, ৯৮, ৩৪, ০০০ মাইল। এই তৃতীয় বিরাট গ্রহ রবিপরিতঃ ৮৪ বৎসর ৬½ দিনে একবার পরিভ্রমণ করেন। ইহাঁর কক্ষের উৎকেন্দ্রত্ব অতি অল্প, .০০৪৬ মাত্র, সুতরাং ইহাঁর অপহৈলিক দূরত্ব ১৮৬, ১৭, ০৬, ০০০ মাইল, এবং পরিহৈলিক দূরত্ব ১৬৯, ৭৯, ৬২,০০০ মাইল। পৃথিবী রবিপরিতঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে দিবস সূর্য্য ও বরুণের মধ্যে আসেন, তাহার ৩৭০ দিন পরে আবার জ্যোতিষ্কত্রয়ের তদ্রূপ অবস্থা ঘটে অর্থাৎ ১ বৎসর ৫ দিন অন্তর রবি হইতে বরুণ ষড়্‌ভান্তরিত হন। এই সময় বরুণ অর্দ্ধরাত্রে যাম্যোত্তর রেখা পার হন। প্রতিবৎসর বরুণকে সন্ধ্যাকালে ছয় মাস পর্য্যন্ত দেখা যায়। বরুণ যখন স্বাতীর দ্বিতীয় পাদে থাকেন তখন তাঁহার সূর্য্য হইতে পরম সন্নিকর্ষ লাভ হয়। তিনি ১৭৯৯ ও ১৮৮৩ তে পরিহৈলিকে ছিলেন, ১৯৬৭তে পুনঃ তথা আসিবেন।

মণ্ডলের আকার ও ব্যাসাদি। বরুণমণ্ডল শনি ও বৃহস্পতিমণ্ডলের ন্যায় কেন্দ্রদ্বয়ে চাপা, কিন্তু এরূপ সপাটত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। ইহার দীর্ঘতম ব্যাস ৩২, ০০০

মাইল, কিন্তু ইহাই ঠিক কিনা তাহা বলা যায় না। দূরবীক্ষণে বিম্ব হরিতাভ দেখায়; এবং চাপাত্মক চারি কিরণ মাত্র বোধ হয়। বিম্বোপরি চিহ্নাদি দেখিয়া আবর্ত্তনকালেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। বরুণের ঘনফল পৃথিবীর ঘণফল অপেক্ষা ৬৯ গুণ অধিক। চারিটি অভিপার্থিব গ্রহের অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের সমষ্টি অপেক্ষাও বরুণ বড়। বরুণের উপগ্রহগণের গতি এবং ইন্দ্রের প্রতি তদীয় আকর্ষণ এই দুই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বব্যাখ্যাত বিধিঅনুসারে সিদ্ধ হইয়াছে যে তাঁহার সামগ্রী পৃথিবীর সামগ্রী অপেক্ষা সাড়েতের গুণে বেশি। অতএব মৃন্ময়ীর উপকরণীভূত পদার্থ অপেক্ষা বরুণমণ্ডলের পদার্থ হালকা। বরুণের সান্দ্রত্ব পৃথিবীর সান্দ্রত্বের পাঁচ ভাগের একভাগ।

বর্ণপট্টিকার ব্যাকৃতি দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, বারুণবায়ুমণ্ডল পার্থিববায়ুমণ্ডল হইতে স্বতন্ত্রভাবে আলোক নিপান করে। আমরা যে বায়ু সেবন করি তত্রত্য বায়ু এরূপ নহে, সে বায়ু বরং বার্হস্পত্য বা শানেয় বায়ুবৎ, এবং তথা যে গ্যাস আছে তাহা ভূমণ্ডলে নাই।

আলোক প্রতি সেকণ্ডে ১,৮৬, ৬২৬ মাইল যায়। অতএব সূর্য্য হইতে বারুণমণ্ডলে আলোক যাইতে ৯৫৩৭ সেকণ্ড বা প্রায় ২½ ঘণ্টা লাগে, সুতরাং রবিমণ্ডলে কোন ব্যাপার ঘটিলে বারুণীকেরা তাহা ২ঘ ৪০মি পরে দেখিতে পায়।

পার্শ্বস্থ তারা সম্বন্ধে বরুণের অবস্থান জানা থাকিলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা নির্ম্মল কৃষ্ণা রজনীতে বরুণকে শুধু চক্ষে দেখিতে পাইতে পারেন। অদ্য ৫ জানুয়ারি ১৮৯৫ তারিখে বরুণ কন্যা অতিক্রম করিয়া তুলার ২৬° ৪১′,এ আছেন এবং তাঁহার যাম্যক্রান্তি ১৭° ৭′। অদ্য কলিকাতার মধ্য রেখায় অপরাহ্ণ ২ঘ ১৪ মিনিটের সময় আসিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে দূরবীক্ষণ ভিন্ন দেখা যায় না।

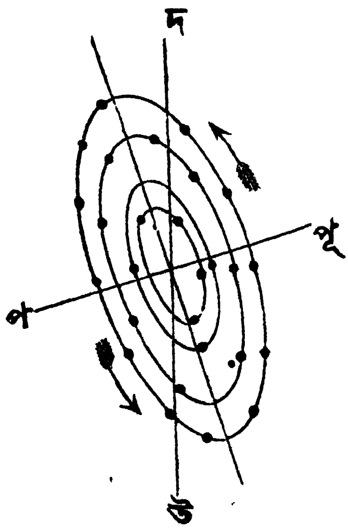
বরুণের উপগ্রহ। বিশাল দূরবীক্ষণ, অনুপম তীক্ষ্ণদৃষ্টি, নভোমণ্ডলস্থ আলোককণা উপলাভে দীর্ঘ অভ্যাস, এসকল অনুকূল সাধন সত্ত্বেও হরসেল ছয় বৎসর কাল বরুণের উপগ্রহ আবিষ্করণে নিযুক্ত থাকিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৭৮৭র প্রারম্ভে দুই উপগ্রহ পাইলেন। ইহার পর ১০ বৎসর ব্যাপিয়া পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, আর চারিটি উপগ্রহ দেখিয়াছেন, কিন্তু সে চারিটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মহা সন্দেহ ছিল। অনন্তর অন্য কোন জ্যোতিষী এ চারিটির বিষয়ে কোন কিছু বলিতে পারিলেন না।

হার লাসেল হরসেলের দূরবীক্ষণ অপেক্ষা অধিক তেজস্বী দূরবীক্ষণ সহকারে দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, এখন বরুণের চারি উপগ্রহ হইল। আরও থাকিলে থাকিতে পারে।

এই চন্দ্র চতুষ্টয়ের গতি বক্রা, অর্থাৎ আমাদের চাঁদ, বৃহস্পতি ও শনির চাঁদ ও গ্রহগণ যে দিকে ঘুরেন, বারুণ চাঁদ তাহার বিপরীত দিকে ঘুরেন। কিন্তু বারুণ কক্ষা সম্বন্ধে উপগ্রহগণের কক্ষা এমন অপূর্ব্বভাবে অবস্থিত যে, গ্রহগণের গতির দিকের সহিত উক্ত উপগ্রহ

চারিটির গতির দিকের সম্বন্ধ স্থির করা সুসাধ্য নহে। মূলগ্রহের কক্ষে উপগ্রহগণের কক্ষার অবনতি ১০১° তবেই গ্রহের কক্ষাক্ষেত্রে উপগ্রহের কক্ষাক্ষেত্র প্রায় খাড়া।

উপগ্রহগণের নাম	কক্ষার চাপাত্মক ব্যাস	ভগণকাল
১ আরিএল	১৩·″৭০	২.৫২ দিন
২ উম্ব্রিএল	১৯·″২০	৪.১৪ „
৩ তিতানিয়া	৩১·″৪৮	৮·৭১ „
৪ অবেরোণ	৪২·″১০	১৩·৪৬ „



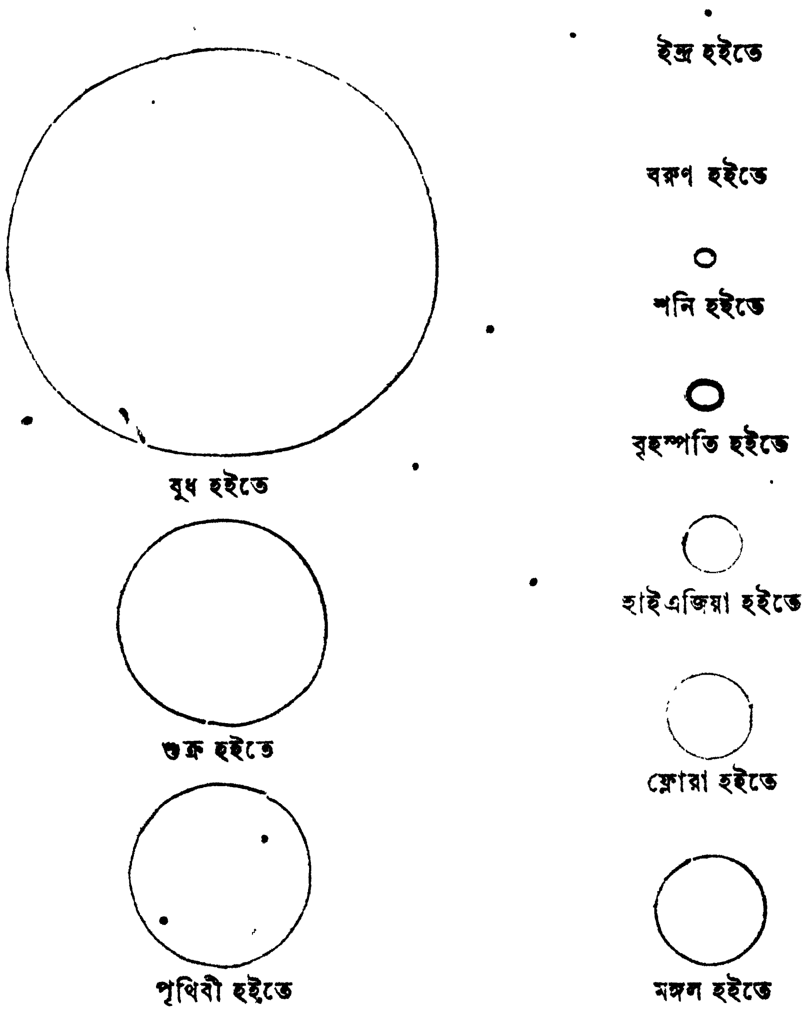
পৃথ্বী সম্বন্ধে বারুণ উপগ্রহগণের কক্ষার অবনতি।

বরুণ হইতে নভোমণ্ডল দর্শন। বরুণ হইতে দেখিলে নভোমণ্ডল আমরা যেমন দেখি তেমনই দেখায় কিন্তু সৌরজগতের দৃশ্য সম্পূর্ণ বিসদৃশ হইয়া পড়ে। বারুণিকদিগের সম্বন্ধে বুধ, শুক্রের তো অস্তিত্বই নাই, এবং দুঃখের কথা কি বলিব শ্রীমতী বসুমতী নামে যে এক গ্রহ আছেন তাহা তাঁহারা জানেনও না। ইনি পৃথুলা বলিয়াই ইহার নাম পৃথ্বী, তথাপি ইহার ক্ষুদ্রত্ব প্রযুক্ত ইনি বারুণিকদিগের অনেত্রগোচরা এবং রবিসান্নিধ্য প্রযুক্ত সতত তদীয় কিরণে সমাচ্ছন্ন থাকেন। রবি হইতে পৃথিবীর চাপাত্মক পরম ব্যবধান ৩ অংশ মাত্র। তাঁহারা মঙ্গল দেখিতে পান না, না পান গ্রহবর বৃহস্পতি দেখিতে! শনিকে তাঁহারা বুধ বা শুক্রের ন্যায় কেবল প্রদোষে বা প্রত্যূষে দেখিতে পান। একমাত্র ইন্দ্র কেবল বারুণ আকাশে যাবন্নিশা বিরাজমান থাকেন।

সুদূরস্থিত বারুণিক নেত্রে স্বয়ং সবিতা বিন্দুবৎ প্রতিভাত হন। আমারা তাঁহাকে যত বড় দেখি, বারুণিকেরা তাহার উনিশ অংশের এক অংশ পরিমিত দেখেন। আমরা যত আলোক ও তাপ পাই, বারুণিকেরা তাহার ৩৬৮ ভাগের একভাগমাত্র পায়, তবেই তাঁহারা

সম্বৎসরে যে তাপ ও আলোক ভোগ করেন, আমরা তাহা এক দিনে ভোগ করি। পার্থিব সংস্কারবশতঃ আমাদের মনে হয় বরুণলোক একটা প্রকাণ্ড জীবশূন্য প্রালেয় পিণ্ড। বারুণিক সম্বন্ধে উত্তুঙ্গ হিমবৎ শিখরও উত্তপ্ত বালুকাময় সাহারা।

নিম্নচিত্রে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ হইতে রবির সাপেক্ষিক পরিমাণ অঙ্কিত হইল।



বরুণাদিতে জীবের অস্তিত্ব। কেবল ব্যোমসাগরে ভাসমান আমাদের এই ক্ষুদ্রদ্বীপের বাহ্যপ্রকৃতি দর্শন করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা অবিধেয়। পার্থিব জীবের পক্ষে বাসের অনুপযোগী স্থান মাত্রই জীবশূন্য জ্ঞান করা বিষম ভ্রম। যাঁহার প্রভাবে অনন্ত আকাশে অপ্রমেয় অন্তরে অব্যক্তা প্রকৃতি বিবিধ বিশাল গোলরূপে ব্যক্তীভূতা হইতেছেন সেই ভূতভাবন ভগবানের মায়া তৎতৎমণ্ডলে যথাযোগ্য জীব সৃষ্টি করিতে অশক্তা হইলেন!

অবশ্য বরুণাদি সুদূরস্থিত গ্রহগণে শীতের আতিশয্য প্রযুক্ত আমাদের মত মনুষ্য কোন প্রকারে থাকিতে পারে না। কিন্তু জীবন ধারণের উপায় সর্ব্বত্র সমান নহে। ভূলোকে পশুজীবনে আর মৎস্য জীবনে যত ভেদ তত ভেদ পার্থিব জীবনে আর বারুণ জীবনে না হইতেও পারে।

আলোকের অল্পতা যদি জীবমাত্রেরই ক্লেশের কারণ হইত তবে পেচকাদি প্রাণীগণ দিবাবসানে আহার বিহারে, ব্যাপৃত না হইয়া তৎতৎ ব্যাপার দিবাভাগে পরম সুখে সম্পন্ন করিত। বলিবেন পেচকের চক্ষু সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারেনা, তবে না বলিবেন কেন যে বারুণিকদিগের পক্ষেও তীব্র আলোক অসহ্য। ভৌতিক কার্য্যসমূহে পরম রহস্য। প্রকৃতি কোন অনির্বচনীয় সমবায়যোগে জীবরূপে আবির্ভূতা হন এবং সর্ব্বত্র চেতন অচেতনে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করেন। অতএব প্রকৃতির প্রাণীরূপে ব্যক্তীভূত হওয়ার পক্ষে আলোকের স্বল্পতা বিঘ্নকর নহে।

দূরবীক্ষণ দ্বারা যেমন অগাধ অন্তরীক্ষে নব নব জগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তেমনই অনুবীক্ষণ দ্বারা সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথচ নয়নের অগোচর কত জগৎ প্রকটীভূত হইয়াছে। প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি গণ্ডূষে, প্রতিগ্রাসে কত জীবানু জীবিত বা মৃত আমাদের উদরস্থ হইতেছে! যদি আনুবীক্ষনিক জগৎ সমূহ জীবে পরিপূর্ণ তবে দৌরবীক্ষনিক জগৎ কেন প্রাণী শূন্য থাকিবে?

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অপরিচ্ছিন্ন, Ill-defined.
অপহৈলিক, Aphelion.
অভিপার্থিবগ্রহ, Terrestrial planets.
আধিশ্রয়নিক ব্যবধান, Focal distance.
আরিএল, Ariel.
আষ্ট্রীয়া, Astraea.
ইন্দ্র, Neptune.
উম্ব্রিএল, Umbriel.
ওবেরণ, Oberon.
কক্ষা, Orbit.
কন্যা, Virgin.
কুহেড়িকা, Mist.
ক্ষেপনী, Parabola.
খণ্ডবৃত্ত, Curve.
খাড়া, Perpendicular.
চাপাত্মক, Angular
তারাগ্রহ, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি।
তিতানিয়া, Titania.
তুলা, Libra.
তৌর্য্যত্রিকী, Musician
দৃষ্টিবিজ্ঞানবিদ Optician.
নিপানকরে, Absorb.
পরিহৈলিক, Perihelion.
পূর্ণবৃত্ত, Closed curve.
ফ্লাম্‌ষ্টীড়, Flamsteed.
মিথুন, Gimini.
মূলগ্রহ, Primary planet.
যাম্যক্রান্তি, South declination.
যুগলতারা, Binary stars.
লাসেল, Lassel.
লমোনিয়ে, Le Monnier.
বরুণ, Uranus.
বারুণিক, Inhabitants of Uranus
বর্ণপট্টিকা Spectrum.
শানেয়, Saturnine.
সপাটত্ব, Flatness.
সাইবিল Cybele.
সাহারা, Desert of Shahara.
সান্দ্রত্ব Density.
স্বাতী Arcturus.
হর্‌সেল, Herschel.
হেয়ার পাউডার, Hair powder.

রাম রাজার মুলুক।

(চতুর্থ প্রস্তাব)

দিবা প্রায় শেষ হয়, সূর্য্য প্রায় অস্ত যায়, এমন সময়ে বলদশকটযোগে নাগরকোয়েল হইতে কন্যাকুমারী অন্তরীপাভিমুখে আমি রওয়ানা হইলাম, সুতরাং অল্পদূর যাইয়াই রাত্রি হইল। পথিমধ্যে একখানি গ্রামে একজন ইংরাজিশিক্ষিত ব্রাহ্মণযুবার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; গাড়োয়ান বলদ লইয়া সম্মুখস্থ একটা বাগানবাটিতে আরাম করিতে লাগিল। সেই রাত্রিতে এই যুবার বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন ছিল, রাত্রি নয়টার সময় নয়জন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহাঁদের সহিত আমারও ভোজনের ব্যবস্থা হইল। এই সকল ব্রাহ্মণের যাহা মূর্ত্তি দেখিলাম তাহাতে আর্য্যরক্ত ইহাঁদের দেহস্থ ধমনীতে বিন্দুমাত্রও আছে কিনা তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। দক্ষিণাবর্ত্তের অনার্য্যেরা পরশুরাম কর্তৃক ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইয়াছিল এবং তাঁহার দ্বারা অনেক অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়। দক্ষিণাবর্ত্তের গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য্যব্রাহ্মণের মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী সম্পূর্ণ অনার্য্য, এখানে আর্য্যেরমূর্ত্তি মোটেই নাই। মালাবার উপকূলে মনুষ্যের যে মূর্ত্তি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যে মূর্ত্তি, তাহা এতই কদাকার ও অনার্য্যোচিত যে, এদেশে আর্য্যেরা কখন বাস করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, এই অপরূপ ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকারের জনশ্রুতি আছে। কন্যাকুমারী অভিমুখে আসিতে আসিতে রাইচুরের নিকট আদোনি নামক পাহাড় ভেদ করিয়া আমরা বেল্লারী নামক জেলায় পৌঁছিয়াছিলাম; যখনকার কথা বলিতেছি তখন এ পথে রেল ছিল না, সম্প্রতি এখানে এ পথ দিয়া রেল হইয়াছে। এই বেল্লারী জেলায় রামায়ণ-প্রসিদ্ধ কিষ্কিন্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা চারি দিবস পর্য্যন্ত এই কিষ্কিন্ধায় বাস করিয়াছিলাম, এখানকার মনুষ্যকে দেখিলে কে বানর না বলিবে? ঠিক কিষ্কিন্ধা পরগণার প্রাচীন অসভ্য অধিবাসীর মধ্যে রামায়ণবর্ণিত বানরাদির মূর্ত্তি এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, প্রভেদ এই যে, এই নরাকার মূর্ত্তিতে লেজ নাই। এমন কদাকার মানবমূর্ত্তি অর্দ্ধপৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও অন্য কোনও স্থানে দেখিনাই। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত অথবা ব্রহ্মার তেজে উৎপন্ন বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, দক্ষিণাবর্ত্তে আসিলে তাঁহাদের এই ভ্রম বিশ্বাস এক দিনেই অপনোদিত হইতে পারে।* যাহা হউক, ভদ্র লোকটির বাটীতে ব্রাহ্মণেরা

* শাস্ত্রী মহাশয়ের দক্ষিণাবর্ত্তে কেবল কুৎসিৎ নরমূর্ত্তিরই দর্শনলাভ ঘটিয়াছে ইহা দুঃখের বিষয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ ব্রাহ্মণের বর্ণ অতিশয় মলিন সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বল্পকাল অবস্থানেও উক্ত প্রদেশীয় শতাধিক ব্রাহ্মণের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি যাঁহাদের বর্ণ ফুট্‌ফুটে গৌর; এবং বর্ণ মলিন হইলেও মুখ চোখ নাসিকা ও ওষ্ঠ ব্রাহ্মণোচিত নহে এমন শতকরা দুইজন ব্যক্তিও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

উপস্থিত হইলে দেখিলাম, এদেশের শতকরা ৯৫ জন ব্রাহ্মণ মোটেই জুতা ব্যবহার করে না, গুবাক বা নারিকেল পত্রের ছাতা সর্ব্বত্র প্রচলিত, ব্রাহ্মণের গাত্রে পিরান বা কামিজ ব্যবহারের নিয়ম নাই, সকলেরই মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ী। এদেশের ব্রাহ্মণের পক্ষে ধূম্রপান মহাপাপ; শরীর প্রায়ই স্থূলাকার এবং ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ। পরিধানে "কেড়ানী" অর্থাৎ পালোয়ানের ন্যায় কোমরে প্রথমে 'লেঙ্গুটি', তদনন্তর তিন হস্ত পরিমাণ এক আঙ্গোছা দ্বারা কটিদেশ বদ্ধ, ইহাই বসন। গাত্র আবরণ জন্য কিছুই নাই সময়ে সময়ে ৪ হস্ত পরিমাণ উত্তরীয়বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। গোঁপ দাড়ি রাখা ব্রাহ্মণের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। মাথার সমুদয় অংশ কেশ বিহীন করিয়া রাখা হয়, মস্তকের ঠিক মধ্য ভাগ হইতে কয়েক গাছা লম্বাচুল সম্মুখের দিকে ঝুলিতে থাকে, কখনও কখনও নাসিকা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। ত্রিশূলাকারের এক প্রকার নিশান কপালের মধ্যভাগে শ্বেত বা লোহিত বর্ণের চন্দনের দ্বারা আঁকা হয়, ইহা সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি থাকে, স্নানের সময় ধুইয়া ফেলা হয়। স্নান করিয়াই আবার ঐচিহ্ন দেওয়া হয়। যাহারা অত্যন্ত গোঁড়া বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাদের সমস্ত দেহ এক প্রকার সাদা রঙ্গের মৃত্তিকাচূর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে 'মালা' ব্যবহারের বড় ধুম ধাম দেখিলাম না; তুলসীকে এদেশে 'বৃন্দাবন' বলে এবং রুদ্রাক্ষকে 'কাশীপুৎ' বলিয়া থাকে। এই অদ্ভুত নরমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ হাত পা ধুইয়া ভোজন গৃহে বসিল, আমিও এক পার্শ্বে বসিলাম। আমার গায়ে পিরান এবং পায়ে মোজা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিয়া উঠিল "এ কেরে" "এ কেরে," শিক্ষিত যুবা বলিলেন "ইনি বঙ্গদেশের পঞ্চ-গৌড় ব্রাহ্মণ, আমার সৌভাগ্য ক্রমে ইনি এক্ষণে দাসের গৃহে অতিথি।" শুনিয়াই ব্রাহ্মণেরা বলিল "অাঁ ব্রাহ্মণ!! ব্রাহ্মণের গায়ে পিরান এবং পায়ে মোজা!!" যাহা হউক অগত্যা বাধ্য হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, গায়ের বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিতে হইল, মোজাও খুলিলাম। যুবক বলিলেন "আপনি ইহাঁদের মতে এখন না চলিলে আমার ব্রাহ্মণভোজন ক্রিয়া বন্ধ হইবে"। সুতরাং তাঁহার কথা আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলাম। ক্রমে কদলী পত্রে অন্ন ইত্যাদির পরিবেশন হইলে আমি আহারের উপক্রম করিতেছি এমত সময়ে ব্রাহ্মণেরা অতি কদাকার অথচ গর্দ্দভের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে একটা শ্লোক আওড়াইতে লাগিল। আমি তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলাম না; তাহাদের চীৎকার শেষ হইলে তাহারা বলিল "তুমি বেদ পাঠ করিলে না কেন?" আমি বলিলাম "এটা কোন্ বেদ?" একজন ব্রাহ্মণ বলিল "ঋগ্বেদের একাদশ মণ্ডলের চতুর্ব্বিংশ অনুবাক।" আমি বলিলাম "বেদ পাঠ করিতে গেলে প্রথমে সংস্কার অর্থাৎ হোমের আবশ্যক, হোম ভিন্ন *বেদাবৃত্তির শাস্ত্রমতে পাঠ

* অধিকাংশ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকাংশ দক্ষিণী ব্রাহ্মণের মুখাকৃতি সমধিক আর্য্য আদর্শের অনুরূপ। সুতরাং দক্ষিণাবর্ত্তের ব্রাহ্মণরক্তে অনার্য্যরক্তও মিশিয়াছে কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে বঙ্গভূমেও কি তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না? কোন কৃষ্ণকায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণরক্তে যতদূর দাবী, বোধ হয় কৃষ্ণকায় দক্ষিণী ব্রাহ্মণের তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। ভাং সং।

নিষিদ্ধ; তদনন্তর উদাত্ত অনুদাত্ত অথবা স্বরিত স্বরাদির সহিত ক্রম-সংযোজনা করিয়া বেদ পাঠ করিতে হয়, এবং পাঠ শেষ হইলে আহুতি দিবার নিয়ম আছে। তোমাদের ত এসকল কিছুই দেখিলাম না, কেবল গাধার মত অর্থশূন্য কদাকার চীৎকারই শুনিলাম।” মালাবারী ব্রাহ্মণেরা বুঝিল যে, আমি সংস্কৃত জানি, সুতরাং তাহারা উচ্চবাক্য করিল না অনন্তর আমি সংস্কৃত ভাষায় তাহাদের সহিত কথা কহিতে লাগিলাম কিন্তু তাহারা যথোচিত শুদ্ধ ভাষায় উত্তর দিতে পারিল না। আচমন করিয়া আমরা আহারে বসিলাম। ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করিল· “আপনি কি বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ?” আমি বলিলাম “হাঁ”। একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল “কি সর্ব্বনাশ! এ লোকটা সেই দেশের ব্রাহ্মণ, যে দেশের ব্রাহ্মণেরা ছাগ মাংস, মৎস্য এবং পেঁয়াজ ভিন্ন আহার শেষ করে না। কি সর্ব্বনাশ!! তুমিও এই অখাদ্য গুলো খাও না কি?” বলা বাহুল্য, পঞ্জাব, বঙ্গদেশ এবং উত্তর পশ্চিমস্থ দেশের কনোজ ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভারতের আর কোনও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আমিষ ভক্ষণ করে না। আমি উত্তর দিলাম “কাশ্মীরের সারস্বত ব্রাহ্মণেরা নিত্য মুর্গী খায়।” একজন বুড়ো ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল “তবে তোমার পেটে দুই একটা মুর্গী দাখিল হইয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হইতেছে।” ইত্যবসরে বাটীর অধিকারী আসিয়া আমাদের কলহ মিটাইয়া দিল. আমরা আহার করিতে লাগিলাম। কলাপাতার অতি নিকটেই একটা ক্ষুদ্র পিত্তলের কটোরা বা “বাটীতে” একটা তরল পদার্থ দেখিতে পাইলাম, ব্রাহ্মণেরা ঐ তরল পদার্থ ভাতে মিশাইয়া আহার করিতে লাগিল; আমি ভাবিলাম ইহা বুঝি ঘৃত হইবে, এই ভাবিয়া আমিও উহা ভাতে মিশাইলাম। কিন্তু মুখে দিবা মাত্রই আমি, দৌড়িয়া ঘরের বাহিরে আসিলাম এবং সজোরে আমার বমন হইল। শিক্ষিত বন্ধু জিজ্ঞাসিলেন “বমন হইল কেন?” আমি বলিলাম “কি সর্ব্বনাশ! নারিকেল তৈল ভাতে মিলাইয়া খাওয়ার প্রথা এদেশে বর্ত্তমান তাহা জানিতাম না।” বন্ধু বলিলেন “ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ মালাবার উপকূলের সর্ব্বত্র নারিকেল তৈলে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাই নিয়ম, আমাদের দেশে ঘৃতের ব্যবহার নাই, আমরা নারিকেল তৈল ভাতে মিলাইয়া খাই।” শুনিয়া আমি অবাক হইলাম, কিন্তু আমরা নারিকেল তৈল খাই না শুনিয়া তিনি আরও অবাক হইলেন। যাহা-হউক, আমার সে রাত্রে অন্ন আহার হইল না; এদেশে ময়দা, আটা, পুরি, ইত্যাদির নাম পর্য্যন্ত শতকরা ৯৯ জন শুনে নাই; রাত্রে দুগ্ধও কলাদি খাইয়া রহিলাম। প্রভাতে এই গ্রাম হইতে রওনা হইয়া বেলা ৯টার সময় কন্যাকুমারীতে পৌছিলাম। পৌছিবার অল্প পূর্ব্বেই বিশাল বারিধির তরঙ্গমালার তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে বলদ শকট ভারত মহাসাগরের তটে আসিয়া পৌছিল। গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে নামিলাম; সেই বিশালাম্বুধির তটে দাঁড়াইয়া উর্ম্মিমালা দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের শোভায় আত্মহারা হইলাম। ভাবিলাম কোথায় বঙ্গদেশ আর কোথায় কুমারিকা অন্তরীপ!! এই সুদূর দেশেও দয়াময় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপা ও মহিমায় একাকী নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পাইতেছি। অদূরে

কন্যাকুমারীর মন্দিরের উপরিস্থিত উড্ডীয়মান লোহিত পতাকা দেখিতে পাইলাম, সেই পতাকার অনুসরণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির খুব বড় নহে; চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত একটা অনতিবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যে একটা মন্দির এবং এই মন্দিরের মধ্যে আর একটা মন্দির, এই দ্বিতীয় মন্দিরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শিবালয়াকৃতি গৃহ, তন্মধ্যে দেবী (কুমারী) "কন্যা" শাণিত তরবারী হস্তে লইয়া ভারত মহাসাগরের নীল সলিলাভিমুখে তাকাইয়া আছেন। মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মানা এবং ক্ষুদ্র। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বর্ণ নির্ম্মিত। ঠিক ভারত মহাসাগরের ঘাটের উপরেই এই প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্রের উর্ম্মিমালা আসিয়া মন্দিরের প্রাচীরকে সময়ে সময়ে স্পর্শ করে। রঘুকুলাবতংস মহারাজ রামচন্দ্র এই মন্দির ও দেবীর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবীর এইমূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় যেন, ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কুমারী কন্যা রূপ ধারণ করিয়া হিন্দুস্থানের দক্ষিণ প্রান্তটিকে তরবারী হস্তে সমুদ্র তটে সবলে রক্ষা করিতেছেন। আমি মন্দিরের সম্মুখের ঘাটে বসিলাম, মহাসাগরের তরঙ্গমালা আসিয়া আমার দেহ ধৌত করিতে লাগিল। সেই লবণাম্বুতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইলাম। ভারত মহাসাগরের এই অংশের বর্ণনা করা সহজ নহে; কয়েক স্থানেই ভারত মহাসাগর দেখিয়া ছিলাম কিন্তু এখানে যাহা দেখিলাম তাঁহা সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। আমি সমস্ত দিন সমুদ্র তটস্থ প্রকষ্ঠাবরণে (বারান্দায়) বসিয়া রহিলাম। সমুদ্রের সম্মুখস্থ ঘাটগুলি সুদৃঢ় প্রস্তর দ্বারা বাঁধান; ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা অনেক ব্যয় করিয়া উচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘাটগুলিকে বাঁধাইয়া দিয়াছেন। মহাসাগরে অপরাহ্ণে বিবিধ প্রকার জন্তু এবং দুই একটা মৃত দেহকে ভাসিয়া যাইতে দেখিলাম। অদূরে একটা বিলাতী জাহাজ বিপদে পড়িয়াছে শুনিতে পাইলাম, পরদিন অন্যত্র হইতে জাহাজ আসিয়া এই জাহাজে রক্ষা করিয়াছিল। কি জন্য বিপদ হইয়াছিল, অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম না।

বেলা প্রায় একটার সময় মন্দিরের পুরোহিত আসিয়া আমাকে ও আমার শকটবানকে আহারের জন্য অনুরোধ করিল। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণ আমাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। মন্দিরে হোমের জন্য সদাসর্ব্বদা ঘৃত মজুদ থাকে, সুতরাং আমাদের ডাল ব্যঞ্জনাদিতে ব্রাহ্মণ নারিকেল তৈল দেন নাই। পুরোহিত বলিলেন "মহারাজা বাহাদুরের হুকুম এই যে, বিদেশী ভদ্র লোকেরা মন্দিরের তত্ত্বাবধানে তিন দিন পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে এই তীর্থস্থানে থাকিতে পারেন; আপনি ইচ্ছা করিলে অধিক দিন থাকিতে পারেন, তদ্বিষয়ে আপনার চিন্তা নাই।" আমি ব্রাহ্মণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, দুই তিন দিনের অধিক আমি থাকিতে পারিব না, অন্যত্রে বিশেষ প্রয়োজন আছে। আহার সমাপনের পরে একজন হিন্দুস্থানী যুবা আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল, সে বলিল "এই সুদূর মহাতীর্থ স্থানে বিদেশী লোককে এদেশের ভাষা বুঝাইয়া দিবার জন্য আমি ত্রিবাঙ্কুর রাজসরকার হইতে মাসিক আট টাকা বেতনে দ্বিভাষী নিযুক্ত আছি।" এই ব্রাহ্মণকে বাঙ্গালী ব্রহ্মচারিণীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে আসিয়া ছিলেন, একদিন

মাত্র অবস্থান করিয়া কোন্ পথে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহা কেহই জানেন না। সাহাহ্নে আমি সমুদ্রতটে একটি ক্ষুদ্র অথচ রমণীয় বাঙ্গালো ঘরে বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম এখানে রাত্রিও কাটাইলাম। এই বাঙ্গালো ঘরে মহারাজা স্বয়ং আসিয়া বাস করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিদেশী বিশিষ্ট ভদ্র লোকেরা দুই একদিন আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে এমন নিয়ম আছে। পরদিন প্রাতেঃ আমি কন্যাকুমারী গ্রাম দেখিতে গেলাম। হিন্দুস্থানী দ্বিভাষী সঙ্গে রহিল। তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম, কন্যাকুমারীর মন্দিরে দিবসে ৪ বার এবং রাত্রে ৪বার "ভোগ" (অর্থাৎ নৈবিদ্যাদি প্রদান) হয় ; রাত্রে নারিকেল তৈলের প্রদীপ জ্বলে এবং ভোরের সময় দেবী কুমারীমূর্ত্তি ছাড়িয়া নরমূর্ত্তি ধারণ করেন।" অনেকের মুখেও ওকথা শুনিয়াছিলাম, কেহ কেহ শপথ করিয়া একথা বলিয়াছিল। পুরোহিতকে দশটি টাকার লোভ দেখাইয়া বলিলাম; "একদিন আমাকে দেবীর নরমূর্ত্তি দেখাইয়া দিউন" পুরোহিত বলিল "এ মূর্ত্তি পুরোহিত ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু এই দশটি টাকা প্রণামী স্বরূপে আপনি দিতে পারেন।" আমি শুনিয়া অবাক হইলাম।' যাহাহউক, গ্রাম দেখিতে গিয়া সে সময়ে আমার রোজ নামচা (Diary) মধ্যে যাহা লিখিয়াছিলাম, সেই প্রাচীন ডাইরীতে এখনও ঠিক তাহাই লেখা আছে। সেই স্বহস্ত লিখিত পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "২রা নবেম্বর। প্রাতঃকাল বেলা ৭টার সময় কন্যাকুমারী গ্রাম ভ্রমণ ও দর্শন। সমগ্র গ্রামে দুইঘর মুসলমানের বসতি ইহারা সমুদ্রের মৎস বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৩৪ ঘর ব্রাহ্মণের বসতি, প্রতি ঘরে গড়ে ৩ জন লোকের বাস। বৈশ্য ৪ ঘর ; শূদ্র অধিক। শূদ্রের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রই সমুদয়, ইহারা "অস্পর্শ পরিয়া," ইহাদের সংখ্যা প্রায় দেড়শত। ৩ ঘর খৃষ্টানের বসতি। খৃষ্টান ও মুসলমান এবং পরিয়ারা গ্রামের প্রান্তে বাস করে। খৃষ্টানেরা মুক্তিফৌজের অন্তর্গত। জল বায়ু ভাল। গ্রামটিতে অনেক কৃষ্ণবর্ন দেখা যায়। পানীয় জলের জন্য গ্রামে ১৭টি কূপ আছে। এই স্থান নাগোরকোয়াল জেলার অন্তর্গত। চব্বিশ ঘণ্টাই সমুদ্রের তরঙ্গের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনা যায়। স্থান শোভাময় হইলেও বাসের উপযুক্ত নহে।"

তৃতীয় দিবস প্রাতে আমি কন্যাকুমারী পরিত্যাগ করিয়া আবার সেই পথ দিয়া নাগোরকোয়েলে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে দুই একদিন বিশ্রামলাভ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবিক্রম্ নগরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। প্রথম দিবস পথে পদ্মনাভপুরে বাসা হইল। এই পদ্মনাভপুর অতি প্রাচীন। "ভোজনে জনার্দ্দন এবং শয়নে পদ্মনাভ" প্রবাদে শুনা যায়, এখানে সেই পদ্মনাভের মন্দির। নারায়ণমূর্ত্তি মন্দির মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, এই মূর্ত্তি বৃহৎ এবং মন্দিরও বৃহৎ। নাগোরকোয়েল জেলার ডিষ্ট্রীকট্ মাজিষ্ট্রেট ও কালে-ক্টরকে পদ্মনাভপুরে থাকিতে হয়। কারণ এই যে এই মন্দিরের তত্ত্বাবধারণের ভার কালেক্টরের হস্তে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের জেলার মাজিষ্ট্রেটদিগকে দেওয়ান—পেস্কার বলে। ইহাদের হস্তে দেবোত্তর সম্পত্তির ভার থাকে বলিয়া হিন্দু ভিন্ন অন্য কেহ এই পদে নিযুক্ত

হয়েন না। পদ্মনাভপুর গ্রাম বড় নহে, এ স্থানও বাসোপযুক্ত নহে। এ দেশে বারমাসই গ্রীষ্ম; শীত বা বসন্ত বলিয়া কোনও ঋতু এ দেশে নাই। কিন্তু শোভায় সকল স্থানেই বারমাস বসন্ত আছে এ কথা বলা যায়। আম্র বারমাস ফলে; নারিকেল, তাল ও তেঁতুল বৃক্ষ অপর্য্যাপ্ত। পদ্মনাভপুর ছাড়িয়া দ্বিতীয় দিবসে আমি যে গ্রামে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলাম সেই গ্রামের সম্মুখে ভুবনবিখ্যাত গন্ধমাদন পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী লইয়া গিয়া হনুমান শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচাইয়া ছিল।

গন্ধমাদন পর্ব্বতের সম্মুখস্থ যে গ্রামে আমার বলদশকট থামিল সে গ্রামটি খুব বড় নহে; এই গ্রামে দুই ঘর ব্রাহ্মণ, এক ঘর ক্ষত্রিয়, বার ঘর বৈশ্য, সাত ঘর মুসলমান এবং ৩৮ ঘর শূদ্রের বসতি। এতদ্ভিন্ন ৪ ঘর প্রোটেস্‌টাণ্ট ও ৫ ঘর রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানের বাস আছে। এই গ্রামে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রাতেঃ ভুবনবিখ্যাত গন্ধমাদন শৈল দেখিতে গেলাম। পর্ব্বতটি নিকটে নহে, অনেক দূরে অবস্থিত; যে পথ দিয়া যাইতে হয় তাহাতে গাড়ী চলে না, উষ্ট্র বা হাতী কষ্টে যায়; অশ্ব ভিন্ন অন্য বাহনের এখানে প্রয়োজন নাই। রাস্তা মোটেই নাই; চাষাদের ক্ষেত্রের উপর দিয়া, কোথাও পতিত শুষ্ক মরুভূমিবৎ ভূমির উপর দিয়া, কোথাও বা জঙ্গল পাহাড় ভেদ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। এ পথে দস্যু ভয়ও আছে, কোথাও পানীয় জল বা কোনও খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, তদ্ভিন্ন বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই; এ সকল ব্যতীত হিংস্র পশুদিগেরও অত্যাচার আছে। আমি এ সকলের কিছুই চিন্তা না করিয়া একটা বেগবান ও হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব সংগ্রহ করিয়া তাহারই পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক এই পথে চলিলাম। গাড়বানকে গ্রামে রাখিয়া গেলাম। আমার সঙ্গে দুইজন মুসলমান, একজন খৃষ্টান এবং সাতজন হিন্দু রহিল, তদ্ভিন্ন একজন সহিষও ছিল। দুই বোতল দুগ্ধ, তিন বোতল পানীয় জল এবং কিছু ফলমূল সঙ্গে লইলাম। যে কষ্টে এই পথ অতিক্রম করিয়াছি তাহা স্মরণ হইলে এখনও আশ্চর্য্যে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। প্রাতেঃ ঠিক সাতটার সময় রওয়ানা হইয়া রাত্রি ঠিক সাড়ে আট ঘটিকার সময় গন্ধমাদনের পাদদেশে পৌঁছিলাম। অন্ধকার রাত্রি; কোথাও. মনুষ্যাবাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিলাম না। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই ছোট ছোট বাবলা কাঁটার ঝাড় এবং লজ্জাবতী লতার বন। ইহারই এক পার্শ্বে একটা বিলাতী ব্লাংকেট্ বিছাইয়া রাত্রিযাপন করিলাম। সকলেরই পরিশ্রম ও কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু সকলকে একেবারে শুইতে দিলাম না, তিনজন করিয়া ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাহারা দিতে লাগিল, বাকি লোকেরা শুইয়া রহিল। এইরূপে নিরাপদে রাত্রি কাটাইয়া প্রাতঃকালে সাড়ে ছয়টার সময় আমরা তাড়াতাড়ি শৈলারোহণে প্রবৃত্ত হইলাম। বেহারের অন্তর্গত গয়া জিলার সীমান্তবর্ত্তী জাহানাবাদ মহকুমায় "বড় বড়" নামে এক পাহাড় দেখিয়াছিলাম; ষ্টেশন মাষ্টার বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় হাতী পৃষ্ঠে আমাকে ঐ পাহাড়ে লইয়া গিয়াছিলেন; গন্ধমাদনে উঠিয়া দেখিলাম, এই পাহাড় ঠিক যেন দ্বিতীয় "বড় বড়" পর্ব্বত। ভারতের আর কোনও শৈলের

সহিত ইহার তুলনা হয় না। এই পর্ব্বত খুব উচ্চ নহে, খুব ছোটও নহে, মধ্যমাকার; কিন্তু উচ্চতা অধিক না হইলেও প্রশস্ততা কম নহে। পর্ব্বতের চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা জাতীয় বৃক্ষ, লতা, ফুল, ফল, মৃগ, পক্ষী, শৃগাল ইত্যাদি দেখিলাম। সঙ্গের একটা লোককে "বিশল্যকরণীর" কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে অনেক কষ্ট করিয়া যাহা আনিয়া দেখাইল তাহা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত "অমৃতবল্লী" লতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এদেশে এই লতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে, ইহা আমাদের দেশে প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য, ইহা প্রসিদ্ধ মহৌষধি। পর্ব্বতের চারিধারেই অনন্তমূল এবং লজ্জাবতী লতার বন দেখিতে পাইলাম। মালাবার উপকূলে (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে) গন্ধমাদন শৈলকে গন্ধমাদন ভিন্ন "মলয় মারুতী" এবং "মারুতী মলয়ও" বলিয়া থাকে। পাহাড়ের এক পার্শ্বে একটা খুব প্রাচীন মন্দির দেখা গেল, এই মন্দিরাভ্যন্তরে কালো পাথরের একটা ভয়ানক হনুমানমূর্ত্তি দেখিলাম। মন্দিরের ভিতর বাহির জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখানে মানুষের পদার্পণ হয় না বলিয়া বোধ হইল। যথাসাধ্য পর্ব্বত দর্শন করিয়া মনের সাধ মিটাইলাম। সঙ্গের লোকেরা বলিল, "আইসুন আপনাকে আরও কিছু নূতন জিনিষ দেখাই।" তাহারা পাহাড়ের আর এক প্রান্তে লইয়া গিয়া বড় বড় প্রাচীন গুহা দেখাইল; বলিল "এই গুহায় ঋষিরা তপস্যা করিতেন। লুক্কায়িতভাবে স্থানে স্থানে এখনও তপস্বী আছেন।" এক স্থানে একটা প্রকাণ্ড সুরঙ্গ দেখিলাম, আর এক স্থানে একটা বৃহৎ মোটা অথচ ভগ্ন প্রস্তর খণ্ডের উপরে মালয়লী ভাষায় খোদা আছে "নিরূপু ইরীক্কে, বয়ম্ ইল্লে।" অর্থ এই যে, অগ্নি আছে কিন্তু ভয় নাই। ইহার কিছুই ভাবার্থ করিতে না পারিয়া অনেকক্ষণ কৌতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শ্রান্ত হইয়াছি এমন সময়ে সঙ্গের লোকেরা তাগীদ্ দিতে লাগিল, আমরা শীঘ্র শীঘ্র নীচে নামিতে লাগিলাম। নামিবার সময় শৈলের গাত্রে আর একটা গুহা দেখা গেল, ঐ গুহার মুখটি একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা বন্ধ। ঐ প্রস্তরের উপরে মালয়লী অক্ষরে যাহা লেখা আছে তাহার অর্থ এই—

"খুলিও না। যদি হিন্দু হও,
শত ব্রাহ্মণ বধ এবং সহস্র
গোবধের শপথ। খুলিও না।
যদি মুসলমান হও, শত শূকর
ভক্ষণের দিব্য।"

ভাবিলাম, এ আবার কি!! অত্যন্ত কৌতূহল হইল, কিন্তু ভয়ে সে পাথরে হাত দিতে পারিলাম না। আমার সঙ্গে একজন খৃষ্টান ছিল, সে বলিয়া উঠিল "এই শপথ হিন্দু ও মুসলমানের জন্য, খৃষ্টানের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই।" এই কথা বলিয়া নিমেষ মধ্যে সেই বলবান খৃষ্টীয় যুবক পাথর টানিয়া ফেলিয়া দিল। উঁকি মারিয়া দেখি, ভয়ানক অন্ধকার, সেই অন্ধকারের পথ দিয়া পারাবত ও চটাই পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে। অবশেষে

অনেক পরামর্শের পরে, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আমরা সেই অন্ধকারভরা গুহায় প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়া দেখি, যাইবার কোনও কষ্ট নাই, প্রশস্ত সিঁড়ি মধ্যে পা ফেলিয়া নিরাপদে যাওয়া যায়। প্রায় বার মিনিটের পরে আমরা আলোক পাইলাম, সেই আলোক ধরিয়া বাহিরে গিয়া দেখি অতি রমণীয় চত্বর, তাহার মধ্যে নির্ম্মল জলের কূপ, চতুর্দ্দিক মনোমোহন শস্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বত্র আশ্চর্য্যরূপে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এক দিকে একটা ক্ষুদ্র মন্দির, তন্মধ্যে যোগিনী মূর্ত্তি; তাহার পার্শ্বে ভাণ্ডার ঘর, তদনন্তর একখানি ছোট সুন্দর "বাঙ্গলো।" মন্দিরে বসিয়া এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পূজা করিতেছিলেন; কূপের ধারে এক বালিকা চন্দন ঘসিতেছিল এবং বাঙ্গলো ঘরে এক পরমা লাবণ্যবতী যুবতী একখানা পুস্তক পড়িতে ছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া বালিকা দৌড়িয়া গিয়া যুবতীকে কি বলিল, যুবতী বাহিরে আসিলে দেখিলাম, ইনি আমাদের সেই পরিচিতা বাঙ্গালী ব্রহ্মচারিণী !! আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া তিনি বলিলেন "এখানে কেমন করিয়া আসিলেন ?" আমি সমুদয় ইতিবৃত্ত তাঁহাকে বলিলাম। বিনা অনুমতিতে প্রস্তর খোলা হইয়াছে বলিয়া তিনি অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আমরা সে দিন ও সে রাত্রি এই সাধুর আশ্রমে পরম পবিত্র ভাবে যাপন করিলাম।

সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মচারিণীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। অনেক অনুরোধের পরে সংক্ষেপে তিনি আপনার যাহা কিছু আত্মপরিচয় দিয়া ছিলেন, আমার সে সময়ের লিখিত রোজ্‌নাম্‌চা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "আমার আদিনাম ধারামতী, আমি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কন্যা, পিতার নিবাস ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর মহকুমার অন্তর্গত, (গ্রামের নাম বলেন নাই।) স্বামীর নাম বরদা প্রসন্ন ভাদুড়ী। পিতা কিছু কাল মোক্তারী করিয়া কলিকাতা এবং ঢাকায় ব্যবসায় করেন, ব্যবসায় দ্বারা বিশেষ ধনবান হইয়া উঠেন। আমি তাঁহার এক মাত্র অপত্য; অন্য কন্যা পুত্র ছিল না। একাদশবর্ষে আমার বিবাহ হয়, তের বৎসরে আমি বিধবা হই। আমার বিধবা দশা দেখিয়া পিতা মাতা শোকসাগরে মগ্ন হয়েন। কাশী, প্রয়াগ, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দেখাইয়া আমাকে ইঁহারা জয়পুরে গোবিন্দজী দেখাইতে লইয়া যান। তথায় আমার দিব্যচক্ষু লাভ হয়, পিতামাতাকে আরও কাঁদাইয়া গোপনে পালাইয়া একাকিনী পাহাড়ে ও জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যে উপনীতা হই। সেখানে গুরু পাইয়াছিলাম; দীক্ষার পরেই ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতেছি। এখানে যে বৃদ্ধ মহাত্মাকে দেখিতেছেন, ইনি গোয়ালিয়রে আমাকে সংস্কৃত পড়াইয়াছিলেন। পিতামাতা আমাকে সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, আমি গুরুর সাহায্যে ৪ টি ভাষা শিক্ষা করিয়াছি।" ইত্যাদি। ঐ ব্রহ্মচারিণীর বর্ত্তমান নাম "ভবানী সইয়া" অথবা 'ভবানীমাতা।'

পরদিন প্রভাতে ছয়টার সময় আমরা গন্ধমাদন পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের দিকে আসিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারিণী বলিলেন "বোধ হয় আমিও শীঘ্র যাইতেছি।"

আনন্দময়ী।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাতের বিষয় আলোচিত হইলে দেখা যায় পশ্চিম বঙ্গের কতিপয় পূর্ব্বতন শিক্ষিতা মহিলার নাম মাত্রই উল্লিখিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে, কতিপয় প্রাচীন ভূম্যধিকারীর অন্তঃপুরস্থা মহিলাদিগের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু কেহ যদি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন,—তবে জানিতে পারিবেন, বঙ্গের প্রতি জনপদের প্রাচীনতম ভূম্যধিকারীদিগের পরিবার মধ্যেই বিদ্যালোচনার সবিশেষ চর্চ্চা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত বিদুষী রমণী অনেক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা যদিও তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,—কিন্তু তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গলা ভাষাও তাঁহারা শিক্ষা করিতেন। স্বর্গীয়া আনন্দময়ী দেবীকে তাহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায়। তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি বঙ্গজ বৈদ্যপ্রধান স্থান মাত্রেই শুনিতে পাওয়া যায়।

লালাবংশীয় রামগতি রায়, জয়নারায়ণ রায় ও রাম গতির কন্যা আনন্দময়ী যে কিরূপ কবিতার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন,—অথবা, তাঁহাদের রচিত কি কি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে,—তাঁহারা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন,—কোন্ স্থানের অধিবাসী তাহাও পূর্ব্ববঙ্গের মুষ্টিমেয় লোক ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই বিশেষ অনুসন্ধান রাখেন না। আমরা এই অভাব দূর করিবার জন্য এপর্য্যন্ত কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই। সম্প্রতি ২।৩ বৎসর হইল ঢাকার স্কুল সব ইনিস্পেক্‌টার বাবু অক্রূর চন্দ্র সেন পূর্ব্ববঙ্গের অনেক লুপ্তরত্ন উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রাচীন কবিদিগের বিরচিত কতক গুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উল্লিখিত কবিদিগের বিরচিত কতিপয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অক্রূর বাবু প্রত্যেক গ্রন্থের এক এক খানা নকল রাখিয়া মূলগ্রন্থ গুলি এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের এই সমুজ্জ্বল রত্নমালা সাধারণ সমীপে প্রকাশ পায় তাহারও চেষ্টা করিতেছেন, এজন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রের ধন্যবাদার্হ।

পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তীরে যেরূপ অসাধারণ সুধী পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্ম হওয়ায় বাঙ্গলার গৌরব ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তদ্রূপ পদ্মার কুটীল আবর্ত্তবিঘাত তটদেশে শত সহস্র মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াও বঙ্গের মুখ কম উজ্জ্বল করেন নাই। জাহ্নবী তীরে যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপের অবস্থান, পদ্মাতীরে সেইরূপ বিক্রমপুরের সংস্থিতি। এই স্থানে কত কত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন—যাঁহাদের নাম আজিও বুধমণ্ডলীর স্মৃতি হইতে বিলোপ সাধন হয় নাই। বিক্রমপুরের পূর্ব্ব বিক্রমের খর্ব্বতা হইলেও,—আজিও উহা বঙ্গের মুখ কম উজ্জ্বল করিতেছে না।

বিক্রমপুরেরর মধ্যে রাজনগর ও জপসা দুটী প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। রাজনগর রাজবল্লভের কীর্ত্তিকলাপ বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গের প্রধান নগর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। জপসা ঐশ্বর্য্য কিম্বা কীর্ত্তিতে তাহার নিম্নেই প্রসিদ্ধ ছিল। রাজনগরের রাজবংশ ও জপসার

লালাবংশ একই মহাপুরুষ হইতে সমুদ্ভূত। ঐ মহাত্মাই অম্বষ্ঠ কুলসম্ভব বেদগর্ভ সেন। তাঁহার ১ম পুত্র নীলকণ্ঠের সন্তান জপসাগ্রামে এবং ২য় পুত্র শ্রীকৃষ্ণের সন্তান রাজনগরে অবস্থান করিতেন। ইঁহারা বংশানুক্রমেই ভূম্যধিকারী ছিলেন।

নীলকণ্ঠের প্রপৌত্র গোপীরমণ সেন জপসার জমীদারীর সূত্রপাত করেন। বাখরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টার মিঃ জে, বেভারিজ সাহেবকৃত ঐ জিলার ইতিহাসে তাঁহার ও তৎবংশীয় বাবু হরনাথ রায়ের বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। গোপীরমণের যথাক্রমে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণরাম রায় (দেওয়ান) রাম মোহন রায় (ক্রোড়ী) সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা তদানীন্তন বাদসাহের নাওয়ার তহসীলদার ছিলেন। পরগণে চাঁদতাপ প্রভৃতি তাঁহাদের আয়ত্তাধীন ছিল। (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং'র ৫ম রিপোর্ট দেখ।) কৃষ্ণরাম দেওয়ানের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাম প্রসাদ রায় নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া "লালা" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। লালা রাম প্রসাদ রায় নিজ ক্ষমতায় বহু বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার যথাক্রমে পাঁচটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে তৃতীয় কীর্ত্তি নারায়ণ ও ৫ম নবনারায়ণ অকালে কালকবলিত হইয়াছিলেন। ১ম রামগতি ২য় জয় নারায়ণ বিদ্যার ক্ষমতায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাব লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি।

রামগতি রায়কৃত "মায়া তিমির চন্দ্রিকা" নামক আধ্যাত্মিক বাঙ্গলা গদ্যগ্রন্থ ও "যোগকল্পলতিকা" নামক যোগ বিষয়ক সংগ্রহ এবং জয় নারায়ণ রায় কৃত "হরিলীলা" ও "চণ্ডিকা মঙ্গল" বাঙ্গলা কাব্যগ্রন্থদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রাজনারায়ণ "পার্ব্বতী পরিণয়" নামক যে সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা আর এখন পাইবার উপায় নাই। এই সমুদয় গ্রন্থ ১৬৯৪ শকে ও তৎপূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। "হরিলীলা" গ্রন্থে উল্লেখ আছে "অত্রিপুত্র জয় নেত্র ষড়াননানন। বসুমতী শাকে পুঁথি হল সমাপন।"—পরে লিখিত হইয়াছে ;—

"নারায়ণ প্রভুপদে করিদড় মন।
ষোড়শ চৌরাণৈ্য শাকে পুস্তকলিখন॥"

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রায় ১২৪ বৎসর হইল ঐ "হরিলীলা" কাব্য বিরচিত হইয়াছে। জয় নারায়ণ কৃত "হরিলীলা" গ্রন্থে আনন্দময়ী দেবী বিরচিত কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। জয় নারায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্রীর গৌরবরক্ষার জন্যই উহা স্বীয় রচিত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে আমরা উহার নামগন্ধও এই সময়ে সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। আমরা সম্প্রতি উল্লিখিত কবি মহোদয়গণের বিস্তৃত কাহিনী প্রকাশে বিরত থাকিয়া আনন্দময়ী দেবীর জীবনী ও তাঁহার রচিত কয়েকটী কবিতা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লালা রামগতি রায়ের যথাক্রমে চারিটী কন্যা ও হরমোহন নামে একটী পুত্র জন্মিয়া-

ছিল। (পূর্ব্বোল্লিখিত হরনাথ রায় হরমোহন রায়ের পুত্র।) তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম আনন্দময়ী। এই মহিলা আপন পিতা ও পিতৃব্যগণের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, শিশুকাল হইতেই শিক্ষার প্রতি নিরতিশয় যত্ন দেখিয়া পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আনন্দময়ীও তাহাতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এতদূর অধিকার জন্মিয়াছিল—বিদ্বান পুরোহিতেরা "চণ্ডি" পাঠকালে কোনও শব্দ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে ঐ ললনা অনায়াসে তাহা ধরিয়া ফেলিতেন, এজন্য পুরোহিতগণ ঐ পরিবার মধ্যে কোন কার্য্যাদি করাইতে গেলে বিশেষ সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতেন।

রামগতি যেরূপ বিদ্বান ছিলেন,—যোগমার্গেও তাঁহার তদনুরূপ অধিকার ছিল। তাঁহার রচিত প্রত্যেক গ্রন্থই যোগবিষয়ক আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে,—পরিচিত লোকমাত্রেই তাঁহার দ্বারা সেই বিষয় মীমাংসা করাইয়া লইতেন। মহারাজা রাজবল্লভ যখন "অগ্নিষ্টোম" "বাজপেয়" প্রভৃতি মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন যজ্ঞক্ষেত্র ও যজ্ঞকুণ্ডাদি নিরূপণ সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে মতদ্বৈধ হইয়াছিল। পরে স্থিরীকৃত হয় উহা মীমাংসার জন্য রামগতির নিকট লোক প্রেরণ করা হউক;—তাঁহাকে রাজসভায় আনাইয়া মীমাংসা করিতে হইবে। সুতরাং বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া পত্রসহ তাঁহার নিকট লোক প্রেরিত হইল। যৎকালে ঐ প্রেরিত লোক রামগতির নিকট উপস্থিত হইল,—তখন তিনি একটী দীর্ঘকালব্যাপী পুরশ্চরণে নিযুক্ত ছিলেন! রাজার ইচ্ছামত তন্নিকট উপস্থিত হইবার কিম্বা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। সুতরাং তিনি কন্যা আনন্দময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার লিখিত পুস্তক হইতে এই যজ্ঞ সম্বন্ধীয় আবশ্যকীয় প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়া এই লোকের নিকট দেও।" আনন্দ তৎক্ষণাৎ নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বাহির করিয়া শ্লোকগুলি লিখিলেন এবং উহার প্রকৃত অর্থ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্র ও কুণ্ডের এক একটী প্রতিকৃতি উত্তমরূপে অঙ্কিত করিলেন। কন্যার শিক্ষার প্রতি পিতার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল,—তিনি উহা দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে উহা রাজসমীপে প্রেরিত হইল। অচিরে পত্রবাহক সমুদয় বৃত্তান্ত রাজা ও সভাসদ পণ্ডিতগণের নিকট প্রকাশ করিয়া একটী তরুণা বালা হইতে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল। সভাস্থ সকলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু রাজসভার প্রধান পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ বলিলেন,—উহার একটী কথাও অমূলক নহে। আমি জানি লালা পরিবারের কন্যারা সকলেই সুশিক্ষিতা;—বিশেষ আনন্দময়ী একটী প্রকৃত বিদুষী রমণীরত্ন। তাহারা আমারই মন্ত্রশিষ্যা। আমার পুত্র শ্রীহরি (তর্কালঙ্কার) আনন্দকে শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিল,—তাহা হইতে অনেক ভুল বাহির করিয়া আনন্দ আমাকে দেখাইয়া অনুযোগ প্রদান করে যে আমি কেন পুত্রের সুশিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন করি নাই।"

এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দকে শত শত ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। রাজা স্ববংশীয়া কন্যারত্নের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া নিরতিশয় পরিতোষ লাভ করিলেন।

লালা জয়নারায়ণ "হরিলীলা" গ্রন্থ প্রণয়ণ কালে ভগবানের দশ অবতার বর্ণন দুইটী চরণে সম্পন্ন করিবার জন্য একটুকু চিন্তিত আছেন,—বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়। তখন আনন্দ পিতৃব্য সমীপে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন,—"বেলা অধিক হইয়াছে, আপনি স্নানাহার না করিলে,—সকলকেই অনাহারে থাকিতে হয়।"—উত্তরে জয়নারায়ণ বলিলেন,—"মা! আমি ভগবানের দশঅবতার কথা দুটী চরণে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছি,—উহা সম্পন্ন করিয়াই স্নানাহার করিব।" আনন্দ তাহা না শুনিয়া খুল্লতাতকে পীড়াপীড়ি করিয়া স্নানাহারে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে নিজে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া ঐ দুটী চরণ সম্পন্ন করিলেন। এবং একখানা কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আহারাদি করিয়া জয়নারায়ণ যখন ঈপ্সিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন,—তখন দেখিলেন, এক খানা কাগজে লিখা রহিয়াছে;—

"জলজ বনজ যুগ যুগ তিনরাম।
খর্ব্বরূপী বুদ্ধ হইয়া কল্কী সে বিরাম।"

বুঝিলেন;—ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীই উহা রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। জয়নারায়ণ এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, উহাই আপন গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া, পরে বিস্তৃতরূপে দশাবতার বর্ণন করিয়া তৎসহ সংযোজিত করিলেন। এতৎ ব্যতীত একটী নায়ক নায়িকার "বাসি বিবাহ" বর্ণনও তিনি করিয়াছিলেন;—তাহাও সাদরে খুল্লতাত "হরিলীলা" গ্রন্থে স্থান দান করিয়া ছিলেন। "বাসি বিবাহ" বর্ণনাটী আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি;—

বাসি বিবাহ।

"প্রভাতে উঠিয়া আসিয়া বাহিরে।
করি নিত্যকর্ম্ম হরিষে অপারে॥
ধনেশাত্মজা নাথ সুপ্রীত চিত্তে।
মনে মত্ততা সুন্দরী রত্ন বিত্তে॥
বসিয়া সুবর্ণ পীঠে হাসিছে।
প্রবালাধরে মন্দ মন্দ রাজিছে॥
পুরী পুরিতা সুন্দরী জাল মালে।
বলেগো চলগো উঠগো সকলে॥
সুনেত্রার বাসি বিবাহ হইবে।
বিলম্বে কৌতুক কিমতে দেখিবে॥
শুনি কামিনীবর্গ ধায় লড়াইয়া।
সুরপুর মালা ধরাতে গড়াইয়া॥
সুমঙ্গল দ্রব্য প্রচুরে গলিয়া।
রাখে সাবধানে বিধান জানিয়া॥
সমস্তে মিলিয়া স্ত্রীআচার রীতে।
উলুলু ধ্বনিতে নানাবাদ্য গীতে॥
বলে চন্দ্রভানে আনরে সাজাইয়া।
ত্বরাতে নানা বাদ্যভাণ্ড বাজাইয়া॥
শুনিয়া ধাইয়া ভৃত্যবর্গে আনিলে।
কুমুদী সমাজে শশাঙ্কে রাখিলে॥
পরে দৃষ্টিলোলাও বক্তে সেকালে।
ঘিরিলেক নীলোৎপল নেত্র মালে॥
সুরম্ভা ক্রমাকীর্ণ বেদী পরেতে।
আয়রা সুনেত্রা ধরাইয়া করেতে॥

রাখি কৌতুকে সারিছে আত্মনীতি।
মহোৎসাহ সর্ব্বে করে নানা ভীতি॥
সরত্ন কীরিট জ্বলে দোঁহ মাথে।
যেন পুষ্পধন্বা সুনাধীর সাথে॥
হেরে চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়রূপা ও রূপে মজন্তি।
হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি॥
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা।
সুনাশা সুহাসা সুবাসা সুভাষা॥
দেখি চন্দ্রভানে কত চিত্ত হারা।
নিকারা বিকারা বিহারা বিভোরা॥
করে দৌড়া দৌড়ি মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া বিমূঢ়া নবোঢ়া নিগূঢ়া॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা সচেষ্টা কেহ তুষ্টা দৃষ্টা॥
অনঙ্গাস্ত্র বিদ্ধা কতস্বর্ণবর্ণা।
বিকীর্ণা বিশীর্ণা বিজীর্ণা বিবর্ণা॥
কার বেস্তবেনী নাহিবাস অঙ্গে।
কার হায় কুর্পাস বিস্রস্ত কক্ষে॥
গলদ্ভূষনা কেও নাহি বাস অঙ্গে।
গলদ্রাগিনী কেও মাতিয়া অনঙ্গে॥
কার বাহুবল্লী কারো স্কন্ধদেশে।
রাখিয়া সাধু বাক্য বক্ত্রে প্রকাশে॥
অগো মঙ্গলা মাধবী চন্দ্র রেখা।
বরে আর কেকে দিতে পার দেখা॥
ডাকগো কামিনী সুভদ্রা জয়াকে।
ও রাজেশ্বরী চিত্র রেখা দয়াকে॥
তোমরা আর ছুঁইতে যে যে পারে।
বরস্নান চেষ্টা কর নির্ব্বিকারে॥
শুনি যত্নেতে ষোড়শী বর্গ ধাইয়া।
সুবর্ণের কুম্ভে জল আনে গড়াইয়া॥
সুকক্ষে নিতম্বে উড়ে হেম কুম্ভ।
এভাবে ওভাবে হাটিতে বিলম্ব॥
তাহে দোলিতা লাজ ভাবি ভাবেতে।
পড়ে হেলি হেলি অনঙ্গ জ্বরেতে॥
সুনেত্রাকে কেহ কেহ চন্দ্র ভাণে।
করে কত্ন যত্ন কত সাবধানে॥
সুহস্তে ঢালিছে সবে বারি অঙ্গে।
ঝলৎঝল গলৎগল পড়ে নীর অঙ্গে॥
চলে ব্যস্ত বেণী নিতম্ব পরেতে।
গিরিতে ভুজঙ্গ ভুজঙ্গ প্রয়াতে॥
কলানাথ কোবাহিনী সঙ্গে করি।
যেন দিক বধূরা ঢালে চারু বারি॥
করেতে বরেরে ধরি আটি বাসে।
দিবানাথ সাথে সরোজ প্রকাশে॥
মনোল্লাসেতে কি হইয়া বিনোদী।
নিশানাথ সাথে খেলিছে কুমুদী॥
সখী চন্দ্রভাণে বলে চাতুরিতে।
এ রত্নের মালা কাকের গলেতে॥
শুনি চাতুরি দম্পতি হেঁটমাথে।
ঢলাঢল গলাগল সখী সর্ব্ব তাতে॥
অলঙ্কার বস্ত্রেতে স্নানাবসানে।
ধনেশ আসিয়া দেখিয়া দুজনে॥
মহানন্দে উৎসাহ নানা করিয়া।
নানা বাদ্য ভাণ্ড ধরিত্রী ভরিয়া॥
স্বসঙ্গে করি অম্বিকাপুরে আনি।
নানা দ্রব্য দিয়া পূজিয়া ভবানী॥
মহাহর্ষে ভাসি আসিয়া পুরীতে।
সুনেত্রার মাতা সহ কৌতুকেতে॥
কত হেম মুক্তা প্রবালাদি রত্ন।
করী বাজী ভূমি করিয়া প্রযত্ন॥
দিলে দাসদাসী কত ভব্যভব্যা।
পুরাণ পুরাণা কত নব্যনব্যা॥

কব কি দিল যাহা বিস্তার তার।
দিল পুত্রবৎ সর্ব্ব সংসার ভার॥
করিল সুবন্ধানরূপে সমস্ত।
ভুলি সত্যদেবের পূজা মনস্ত॥
কলিতে চাহে বিষ্ণু মায়া অবশ্য।
কে পারে বুঝিতে সে সব রহস্য॥
ভুজঙ্গ প্রয়াতে এ বাসি বিবাহ।
দ্বিতীয় দিবসে আনন্দে নির্ব্বাহ॥"

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি "হরিলীলা" গ্রন্থ ১২৪ বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত কবিতাটীর বয়সও ঐরূপই বলিতে হইবে। ঐ সময়ের বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। তৎকালে একটী পুরমহিলার ঐরূপ রচনা যে কত মূল্যবান, তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর পাঠক মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনন্দময়ী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রচিত পদ্যে তাহা হইতেই বহুশব্দ ও ভাব গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত দেশীয় শব্দও তাহাতে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গলার "বাসি বিবাহ" দেখিয়াছেন, তাঁহারা উপরি উক্ত কবিতা পাঠ করিলে, তাহার জীবন্তচিত্র দেখিতে পাইবেন। আমরা এই বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া পাঠককে বিরক্ত করিতে ইচ্ছুক নহি। কবিতা রচয়িত্রীর নাম বিলোপ আশঙ্কায়ই কবিতাটী সহ তাঁহার জীবনী প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বোধ হয় আমাদের এই ধারণা কখনই অমূলক নহে যে, বঙ্গীয় কবিতা কাননে পুরাঙ্গনা মধ্যে আনন্দময়ীই প্রথম বিচরণ করিয়া সুগম্ভীর প্রসূণ সম্ভারে মালা গাঁথিয়া ভারতী চরণে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী রচিত আরও দুই তিনটী কবিতা শুনিতে পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু তাহা অধুনা সঙ্গীতরূপে পরিণত হইয়াছে।

এই ললনা রত্ন অপাত্রে অর্পিতা হন নাই। পিতা রামগতি রায়, পার্সী এবং সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ সদ্বৈদ্য প্রভাকর বংশীয় পয়গ্রাম নিবাসী অযোধ্যা রামসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাকে পিতা ও পিতামহ বহু ভূসম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। অযোধ্যারাম যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই মহানবংশ চিরকাল বিদ্যাখ্যাতির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতা সুপ্রসিদ্ধ রূপরাম কবিভূষণ কাব্য ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আনন্দময়ী সুশিক্ষিতা হইয়াও বিশেষ বিনীতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। পতির প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। পতির মৃত্যু সময়ে আনন্দ পিত্রালয়ে ছিলেন। পরে যখন এই হৃদয় বিদারক সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার পুত্র কন্যা ভাই ভগ্নী কাহারও জন্য মমতা রহিল না। আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া অচিরে অনুমৃতার আয়োজন করাইলেন। পরে স্বামীর কাষ্ঠপাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার স্বধর্ম্মনিরতা মাতা কাত্যায়নী দেবীও পতি রামগতির সহিত ৺কাশীর মহাশ্মশানে অনুমৃতা হইয়াছিলেন। পরে কন্যা সেই পুণ্যময়ী জননীর অনুসরণ করিয়া পতিসহ সেই নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। আনন্দের গর্ভে অযোধ্যারামের যথাক্রমে একটী কন্যা ও চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজা রাজবল্লভের পৌত্র রামকানাই বাবুর সহিত কন্যা পরিণীতা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্র সেনের একমাত্র পুত্র কালিদাস সেন কবীন্দ্র মহাশয়ের সহিত এই মহান বংশের বিলোপ সাধন হইয়াছে। তৃতীয় পুত্র গিরীশচন্দ্র সেনের দৌহিত্র ভবানীপুরের বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীপঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি মহাশয় আজ একমাত্র তাঁহাদের সেই পুণ্যপুরীতে আলোক প্রদান করিয়া মাতামহবংশের পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রমণীগণের সুযশ ধরাধামে বিস্তৃত হইতে থাকিবে,—ততদিন আনন্দময়ী কবিত্বে ও চরিত্রে সকলের জ্যেষ্ঠাভগ্নী বলিয়া চিরস্মরণীয়া ও নমস্যা রহিবেন।

মঙ্গল-গ্রহ।

সন্ধ্যাগগনে মঙ্গল-গ্রহ
জ্বলিছে দেখিতে পাই।
জানিনা সেখানে মানুষ-আবাস
আছে কি নাই।
জানিনা সেখানে বহে কি পবন,
ফোটে কি ফুল;
হাসে কি চন্দ্র, বিহগ করে কি
নিশীথে দিবস-ভুল।

সেথায় প্রকৃতি, স্বাদে রূপে গুণে
যদি গো এমনি হয়;
অথচ মানুষ একটি কোথাও
নাহিক রয়;
তা'হলে, বিধাতা, করি এ ভিক্ষা
যুড়িয়া কর,
জন্মান্তরে আমরা দুজনে
সেথানে বাঁধিব ঘর।

বিশাল জগৎ, বিপুল প্রকৃতি,
বিরাট আকাশ, জল।
শীতল পবন, সুতানবর্ষী
বিহগদল।
বিবিধ বর্ণ বিচিত্র বাস
কুসুম কোটি।
কেহ নাই সারা জগৎ ভিতরে;
কেবল আমরা দুটি!

প্রকৃতি যেখানে বিছায়ে রেখেছে
মোহন মাধুরী-জাল;
প্রবল যেখানে বসন্ত আর
বর্ষাকাল;
ফলের ফুলের তরু অসংখ্য,
গিরির গায়;
নিকটে ক্ষুদ্র স্বচ্ছ তটিনী
সতেজ বহিয়া যায়;

এমন একটি নিভৃত-আলয়
যতনে অন্বেষিয়া,
লতা পাতা ফুলে রচিব কুটীর
দোঁহে মিলিয়া।
আদিম মানব আদিম মানবী
মোরা দুজনে,
যুগ যুগ ধরি করিব বসতি
সে নব ইডেন-বনে!

অনাথবন্ধু।*

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন "অনাথবন্ধু" উপন্যাস খানি কেমন? বলিতে হইবে, অপাঠ্য। উপন্যাস পাঠের সুখলাভে লুব্ধ হইয়া বইখানি হাতে লইলে পাঁচসাত পৃষ্ঠা যাইতে না যাইতে বিরক্ত হইয়া বই ফেলিয়া উঠিতে হইবে। কেবলমাত্র সাহিত্যরসলোলুপ ব্যক্তিকে এ উপন্যাস পাঠের পরামর্শ দিতে পারি না। কিন্তু পুত্রবান্ ব্যক্তি মাত্রকে, পুত্রের চরিত্র গঠনেচ্ছু নবীন বাঙ্গালী মাত্রকে, কায়মনোবাক্যে স্বদেশের সর্ব্বতোভাবে উন্নতিকামী নাগরিক মাত্রকে এক এক খণ্ড অনাথবন্ধু আনাইয়া পাঠ করিয়া দেখিতে ও তাহার অন্তর্ভূত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিতে বলি।

ভূমিকম্পে গৃহ যখন ধরাশায়ীপ্রায় তখন পাঁচজন বন্ধুর সহিত সে আকস্মিক দৈব ঘটনা সম্বন্ধে ঘণ্টাকতব্যাপী সরস আলোচনায় কালহরণ করা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে এঞ্জিনিয়রের

* অনাথবন্ধু (উপন্যাস)। হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাড়ী গিয়া দুটা কাজের কথা কহিয়া আসাও অত্যাবশ্যক বোধ হয়। সমাজ বিপ্লবের নৈসর্গিক উৎপাতের দিনে চিত্তবিনোদের নিমিত্ত "কৃষ্ণকান্তের উইল" "বিষবৃক্ষ" চাই, কিন্তু জীর্ণ গৃহ সংস্কারের জন্য "অনাথ বন্ধুর" ন্যায় দুই একটা এঞ্জিনিয়রের পরামর্শে কর্ণপাত করাও চাহি। হয়ত ম্যাকিণ্টস বার্ণের মতে গৃহের যে অংশ এখনও নিরাপদ্ 'এঞ্জিন্‌ওলা' বিপিন বাবুর মতে তাহা সমূহ শঙ্কটাপন্ন; যাহার প্রতি তোমার বেশী শ্রদ্ধা তাহারই মত গ্রহণ করিও, কিম্বা নিজের যদি কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং জানা থাকে উভয়ের মত পরীক্ষা করিয়া যাহারটি বেশী গ্রাহ্য বিবেচনা কর তাহারই অনুমোদন করিও; কিন্তু ইহা নিশ্চিত কেবলই বিনোদক আলাপনে রত থাকিলে চলিবেনা, কাজের কথাও কহিতে ও শুনিতে হইবে, নতুবা নিজেরই ক্ষতি।

আমরা বাঙ্গালীরা যেন নূতন করিয়া সংসার পাতিতেছি। এতদিন কেবল পরলোক লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম, সে আমাদের পঠদ্দশা গিয়াছে। সে অবস্থায় ইহলোকের চিন্তার কোন ধার ধারি নাই, তাহার সরঞ্জামও কিছু গুছাইয়া রাখি নাই। এইবার গৃহস্থাশ্রমের কাল সমুপস্থিত, কিন্তু গৃহস্থের উপযোগী তৈজসপত্রাদি কিছুই নাই, সবই নূতন করিয়া করিতে হইবে। নূতন গৃহী ঝোঁকের মাথায় তাড়াতাড়ি এমন অনেক গুলি গৃহসজ্জা কিনিয়া বসেন যাহা পরে আর চোখে ও মনে রুচেনা, দেখা যায় গৃহের অন্যান্য অবয়বের সহিত খাপ খাইতেছে না, অথচ তাহাদের পরিত্যাগ করাও আর সহজ হয় না, কেননা সে গুলির উপর অনেক অর্থব্যয় হইয়া গিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুরা আমরা নূতন সংসারী। আমাদের সংসারের যাহা কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম—মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা কিছুই আমাদের প্রস্তুত নাই। সুচারুরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে উহার সবগুলিই চাই। এখন বিবেচ্য এই, ল্যাজারসের বাড়ী খাঁটি হাল বিলাতী ফ্যাসনে উক্ত দ্রব্যগুলি অর্ডার দেওয়া যাইবে, কি বড়বাজারে বম্বেওয়ালা, দিল্লীওয়ালা, কাশ্মীরিওলার দোকান ঘুরিয়া কোথাও মালাবার উপকূলের কারুকার্য্যময় আব্‌লুষ কাঠের একখানি সুন্দর কেদারা, কোথাও মির্জ্জাপুরী গালিচা, কোথাও সাহারানপুরী ছবির পরদা একখানি, কোথাও জয়পুরী পুষ্পাধার একটি পছন্দ করিয়া আসিব? শেষোক্ত উপায়ে গৃহসজ্জা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ কিন্তু জিনিষগুলি আমাদের অধিক উপযোগী ও মনোরঞ্জক হইবার সম্ভাবনা। আমরা ঠিক করিয়াছি এবার আমাদের গৃহকে গৃহ করিতে হইবে, আর কেবলই দুদিনের পান্থাবাস—অতএব সহস্র অস্বস্তির, সহস্র অসুবিধার সহস্র অশোভার নিলয় নহে; এবার আমাদের গৃহে শুধুই আর প্রসূতি দেখিতে চাহিনা, মাতা চাই; জন্মদাতা চাহিনা, পিতা চাই; বংশরক্ষক চাহিনা, পুত্র চাই। কিন্তু আমাদের মাতারা ভারতবর্ষীয় মাতা হইবেন, সাবিত্রী সীতা খনা লীলাবতী মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি অস্মৎমাতামহীগণের স্মৃতি তাঁহাদের রক্তে জড়িত থাকিবে, কি তাঁহারা কেবল পাশ্চাত্য আদর্শে সুমাতা হইলেই চলিবে? আমাদের পুত্রকন্যাগণের শৈশব জীবন রামায়ণের পুণ্যকাহিনীতে মণ্ডিত হইবে, কি তাহাদের শিশু কল্পনা শুধু ইংরাজী ফেয়ারি টেল্‌স্ হইতে দুগ্ধ সঞ্চয় করিলেই চলিবে? আমাদের পিতারা বালকগণকে শুধু পাশ্চাত্য ভাষায় পারদর্শী ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় সুশিক্ষিত করিবেন কি তাহাদের আদর্শ ভারত সন্তান করিবেন—রামের ন্যায় সত্যপ্রতিজ্ঞ, নানকের ন্যায় নির্ভীক, প্রতাপের ন্যায় বীর, ইংরাজের ন্যায় অধ্যবসায়ী?

যে কখন ভারতবর্ষীয় শিল্পীর কারুকার্য্য দেখে নাই সেই বিলাতী মেশিনজাত শিল্পের পক্ষপাতী। য়ুরোপীয় বিবিধ বর্ণের বিবিধ প্যাটার্নের পশমী শাল অতি চাকচিক্যসম্পন্ন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের পাশে একটি কাশ্মীরিশাল আনিয়া ধর তাহাদের ম্লান দেখা-

হইবে। অস্মদ্দেশে পাশ্চাত্য মাতা, পাশ্চাত্য পিতা ও পাশ্চাত্য কন্যার অপেক্ষা হিন্দু মাতা, হিন্দু পিতা ও হিন্দু কন্যার আভিজাত্য অনেক অধিক—যদি তাঁহারা যথার্থ মাতা, যথার্থ পিতা ও যথার্থ কন্যা হয়েন। কোন জাতির পক্ষে সার্ব্বভৌমিক হওয়া অসম্ভব, কোন না কোন বিশেষত্ব তাহাতে থাকিবেই—সে বিশেষত্ব বিজাতীয় না হইয়া যতই সজাতীয় হইবে ততই তাহার শোভা ও আভিজাত্য বৃদ্ধি হইবে।

"অনাথবন্ধুতে" খাঁটি দিশী কারুকার্য্যের কতকগুলি মানবচরিত্রের সহিত পরিচয় হয়। তাহাদের অতি সুন্দর লাগে, অথচ সেই সঙ্গে মনে হয় আমাদের সকলকেই যে সর্ব্বতোভাবে "অনাথবন্ধু" রচয়িতার অনুসরণ করিতে হইবে তাহা নহে। তিনি যতদূর মাত্রায় প্রাচীনতার পক্ষপাতী আমরা ততদূর যাইতে স্বীকৃত না হইতে পারি—লক্ষৌ কাজের রূপার ঘটি বাটিই যে গড়াইতে হইবে এমন কোন কথা নাই, অবস্থাভেদে কালভেদে হয়ত রূপার চাদানি, চিনিদানি আমাদের ভাবী গৃহে অধিক কাজে আসিবে, সুতরাং আমরা তাহাই প্রস্তত করাইব। লেখক হয়ত গ্রীষ্মকালে তরমুজের সরবতের পক্ষপাতী—আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা ইচ্ছামত তাহাকে এয়ারেটেড করিয়া লইব না কেন?

"অনাথবন্ধু" ও তাঁহার পরিবারবর্গের শিক্ষা ও চারিত্র্যকে অবলম্বন করিয়া তাহার আশপাশে স্বস্ব রুচি অনুযায়ী ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক গৃহ রচনা করিলে নব্য বাঙ্গালীর গৃহ অতি মনোলোভা হইবে, জগতের আর কোন ভাস্কর বিদ্যায় সুপণ্ডিত জাতিরই নিকট আমাদের লজ্জা পাইতে হইবে না।

এই গ্রন্থে স্বদেশহিতৈষী চিন্তাশীল পাঠকের আলোচ্য ও ভাব্য বিষয়ের সংখ্যা প্রচুর। বাঙ্গালীর আভ্যন্তরীন বাহ্যিক অর্থাৎ পারিবারিক ও নাগরিক দ্বিবিধ জীবন পর্য্যালোচনার ভার গ্রন্থকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমরা শুধু আভ্যন্তরীন বিষয়টীর আলোচনা করিলাম, স্থানাভাবে তাহাদের বাহ্যিক জীবনের যে সংস্কৃত চিত্র গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন, তাহাদের নাগরিক কর্ত্তব্যের যে সকল প্রস্তাব অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কেবল "দেশীয় শিল্পের" উন্নতি সম্বন্ধে লেখকের আশা ও উৎসাহ-কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র রেলওয়েতে আনন্দনাথ অনেক টাকার শেয়ার কিনিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আরও দুই একটি রেলওয়ে ভারতবাসীর টাকায় চলিতে আরব্ধ হইয়াছিল। অনাথবন্ধুও কিছু শেয়ার কিনিয়াছেন। আনন্দনাথ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য। অনাথবন্ধুও রেলওয়েটির কার্য্যে সর্ব্বদা সস্নেহ দৃষ্টি রাখেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মধ্যে ঝগড়া মিটানই উহাঁদের এ সম্বন্ধে প্রধান কাজ। "অমুক কর্ম্মচারী অমুক ডাইরেক্টারের সহিত এতদূরের সম্পর্কিত, উহাকে তাড়াইয়া না দিলে রক্ষা নাই!" "অমুক লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না।" "আমি কাহার অমন খাতির রাখিয়া চলিতে পারি না। বড় জোর আমার না হয় এই কমিটির 'অনাহারী চাকরীটা খসাইয়া' লইবেন। আমি ত আর কাহার খানা বাড়ীর রাইয়ত নহি। আমি বাপকে হক্ কথা শুনাই—অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না"—এইরূপ উক্তি অনাথবন্ধু ও আনন্দনাথকে প্রায়ই শুনিতে হয়।

রেলওয়েতে, পথে, ঘাটে, আফিসে যাঁহারা সরকারী মেথরটীর এবং বেসরকারী, ইংরাজের যেযেড়াটার পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধত ব্যবহারে অভ্যস্ত, ভিন্ন সমাজান্তর্গত ব্যক্তিদিগের নানা প্রকার অন্যায় অত্যাচার যাঁহারা প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় অম্লান বদনে সহ্য করিতেছেন তাঁহারা স্বদেশীয় কাহার দ্বারা অতি নম্রভাবে ক্ষমতার পরিচালনা হইতে থাকিলেও তন্মধ্যে

'অন্যায় অত্যাচার' দেখিতে পান। কারবার মাটি হয় হউক তবু "অত্যাচার" নিবারণে এই সকল ব্যক্তি কৃতসংকল্প!

যখন এইরূপ একটা হাঙ্গামা উঠে, তখন গোপনে গোপনে ভোটের জোগাড় আরম্ভ হয়—আর আনন্দনাথ এবং অনাথবন্ধুর যেন বাপ মা মরা দায় পড়ে। মাতৃভূমির অঙ্কুরিত আশাটি পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহারা ছুটাছুটি করিয়া বুঝাইয়া একরূপ মিটমাট করিয়া দেন।

• এইরূপে কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়া গেলে দুজনের প্রতিই সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়াছে এবং দুজনেরই এক্ষণে আশা হইতেছে যে, ক্রমশঃ এইরূপে হয়ত আরও বড় বড় কারবার বাঙ্গালীর দ্বারা চলিতে পারিবে। ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না। অনাথবন্ধু এবং আনন্দনাথ সর্ব্বদাই স্বব্যয়ে লাইনটীতে ঘুরিতে থাকেন! তাঁহাদের যত্ন দেখিয়া ম্যানেজারও ঢিলে দিতে পারেন না; এবং সকলেরই সুধু কলিকাতায় বসিয়া বসিয়া চিঠিবাজী করিতে লজ্জা হয়।

বিলাতী দিয়াশালাই, কাচের বাসন, লোহার কারখানা প্রভৃতি যে সকল নূতন নূতন কারবারের চেষ্টা হয় তাহাতে দুজনেই দশ বিশ টাকা শেয়ার কিনিয়া থাকেন। উহাঁদের বিশ্বাস যে অমন পাঁচ সাতবার লোকসান গিয়া শেষে এক একটি কারবার প্রবল হইয়া উঠিবে।

মধ্যবিত্ত সকলেরই একটু একটু ওরূপ "লোকসান স্বীকারে" প্রস্তুত থাকা উচিত। ফলেও দেখা গিয়াছে যে দিয়াশালাইয়ের কারবারটি উর্য্যুপরি চারিটি কোম্পানির হাত বদলাইয়া—প্রথম তিনটিকে ফেল করিয়া—এক্ষণে বেশ চলিতেছে।

সকল বিষয় জানা না থাকাতেই প্রথম কয়েক বার লোকসান হয়! আর আমাদের দেশে সব চেয়ে বেশী দেখে ও ঠেকে কম শেখা একটি জিনিস এই যে, "ঝগড়া করিলে কাজ চলে না"।

আজ কাল নানা স্থানে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কারবারের এবং নানা প্রকারের জীবনবীমার বিবাহফণ্ডের গোলমেলে কোম্পানি উঠিতেছে। কিন্তু ও সকল স্ফূর্ত্তি বা জুয়াখেলায় অনাথ বন্ধু রাজী নহেন—শিল্পজাত প্রস্তুত চেষ্টাতেই তাঁহার আগ্রহ।

অনাথবন্ধু একটু খ্যাতনামা লোকের নাম না দেখিলে টাকা দেন না। অনুসন্ধান করিয়া ভাল বলিয়া জানিতে পারিলে অল্প স্বল্প শেয়ার কেনেন।

তাঁহার বিশ্বাস প্রথম প্রথম এ দেশে খ্যাতনামা লোকদিগেরই আসরে নামিয়া যৌথ কারবারে সাহস দেওয়া আবশ্যক।

সব ভাল জিনিসেরই সঙ্গে একটা মন্দ থাকে। যৌথ কারবারের নামে অনেক গরীবের টাকা ফাঁকিতে যায়। এজন্য সাবধান হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম দেখিয়া টাকা দেওয়া উচিত। বড় নামের জিনিস একবার একটা বড়ই ডুবি হওয়ায় বড় নামেও অনেকের ভয়, কিন্তু তাহার কারণ ছিল। প্রকৃত কার্য্যপ্রণালী না জানাই প্রধান কারণ এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাহক সভার গঠনেও যে দোষ আছে তাহাও এক কারণ।

জমিদার এবং মহাজনেরাই সাধারণতঃ কার্য্যক্ষম লোক। অধ্যক্ষদের মধ্যে সেরূপ লোক না থাকিলে প্রায়ই গোলমাল হয়। সুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য উকীল বা চাকুরিয়ার দ্বারা যৌথ কারবার ভাল হয় না। সুবর্ণ বণিক, তিলি, তাম্বুলি, মাড়োয়ারীদিগের কতকটা প্রভুতা থাকিলে তবে কারবার 'হিসাবী ধরণে' এবং সহজে চলে। যাদের যে কাজ পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত!—সুবর্ণ বণিক বড়াল খুব অসাধারণ বিদ্বান বা রাজনীতিজ্ঞ

নহেন। কিন্তু তিনি ধীরতা এবং বিচক্ষণতা সহ কার্য্য করিয়া লক্ষপতি, তাহাই সুপণ্ডিত ও নামজাদা কোন ব্রাহ্মণসন্তান তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সর্ব্বস্বান্ত হন! সর্ব্বত্রই এইরূপ।

দেশী ছাতার শিক প্রস্তুত আজও হয় নাই এবং শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা কম। তবে একটী খুব ভারী মূল ধনের বিলাতী কোম্পানি বরাকর অঞ্চলে লোহার কারখানা আরম্ভ করিয়াছে। প্রধানতঃ উহারা রেল ও পুলের সরঞ্জাম গড়িতেই ব্যাপৃত, কিন্তু ক্রমে উহাদের লাভ দেখিয়া অন্য দু একটা বিলাতী কোম্পানি ঐ অঞ্চলে আসিতেছে। লোহার কারবারে অত্যন্ত অধিক টাকার প্রয়োজন—উহা প্রথমে বিলাতী কোম্পানির দ্বারাই এদেশে আরম্ভ হইতেছে।

দেশী জিনিস সম্বন্ধে অনাথবন্ধুর সহিত একদিন ট্রামওয়েতে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের কথা বার্ত্তা হয়।—বাজারের চৌরাস্তার কাছে একখানি দোকানে লেখা আছে "এখানে সুধু দেশী জিনিস বিক্রয় হয়।" দোকান খানি বেশ বড়। ভদ্রলোকটী বলিলেন "এ দোকানে ত লোক অনেক ঢুকিতেছে।—ফরাসডাঙ্গার কাপড় আর কাঁসা পিতলের জিনিস ছাড়া দেশী আর কি আছে!"

অনাথবন্ধু বলিলেন "ঐ দোকানটির স্থাপনে অনেক গুলি ভদ্রলোকে যত্ন করিয়াছেন। আমিও উহার কল্যাণপ্রার্থী। ওটি প্রথমে যৌথ কারবাররূপে আরম্ভ হয়—এখন একজনেরই সম্পত্তি। ওখানে দেশীয় সব জিনিস একত্রে রাখায়, যে সকল লোক দেশীয় জিনিস খোঁজেন তাঁহারা ঐ সকল পাইয়া থাকেন। জিনিস খাঁটি—দর দাম নাই। অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্রে দোকানটির বিজ্ঞাপন অতি অল্প মূল্যে, কোথাও বা বিনা মূল্যেই ছাপা হয়! মফঃস্বল হইতে অনেক জিনিস অনেকে ডাক রেল ও ষ্টীমার যোগে লইয়া থাকেন।

"দোকানটীতে সর্ব্বপ্রকার দেশী কাপড়—ধূতি, উড়ানি, গামছা ঝাড়ন, দোসুতি, ছিট, তাঁতে বোনা লংক্লথ—ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, মালদহ, হাবড়াহাট, কঁইকালারহাট, প্রভৃতি হইতে আনান হয়। বোম্বাই, নাগপুর, কানপুর, দানাপুর, লাহোর, অমৃতসহর, গোহাটী, ভাগলপুর, প্রভৃতি হইতে চোকা, মোটা মার্কিন, মোটা লংক্লথ, ড্রিল, টুইল, বিছানার চাদর, মোটা ধুতি, তোয়ালে সুতি ও পশমী মোজা, ফ্লনেল, কাশ্মীরা বনাত, সার্জ্জ, কম্বল র‍্যাপার, কার্পেট বুনিবার উল, অল্প দামের শাল, মলিদা, পটু, আসামী এণ্ডি, দেশী তসর বাফ্‌তা, গরদ, চেলি, বেনারসি কাপড় ও কিংখাপ এবং প্রকৃত বোম্বাইএর কাপড় পাওয়া যায়। সঙ্গে দর্জ্জির দোকানও আছে কাটা কাপড়ের জিনিস প্রস্তুত থাকে।

"পশ্চিমে সতরঞ্চি, গালিচাও আসন, বীরভূমী এবং ভুটীয়া রঙ্গিন চাদর, দেশীয় মসারির কাপড় প্রভৃতি ঐ দোকানে আনাইয়াছে। বালী, টিটেগড়, কাঁকনাড়া, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি কল হইতে সকল প্রকারের সাদা ও রঙ্গিন কাগজ, বুটিং কাগজ, খাম, চিঠির কাগজ, প্রভৃতি আনাইয়া রাখাইয়াছে।

"দেশীয় কোম্পানির দিয়াশালাই, পেন্সিল, বার্ণি, ছাপার ও লেখার কালি, ঔষধাদি, সাবান, বাতি এবং আতর গোলাপ ও নূতন ধরণের সুগন্ধি, দেশীয় মিস্ত্রির হাতের ভাল টিনের বাক্স ও তোরঙ্গ, বেতের পেটারা কল, তালা, কাটারি, কুড়ালি, ছুরি কাঁচি আসিয়াছে॥

"কটকের আমদানির্শিংএর ছড়ির খুব কাটতি হইতেছে। জয়পুরী পাথরের পুতুল ও কাগজচাপা, পশ্চিমে কাঠের খেলনা, বীরভূমী গালার পুতুল ও দেশীয় পিতলের খেলনা, মুরশিদাবাদী ও যোধপুরী হাতীর দাঁতের খেলনা ও ঘড়ির চেন কম বিক্রয় হয় না।

বিলাতী টিনের ও কাচের পুতুল দুদিনে ভাঙ্গিত—এখন আবার কাঠের খেলনা আসি-তেছে দেখিয়া লোকে বিরক্ত হইয়া ছেলেদের জন্য সাবেক মত নির্দ্দোষ বাঙ্গালীর উপ-যোগী টেকসই কাঠের খেলনাই কিনিয়া দিতেছেন।

"ভিতরে কাপড় দিয়া খুব ছোট এক রকম সচিত্র বর্ণ শিক্ষার বই—প্রে[illegible]তে বাহির হইয়াছে। দাম এক আনা মাত্র। তাহা এবং উহাঁদের বিখ্যাত ডায়ারিও এখানে কমিশন সেলে আছে—খুব বিক্রী হয়।

"পাশাপাশি কয়েকখানি দোকানই একজন ধনী তিলির। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বিশ্বস্ত লোক দিয়া তিনি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের দোকান চালাইতেছেন। লোহা লক্কড়ের, জুতার এবং কম্বলাদির দোকানগুলি ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে পাশাপাশি আছে। হঠাৎ এক সামিলের বলিয়া বোধ হয় না। উপরের সাইনবোর্ট দেখিলে তবে এক দোকান বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাদের এইরূপ আর একখানি দোকান হাবড়া পুলের কাছে হ্যারিসন রোডের উপর আছে।

"এক জায়গায় সকল প্রকার দেশীয় জিনিস পাইলে ভাল হয়, এ জন্য একজন মুসল-মানের দোকানে কাবুলি সিমলার, দানাপুরী এবং দেশীয় পশ্চিমে কোম্পানিদের সর্ব্ব প্রকার জুতা রক্ষিত আছে। অপর একজন মুসলমান দোকানদার দেশীয় বিদেশীয় নূতন পুরাতন সর্ব্বপ্রকার পুস্তকের দোকান নিকটেই খুলিয়াছেন। দেশীয় চামড়া ও দেশীয় কাপড় দিয়া উহাঁরা ফরমাইসমত উৎকৃষ্টরূপ পুস্তক বান্ধাই করিয়া দেন।"

"মফঃস্বলের লোকের কাছেই দেশী জিনিস অধিক বিক্রয় হয়। কলিকাতায় কিছু মৌখিক আড়ম্বর বেশী—কাজের সময় মনের দৃঢ়তা কম দেখা যায়। অনেকে ছাতা পর্য্যন্ত বিলাতী ব্যবহার করিতে চান না। তাঁহাদের জন্য বেতের শিকওয়ালা একপ্রকার ছাতা প্রস্তুত আছে। দেখ্‌তে মন্দ নয়। তবে কাট্‌তি কম বলিয়া দাম বেশী।"

ভদ্র লোকটি চুপ করিয়া এতক্ষণ শুনিতে ছিলেন। এত জিনিস দেশীয় পাওয়া যায়, তাঁহার জ্ঞানই ছিল না।

বলিলেন "বন্দোবস্ত করেছে ভাল বল্‌তে হবে! কিন্তু আমার ত কোন মতেই মনে হয় না যে খরচা পোষায়। লোকটা বোধ হয় কোন বড় মানুষের ছেলে! ঘি ময়দা তরি তরকারি পশু পক্ষী রাখে নাই ত?"

অনাথবন্ধু স্মিত মুখে বলিলেন "না, খাঁটি ঘি ময়দা অন্য এক দোকানে বাজারের গায়ে পাওয়া যায়—সেটা এদের চেষ্টায় স্থাপিত নয়।—এ দোকানে লোকসান নাই।

ভদ্রলোকটি বলিলেন "এত সব করিবার দরকার কি? ফলে এ সকল কি পাগলামি নয়? ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের সূতা বিলাতী, কানপুর ও বালীর কলের মূলধন বিলাতী—ও সব জিনিস দেশী হো'ল কি করে?"

অনাথবন্ধু। অনেকটা দেশী হইল বই কি! ফরাসডাঙ্গাদির কাপড়ের সূতার দামে যত টাকা এ দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহার অপেক্ষা কিছু অধিকই মজুরি প্রভৃতি হিসাবে এ দেশে থাকিয়া দেশীয় তাঁতিগুলি পালিত হয়। সাহেবদের কল সম্বন্ধেও দেখুন, কল স্থাপনের সময়, চালনার সময়, দেশীয় সরঞ্জাম, কয়লা, মজুরী প্রভৃতি খরচায় ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদেরও খাওয়া দাওয়া চাকর বাকর প্রভৃতিতে দেশীয় লোকে অনেক টাকাই পায়। এ দেশস্থিত ইংরাজের কলের জিনিস এক টাকার কিনিলে তাহার অন্ততঃ ৸৹ আনা এ দেশীয়ে পায়। বিলাতী কাপড়ের বেলা বড়জোর /১০ মাত্র দেশীয়ে পায়। ইয়ুরোপীয়দের উপর বিদ্বেষ বশতঃ এ কাজ হইতেছে না। দেশীয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য—

বিলাতী জিনিসের ব্যবহারে দেশীয় শিল্পীরা একেবারে কিছুই পায় না, সেই জন্য আপনার লোককে কিছু দিবার চেষ্টা, নচেৎ সমাজের একটা অঙ্গ শিল্পজীবীরা যে পক্ষাঘাতে অসাড় হইয়া যাইবে।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন 'ও বিষম ভুল! সস্তাই চলিবে—দেশ যে গরীব।"

অনাথবন্ধু। হাঁ। মোটের উপর যাহা সস্তা তাহাই চলিবে। 'তবে বিলাতী জিনিস কিনিব না; আর দেশী চক্‌চকে জিনিসের বড় বেশী দাম আমা হইতে তাহা পোষাইবে না'—এই বলিয়া অনেক অনেক বাজে জিনিস কেনা একেবারেই ছাড়িয়া দেশী মোটা জিনিস ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া মোটে সস্তা দাঁড়াইতেছে। দশ পনের টাকা উপায়ের লোকও অনেকে দেশীতে চালাইতেছেন—পূর্ব্বেত চলিত! এখন আবার সাবেক মত মনটা করিলেই হয়।

"ফলতঃ চটিজুতা, বোম্বাই চাদর, হেটো কাপড় এবং উড়ানি, দেশী কলের মোটা মার্কিনের জামা বেশ সস্তা জিনিস। মনকে দৃঢ় করা নিয়েই আসল কথা। একটা 'কর্ত্তব্যের ঠিকানা' থাকিলে সাংসারিক কোন বিষয়েই কোন গোলযোগ হয় না। আমার জানা একজন অল্প বেতনের কর্ম্মচারী 'বোম্বাই চাদর কাটিয়া' নিজের ও ছেলেদের পিরাণ করেন। সেই রকম 'মনের' প্রয়োজন।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেদেরও যে কোথাও কোথাও পালকের টুপি ও ঘাগরা পর্য্য হইতেছে তাহা কি একান্ত হেয় ব্যবহার নয়? আত্মমর্য্যাদা বোধ থাকিলে দেশীয় সাধারণ গৃহস্থও কেহ বলিতে পারেন না যে 'সকলে লোভে পড়িয়া অন্যায় করিতেছেন বলিয়া আমারও বাহারের লোভ—সুতরাং দেশীয় তাঁতিকে কিছু দিব না।' নিজে না খাইয়া অপরকে ∙ আজ গায়হলদে নিয়ম সে দেশে স্বধু মোটা পরিয়া দেশীয় শিল্পী পোষণ যে কর্ত্তব্য তাহাও আজ বলিয়া দিতে হইতেছে!

ভদ্রলোক। আসে পাশে সস্তা বিলাতী দেখে কে আর মোটা দেশী লইতে যাইবে।

অনাথবন্ধু। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা ঐরূপ করিলেই দেখাদেখি সাধারণ লোকেও তাহা করিবে। উপরিস্থ ব্যক্তিদিগকে যেরূপ করিতে দেখে, নিম্নস্তরের লোকেরা সর্ব্বত্রই সেইরূপ করে। বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণের কার্য্য দেখিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে এদেশের লোকেরা আশৈশবকাল অভ্যস্ত এবং শাস্ত্রে আদিষ্ট। ব্রাহ্মণ সন্তানেরা একটু সংযমশীল হইয়া বিলাতী ব্যবহারে লজ্জা বোধ করিলে আর কোন গোলই থাকে না। বিলাতী চটের র‍্যাপারে মোটা দেশী চাদরের অপেক্ষা শীত কম কাটে—আবার জল সয় না সুতরাং অপবিত্র। ব্রাহ্মণেরা এই কথা স্মরণ করিলে ছেলেরাও শীতের দিনে বাঁচে, আর দেশীয় শিল্পীরাও বাঁচে।

ভদ্রলোক। আমি একজন পুরোহিতকে বলিতে শুনিয়াছি 'দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার প্রচলনে আমাদের লাভ নাই। যজমান ত আর বেশী টাকা খরচ করিবে না। যে এক টাকার বিলাতী কাপড় দিত, সে এক টাকারই দেশী বস্ত্র দিবে। আমাদের পক্ষে এক টাকার দেশী কাপড় দেওয়া অপেক্ষা এক টাকার বিলাতী দেওয়া ভাল—তবু পরা যায়!'

অনাথবন্ধু। ব্রাহ্মণ এইরূপ স্বার্থপর এবং নীচদৃষ্টি হওয়াতেই দেশের যত অমঙ্গল। পুরোহিতদিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা বড়ই দরকার। পুরোহিতগণ যদি এখনও বলিতে পারেন 'দেশী কমদামী কাপড়ে আমার নিজের একটু অসুবিধা হইবে বটে, তথাপি দেশী কাপড়ই দিও। দেশের তাঁতিরা যে খাইতে পায় না। আহা বেচারীরা খাইতে পাউক পূর্ব্বগত কর্ত্তাগণ ত মোটা খাট দেশী কাপড়েতেই চালাইয়াছেন—আমি কোন ছার যে

চলিবে না।'—তাহা হইলে প্রকৃত ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন এবং উদার হৃদয় দেখিয়া যজমানগণও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ধর্ম্মপথপ্রদর্শক বলিয়া বুঝিবে এবং তাঁহাদে সন্তানাদির কখন সাংসারিক কষ্ট হইতে দিবে না।

"কৌশলে বা স্বার্থদৃষ্টিতে ত ব্রাহ্মণ এই সমাজে বড় হন নাই। প্রাধান্য হইয়াছিল, উদারতা, সর্ব্বজনহিতে দৃষ্টি এবং স্বার্থত্যাগ জন্য। প্রাধান্য যাইতেছে ক্ষুদ্র দৃষ্টি এবং স্বার্থান্বেষণ জন্য। স্বার্থত্যাগেই যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থলাভ হয়, তাহা কি ব্রাহ্মণগণ আর বুঝিবেন না? বস্ত্র পর্য্যন্ত ত্যাগী পরমহংসগণকে রাজভোগে রাখিতে যে হিন্দুসমাজ কি জন্য ব্যাকুল তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না? ব্রাহ্মণ প্রকৃত প্রস্তাবে এক মনে অপরের জন্য চিন্তা করুন তাঁহার নিজের পেটের উপায়, যেমন পরমহংস মহাপুরুষ দিগের জন্য করিতেছেন, ভগবান্ হিন্দু সমাজের হাত দিয়া তেমনই করিয়া দিবেন!

লাহোরে দেশীয় বস্ত্র প্রচারিণী সভা এবং মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে স্বদেশীসভা স্থাপিত হইয়াছে। পঞ্জাব এবং বোম্বাইয়ে অধিকাংশ দেশীয় ভদ্রলোকেই দেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন। এখন বাঙ্গালী অনেকের গায়েও দেশীয় টুইলের সার্ট দেখা যাইতেছে। ফলতঃ এই বিষয়ের আলোচনা রাখিলে এবং দশজন ভাল লোক এইমত চলিলে সাধারণের ভিতরেও দুই তিন পুরুষের মধ্যেই এই প্রকার মত দাঁড়াইয়া যাইতে পারে।

স্বদেশীয় শিল্পজাতের প্রতি এত অনাদর পৃথিবীর কোন দেশের লোকে করে না! মহাশয় ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রজার রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দেশীয় জিনিস পাইলে বিলাতী লইবেন না। আমরা নিজেরা সে প্রতিজ্ঞা করি না কেন? প্রতি টাকার বিলাতী জিনিস কিনিবার সময় মনে করি না কেন যে, শীর্ণকায় দেশীয় মজুর ও শিল্পী তের চৌদ্দ জন যেন আমার দ্বারে পাত পাতিয়া এক বেলার অন্নের প্রতীক্ষায় আছে এবং আমি ঐ টাকাটি দিয়া দেশীয় জিনিস কিনিলেই তাহাদের পাতে ভাত পড়িত! এদেশী মজুরেরা ত চারি পয়সায় একবেলার আহার সারে। দেশী জিনিস কিনিলে প্রত্যেক টাকার ৮/০ কি ৸৴০ আনা ত এ দেশে থাকে ও স্বদেশীয় শ্রমজীবিরা পায়।

ফলতঃ দেশীয় জিনিস কিনিলেই একটি অলক্ষ্য 'ভারত দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ফণ্ডে' নিয়মিত চাঁদা দেওয়া হইয়া যায়! বিলাতীর পরিবর্ত্তে যদি সকলেই দেশী জিনিস কিনি তবে ঐ ফণ্ডের বার্ষিক চাঁদা প্রায় ৪০৲ কোটি টাকা বাড়িয়া যায়! যাঁহারা সুস্পষ্ট দুর্ভিক্ষ হইলে দশ পাঁচ টাকা চাঁদা তোলেন তাঁহারা এমন মোটা কথাটা বিলাতী কাপড়ের কোট কামিজ কিনিবার সময় মনে করেন না কেন? 'সকলে একথা না বুঝিলে, সকলে এমন না করিলে, আমি করিব না' এ আবদারে 'চিত্র গুপ্তের খাতায়' প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব কাটে কি? যিনিই জানিয়া বুঝিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য না করেন তাঁহারাই 'জ্ঞানকৃত অপরাধটি হয়।"

ভদ্রলোকটী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যতদূর পারি আমিও দেশীও জিনিশ ব্যবহারের চেষ্টা করিব। বাড়ীতে মেয়েরা হেটো মোটা কাপড়ে প্রথম একটু খুঁত খুঁত করিবে। কিন্তু উচিত কার্য্যে মেয়েদের ভয় করিলে চলিবে কেন?"

ভারত গবর্ণমেণ্টের উদার কার্য্যের উদাহরণ পাইয়া ভদ্রলোকটীর একেবারে সকল ভ্রম ঘুচিয়া গেল। ইংরাজের সদুদাহরণে যে কাজ হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না।"

সতীর খেলা !

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মাধার বৌ দৌড়ে বাড়ী আসিয়া বলিল,—"প"—তখনি মাধা মাঠ হইতে লাঙ্গল ঘাড়ে ঘরে ফিরিয়াছে। বৈশাখ মাস, নিরম্বু বৎসর, চন্‌চনে রৌদ্র, ছনছনে মন, তাহার উপর "প"—একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। শীঘ্র সে আগুন না নিবাইলে ঘর দুয়ার ছারখার হইয়া যাইবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া মাধার বৌ আবার চেষ্টালব্ধ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "প—অ—অ।" চক্ষু কপালে উঠিল। অগ্নি নির্ব্বাণাভিপ্রায়ে চক্ষু দুইতে দুই এক ফোঁটা জল ফেলিয়া অগত্যা পঘটিত শব্দ ছাড়িয়া বলিল—"ফ"। "ফ" বলিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া যেন ক্রুদ্ধ স্বামীকে ভয় দেখাইল—"খবরদার,রাগ কর্‌তো খাইয়া ফেলিব।" বে কেন ? তোতলা তাহার উপর স্বরা ; কাজেই অসংযুক্ত বর্ণমালা প... । সত্যবতীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জ্বলিয়া না। অনেক চেষ্টার পর স্থির হইয়া মৌনব্রত অবল... বলনা, আমি তাহার ভাবনা ভাবি কথা ফুটিল। তখন সে মহাভারত খুলিয়া বসিল।—"নদের সত্যানন্দ বাবুর ছে... হরি হরি তাহার পাল বাবুর বিয়ে। আজ গায়হলুদের ভোজ। খুব ধূম ধাম। চাকর বাকর আপন আপন কাজ কর্‌ছিল। কর্ত্তা বাবু একা বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। এমন সময় এক অতিথ ঠাকুর এসে তামাক চান। কর্ত্তা বাবু তামাক দিতে চাকর ডাকতে বাড়ীর ভিতর গিয়ে তামাকের কথা ভুলে যান। অতিথ ঠাকুর গতিক বুঝে চম্পট দিলেন, সেই কথা সত্যবতী ঠাক্‌রুণ শুনে চটে লাল। "ছেলের বিয়ে, আজ গায় হলুদের ভোজ, এমন সময় অতিথ ফিরা কি ভাল কৈ! অতিথ তো কখন ফেরে না? তবে বুঝি এ বিয়ের ভদ্র হবে না" এইরূপ পচাল পাড়্‌তে পাড়্‌তে অতিথ খুঁজ্‌তে চাকরদের হুকুম দিলেন। কোথায়ও পাওয়া গেল না। তখন ঢেঁড়ি দিলেন যে অতিথ খুঁজে আন্‌তে পার্‌বে, তাকে পঞ্চাশ টাকা বক্‌সিস্ দিব। সব কথা খুলে বল্‌লেম। এখন ছেলে পিলে নিয়ে খুজ্‌তে বেরোও, নইলে পঞ্চাশ টাকা ফস্কায়।" মাধার বৌ এই রূপে "প"ও "ফ"র ভাষ্য করিয়া চুপ করিল। 'প'তে পঞ্চাশ আর "ফ"তে ফস্কায়। এই দুইটী ইহার মূলসূত্র। সূত্রকার নিজে ভাষ্য না করিলে কাহার সাধ্য বোঝে? তখন সকলে একে একে দিকে দিকে চলিল। মাধার বৌ একা ঘরে বসিয়া কখন গহনা গড়ায়, কখন ভুঁধ খাটায়; কখন বা আঙ্গুলে প্রাচীর দেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ গাত্র হরিদ্রার দিন। নহবৎ বাজিতেছে। নাচ তামাসা চলিতেছে। কাতারে কাতারে ঢুলি জুটিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া কলরবের উপর উলুধ্বনির রাগিণী চলিতেছে। বালক

ছুটিতেছে, বৃদ্ধ বরাদ্দ করিতেছেন, যুবক তেড়ি, দাড়ি, ছড়ি ধরিয়া বরযাত্রের কথায় বিভোর আছেন। বৃদ্ধা স্বস্তি ক্রিয়ায় রত, যুবতী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত, কিশোরী নূতন সঙ্গিনী লাভাশায় উন্মত্ত। সকলেই আমোদে মাতোয়ারা; নবদ্বীপ আজ যাহাদের আনন্দে আনন্দিত, তাহারা কিন্তু নিরানন্দ। সত্যানন্দ বাবুর নিরানন্দের কারণ তাঁহার পতিব্রতা পত্নী সত্যবতী। অতিথি প্রত্যাগত না হইলে আহার করিবেন না, স্থির করিয়াছেন। আজ তাঁহার বাড়ী ভোজ, শত শত অতিথির পাত পড়িবে, তথাপি সেই অতিথির জন্য প্রাণ আকুল। যাহা কখন ঘটে নাই, তাহাই ঘটিল। তাই একান্তমনে একান্তে অতিথি প্রত্যাগমনের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময় বাবু উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"আচ্ছা গিন্নি! আজ তোমার ছেলের বিবাহ, সকলেই আমোদ করছে আর তুমি একা বসে কেবল চোকের জল ফেলছো। শুভকার্য্যে ওরূপ করলে অশুভ হতে পারে, অতিথি বিমুখ হলে প্রত্যবায় হয়, স্বীকার করি, এত ব্রাহ্মণ ভোজনেও কি তার ক্ষয় হবে না?
বিষয়ের আলোচনা রা। জন্য আরও দানধ্যান কর। নিশ্চয় পাপ মোচন হবে।"
তিন পুরুষের মধ্যেই এই প্র ই। পতি তাঁহার দেবতা। দেবতার কথা কি মিথ্যা হয়?
স্বদেশীয় শিল্পজাতের প্রতি
সদাশয় ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রজার রক্ষিয়া উঠিলেন। এমন সময় মাধার বৌ একবার স্থির
বিলাতী লইবেন না। আমরা নিজেরা সে প্রা ঠাকুরুণ! আমাদের ত্রিনি কত সাধ্য সাধনা
জিনিস কিনি—।—অ—আতথ ফিরেছে ঠা ঠা ...

করে এনেছেন।" ইত্যাদি লম্বা চৌড়া বক্তৃতা করিয়া ৫০৲ টাকা পারিতোষিক লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিল। গিন্নীর আর আনন্দ ধরে না। গিন্নী স্বয়ং অতিথিকে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করাইয়া ৫০৲ টাকা ভোজন দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন। অপরাপর ব্রাহ্মণগণকেও এক টাকা করিয়া ভোজন দক্ষিণা দেওয়া হইল। রাত্রি যেন সমারোহ দেখিতে আসিল। নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। আনন্দের প্রবাহ চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। সুখের চাঁদ ষোলকলায় পূর্ণ না হইতে হইতে রাহুগ্রস্ত হইল। প্রাণগোপাল কালসর্পে দষ্ট হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইলেন, তখন আনন্দাশ্রু শোকাশ্রুতে পরিণত হইল। "প্রাণগোপাল রে! কি করিলি?" বলিয়া কর্ত্তা গিন্নী বক্ষে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। যথাবিধি প্রতীকারের চেষ্টা হইল। চেষ্টা বিফল। প্রাণগোপাল অবসন্ন হইয়া পিতা মাতার চরণস্পর্শ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।—"পিতঃ আমি অতি পাপী, দেবদুর্ল্লভ চরণ সেবা করতে পারলেম না। আপনি আমার স্থানীয় হয়ে আমার দুঃখিনী মায়ের সেবা করবেন। আর মায়ের কথা রক্ষা করবেন। আমি চির বিদায় নিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন পরলোকে যেন ভাল হয় আর জন্মান্তরে যেন আপনাদের মত মা, বাপ পাই। মা, আমার মা, আমার দুঃখিনী মা! তোমারও নিকট ঐ প্রার্থনা। কায়মনোবাক্যে পিতার কল্যাণ সাধন করবেন, আমি চল্লেম। ঐ দেখুন আপনাদের অমূল্য ধন যমদূতেরা নিতে এসেছে। মা, মা, মা"—এই বাক্য বিশ্রামের সহিত প্রাণগোপালের প্রাণ চির বিশ্রাম লাভ করিল। চারিদিকে উলুধ্বনির পরিবর্ত্তে হাহা ধ্বনি পড়িয়া গেল।

কোথায় রামের রাজ্যাভিষেক, কোথায় নির্ব্বাসন! কোথায় বিবাহ, কোথায় মরণ! অমরাবতী শ্মশান হইল। একমাত্র অন্ধের যষ্টি, পরিণামের অবলম্বন, ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গলদাতা পুত্রশোকে গিন্নী মূর্চ্ছিত, ধূলায় ধূসরিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিশীথ সময়। নির্ম্মল আকাশে পূর্ণিমার শশী। জগৎ প্রসন্ন; কেবল সত্যবতী ও সত্যানন্দ অপ্রসন্ন। বাল্যে মাতৃবিয়োগ, যৌবনে পত্নীবিরহ এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রশোক বড়ই দুর্ব্বিসহ। উপযুক্ত পুত্র, দুদিন পরে পুত্রবধূ আসিবে—তাহার মরণ কে সহিতে পারে? সংসারের ভার তাহাদের উপর সমর্পণ করিয়া উভয়ে কাশীবাস করিবেন—ইহাই দম্পতির চির আশা, সে আশা মুকুলিতা না হইতেই নির্ম্মূল হইল। জীবনের ফল পর্য্যবসিত হইল। জগৎ জীর্ণারণ্য হইল। সত্যবতীর নিদ্রা নাই। হৃদয়ে শান্তি নাই। শোকানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার ধূমে সব অন্ধকার, চৈতন্য প্রকাশ পাইবে কেন?

কিন্তু অগ্নি কতক্ষণ ভস্মাচ্ছাদিত থাকে? শোকের সন্ধুক্ষণে সত্যবতীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিল, তখনই তিনি ভাবিলেন—"যে আমার ভাবনা ভাবিলনা, আমি তাহার ভাবনা ভাবি কেন? যে আমার সুখ চাহিল না, আমি তাহার সুখ মনে [illegible]রি কেন? হরি হরি তাহার জন্য যে সব বিসর্জ্জন দিয়াছি। পরমগুরু স্বামীর মুখের [illegible]ড়িয়া তাহাকে খাওয়াইয়াছি, যাহার জন্য দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিবা[illegible]নাই, দুবেলা দুমুটা ভাত দরিদ্রকে দিতে পারি নাই, তাহার জন্য শোক? [illegible]ত আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেল। আমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ধর্ম্মোপাসনা করি আর পতিসেবা করি। বুঝিতে পারিলে—ইহা আমার বিপদ নয় বরং সম্পদ। রোগ, শোক পরিতাপ স্বীয় পাপের ফল। আমার পাপেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। যদি তাহার মৃত্যু না ঘটিত, তবে আমার পাপের ক্ষয় হইত না। তাহার মৃত্যুতে আমি সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি।" সত্যবতী ভাবিতেছেন এমন সময় পুত্রের চাঁদ মুখ খানি মনে পড়িল, গালভরা হাসি, স্খলিত, অস্পষ্ট অসমঞ্জস্ত অমিয়মাখা বাণী আর যৌবনের ঈষৎ নীলাভ বালশ্মশ্রু সব একে একে মনে পড়িল। আর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উড়িয়া গেল। পূর্ব্ববৎ বক্ষে করাঘাত করিয়া "হা প্রাণ গোপাল" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সময় দুঃখীর অনিবেদ্য প্রিয়কারী বন্ধু। তাহাকে কিছু বলিতে হয় না, সে যথাসময়ে আপন কাজ সব করিয়া যায়,—সময় আবার প্রবোধ দিতে লাগিল। সত্যবতী ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হরি হরি এতক্ষণ ঈশ্বরের নাম করিলে কাজ হইত। ভগবান্! দয়াল প্রভো, দীনবন্ধো! হরি হে! হরি হরি! সতীর আবার ভগবান্ কে? পতিই সতীর ভগবান্। পতিকার্য্যই ভগবৎ কার্য্য। আমরা শক্তির অংশে জন্মিয়াছি। পতি শক্তিমান্ ঈশ্বরের অংশে জন্মিয়াছেন। আমরা প্রকৃতি, তিনি পুরুষ। প্রকৃতি পুরুষের

কার্য্যই করিয়া থাকে। আর শোক করিব না, পতিকেও শোক করিতে দিব না। আর প্রাণগোপালের নাম মনে করিব না। এত যে ভাবিতেছি, তথাপি চোকে জল আসিতেই হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। চোকে জল আসুক, হৃদয় বিদীর্ণ হউক, কাহাকেও বুঝিতে দিব না। নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিব আর সজনে কর্ত্তব্য পালন করিব। হৃদয়! কঠিন হও। যে হৃদয় শোকের দারুণ আঘাতে ভগ্ন হইল না সে হৃদয় কঠিন বই কি? বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। বাবুর বয়স পঞ্চান্ন। এখনও বয়স আছে। তাঁহার বংশ রক্ষা করিতে হইবে। অতুল সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? আমার সন্তান হওয়ার আশা নাই। শান্তিপুরের মেয়েটী বয়ঃস্থা; অতএব ঐ মেয়ের সহিত, ঐ দিনে বাবুর বিবাহ দিব। যাহাকে পুত্রবধূ করিতাম তাহাকে সপত্নী করিব। কন্যার মত ভাল বাসিব। জগৎকে সপত্নী ব্যবহার শিখাইব, আপন সুখ বিসর্জ্জন না দিলে কি ভালবাসা হয়? স্বামীভালবাসার মূর্ত্তি দেখাইব। হৃদয়! দৃঢ় হও। সাবধান! প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইও না।" ইত্যাদি অনেক ভাবিয়া উষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উষা হাসিতে হাসিতে আসিল। উষা! তুমি সহায় হইলেও সত্যবতী সত্য পালন করিতে পারিবেন না এই ভাবিয়া যেন প্রাচী-দিক সুখভরে হাসিল। চন্দ্র প্রাচীকে সূর্য্যের করায়ত্ত দেখিয়া মলিন হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিল। তারাগণ বেগতিক দেখিয়া তাহার সহগামী হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সত্যবতী যেন কাঠের পুতুল। চোকে জল নাই। মুখে কথা নাই। আপন কাজেই ব্যস্ত। দাস দাসী সব অবাক্। কাল পুত্রশোক, আজ গৃহকার্য্যে ঝোঁক। পৌরজনেরা ভাবিলেন গিন্নী পাগল হইয়াছেন। তাই তাহারা দৌড়ে গিয়া কর্ত্তাকে সংবাদ দিল। কর্ত্তা শোক বেগ সম্বরণ করিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"গিন্নি! এতভোরে উঠেছ? আবার দেখছি, পরিবেশনের কাজ করছ। ক্ষান্ত হও।"

গিন্নী বলিলেন—"ক্ষান্ত হই—যদি আমার কথাশুন।" কর্ত্তা বলিলেন—"তুমি যা বল্‌বে তাই শুন্‌ব।" গিন্নী বলিলেন—তিন সত্যি কর।

কর্ত্তা বিনা আপত্তিতে "কর্‌ব" বলিলেন। গিন্নী দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ডাকাইয়া বলিলেন—"আমি অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলেম। শোক করা বৃথা। অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল এখন স্বামীর বংশ রক্ষা করতে হবে। আপনারা থেকে ঐ পাত্রীর সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ দিন। তাহলে আমি ঘরে থাক্‌তে পারি নতুবা পাগল হয়ে একদিকে চলে যাব।"

গ্রাম্যমণ্ডলী সত্যবতীর হৃদয়ের বল জানেন, তাঁহারা প্রতিবাদ না করিয়া বলিলেন—"তাই হবে। এখন কর্ত্তা সম্মত হলে হয়।"

সত্যবতী বলিলেন—"সে ভার আমার। বাবু আমার নিকট তিন সত্যি করেছেন।

আর এক কথা—জন্মান্তরে কত লোকের আশাভঙ্গ করেছি। তাই আশাভঙ্গ হ'ল। এ জন্মে আর কারো আশাভঙ্গ করব না। যেমন সমারোহে সে বিবাহ হ'ত, এ'তেও সেইরূপ হ'বে। তক্তারাম আশাছোটা, বাজি, বাজনা সব চাই। শান্তিপুরে কনের বাপকে এ সংবাদ দিবার দরকার নেই। তারা জানুক, সেই বিবাহই হ'বে। বরাসনে বস্‌লে আর বুড়ো ব'লে পেছুতে পার্‌বে না। পাত্রীর আত্মীয় স্বজনকে কিছু ঘুস্ দিলেই চল্'বে।"

সত্যবতী হিন্দুর রমণী। বিবাহে এভাবে মিথ্যা ব্যবহারে পাপ নাই—ইহাই তাঁহার ধারণা। গ্রাম্যমগুলীরা বিবাহের উদ্‌যোগে ব্যস্ত হইল। গৃহিণী মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে গৃহস্বামীকে ঝাড়াইতে বসিলেন। অনেক কষ্টে বিষ নামিল। সকলই ভগবানের খেলা, মানুষ নিমিত্ত মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আবার যে আমোদ সেই আমোদ। কেবল আমোদ নাই বাবুর হৃদয়ে। নল দেবতাদের ঘটকালি করিতে গিয়া নিজে বিবাহ করিয়াছিলেন; বাবুও পুত্রের বিবাহ দিতে স্বয়ংই বিবাহ করিতে প্রস্তুত। একে লোকলজ্জা তাহাতে পুত্রবিরহ যন্ত্রনা; কিন্তু কি করেন— [illegible] বাহ করিতেছেন [illegible] ছিলেন, আজ তিনি বিবাহ করিতে পারেন না [illegible] বসিল [illegible] বুকে [illegible] সেই বড়কে [illegible] গ্রহণ [illegible] প্রভৃতিতে [illegible] আশাছোটা, বাজি, বাজনা [illegible] নাচ [illegible] হইবে না [illegible] আসিয়াছে গিন্নী সকলেরই আশাপূর্ণ করিবেন। আশাভঙ্গের কষ্ট যে তিনি স্বয়ং অনুভব করিতেছেন; তাই কাহারও আশাভঙ্গ হইবে না—ইহাই গৃহিণীর আদেশ। ইহাই সত্যানন্দ বাবুর গোদের উপর বিস্ফোটক। কর্ত্তা কত স্তুতি মিনতি করিলেন, কিছুতেই গৃহিণীর রায় ফিরিল না। গৃহিণী বলিয়া পাঠাইলেন যদি ঐহিক সুখের জন্য আমাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে চান এবং নিজের পারত্রিক সুখের জন্য ত্রিসত্য পালন করিতে চান্ তবে যেমন বলি সেইরূপে বিবাহ করুন। বাবু শুনিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া বরসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। সর্পাঘাত ত্রিরাত্র শৌচ। শ্রাদ্ধের দিন বুড়ো বাবা বিবাহ করিতে চলিলেন। শ্রাদ্ধ এখন বন্ধ থাকিল। শুভ কার্য্যে অশুভ অনুষ্ঠিত হইবে না ইহাই ভূদেবী সত্যবতীর আজ্ঞা। এ বিবাহ শান্তিপুরের কন্যার সহিত হইবে। বাবু কারামায় আর বরযাত্রীরা ইচ্ছামত হাতী, ঘোড়া, পালকি নৌকা প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরি বাবুর বাড়ী আলোক মালায় আলোকিত। লোক জন, কুটুম্বে বাড়ী ভরা। চারিদিকে আনন্দের লহরী ছুটিতেছে। একমাত্র কন্যা তাহার বিবাহ, যেরূপ হওয়া উচিত, হইতেছে। এমন সময় বোোম, তুবড়ির ধ্বনির সহিত হুলুধ্বনি মিশিল। বর আসিয়া দ্বারে উপস্থিত। বর পরামাণিকের অগ্রে ভুড়ি ঢুলাইতে ঢুলাইতে আসিয়া বরাসনে বসিলেন। সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল! হুলুধ্বনির পরিবর্ত্তে হাহা ধ্বনি পড়িয়া গেল, এ দিকে পেঁচোর মাকে লইয়া টানা টানি—পেঁচোর মা পাত্র দেখিতে গিয়াছিল। সে হরি বাবুর স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিয়াছে—'পাত্রের বয়স ১৮ বৎসর।" এখন হইতেছে ৫৫ বৎসর। বুড়োর হাতে সে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া স্বর্ণলতিকা কি রূপে সমর্পণ করেন, হরিবাবু কিছুতেই সে পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নন। এ দিকে জাতি যায়। হরিবাবু ঘটক হাজির করিতে হুকুম দিলেন। পেঁচোর মা হতভম্ব হইয়া বসিয়া পড়িল। ঘটক দেখিল—প্রাণগোপাল বাবুর পরিবর্ত্তে সত্যানন্দ বাবু! "বাবা!! বরের বাবা নিজে বর! আমি কি পাগল। না—তবে কি জাল! তাইতো কিছুইত বুঝ্‌তে পারছিনে। যাই হো'ক বাড়ী গিয়ে সে চিন্তা, এখন পলাই—" এই ভাবিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া চম্পট দিল। "ধর্ ধর্।" আর ধর্—একে দৌড়ে বাড়ী। অন্তঃপুরে ক্রন্দন রোল পড়িল। বাহিরে তর্কের গোল বাধিল। বিবাহ না দেওয়া স্থির হইলে গোলাপ জলের বিনিময়ে ঢিল বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহার উপর কিল, চাপড়। অনেকে প্রাণভয়ে প্রস্থান করিল। তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে কষ্টে পুত্তলিকাবৎ অবস্থিত বরের পিঠে জুতার রূপবাদ্য বাজিতে লাগিল। পলাইবার পথ নাই! ইষ্টদেবের স্মরণ করিবার সময় উপস্থিত, প্রাণগোপাল ইষ্টদেবের স্থান অধিকার করিয়া আছেন; তাই "প্রাণগোপাল রে! রক্ষাকর বাবা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "বাবা! বাবা!" বলিয়া অজাতশ্মশ্রু যুবক দ্রুতপদে আসিয়া সত্যানন্দ বাবুর চরণযুগল চুম্বন করিল। পেঁচোর মা দৌড়ে আসিয়া বলিল—"এই যে বর"—তাহার অনুভাব দর্শনে সকলেরই নিগ্রহেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার পর পেঁচোর মার কথায় তখন উদ্বেল সমুদ্র নিস্তব্ধ হইল। সত্যানন্দ বাবু অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন "তবে কি আমি পাগল হ'লেম। আমার সোণার চাঁদ যে কালসর্পে দষ্ট। তাকে যে ভেলায় করে ভাসিয়ে দিয়েছি। তুমি প্রাণগোপালের মত কে বাবা?"

প্রাণগোপাল বলিলেন—"আমি আপনার পুত্র প্রাণগোপাল! ভেলা ভাস্‌তে ভাস্‌তে শান্তিপুরে লাগল। কোন গুণী মন্ত্রৌষধি বলে বাঁচিয়েছেন। কাল তাঁরা তাঁদের নৌকায় রেখেছিলেন। আজ সন্ধ্যার পর আহারান্তে আমাকে বিদায় দিয়েছেন। আজ আমার এই শান্তিপুরে বিবাহ হ'ত—এই ভেবে বিয়ে দেখ্‌তে এ'সে আপনার চরণ দেখ্‌'তে পেলাম।"

তখন সত্যানন্দ বাবু হরি বাবুর নিকট রহস্য প্রকাশ করিলেন। হরি বাবুর আর আনন্দ ধরেনা, নহবৎ বাজিয়া উঠিল। আবার যে আনন্দ, সেই আনন্দ। শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল। তথনই মাধা বেহারা প্রাণগোপালের স্বহস্তের পত্র লইয়া শুভ সংবাদ দিতে নবদ্বীপ প্রেরিত হইল। মাধা বিলক্ষণ চলিতে পারে। অতিপ্রত্যূষে নবদ্বীপ সমীপে উপস্থিত। তাহার স্ত্রীর সহিত পথে সাক্ষাতে সমস্ত প্রকাশ হইল। "চল,--আমিও তোমার সহিত বাবুর বাড়ী গিয়ে এ শুভ সংবাদ দিয়ে আসি," "এই বলিয়া সত্যানন্দ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল, মাধা বাবুর কর্ম্মচারীর নিকট পত্র দিল। মাধার বৌ সত্যবতীর নিকট এ শুভ সংবাদ দিল, সত্যবতী বলিলেন " যদি কথা সত্য হয়, তবে তোকে সোণার বাউটী পরাব, আর কোটায় শোয়াব।" অপরাহ্ণে বর আসিল। একে একে সকলে আসিয়া জুটিল। কেবল আসিলেন না পুত্রবৎসলা ভগবদ্‌ভক্তা, স্বামীগতপ্রাণা গৃহিনী সত্যবতী। গৃহিণী কর্ত্তার চির সুখ দুঃখের ভাগিনী, গৃহিণী ব্যতীত একা দেবদুর্ল্লভ সুখ-ভোগের ইচ্ছা হইল না! তাই কর্ত্তা দৌড়ে গৃহিণীর নিকট আসিলেন। গৃহিণী দ্বার রুদ্ধ করিয়া তারস্বরে ভগবান্‌কে ডাকিতেছেন—"ভগবন! দুঃখনিবারণ! এ তোমার কেমন খেলা—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।" কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"গিন্নি! ও গিন্নি! আমি বুঝেছি এ সতীর খেলা। এমন খেলা আবহমান চলে আস'ছে। এখন দ্বার খোল " স্বামীর আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। সত্যবতী যথাবিধি বরণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে সকলকে ভাসাইয়া ভাসান ধন ঘরে তুলিলেন।

সৌর-কলঙ্ক।

চন্দ্র কলঙ্কী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, এই কলঙ্কোৎপত্তির কারণও আমাদের প্রাচীন পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে এবং বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট ইহার আমূল বৃত্তান্ত আজও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পুরাণকারগণের হস্তে চন্দ্রদেব বহু নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রচার সত্ত্বেও সেই অপবাদ সম্পূর্ণ ক্ষালিত হয় নাই। আমাদের প্রধান পুরাণকারগণ বোধ হয় সূর্য্যের কলঙ্কের কথা জানিতেন না, নচেৎ তাঁহাদের কল্পনার হাত হইতে গ্রহরাজও কোনক্রমে নিস্তার পাইতেন না এবং বোধ হয় একটা কঠিন অপবাদ চির-কাল নীরবে সহ্য করিতে হইত। চন্দ্রমণ্ডলস্থ কলঙ্ক সকল অতি সহজেই লক্ষিত হইয়া থাকে, অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যের কৃষ্ণচিহ্ন সকল নগ্ন চক্ষে প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না, সাধারণ দূর-বীক্ষণ যন্ত্রে সৌরমণ্ডল পরিদর্শন করিলে এগুলি স্পষ্ট দেখা যায়;—বোধ হয় পরিদর্শনো-পযোগী উন্নত যন্ত্রাদির অভাবে, সৌরকলঙ্ক জ্যোতির্বিদগণের অগোচর ছিল। চান্দ্রকলঙ্কের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলের কৃষ্ণচিহ্নসকল চিরস্থায়ী নয়, বৎসরের কোন কোন অংশে ইহার সংখ্যা

অত্যন্ত অধিক দেখা যায়, আবার কখন কখন অতি বৃহৎ দূরবীক্ষণ সাহায্যেও ইহার চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হয় না। শোয়াবি নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন; তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রতি একাদশ মাসের শেষে সূর্য্য-মণ্ডলে অধিক পরিমাণে চিহ্ন দেখা যায়,—পরবর্ত্তী বিখ্যাত দার্শনিকগণ শোয়াবির এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোটি যোজন দূরস্থিত পৃথিবীর উপর সৌরকলঙ্কের প্রভাব বড় অল্প নয়, পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডলে অধিক কলঙ্ক চিহ্ন প্রকাশ হইলেই, পৃথিবীর নানা অংশে তড়িৎ ও চৌম্বক শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে;—অনেক গুলি দার্শনিক স্বাধীন গবেষণাদ্বারা ইহা সৌরকলঙ্কেরই কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সার্ উইলিয়ম্ হার্সেল্ সৌরকলঙ্কের আর একটি কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন; তিনি বলেন বৃষ্টি বাত্যাদি পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক ঘটনা, উক্ত কৃষ্ণচিহ্ন দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখা যায়, কাযেই শস্যাদির উৎপত্তি ও সাধারণ স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপার সৌরকলঙ্কের সহিত বিশেষ সম্বদ্ধ। সূর্য্য মণ্ডল পরীক্ষা করিয়া, তিনি এই প্রকারে ভাবী শস্যোৎপত্তির কথা অনেক পূর্ব্বে গণনা করিয়াছিলেন এবং গণনানুযায়ী ফলও হইয়াছিল। মান্দ্রাজ ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দুর্ভিক্ষের কথা নাকি পূর্ব্বোক্ত প্রথায় ঘটনার অনেক পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল। সৌরকলঙ্কের আয়তন বড় অল্প নয়; সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ লিক্ মানমন্দির হইতে একটি সুবৃহৎ সৌরচিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে,—জ্যোতির্ব্বিদ্গণ অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্র দ্বারা এটির বিস্তৃতি পরীক্ষা ও গণনাদি করিয়া, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৪,০০০ মাইল হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সৌরকলঙ্ক আবিষ্কার কালীন পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান অতি হীনাবস্থায় ছিল; তৎপূর্ব্বে বরুণ (Neptune) প্রভৃতি কয়েকটি গ্রহ আবিষ্কার করিয়া দার্শনিকগণ দারুণ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; গ্রহনক্ষত্রাদির শ্রেণী বিভাগই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের চরমোন্নতি ভাবিয়া জ্যোতিষীগণ নিরুদ্দম হইয়াছিলেন;—গ্রহগণের আপেক্ষিক দূরত্ব ও আয়তনাদি স্থিরীকরণই, নব জ্যোতিবিদ্যার শেষ কার্য্য বলিয়া প্রাচীন আচার্য্য কঁৎ (Comte) ঘোষণা করিয়াছিলেন;—এই সকল কারণে তৎ কালিক পণ্ডিতগণের নিরুৎসাহের মাত্রাটা আরো অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিষ্কগণের গঠনোপাদান প্রভৃতি আবিষ্কারের কোনও উপায় নাই দেখিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ প্রয়াস যে বৃথা শ্রমব্যয় তাহা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অনেক খ্যাতনামা দার্শনিক এই সময়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের এই অবস্থায় সূর্য্যের পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণচিহ্ন জ্যোতিষীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে;—তৎকালে পণ্ডিতগণ সূর্য্যমণ্ডল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতেন না, ইহা কোন্ কোন্ পদার্থে নির্ম্মিত এবং সেই সেই উপাদান তরল কি কঠিন, এই প্রকার স্থূল বিষয় গুলির সহিতও তাঁহারা পরিচিত ছিলেন না। অকলঙ্ক সূর্য্যমণ্ডলে অদৃষ্টপূর্ব্ব কলঙ্করেখার উদয়ে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দার্শনিকগণ জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে নানা আজগুবি

কথা বলিতেন;—সৌরকলঙ্ক গুলিকে সচঞ্চল দেখিয়া কয়েকজন জ্যোতিষী তাঁহাদের অসামান্য কল্পনা সাহায্যে, এগুলি সূর্য্যলোকবাসী জীব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কল্পনাপ্রিয় দার্শনিকগণের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কিন্তু অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। এই ব্যাপারের অনেক পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্য ওলাষ্টন্ ও ফ্রানহোফার ত্রিকোন কাচখণ্ড দ্বারা সৌররশ্মি বিশ্লেষ করিয়া, সৌরকিরণ যে লাল নীল প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক বর্ণরশ্মি সংমিশ্রনে উৎপন্ন হয় তাহা স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত ত্রিকোন কাচখণ্ডজাত বর্ণচ্ছত্রের স্থানে স্থানে বর্ণাভাব প্রযুক্ত যে সকল কৃষ্ণরেখা দেখা গিয়াছিল, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এই সময় ফ্রানহোফারের উক্ত ত্রিকোন কাচ সাহায্যে "রশ্মি নির্ব্বাচক" (Spectroscope) নামক একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল; সূর্য্য নক্ষত্রাদির গঠনোপাদান এবং গ্রহাদি সম্বন্ধে নানা ব্যাপার আবিষ্কার হইতে লাগিল,—নির্জীব জ্যোতির্বিদ্যা নবজীবন প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে সৌরকলঙ্কের অনেক বিষয় এই যন্ত্রদ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন—পদার্থ মাত্রেই যথেষ্ট তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা বাষ্পীভূত প্রজ্বলিত হইয়া পড়ে। এই জ্বলন্ত বাষ্পের শুভ্র আলোক রশ্মি নির্ব্বাচণযন্ত্রের ত্রিকোন কাচের মধ্যদিয়া আনিলে, পদার্থভেদে নানা প্রকার বর্ণচ্ছত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সকল বর্ণচ্ছত্রে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের আলোক হইতে এক একটি নিদ্দিষ্ট বর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। এই প্রকারে যে কোন উজ্জ্বল বাষ্পের রশ্মি উক্ত যন্ত্রে ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে কোন্ কোন্ পদার্থ প্রজ্বলিত হইয়া আলোক উৎপন্ন করিতেছে তাহা কেবল বর্ণচ্ছত্রের আলোক দেখিয়াই বেশ বুঝা যায়। জ্বলন্ত বাষ্পের আর একটি ধর্ম্ম এই যে, যদি অপর কোন জ্বলন্ত পদার্থের রশ্মি, ইহার ভিতর দিয়া বহির্গত হয়, তাহা হইলে প্রবিষ্ট আলোকরশ্মি হইতে, উক্তবাষ্প স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বর্ণোৎপাদক রশ্মিগুলি আত্মসাৎ করে, সুতরাং রশ্মি নির্ব্বাচক যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে উক্ত অপহৃত রশ্মিগুলির নির্দ্দিষ্ট বর্ণের স্থান বর্ণচ্ছত্রে শূন্য থাকে। ফ্রানহোফার-আবিষ্কৃত সৌর বর্ণচ্ছত্রে, যে সকল বর্ণহীন রেখা দৃষ্ট হইয়াছিল,—সৌরমণ্ডল পরিবৃত প্রজ্বলিত বাষ্প রাশির মধ্য দিয়া সূর্য্য রশ্মি আসাতেই যে তাহার উৎপত্তি, তাহা বেশ বুঝা গেল; এবং সূর্য্য যে কেবল একটি বিশাল জ্বলন্ত জড়পিণ্ড বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল তাহা অপনীত হইয়া সৌরমণ্ডল পরিবৃত উজ্জ্বল বাষ্পময় আকাশের অস্তিত্ব সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। সৌরকলঙ্ক উক্ত বাষ্পাবরণ হইতেই যে উৎপন্ন তাঁহাতে আর সন্দেহ রহিল না,—কয়েকটি পণ্ডিত স্থির করিলেন, কোন স্থানীয় কারণে সময় সময় সূর্য্যের বাষ্পাবরণ অপসৃত হইয়া, সৌরমণ্ডলে কলঙ্ক উৎপত্তি করে,—কিন্তু সেই কারণটি কি এবং কলঙ্কটা কৃষ্ণ বর্ণই বা হয় কেন, এসকল প্রশ্নের মীমাংসা হইল না।

তাহার পর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল; দেশ বিদেশীয় অনেক বিজ্ঞানবিদ্ বহুগবেষণায় জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা আবিষ্কার করিয়া ইহার সর্ব্বাংশের স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কোন দার্শনিকই সৌরকলঙ্ক রহস্যোদ্ভেদে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উন্নত ফটোগ্রাফিক্ যন্ত্রের দ্বারা কোটি কোটি যোজনস্থিত ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য তারকাবলীর চিত্র এবং সূর্য্যের নানা অবস্থার নিখুঁৎ ছবি তোলা হইতেছে, এবং উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্যে বহুদূরবর্ত্তী গ্রহাদি অনেক বিষয়ে জানা যাইতেছে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, জ্যোতিষ্ক পরিদর্শনের এই সকল অভাবনীয় সুযোগ সত্বেও, আজও উপস্থিত বিষয়টির মীমাংসা হয় নাই। সৌরচিহ্নের উৎপত্তিতত্ব আবিষ্কার জন্য অল্পদিন মধ্যে অনেকগুলি খ্যাতনামা পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া নানা চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই সর্ব্ববাদিসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; বরং গবেষণা শেষে প্রত্যেকেই এক একটি মতবাদ খাড়া করিয়া, বিষয়টিকে অসম্ভব জটিল করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল গবেষণা দ্বারা কেবল একটি মাত্র সুফল লাভ হইয়াছে দেখা যায়,—সূর্য্য ঠিক্ কত সময়ে একবার স্বীয় মেরুরেখা আবর্ত্তন করেন, তাহা এতাবৎ অভ্রান্ত রূপে জানা যায় নাই; সৌর কলঙ্কের বাহ্যিক গতি পরিদর্শন করিয়া উক্ত সময়টা এখন ঠিক্ স্থিরীকৃত হইয়াছে *।

একদল পণ্ডিতের মতে, বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধগ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইলে সৌরমণ্ডলে কলঙ্কচিহ্নের বিকাশ হয়, তাঁহারা বলেন, সম্ভবতঃ উক্ত গ্রহগণের সান্নিকর্ষই কলঙ্কোৎপত্তির কারণ। অপর এক সাম্প্রদায়িক দার্শনিক বলেন,—আমাদের পৃথিবীতে যে প্রকার উল্কাপাত হইয়া থাকে, সূর্য্যমণ্ডলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে সেই প্রকার উল্কাবৃষ্টি হয়, এবং এই উল্কাসকল বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া সৌরপৃষ্ঠে পতিত হইবার কালীন, জ্বলন্ত বাষ্পরাশি অপসৃত করিয়া অনুজ্জ্বল সৌরদেহ প্রকাশ করে। সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় অনুজ্জ্বল, ইহার আকাশই কেবল অত্যুত্তপ্ত দীপ্ত বাষ্পরাশিতে পূর্ণ, কাযেই উল্কাপিণ্ড সকল উজ্জ্বল বাষ্প স্থানান্তরিত করিলে, সূর্য্যের অনুজ্জ্বল দেহ সৌর চিহ্নরূপে প্রতিভাত হয়। ভুবন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ উইলিয়ম্ হার্সেল শেষোক্ত মতবাদের কতকটা পোষকতা করিয়াছেন; তিনি বলেন,— সূর্য্যের শীতল ও অনুজ্জ্বল কলেবরই যে উন্মুক্ত উজ্জ্বল বাষ্পাবরণের তুলনায় কৃষ্ণবর্ণ দেখাইয়া কলঙ্ক রূপে প্রকাশ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তবে কি কারণে যে সৌরাকাশের জ্বলন্ত বাষ্পরাশি সময় সময় অপসৃত হয় তাহা স্থির করা বড় দুরূহ। লসন্ নামক জনৈকখ্যাতনামা জ্যোতিবী অনুমান করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ন্যায়, সূর্য্যেরও উচ্চ পর্ব্বতাদি আছে, ইহার বাষ্পাবরণ কোন স্থানীয় কারণে তরল হইলে সেগুলির অত্যুচ্চ শিখরদেশ সৌরকলঙ্করূপে দৃষ্টি গোচর হয়। সার্ জন্ হার্সেলের মতবাদটি কিছু স্বতন্ত্র; তিনি বৃদ্ধ উইলিয়ম্ হার্সেলের মতবাদটিও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তাঁহার

* পৃথিবীর ২৫ দিন ৬ ঘণ্টায়, সূর্য্য একবার স্বীয় মেরু রেখা আবর্ত্তন করেন; অর্থাৎ আমাদের ২৫ দিন ৬ ঘণ্টা কালে, এক সৌরদিন হয়।

মতে,—সৌরাকাশে সর্ব্বদাই ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত বিদ্যমান আছে, এই ঘোর আবর্ত্তে অনন্ত বাষ্পরাশি স্থানচ্যুত হইয়া সূর্য্যের কলঙ্ক উৎপন্ন করে। ফেয়ি ও সেক্কি নামক দুইজন দার্শনিক অনেক দিন অবধি এই বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন; ইঁহারা জ্যোতিষ্ক পরিদর্শনোপযোগী প্রচলিত যন্ত্র ব্যতীত আরো দুই একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, তৎসাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—সৌরপৃষ্ঠসংলগ্ন বাষ্পরাশি তাপ সংযোগ প্রসারিত হইলে সবেগে সূর্য্যের বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হয় এবং এই বাষ্পহীন বহির্গমন পথই কৃষ্ণচিহ্ন রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত মতবাদগুলির মধ্যে কোন্‌টি সমীচিন তাহা সিদ্ধান্ত করা বড় দুরূহ, এক একটি সৌরচিহ্ন প্রায় তিনমাসকাল সূর্য্য মণ্ডলে দৃষ্ট হইয়া, থাকে, পরে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী চিহ্ন প্রায় দেড় বৎসর স্থায়ী ছিল;—এই সকল কথা বিবেচনা করিলে সৌরকলঙ্ক যে বাষ্পাবরণস্থ ঝটিকাবর্ত্তের ফল বা সূর্য্যপৃষ্ঠস্থ আবদ্ধ বাষ্পরাশির বহির্গমন পথ একথা কিছুতেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; আবার দুই একটী সৌরকলঙ্কের আকস্মিক অদর্শন বা আকার পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিলে, এই সকল আকস্মিক পরিবর্ত্তন যে, কোন বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে, তাহাও সহজে বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক সৌরকলঙ্ক রহস্য যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও গুহ্য রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং দার্শনিকগণের পরস্পর বিরোধী মতবাদগুলি সমালোচনা করিলে, তাঁহারা যে ইহার মূল তত্ত্বাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও বলা যায় না।

প্রবাদ প্রসঙ্গ।

গোঁফ খেজুরে।

একবার একজন অসম্ভব রকমের আলসে লোক একটী খেজুর গাছতলায় শয়ন করিয়াছিল, ইতিমধ্যে একটা বুলবুল আসিয়া ঐ খর্জ্জুর গাছে বসিল, এবং সুপক্ক খর্জ্জুরের উপর চঞ্চুর আঘাত করিতে লাগিল, দৈবক্রমে একটি বৃন্তভ্রষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষতলশায়ী লোকটির গালের উপর পড়িয়া তাহার গোঁফে আসিয়া বাধিয়া গেল, কিন্তু সে ব্যক্তি এতই আলস্যপ্রিয় যে হাত বাড়াইয়া তাঁহা যে মুখের মধ্যে দিবে তাহার ইচ্ছা নাই, অথচ খেজুরটির রসাস্বাদনের প্রচুর সখ আছে। পার্শ্বস্থ পথদিয়া একজন লোক যাইতেছিল তাহাকে দেখিতে পাইয়া সে বলিল "মহাশয় যদি দয়া করে আপনার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়ে

আমার গোঁফের উপরকার খেজুরটা ঠেলে মুখের মধ্যে ফেলেদিয়ে যান ত বড় উপকার করা হয়।" পথিক তাহার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আলস্যপ্রিয়তা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, তাহার পর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "তুমি দেখচি সত্য সত্যই আলসের রাজা, তোমার মত কুঁড়ে আমি দুনিয়াতে দুটি দেখি নাই, কিছু পুরস্কার চাও?"—শুনিয়া লোকটি অম্লান বদনে উত্তর করিল "আজ্ঞে, করচে গুঁজে দিয়ে যান ত নিতে পারি।"—এই জন্যই যৎপরোনাস্তি আলস্যপ্রিয় লোক 'গোঁফ খেজুরে' নামে অভিহিত হয়।

খ'য়ে বন্ধন।

একটি ছেলে ঘরে খুঁটির কাছে বসিয়াছিল, তাহার ঠাকুরমা একটি পাত্র হস্তে তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "খৈ খাবি ত হাত পাত।" লুব্ধ বালক দুইহাত একত্র করিয়া যুক্ত করতল বিস্তৃত করিল, কিন্তু ব্যগ্রতা বশতঃ সে খুঁটির দুই পাশ দিয়া তাহার হাত দুখানি বাড়াইয়া দিয়াছিল, ঠাকুরমা তাহার হাতে খৈ ঢালিয়া দেওয়ার পর সে মুখের কাছে হাত সরাইয়া লইতে আসিয়া নিজের বিপদ বুঝিতে পারিল, হাত খুলিলে খৈ গুলি মাটিতে পড়িয়া যায়, হাত না খুলিলে তাহা মুখে দেওয়া যায়না, খুঁটিতে হাত আটকাইয়া থাকে।

এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় 'খৈয়ে বন্ধন' অর্থ অগ্র পশ্চাৎ সকল দিকেই অসুবিধায় পড়া, ইংরাজীতে Between two fires বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই।

নাকে হাত দিয়া বলা।

ইহা একটি গ্রাম্য প্রবচন। কোন কথা আন্তরিকতার সহিত বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে লোকে সাধারণতঃ বলে "নাকে হাত দিয়ে বল তবেত কাজ হবে!"—এই প্রবচনের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি হাস্যকর গল্প আছে।

কোন পল্লীগ্রামের একজন জমীদার যৎপরোনাস্তি কৃপণ ছিলেন, একটি পয়সা বাজে খরচ করা তাঁহার কখন অভ্যাস ছিলনা, এমন কি বাজে খরচের আশঙ্কায় তাঁহার গৃহে তামাক পর্য্যন্ত উপযুক্ত পরিমানে রক্ষিত হইতনা, অথচ তাঁহার চাল চলনে বাবুগিরি ভাবটা খুব বেশীমাত্রাতেই প্রকাশ পাইত। তাঁহার বাড়ীতে দৈবাৎ কখন কোন ভদ্র লোক আসিলে তিনি আদর অভ্যর্থনার ক্রটী করিতেন না, "পা ধুইবার জল নিয়ে আয়" "জলখাবারের যোগাড় কর" "ভাল করে তামাক সাঁজ" ইত্যাদি ফরমাইসে তিনি তাঁহার বাড়ীখানি সশব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, এদিকে চাকর বাকরদের প্রতি আদেশছিল "আমি যতই কেন বলিনা, তোরা আমার কথাতে ভ্রূক্ষেপও করবিনে, যদি গালাগালি খাস তাও না। তবে যখন নাকে হাত দিয়ে পান কি তামাক দিতে বলবো, তখনই তা দিবি।" চাকরেরা বাবুর কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু দিন যায়, একদিন বাবুর বাড়ীতে দৈবাৎ তাঁহার বৈবাহিক আসিয়া উপস্থিত। বাবু তৎক্ষণাৎ চাকরকে পা ধুইবার জল ও তামাক দিবার জন্য আদেশ করিলেন, ভৃত্য পূর্ব্বশিক্ষামত 'যে আজ্ঞে' বলিয়া আপন খেয়ালে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তামাকের নামও করিলনা। কিন্তু বৈবাহিককে এক ছিলিম তামাক হইতে বঞ্চিত করিতে বাবুর বাস্তবিকই ইচ্ছা ছিলনা, চাকর বেটা তাঁহার এ উদার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলনা, আর কিরূপেই বা পারিবে? মনিববাড়ী আসিয়া একদিনও তাহার সে শিক্ষা লাভ হয় নাই, বাবু পুনঃ পুনঃ তামাকদিতে অনুরোধ করাতে সে 'আজ্ঞে এই যাই,' 'এই নিয়ে এলাম ব'লে' ইত্যাকার ওজরে ক্রমেই বিলম্ব করিতে লাগিল। কিন্তু ভৃত্যের এই ব্যবহারে ক্রমে বাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তাহার এমন অশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া বেহাই নাজানি কি মনে করিতেছেন ভাবিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ লজ্জারও সঞ্চার হইল, তিনি তখন তাঁহার সেই উপেক্ষিত প্রভুমহিমা সবলে অবাধ্য ভৃত্যের পৃষ্ঠে নিক্ষেপকরা বাহুল্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। পৃষ্ঠদেশে দুই একটি সুগুরু মুষ্ট্যাঘাত পড়িতেই সে সরোদনে বলিয়া উঠিল "হুজুর মার ধোর করেন কেন? আপনি নাকে হাত দিয়েঁ না বল্লে আমি কেমন ক'রে তামাক দিই! আপনার হুকুম মত কাজ করবো ত?" বৈবাহিকের শুভাগমনে কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়াতে হুজুর নাসিকা স্পর্শের কথাটা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ভৃত্যের কথা শুনিয়া বৈবাহিকের সম্মুখে তাঁহার মস্তক নত হইল।

"যারধন তার ধন নয় কো নেপোয় মারে দৈ।"

যাহার যে জিনিষ তাহার কাজে না আসিয়া যদি তাহা অন্যের ব্যবহারে লাগে, তাহা হইলে সাধারণতঃ লোকে এই প্রবাদটির উল্লেখ করিয়া থাকে। এ প্রবাটির মূল কি তাহা জানিতে পারি নাই, কেবল ইহার সম্বন্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা সংক্রান্ত একটি গল্প আছে তাহাই জানা যায়। একদিন মহারাজা কথা প্রসঙ্গে তদীয় সভাসদ্ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী ওরফে রস সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "'যার ধন তার ধন নয়কো নেপোয় মারে দৈ' কথাটা কি রকম রস সাগর?" রস সাগর তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে উত্তর করিলেন:—

"আয়ান ঘোষ বিয়ে কল্লেন রাজ কন্যা রাধা
নন্দের বেটা কৃষ্ণ তাতে ভাগ বসালেন আধা,
আর শুনেছ দুঃখের কথা আর শুনেছ সৈ
'যারি ধন তার ধন নয়কো নেপোয় মারে দৈ'।

রাম খোদা।

যাহারা হিন্দু মুসলমান কি অন্ত কোন ধর্ম্মাবলম্বীর দেবতা মানেনা অথচ বিপদে পড়িলে কিম্বা দায়ে ঠেকিলে শীতলা দেবীর বা ওলাবিবির শরণাপন্ন হয়, এবং 'পীরের দরগাতে' 'সিন্নি' মানত করে, সাধারণ কথায় তাহারাই 'রাম খোদা' নামে পরিচিত। ইহার একটা গল্প আছে। একবার একজন অত্যুৎসাহী হিন্দু ও গোঁড়া মুসলমানে বিবাদ উপস্থিত হয়, বিবাদের বিষয়টি নূতন নহে, বহুপুরাতন; হিন্দু বলিল "আমাদের হিন্দুর দেবতাই সত্য, তাঁহার নাম লইলে সকল বিপদ কাটিয়া যায়, হিন্দুর দশ অবতার পর-ব্রহ্মেরই অংশ, ম্লেচ্ছের আবার দেবতা! তোমরা পশ্চিমমুখো হইয়া কাছা খুলিয়া নমাজ পড়, আর বিড় বিড় করিয়া সাপের মন্ত্র আওড়াও।"—বিশ্বাসী মুসলমান হিন্দুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, এবং তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল "সকলই এক ভাই, তোমার রামও যে আমার রহিমও সেই, এক খোদা ছাড়া দুনিয়াতে আর দোসরা দেবতা নেই।"—হিন্দু বলিল "এস, তবে কিন্তু বাজী রাখা যাক্, দেখ কার দেবতা সত্য।" মুসলমানের উৎসাহও কম নহে, সে পাঁচ 'ওক্ত' নমাজ করে, তাহার উপর 'হজ' করিয়াছে; একজন কাফের তাহার দেবতাকে মিথ্যা বলিয়া যাইবে ইহা কি তাঁহার সহ্য হয়? সে বলিল "সেই ভাল, এস আমরা এই আম গাছে উঠি, উচু ডাল হইতে আমরা নিজের নিজের দেবতার নাম লইয়া নীচে মাটিতে লাফাইয়া পড়িব, যাহার দেবতা সত্য, লাফাইয়া পড়িলে তাহার কোনই অনিষ্ট হইবেনা।"—তাহার হিন্দু বন্ধু এতবড় গুরুতর একটা পণ করিতে কিছুতে প্রস্তুত ছিলনা, কিন্তু জিদ ত আর সহজে ছাড়া যায় না, এদিকে পণ রক্ষা করাও কঠিন, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মুসলমানকে বলিল "আচ্ছা তুমি আগে লাফ দেও, আমি পরে দিব।" মুসলমান তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে 'খোদা' বলিয়া গাছের উচ্চ শাখা হইতে লম্ফ প্রদান করিল, খোদা তাঁহার এই বিশ্বস্ত ভক্তের কথা শুনিলেন কি না বলা যায়না, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাহার হাত পা ভাঙ্গিল না, কিম্বা সে গুরুতর আঘাতও পাইলনা। অনন্তর হিন্দু প্রতিদ্বন্দী নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত গাছে উঠিল এবং 'রাম' নাম স্মরণ পূর্ব্বক সেই বৃক্ষশাখা হইতে লম্ফ প্রদান করিল, কিন্তু লাফ দিয়াই তাহার মনে হইল যদি মুসলমানের দেবতাই সত্য হয়! উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের হাত পা বাঁচাইবার জন্ত পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'খোদা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই হইতে 'রাম খোদা' শব্দের উৎপত্তি।

ভীম একাদশী।

'ভীম একাদশী'—কথাটার মধ্যে কোন পৌরাণিক তত্ত্ব নিহিত আছে কিনা তাহা মহাজনেরাই বলিতে পারেন, কিন্তু কথার মানে ধরিলে 'ভীম' বলিতে অতি 'ভয়ানক' বা 'দুষ্কর'

বুঝায়, সুতরাং 'ভীম একাদশীর' অর্থ আমারা বুঝি অতি কঠিন নির্জ্জলা একাদশী, কিরূপে কথাটার উৎপত্তি হইল বলা শক্ত কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে।

একজন সেকেলে গ্রাম্য জমীদারের একটি সৌখিন ভৃত্য ছিল, তাহার বুদ্ধি স্থূল, কিন্তু অধিকাংশ লোকের মত নিজের বুদ্ধির উপর তাহার বড়ই আস্থা ছিল! জমীদারটি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে তিনি বিশেষ ধুমধামে একাদশী করিতেন। কিন্তু নির্জ্জলা একাদশী করা তাঁহার সহ্য হইত না, সমস্ত দিন উপবাসে কাটাইয়া, অপরাহ্ন কালে ফল ফুলারী হইতে আরম্ভ করিয়া দুধ, ক্ষীর, ছানা, সর ও লুচি কচুরি প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ তাঁহার বুদ্ধিত ক্ষুধানলে আহুতি প্রদত্ত হইত। চাকরটি মণিব মহাশয়ের এইরূপ একাদশীর ঘটা দেখিয়া মনে মনে স্থির করিল অতঃপর সেও একাদশী করিতে আরম্ভ কবিবে। কিন্তু মনিবের নিকট সহসা তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলনা, মনে করিল একাদশীর দিনই তাহার অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রভুর প্রশংসা এবং বিস্ময় মায়সুদ আদায় করিয়া লইবে।

এক পক্ষ পরে আবার একাদশী আসিল। পরিচারকবর প্রত্যহ তিনবার করিয়া অন্ন [illegible] করিত, তাহার উপর 'চাউলভাজা' 'মুড়ি' প্রভৃতি ত উপরি রোমন্থন করা আছেই, কিন্তু এদিন সে জলস্পর্শও করিলনা। তাহার প্রভু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রে! আজ কিছু খাচ্ছিস নে, অসুক টসুক করেছে নাকি?"—ভৃত্য সবিনয়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, চিরকালই ত আর এক রকমে কাটানো ভাল নয়, বয়েস ক্রেমে বাড়ছে, এখন একটু ধর্ম্মের দিকে নজর চাইতো, আমি এখন হতে একাদশী করবো মনে করেছি"।—প্রভু দেখিলেন এ মন্দ কথা নয়, মাসে দুদিন গৃহস্থালীর যে কিছু চাউল বাঁচে, সেই পরমলাভ, সুতরাং তিনি তাঁহার ভৃত্যের এই সাধু সংকল্পের প্রচুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং তাহার পরকালের পথও যে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে সে কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু হায়! চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী! যতই বেলা শেষ হইতে লাগিল, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ততই তাহার মহাপ্রাণী ছটফট্ করিতে লাগিল, অবশেষে প্রচুর ধৈর্য্য এবং অসাধারণ উৎসাহ সঞ্চয় পূর্ব্বক কোন রকমে সে সন্ধ্যার আগমন প্রতীক্ষায় রহিল,—আজ ভাল রকমই প্রসাদ পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাবু তাঁহার ভৃত্যের মতলব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, সে দিন তিনি জলযোগের কোন রকম আয়োজন করিলেন না, ক্ষুধার প্রকোপ বৃদ্ধি হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে ধীরে ধীরে ময়রার দোকানে গিয়া গোপনে পরিতোষ পূর্ব্বক জলযোগ করিয়া আসিলেন, ভৃত্য তাহা জানিতে পারিল না। এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, কিন্তু প্রভু একাদশীর প্রতি একান্ত উদাসীন দেখিয়া ভৃত্যের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সাহসে ভর করিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিল 'বাবু, রাত হলো এখনও ত একাদশীর কোন আয়োজন করা হয়নি, একবার খবর নেব কি?"—প্রভু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন "জল খাব কিরে বেটা!—আজ

যে ভীম একাদশী, নির্জ্জলা উপোস করবার নিয়ম, আজ জল খেলে যে ছাপান্ন পুরুষ নরকে যাবে, এমন কথা আর মুখে আনিস্‌নে।” শুনিয়া ভৃত্য অগত্যা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, বুঝিল একাদশী করাও সর্ব্বত্রনিরাপদ নহে, একাদশী করিয়া সমস্তদিন অনাহারে লুচি সন্দেশের মিথ্যা প্রলোভন অপেক্ষা দিনে তিনবার পরিপুর্ণ মাত্রায় ভাত থাওয়া অনেক ভাল, তাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হোক না হোক সঞ্চিত ক্ষুধার তাড়নায় জ্বালাতন হইতে হয় না। সেই দিন হইতে সে একাদশী করার সংকল্পটা একবারেই পরিত্যাগ করিল, কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ললাটে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া সবিষাদে উত্তর করিত “কপাল গো কপাল, বাবু যেদিন করেন একাদশী সেই দিনই লুচি সন্দেশ, ক্ষীর মোহন ভোগের আয়োজন হয় আর আমি যে দিন একাদশী কর্ত্তে চাই সেই দিনই ভীম একাদশী, নিরম্বু উপবাস!”

ঢেঁকী অবতার।

সহৃদয় পাঠক দশ অবতারের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু ‘ঢেঁকী অবতার’ কথাটা তাঁহাদের কানে কিছু অদ্ভুত শুনাইবে, তথাপি আমাদের পাঠিকাগণ অনেকেই যে এ ... ‘হুজ’ তাঁহারা পরিচিতা একথা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি; ঢেঁকী অবতার বলিতে তাঁহারা যা বুঝেন তাহার অর্থ অনেকটা ‘অদ্ভুদ্ বেসবত জানোয়ার বিশেষ।’ যাহা হউক ঢেঁ অবতারের গল্পটার এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে;

এক সময়ে এক ঠাকুর একজন শিষ্যের গৃহে পদার্পন করিয়াছিলেন, তিনি সেখা উপস্থিত হইয়া আহারাদি বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং অসাধারণ সংযম শিক্ষা দেখাইয়া সকলে মুগ্ধ করিবার অভিপ্রায় করিলেন; মাঘ মাসের শীত, শিষ্য কিছু সম্পন্নলোক, সে গু ঠাকুরের জন্য পালঙ্ক, তাহার উপর পুরুবিছানা লেপ ও বালিশ দিয়া সেখানে শয় করিবার জন্য অনুরোধ করিল, গুরু ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন “বেটা, আমি তোর মত বাবু যে বাবুগিরি করিয়া পালঙ্কে শুইব, মেঝেতে একটা মাদুর বিছাইয়া আর এক আঁটী বিচালী লইয়া আয়, তাহার উপর শুইয়াই আমার রাত্রি কাটিবে, ব্রহ্মচ করাই আমাদের সনাতন বিধি।”

শিষ্য আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় নাকরিয়া গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল, গুরুঠা মেঝেতে এক মাদুর বিছাইয়া বিচালীর বালিশ শিথানে দিয়া এক মাত্র কম্বল সম্বল কি শয়ন করিলেন। শিষ্য গৃহে নৈশ সেবাটা কিন্তু গুরুতরই হইয়া ছিল, গুরু ভোজনে গু শরীর কিছু গরম হইয়া উঠিল, মাঘের শীতেও তিনি মাদুরের উপর সটান প রহিলেন।

প্রথম প্রহর রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল।

দ্বিতীয় প্রহরে একটু শীত বোধ হওয়াতে, গুরুদেবের দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ বক্র হ

পড়িল, কম্বলে আর শীত থামেনা, কিন্তু কাহারো নিকট লেপ কি মোটা কাপড় কিছু চাহিয়া লইতে লজ্জা বোধ হইল।

তৃতীয় প্রহরে শীত আরো প্রবল হইয়া উঠিল, তখন গৃহস্থ সকলেই নিদ্রাসুখে নিমগ্ন, কাহার নিকট এতরাত্রে গাত্র বস্ত্র চাহিবেন? অগত্যা গুরুদেব আরও একটু বক্র হইয়া উভয় জানু বক্ষের সন্নিকটবর্ত্তী করিয়া কোন প্রকারে শীত নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়, শীতে হিহি কম্পন।

চতুর্থ প্রহরে শীতের প্রাবল্যে গুরুদেবের প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বহু কষ্টে, নিশ্বাস রোধ করিয়া, জানু বক্ষ ও মস্তক একত্র করিয়া কোন রকমে অবশিষ্ট রাত্রি টুকু অতিবাহিত করিলেন।

গুরুঠাকুরের এই ভণ্ডামী একজন শিষ্যের কিছু অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, গুরুঠাকুরের এই রকম দুরবস্থাও তিনি সমস্ত রাত্রি পর্য্যবেক্ষন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে স্থানীয় পাঁচজনে গুরুঠাকুরের নৈশ কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অম্লানবদনে ব্যক্ত করিলেন যে অতি [illegible] আরামে তাঁহার রাত্রি কাটিয়াছে, গরম কাপড় না থাকাতে তাঁহাকে কোন [illegible] কষ্টভোগ করিতে হয় নাই, [illegible] [illegible] তাঁহার বন্ধু [illegible] বলিলেন—

প্রথম প্রহরে প্রভু [illegible] ([illegible])
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু [illegible] (কিঞ্চিৎ বক্র)
তৃতীয় প্রহরে প্রভু [illegible] (শীতে জড়সড়)
চতুর্থ প্রহরে প্রভু কুক্কুর কুণ্ডলী। (একেবারে [illegible])

[illegible] পড়িল।

যাঁহা পঞ্চাম তাঁহা ছাপাম।

একজন লোক বাল্যকাল হইতেই অসৎসংসর্গে মিশিয়া নানা প্রকার কুকার্য্যে কাল যাপন করিত, বয়োবৃদ্ধি সহকারে শেষে সে দস্যুদলপতি হইয়া উঠিল; তাহার লাঠির আঘাতে অনেককেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার মনের বল কমিয়া আসিল, এবং পরকালের কথা ভাবিয়া ধর্ম্মভয় উপস্থিত হইল, তখন সে অনুতপ্ত হৃদয়ে এই ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল। তাহার মিনতি এবং প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অভীষ্ট দেবতা মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ জীর্ণ বস্ত্র দিয়া বলিলেন "বৎস, এই বস্ত্রখণ্ড তুমি তোমার নিকটে রাখিয়া দেও, যে দিন দেখিবে এই কালো কাপড় সম্পূর্ণ সাদা হইয়া গিয়াছে সেই দিন তোমার সমস্ত পাপক্ষয় হইবে।"

দস্যু সেই বস্ত্র খণ্ড লইয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার ছেঁড়া নেকড়া সাদা হইলনা, কত ব্রাহ্মণের পাদোদক খাইল, কত সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় ঘসিল, তথাপি কোন ফল পাইলনা, অত্যন্ত মনোকষ্টেই সে কাল কাটাইতে লাগিল।

এক দিন সে একটি বন্যপথ দিয়া তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইতেছে এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী অরণ্যের অন্তরালে রমণীর বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইল। সবিস্ময়ে অগ্রসর হইয়া দেখিল এক বিকটাকার, বলবান ব্যক্তি একটি অসহায় রূপবতী যুবতীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে, যুবতী অতি কাতর ভাবে সেই পাষণ্ডের করুণাভিক্ষা করিতেছে কিন্তু সে তাহার কাতর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে।

দেখিয়াই সেই প্রাচীন দস্যুর মনে অত্যন্ত ক্রোধ সঞ্চার হইল। আজ এই অনাথার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দীকে দয়া প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধে কোন ফলই পাওয়া যাইবেনা তাহা সে বুঝিতে পারিল। তাহার হাতে ছিল এক মোটা বাঁশের লাঠি, ডাকাইতি ছাড়িয়াছে বটে কিন্তু আজ ও সে লাঠি ছাড়ে নাই। যৌবনকালে দস্যুদলে মিশিয়া এই লাঠির আঘাতে সে পঞ্চাশ জন মনুষ্যের মস্তক চূর্ণ করিয়াছে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে সেই যুবতীর প্রতি অত্যাচারোন্মুখ বলবান ব্যক্তির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর "যাহা পঞ্চাশ তাঁহা ছাপ্পান্ন" বলিয়া তাহার মস্তকের উপর সবেগে সেই বংশদণ্ড বসাইয়া দিল, লোকটি তখনই প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পড়িল, এবং এইরূপে অসহায় যুবতী উদ্ধার লাভ করিল। হঠাৎ তাহার কালো নেকড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দস্যু সবিস্ময়ে দেখিল বস্ত্রখণ্ড সম্পূর্ণ সাদা হইয়া গিয়াছে। এই একটি মাত্র কার্য্যে তাহার জীবনের সকল পাপ ধৌত হইয়া গেল।

বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বে অনেক কাজ করা হইয়াছে, হয়তসে জন্য ঠকিতেও হইয়াছে কিন্তু ঘটনা ক্রমে আবার হয়ত সেই রকম কাজ করিতে হইল, অথচ বিশেষ বিবেচনা করিয়া কি করা কর্ত্তব্য তাহাও ভাবিয়া দেখিবার সময় নাই, তখন অনেকেই "যাহা পঞ্চাশ তাঁহা ছাপ্পান্ন" বলিয়া একটা কাজ করিয়া ফেলে!

"বল্লে মা মার খায়, না বল্লে বাপে এঁটো খায়।"

এই প্রবচনটি পল্লী অঞ্চলে গৃহস্থ রমণীগণের মধ্যে অত্যন্ত বেশী রকম প্রচলিত আছে। কেহ কোন দোষ করিলে যদি কাহারো পক্ষে তাহা গোপন করার আবশ্যক হয় অথচ গোপন করিলেও বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া পুরনারীর মুখে এই প্রবচন স্বতঃই উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই প্রবাদের উৎপত্তি এইরূপঃ—

কোন কোপনস্বভাব বিশিষ্ট গৃহস্থ অত্যন্ত মাংসপ্রিয় ছিল, সে এক দিন ছাগ মাংস কিনিয়া আনিয়া তাহার স্ত্রীকে তাহা রন্ধনের জন্য আদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্থানান্তরে যায়।

গৃহিনী স্বামীর আজ্ঞানুসারে মাংস রন্ধন করিয়া রান্নাঘরে একটা পাত্রে ঢাকিয়া রাখিল, কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ পাকশালায় ভিতর একটী কুকুর প্রবেশ করিয়া পাত্রস্থ মাংস প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

গৃহিনী টের পাইয়া তাড়াতাড়ি কুকুরটাকে ত তাড়াইয়া দিল, কিন্তু স্বামী আসিয়া কি বলিবে এই ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কোন উপায় নাই দেখিয়া নিষ্ঠুর স্বামীর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় অবশেষে অতি সঙ্কুচিত ভাবে কুকুরের ভুক্তাবশিষ্ট মাংসই তাহাকে আহারার্থে প্রদান করিল। স্বামী মাংসের অল্পতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল যে অবশিষ্ট মাংস ছেলেরা খাইয়া ফেলিয়াছে। ছেলেরা খাইয়াছে শুনিয়া গৃহস্থ আর কোন রকম উচ্চবাচ্য করিলনা, কিন্তু সেই গৃহে তাঁহাদের একটি বয়স্থা বুদ্ধিমতী কন্যা ছিল, সে প্রথম হইতেই সকল কথা জানিত, পিতামাতার কথোপকথন শুনিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কি করা উচিত, কুকুরের মাংস খাওয়ার কথাটা প্রকাশ করিলেও বিপদ, প্রকাশ না করাও অন্যায়—"বল্লে মা মার খায়, না বল্লে বাপে এঁটো খায়।"

হায়দ্রাবাদ এসাইণ্ড ডিষ্ট্রীক্টস্।

এত দিন যে যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে সে দেশগুলি প্রায়ই বাঙ্গালী-দের পরিচিত ছিল। কিন্তু আগামী বারে যেখানে জাতীয় মহা সভা বসিবে সে দেশ সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা প্রায়ই কিছুই জানেন না। তাই আজ সেই অঞ্চলের কিছু কিছু বিবরণ আমার স্বজাতীয় পাঠকদের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

হায়দ্রাবাদ এসাইণ্ড ডিষ্ট্রীক্টস্ বা বেরার, হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্য কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইম্পিরিয়ল ট্রুপস্ রাখিবার খরচের বাবদ নিজাম গবর্ণমেণ্ট বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দেনায় হইয়া পড়েন। তন্নিমিত্ত ইংরাজী ১৮৫৩ সালে বেরার প্রদেশটি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেন—সর্ত্ত এই থাকে যে গবর্ণমেণ্ট প্রদেশের আয় হইতে ইম্পিরিয়ল টুপস্ রাখিবার খরচ চালাইবেন এবং বক্রী টাকা হইতে বৎসর বৎসর দেনার টাকা শোধ হইবে। কিন্তু তদবধি বেরার একেবারে নিজামের হস্ত বহির্ভূত হইয়া গেল। যদিও সমস্ত দেনা ইংরাজি ১৮৬০ সালে শোধ হইয়া গিয়াছে তথাপি বেরার প্রদেশ ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। মধ্যে মধ্যে এক একবার ফিরাইয়া দিবার কথা উঠে কিন্তু আবার তাহা চাপা পড়িয়া যায়। তবে বেরারের উদ্বর্ত্ত আয় বলিয়া কয়েক লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর নিজাম বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পান। কথিত আছে বাযায় লক্ষ টাকা বাকী

পড়ায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বেরার গ্রহণ করেন; তজ্জন্য এই দেশকে হিন্দুস্থানীরা "বাওন্ বরার" বলে।

বেরারের ঠিক মাঝামাঝি দিয়া ভূসাওল ষ্টেশন হইতে জি, আই, পি, রেলওয়ের লাইন নাগপুর অভিমুখে গিয়াছে। বেরারের দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ অর্থাৎ খাস নিজামের রাজ্য। পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস্ এবং পশ্চিমে বোম্বাইয়ের অন্তর্গত খান্দেশ। প্রদেশটি ঠিক ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে এবং তজ্জন্য অতিশয় গরম। নদী এদেশে একরূপ নাই। পূর্ণা বলিয়া একটি ছোট নদী আছে, ইহা তাপ্তীনদীর একটি শাখা। তবে পূর্ব্ব সীমায় ওয়ার্দা নদী এবং দক্ষিণ সীমায় পেন গঙ্গা নদী আছে। ইহারা উভয়ে মিলিত হইয়া গোদাবরীতে গিয়া পড়িয়াছে। বেরারের উত্তর অংশের নাম মেলঘাট, মেলঘাট পার্ব্বত্যপ্রদেশ কিন্তু অতি অস্বাস্থ্যকর। এই পর্ব্বত মালার নাম সাতপুরা। এই পর্ব্বত ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তরে হিন্দুস্থান এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য। মেলঘাটে চিকালড়া বা চিকালদারা নামে শৈলনিবাস আছে। গ্রীষ্ম কালে বেরারের সাহেবগণ এইখানে থাকেন। চিকালডা বেশী উচ্চ নয়—প্রায় ৩৭০০ ফুট হইবে। বেরারের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অরঙ্গাবাদ নামে একটি সহর আছে। অরঙ্গাবাদ বেরারের বাহিরে; নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে সম্রাট অরঙ্গজেবের কন্যার শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত কবর আছে। এই কবর আগ্রার তাজের অনুকরণে নির্ম্মিত। এখান হইতে ইলোরা এবং অজণ্টা গুহা বাওয়া যায়।

বেরারের প্রধান শাসনকর্ত্তা হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট। রেসিডেণ্ট হায়দ্রাবাদ সহরে থাকেন। এখানকার রেসিডেণ্টের নাম মিষ্টার চিচ্লে প্লাউডেন। এবার যখন মহীশূরের রেসিডেণ্ট মিষ্টার ম্যাকওয়ার্থ ইয়ং পঞ্জাবের ছোট লাট নিযুক্ত হন তখন ইহারও ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল। রেসিডেণ্টের নীচেই একজন কমিশনর আছেন। ইহার হেড কোয়ার্টার্স অমরাবতীতে এবং সমস্ত বেরারের উপর ইহার আধিপত্য। অমরাবতী বা উমরাওতী বেরারের রাজধানী। এই স্থানেই আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। জি, আই, পি রেলওয়ের মেল্ লাইনের বদ্‌নেরা ষ্টেশন হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত ৬ মাইল একটি ব্রাঞ্চ লাইন আছে। অমরাবতী সহর নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। সহরের চতুর্দ্দিকে পাথরের দেয়াল দিয়া ঘেরা। এই দেয়ালের বেড় প্রায় ৩।৪ মাইল হইবে এবং ২০।২৫ ফীট উচ্চ। পিণ্ডারীদিগের লুঠের দৌরাত্ম্যে নাগপুরের ভোঁসলা রাজা এই দেয়াল প্রস্তুত করান। দেয়ালের বাহিরে নূতন বসতি হইয়াছে। এইখানে সহরের দেশীয় বড়লোক সুন্দর সুন্দর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছেন। এদেশের উকীল, একষ্ট্রা আশিষ্টেণ্ট কমিশনর প্রভৃতি শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রায়ই পুণা অঞ্চলের মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। শিক্ষিত বেরারী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অমরাবতীতে জন কতক উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত উকীল আছেন। তাহার মধ্যে গণপৎরাও থাপার্ডে, রঙ্গরাও মুধোলকার এবং মোর পন্থ

যোশী এই তিন জনই প্রধান। ইহারাই এদেশের মুখপাত্র। সাহেবেরা সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সিবিল লাইন্সে থাকেন। সে জায়গার নাম ক্যাম্প। অমরাবতীতে বেরারের হাইকোর্ট আছে। জজ একজন মাত্র, তাঁহাকে জুডিসিয়াল কমিশনর কহে। একজন শেশন জজ আছেন। তিনি বেরারের সব জেলায় দায়রা করেন। বেরারে মোট ছয়টি জেলা আছে:—অমরাবতী, ইলীচপুর, আকোলা, বুলডানা, বাসিম এবং উন, বা, ইয়োৎমল ; প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ডেপুটি কমিশনর এবং তাহার আনুসঙ্গিক আসিষ্টণ্ট ও একষ্ট্রা আসিষ্টণ্ট কমিশনরগণ আছেন। একষ্ট্রা আসিষ্টণ্ট কমিশনর অমাদের দেশের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের মতন। ডেপুটি ও আসিষ্টণ্ট কমিশনর আমাদের দেশের সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেটের মতন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে এক আধজন মাত্র ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিসের লোক আছেন। আর সবই মিলিটারী ষ্টাফ্‌কোর অফিসার এবং আন্‌কবেন্তাণ্টেড সার্বিসভুক্ত। জন কতক কালা আদমী বেরার কমিশনের মধ্যে আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কপালে পূরা মাহিয়ানা নাই—এক তৃতীয়াংশ কম। বেরার কমিশনে ঢুকিতে হইলে কোনরূপ পরীক্ষা প্রভৃতি আলাযন্ত্রনা কিছুই নাই। শুদ্ধ সুপারিসের জোর চাই। দেশীয় অফিসরের মধ্যে একজন খুব মোটা মাহিয়ানা পান—মাসে ১০০০৲ এক হাজার টাকা। ইনি শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা, ইঁহার হেড কোয়াটার্স আকোলায়। ইনিও পুণার ব্রাহ্মণ। এদেশে কোনও কলেজ নাই। গবর্ণমেণ্টের দুইটি হাইস্কুল আছে। একটি অমরাবতীতে এবং আর একটি আকোলায়। এই স্কুল হইতে ছেলেরা বম্বে ইউনিভার্সিটীর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়। পরে পাস হইলে বম্বে গিয়া কোনও কলেজে পড়ে। এদেশে বাঙ্গালী একরূপ মোটেই নাই। একজন বাঙ্গালী আসিষ্টণ্ট ইঞ্জিনিয়র পূর্ত্ত বিভাগে আছেন। এবং আকোলা একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রের আফিসে একজন বাঙ্গালী একাউণ্টেণ্ট এবং একটি বাঙ্গালী ওভারসিয়র আছেন। এদেশে বাঙ্গালীর উপযুক্ত খাওয়ার জিনিষ পাওয়া যায়না। মাছ মোটেই নাই। নদী নালা বিল কিছুই নাই মাছ আসিবে কোথা হইতে? তরিতরকারিও সুবিধা মত পাওয়া যায়না। এখানে পবলিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রের তিনটি ডিবিশন আছে। একটী অমরাবতীতে একটি আকোলায় ও আর একটি ইয়োৎমালে। এদেশে পূর্ত্ত বিভাগের কাজ খুব চলে। এখন প্রায় সকল জায়গাতেই পাকা রাস্তা তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও জায়গায় নদীনালার উপর পুল তৈয়ার হওয়া বাকি আছে। দুই এক স্থানে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সব সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। এদেশে ইট প্রস্তুত করার উপযুক্ত মাটি পাওয়া যায়না এবং পাথর সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া বাড়ী ঘর সব পাথরের তৈয়ারী। আমাদের দেশের ন্যায় পাকা ছাদ নাই, সব খোলার ছাদ। সরকারী বাড়ীর ছাদ সব ম্যাঙ্গালোর কিম্বা ওয়ারোরা হইতে আনীত খোলার টালিতে তৈয়ারী। দেখিতে মন্দ দেখায় না। দোতলা বাড়ী খুব কম।

অমরাবতীর নীচেই আকোলা সহর। আকোলা জি, আই, পি মেন লাইনের উপর। আকোলা রেলওয়ে ষ্টেশনটি অতি সুন্দর। আকোলা হইতে বাসিম এবং হিঙ্গোলী যাইতে হয়। পাকা রাস্তা আছে। আকোলা হইতে বাসিম ৫১ মাইল এবং বাসিম হইতে হিঙ্গোলী ২৯ মাইল দূরে। হিঙ্গোলী হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত এবং একটি ক্যাণ্টনমেণ্ট। এখানে হায়দ্রাবাদ কণ্টিঞ্জেণ্টের একটি রেশালা (cavalry) ও একটি পল্টন (Infantry) থাকে। এই স্থানে হায়দ্রাবাদ কণ্টিঞ্জেণ্ট সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া লই। হায়দ্রবাদ কণ্টিঞ্জেণ্টকেই ইম্পিরিয়ল ট্রুপ্স্ বলে।ক ণ্টিঞ্জেণ্টের সমুদয় খরচ নিজাম (অর্থাৎ বেরারের আয় হইতে) বহন করেন কিন্তু যুদ্ধকালে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের। অফিসরেরা সব ইংরাজ এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার অধীন। কণ্টিঞ্জেণ্টের ৬টি পল্টন ৪টি তোপ খানা (Battery) এবং ৪টি রেশালা আছে। এই সকল রেজিমেণ্ট হায়দ্রাবাদের নানা স্থানে ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে। জাল্না মোমিনাবাদ হিঙ্গোলী অরঙ্গাবাদ রায়চুর এবং সেকেন্দ্রাবাদে কণ্টিঞ্জেণ্টের ছাউনি আছে। বেরারের মধ্যে এক ইলীচপুরে ছাউনি আছে। এখানে হায়দ্রাবাদ কণ্টিঞ্জেণ্টের একটি পল্টন ও একটি তোপখানা থাকে। ইলীচপুর অমরাবতী হইতে ৩১ মাইল দূরে। বরাবর একটি পাকা রাস্তা আছে। ইলীচপুর এককালে খুব বড় সহর ছিল। কিন্তু এক্ষণে রেল হইতে অনেক দূরে পড়ায় ইহার অতি দুরাবস্থা। ইলীচপুর হইতে চিকালডা পাহাড়ে যাইবার পাকা রাস্তা আছে, চিকালডা ইলীচপুর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে।

আকোলার নীচেই খাস গাঁও সহর। জি, আই, পি মেন লাইনের জালম ষ্টেশন হইতে খাস গাঁও পর্য্যন্ত একটি আট মাইল ব্রাঞ্চ লাইন আছে। খাস গাঁও আকোলা জেলার একটি মহকুমা; এক্ষণে ক্রমে একটি বড় সহর হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইয়োৎমাল যাইতে হইলে ধামন গাঁও ষ্টেশনে নামিতে হয়। ষ্টেশন হইতে ২৯ মাইল পাকা রাস্তা আছে। ডাকগাড়ী চলে। এখানে সকল রাস্তাতেই প্রায় ডাকগাড়ী চলে। আকোলা হইতে বাসিম হইয়া হিঙ্গোলী পর্য্যন্ত একটি ডাকগাড়ী যায় এবং অমরাবতী হইতে ইলীচপুর পর্য্যন্ত ডাকগাড়ী যায়। বুলডানা যাইতে হইলে মাল্কাপুর ষ্টেশন হইতে ডাকগাড়ী করিয়া ২৮ মাইল যাইতে হয়। ডাকগাড়ী মানে দুইচাকার গাড়ী; মাথায় ক্যাম্বিশের ছাদ, নাম টাঙ্গা, ছোট ছোট দুইটি ঘোড়ায় টানে। যাঁহাদের নিজের টাঙ্গা আছে তাঁহারা ঘোড়া রাখেন না, বলদ রাখেন। এদেশে বলদের চলনটা ঘোড়া হইতে বেশী। বলদও আমাদের দেশের মতন জীর্ণ শীর্ণ নহে; ঘোড়ার ন্যায় দৌড়াইয়া যায়। এদেশের প্রায় সকল সহরেই জলের কল আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বৃষ্টিপাত এত কম যে প্রায়ই কলে জল পাওয়া যায় না। এদেশে গড়ে ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। এদেশের লোককে বড়ারি বলে। ভাষা মহারাষ্ট্রী। বড়ারি প্রায় সকলেই কৃষিকর্ম্ম করে; কোনও রূপ শিল্প কার্য্য জানেনা। স্ত্রীলোকেরা কাছা দিয়া কাপড় পরে এবং দেখিতে সুশ্রী নয়। ভদ্রলোকমাত্রেই

প্রায় পুণা অঞ্চলের লোক; এদেশে প্রবাস করিতেছেন মাত্র। ইহাদেরও ভাষা মহারাষ্ট্রী, ইহারা আগন্তুক ভদ্রলোক দেখিলে খুব খাতির যত্ন করেন। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও কাছা দিয়া কাপড় পরেন কিন্তু দেখিতে খুব সুশ্রী এবং পর্দ্দানসীন নহেন। মহারাষ্ট্রীদিগের মধ্যে কেবল রাজ রাজড়াদিগের মতন খুব বেশী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে পর্দ্দা আছে। "মহারাষ্ট্রী" বলিলেই আমাদিগের মনে শিবজি ও তাঁহার সে দুর্দ্দান্ত সৈন্যদলের কথা উঠে; ভাস্কররাও ও তাঁহার লুণ্ঠনকারী বর্গীদিগের কথা স্মরণ হয়। মনে হয় মহারাষ্ট্রীরা নাজানি কিরূপ বীর পুরুষ। কিন্তু এখানে আসিয়া মহারাষ্ট্রীদিগকে দেখিলে সে সব কথা কল্পনা বলিয়া মনে হয়। এখন ইহারা বাঙ্গালী অপেক্ষাও অধম। তবে যাকিছু পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিয়াছেন গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরের হোলকার। কিন্তু ইহারা এক্ষণে আর পুরা মহারাষ্ট্রী নাই। কতকটা হিন্দুস্থানী এবং কতকটা রাজপুত হইয়া পড়িয়াছেন।

এদেশের মাটি কাল রঙ্গের এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। তুলার যেই বেরারের ক্রমে উন্নতি হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ খাদ্যোপযোগী শস্যের প্রতি অমনোযোগ করায় খাদ্য শস্য মহার্ঘ হইয়াছে এবং অন্য দেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। অবস্থাটি অনেকটা আমাদের দেশের পাটের চাষের অবস্থার মতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে সকল সহরেই বিশেষতঃ অমরাবতী আকোলা এবং খাস গাঁওয়ে তুলার বিচী ছাড়াইয়া গাঁটবন্দি করিবার বিস্তর কল আছে এবং প্রতিবৎসর অসংখ্য তুলার গাঁট বম্বে হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। রেলি ব্রাদার্সের কল প্রায় সকল জায়গাতেই আছে। কিন্তু অনেক কল নাগপুর অথবা বম্বের দেশীয় ধনীর কল। এটি আমাদের দেশের ধনী লোকের লক্ষ্য করিবার কথা। একটি মাত্র কাপড় বুনিবার কল আছে। সেটি বাদ্‌নেরায়। তাহার কাজ বেশ চলে! এই সকল কলে অনেক পার্শি ইঞ্জিন-ড্রাইভার মিস্ত্রি (fitter) প্রভৃতির কাজ করে। মাহিয়ানাও বেশ পায় এবং ভদ্রলোকের ন্যায় থাকে। আর আমাদের দেশের যুবকেরা বি, এ, এম, এ, পাশ করিয়া ৩০৲ টাকা মাহিয়ানার কেরানীগিরি খুঁজিয়া বেড়ায় এবং টানা পাখার নীচে চেয়ারে বসিতে পাইলে স্বর্গসুখ মনে করে। পার্শিদিগের মাতৃ ভাষা গুজরাটি; মারাটি নহে।

প্রায় সকল দেশেই দেখিবার এবং দশজনকে দেখাইবার উপযুক্ত স্থান দুই একটি আছে কিন্তু এদেশ এমন হতভাগা, এখানে দেখিবার স্থান একটিও নাই। এ দেশ বেড়াইয়া স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ যে কিছু জিনিস কিনিয়া লইয়া যাইবেন সেরূপও কিছু পাওয়া যায় না।

কবির মালঞ্চ।

ক্ষুদ্র গাঁ্যাদা।

(এক প্রকার বৃহৎ গাঁ্যাদা আছে, সে গুলি খুব্ ফুটন্ত হয়। সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ক্ষুদ্র ও ঘন নিবিষ্ট দল)

(১)

হাসরে—ফোটরে,
হাসি হাসি ফোটরে,
অত জড় সড় হয়ে কেন তুমি থাকরে ?
কেন, কেন ফুল,
সোণার বরণ ধরে হোস্‌রে আকুল ?

(২)

তুষার প্রদেশে যথা
মেষশিশুগুলি হায়,
সঙ্কুচিত লোমাবলী ইতি উতি ধায়,
রে ফুল সুন্দর
অনাদর-তুষারেতে তুইও কাতর !

(৩)

হাটে বাটে মাঠে,
পুকুরের ঘাটে,
যেখানে সেখানে, তুমি ফোট সব ঠাঁই,
জান না বড়াই,
যতনে ভারতবাসী তোষে না'ক তাই !

(৪)

অমন করিয়া,
সুলভ হইয়া,
রূপের দোকান পাত যেখানে সেখানে ;
ভারতের কিবা সদাচার,
দেখেও দেখে না তাই তোর ও বাহার !

(৫)

আমি কিন্তু ভাল বাসি,
তোর সঙ্কুচিত হাসি,
প্রকৃতি মায়ের কোলে "ভীতুশিশু" প্রায় ;
যেন শাখার আগায়,
ক্লেশে দোলে কায়,
তবু পাখী গান গায়—জগতে মাতায় !

(৬)

ফুল,
ঝরণার নীর,
নয়নের নীর,
কত কি গো ঢালিয়াছি গোলাপের পায় ;
তবু ফোটেনারে হায়—
এত কি করেও তার মন পাওয়া যায় !

(৭)

কামিনীর মূলে
দিয়াছি গো ঢেলে,
প্রাণপণ ভালবাসা, হিয়ার আরতি ;
ফুটি ফুটি করি,
আধফোটা হয়ে শেষে গেল ফুল ঝরি !

(৮)

বাগান হলনা আর,
বৃথা সাধন যতন !
এত ভাবি কবি-মন কাঁদিল যখন ;
দোপাটিরে অগ্রদূতী করি,
দাঁড়ালে আসিয়ে তুমি সুবর্ণশরীরী !

(৯)

তাই ভাল বাসি
রাশি রাশি রাশি,
মেদুর সমীরে ঢেউ, তোর ঐ হাসি ;
সহজ সুন্দর,
মান-টানা-নাহি-জানা রূপ মনোহর!

(১০)

বাসন্তী সুন্দরী,
ফুলকুলেশ্বরী,
তোরেই করিত ভূষা বালিকা-শৈশবে ;
হাব ভাব শিখি,
অশোক চম্পকে সাজে এবে রতি-সখি!

(১১)

হাসরে, ফোটরে,
হাসি হাসি ফোটরে,
অত জড় সড় হয়ে কেন তুমি থাকরে ?
হেমকান্তি যার
অমন সংকোচ-ভাব কেন ফুল তার ?

কৃষ্ণচূড়া ফুল।

(বিরহিণী রাধার উক্তি)

(১)

না সখি—আমার শ্যাম এখানেই আছে লো,
বঁধুয়া আমার ;
গৃহেতে পশেনি চোর,
ভাঙেনি সম্পদ মোর,
হয় নাই বিসর্জ্জন প্রেম-প্রতিমার ;
এই সখি তার চূড়া—কোথা তার পীতধড়া?
কোথায় বাঁশরি তার ঝরণা সুধার ?

(২)

কেমন মোহন চূড়া রাঙাপীতে আঁকা লো
আমার শ্যামের!
কেমন হেথায় রেখে, আপনি লুকায়ে থেকে,
খেলিছেন লুকাচুরি লয়ে আমাদের!
এস খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় মাধব তারি,
আমরাও গোপবালা রঙ্গ জানি ঢের!

(৩)

বাঁশিটি আছেগো রাখা কদমেরি তলে লো,
যমুনা—পুলিনে ;
কদমেরি তলে বাঁশি
ছড়াইতে সুধারাশি
ভাল বাসে ; শ্যাম তারে রেখেছে সেখানে ;
তার প্রতি নন্দ বাম, যথা বাঁশি তথা শ্যাম ;—
বাঁশিটি পাইলে, মোরা পাব শ্যামধনে!

(৪)

এই তো যমুনা গায় কুল কুল স্বরে লো, বুক
ফুলাইয়া!
এইত কদম তলা ;
মোরা সবে গোপবালা,
এস খুঁজি শ্যাম-বাঁশি, নয়ন সঁপিয়া ;—
কোথা বাঁশি—কোথা বাঁশি—
হাসি দেখা দাও আসি—
শ্যামের সন্ধান কিম্বা দেওরে বলিয়া!

(৫)

দুষ্ট বাঁশি—দুষ্ট শ্যাম—কুদশা নিরখি লো
হাসিছে যমুনা!
চল কুঞ্জবনে যাই—যদি সে চতুরে পাই—
নারীরে ছলনা করে ভাল গুণপণা!
আমাদের চিত্তচোর—শেষে নিজদেহ চোর!
তাতেও কি সহচরি মোদের লাঞ্ছনা!

(৬)

শূন্য কুঞ্জ!—একি সখি?—কপাললিখন লো
এমনি আমার!
কুঞ্জ যেন রাগ করি,
বেশভূষা পরিহরি,
যৌবনে উদাসী সাজি দেহখানি সার!
কোণের লতাটি ওই,
তরু সাথে যারে সই,
গেঁথে দিয়াছিল শ্যাম, দশা দেখ তার!

(৭)

আর,
লতার বিতান সই, যাহার পরাণ লো মাধব
নয়ান;
যার তলে প্রেমযাগ, অনুযোগ, অনুরাগ,
মানের ঝঙ্কার আর অভিমান—ভাণ্,
হইয়াছে কতই কি; সেও শ্যামে নাহি দেখি
ধূলা মাখি ধরণীতে রয়েছে শয়ান!

(৮)

তবে কি সত্যই সখি হইয়াছে শ্যামহারা এ
হতভাগিনী?
"ফুলে চূড়া অনুমানে রাধা হারায়েছে জ্ঞানে"
একি কথা! মর্ম্মব্যথা! একি কাণাকাণি?
ভেঙে বল্ সব কথা; নারীর অন্তরে ব্যথা
সব সয়; কি বলিব? তোরা'ত রমণী!

(৯)

সত্যই'ত—চারিদিকে ফুটেছে স্বজনি লো
কৃষ্ণচূড়া ফুল;
আমি ভাবি আমাদের,
শিরভূষা মাধবের,
শ্যামের বিরহে আঁখি এমনি আকুল!
সে চূড়ার নাহি তুল,
এ চূড়া চক্ষের শূল,
কি রোগে হইল সখি মনের এ ভুল?

(১০)

রে ফুল যেমতি তুই করিলি বিদ্রূপ রে,
হীনদশা হেরি,
তুষিবে না তোরে কেহ, গন্ধহীন হবে দেহ,
ক্ষুদ্র দেহ রাখিবে না ফুলের মাধুরী!
কবি কহে, রাধে, রোষে,
শাপ দাও কোন্ দোষে?
প্রকৃতির শিশু ওযে, জানে না চাতুরি!

কল্‌কে ফুল।

(১)

অন্নপূর্ণা ছলনা করিয়া,
বিপুল বিশ্বের অন্ন লইলা হরিয়া;
খুঁজি বিশ্ব চরাচর, ক্ষুধায় কাতর হর,
ধূমপান তরে হৈল উচাটন হিয়া;
পথে ফুল তোরে নিরখিয়া,
ভোলানাথ ভাবে ভোর,
বাখানি যোগ্যতা তোর,
সাধিলা মনের সাধ, মানস পূরিয়া!

(২)

পুরাইলি তাঁর মনস্কাম;
তাই বুঝি তাঁর বরে পেলি এই নাম?
বসন্ত কি তাই তোরে, বাঁধিয়া আদর-ডোরে,
হৈম-সাজে সাজায় ও মুরতি সুঠাম?
বাঞ্ছিতের আদরের ধন,
তাহারে আদর দিলে; কত না আদর মিলে,
তাই উমা কত তোরে করিল যতন!

(৩)

এ বেশ কি শিখেছ ধরিতে,
নরের মাদক দোষ বিদ্রূপ করিতে?
চিকন ও রঙ্গে তোর, হাসি ফুল পায় মোর;
সুন্দর হইলে তার রঙ্গ কি সুন্দর!
ক্ষোভ কভু পায় না রে নর;
ওই চারু তামাসায়, সরলতা দেখা যায়,
নহেরে কথার শ্লেষ, বিঁধিতে অন্তর!

(৪)

মরি মরি কিবা পরিপাটি,
প্রকৃতি-ভাণ্ডারে তোরা সুবর্ণের বাটি!
সত্যযুগে কথা যবে, পশুরা কহিত সবে,
তরুরা ভ্রমিত, শিলা ভাসিত সলিলে,
তোর তরু কৈলাসেতে চলে,
প্রকৃতির দূত হয়ে, শিরেতে তোদের লয়ে;
অরপিতে উপহার সতীপদতলে!—

(৫)

একি! একি! একি ভীমরোল!
প্রলয় শিঙ্গার নাদ, ঘোর গণ্ডগোল!
স্তম্ভিত হইল পাখী; তরুরা দাঁড়ায়ে থাকি
কাঁদিল শিশির—অশ্রু অচল নয়নে!
কলি এল এ মর্ত্ত্য ভবনে;
পশু পক্ষী তরু লতা ধরিল জড়ের প্রথা,
অক্ষম হইল তরু কৈলাস-গমনে!

(৬)

তদবধি দূত প্রকৃতির,
শিরেতে বহন করে সামগ্রী রুচির!
মূকের স্বপন প্রায়, কত কি গো ভাবে হায়!
(মর্ম্ম-ব্যথা বোঝে স্মুধু মনটি কবির!)
পড়িলে গো বরিষার নীর,
সে নীর জড়ায় শাখে, সুবর্ণে লুকায়ে রাখে,
ভাবে বুঝি ঝরিল গো করুণা বিধির!

(৭)

ক্ষম ফুল—আমি গো উদাসী;
ক্ষণেক হিয়ায় জোটে কত ভাব আসি!
আমি কিন্তু ভাল বাসি,
ও তোর রঙ্গের হাসি,
নর-চিত্তে সাধুতা ঢালিতে অভিলাষী!
যত মানব বিলাসী
ও তোর রঙ্গের হাসি, দেখুক্ হাসুক্ আসি,
যথা আমি হাসি ফুল, আঁখি-নীরে ভাসি!

জয়ন্তী ফুল।

(১)

"লাখে লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে,
কত প্রজাপতি তরুবর-শাখে,
দেখ প্রাণেশ্বর বসেছে ওই!
শ্যাম পীতে আঁকা, আ মরি কি পাখা!
রাকা শশী যেন কলঙ্কেতে মাখা,
শতধা হইয়ে পড়েছে ওই!"

(২)

এত বলি রতি, সতত চপলা,
হাসিতে ভুবন করিয়ে উজলা,
নীরব চরণ-নুপূর-ধ্বনি,
ধীরি ধীরি ধীরি, চলিল সুন্দরী
(সঞ্চারিণী লতা, অলস বিজুরি!)
ধরিতে সাধের পতঙ্গ মণি।

(৩)

এমন চোরের চুরি করা ধন,
হইবারে চায় কার না রে মন ?
চকিতে শশব্যস্তে ধরিল রতি।
একি চমৎকার, বিস্ময় ব্যাপার !
পোষাপাখীপ্রায়, মুষ্টি মাঝে যায়,
এ কেমন আজি পতঙ্গ-রীতি !

(৪)

"বেশ" ! বলি ঢলি পড়িল অনঙ্গ ;
স্বর্গ-অপ্সরীরা করে কত রঙ্গ ;
খল্ খল্ হাসে ত্রিদশকুল ;
আপনার ভ্রম বুঝিল তখন,
হেটমুখে রতি বলিল বচন—
"ভাল সাজা আজি দিলিরে ফুল" !

(৫)

এ সব বারতা কেহ না দেখিল ;
মুগ্ধ বঙ্গকবি কেবল হেরিল,
কল্পনার কাচে মধুর ছবি !
লো জয়ন্তি তোর প্রকৃতি মাতার
শুধিবারে ধার, পারে না রে আর,
স্বল্প প্রতিদান জগতে প্রচার,
তাই এ কাহিনী করিল কবি !

জাতীয় শোক ও জাতীয় হর্ষ।

যখন স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে চন্দননগরে অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই সময় একদিন বিধবা বিবাহের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন "বাঙ্গালীরা যখন কাঁদিতে জানেনা তখন কি তোমরা মনে কর যে বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে ? স্বপ্নেও মনে করিও না।" মহা পুরুষের বাক্যে যে কত গভীর সত্য রহিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাস্তবিকই বাঙ্গালী কাঁদিতে জানেনা। যে দিন বাঙ্গালী কাঁদিতে শিখিবে সেই দিন হইতেই বাঙ্গালীর উন্নতি হইতে আরম্ভ হইবে। শুদ্ধ ক্রন্দন নহে বাঙ্গালী হাসিতে জানেনা, খেলিতে জানেনা, আমোদ করিতে জানেনা, কিছুই জানেনা, অথচ মনে করে সকলই জানে। উদাহরণ দিয়া বুঝাইলে বোধ হয় আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইবে।

প্রথমেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা ধরা যাউক। "বাঙ্গালী কাঁদিতে জানেনা।" আত্মীয় বিয়োগ হইলে সকলেই অল্প বিস্তর কাঁদিয়া থাকে সুতরাং কাঁদিতে জানেনা বলা অন্যায়, কিন্তু আমরা ব্যক্তিবিশেষের ক্রন্দনের কথা বলিতেছি না, বাঙ্গালী জাতি সাধারণের ক্রন্দনের কথা বলিতেছি। বাঙ্গালী জাতি সাধারণ এখনও কাঁদিতে শিক্ষা করে নাই অথবা বাঙ্গালীর কাঁদিবার ক্ষমতা আজিও সম্যক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। কোন বাঙ্গালী মহানুভবের মৃত্যুতে আমরা এখনও হৃদয়ে শোক অনুভব করিনা। পাঁচটা সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া কেবল এইটুকু বুঝিতে পারি যে আমাদের দেশের এক জন বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যখন শুনি, তখনই মনে যাহা হয় একটা ভাব উদয় হয়; তাহার দুই মাস পরে আর কেহ মৃত মহাত্মার নামোল্লেখও করে কিনা সন্দেহ! আমরা যদি শুনি যে অমুক লোকের পুত্র বিয়োগ হইয়াছে এবং দুর্ঘটনার দুই তিন দিন পরে যদি মৃত ব্যক্তির পিতার সহিত দেখা হয় এবং তাঁহার কথায় অথবা ভাবে কিছু মাত্র শোকের লক্ষণ দেখিতে না পাই তাহা হইলে আমরা বলি যে হয় লোকটার পাষাণ প্রাণ, শোক অধিক লাগে নাই, নচেৎ লোকটার খুব মনের জোর, দুই দিনে বেশ সামলাইয়া লইয়াছেন। মনের জোর অবশ্য জিতেন্দ্রিয়তার পরিচায়ক হইতে পারে কিন্তু পাষাণ প্রাণ বা অসাড় প্রাণ যে মনুষ্যত্বব্যঞ্জক নহে তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালার কিম্বা ভারতবর্ষের কোন মহাত্মার মৃত্যুতে আমরা এতদূর শোকার্ত্ত হইনা যে ভিন্ন দেশী অপর কেহ বলিতে পারেন যে বাঙ্গালীর হাড়ে হাড়ে শোক বিঁধিয়াছে। মৃত ব্যক্তির স্মৃতি অন্তঃকরণে জাগরূক রাখাই বোধ হয় শোক প্রকাশের প্রধান উপায়, কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা বাস্তবিকই মহাত্মাপদবাচ্য তাঁহাদের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার আমাদের কোন প্রকার উপায় নাই এবং চেষ্টা বা ইচ্ছাও নাই। রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসার মহাশয়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে বটে কিন্তু সেও নিতান্ত তিল কাঞ্চন গোছ। চৈতন্য লাইব্রেরী অথবা অন্য কোন সভা সমিতিতে বৎসরে এক দিন করিয়া দুই এক ঘণ্টার জন্য মৃত মহাত্মাদ্বয়ের বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও করতালিবর্ষন হয়, আবার কখনও বা "মধুরেণ সমাপয়েৎ," দুই একটি সুললিত সঙ্গীতে শ্রাদ্ধ সভা ভঙ্গ হয়। তার পর "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বোধ হয় যে রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর কেশব বাবু রাম গোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি দেশ হিতৈষী মহাত্মাগণ, রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম বাবু, দীনবন্ধু, ভূদেব বাবু, রাজেন্দ্র লাল রাম দাস সেন, মধুসূদন প্রভৃতি বঙ্গ ভাষার সৃষ্টি কর্ত্তা ও সেবকগণ, এবং কবিকঙ্কন, কৃত্তিবাস, কাশী দাস, জয়দেব, ভারত চন্দ্র প্রভৃতি সুকবিগণের, অর্থাৎ এক কথায় যাঁহাদের নাম করিয়া আজিও আমরা উন্নত ও সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করি যাঁহাদের নামে আজিও শিক্ষিত অশিক্ষিত বঙ্গ বাসীর হৃদয় উথলিয়া উঠে সেই মহৎ ব্যক্তিগণের জন্ম দিবসে অথবা মৃত্যু দিবসে বঙ্গদেশে একটা সার্ব্বজনীন স্মৃতি জাগাইতে পারিলে ভাল হয়। পঞ্জিকাতে যেমন বৈষ্ণব দিগের পর্ব্ব-

দিনের তালিকা থাকে, সেইরূপ বাঙ্গালী জাতির পর্ব্বদিনের তালিকা থাকা উচিত, প্রত্যেক মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিন আমাদের চক্ষের সম্মুখে থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে ইংলণ্ডের রাজবংশ মুখস্থ করিতে হয়; মোগল বাদসাহদিগের জন্ম মৃত্যুর তালিকা কণ্ঠস্থ করিতে হয় আর আমাদের গৃহ পঞ্জিকাতে আমাদেরই স্বদেশবাসী মহাত্মাগণের স্মৃতি চিহ্ন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে কি? আমাদের আরও বোধ হয় যে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সমূহ এই প্রকার শুভ কর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করুন, আজ কাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু দিবসে চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশন হয়। অধিবেশনের পর সপ্তাহে কেবল দুই একখানি কাগজে দুই ছত্রে, একটা যে শোক সভা হইয়া ছিল ইহারই উল্লেখ থাকে মাত্র। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ মৃত্যু দিনেই সংবাদ পত্রের একটা বিশেষ সংস্করণ বাহির করিয়া তাহাতে মৃত মহাত্মার জীবনী, তাঁহার চিত্র, তাঁহার কার্য্যকলাপ তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলে সাধারণের মধ্যে স্মৃতি বিশেষ রূপে সঞ্চারিত ও জাগরুক করা হয় না কি? এবং তাহাতে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায় নাকি? ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন সম্প্রদায় বিশেষের সমধিক শ্রদ্ধা বা সমধিক অশ্রদ্ধা থাকিতে পারে কিন্তু যে পঞ্জিকাতে বৈষ্ণব পর্ব্বাহ থাকে সেই পঞ্জিকাতেই শাক্ত, ব্রাহ্ম, মুসলমান ও খ্রীষ্টান পর্ব্বাহ থাকে বিবেচনা করিয়া একদিনের জন্য সাম্প্রদায়িকতা বিস্মৃত হইয়া এক প্রাণে গভীর শোকে ও ভক্তিভরে মৃত মহাত্মার যশোগান করিলে দেশের—বিশেষতঃ উদীয়মান যুবককুলের বিশেষ উপকার হইতে পারে না কি? কলিকাতায় একটা কেশব একাডেমি একটা বিদ্যাসাগর স্কুল এবং একটা রামমোহন রায় ইনষ্টিটিউটের অস্তিত্ব আছে কি না তাহা দূর পল্লীগ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও বোধ হয় জানেন না। কলিকাতাবাসী অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে, পল্লিগ্রামে এক খানি বঙ্গবাসী, একখানি হিতবাদী বা একখানি সঞ্জীবনী যাইলে ঘোষাল মহাশয়ের দাওয়াতে বসিয়া সন্ধ্যার পর গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক তাহা পাঠ করেন এবং অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষীগণ কত আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া থাকে! বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীগ্রামেরই এই প্রকার অবস্থা এবং এই প্রকার গ্রাম সমষ্টি লইয়াই বঙ্গদেশ! এই সকল গ্রামের উন্নতি লইয়াই বঙ্গদেশের উন্নতি! কলিকাতার সমিতিতে বাঙ্গলার উন্নতি নহে; কলিকাতার নব্য ছাত্রবৃন্দের করতালি বর্ষন সমগ্র বঙ্গ দেশের করতালি বর্ষন নহে। স্থতরাং যাহাতে সেই দূর পল্লীগ্রামের হৃদয়পটে আমাদের দেশীয় মহাত্মাগণের চিত্র সদাই অঙ্কিত থাকে দেশীয় সংবাদ পত্রকেই সেই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইতে হইবে। দেশী সংবাদ পত্র গুলি কেবল সংবাদ পত্র নহে কতকটা পল্লীগ্রামের শিক্ষকও বটে। পল্লীগ্রামে এই শিক্ষকের পসার প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বড় কম নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল প্রায় সকল সংবাদ পত্রই নিজ নিজ লক্ষ্য হারাইয়া কুপথগামী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বদেশের উন্নতি যাঁহাদের জীবনের ব্রত তাঁহারা

আজ সেই মহান ব্রতের অবমাননা করিয়া কেবল পরকুৎসা লইয়া দিন যাপন করিতেছেন—বাঙ্গালীর এমনি অদৃষ্ট !!

টেক্সট্ বুক কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকম্পায় পল্লীগ্রামস্থ কৃষক পুত্রগণ রঘুনন্দন রামনাথ মথুরানাথ শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি দেবোপম চরিত্রের পরিবর্ত্তে নেলসন, ক্লাইব প্রভৃতি সুচতুর বীরবৃন্দের চিত্র দিন রাত চক্ষের উপর দেখিতেছেন, আর কি কৌশলে ইংরাজ সরলবুদ্ধি ফরাসীর হাত হইতে ভারতবর্ষ নিজ করতলগত করিলেন, কি উপায়ে ওয়েলিংটন মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করিলেন তাহা ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইতেছেন। এ অবস্থায় দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহ মনে করিলে দেশের যথার্থ উপকার যে কি পরিমাণে করিতে পারেন তাহা মনে হইলেও বিস্মিত হইতে হয় !

তার পর আমোদ প্রমোদের কথা। থিয়েটার নাচ গান উদ্দেশ্য করিয়া আমি আমোদ বলিতেছিনা; জাতীয় ক্রন্দনের ন্যায় আমি জাতীয় আমোদের কথা বলিতেছি। যাহাতে সকলের, সকল বঙ্গবাসীর হৃদয়তন্ত্রী এক অঙ্গুলী স্পর্শে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে, যে আমোদে উন্মত্ত হইয়া বাঙ্গালী আত্মহারা হইবে সে আমোদ বাঙ্গালীর নাই সে আমোদ বোধ হয় বাঙ্গালায় নাই। এই প্রকার জাতীয় আনন্দের দুই প্রকার কারণ থাকিতে পারে। প্রথম স্বদেশের শুভকরী কোন মহান কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং দ্বিতীয় ধর্ম্ম। প্রথম প্রকার আনন্দউৎসবের উজ্জ্বল উদাহরণ ফরাষী দিগের জাতীয় উৎসব। প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই যে দিন ফরাসীরা রাজার হস্ত হইতে নিজ নিজ হস্তে রাজ্যশাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন যে দিন ফরাসী অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রত্যেক নরনারী আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিলেন সেই দিন, সেই ১৪ই জুলাই সমস্ত ফরাষী জাতি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ওঠে, সে আনন্দ পরাধীন বঙ্গবাসী বোধ হয় কল্পনাতেও আনিতে পারেনা। ইটালিতে গ্যারিবল্ডীর ও ম্যাটসিনির জন্মদিবসেও ঐ প্রকার জাতীয় উৎসব হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও মহারাণীর জন্ম দিবসে কতকটা সেই প্রকার উৎসব হইয়াথাকে। দিগন্ত বিস্তৃত অপার জলধি মধ্যদেশে ভাসমান ইংরাজপোতের গুণবৃক্ষে সে দিন ব্রিটীস পতাকা উড়িতে থাকে। পোতচালক নাবিকেরা সাধ্যমত, সাম্রাজ্ঞীর মঙ্গলোদ্দেশে আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে! বাঙ্গালীর স্বাধীনতা নাই সুতরাং ও প্রকার জাতীয় আমোদ থাকা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু তারপর দ্বিতীয় কারণ দেখা যাউক; ধর্ম্ম সংস্রবে আনন্দ। আমাদের দেশে দুর্গোৎসবই সর্ব্বপ্রধান উৎসব। দুর্গোৎসবেই সমস্ত বঙ্গদেশ এক কালে আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যাইত শুনিতে পাই কিন্তু আজ কাল তাহা বড় দেখিতে পাইনা। বর্ত্তমান দুই তিন বৎসরের কথা ধর্ত্তব্য নহে। দুর্ভিক্ষ মারী ভয় ইত্যাদির জন্য এখন আমোদের কথা মনে আনাও পৈশাচিকতা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যখন, ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে ৫।৬ টাকা চাউলের মণ ও প্লেগের প্রলয় ছিলনা তখনই কি আমরা পূজার সময় আনন্দে উন্মত্ত হইতে পারিয়াছি? পূজার আনন্দে উন্মত্ত হইতে দেখিয়াছি নব বেশে ভূষিত বালক বালিকাকে

আর আনন্দময়ীর আগমনে ভক্তকে, কিন্তু সে কয়জন? বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই পূজার সময় কত লোককেই বা আনন্দিত আর কত লোককেই বা চিন্তিত দেখা যায়? চিন্তিতের তুলনায় আনন্দিতের সংখ্যা বোধ হয় মুষ্টিমেয়। খরচের জন্য কেরাণী-কুল চিন্তিত, মহার্ঘতত্ত্বের জন্য পাশকরা জামাতৃবর্গের শ্বশুর মহাশয়েরা চিন্তিত, মহাজনের টাকার তাগাদায় ঋণী চিন্তিত, আর আশ্বিনের খাজনা কিস্তির জন্য দীন হীন প্রজাকুল চিন্তিত। এই চিন্তা প্লাবিত দেশে আনন্দ কোথায়? আনন্দময়ীর আগমনেও দেশে আনন্দ দেখিনা, আর যাঁহাদের কোন চিন্তা নাই তাঁহারাও নিরানন্দ কারণ তাঁহাদের আনন্দ উপভোগ বা বিতরণ করিবারও ক্ষমতা নাই। তাঁহারা আনন্দের অধিকারী হইয়াও নিরানন্দ! দেখিয়াছি, হোলীর উৎসবে সুবিদ্বান, প্রবীন, সমাজে পদস্থ মাড়োবারী ও খোট্টাগণ আবীর লইয়া বালকের ন্যায় উন্মত্ত হইয়াছে প্রাণ খুলিয়া আমোদে মত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিন যে মাড়োয়ারী গদীয়ানকে দেখিলে গাম্ভীর্য্যের আগার বলিয়া বোধ হইত হোলির দিন তিনিও যেন অবোধ বালক, লালে লাল হইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত হাত কাড়াকাড়ি করিতেছেন আর উল্লাস শব্দে গগণ প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। আর আমরা অকালপক্ক অথবা অপক্ক বাঙ্গালী আনন্দের যথেষ্ট কারণ থাকিলেও আনন্দ করিতে পারিনা। এমন কি বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্যে কোন আত্মীয় বা বন্ধু শুভ চিহ্ন স্বরূপ গাত্রে কিঞ্চিৎ রং দিলে আমরা চটিয়া অগ্নি শর্ম্মা হইয়া উঠি আর উক্ত প্রকার ব্যবহারকে অসভ্যতার চরম আদর্শ মনে করি। দোলের দিন পাড়ার কোন বালক গাত্রে পিচকারী দিলে তাহাকে চপেটাঘাতের স্বাদ জানাইতে তিল মাত্র বিলম্ব করিনা। নিজে ত আনন্দ উপভোগ করিতে জানি না আর প্রস্ফুটনোন্মুখ সুকুমার বালকদিগের বিমল আনন্দে নির্দ্দোষ উল্লাসে বাধা দিয়া তাহাদিগকে পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই প্রবীনোচিত গম্ভীর ও স্ফূর্ত্তি বিহীন করিয়া দিই। সকলের একমাত্র আরাধ্য "আনন্দ" আমরা পাইয়াও নিজ বুদ্ধি দোষে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রবীন দার্শনিক সাজিয়া বসি। আমার কি কম হতভাগ্য! আমাদের উন্নতি করিতে হইলে দেখিতে হইবে আমরা জীবিত না মৃত। যে জাতির আত্মীয় বিয়োগে চক্ষে অশ্রু কণা ঝরেনা, বন্ধু সমাগমে অধর প্রান্তে হাস্য দেখা দেয় না তাহারা হয় মৃতবৎ স্তম্ভিত কিম্বা বিমুক্তাত্মা যোগী। যদি আমরা শেষোক্ত শ্রেণীই হই তাহা হইলে আর আমাদের উন্নতি আবশ্যক করেনা, আর যদি মৃতবৎ স্তম্ভিত হই তাহা হইলে অগ্রে জীবনী শক্তি অল্পে অল্পে শরীরে প্রবাহিত করিতে হইবে, মূর্চ্ছিত ব্যক্তির মুর্চ্ছা ভঙ্গ না হইলে তাহার উত্থান অসম্ভব, তাহার দ্বারা কোন কর্ম্ম করাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।　　　　　সুর—ঐ

মল্লার—ঢিমেতেতালা।

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহহারা!
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে!
রজনী আঁধারা!
অধীর যমুনা তরঙ্গ-আকুলা! অকূলারে, তিমির-দুকূলারে!
নিবিড় নীরদ গগণে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে, নাহি শশিতারা!

রগো১ রগো১

।।৪।। [র১ র১ ম১ গম১ । র১ র১ স২ । র২ প২ । ম১ গো১ মগো২ ।] রগো১
ঝ র ঝ র　ব রি ষে　বা রি　ধা — রা　হা

শেষ।

রগোম১ র১ স১ । র২ স২ । নোধ্নো১ প১ প১ ন১ । ন১ ধন্স১ স২ । মর১ মর১
য় প থ　বা সী　হা য় গ তি　হী — ন　হা য়

ম১ প১ । নোধনো১ পম১ প১ র১ । মগমো১ রস১ র২ । প১ মপ১ ম১ গো১ ॥
গৃ হ　হা — — —　— — —　— — রা —

(আ-প্র)

[ন১ ন১ নধ১ ন১ । র্স৪ । পম১ প১ ন১ র্স১ । র্রস১ র্র১ র্ম১ র্গো১ । —২ রর্গো১
ফি রে বা —　যু　হা — — —　হা — — —　— স্ব

র্রর্গোর্ম১ । র্র১ র্স১ সর্রস১ ন১ । {র্স৩ প১ । }] র্স৪ । র্স১ র্রস১ র্র১ র্গো১ ।
—　রে — রে —　— —　— ডা — — —

র্রস১ র্র১ র্স২ । নর্স১ র্র১ র্সন১ র্স১ । সনো১ ধ১ ধনো১ ধনোধ১ । প১ প১ প১ প১ ।
— — কে　কা — — —　— — রে —　জ ন হী ন

র১
প১ প২ পধপ১ । ম১ পম১ প১ প১ । র্স৪ । [স১ স১ র১ ম১ । গম৪ । —২
অ সী ম প্রা — — স্ত রে [র জ নী আঁ ধা —

গোর১ সর১ । প১ মপ১ ম১ গো১ ।] গোম২ র১ স১ । র১ গোর১ স২ । ধনো১
— — — — রা —] হায় প থ বা — সী হা

প্১ প১ ন্১ । ধন্১ ধ্ন্স১ স২ । মর১ মর১ ম১ প১ । নোধনো১ পম১ প১ র১ ।
য় গ তি হী — ন হা য় গৃ হ হা — — —

মগম১ রস১ র২ । প১ মপ১ ম১ গো১ ॥ —৪ । ম১ প১ প২ । প১ প১ প১ ধপ১ ।
— — — — — রা — — অ ধী র য মু না —

(আ-প্র)

ম১ প২ পধপ১ । ম১ প১ মগো২ । —৪ । র১ স১ ন্স১ রগো১ । সর৪ ।
ত র ঙ্গ আ কু লা — অ কূ লা — রে

ম১ প১ মগো২ । র১ সর১ ন্স১ রগো১ । সর৪ । ম১ প১ প১ ম১ । প১ ন১
তি মি র দু কু লা — রে নি বি ড় — নী —

নধ১ ন১ । স১ র্স১ র্সর্র্স২ । —৪ । ম১ প১ প১ প১ । পনো১ ধ১ ধনো১ প১ ।
র দ গ গ নে — গ র গ র গ র জে —

ম১ প১ পম২ । —৪ । [স২ র১ গো১ । রগো১ স১ র১ গো১ । রস১ র১ প২ ।
স ঘ নে — [চ ঞ্চ ল চ প লা — চ ম কে

—৪ ।] পর্স২ সনো২ । ধ১ প১ মপ১ ধ১ । পম১ গো১ —২ । মগো১ রগোম১
—] না হি শ শী তা — রা — — হা য়

র১ স১ । র১ গোর১ স২ । নোধনো১ প১ প১ ন্১ । ধন্১ ধ্ন্স১ স২ । মর১ মর১
প থ বা — সী হা য় গ তি হী — ন হা য়

ম১ প১ । নোধনো১ পম১ প১ র১ । মগম১ রস১ র২ । প১ মপ১ ম১ গো১ ॥
গৃ হ হা — — — — — — — — রা —

(আ-প্র)

রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও তাহার প্রতিকার।

টালার মসজিদ ভাঙ্গা হাঙ্গামার পর এদেশের হিন্দু মুসলমানকে আক্রমণ পূর্ব্বক কোন কোন ভারতপ্রবাসী ইংরেজ এতদ্দেশীয় এংগ্লো ইণ্ডিয়ান পত্রিকা সমূহে কিছু দিন ধরিয়া কতক গুলি প্রলাপ রচনা প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহাদের স্বজাতীয় মহিলা এবং পুরুষগণ অকারণে ক্ষিপ্ত প্রায় দেশীয় লোকের হস্তে অপমানিত ও আহত হওয়াতে আমাদের উপর তাঁহারা যে এইরূপ জাতক্রোধ হইবেন ইহা কিছু মাত্র বিস্ময়কর নহে। শুধু যদি টালায় এই কাণ্ডটা ঘটিত তাহা হইলে তাঁহারা এতখানি বিচলিত না হইলেও পারিতেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ অল্পদিন পূর্ব্বে পুনা নগরে কোন অজ্ঞাতহস্তে শ্বেত পুরুষের রক্তপাত হওয়াতে তাঁহাদের হৃদয়ে যে বিদ্বেষাগ্নি প্রধূমিত অবস্থায় ছিল, টালার হাঙ্গামায় তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে মাত্র। এংগ্লো ইণ্ডিয়ানের নেটিভবিদ্বেষ নূতন কথা নহে, কিন্তু সংপ্রতি তাহার প্রাবল্য দেখিয়া আমরা কিছু অধিক মাত্রায় চিন্তিত হইয়াছি, কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে কথামালার বাঘ ও মেষশাবকের গল্পের অভিনয় আমাদের মধ্যেও বিরল নহে। "তুই গালাগালি কর আর তোর পিতাই করুক সে একই কথা, আমি আর তোর কোন ওজর শুনিতে চাই না" এই বলিয়া নির্ঝর জলপায়ী ব্যাঘ্র, অনাহারদুর্ব্বল মেষশাবকের প্রাণ সংহার করিয়াছিল; পুণার কে কোথা হইতে আসিয়া শ্বেত পুরুষের প্রাণবধ করিল তাহার খপর হইল না, সমস্ত পুণাবাসীকে এই এক জনের অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই উভয় দৃষ্টান্তের মধ্যে সাদৃশ্য অল্প নহে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। একের অপরাধে অন্যের প্রতি দণ্ডবিধান কথা-মালার সেই পশুনীতিতে যতই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হউক, ক্ষমাশীল, উদার এবং সহিষ্ণু খৃষ্টান গবর্ণমেণ্টের নীতি অন্য রকম বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ছিল।

প্রতিবৎসর দেশের বিভিন্ন স্থানে শতশত ব্যক্তি নিহত হইতেছে এবং যদিও এই সকল হত্যারহস্যের অধিকাংশই অনুদ্ঘাটিত থাকে, তথাপি তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে বিচলিত হইতে দেখা যায় না, কিন্তু দুইজন ইংরেজ হত হইবা মাত্র দেশের উপর একটা কঠোর করভার চাপাইয়া শান্তি রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; দুইজন ইংরেজের আকস্মিক হত্যা অতি গুরুতর ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অপরাধে কতকগুলি নির্দ্দোষী লোকের নিতান্ত পরিমিত 'আটা' ও 'ভুট্টার' উপর টেক্স বসান কখন সঙ্গত হইতে পারে না।

যাহারা মনে করে ভারতবর্ষ পশুবলে বিজীত হইয়াছে, পশু বলেই তাহা রক্ষিত হইবে, পাখাটানা কুলীর গর্ভ দুপাচটা অপদার্থ ব্ল্যাক নিগারের প্লীহা ফাটাইয়া যৎসামান্য অর্থদণ্ড মাত্র দিয়া যাহারা আইনের হাত হইতে অব্যাহতি পায় এবং তাহার পর প্রফুল্ল মনে চুরুট

ফুঁকিতে ফুঁকিতে ক্লাবে গিয়া হুইষ্ট খেলিয়া আরও দশটা প্লীহা ফাটাইবার অবসর লাভ করে, তাহাদের একটা বিবেচনাহীন উচ্ছৃঙ্খল মত শুনিয়া আমাদের কিছুমাত্র আক্ষেপ জন্মেনা, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের এই মতটাকে অকাট্য এবং সারপূর্ণ যুক্তি বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে ভারতবাসীর সমূহ আশঙ্কার বিষয়।

কিছুদিন হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে ভারতের অসংখ্য নরনারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশান্তি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশে দুই একটা আকস্মিক দাঙ্গা হাঙ্গামায় যে রক্তপাত হইতেছে তাহাও এই অশান্তি ও অসন্তোষের গৌণ ফল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই অশান্তি ও অসন্তোষ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য অনেককেই পরামর্শ দিতে দেখা যাইতেছে। তন্মধ্যে ভারত প্রবাসী ইংরেজগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিতেছেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নীতিজ্ঞানবর্জ্জিত; রোগের হ্রাস না হইয়া তদ্বারা রোগবৃদ্ধি হওয়ারই সম্ভাবনা।

এই এংগ্লোইণ্ডিয়ান দলের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারি তাঁহাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে আমাদের দেশের বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বীতস্পৃহ ব্যক্তিগণের মধ্যে স্থানেস্থানে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কি পুণা, কি কলিকাতা কি অন্যান্য স্থান হইতে যে বিবাদ বিসম্বাদের বা হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা যে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রসঞ্জাত, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নই। য়ুরোপীয়-গণকে বধ করিবার নিমিত্ত বা রাজশক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য যে কাহারো চেষ্টা আছে এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহার মন্ত্রীবর্গের ভাবিয়া দেখা উচিত এই ষড়যন্ত্রবন্ধনের কথাটা কতখানি সম্ভবপর। হিন্দু ও মুসলমান দেশের এই দুই বিভিন্ন পন্থাবলম্বী অধিবাসীর মধ্যে এতখানি ঐক্য বন্ধন নাই যাহাতে তাহারা একত্র হইয়া গোপনে গোপনে রাজার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবে। হিন্দু মুসলমান কেন, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং মুসলমানে মুসলমানেই কি মতের এবং মনের মিল আছে? সকল ধর্ম্ম এবং সকল জাতির মধ্যেই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধী। পুণা সহরের মারহাট্টা ব্রাহ্মণগণ গুপ্ত ষড়যন্ত্রে সম্মিলিত বলিয়া অভিযুক্ত, কিন্তু তত্রত্য হিন্দু সমাজেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকাণ্ড মতভেদ পরস্পরের প্রতি সুতীব্র ঘৃণার বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকার বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজ কখনো ষড়যন্ত্রের অনুকূল হইতে পারেনা, "ডেকান" সভা সার্ব্বজনিক সভার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। অল্পদিন পূর্ব্বে পুণা নগরে রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির অধিবেশন উপলক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাষ্ট্র সমাজের মধ্যে যেরূপ মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল তাহা কাহারো অজ্ঞাত নহে। সুতরাং সকল দিক হইতে দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ভারতবর্ষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে কোন প্রকার গুপ্ত ষড়যন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। যদি কেহ ভারতীয় প্রজা সাধারণের মধ্যে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা দেখিয়া থাকেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই কাল্পনিক ভয় মাত্র।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান হইতে যে একটা অশান্তির কল্লোল ও অসন্তোষপূর্ণ তীব্র হাহাকার সমুত্থিত হইতেছে একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, এবং গবর্ণমেণ্টও যে এই বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন তাহা বোধ হয় না। দুই প্রকার উপায়ে এই অসন্তোষ নিবারিত হইতে পারে; প্রথম, প্রজার এই অসন্তোষ ও অশান্তির কারণ আবিষ্কার পূর্ব্বক সেই সকল অসুবিধা নিরাকরণ দ্বারা প্রজাসাধারণের হৃদয় হইতে বেদনা বিদূরীত করা, দ্বিতীয়, বন্দুকের আওয়াজে বা বেওনেটের সূচাগ্রে তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রাখিয়া কোন প্রকার অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিতে না দেওয়া। প্রবল বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই দুইটি উপায়ই সম্ভবপর; একদল এংগ্লোইণ্ডিয়ান এই শেষোক্ত নীতির পক্ষপাতী, আমরা কিন্তু প্রথমোক্ত নীতিকেই সুনীতি বলিয়া বিবেচনা করি।

দেশের বর্ত্তমান অশান্তিকে একটা রোগ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়; পীড়ার প্রথম অবস্থায় রীতিমত চিকিৎসা না করিয়া টোটকা টুট্‌কি ঔষধ প্রয়োগ করিলেও রোগের প্রাখর্য্য নিবারিত হইতে পারে কিন্তু দেহ কখন নীরোগ হয়না। সম্পূর্ণরূপে রোগ বিদূরীত করা অবশ্যই কষ্ট সাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ, কিন্তু তাহার ফল অপেক্ষাকৃত শুভকর; সেই জন্যই আমরা এই শেষোক্ত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করি। কারণ আমাদের বিশ্বাস ভারতে বৃটীশগবর্ণমেণ্টের স্থায়ীত্বের উপর আমাদের শিক্ষা, সুখ, বর্ত্তমানের আশা এবং ভবিষ্যতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে; আমাদের রাষ্ট্রীয় মহাসমিতি এই দ্বাদশ-বৎসর ধরিয়া সেই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছেন, এবং আমাদের ইংলণ্ডীয় মুখপত্র-গণের ইহা ভিন্ন অন্য বক্তব্য নাই।

কিন্তু আমাদের দেশের এংগ্লোইণ্ডিয়ানদল আমাদিগকে বড়ই অপরাধী করিতেছেন, সাধারণ অসন্তোষ ও দাঙ্গাহাঙ্গামের মূলে যে কংগ্রেসের হাত আছে এবং হিন্দু সম্প্রদায় পরোক্ষভাবে তাহাতে উৎসাহ প্রদান করিতেছে এরূপ কথা বলিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হন নাই; এবং এই জন্যই তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কাছে ভারতবাসীর অসন্তোষ নিবারক দুই একটা প্রবল মুষ্টিযোগ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার একটা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ বিষয়ক আইন। হয়ত লিটনী আমোলের মত একরাত্রের মধ্যেই এই কঠোর আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারে, আজ আমরা সাধারণের যে সকল দুঃখ ক্ষোভ অভাবের কথা মুদ্রাযন্ত্রের অভ্যন্তর দিয়া রাজদ্বারে নিবেদন করিতেছি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে তাহা প্রকাশ করিবার আর অধিকার থাকিবে না। কিন্তু মনুষ্যের দেহ ও মন লইয়া প্রতি-দিনের শত অভাবের মধ্যদিয়া যখন আমরা অতি ধীরে জীবনের বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংকীর্ণপথে অগ্রসর হইতে থাকিব তখন আমরা আমাদের দুঃখদৈন্যের কথা মুখে প্রকাশ না করিলেও হৃদয়ের মধ্যে কি তাহা প্রবলরূপে অনুভব করিবনা? যদি সেই হাহাকার, সেই অভাব, সেই নিত্য নব অসন্তোষ বক্ষের অভ্যন্তরে অপ্রশমিত ভাবে অনিবার কল্লোল করিতে থাকে তাহা হইলে এই মুখবন্ধকারী মুষ্টিযোগের আবশ্যক কি?—তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কি ফল লাভ করিবে?

আমরা বিবেচনা করি অতি ধীরভাবে বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত এবং যাহাতে বর্ত্তমানের এই অসন্তোষ প্রকাশের অধিকার নষ্ট না করিয়া অসন্তোষের বীজ বিনষ্ট করা হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করাই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু এই সুমহৎ কার্য্য কঠোর রাজদণ্ড নিক্ষেপের ন্যায় কঠোর নিষেধবাণী প্রচারেই সম্পাদিত হইবে না; জাতীয় জীবনের অভ্যন্তরপ্রবাহিত বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণকারী সকরুণ হাহাকার ধ্বনি রাজকীয় বল প্রকাশে নিবারণ করা যায় না; সামান্য সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া একটি দেশের উপর পিউনিটিভ পুলিশ নিয়োগ করিয়াও নহে, ব্যথিতের বেদনা প্রকাশের অধিকার হরণ করিয়াও নহে। ভারতীয় প্রজাসাধারণের অভাব, অভিযোগ ও ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া দুর্ব্বার মনোবলের প্রভাবে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পলিসিই অবলম্বন করুন তাহাতে অসন্তোষের নিবৃত্তি হইবে না; অতএব ন্যায়পরতা ও প্রজাবর্গের অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত পূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধান দ্বারা বর্ত্তমানের অশান্তি ও অসন্তোষ নিবারণ করিতে হইবে।

অপ্রীতিকর হইলেও আমরা একথা বলা বাহুল্য মনে করিতেছি না যে কিছুকাল হইতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে একটি সদাজাগরণশীল চেতনার অভাব অনুভূত হইতেছে। সদ্য-জাগ্রত অজাগরের সুবৃহৎ কুণ্ডলীর মধ্যে যেমন চেতনাশক্তি অতি ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়া উঠে, সেইরূপ আমাদের রাজশক্তিরূপ অজাগরের বিশাল দেহের সর্ব্বত্র অনেক বিলম্বে কর্ত্তব্য জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই একথাটা পরিস্ফুট হইবে। আমাদের দেশের দরিদ্র লোকেরা যখন দুর্ভিক্ষের প্রথম আর্ত্তনাদ আরম্ভ করে এবং আমাদের সাপ্তাহিক ও দৈনিক খবরের কাগজ গুলি গবর্ণমেণ্টকে সচেতন করিবার জন্য কাঁশর হইতে ঢক্কা পর্য্যন্ত সকল প্রকার বাদ্য যন্ত্রই বাজাইয়াছিল, তখন গবর্ণমেণ্টের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। তাহার পর নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু ভারতে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব নিতান্তই অলীক বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। অনন্তর যখন সহস্র সহস্র নিরন্ন নরনারী প্রতিদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, তখন গবর্ণমেণ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহার ফলও তেমন সন্তোষজনক হইল না; উপায়ান্তর না দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট অগত্যা সাধারণের সাহায্য ভিক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। যদি দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত মাত্র এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত তাহা হইলে এত লোককে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত না। হতভাগ্যের দুরদৃষ্ট, তাহাদের মূল্যহীন প্রাণের জন্য আর কে দায়ী হইবে? কিন্তু দুর্ভিক্ষের এই দেশব্যাপী ভীষণ প্রকোপের সময়, এখনও মধ্য ভারতের রাজকর্ম্মচারী-গণ এই নিত্যবর্দ্ধনশীল অন্নকষ্টের প্রতি উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিতেছেন "এমন কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে যে তোমরা আর্ত্তনাদ করিতেছ, যাহারা না খাইয়া মরিতেছে তাহাদের সংখ্যাই বা এমন বেশী কি?" দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের এরূপ নির্লজ্জ এবং হৃদয়হীন মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেও লজ্জাবোধ হয়। প্রতিবাদ করিলে হয়ত তাহা

রাজভক্তি হীনতা বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু রাজার প্রতি আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমরা এসকল দুঃখের কথা এখনো প্রকাশ করিতেছি। দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ তেমন প্রবল নয় বলিয়া ঘোষণা করা কর্ত্তৃপক্ষীয়ের পক্ষে কতদূর স্বাভাবিক এবং মনুষ্যোচিত বলিতে পারিনা, কিন্তু দেশীয় ও বৈদেশিক পত্রিকাগুলিতে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, অভুক্ত, অবসন্ন, জড়প্রায় নরনারীর যে চর্ম্মাবৃত কঙ্কালসার মূর্ত্তিমতী ক্ষুধার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইতেছে তাহা দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বেদনা ও করুণায় না পূর্ণ হইয়া উঠে? দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী জেলায় যে লুটপাট ও হাঙ্গাম হইয়াগিয়াছে তাহা কি অন্নহীন, বুভুক্ষিত, ক্ষিপ্তপ্রায় দীন দাক্ষিণাত্যবাসীর নিরাশা প্রপীড়িত জঠরানলসঞ্জাত উৎকট ঔদ্ধত্যের ফল নহে? কিন্তু তথাপি ভারত গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজের এই নিদারুণ অভাবের প্রতি একান্ত উদাসীন, কলিকাতার "সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি" সেখানে তাঁহাদের সাধ্যানুরূপ আনুকুল্য প্রেরণেও অসমর্থ, কারণ কমিটির যে সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারী সভ্য আছেন, যাঁহারা সমিতির পরিচালক, তাঁহাদের অনেকেই শিমলা শৈলে শৈত্য ও শান্তি উপভোগ করিতেছেন! এ সকল কথা সত্য, অপ্রীতিকর সত্য, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা ইহা ব্যক্ত করিতে বাধ্য।

বর্ত্তমান অসন্তোষের আর একটি কারণ আমাদের রমণীগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। ভারতীয় প্রজাবৃন্দ তাহাদের সর্ব্বপ্রকার দীনতা ও হীনতা এবং যাবতীয় লাঞ্ছনা অবলীলাক্রমে মস্তকে বহন করিতে পারে কিন্তু রমণীর প্রতি সামান্য অত্যাচারেই তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া তাহার প্রতিফলের চেষ্টা করিয়া থাকে। প্লেগ ব্যাপার লইয়া বোম্বে অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যগণের দ্বারা সম্রান্তবর্গের প্রতি যে অসামান্য অসম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দেশীয় অধিবাসীগণ যে ধীরভাবে তাহা উপেক্ষা করিবে কোন বিবেচক গবর্ণমেণ্টেরই তাহা প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। শুধু সুদূর বম্বে অঞ্চলে নহে আমাদের দেশেও এই ব্যাপারের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। আজকাল ভদ্র পরিবারস্থ স্ত্রীকন্যাগণের রেলপথে ও ষ্টীমারে গমনাগমন অতি বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য গবর্ণমেণ্টের প্রতি কোন দোষ দেওয়া যায়না কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী এই সকল দুর্ব্বৃত্তের অসংযত পৈশাচিক প্রবৃত্তির জন্য গুরুতর ব্যবস্থা না করেন, তাঁহাদিগের প্রতি স্বতঃই সাধারণের অভক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তাহা ক্রমে গবর্ণমেণ্টের উপর সংক্রামিত হয়। প্লেগের হুজুগ লইয়া পুণাতে পুরাঙ্গনাগণের উপর যে লজ্জাজনক দুর্ব্ব্যবহার চলিতেছিল পুণার সাময়িক পত্রিকা সমূহ তারস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, এজন্য তাহারা বোম্বে গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিভাজন হইয়াছে। প্লেগকমিটির সভাপতি ভূতপূর্ব্ব মিঃ র্যাণ্ডের নিকট এই অত্যাচারের প্রশমন জন্য যে সকল আবেদনপত্র প্রেরিত হয় তন্মধ্যে 'ডেকান সভা' দুই খানি আবেদন পত্রে উল্লেখ করেন যে সৈন্যগণ পরীক্ষার জন্য রমণীবর্গকে প্রকাশ্য রাজপথে লইয়া যাইতেছে, মিঃ র্যাণ্ড ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া বলেন যে ভবিষ্যতে যাহাতে আর

এ প্রকার অত্যাচার না হয় তিনি তাহার উপায় করিবেন। অন্য আবেদন পত্রখানির অভিযোগ আরো গুরুতর, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে সৈন্যগণ কাহারো কিছু মাত্র খাতির করেনা, তাহারা লোকের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিতেছে, এমন কি পিত্তল কাঁশার তৈজস পত্র ও চূর্ণ করিতেছে, সুপবিত্র দেবগৃহও তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না, এবং রমণীগণকে শুধু প্রকাশ্য পথের উপর টানিয়া আনিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট নহে, তাহাদিগের সম্মুখে অতি কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিয়া থাকে, এক কথায় তাহারা শান্তিরক্ষক নহে, অশান্তি উদ্দীপক একদল পশুমাত্র। ডেকান সভার এই আবেদন পত্র উক্ত সভার সভাপতি রাও বাহাদুর ভাইদ, এবং অন্য একখানি আবেদন পত্র পুণার মহম্মদীয় আনজুমানের সভাপতি শ্রীযুক্ত আবদুল ফ্রোজলক খাঁ ও সর্দ্দার কবুস্বামী মুদেলিয়ার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই তিন ব্যক্তিই এ প্রদেশের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক, সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট দায়িত্ব ও প্রচুর প্রতিপত্তি আছে; কিন্তু লর্ড সাণ্ডহর্ষ্টের মতে তাঁহারা মিথ্যাবাদী—এই সকল অত্যাচার কহিনী বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত মিথ্যা রচনা মাত্র! পণ্ডিতা রমাবাই ও নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে; 'বোম্বে গার্জ্জিয়েনে' শারদাসদনের একটি ছাত্রীর সম্ভবাতিরিক্ত অপমানের দীপ্যমানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, প্রিয়তমা ছাত্রীর শোচনীয় অধঃপতনে ঘোরতর মানসিক কষ্টসঞ্জাত সমবেদনাপূর্ণ তাঁহার সেই পত্রখানি পাঠ করিলে হৃদয় সহজেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; লর্ড সাণ্ডহার্ষ্ট কি এই পত্রখানিও কাল্পনিক অত্যাচার কাহিনীতে পূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চান?

যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট কঠোর শাসন নীতি অনুসারে সহজেই একটি সাময়িক শান্তি সংস্থাপন করিতে পারিবেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার মূল্য অধিক নহে। স্থায়ী শান্তির প্রবর্ত্তন করিতে হইলে এবং প্রজারঞ্জন অভিপ্রায় থাকিলে গবর্ণমেণ্টকে উদারভাবে ধীরতার সহিত ভারতীয় প্রজার অভাবের নিরাকরণ করিতে হইবে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টর স্থায়িত্ব দীর্ঘকালব্যাপী হউক, আমাদের দেশের উন্নতি স্রোত অপ্রতিহত হউক এবং রাজা ও প্রজা জেতা ও বিজীতের সম্বন্ধ প্রীতিকর হউক ইহাই আমাদের ইচ্ছা। শত্রু পক্ষের লোক যখন গোপনে শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করে, প্রকৃতবন্ধু তখন প্রকাশ্য ভাবে ত্রুটী ও কর্ত্তব্য কার্য্যে শিথিলতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। সুহৃদের এই প্রকার কার্য্যে শুদ্ধ নির্ব্বোধ ব্যক্তিরই ক্রোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠে, সুতরাং আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আমরা প্রাণপণশক্তিতে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল হিতকর প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেছি তাহা বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিচালিত অসন্তোষপূর্ণ প্রলাপোক্তি না ভাবিয়া প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করিবেন।

কাহাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কাহাকে? তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? চঞ্চল কি জানে? তার সব অনুমান বইত নয়! মিষ্টার জি যে এমন সুবিধার বিবাহ আপনা হইতে ছাড়িবেন তাহা হইতেই পারেনা; কেন ছাড়িবেন, তাহার যখন কোন কারণই নাই। কুসুমই ইহা ভাঙ্গিয়াছে। যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয় ততক্ষণ নক্ষত্র দীপ্তিশালী, চন্দ্র উঠিলে কি আর তারার আলো চোখে লাগে? ডাক্তারের সহিত পরিচিত হইয়াই কুসুম মন পরিবর্ত্তন করিয়াছে—কুসুমের সহিতই ডাক্তার engaged; নহিলে তাঁহার নাম উঠিবামাত্র কুসুম ওরূপ বিহ্বলতা প্রকাশ করে! বেচারা জি! তাঁহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল।

স্তব্ধ নিশায় শয্যাশায়ী একাকী আমি নির্ব্বাধে চিন্তামগ্ন হইয়া এইরূপ মীমাংসা করিতে করিতে আর একটি কথা সেই সঙ্গে বারম্বার এই ভাবিতেছিলাম—"কুসুম কি ভাগ্যবতী!" ইহার মধ্যে কি ঈর্ষা লুকান ছিল? নিশ্চয়ই। লোকে বলে এমন স্থানে ঈর্ষা না হইয়া যায়না—আমি কি আর সৃষ্টিছাড়া! তবে এ ঈর্ষা নিতান্তই নিরীহ ঈর্ষা, অপূর্ণ আকাঙ্খা-উত্থিত নৈরাশ্য বেদনা;—আকুল দীর্ঘ নিশ্বাসে মাত্র তাহার বিকাশ ও তাহাতেই তাহার অবসান, বিকৃত বিরূপ দ্বেষ নহে। ক্রোধপূর্ণ বিদ্বেষপূর্ণ অভিশাপ ইহাতে ছিল না। থাকিবার কথাও নহে।—যেথানে অধিকারে, উপভোগে কেহ অপহারক সেথানে সেই অপহারকের প্রতি ক্রোধ বিদ্বেষ স্বাভাবিক। কিন্তু কুসুম আমার কাছে কি দোষে দোষী? আমা হইতে আমার প্রিয়তমের স্নেহও সে ছিন্ন করে নাই, আমার আত্মীয়তা অধিকারও তাঁহা হইতে সে হরণ করে নাই;—সৌভাগ্য ক্রমে সে নাহয় তাঁহার প্রণয়িনী হইয়াছে, যদি তাহা না হইত—যদি কুসুমকে তিনি না ভালবাসিতেন—তাহা হইলেই যে আমি সে ভালবাসা পাইতাম এমন আশাও আমার মনে নাই। তবে তাহার উপর ক্রোধ বিদ্বেষ জন্মিবে কেন? বরঞ্চ বিপরীত। দ্বেষের পরিবর্ত্তে এই ঈর্ষার আঘাতে আমার হৃদয়ের একটি গুপ্ত প্রীতিদ্বার সহসা খুলিয়া গেল। সত্য কথা বলিতে হইলে, ইতি পূর্ব্বে আমি কুসুমের প্রতি সখ্যভাব অনুভব করি নাই। কিন্তু যখনি মনে হইল—কুসুম আমার প্রিয়তমের প্রিয়তম—তখনি আমারও সে প্রিয় হইয়া উঠিল,—তাহার যে সকল গুণ রাশি এতদিন আমার অন্ধনয়নে অপ্রকাশিত ছিল—পরম প্রীতি ভাজন বন্ধুর মত সহসা সেই সবে আমি সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়া উ[illegible]ম, এবং এই নবসখ্যতা ভাবে আমাকে এতদূর অধীর এতদূর

বিহ্বল করিয়া তুলিল যে তখনি তাঁহাকে সখিত্বের ডোরে বাঁধিয়া তাহার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। এমন কি মনের আবেগে বিছানা হইতে উঠিয়াও পড়িলাম, কিন্তু ডেক্‌সের কাছাকাছি আসিয়া সহসা মন পরিবর্ত্তিত হইল, মনে হইল, ছি কুসুম কি ভাবিবে? আর কিই বা লিখিব! আস্তে আস্তে আবার ফিরিয়া গিয়া বিছানায় ঢুকিলাম।

পরদিন সকালে দিদি বলিলেন "সে আসবে জানিস?" আমার হৃৎপিণ্ড বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে?"

"কাল টেনিসে।—মুখে তুই কিছু বলিসনে, কিন্তু দিন দিন যেরকম শুকিয়ে যাচ্ছিস দেখলে চোকে জল আসে।"

ভারী লজ্জা হইল, ছি ছি—দিদিও ধরিয়া ফেলিয়াছেন! বলিলাম—"হ্যাঁ শুকিয়ে যাচ্ছি! তোমার যেমন কথা!"

দিদি বলিলেন—"আর এতটা কষ্ট কেন—না সামান্য একটু ভুল বোঝার জন্যে!"

আমি সহসা আকাশ হইতে পড়িলাম—বুঝিলাম ডাক্তারের কথা বলিতেছেন না।

দিদি বলিলেন—"সে যে তোকে ভালবাসে তাতে আর সন্দেহ নেই। ওনার সঙ্গে দেখা হতে নিজেই সে কথা তুলে বলেছে যে তোর ব্যবহারে তার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে;—যদিও অন্য পার্টিরা তাকে বিয়ের জন্য বিশেষ ধরে পড়েছেন—কিন্তু এখনো সে শেষ কথা দেয়নি। এখনো যদি তোর মত হয় ত সমস্ত sacrifice করতে প্রস্তুত! কাল আসবে দেখিস যেন আর হেঙ্গাম বাধিয়ে বসিস নে। তুই ভাল বাসিস, সেও ভাল বাসে মাঝে থেকে এক ফ্যাকড়া!"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি এখন নিজের হৃদয় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি তাঁহাকে ভালবাসা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব তবে বিবাহ করিব কি করিয়া? আমি বলিলাম "আমার জন্য তাঁকে কোন রকম sacrifice করতে হবেনা। দিদি আবার কেন এ হেঙ্গাম বাধান? আমি দেখা করতে পারবনা!"

দিদি বলিলেন "তুই এমন কথা ধরতে পারিস? sacrifice ব'লেছে অমনি অভিমান!"

"অভিমান কিছু না। ভালবাসাস্থলেই মানাভিমান! ভালবাসাতেই আত্মবিসর্জ্জন ক'রে আত্মবিসর্জ্জন নিয়ে সুখ। তেমন ভালবাসা থাকলে তিনিও এটা sacrifice ভাবে দেখতেন না, আর আমারো তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা হোতনা।—যাকে ভালবাসিনে তার উপর মানাভিমানই বা কি—আর তার sacrificeই বা নিতে যাব কেন?"

দিদি তবুও মনে করিলেন—ইহা আমার অভিমানের কথা, হাসিয়া বলিলেন,—

"তোর সঙ্গে বাবু আমি তর্কে পারব না—সেত কাল আসবেই, এসে তর্ক ভঞ্জন মান ভঞ্জন করবে এখন।"—

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম "দিদি তুমি খুবই ভুল বুঝছ। অভিমান করে আমি এরূপ বলছিনে। তাঁর এ কথায় আমার বরঞ্চ আহ্লাদই হয়েছে—মনের থেকে একটা দারুণ ভার নেমে গেছে। আমি যাকে ভাল বাসতে পারছিনে—তিনি আমাকে ভাল বাসছেন—আমি তাঁর কষ্টের কারণ—এটা মনে করতে কি খুব সুখ নাকি ?"

দিদি রাগিয়া বলিলেন "তোর মত আত্মম্ভরী লোক যদি আর দুটি আছে? সেই যে ধরে বসেছিস সে ভাল বাসেনা—এ আর কিছুতে ছাড়বিনে। যা হক কাল ত আসছে, দেখা ত হোক তারপর যা হয় হবে।"—

আমি কাতর হইয়া বলিলাম—"আমি দেখা করতে পারব না দিদি,—বলো আমার অসুখ করেছে।

"অসুখ করেছে! উনি বলে এলেন তাকে আসতে;—এইরূপ বুঝতে দিলেন যে তোর আর কোন আপত্তি হবেনা আর তুই বলছিস দেখা করবিনে!"

"আমি কি করব? দেখা হলেই যে আমাকে আবার সেই কথাই বলতে হবে আমি যে কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হতে পারবনা দিদি।"

"আমাদের অপমান, তোর নিজের অপমান, লোক হাসবে, তবু এ বিয়েতে রাজি হতে পারবিনে—অথচ তার দোষ কিছুই নেই বেশ বুঝছি। এর কোন মানে আছে?"

"আমি তাঁকে ভাল বাসতে পারবনা"

"এই দুদিন আগে এত ভাল বাসা আর ভাল বাসতে পারবিনে! সে কি কখন হয়! এখন ও রকম মনে হচ্চে বিয়ে হলেই ঠিক ভাল বাসা হবে।"

আমি নিতান্ত মরিয়া হইয়া বলিলাম "দিদি তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমি দেখা করতে পারবনা, আমি তখন বুঝিনি এখন বুঝেছি তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলে আমিও সুখী হবনা তিনিও না।"

"তবে তোর যা ইচ্ছা করিস যা ইচ্ছা বলিস! এমন এক গুঁয়ে মেয়েও ত আমি দেখিনি" বলিয়া দিদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জীবনে পরে অনেক বিপদে পড়িয়াছি কিন্তু কোন মহাবিপদেও আর কখনও আমাকে এই সামান্য বিপদের মত এত কাতর এত অভিভূত করে নাই। যেন ভীষণ অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া, দেহে তীক্ষ্ণ শাণিতাস্ত্র বর্ষণ চলিতেছে আত্ম রক্ষার কিছুমাত্র উপায় নাই, হস্ত উঠাইতে মস্তক তুলিতে শতধার কৃপাণ তাহার তীক্ষ্ণতা আরো ভীষণরূপে অনুভব করাইয়া দিতেছে। আমি যন্ত্রণা জর্জ্জর কাতর প্রাণে সর্ব্বান্তঃকরণে কেবল ডাকিতেছি মাতঃ পৃথিবী বিদীর্ণ হও আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। সে কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না, জগৎ পিতার সিংহাসন তাহাতে বিকম্পিত করিয়া করুণা আনয়ন করিল। তখনো আমি

সেই চৌকিতে সেইরূপ মুহ্যমান ভাবে বসিয়া আছি, চাকর আসিয়া খবর দিল বাবা আসিয়াছেন। বাবার আসিবার কথা ছিল বটে, তিনি লিখিয়াছিলেন আমাকে আসিয়া লইয়া যাইবেন তবে এত শীঘ্র আসিবেন তাহা আমরা মনে করি নাই।

দিদির ঘরে প্রবেশ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম, অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিতেও সাহস হইল না, দেখিলাম বাবা অগ্নি মূর্ত্তি হইয়া ক্রোধবিকম্পিত উগ্রস্বরে দিদির সহিত কথা কহিতেছেন, বুঝিলাম অবশ্য আমাকে লইয়াই তাঁহাদের বাকবিতণ্ডা, কম্পিত কলেবরে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাঁহারা আমার আগমন লক্ষ্য না করিয়াই পূর্ব্বের ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন।

বাবা বলিলেন "সে শোনবার মত কথা কি যে বলব? আমি যে শুনে পাগল হয়ে যাইনি তা আমারি আশ্চর্য্য মনে হচ্চে। তুমি বলছ মণির ইচ্ছা ছিলনা তাই বিয়ে ভাঙ্গতে হয়েছে, বাজার রাষ্ট্র সে নাকি বলেছে কন্যার শোভন শীলতা নম্রতার অভাব দেখেই তাকে সরে পড়তে হয়েছে, বেশী আর কি বলব?"

দিদি। মিথ্যা কথা!

বাবা। মিথ্যা কথা তাকি আমাকে বলতে হবে? মণির মত স্বাভাবিক চাঞ্চল্য, শীলতা কটা মেয়ের আছে?

দিদি। না তা বলছিনে। পাত্র কখনই এরূপ বলেনি, মিথ্যা গুজব; এখনো সে বিয়ে করতে রাজি, যদি ওরূপ তার মনের ভাব হবে তাহলে কি—

বাবা। বিয়ে করতে রাজি! অমন পাত্রে আমি মেয়ে দেব!

দিদি। কিন্তু আপনি স্থির হয়ে একটু ভেবে দেখুন তাতেই লোকলজ্জা কলঙ্ক সমস্ত দূর হবে।

বাবা। লজ্জা কলঙ্ক যা হবার হয়েছে.তার চেয়ে বেশী আর কি হবে? হলেও সবই সহ্য করব তবু অমন চণ্ডালের হাতে মেয়ে সমর্পন করব না।

দিদি। কিন্তু আপনি পরের কথা শুনে অন্যায় করছেন সে কখনই অমন দুর্জ্জন নয়, অমন করে সে বলেনি"—

বাবার রাগ তাহাতে উপশমিত হইল না তিনি তেমনি ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন—"Scoundrel! নিশ্চয়ই বলেছে! মণি যে তাকে বিয়ে করতে নারাজ সেটা বলতে যে তার নিজের মান হানি হয়! কিছুতেই আমি তার সঙ্গে মণির বিয়ে দেবনা; মণিকে আজই রাত্রে সঙ্গে নিয়ে যাব। নিজে দেখে শুনে যে পাত্র পছন্দ করব তাকেই বিয়ে দেব, তোমাদের মত ইংরাজী কোর্টসিপ আর না।"

দিদি অনেক করিয়া তাঁহাকে দু এক দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন, বাবা কিছুতেই রাজি হইলেন না, সেই রাত্রেই আমরা ঢাকা যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া আমি যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, পিতার স্নেহের মধ্যে আপনাকে পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়া

অনেক দিনের পর অতি অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ সে সুখভোগ অদৃষ্টে ঘটিল না, কে জানে সংসারের একি দানব নিয়ম, কাহারও অতিসুখ তাহাকে এ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে দেখিলাম না। ষ্টিমারে বাবা বলিলেন "ছোটুকে তোমার মনে পড়ে কি ?"

"পড়ে বই কি !"

"তাঁর মায়ের ভারী ইচ্ছা তোমাকে পুত্রবধূ করেন আমারো অত্যন্ত ইচ্ছা ইহাকে জামাতা করি ; এমন সুপাত্র সচরাচর পাওয়া যায় না ; ভগবান যদি বিমুখ না হন, তোমার যদি ভাগ্যবল পুণ্যবল থাকে তাহলে ঢাকায় গিয়ে যত শীঘ্র হয় এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন করার ইচ্ছা আছে।"

যে আশা যে কল্পনা অনেক দিন ধরিয়া হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখকর স্বপ্ন রাজ্য নির্ম্মাণ করিত আজ সেই সংবাদে সহসা বজ্রাঘাতে যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম।

রামরাজার মুলুক।

(পঞ্চম প্রস্তাব।)

গন্ধমাদন পর্ব্বতের সম্মুখস্থ গ্রামে আরও দুই চারি দিবস অবস্থান করিয়া রামরাজার মুলুকের (ত্রিবাঙ্কোরের) রাজধানী ত্রিবিক্রম নগরাভিমুখে রওয়াণা হইতে প্রস্তুত হইলাম। যে বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্র লোকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন "এখান হইতে রাজধানী কেবল আট ঘণ্টার পথ; বেলা দশটার সময়ে আহারাদি করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক দ্বিপ্রহরে আপনি রওয়াণা হইতে পারেন। আপনি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বহু দূরদেশবাসী ব্রাহ্মণ; আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমার বাটীতে আপনি পদার্পন করিয়াছেন, খালি পেটে আপনাকে যাইতে দিতে পারিনা, আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্তভাবে গমন করিলে সুখী হই।" এই ভক্ত হিন্দুর ব্রাহ্মণ ভক্তি দেখিয়া অগত্যা আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক বেলা বারটার সময় গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম; বলা বাহুল্য পূর্ব্বেকার শকটবান চলিয়া গিয়াছিল, কয়েকদিন বিলম্ব হওয়ায় আমাকে আবার ক্ষতি স্বীকার পূর্ব্বক নূতন গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে হইল। গ্রামে মোটে একখানি গাড়ী, গাড়োয়ান আমাকে সোয়েলপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবে এই স্বর্ত্ত করিয়া গাড়ী ছাড়িল। ঠিক সায়াহ্ন সাড়ে ছয়

ঘটিকার সময় আমি এই গ্রামের প্রান্তে পৌঁছিলাম; শকটবান আমার দ্রব্যাদি ভূমিতলে রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে, আকাশে অল্প অল্প মেঘের উদয়ও হইয়াছে দেখিলাম। শকটবান চলিয়া গেলে বুঝিলাম, আমি তাহার দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়াছি। যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিলাম তাহা একটা প্রকাণ্ডরাজবর্ত্মের পার্শ্বদেশ, এখান হইতে সোয়েলপুর প্রায় এক মাইল পথ। রাস্তা দিয়া লোকের যাতায়াত দেখিলাম না, নিকটে মনুষ্যাবাস আছে বলিয়া বোধ হইল না। আমার সঙ্গে যদি দ্রব্যাদি না থাকিত, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া গ্রামে চলিয়া যাইতাম; কিন্তু "পথের ধারে দ্রব্যাদি রাখিয়া কোথায় যাই" এই চিন্তায় আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। সঙ্গে খুব মোট ছিল; অন্ততঃ তিনটা মুটে না হইলে সে মোট উঠান দুষ্কর। মান্দ্রাজের স্পেন্সার কোম্পানীর নির্ম্মিত দুইটা বড় বড় ষ্টীল ট্রাঙ্ক, সোলাপুরের এক প্রসিদ্ধ চর্ম্মকার প্রণীত একটা খুব বড় 'কোরিয়ার ব্যাগ,' কলিকাতার একটা কাষ্ঠ-সিন্দুক, প্রায় ৫০ খানা পুস্তক, শয্যার একটা মোট, তদ্ভিন্ন ছড়ি, ছত্র, জুতা, ইত্যাদি কয়েক প্রকারের সরঞ্জাম। এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিবার পরে, একজন মুসমান যুবক ও মুসলমানী যুবতী তথায় আসিয়া একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে অন্ধকার স্থানে উপবেশন করিল। ইহারা কে এবং ইহাদের দ্বারায় আমার কোনও সাহায্য হইতে পারে কিনা এই ভাবিয়া তাহাদের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু তাহাদের উভয়েই এমন একটা অদ্ভুত ও মজার গল্পে উন্মত্ত যে, আমার দিকে তাহারা দৃষ্টিপাতও করিলনা। তাহারা যে আমোদজনক "কেচ্ছায়" (গল্পে) আত্মহারা ছিল, তাহার কিয়দংশ শুনিয়াই ইংরাজি লেখক জন্‌সন্ প্রণীত Rasselas গ্রন্থের প্রথম কয়েক ছত্র মনে পড়িল। "Ye who listen to the credulity of the whispers of Fancy, and pursue with eagerness the phantoms of hope"—&c. আমি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাহারা তখন Whispers of Fancy এবং Phantoms of Hope লইয়া এতই মাতিয়া উঠিয়াছে যে, আমার কথায় তাহাদের কর্ণপাতও হইলনা। এমন সময়ে এক খানা খালি গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া সেই গাড়ীর সাহায্যে সোয়েলপুরে পৌঁছিলাম এবং গদাধর বেঙ্কটরত্নম্ চেটি নামক এক বৈশ্যের বাটীতে রাত্রিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, বিদেশে ভ্রমণ করিতে গেলে রাজার ন্যায় ধন দৌলৎ লইয়া ভৃত্যাদি সঙ্গে পরিভ্রমণে সুবিধা আছে, অথবা কাঙ্গাল সন্ন্যাসীর ন্যায় ভ্রমণে কষ্ট নাই, কিন্তু আমার ন্যায় মধ্যবিত্ত লোকের বহুদূর দেশে ভ্রমণ করা নিতান্ত কষ্টকর ও অসুবিধাজনক। আমার সঙ্গে যে চাকর ছিল, অনেক দিন হইল সে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন আমি একাকী। এত মোট ও বোঝা লইয়া পরিভ্রমণ করা অত্যন্ত অসুবিধা ও বিপদজনক দেখিয়া স্থির করিলাম, সমুদয় দ্রব্য এই গ্রামে বিক্রয় করিয়া "খালি হাত" হইব। ঐ গ্রামের তালুকদার এবং পুলিসের দারোগা আমার সমুদয় দ্রব্যগুলি অর্দ্ধ মূল্যে খরিদ করিয়া লইলেন, আমার সঙ্গে যাহা রহিল তাহার তালিকা দিতেছি; এক

জোড়া জুতা, একটা ছড়ি, একটা ছত্র, এক খানি উপনিষদ, বৃন্দাবনের একটা কাষ্ঠের কমণ্ডলু এবং এক খানা প্রকাণ্ড শার্দ্দূল চর্ম্ম। বেহারের অন্তর্গত বেতিয়ার মহারাজা কোনও সময়ে আমাকে এই মূল্যবান ব্যাঘ্রচর্ম্ম উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রামে সাত দিন থাকিয়া অষ্টম দিবস প্রাতে আমি আট গজ 'নয়নশুক' খরিদ করিলাম; মধ্যাহ্নে গৈরিক মাটির রঙ্গে ঐ কাপড় রঙ্গাইয়া একখানি বহির্ব্বাস, একখানি ধুতী এবং একখানি উত্তরীয় প্রস্তুত করিলাম। সায়াহ্ন সার্দ্ধপঞ্চ ঘটিকার সময়ে গ্রামের লোকেরা আশ্চর্য্যে ও সভয়ে দেখিল যে, বেঙ্কটরত্নম্ চেটির বাটীতে এক ব্রহ্মচারী বর্ত্তমান! আমার ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়া বৃদ্ধ চেটি আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং হাসিয়া বলিল "জুতাটা ফেলিয়া দিলে ভাল হয়।" বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং মনে করিয়া, জুতাটা ফেলিয়া দিলাম। অদ্য হইতে আমি খালি পায়ে বেড়াইতে লাগিলাম, অদ্য হইতে আমি ব্রহ্মচারী! আমার সঙ্গে আর কিছুই মোট রহিল না, আমি এখন বেশ নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, নির্ভীক এবং প্রফুল্ল চেতা। এই গ্রামে হরিতকীর বন আছে, স্থানে স্থানে রুদ্রাক্ষ বৃক্ষও দেখিয়াছিলাম। সোয়েলপুরে বহুসংখ্যক Syrian Christians এর বসতি; হরিতকী বনের পার্শ্বে St. Franciscan সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দেড় শত রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান বাস করে। ইহারা রূপবান, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, সভ্য এবং ধনবান। গ্রামে একটা ক্ষুদ্র Nunnery আছে; এই 'ননারী' সম্বন্ধে হিন্দুর মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা "Father Chiniquy's Fifty years in the Church of Rome" গ্রন্থে পাঠকেরা পাঠ করিতে পারেন!

সোয়েলপুর হইতে একাদশ মাইল দূরে (আর একদিকে) মলয়পেটা নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম। সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য ইহা প্রাচীন কাল হইতে প্রখ্যাত। এই পুরাতন গ্রামে দেখিবার ও শুনিবার অনেক জিনিষ আছে, সুতরাং কয়েক দিবসের জন্য মলয়পেটায় বাস করিতে গেলাম। গ্রামের তিন দিকে পর্ব্বত, চতুর্থ দিকে মহাবন, এই বনের ভিতর সুন্দর ও প্রশস্ত পথ, এই পথ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। বনে কোনও ভয় নাই। গ্রামটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, ঐ পাহাড়ের চারি দিকে নির্ম্মল সলিলের প্রস্রবণ। এই প্রস্রবণ দেখিলে চিতোর দুর্গের প্রস্রবণ স্মরণ হয়। আমি এই সুপ্রাচীন ও সুবৃহৎ গ্রামে গিয়া এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তালুকদারের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গ্রামের সকল অধিবাসীই প্রায় শিক্ষিত ও সভ্য এবং সকলের ঘরেই ধন ধান্য ভরা। এমন সৌভাগ্যশালী সুন্দর গ্রাম আমি অল্পই দেখিয়াছি। যে ব্রাহ্মণের বাটিতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তিনি ৫০ খানি গ্রামের তালুকদার এবং সুদ লইয়া অনেককে টাকা কর্জ্জ দেন। এই গ্রামে দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আমার শারীরিক অবস্থা যাহা ছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) পাঠক মহাশয়কে দিতে বাধ্য হইতেছি। আমার তখন প্রবীন অবস্থার সূত্রপাৎ হইয়াছে কিন্তু এই প্রবীন অবস্থায় আমার শরীর এত সবল ও সুস্থ ছিল যে, ত্রিশ বৎসরের যুবকেরাও সে শরীর

দেখিয়া হিংসা করিয়াছে। দক্ষিণাবর্ত্তের লোকেরা আমার সবল মাংসালু দেহ ও তাহাদের পক্ষে অসাধারণ গৌরবর্ণ দেখিয়া আমাকে "বাঙ্গালার মহাদেব" বলিয়া ডাকিত। আমি যখন কলেজে পড়িতাম তখনও আমার লম্বা চুল ছিল, সেই চুল কখনও কাটা হয় নাই। রামরাজার মুলুকে যখন পৌছিয়া ছিলাম তখন মাথার চুল এত দীর্ঘ হইয়াছিল যে দাঁড়াইলে জানু স্পর্শ করিত। কেশ তখন পাকিতে আরম্ভ হয় নাই; প্রায় অর্দ্ধশরীর কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ সুচিক্কণ ও কুঞ্চিত কেশপুঞ্জদ্বারা ঢাকা থাকিত। এই কেশকে সুন্দর রূপে রক্ষা করিবার জন্ম বহুবর্ষকাল ব্যাপিয়া আমি বিশেষ রূপে অর্থব্যয় ও যত্ন স্বীকার করিয়া ছিলাম। কেন করিয়া ছিলাম তাহা জানিনা, মানুষ মাত্রেরই একটা না একটা সখ থাকে, বোধ হয় এটাও আমার যুবা বয়সের পাগলামী সখ! ত্রিবাঙ্কুরের লোকেরা তদ্দেশীয় প্রথানুসারে মাথায় চুল রাখিতে পারেনা সুতরাং কাহারও মাথাভরা সুন্দর চুল দেখিলে চুলের বড়ই পক্ষপাতী হয়। আমি যখন মাদ্রাজ অঞ্চলে বেড়াইতে ছিলাম তখন মাদ্রাজের ইংরাজি ও দেশীয় সম্বাদ পত্র সমূহে আমার মাথার কেশের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, অনেকে তাহা পাঠও করিয়াছিল, মলয় পেটার শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই তাহা জানা ছিল। যে ব্রাহ্মণের বাটীতে ছিলাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাকে বলিলেন "আপনার সম্বন্ধে পর্দুকোটা রাজ্যের কলেজের পৃন্সিপাল Madras Times" সমাচার পত্রে লিখিয়া ছিলেন "His long, black, and exquisitely beautiful hair have made him an observed of all observers in this Native State." জিজ্ঞাসা করি, আপনিই তিনি?" আমি বলিলাম 'হাঁ'। এই কথা শুনিয়া তিনি তিন জন ফোটোগ্রাফারকে ডাকাইয়া আমাকে বলিলেন "ইহাঁরা আপনার ফোটো লইবার জন্ম আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া ছেন, বোধ হয় ইহাতে আপনি আপত্তি করিবেন না।" আমি উত্তর দিলাম "কোনও আপত্তি বা কষ্ট নাই। অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত Adelaide, Sydney Melbourne প্রভৃতি নগরে পরিভ্রমণের সময়ে আমাকে ন্যূনাধিক ৩৬ বার ফটোগ্রাফার দিগের ক্যামেরা সম্মুখে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, আরও ৩৬ বার দাঁড়াইতে আপত্তি নাই।" সুতরাং আমার ফোটো লওয়া হইল। এই চিত্র তুলিবার দুই এক দিন পরেই ব্রাহ্মণের ঘরে নানা স্থান হইতে দলে দলে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আমদানী হইতে লাগিল। কদলী, তাল, নারিকেল আম্র, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, চিনি, গুড়, বাতাসা, বেদানা, পেয়ারা, প্রভৃতি নানা প্রকারের উপহার দ্রব্যে নিত্য নিত্য ব্রাহ্মণের ঘরখানি পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; কেহ ধর্ণা দিয়া বসিয়া আছে, কেহ মাদোল বাজাইয়া গান করিতেছে, কেহ ভাগবৎ পাঠ করিতেছে, কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া যোড় হস্তে দণ্ডায়মান আছে এবং কেহ বা নৃত্যকারী ও গীতকারী বালকের দলকে সঙ্গে লইয়া গীত গাহিতেছে ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। আমি ভাবিলাম, বুঝি এই জন্যই আজি কালিকার ধর্ম্মধ্বজী কপটেরা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী সাজিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! বাহিরের এক প্রকাণ্ড স্থানে আসিয়া আমি অনেককে বুঝাইলাম যে,

আমি দৈবশক্তি সম্পন্ন নহি এবং কাহারও ভাল মন্দ করিবার মন্ত্র জানি না। এ কথায় কেহ বিশ্বাস করিলনা, দিনে দিনে জনতা আরও বাড়িতে লাগিল। কেহ বলিল, আমার পুত্রের সাতবর্ষকালব্যাপী পীড়া আছে ঔষধ দাও, কেহ বলিল আমার পুত্রবধূর সন্তান হয় না কোনও উপায় আছে কিনা বলিয়া দাও, কেহ বলিল আমার কন্যাকে ভূতে ধরিয়াছে মন্ত্র পড়িয়া মাদুলী দাও, কেহ বলিল আমার প্রতিবেশীর বৃদ্ধা মাতা 'ডাইন্' সুতরাং তাহাকে দমন করিবার উপায় কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি পুনরায় নিষেধ করিলাম, সে নিষেধ কেহই মানিলনা। এই সময়ে মালাবার দেশীয় একজন সন্ন্যাসী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি- লেন, আমি তাঁহাকে দুগ্ধ ও ফল মূল খাইতে দিলাম এবং চারি আনা পয়সা দিয়া বিদায় করি- লাম। সন্ন্যাসী পরম পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে গ্রামের প্রধান লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীকে কেমন দেখিলেন?" সেই 'সন্তুষ্ট অথচ কপট এবং মিথ্যাবাদী' সন্ন্যাসী তাহাদিগকে বলিল "এমন গুণবান মহাত্মা আর দেখি নাই, ইনি যথার্থই বাকসিদ্ধ পুরুষ, ইহাঁর মুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহা ফলবান হইয়া থাকে। ইনি ইচ্ছা করিলে মানুষ কে পশু এবং পশুকে মানুষ করিতে পারেন, ইনি বোধ হয় যোগিনী সিদ্ধ গুরুর শিষ্য, ইহাঁর সঙ্গে তিনটা ভূত আছে, সেই ভূতেরা ইহাঁর আদেশে অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারে। আমি যখন নির্জ্জনে ইহাঁর সহিত কথা কহিতেছিলাম, তখন ইহাঁর মুখ হইতে সতেরটা বড় বড় বিষাক্ত সর্প নিঃসৃত হইয়া আকাশ মার্গে উড়িয়া গেল এবং আকাশ হইতে একটা চতুর্ভুজ যোগিনী আসিয়া ইহাঁর সম্মুখে দাঁড়াইল, এই সকল ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" এই মিথ্যা জনরব ক্রমে যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণের গৃহে ততই মনুষ্যের ভিড় হইতে লাগিল, শেষে জনতা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। দুই একদিনের মধ্যে পুলিষের দারোগাকে ডাকাইয়া জনতা বন্ধ করিলাম, পুলিষের ভয়ে লোকের আসা যাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া হইয়া গেল। ভাবিলাম, ধর্ম্মের নামে—অথবা কপটতার ছলে—ভারত ভূমিতে না হইতে পারে এমন কোনও কাণ্ডই নাই!*

অতঃপর আমি রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম, কিন্তু আশ্রয় দাতা গৃহস্থটির অনুরোধে আরও কয়েক দিনের জন্য তাঁহার বাটীতে থাকিতে হইল। তখন নবেম্বর মাস কিন্তু তবুও এত গ্রীষ্ম যে রাত্রে গৃহের ছাদে শুইতে হয়। একদিন রাত্রে আমার সেই সুদীর্ঘ ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া গৃহস্থের বহির্বাটীর ছাদে শুইয়া আছি এমন সময়ে (রাত্রি) প্রায় সার্দ্ধ দ্বাদশ ঘটিকার প্রারম্ভে একটা গুরু দ্রব্যের পতন শব্দে আমার অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দেখি, ব্রাহ্মণের প্রস্তরময় অট্টালিকার প্রাচীর ধরিয়া তিনজন কৃষ্ণকায়, বলবান এবং বিকটমূর্ত্তি মনুষ্য ছাদের উপরে উঠিতে চেষ্টা করি-

* পাঠক মহাশয়কে বলিয়া রাখা উচিত, আমার এখন আর পূর্ব্বেকার সুদীর্ঘ কেশ নাই, সে সকল সুহ শরীরেরও অধঃপতন হইয়াছে।—লেখক।

তেছে ; একটা পুরাতন প্রস্তর খণ্ড দেওয়াল হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারই পতন শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাহারা কে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময়ে দেখিতে দেখিতে তীরের ন্যায় দ্রুতবেগে সেই তিন জন অপরিচিত ব্যক্তি ছাদের উপরে উঠিয়া আমার বিছানার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাদের এক জনের হাতে কুঠার, একজনের হাতে বাঁশের লাঠি এবং তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে তরবারী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তোমরা কে ?' একজন বলিল "চুপ! চুপ! আমরা ডাকাইত, এই গৃহস্থের বাটিতে ডাকাইতি করিতে আসিয়াছি, এই তালুকদারের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইব। যদি আমাদের হাতে নিহত হইতে ইচ্ছা না কর তাহা হইলে যাহা বলিতেছি শুন।" আমি কোনও উত্তর দিলাম না। যাহার হাতে বাঁশের লাঠি ছিল সে বলিল, "তালুকদারের বাটীর কোন্ গৃহে টাকা ও অলঙ্কারাদি আছে বলিয়া ও দেখাইয়া দাও এবং কাহার আছে চাবি থাকে তাহাও বল।" আমি উত্তর দিলাম 'আমি কিছুই জানিনা।' এই কথা শুনিয়া একজন ডাকাইত আমার লম্বা চুল ধরিয়া আমার মুখ নত করিল এবং সবলে পৃষ্ঠদেশে এক বিষম মুষ্ট্যাঘাত করিল, আমি বলিলাম "মার কেন, আমি বিদেশী ব্রাহ্মণ, ইহার বাটীতে অতিথি মাত্র ; আমি তালুকদারের বেতন ভোগী ভৃত্য বা গোমস্তা নহি, আমি দূর দেশের লোক, গৃহস্থের সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কে ? আমি উত্তর দিলাম 'আমার লম্বা কেশ, গৈরিক বস্ত্র, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কমণ্ডলু ইত্যাদি দেখিয়া বুঝিতেছ না আমি কে ?' কথা শুনিয়া ডাকাইতেরা ছাদের উপরে বসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার দেশ কোথায় ?' আমি বলিলাম 'বাঙ্গালা দেশ'। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক ডাকাইত বলিল 'গৌড় বাঙ্গালা ? যে দেশে রাজা গোপী চাঁদের বাস ছিল ?' * আমি বলিলাম 'শুনিয়াছি, তথায় গোপীচাঁদ রাজার রাজত্ব ছিল।' একজন ডাকাইত বলিল

* পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় জানা নাই, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে ইংরাজি অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যে বঙ্গদেশ গৌড় নামে পরিচিত। অনেকের বিশ্বাস, বাঙ্গালা দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামরূপী কামাখ্যার আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালীরা ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পরিপক্ক ; অনেকের ধ্রুব সংস্কার এই যে 'খাস বাঙ্গালায়' বিদেশী যাইতে পারেনা, ঘটনাক্রমে যাইয়া পৌঁছিলে আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারেনা, কারণ এই যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা বিদেশী পুরুষকে গাধা ও ছাগল রূপে পরিণত করিয়া রাখে।" এই কুসংস্কার ও ভ্রম বিশ্বাসের কোথা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে জানিনা কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একথা শুনিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, বেহার, রাজপুতানা, মধ্যভারত, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই অঞ্চল এবং সুদূর মালাবার উপকূলেও লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে "গৌড় বাঙ্গালার রাজা গোপী চাঁদের" কথা শুনিয়াছি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গোপী চাঁদের যাত্রা, থিয়েটর ইত্যাদি দেখিয়াছি। অযোধ্যায় গোপীচাঁদ সম্বন্ধে নাটক ছাপা হইয়াছে ; বোম্বাই অঞ্চলে গোপী চাঁদের ইতিহাস লইয়া শতাধিক গীত প্রচলিত আছে। এই ইতিহাস শুনিয়া অনেকে কাঁদে, এই সকল গীত গাহিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পুণার চিত্রশালা হইতে গোপী চাঁদের চিত্র প্রকাশিত হইয়া সহস্র সহস্র খণ্ড বিক্রয় হইয়াছে, অথচ আমরা গোপী চাঁদের কথা কিছুই জানিনা !—লেখক।

'কলিকাতার কালীমাতাকে দেখিয়াছ?' আমি বলিলাম হাঁ। আর একজন ডাকাইত জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কালীমাতার পূজা কর কিনা?' এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব তাহা লইয়া বড়ই চিন্তা হইল। যদি বলি, পূজা করি না, তাহা হইলে ডাকাইতেরা আমাকে দুষ্টলোক ভাবিবে, কেন না কালী তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী ও আরাধ্যা দেবী; যদি বলি, পূজা করি, তাহা হইলে নিজের ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বলা হয়, কেন না আমি কালীকে ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। চুপ করিয়া আছি, এমন সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বয়স্ক ডাকাইত বলিয়া উঠিল "ইনি নিশ্চয়ই কালীভক্ত; যাঁহারা প্রকৃত সাধু তাঁহারা নিজ মুখে কালীমাতার পূজার কথা ব্যক্ত করিয়া স্বমুখে স্বপ্রশংসা করেন না।" আমি মনে মনে ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলাম; অকারণে ডাকাইতের হাতে প্রাণ যাইত, ঈশ্বর দয়া করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন দেখিয়া চক্ষে প্রেমাশ্রু বহিল। কথায় কথায় ডাকাইতেরা আমাকে ব্রহ্মচারী বলিয়াই স্থির করিল, আমি তাহাদিগকে ধূম্রপান করিতে দিলাম, তদনন্তর তাহারা আমার বড়ই ভক্ত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে একজন ডাকাইত বলিল "রাত্রি অধিক হইতেছে, সময় ও সুবিধা যাইতেছে, অট্টালিকার বাহিরে আমাদের আরও অনেক লোক লুকাইয়া আছে, অতএব ব্রহ্মচারী মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া কালীমাতার এই ভক্তদিগকে ডাকাইতির সুবিধা করিয়া দিউন।" আমি বলিলাম "ভাই! ব্যস্ত হইওনা, যাহা বলিতেছি প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই গৃহস্থ বাস্তবিক ধনবান, ইহার অনেক টাকা এবং সোনা রূপা ইত্যাদি আছে ইহাও সত্য, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ এমনই সাবধান যে, বাটীতে অতিসামান্য মাত্র টাকার অধিক রাখে না, সময়ে সময়ে ৫০ কাটার বেশী এখানে জমা থাকে না, অলঙ্কারাদি এবং টাকা ও নোট ত্রিবঙ্কুরের রাজ খাজানায় মজুদ থাকে, দরকার হইলে তথা হইতে দরকারমত অর্থাদি লইয়া আইসে। বিবাহ বা উৎসবের সময়ে অলঙ্কারাদি আনে, দুই চারি দিন পরে সে গুলি আবার খাজানা খানায় পাঠাইয়া দেয়।" আমি অনেক শপথ দিব্য করিলাম, ডাকাইতেরা সে কথায় বিশ্বাস করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। যাইবার সময় আবার সেই প্রাচীর ধরিয়া ভূমিতলে অবতরণ করিল। দুষ্টেরা চলিয়া গেলে, মনেমনে ভাবিলাম 'অন্ধকার রাত্রে অন্যূন তিন শতটা মিথ্যা কথা বহিয়াছি।' আবার ভাবিলাম 'এই মিথ্যা কথা গুলি না বলিলে এই গৃহস্থের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইত, গ্রামে অরাজকতার ভয় বাড়িত, পুলিসের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত এবং না জানি ডাকাইতি উপলক্ষ্যে অন্ধ রাত্রিতে কত স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ, কত বালক বালিকার পাশবীয় নির্য্যাতন এবং কত পুরুষের প্রাণহত্যা হইত।' মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'হে মন! আমি কি পাপ করিয়াছি?' মন বলিল 'মিথ্যা সর্ব্বথাই মিথ্যা, এবং সত্য সকল অবস্থাতেই সত্য"। Reason এবং Conscience এতদুভয়ের অস্মমত হইল সুতরাং মনের সহিত ইহাদের তর্ক চলিতে লাগিল। এমন সময়ে প্রসিদ্ধ তার্কিক Bentham সাহেবের একটা কথা স্মরণ হইল, তিনি বলিয়াছেন Not the act itself, but the

motive which actuates the actors to act, is to be taken into consideration. মোটের উপর বলিতে হইলে সে সময়ে আমি একটা পরস্পর বিরুদ্ধমতের—স্বার্থবাদের তর্কের সাগর মধ্যে ভাসিতে লাগিলাম, ইংরাজীতে ইহাকে Casuistry বলে, এবং লাটীন ভাষায় Libellaticide কহা গিয়া থাকে। ভাবিলাম, মিথ্যাকে আমরা ঘৃণা করি, কারণ এই যে মিথ্যার উদ্দেশ্য অসৎ ও অসাধু; সত্যকে আমরা ভাল বাসি ও প্রিয়জ্ঞান করি, কারণ এই যে সত্যের উদ্দেশ্য সাধু ও সৎ; কিন্তু সত্যের উদ্দেশ্য যদি কোনও সময়ে ক্ষতিজনক বা অসাধু হয় এবং মিথ্যার উদ্দেশ্য যদি সাধু ও সৎ হয় তাহা হইলে এমত দৃষ্টান্ত স্থলে সত্য মিথ্যা এবং মিথ্যা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। দুগ্ধের অন্য নাম অমৃত, কিন্তু কোনও কোনও রোগে দুগ্ধপান করিলে সর্পবিষ অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট হয়, এমত স্থলে দুগ্ধ সর্পবিষ তুল্য কিনা? সান্নিপাতিক বিকারে সর্পবিষ মহৌষধি, এস্থলে হলাহল অমৃত তুল্য কিনা বল দেখি? ভাবিলাম, The motive which actuated me to tell so many so-called lies ভাল ছিল, সুতরাং Libellaticide মতে ইহা পাপ জনক নহে। * আমার মিথ্যায় কাহারও অনিষ্ট হয় নাই, বরং অন্যপক্ষে শত সহস্র অনিষ্টের প্রতিকার করিয়াছি। এমন সময়ে casuistryর অনেক কথা স্মরণ হইল। হিন্দুর ধর্ম্মকল্পদ্রুম রাজা যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা' এবং 'আহত' ও 'গজ' এই তিনটি কথা লইয়া কত খেলা খেলিয়াছিলেন! কুরুক্ষেত্রের মহাবীর, শ্রীকৃষ্ণের পরমমিত্র, মহা যোগীন্দ্র পুরুষ শ্রীঅর্জ্জুন মহাপ্রস্থান কালে মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে সূপকার রূপে বর্ণনা করেন। মক্কা হইতে মদিনায় পলাইবার সময়ে আক্রমণকারীদিগকে মহম্মদ বলিয়াছিলেন 'আমি মহম্মদ নহি। যে ব্যক্তি মহম্মদ সে এখন পর্ব্বতের গুহায় আছে।' † খৃষ্টের পরমভক্ত ও প্রধান শিষ্য 'পিতর' (St. Peter) বিপদের সময়ে 'আমি খৃষ্টকে জানিনা এবং খৃষ্টের শিষ্য নহি' বলিয়া মিথ্যা বলিয়াছিলেন। (New Testament. St. Mark's Gospel, chapter XIV). বাইবেলের Genesis গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখা যায়, ফেরোণ রাজার পুত্রদের নিকটে পাট্রিয়ার্ক ইব্রাহিম আপনার স্ত্রী "সারা"কে ভগ্নী বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া ছিলেন, ইত্যাদি। যাহা হউক, কয়েক দিন পরে সে গ্রাম হইতে রওয়ানা হইয়া রাজধানী অভিমুখে গাড়ী চালাইলাম।

আসিতে আসিতে একস্থানে প্রকাণ্ড রাজবর্ত্ম পার্শ্বে একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী সর্প অথবা অজাগর। এই

* অনেক পাঠক মহাশয়ের আমার সহিত মতভেদ হইতেছে তাহা জানি, কিন্তু সেই বিপদ জনক রাজ্যে মনে মনে যাহা হইয়াছিল তাহাই ব্যক্ত করিতেছি।—লেখক।

† 'হদিস সরিফ'। ৩২ পৃষ্ঠা। (উর্দ্দু অনুবাদ)।

Published by Munsi Newal Kisore, C. I. E.; Oudh Akbar press, Lucknow.

সর্পের বিবরণ শুনিলে অনেকে, হয়ত আরব্যোপন্যাসের গল্প বিবেচনা করিবেন, কিন্তু আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। এই সাপ লম্বায় ৮ হাত, এবং একটা নারিকেল বৃক্ষ যত মোটা হইতে পারে, সাপটা তত মোটা। মুখ ব্যাদান করিলে, মুখের মধ্যে একটা বড় বাক্স অনায়াসে প্রবেশ করান যায়। বুড়ী সেইখানে বসিয়া সাপ দেখাইয়া পথিকের নিকটে পয়সা আদায় করিতেছে। সে বৎসর ত্রিবাঙ্কুরে বৃষ্টির অভাব ছিল, বুড়ী একটা গীত গাইয়া বৃষ্টির 'অভাবত্ব নাশ হইবে' তাহাই প্রমাণ করিতেছিল। গীতটার আমি যাহা বাঙ্গালানুবাদ করিয়াছি তাহা এই—

"বোতল ভরা চিনি ওগো! হাঁড়ি ভরা ফল।
সাপের মুখে দিলে পরে, বর্ষে যাবে জল॥
পের্ম্মার বেটির ছেলে হয় নাই, সাপে দিল বর।
তিন বৎসরে পুত্র কণ্যায় ভরে গেল ঘর॥
ওগো! বিরহিণীর পতি যদি থাকে দূর দেশে।
সাপের বরে, আপন ঘরে, আসে এক মাসে॥
বোতল ভরা চিনি ওগো! হাঁড়ি ভরা ফল।
সাপের মুখে দিলে পরে, বর্ষে যাবে জল॥" &c.

চারি আনা পয়সা দিয়া আমি সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেলা প্রায় ৫ টার সময় ত্রিবিন্দ্রমে পৌছিলাম। একটা বাজারের পার্শ্বে আমাকে নামাইয়া দিয়া গাড়োয়ান চলিয়া গেল। সে প্রস্থান করিলে পর, একজন মালাবারী আসিয়া বলিল 'আপনাকে বিদেশী এবং ব্রহ্মচারী দেখিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে আইসুন।' আমি তাহার সঙ্গে তাহার বাটিতে গেলে, সে ব্যক্তি গাভী দোহন করিয়া আমাকে দুগ্ধপান করিতে দিল। দুগ্ধপান সমাপ্ত হইলে সে বলিল "মহাশয়! আমি আপনাকে কেবল দুগ্ধপান করাইবার জন্য আনিয়াছিলাম, অনুগ্রহ করিয়া দুগ্ধপান করিলেন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমার বাটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, সুবিধাজনক এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেও এবাটিতে আপনার থাকা হইবে না, আপনার অন্যত্রে-স্থান করিয়া দিব।" কেন তাহার বাটীতে থাকা হইবেনা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "মহাশয়! আমি হিন্দু কিন্তু অত্যন্ত নীচ জাতি; কেন নীচ জাতি জানিনা, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকে নীচ জাতি ভুক্ত করিয়াছেন। আমরা নীচ জাতির কোনও ব্যবসা বা কর্ম্ম করিনা কিন্তু এখানকার সামাজিক প্রথানুসারে আমরা নীচ। ব্রাহ্মণেরা আমাদের অন্ন স্পর্শ করেন না, তাঁহাদের বাটীর সীমামধ্যে আমার যাইতে অধিকার নাই, অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বাটির সীমায় যাইতে পারি কিন্তু কোনও গৃহে প্রবেশ করিতে পারিনা। আমরা চিকিৎসা ব্যবসায় করি, আমদের জাতির লোকেরা ব্যবসায়ী বৈদ্য, অন্যকর্ম্ম আমরা প্রায়ই করিনা। আমার বাটীতে আপনি থাকিলে ব্রাহ্মণেরা আমাকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে; বলিবে

তুমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছ।" এই কথা গুলি এই ব্যক্তি অতীব বিশুদ্ধ এবং মনোহারিণী সংস্কৃত ভাষায় বলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি সংস্কৃত কোথা শিখিলে? সে বলিল, "আমরা সকলেই সংস্কৃত জানি, আমাদের জাতির লোকেরা দুই তিন ঘণ্টাকাল অনর্গল বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে। আমরা বেদ, বেদান্ত ইত্যাদি পাঠের অধিকারী নহি, কারণ এই যে ব্রাহ্মণেরা তাহাতে আপত্তি করেন। আমরা ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য এবং চরক, সুশ্রুত, হারীত ইত্যাদি চিকিৎসা শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় পাঠ করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের বালকেরাও আমাদের নিকট ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পড়ে এবং ব্যাকরণ ও কাব্যাদি সমাপ্ত করিয়া শাস্ত্র গ্রন্থ ব্রাহ্মণের নিকটে পড়িয়া থাকে। মালাবারে সংস্কৃতের খুব চর্চ্চা; আপনি যদি ভাল সংস্কৃতজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে এখানে আপনার বড়ই যশ ও আদর হইবে।" আমি বলিলাম, ব্রাহ্মণ রোগীর তবে নাড়ী দেখিতে হইলে শরীর স্পর্শ কর কি না? সে বলিল 'আজ্ঞে না; যদি একান্তই দেখিতে হয় তাহা হইলে আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া ফেলে অথবা তুলসী বৃক্ষতলে এক আনা পয়সার মিষ্টান্ন রাখিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে। ব্রাহ্মণেরা আমাদের হাতের প্রস্তুত ঔষধ সেবন করেন কিন্তু যে সকল ঔষধে লবণ বা জল মিশাইতে হয় সে সকল ঔষধের আমরা কেবল পর্চ্চা (Prescription) লিখিয়া দিই, ব্রাহ্মণেরা ঔষধ আপনার হাতে প্রস্তুত করিয়া লয়।" জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্রাহ্মণের এত আধিপত্য কেন?" লোকটি বলিল "চুপ করুন, চুপ করুন, আস্তে আস্তে বলুন; কথাটা বামুনদের কাণে গেলে বড়ই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে'। মহাশয়। এদেশে ব্রাহ্মণের এমনই আধিপত্য যে, এখানে ব্রাহ্মণই ঈশ্বর এবং হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। এখানে ব্রাহ্মণ অবধ্য; কাহার সাধ্য বামুণের বিরুদ্ধে এদেশে কথা কয়? আজি যদি ব্রাহ্মণেরা এক হইয়া বলে যে রাজাকে পদচ্যুত করা আবশ্যক, তাহা হইলে এক ঘণ্টা মধ্যেই ত্রিবাঙ্কুরের রামরাজা সিংহাসনচ্যুত হইবেন, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টও ইহার প্রতিবাদী হইবেনা। এখানে রাজা নাম মাত্র, যাহা কিছু ব্রাহ্মণে করে বা বলে তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়।" * যাহাহউক, কিয়দ্দূরে এক ব্রাহ্মণের বাটী ছিল, আমার সেই স্থানেই থাকার বন্দোবস্ত হইল। বলা বাহুল্য শিক্ষা, স্বভাব, সভ্যতা, চরিত্র, সাংসারিক অবস্থা সকল বিষয়েই ঐ বৈদ্য এই ব্রাহ্মণ হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তবুও ঐ ব্যক্তি নীচ এবং এই অপোগণ্ড ব্রাহ্মণ ব্রহ্মাপুত্র! রাত্রিতে ব্রাহ্মণ বলিল "আপনার আহারের বন্দোবস্ত করিতেছি, আপনি অন্ন আহার করিবেন কি হপ্‌স্‌ খাইবেন?" আমি বলিলাম, 'হপ্‌স্‌ জিনিষটা কি?' ব্রাহ্মণ যাহা দেখাইল তাহা বাঙ্গালা দেশের আস্কে; তাহার পরে দোশ দেখাইল, ইহা বাঙ্গালা দেশের সরুচাকুলি। এই দুই দ্রব্য সমুদয় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামে, নগরে, দোকানে, মন্দিরে, মশ্‌জিদে

* বৈদ্যরাজের কথাগুলি যে সম্পূর্ণ সত্য পরপ্রস্তাবে তাহা দেখাইব।—লেখক।

এবং প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাইবেন; রাইচুর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই দুই দ্রব্য ব্যবহৃত ও বিক্রীত হয়। সাহেবেরাও ইহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাদিগকে Ups এবং Downs বলেন। যাহা হউক, আমি অন্নের পরামর্শই দিলাম, সুতরাং অন্নের ব্যবস্থা হইল। আমার সম্মুখে বসিয়া ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের বৃদ্ধামাতা, কনিষ্ঠা সহোদরা এবং আর দুইজন স্ত্রীলোক বসিয়া আমার ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। কতকগুলা কাঁচা কলা আনিয়া একটা ছুরিকা দ্বারা কাটিল, উপরের অব্যবহর্য্য অংশ বাদ দিলনা, কেননা এদেশে ছাল শুদ্ধ অপক্ক কদলী খাওয়ার নিয়ম! তদনন্তর একটা বড় লাউ লইয়া তাহাতে কাটিল, ইহার ভিতরের সমুদয় অংশ (শস্য) বাদ দিয়া ফেলিল, উপরের পাৎলা পাৎলা ছাল গ্রহণ করিল এবং তাহাই অপক্ক কদলীর সহিত মিশাইয়া তরকারী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। অলাবুর কেবল সবুজবর্ণ ছাল খাওয়াই এদেশে রীতি, ভিতরের অংশটা অখাদ্য, তাহা কেবল গবাদির ব্যবহার যোগ্য! দ্রব্যাদি পাকের সময়ে লবণ দেওয়া হয় না, পাক শেষ হইলে হাঁড়ি নামাইবার সময়ে লবণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়! লংকা, গোলমরিচ, আদ্রক ইত্যাদির এতই ব্যবহার যে, চট্টগ্রাম বা ঢাকা জেলার লোকেরা এখানে ঝাল খাওয়া শিখিয়া যাইতে পারে। কাঁচাআম, আমড়া, তেঁতুল, কামরাঙ্গা প্রভৃতি ইহারা খুব ব্যবহার করে; ঘোল (তক্র) খাওয়াটা নিত্যই হইয়া থাকে; ঘোলকে এদেশে 'মাইয়ার্' বলে। মালাবারে 'ঝিঙ্গে' প্রায় ৪ হাত লম্বা হয়, স্থূলতা প্রায় ঝাঁটার মত; ঝিঙ্গের নাম 'পিকেঙ্গে'। যাহা হউক, রাত্রে আহার করিতে বসিলাম; আহার প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময়ে ব্রাহ্মণের মাতা বলিলেন 'অপেক্ষা করুন, একটু আচার দিতেছি'। এই বলিয়া আমের আচার দিলেন; দেখিলাম ঐ আচারের মধ্যদেশে এবং চারিপার্শ্বে ছোট ছোট শুভ্র বর্ণের কীট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি বলিলাম "রাম! রাম! এমন আচার কেমনে ব্যবহার করেন? কীট গুলাও খাইয়া থাকেন নাকি?" বৃদ্ধা বলিলেন, "এদেশে সকলের ঘরেই আচারে কীট থাকে, কেহ তাহাতে আপত্তি করেনা; এত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে সকল দ্রব্যই পরিত্যাগ করিতে হয়'।" আমি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত হাত ধুইতে আসিলাম, মনে মনে ভাবিলাম, রাম রাজার মুলুক মজার মুলুক বটে!

শয়নের সময় ব্রাহ্মণের নিকটে আর দুই জন ব্রাহ্মণ আসিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, গৃহস্বামী বলিল "ইহাঁদের প্রথমটি আমার মাতুল এবং দ্বিতীয়টি আমার পিতার সহোদরার স্বামী; ইহাঁরা উভয়েই আমার শ্বশুর। আমার ঘরে দুইটি যে যুবতী স্ত্রীলোক দেখিতেছেন, ইহাদের প্রথমটি আমার মাতুল কন্যা, দ্বিতীয়টি আমার পিতৃস্বসাকন্যা।" শুনিয়াই আশ্চর্য্য হইল, জিজ্ঞাসিলাম "মাতুলকন্যা বিবাহ করিয়াছেন? পিসির কন্যাকেও বিবাহ করা হইয়াছে কি না?" ব্রাহ্মণ বলিল 'আশ্চর্য্য হইতেছেন কেন? আপনাদের দেশে বিবাহের কি অন্য নিয়ম? আমাদের দেশে মাতুলের কন্যাকে আমরা বিবাহ করি। পিসির

কন্যাও স্ত্রী হইতে পারে।” অনুসন্ধানে জানিলাম, সমুদয় মালাবার উপকূলে এই প্রথা প্রচলিত আছে, ইহা তথাকার দেশাচার, স্থানীয় আইন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী নহে। ভাবিলাম, মজার মুলুক বটে! পরদিন প্রভাতে মুখ হাত ধুইতেছি এমত সময়ে একটা বলদশকট আসিয়া ব্রাহ্মণের বাড়ীর দ্বারদেশে থামিল। সেই শকট হইতে একটী যুবতী স্ত্রীলোক অবতরণ করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার ভগিনীর সহিত কথাবার্ত্তা করিতে লাগিল, তদনন্তর আমার সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাৎ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে আমি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ‘এ স্ত্রীলোকটি কে?’ ব্রাহ্মণ বলিল ‘ইনি আমার তৃতীয় পত্নী’। আমি বলিলাম ‘ইহার পিতা কোথায় থাকে?’ ব্রাহ্মণ উত্তর দিল ‘দ্বারদেশে যে শকটবান দেখিতেছেন, ঐ ব্যক্তি ইহার পিতা এবং আমার তৃতীয় শ্বশুর।’ আমি বলিলাম ‘এদেশে ব্রাহ্মণে গাড়ী চালায় কি?’ উত্তরে জানিলাম, মালাবার উপকূলে ব্রাহ্মণে শকটবানের কার্য্য করে, কিন্তু এই শকটবান শূদ্র। ব্রাহ্মণ বলিল “এদেশে ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রার পাণিগ্রহণে অধিকারী; বৈশ্য বৈশ্যা এবং শূদ্রার সহিত বিবাহ করে এবং শূদ্র কেবল শূদ্রাকে পত্নী করিয়া থাকে। এ প্রথা অতি পুরাতন কাল হইতে এদেশে প্রচলিত।’ ইহা আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও আইনের বিরোধী নহে।” আমি বলিলাম ইহার (শূদ্র পত্নীর) হাতে অন্ন খাও কিনা? ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিল, “কি আশ্চর্য্য! যে মুহূর্ত্তে ইহাকে বিবাহ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহার হাতে অন্ন না খাইব কেন?” আমি বলিলাম, ইহার পুত্রাদি কি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবে? ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, “পুত্র হইলে ব্রাহ্মণ এবং কন্যা হইলে শূদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ কন্যার সহিত যদি ব্রাহ্মণের বিবাহ হয় তাহা হইলে কন্যাও ব্রাহ্মণী বলিয়া পরিগণিতা হইবে।” আমি গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম; দেখিলাম The history (of Mahabharata) repeats itself !! মনে মনে বলিলাম, রামরাজার মুলুক মজার মুলুক বটে!

জাতীয় মহাসভা ও জাতীয় সজ্জা।*

পূজ্যপাদ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের ক্ষমা করিবেন। প্রবন্ধের শিরোনামায় মহারাষ্ট্রভাষায় প্রচলিত ও তৎকর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় প্রবর্ত্তিত "রাষ্ট্রীয় সভার" পরিবর্ত্তে, আমরা পুনর্ব্বার সেই "জাতীয়" শব্দ ব্যবহার করিলাম।" জাতীয় সভা" আমাদের বহুকালের পুরাতন বন্ধু। ভারতবর্ষের রাজধানীতে বিগত পাঁচদিন যে মহাপ্রাণ মেলা বসিয়াছিল তাহাকে "জাতীয়" না বলিয়া, আর যে কোন যোগ্যতর নামেই আখ্যাত করা হউক তৃপ্তি হয়না। আমার স্বদেশীয় পাঠকগণের যে "জাতীয়তার" মর্ম্মমূলে আমার গুটিকতক বক্তব্য নিবেদন করিতে চাহি, আমার "জাতীয়তার" আনন্দ আশা ভরষার কথায় তাঁহাদের যে "জাতীয়তাকে" সচেতন ও আহ্লাদিত করিতে চাহি, আমার জাতীয়তার অপমান কাহিনীতে তাঁহাদের যে "জাতীয়তাকে" সচেতন ও ব্যথিত করিতে চাহি, সে নিভৃত, হৃদয়ান্তঃপুরবর্ত্তী, সংসার সূর্য্যালোককুণ্ঠিত মনোভাবটিকে যে সে নামমন্ত্রে আহ্বান করিলে চলিবে না। হয়ত "রাষ্ট্রীয়" শব্দ মহারাষ্ট্রীয়দের হৃদয় মূলে পৌছায়, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও তাহাদের রাষ্ট্র ছিল, রাজ্য ছিল, রাজমন্ত্রী ছিল, মন্ত্রণা ছিল। আমাদের বহুকাল কিছুই নাই, অন্ততঃ দ্বিপুরুষযাবৎ নাই, এবং ইংরাজ ইতিহাসকারগণের ইতিহাস পাঠে, তাহার উর্দ্ধতন কোন পুরুষেও যে কিছু ছিল না এই ভ্রান্ত, আত্মাপমানী, হীনসংস্কারে বাঙ্গালীর শিশু পরিবর্দ্ধিত, তাই "রাষ্ট্রীয়" শব্দের গাম্ভীর্য্যে আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে না, "জাতীয়" শব্দের উচ্ছ্বাসে নবজাগ্রত-প্রাণোন্মাদকারিতায় আমাদের হৃদয় সুখদুঃখলজ্জা, মানাপমান ক্রোধের বিকম্পনে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া "রাষ্ট্রীয়" শব্দে বিশেষ বিশেষ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ভাব হৃদয়ে সমুদিত হয়। যেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীন সে দিন তাহা যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত তাহার অধিবাসীরা একত্রে সম্মিলিত হইলে সে মিলনকে "রাষ্ট্রীয় সভা" বলা যাইতে পারিবে। আজ আমরা সকলে পরাধীন, এক বিদেশীয় ছত্রাধীন, আজ আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্র নহি, বিভিন্ন জাতি মাত্র, সেই বিভিন্নতার মধ্যে আমাদের যে ঐক্য তাহাই জাতীয় ঐক্য, জাতীয়তা। তাই আজ যে মহাসভা আমাদের গৃহে আহূত হইয়াছে তাহা "জাতীয় সভা" মাত্র, "রাষ্ট্রীয় সভা" নহে।

"মাত্র?" হে বন্ধু! হে স্বদেশি সম্পদের দিনের তুলনায় "মাত্র" বলিয়া আজ এ দুর্দ্দিনের

* এই প্রবন্ধ বিগত মাঘমাসে বিরচিত, এতদিন স্থানাভাবে অপ্রকাশিত।

সুহৃদ আমাদের মাত্রাধ্যায় অপমানাস্পদ নহে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে একবার আমাদের গৃহে এই মহাসুহৃদের অধিষ্ঠান হইয়াছিল। তাহার পর দেশ বিদেশে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন আলয়ে অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে নবোৎসাহে প্রোৎসাহিত, নব তেজে উত্তেজিত, নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া ইহা পুনর্ব্বার আমাদের আলয়ে সমুপস্থিত!

এ জাতীয় সভার হিতকারিতা দ্বিবিধ; এক ভারতবর্ষের বিভিন্নাংশের অধিবাসীদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব সমুৎপন্ন ও সম্বর্দ্ধন করা, দ্বিতীয়তঃ সকল দেশের সাধারণ ও প্রত্যেক দেশের বিশেষ অভাব ও অপূর্ণতার বিষয় আলোচনা করিয়া রাজদরবারে জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহার সংস্কার সাধন করা। প্রত্যক্ষতঃ কনগ্রেসের এই দুইটি অঙ্গ। কিন্তু ইহার বেশী আর কি কিছু নাই? এ জাতীয় সভার মাহাত্ম্যে পূর্ব্ব হইতে অভিভূত হইয়া আসি আর না আসি, সমস্ত ভারতবাসীর এই মহামিলনক্ষেত্রে, মহামিলন দৃশ্যে আত্মার একটি অংশ কি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রবুদ্ধ ও অল্পে অল্পে ভূমানন্দে প্লুত হয় না? তাহাকে কি জাতীয়তা বলিব না?

শত কোটি ভারত সন্তান আমরা! ইংরাজ বণিককে আমরাই আমন্ত্রণ করিয়া সাহায্য করিয়া আমাদের দেশে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমরা হিন্দু মুসলমান; উভয়ে মিলিয়া হিন্দু ও মুসলমান অরাজকতার পরিবর্ত্তে স্বদেশে য়ুরোপীয় সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এখনও আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মন্ত্রণাদাতারূপে সৈন্যরূপে ইংরাজের ভারতশাসনের সহায়তা করিতেছি। যে দিন ইংরাজকে প্রথম আমরা ভারতের রাজতখতে বসাইয়াছিলাম সে দিন আমরা জীর্ণ শীর্ণ, রুগ্ন ভগ্ন, অন্ধ অজ্ঞ অমানুষ ছিলাম; সে দিন কল্পনার অতীত ছিল একদিন আমাদের সুস্থ সবল দেহে পুনর্ব্বার জীবনীর সঞ্চার হইবে। তাই আজ এ জাতীয় মহাসভা যে আহূত হইতে পারিয়াছে—হিন্দু মুসলমান, রাঠোর জাট, মারাট্টা শিখ, পঞ্জাবী বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী পারসী যে এক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইতে পারিয়াছে এ জ্ঞানে, এ দৃশ্যে আমাদের জাতীয়-চেতনার পরম আনন্দ, পরম পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। কিন্তু সেই দৃশ্যস্থলেই জাতীয় চেতনার প্রতিকূল অভিঘাতে বিষাদছায়াও কি হৃদয়ে অন্ধকার বিস্তার করেনা? যেমন জাতীয়তার গৌরবে হৃদয় স্ফীত হইবার কারণ এই মহসভায় বর্ত্তমান দেখিলাম, তেমনি জাতীয়তার অপমানে হৃদয় কুণ্ঠিত হইবার কারণও কি সেখানে পরিদৃশ্যমান হয় নাই?

গতবর্ষে যেদিন শুনিয়াছিলাম বঙ্গদেশ সমস্ত ভারতকে আগামী বৎসর তাহার গৃহে আহ্বান করিয়াছে, নিজেকে বাঙ্গালী মানিয়া ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলাম। আমাদের বহুপুণ্য ফলে সমগ্র ভারতবাসী তৃতীয়বার আমাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন; এবং কনগ্রেস যে জাতীয় ঐক্য, মাহাত্ম্য ও সংস্কারের মহৎভাবে অনুপ্রাণিত সে দিব্যভাব তৃতীয়বার আমাদের দ্বারস্থ হইবে, বাঙ্গালী তৃতীয়বার তাহাকে হৃদয়ান্তঃপুরে বরণ করিয়া লইবার সুযোগ পাইবে। এবার বাঙ্গালীর দুই প্রকার আতিথ্যের পরিচয় দিবার কাল সমুপস্থিত

হইয়াছিল ; এক মনুষ্যগত, দ্বিতীয় ভাবগত। নিমন্ত্রিত ভ্রাতাগণের সম্যক্ আতিথ্যে আমরা প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু যে পুণ্যভাব আমাদের গৃহে আহূত হইয়া আসিয়াছিল তাহার কি যোগ্য সমাদর করিয়াছিলাম, কোথাও কিছু ত্রুটি হয় নাই ?

ভারতবাসীর এই দেশহিতকর যজ্ঞের প্রথম দিন চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলাম বাঙ্গালী কোথায় ? মারাটী গুজরাটী, তৈলঙ্গী তামিলী, মুসলমান পার্সী, পঞ্জাবী কাশ্মীরী সকলেই উপস্থিত, যাহাদের গৃহে শুভকার্য্য তাহারা কোথায় ? নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম বাঙ্গালী উপস্থিত, কিন্তু আজ এই পুণ্যদিনে শুচি শুদ্ধচিত্তে জাতীয়ভাবের পূর্ণাহ্বানে মনঃ সন্নিবেশ না করিয়া বাঙ্গালী আজও সমস্ত জগতের সমক্ষে জাতীয় চরিত্রের লঘুতার পরিচয় দিতেছে।

হে বাঙ্গালী আজ জাতীয় সভায় উপস্থিত হইয়াছ, তোমার জাতীয় বেশ কোথায় ? এ কলিকাতার শীত ঋতুর অন্যতম তামাসা প্রাঙ্গন নহে ;—এ স্কেটিং রিঙ্ক নহে, উইলসনের সার্কাস নহে, হাড্‌সন্‌স্ সাপ্রাইজ পার্টি নহে, উইলার্ড্‌স্ অপেরা কম্পানী নহে—এ জাতীয় মহাসভা। ইহার গুরুত্ব তোমার লঘুতার ধারণাতীত কি ? হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতীর যে যে সন্তান আজ এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সকলেই সস্মিতচিত্তে, ভব্যবেশে সমাগত—শুধু তুমিই চির অভব্য, চির গাম্ভীর্য্যপরাঙ্মুখ ?

হে মহারাজাধিরাজ ! তুমি বঙ্গকুলগৌরব ? তুমিই আমাদের মুখপাত্র ? তাই অক্ষুব্ধচিত্তে পরম স্মিতমুখে হীনতার ডালি মাথায় ধারণ করিয়া এ মহাসভায় উপস্থিত ? হে ব্যারিষ্টার-কুলতিলক তোমার পূর্ব্বপুরুষ যে নামাবলী অঙ্গে জড়াইয়া শীত নিবারণ করিতেন তোমার হীন খোলসের অপেক্ষা কি তাহার প্রতি সূত্রে শতগুণ আত্মসম্মান গ্রথিত ছিল না ?

আর এই মহাসভার শান্তি রক্ষক বঙ্গবালকবৃন্দের যে বেশ দেখিলাম তাহা কোন দিন ভুলিবার নহে। ইহারা স্বেচ্ছায় এই সভায় সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়াছে ? ইহারাই বঙ্গবীর ? আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা ?—অথচ জাতীয় বেশ ধারণের সাহস ইহাদেরও নাই ?

এই সভার মুসলমান সভাপতিপ্রবরের পশ্চাতে একটি অবৈতনিক বালক প্রহরী দেখিতাম, দেখিয়াই চিনিতাম সভাপতির স্বধর্ম্মী। তাহার সুঠাম দেহ জাতীয় আচ্ছাদনে মণ্ডিত, তাহার শুভ্র ললাট ইরানী শিরস্ত্রাণে শোভিত। বঙ্গীয় প্রহরী-বালকগণের মধ্যে মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীকে নির্ণয় করিতে কিছুমাত্র গোল হইত না, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুবালককে দেখিলে সন্দেহ হইত এ হিন্দু, না গোয়ানী, না পর্টুগিজ, না ফিরিঙ্গী ! কাহারও অন্যথা সম্পূর্ণ ভারতীয় বেশ কিন্তু মাথায় স্মোকিং ক্যাপ, কাহারও কণ্ঠে এক পুরাতন অতি মলিন নেকটাই, কাহারও ধুতি-পিরানের উপর খাস বিলাতী ওয়েষ্টকোট্—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই কিম্ভূত কিমাকারবেশী বালকগণকে দেখিয়া প্রসিদ্ধ মার্কিন পরিহাসরসিক মার্ক টেনের একটি বর্ণনা স্মরণ হইল। হনলুলুর অসভ্য বর্ব্বরগণের মধ্যে প্রথম যখন খৃষ্ট মিসনরীর আবির্ভাব হয় তদ্দেশীয় রমণীরা দিনের পর দিন মৈত্রীভাবে মিসনারি পরিবারে যাতায়াত আরম্ভ করিল—

কিন্তু তাহাদের পরিধানে এতটুকু লজ্জাবাসও থাকিত না। ইহার অশোভনত্ব তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া ভারি শক্ত হইল। অবশেষে মিসনারিরা কতকগুলি সুদীর্ঘ আলখাল্লা প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের দান করিলেন, গোল চুকিল; কেননা বর্ব্বর নারীরা তাহার পরদিন কাপড়গুলি ভাঁজ করিয়া কক্ষতলে রাখিয়া, সম্পূর্ণ উলঙ্গ বেশে সহরের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া, মিসনরি গৃহে প্রবেশানন্তর বস্ত্র পরিধান প্রক্রিয়া আরম্ভ করিল। তদ্দেশীয় নরনারীর বস্ত্রানুরাগ শীঘ্রই প্রকটিত হইল, কিন্তু অল্প দিনেই বুঝা গেল লজ্জা নিবারণার্থে তাহাদের বস্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিতা নহে, কেবল শোভার্থে। মিসনারীরা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উপযোগী বহুবিধ পরিধেয় বস্ত্রের আমদানী করিলেন, তাহা সর্ব্বসাধারণে বিতরণ করিলেন, এবং বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন আগামী রবিবাসরে যেন তাহাদের পুনর্ব্বার উলঙ্গাবস্থায় গির্জ্জায় দেখিতে না হয়। তাহা হইল না; কিন্তু স্বাভাবিক নিঃস্বার্থ-পরতাবশতঃ বস্ত্র বিতরণ কালে অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত উপস্থিত ব্যক্তিরা লব্ধ বস্ত্র ভাগাভাগি করিয়াছিল। তাই পরবর্ত্তী রবিবারে প্রচারক বেচারীগণের শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে হাস্য সম্বরণ করিয়া রাখা অত্যন্ত দুরূহ হইল। হয়ত একটি সঙ্গীতের মাঝামাঝি কোন প্রৌঢ়া রমণী নবপরিধেয়গর্ব্বে সাহঙ্কারে নানা হাবভাবের সহিত গির্জ্জায় প্রবেশ করিল; তার মাথায় একটা "ষ্টোভ পাইপ" হ্যাট, এবং হাতে এক জোড়া সস্তা দস্তানা—আর কোন অঙ্গাবরণ নাই। তাহার পশ্চাতেই আর একজন দেখা দিল—পুরুষের কামিজে তাহার অঙ্গ শোভিত—অন্যথা দিগম্বরা। তাহার পরই আর একজন মহাসমারোহে উপস্থিত, একটা চক্‌চকে ক্যালিকোর আস্তিনে তাহার কটিদেশ পরিবৃত এবং উক্ত পরিধেয়ের অবশিষ্টাংশ কর্ত্তব্য হইতে অবসর প্রাপ্ত ময়ূরপুচ্ছবৎ পশ্চাদ্দেশে লম্বমান।

আবার কোন মাতব্বর পুরুষপুঙ্গব পরম গম্ভীর চালে চলিয়া আসিতেছেন, তাঁহার মাথায় একটা স্ত্রীলোকের টুপি—উল্টা করিয়া পরা,—শুধু এই, আর কিছু নহে। তাঁহার পশ্চাতেই আর একজন আছেন তাঁহার গলায় একটা পেণ্টলুনের পায়া জড়ান, সর্ব্বাঙ্গে আর কোন বস্ত্রের বালাই নাই; তাহার পশ্চাতে আর একটি ভদ্রলোকের দর্শন পাওয়া যাইতেছে তাঁহার গলায় সুধু একটা ড্যাড়বে নেক্‌টাই।

ইহাদের সকলেরই মুখচ্ছবি আত্মপ্রসাদে দীপ্তিমান—কোথাও যে কিছু অসংলগ্নতা হইয়াছে সে বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহারা পরস্পরের প্রাত মুগ্ধভাবে চাহিয়া দেখিতেছে এবং স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের সাজের উপর নানারূপ টীকাটীপ্পনি করিতেছে, যেন তারা চিরকালই খ্রীষ্টীয় জগতে বাস করিয়া আসিয়াছে এবং গির্জ্জা সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য জানিয়া লইয়াছে।

দৃশ্যটি এরূপ অসম্ভব অদ্ভুত হইয়াছিল, বিশেষতঃ যখন প্রকাশ্য সভাস্থলে তাহারা পরস্পরের সহিত বস্ত্র বিনিময় করিয়া বেশবিন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু করিল তখন এমন প্রচণ্ড হাস্যরসের কতকগুলি উপসর্গ ঘটিতে লাগিল, যে মিসনরিরা আর আত্মসম্বরণে পরাঙ্মুখ হইয়া চট্‌পট্ স্বস্তি বচন বলিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

মার্ক টেুন তাঁহার গ্রন্থে উক্ত হনলুলুবাসীগণের "Full Church Dress"এর যে ছবি দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বাঙ্গালী বালকগণের "Full National Dress" নাম দিয়া বিগত কংগ্রেসের রিপোর্টে এই ছবিটি সংযোগ করিলে বড় বেশী সত্যের অপলাপ হইবে না।



কেন এ বিড়ম্বনা? কেন এ আত্মাপমান? শুভ্রধুতি, শুভ্র উত্তরীয় ও প্রকৃতিমাতার স্বহস্তের দান সুন্দর কেশদামের শিরোভূষণ বঙ্গবালকের ছিল নাকি?

ধুতি চাদর যদি অঙ্গ-আবরণের পক্ষে সকল সময় পর্য্যাপ্ত মনে না হয় তবে আর কোন জাতীয় বেশ উদ্ভাবিত হউক, কিন্তু যতদিন তাহা না হয় ততদিন ধুতিচাদর পরিত্যাজ্য হইতে পারেনা। তুমি সুমহৎ কৌন্সিলিই হও আর জজ ম্যাজিষ্ট্রেটই হও, যতদিন জাতীয় সভায় জাতীয় বেশ পরিধান করিয়া আসার সাহস না হইবে ততদিন তোমার পেট্রিয়টিজম্ সম্পূর্ণ হইবে না।

একজন আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার তাঁহার "ন্যাশনাল লাইফ অ্যাণ্ড্ ক্যারাক্‌টার" নামক গ্রন্থে "পেট্রিয়টিজম" এর যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা আমাদের বিলাতফেরৎ এবং তদনুকারী পেট্রিয়টপ্রবরগণের অবধেয় :—

"Patriotism is now the feeling that binds together people who are of the same race, or who at least inhabit the same country, so that they shall try to preserve the body politic as it exists and recover for it, what it has lost, or acquire what seems naturally to belong to it. It seeks within the country to procure the establishment of the best possible order. It enjoins the sacrifice of property, liberty, life for the attainment of these object. *It favours the existence of whatever is peculiar and local, of a distinctive literature, manners, dress and character.* When it conceives the common country to be weak, it tries to discard every foreign element as dangerous ; and when it is conscious of its strength, it tries to assimilate what is best from abroad."

সাবিত্রী লাইব্রেরীর কোন এক অধিবেশনে একজন বক্তা তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটি ভারি হৃদয়গ্রাহী কথা বলিয়াছিলেন শুনিয়াছি। তাহার ভাবার্থ যতদূর মনে আছে লিখিতেছি :—"আমরা সব বিষয়ে যদি ইংরাজের অনুকরণ করিতে পারি তাহাতে ত ক্ষতি নাই, কিন্তু পারি কৈ? আমার এক ইংরাজ বন্ধু একবার এক প্রখর গ্রীষ্মের দিনে ভারি কষ্ট পাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম 'আপনার জামাজোড়া শীত দেশেরই উপযোগী, যখন এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিতেছেন তখন এখানকার উপযোগী কাপড়ই পরিধান করুন না, ভারতবর্ষে ভারতীয় বেশ ধারণ করুন অনেক আরাম পাইবেন।' ইংরাজ বলিলেন 'তাহা পারি না; গ্রীষ্মহেতু যতই কষ্ট সহ্য করিতে হয় সহিতে প্রস্তুত আছি; তাই বলিয়া জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি।' ইংরাজী কাপড় পরায় ইংরাজের অনুকরণ হয়না, ইংরাজী কাপড় না পরায় ইংরাজের অনুকরণ হয়।" জাতীয় মহাসভার নেতাগণের একথাটা কতদিনে হৃদয়ঙ্গম হইবে?

সুখু

(১)

সুখুর যে কবে বিবাহ হইয়াছিল, তাহা তাহার একটুকুও মনে নাই। লোকের কাছে শুনিয়াছে অতি অল্পবয়সেই হইয়াছিল। লোকের কাছে না শুনিলে বোধ হয় সে জানিতেও পারিতনা যে তাহার বিবাহের ৭ দিন পরেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। বিধবা হইয়াছে বলিয়া যে তাহার বিশেষ কিছু কষ্ট হইত এমত বোধ হয় না; সে আর সকলেরই মত খায় দায়, কাজ কর্ম্ম করে, নদীতে বাসন মাজিতে স্নান করিতে যায়—আর হয়ত দ্বিপ্রহরে কাজকর্ম্ম হইয়া গেলে বাড়ীর সম্মুখে বটগাছতলায় বসিয়া কত কি ভাবে, কোন কোন দিন বা বৃক্ষমূলে মাথাটি রাখিয়া সমীরণের মৃদু শীতল সঞ্চালনে ঘুমাইয়া পড়ে—কত সুখ স্বপ্নদেখে,—শেষে তাহার কাকীর কর্কশ ভর্ৎসনা খাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

স্বামীর অভাব ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও তাহার কষ্টের অভাব [illegible] সে বাপ মায়ের বড় আদরের মেয়ে ছিল—তাই তাহার অত [illegible] শুনা যায় সুখুর বাপ সুখুর বিবাহে সাধ্যাতীত খরচ [illegible] দশ টাকা খরচ হইয়াছিল; কত কুটুম্ব [illegible] ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়—বাপ মায়ের [illegible] বাপ মা থাকা [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়া [illegible] অন্যের মত পরিত্যা[illegible] নাই—মৃত্যুর সময় কাঁদিয়া ছিল [illegible] অনুভব করিতে পারে নাই। রামচন্দ্র (সুখুর [illegible]—একেত মেয়ের মুখের দিকে চাহিলে তাহার [illegible] বুক ভাঙ্গিয়া যাইত,—তবুও কষ্টের ভাগী একজন ছিল—[illegible] সে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। আবার এদিকে অব[illegible] জড়িত (এই স্থানে বলিয়া রাখি যে রামচন্দ্র জাতিতে ধীবর) [illegible] পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার স্বভাবের গুণে তাহার প্রজারা [illegible] বাসিত,—বিশেষতঃ হরিনাথ মাঝির সহিত তাহার বিশেষ সম্ভা[illegible] অপেক্ষাকৃত ভাল—নিজের একখানি নৌকা ছিল, তা ছাড়া [illegible] জো' ছিল। এই হরিনাথের চেষ্টায় ও সাহায্যে রামচন্দ্রের

চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। এক বৎসর ভুগিয়া, সুখুকে হরিনাথের হাতে সঁপিয়া দিয়া ইহলোকের যন্ত্রনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সুখু এবার বেশ একটু শোক পাইল—বেশ বুঝিতে পারিল তাহার স্নেহের আলো জন্মের মত নিবিয়াছে—সে আঁধারে পড়িয়া গিয়াছে।

(২)

নদীর মধ্য হইতে কেবল অগণিত শ্যামল বৃক্ষাবলীই দেখা যাইত, ঘর বাড়ী বড় একটা দেখা যাইত না। বৃক্ষবল্লরীগুলি যে স্নেহের স্নিগ্ধ কোলে ঘরগুলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা নদীর ধার হইতে একটু হাঁটিয়া ভিতরে প্রবেশ না করিলে, বুঝা যাইত না। সকালে সন্ধ্যায় জল আনিবার, স্নান করিবার জন্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নদীরধারে একটু ভিড় হইত, তাহাতেই বেশ বুঝা যাইত ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের সারির মধ্যে গ্রাম আছে! গ্রামে দুই চারি ঘর ভদ্র লোকও আছেন, তন্মধ্যে বোসেরাই একটু সম্পন্ন, তাঁহারাই গ্রামের [illegible] াহাদের বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব হয়, গরীব লোকেরা বৎসরের মধ্যে ২।৩ [illegible] ময় মুখ দেখিয়া তাঁহাদিগকে ধন্য ধন্য করে—একটা রাজা বাদসা বলিয়া [illegible] দের বাড়ীর বড় ছেলে, নীরদ বাবু, কলিকাতার কালেজে পড়েন;—তিনি [illegible] রোপকারী। গ্রামের চাষা ভদ্র সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে; তাঁহার [illegible]

হরিনাথ গৃহিণীর ধারালো নখের মিষ্ট আস্বাদন পাইয়া সে স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় চমকিয়া উঠিল, একটু যেন লজ্জিত হইল। হরিনাথ গৃহিণীর তখনও রোষের উপশম হইল না। তাহার ঘোমটার ভিতর হইতে অর্দ্ধোচ্চস্বরে যখন বলিল 'মর্ মর্—তোর কি রঙ্গ দেখাবার আর জায়গা নাই? এখন যাবি নাকি চল্'—তখন, যদিও কাকীর (হরি-নাথের স্ত্রী) মিষ্ট সম্ভাষণগুলি সুখুর এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি স্বপ্নসমুদ্রের সুখলহরীর সহিত তাহার কাকীর সাদর সম্ভাষণের পার্থক্য বিশেষরূপে অনুভব করিল—বড় কষ্টে চক্ষে জল আসিল। কিন্তু আর বেশীক্ষণ থাকা মঙ্গলজনক মনে না করিয়া, ঠাকুর প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিল—প্রণাম করিবার সময় মনে মনে বড় বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিল।

(৩)

প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। তাই সুখুর দেহে যৌবনের ভরপুর জোয়ার লাগিয়াছে। তাহার কাকীর বাক্যবাণ,—প্রহার তাড়না সময়ে সহিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যৌবনের অলস মধ্যাহ্ন যখন দেহে ও মনে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব সুখ-তীব্রতার সঞ্চার করিয়া দিত, তখন জলমগ্ন জীবের ন্যায় আকুলিত হইয়া উঠিত, কোথায়ও কূলকিনারা পাইত না। তাই অবশেষে প্রাণের ব্যথায় অস্থির হইয়া, নিজের হৃদয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি করিল। আগে রাত্রিদিন নির্দ্দয় তাড়না গঞ্জনা ভোগ করিতে করিতে কষ্টের প্রখরতা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন যেন সুখ দুঃখের জ্ঞান অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া আসিল, অভিমানের আবছায়া মনে দেখা দিল—আর কেমন একটা অব্যক্ত অভাব মনে জাগিয়া উঠিল। আগে মা'র খাইলে সুধু শরীরে বেদনা বোধ হইত—সেই জন্যই অধিকতর কষ্ট হইত; আর এখন (এখনও মা'র খাইয়া থাকে) এখন শরীরের কষ্ট যতটা না হউক, মনের কষ্টই বেশী হইত। সে যখন দেখিত তাহার 'আহা' বলিবার কেহ নাই, মনের কথা প্রাণের ব্যথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কহিবার সুবিধা নাই তখন সে মনোমধ্যে স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি করিল। সেখানে তো কেহ তাহাকে মারিতে আসে না গালাগালি দেয় না,—সেখানে সে মৃত বাপ মার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাইত,—আর জমিদার বাড়ীর বড় বাবুকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবার অবসর পাইত। যখন কাকীর নির্ম্মম পাশবিক অত্যাচার অসহ্য বোধ হইত তখন সে তাহার নিভৃত হৃদয় কোটরে প্রবেশ করিয়া কত শান্তি পাইত, প্রাণ কতটা জুড়াইত!

এই রকমে তাহার একটা অভ্যাস জন্মিয়া গেল—সর্ব্বদাই সে অন্যমনস্ক থাকিত, সুতরাং তাহার কাকী তাহাকে আরও যন্ত্রণা দিবার সুযোগ পাইল। কিন্তু এত অত্যাচার যন্ত্রণার মধ্যেও কখন কখন বোসেদের বাড়ী যাইবার সুযোগ হইত। যে দিন বোসেদের বাড়ী যাইত সেদিন তাহার পক্ষে পর্ব্ব বলিয়া বোধ হইত। সে মনের উল্লাসে, দ্রুতগতিতে নীরদ বাবুর মার কাছে কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর কাছে গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে স্বর্গসুখ অনুভব করিত, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। নীরদ বাবুর মা, স্ত্রী, সকলেই তাহার দুঃখমলিন মুখখানি

দেখিয়া ব্যথিত হইতেন, কখন কখন কিছু সাহায্য করিতেন—সে তাহাতেই কাঁদিয়া ফেলিত, অত অনুগ্রহ, অত আদর, অত সুখ তাহার সহ্য হইত না। সে তাঁহাদিগকে দেবী বলিয়া মনে করিত—আর একটু ত, হইবেনা কেন? বড় বাবুরই ত মা, বড় বাবুরইত স্ত্রী?

...বিয়াছে—সে আঁধ...ক ইলিস মাছ ধরিয়া, উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ী আসিয়া, একটু আদর কা... ...কয়া বলিল সুখু—আজ তোকে একটা মাছ দিলাম, তোর যা ইচ্ছা তাই করগে যা;—সুখু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল—একটু ব্রীড়া কম্পিত স্বরে বলিল 'বড় বাবুদের বাড়ীতে দিয়ে আসিগে কাকা?' হরিনাথ বলিল 'তোর যা ইচ্ছা তাইকর্' আর বিলম্ব সহিল না। অমনি মাছটি হাতে করিয়া বোসেদের বাড়ীর অভিমুখে এক রকম ছুটিয়া চলিল। যাইয়া দেখিল নীরদ বাবুর স্ত্রী বারাণ্ডায় বসিয়া বই পড়িতেছেন। আধ কম্পিত স্বরে বলিল 'বৌ ঠাকুরুণ, মা ঠাকুরুণ কোথা?' বৌ বলিলেন 'কেন? তিনি ঐ ঘরে শুয়ে আছেন কি জন্যে চাস্?' সুখু বলিল 'এই একটা মাছ নিয়ে এয়েছি';—এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই সহসা নীরদ বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন মা নাই কিন্তু সুখু সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে,—বলিলেন 'কিরে সুখু যে—বা! বেশ মাছটিতো, আমাদের দিতে এয়েছিস বুঝি? আহা! রৌদ্রে দাঁড়িয়ে কেন? এই বারান্দায় এসে একটু বোস্'—; সুখুর তখন রৌদ্র বৃষ্টি জ্ঞান ছিল না; চোখ মাটির দিকে ছিল কিন্তু চোখে দৃষ্টি শক্তি ছিলনা, কোন্ স্বপ্নরাজ্যে—অব্যক্ত মধুর সুখাবেশে তাহার প্রাণ অবশ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু আবার নীরদ বাবু যখন তাহাকে বারাণ্ডায় বসিতে বলিলেন তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল,—সে লজ্জিত হইয়া ছেঁড়া কাপড় খানির প্রান্ত ভাগ গায়ে একটু টানিয়া দিয়া বারাণ্ডায় যাইয়া বসিল। নীরদ বাবু ঘরের মধ্যে যাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন 'আহা ওকে একখানি কাপড় দাওনা—বেচারী বড় কষ্ট পায় আর কিছু পয়সাও দিও।' স্ত্রী মুখ তুলিলেন—তাঁহার নয়ন কোণে করুণাব্যঞ্জক অশ্রুকণা দেখা দিল—নীরদ বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন—সাদরে স্ত্রীকে বক্ষে ধারণ করিয়া একটি মধুর চুম্বনদান করিলেন, বলা বাহুল্য সুখু সমস্তই দেখিতে পাইতেছিল। এরূপ দৃশ্য সে আর কখন দেখে নাই—এ দৃশ্যের নূতনত্ব, পবিত্রতা, তাহার সুকুমার হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ আনিয়া দিল, শরীর অভূতপূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, ভগবানের পূতপদে দম্পতীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আনন্দ-নীরে ভাসিতে ভাসিতে বাটি ফিরিল। বাটী আসিবার সময় পথে সুখু—বড় বাবু যে তাহাকে অতি মধুর স্বরে 'সুখু' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন তাহাই মনে করিতে করিতে আসিতেছিল! বড় বাবু যে দয়া করিয়া তাহাকে 'সুখু' বলিয়া ডাকেন এই চিন্তায় বড় সুখ পাইতেছিল। হৃদয়ের অসীম প্রীতিপ্রফুল্লতা তাহার চির বিষাদমলিন মুখ খানিতে ঈষৎ হাসির রেখাকারে প্রতিভাত হইতেছিল। কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা যাইতেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যে তাহার হাসি-রেখা, রবিকিরণ প্রতিফলিত জল-বিম্বের ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যাইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

(৪)

সেই দিন সন্ধ্যার সময় সুখু বাসন মাজিয়া, গা ধুইয়া ফিরিয়া আসিতে ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া গেল—পড়িয়া গিয়া অবশ্য গুরুতর ব্যথা পাইল—কিন্তু মুহূর্ত্তেকের পরেই ব্যথার অস্তিত্ব লোপ পাইল। যখন সে দেখিল পাথরের 'থাদা' থানি দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন ভাবী বিপদের আশঙ্কায় তাহার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ!—তাহার কাকী বিড়ালে মাছ খাইলে, দুধ জ্বাল দিবার সময় উৎলাইয়া পড়িয়া গেলে,—বাড়ীর কোন দ্রব্য, যে কোন কারণেই হউক না কেন, হারাইয়া গেলে—অথবা শুধু ঘাট হইতে দেরী করিয়া আসিলে—সুখুর প্রতি যেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকে—আজ তাহার বড় সাধের পাথরের 'থাদা' ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঐ আড়াল হইতে স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছে—আজ আর কি রক্ষা থাকিবে? কিন্তু ভাবিবার অবসরও হইল না। বাটীতে পদার্পণ করিবা মাত্র একটা ঝাউগাছের ডাল লইয়া তাহার উপর ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রথমে উক্ত পদার্থ দ্বারা বিশেষ রূপে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিল,—সমস্ত অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, সুখুর মাথা ঘুরিতে লাগিল— তথাপি সুখু একটি কথা কহিল না, কাঁদিল না—ভাবিতে লাগিল তাহার নিজেরইত অন্যায় হইয়াছে, সে পিছলিয়া না পড়িলেত আর থাদা ভাঙ্গিয়া যাইত না। কিন্তু মারিতে মারিতে যখন হাত অবশ হইয়া আসিল তখন হরিনাথ গৃহিণী প্রহার ত্যাগ করিয়া গালাগালি আরম্ভ করিল। এইবার সুখুর মনে বড় লাগিল—সে আজ কাল প্রহার অপেক্ষা গালাগালিকেই অসহ্য মনে করিত—গালাগালিতে সে বড় ব্যথা পাইত। মুখে যাহা আসিল তাহাই বলিয়া গালি দিতে লাগিল। গালাগালি এপর্য্যন্ত অতি কষ্টের সহিত সহ্য করিল। কিন্তু যখন চীৎকার করিয়া তাহার মৃত পিতা মাতার উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল, যখন তাহার ঘাটে প্রত্যহ বেশীক্ষণ থাকা লইয়া তাহার চরিত্রের প্রতি জঘন্য ভাষায় কটাক্ষপাত করিতে লাগিল—তখন আর তাহার সহ্য হইল না—এতকাল সহ্য করিয়াছে আর পারিল না। সে মান অপমান, লজ্জা ভয়, ভবিষ্যৎ—কিছুই বিবেচনা করিল না—সে পাগলের মত হইয়া ভীষণ বেগে তাহার কাকীকে আক্রমণ করিল।

সে আক্রমণ সে সহ্য করিতে পারিলনা—একেবারে ধরাশায়ী হইল—এবং আক্রমণের শেষ দায় যখন সুখু তাহার হস্তে বিষম দংশন করিল—তখন যাতনায় অস্থির হইয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। পাড়াপ্রতিবেশীরা কেহই—অন্ততঃ কৌতূহলপরবশ হইয়াও সেদিকে আসিল না। তাহারা হরিনাথের স্ত্রীকে বিলক্ষণ চিনিত, এবং বোধ হয় হরিনাথই প্রহার করিতেছে এই ভাবিয়া আসিবার কিছু ইচ্ছা থাকিলেও কেহ আর আসিল না। এদিকে হরিনাথ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময় বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার স্ত্রীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া দৌড়াইয়া আসিল। আসিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী নীরব নিশ্চলভাবে উঠানে পড়িয়া আছে—সম্মুখে সুখু দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে।

হরিনাথ-গৃহিণী যখন দেখিল গলা হইতে স্বর বাহির হইবার আর সম্ভাবনা নাই এবং যখন দেখিল সুখুর আয়ত চক্ষু দুটি অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া তখনও ধক্ ধক্ জলিতেছে—তখন ভাবিল আর কেন,—অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য; সেইজন্য নীরব নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল।

হরিনাথ ব্যাপার দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না—সে নিতান্ত নিরীহ—সুতরাং কিছুক্ষণ বুদ্ধি ঠিক করিতেই কাটিয়া গেল—তাহার পর সুখুকে ডাকিল কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। তখন ভয় হইল; ভাবিল, তবে বুঝি তাহার সাধের গিন্নী ফাঁকি দিয়াছে—যাহার সহিত এতকাল একমন একপ্রাণ হইয়া একঘরে বসবাস করিয়াছে—যে হরিনাথের সর্ব্বস্বই ছিল—আজ সেই বুঝি না বলিয়া কহিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গেল—এ চিন্তা হরিনাথের সহ্য হইল না; ভীত কম্পিত কণ্ঠে একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল 'বলি—কেউ কি বেঁচে আছে?'। স্বামীর কণ্ঠস্বরের সাড়া আগেই পাইয়াছিল—কিন্তু একেবারে নিশ্চিত ভাবে যখন তাহা জানিতে পারিল তখন ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল "মা কালীর আশীর্ব্বাদে;—আগে আমায় ঘরে নিয়ে চল—তার পর সব বল্‌ছি"। হরিনাথ কি করে—স্ত্রীকে যথাসাধ্য বহন করিয়া ঘরে লইয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার কান্না আসিল। তাহার গিন্নীর অমন গোলগাল মুখখানির আর সে শোভা নাই—আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু বাহুতে ভীষণদংশনের চিহ্ন দেখিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। যাহা হউক অবিলম্বেই গৃহিণীর নিকট সমস্ত শুনিতে পাইল। যখন শুনিল সুখুর এই কাজ তখন সে লাফ্ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—ক্রোধে চক্ষু জলিতে লাগিল—হাত মুষ্টিবদ্ধ হইল, তাহার স্ত্রী সুখুর নামে কতদিন কতকথা লাগাইয়াছে—বিচারে অসত্য প্রমাণিত হইলেও সামান্য রকমের মুষ্টিপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছু করে নাই। কিন্তু আজ!—আজ প্রত্যক্ষ জলন্ত, ভীষণ প্রমাণ দেখিয়া সে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল। বড় একগাছি লাঠি লইয়া সে বাহিরে আসিল—বাহিরে আসিয়া দেখিল সুখু একজায়গাতে এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে।

এদিকে এতক্ষণ সুখু ভাবিতেছিল 'কি করিলাম!—কেন এমন কাজ করিলাম—কিন্তু কি করিব—যাহা কখনও শুনি নাই তাহাই আজ শুনাইয়াছে অতএব বেশ করিয়াছি। আবার ভাবিল—'না না কাজটা বড়ই খারাপ হইয়াছে—হাজার হউক—এতকাল দুটো করে খেতে দিয়েছে তো;—বাহিরের লোক শুনিলেই বা কি বলিবে—আর যদি বড়বাবু শোনেন? তাহা হইলে? না-না আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি—পায়ে ধরিলেও কি কাকী মাপ্ করিবে না?' এইরূপ ভাবিতেছিল এমন সময়ে প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া হরিনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বলিল 'বেইমান! বজ্জাত্! এতকাল ভাত কাপড় দেওয়ার বুঝি এই ফল? শীগ্‌গির দূরহ—নইলে এক লাঠিতে, তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলব—পাজী নচ্ছার নষ্ট মাগী—বেরো আমার বাড়ী থেকে নইলে—'এই বলিয়া যেমন হাত বাড়াইয়া সুখুকে ধরিতে যাইবে অমনি সুখু পিছু হটিতে হটিতে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

(৫)

চারিদিক অন্ধকার, শুধু শুভ্রহীরকখণ্ডবৎ সহস্র সহস্র নক্ষত্র অন্ধকার আকাশে ঝিক্ মিক্ করিতেছে—বৃক্ষরাজির ঘন সন্নিবেশে আঁধার আরও ঘনাইয়া আসিয়াছে—শুধু জোনাকীর ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র আলো চিক্ মিক্ করিতেছে—যেন কেহ চাঁদনী রাত্রিতে চাঁদের হাসি চুরী করিয়া এই অন্ধকারে বৃক্ষবল্লরীর গায় পুষ্পবৎ ফুটাইয়া দিতেছে। এমন সময় সুদূরবিস্তৃতা নদীর ধারে সুখু ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীর উচ্চ-পাড়,—লোকেরা স্নানাদির সুবিধার জন্য মাটি কাটিয়া ঘাটের মত তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সেই দুরন্ত খরস্রোতা নদীর স্রোতে পাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত; কেহ—বিশেষতঃ অন্ধকারে—একেবারে পাড়ের ধারে দাঁড়াইতে সাহস করিতনা—পাছে পাড় ভাঙ্গিয়া নদীর জলে পড়িয়া যায়। কিন্তু সুখু একেবারে, ঘাটদিয়া নামিয়া, জলের ধারে আসিয়া বসিল। পা দুখানি জলের মধ্যে রাখিয়া মাটির উপরে বসিল। নদীর গভীর কল কল শব্দের সহিত বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ মিলিত হইয়া অন্ধকার রাত্রির ভীষণতা আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছিল। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। ঘাট জনমানবশূন্য—সুধু সুখু সেখানে বসিয়া ;—নদীতে কচিৎ দুই একখানি নৌকার মিটি মিটি আলো দেখা যাইতেছিল। সুখুর ভয় নাই, চোখে জল নাই, বাহ্য জগতে তাহার মন নাই। এই অন্ধকার নিশীথে, বৃক্ষের কোলে বায়ু হিল্লোলিত লতাটির মত তাহার হৃদয় নৈরাশ্যের অন্ধকারে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল। ভাবিতে লাগিল—তাহার কি দোষ হইয়াছে যে এত অল্প বয়সে তাহার স্নেহের বাজার ভাঙ্গিয়া গেল—সে কার কি করিয়াছে যে কেবলই নির্ম্মম আঘাতে এতদিন ব্যথা পাইয়াছে—সংসারে তা'র যে কেউ নাই—কে আছে? বাপ, মা, আর বুঝি যাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল সেও, ওই আকাশের বুকে তারা হইয়া রহিয়াছে।

তাহাকে বুঝি তাহারা ডাকিতেছে—ডাকিতেছে?—না, নিশ্চয়ই রোজ রোজ তাহারা ডাকে,—এতদিন তাহাদের মুখপানে তাকায় নাই বলিয়াই বুঝি আজ একেবারে আশ্রয়-হীনা হইল;—এখন যাইবে কোথায়? ওই—ওই বড় বাবুদের বাড়ী? সেখানে তাহাকে বারমাস থাকিবার জায়গা দিবে কেন? তাঁহারা যে একটু স্নেহ দৃষ্টিতে দেখেন তাহাতেই সে 'আপন হারা' হইয়া যায়—তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট—না,—সেখানে যাওয়া হইবেনা—তবে যাইবে কোথায়? আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা তাহারই দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাঝে মাঝে অদৃশ্য হইতেছে—ভাবিল ওই—ওই বুঝি ডাকিতেছে—আর কেন! ওই খানেই যাই! কিন্তু আকাশে যাওয়া যায় কেমন করিয়া? জলে ডুবিলে? অমনি তাহার একটু জ্ঞান হইল, দেখিল যেখানে সে বসিয়াছিল সেখানে জল হইয়া গিয়াছে, জলের স্রোত কল্ কল্ করিয়া ছুটিতেছে—বুক পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গিয়াছে;—উঠিয়া দাঁড়াইল, কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল—ভাবিল জল কত ঠাণ্ডা;—দুই

করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল—বাতাসের সংস্পর্শে জল হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিতে লাগিল—তরঙ্গের মৃদু আঘাতে তাহার সমস্ত শরীর সিক্ত হইতে লাগিল। শৈশবের অস্পষ্ট মধুর স্মৃতি তাহার মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল—সে তাহার বাপ মায়ের কত আদরের ধন ছিল,—মা তাহাকে কেমন রাত্রিদিন বুকের মধ্যে করিয়া রাখিত, একটু আঁচড়ও তাহার গায়ে লাগিতে দিত না,—'সুখু' বলিতে যে তাহারা অস্থির হইত,—আর আজ সেই সোহাগ, বুকভরা স্নেহ কোথায়? তাহারা যে স্নেহের পক্ষপুটে সংসার যন্ত্রণার প্রখর সন্তাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছিল, এখন তাহারা কোথায় পলাইল? কেন পলাইল? কে তাহাকে স্নেহের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া অন্ধকার, নির্ম্মম, কর্কশ ভূমিতলে ফেলিয়া দিল?—সবই যে কঠিন, সবই যে কর্কশ, তাহার অন্তরে বাহিরে সবই যে অন্ধকার—উঃ কি কঠোব ভীষণতা! হতাশ হইয়া চহিয়া দেখিল—উপরে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে প্রকাণ্ড নদী—চতুর্দ্দিকে সর্ব্বগ্রাসী করাল অন্ধকার, আর বাতাস অধিকতর বেগে বহিতেছে। তরঙ্গের প্রবল আঘাত চোখে মুখে লাগিতে লাগিল;—সহসা—দূরাগত সঙ্গীতের ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল;—কি সুধাবর্ষী তান! ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শ্রুত হইতে লাগিল—নৌকা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

তরঙ্গের তাড়নে, স্রোতের বেগে তাহার জীর্ণ পরিধেয় খানি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, অদূরাগত সুস্বরলহরী বাতাসের সহিত আসিয়া তরঙ্গের অঙ্গে মিশিয়া তাহার নিশ্বাস বন্ধ করিবার উপক্রম করিল—ক্রমে সংগীতের কথা সে বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইল—"ওগো, তারে যে বড় বেসেছি ভাল"—আর বেশী শুনিতে পাইল না, তাহারা কর্ণবদ্ধ হইয়া আসিল।—হৃদয় তরীখানি সেই সুরের সহিত হেলিতে দুলিতে লাগিল—ভাবিল কারে কে ভালবেসেছে? সকলেরইত ভালবাসার লোক আছে—আমার কে আছে? এমন সময় নৌকার অস্পষ্ট ক্ষীণ আলোকে গায়কের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল—দেখিয়াই তাহার প্রাণ যেন কেমন ব্যগ্র হইয়া উঠিল—তাহার বুক ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল নৌকা আরও নিকটবর্ত্তী হইল,—ওকে?—বড়বাবু! শরীর কণ্টকিত হইল, হৃদয় সঙ্গীতময় হইয়া গেল,—জ্যোৎস্নার মৃদু-মধুর, সুখ-শীতল, স্বর্ণরাগরঞ্জিত, তরল রশ্মিরাশিতে হৃদয় ভরপুর হইয়া আসিল, অনন্ত বিস্তৃত ঘননীল হৃদয়াকাশে নীরদ বাবুর দেবতুল্য কান্তি চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, করুণার মোহন হাসি তাহার বুকে জ্যোৎস্নার স্বর্ণশোভা ঢালিয়া দিতেছিল—আবেশে সজল চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল;—আর অমনি নদীগর্ভ আলোড়িত বিধ্বস্ত করিয়া মহাশব্দে পাড় হইতে প্রকাণ্ড মাটির চাপ খসিয়া তাহার উপর পড়িয়া গেল,—সব জ্বালা জুড়াইল।

ইন্দ্র।

নাম। হর্‌সেলের আবিষ্কৃত গ্রহের যখন উরেনস্ নাম রাখা হইয়াছিল তখন জ্যোতির্বিদ্‌গণের বিশ্বাস ছিল যে উরেনসের উর্দ্ধে আর গ্রহ নাই। এই বিশ্রম্ভ বিমূঢ় হইয়া তাঁহারা আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উরেনসের নামে উক্ত গ্রহকে অভিহিত করিলেন। উরেনস্ শব্দতঃ আমাদের বরুণ হইলেও ইনি ইউরোপীয়দিগের ইন্দ্র। কিন্তু যখন উরেনসের উর্দ্ধে আবার এক গ্রহ আবিষ্কৃত হইল তখন তাহার নাম কি হইবে, এই একটি নূতন চিন্তার বিষয় হইল। এখন আর ইহাকে ইন্দ্র বলিতে পারেন না এখন গ্রীকদেবগণের সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বক ইহার নেপ্‌তুন্ নাম রাখিলেন। নেপ্‌তুন্ ইউরোপীয় মতে সাগরাদির অধিপতি, আমাদের পৌরাণিক বরুণের ন্যায়। উরেনস ও নেপ্‌তুন এই দুই গ্রহের সহিত আমাদের এই নূতন পরিচয়; আমাদের পক্ষে উরেনস্‌কে বরুণ ও নেপ্‌তুন্‌কে ইন্দ্র বলায় কোন আপত্তি দেখিনা। এই দুই নাম সম্বন্ধে দাসী নামক মাসিক পত্রিকায় আমার একটি প্রবন্ধ আছে।

গণিতের প্রভাব। মানুষের মানসিক শক্তির পরিমাণ যে কেবল জ্যোতির্বীর কীর্ত্তিস্তম্ভে পাওয়া যায়, ইহা অত্যুক্তি বোধ হয় না। নিরবচ্ছিন্ন গণিত প্রভাবে ইন্দ্রের আবিষ্কার এ তথ্যের জীবন্ত বাগ্‌বিদগ্ধ সাক্ষী। ঘরে বসিয়া খড়ী পাতিয়া বলিয়া দিলেন আকাশের অমুক স্থানে গ্রহ আছে; দূরবীক্ষণ সন্ধান করিলেন অমনই গ্রহ বিদ্ধ হইল! ধন্য নর! মানব তোমার সার্থক নাম।

গ্রহগণের বিক্ষোভ। রশ্মিবৎ সূর্য্য আকর্ষণে সংযত হইয়া গ্রহগণ তৎপরিতঃ বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করেন। এই বৃত্তাভাসের অন্যতর অধিশ্রয়ণে রবির অধিষ্ঠান। সূর্য্যের সামগ্রী গ্রহগণের সামগ্রী অপেক্ষা বহুগুণে অধিক; সুতরাং সূর্য্যের আকর্ষণই গ্রহগণের গতি নিরূপণের প্রধান উপায়। পরন্তু কেবল সূর্য্যই গ্রহগণকে আকর্ষণ করেন না। জগতের প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অতএব প্রত্যেক গ্রহ রবি এবং অন্যান্য গ্রহগণ দ্বারা আকৃষ্ট হন, এবং সমস্ত আকর্ষণের ফলসমষ্টি গ্রহের গতিদ্বারা অভিব্যক্ত হয়। তারাগণের আকর্ষণের ফল কিছুই টের পাওয়া যায় না। তারাগণ বৃহৎ বটে এবং অনেক তারা সূর্য্য অপেক্ষাও বড়, কিন্তু সে সকল অত্যন্ত দূরে আছে, তজ্জন্য সৌর জগতে তাহাদের টান পড়ে না বলিলেই হয়, কারণ আকর্ষণ দূরত্বের বর্গের বিলোমানুপাতী। অতএব গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণ জনিত তাঁহারা ঠিক বৃত্তাভাস পথে গমন করিতে পারেন না, কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ চালিত হন। বৃত্তাভাস কক্ষের এদিক

ওদিক চলাকেই জ্যোতিষীরা বিক্ষোভ বলেন। তাঁহারা গ্রহগণের দূরত্ব এবং সামগ্রীর পরিমান জ্ঞাত হইয়া উপরুক্ত গ্রহগতির বিষমতা যত্নসহকারে, অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে গণিত দ্বারা অবধারিত করিয়া বলিতে পারেন কোন গ্রহ কোন সময় কোথায় থাকিবেন, এবং কোন গ্রহ কোন সময়ে কোথায় ছিলেন।

অজ্ঞাত গ্রহ আবিষ্করণের পদ্ধতি। কক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্ট-বরুণের যে অন্তর, অর্থাৎ বাস্তব ও গণিত বরুণে যে অন্তর, তদ্‌ব্যতীত অজ্ঞাত গ্রহ আবিষ্কার করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না। অতএব অনুসন্ধেয় গ্রহের কক্ষার ও সামগ্রীর পরিমাণ এত ধরিতে হইবে, যে তাহা বিবিধ বিক্ষোভের পর্য্যাপ্ত কারণ বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে। প্রথমতঃ মনেকর অজ্ঞাত গ্রহের যথাসাধ্য সত্যাসন্ন দূরত্ব ধরিয়া তদীয় যথাসম্ভব কক্ষা ও সামগ্রীও কল্পিত হইল। এই কল্পিত সামগ্রী আদির দ্বারা যদি গণিত বিক্ষোভ দৃষ্ট বিক্ষোভ অপেক্ষা অধিক হয় তবে দূরত্ব একটু কম ধরিতে হইবে; কম ধরিয়া মনেকর উক্ত উভয়বিধ বিক্ষোভে যেন অধিক তফাৎ রহিল না। তৃতীয় পরীক্ষার ফল আরও ভাল হইল, এবং পরিণামে দূরত্বের সহিত বিক্ষোভের সামঞ্জস্য হইল, তবেই বাস্তব দূরত্ব পাওয়া গেল। এইরূপে সামগ্রীও নির্ণীত হইতে পারে। আন্দাজ এত সামগ্রী ধরিয়া গণিত করিলে বিক্ষোভ যদি অধিক হয় তবে সামগ্রী পরিমাণ কমাইতে হইবে, এবং যাবৎ না দৃষ্ট ও গণিত বিক্ষোভ একতা পায়, তাবৎ সামগ্রী এদিক্ ওদিক্ করিয়া ধরিলেই পরিশেষে বাস্তব সামগ্রী লাভ হইবে। উৎকেন্দ্রত্ব কক্ষার অবস্থান ইত্যাদি সদৃশ রীত্যনুসারে স্থিরীকৃত হইতে পারে। অতএব বরুণের বিক্ষোভ জনক যে অজ্ঞাত গ্রহ তাহার সামগ্রীর পরিমাণ এবং কক্ষার আকার ও অবস্থান ঠিক করিতে পারিলেই গ্রহ আবিষ্কৃত হইতে পারে:

বরুণের গতির বিসমতা। ম, বোবার্ড পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে নিশ্চয় বুঝিলেন যে বরুণের অবস্থানে দৃগগণিতৈক্য হয় না, অতএব উক্ত গ্রহের এক শুদ্ধ সারণী প্রস্তুত করিবার মানসে যত্ন ও সাবধান পূর্ব্বক ১৮২১ অবধি উপর্য্যুপরি বেধ আরম্ভ করিলেন। ১৭৮১ অব্দে বরুণ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ফ্লামষ্টীড যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং উক্ত আবিষ্কৃতির পর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্বিদ্‌গণ যে সকল বেধ করিয়াছিলেন, সমস্ত কাগজ পত্র বোবার্ডের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি ১৭৮১ অব্দের পূর্ব্বের ও পরের উভয় কালের পর্য্যবেক্ষণের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে বৃত্তাভাস কক্ষের সহিত কোনটিরই সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু উভয় কালের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উভয়বিধ বৃত্তাভাস প্রাপ্তি হয়, একমাত্র বৃত্তাভাস উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অবস্থায় তিনি অগত্যা পূর্ব্ববেধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আধুনিক বেধ আশ্রয়ে ১৮২১ অব্দে এক সারণী প্রচার করিলেন; বেধলব্ধ গ্রহ ও গত ৪০ বৎসরের গণিত গ্রহ একতা পাইল; কিন্তু ১৭৮১এর পূর্ব্বের এবং ১৮২১এর পরের দৃষ্ট গ্রহের অবস্থান উক্ত টেবেল দেখিয়া গণিত করিলে মিলিল না।

বোবার্ডের নির্দ্দিষ্ট কক্ষা হইতে বরুণ বর্ষে বর্ষে, উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বিচ্যুত

হইতে লাগিলেন। ১৬৯০ হইতে ১৭১৫ পর্য্যন্ত গণিত বরুণ অপেক্ষা বেধলব্ধ বরুণ অগ্রে ছিলেন। ১৭১৫ এর পর ১৭৭১ পর্য্যন্ত বেধলব্ধ বরুণ অত্যন্ত পশ্চাতে ছিলেন। ১৭৮১ হইতে ১৮২২ পর্য্যন্ত বাস্তব বরুণ গণিত বরুণকে পশ্চাৎ ফেলিয়া চলিয়াছিলেন। ঐ ১৮২২ এ বরুণেন্দ্র যোগ হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহারা উভয়ে একরাশিস্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলে যুগপৎ দুইগ্রহ দূরবীক্ষণের ক্ষেত্র মধ্যে দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইতেন। ইহার পর গণিতাগত বরুণ বেধলব্ধ বরুণকে অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। ১৮৩০ অব্দের আসন্ন সময়ে উভয়ের অন্তর চাপাত্মক ১৮″ হইয়াছিল, ১৮৫৩এ ৩২″ ১৮৩৮ সে ৫৩″ ১৮৪০ এ ৮৭″ এবং ১৮৪১ এ ৭২″ হইয়াছিল। ১৮৪০ হইতে ইন্দ্রের গতির ক্রমবৃদ্ধি বশতঃ অন্তরের হ্রাস হইতে লাগিল, অবশেষে ১৮৪৫এ বোবার্ডের গণিত বরুণ এবং বাস্তব বারুণ একতা প্রাপ্ত হইল। ১৮২২ এর পূর্ব্বে এবং পরে বাস্তব ও গণিত বরুণের এই দ্বিবিধ গতি দেখিয়া কোন জ্যোতিষীর মনে উদয় হইল না যে বরুণের ঊর্দ্ধ আকাশে অবস্থিত কোন গ্রহবিশেষের আকর্ষণ প্রযুক্ত এই ব্যাপার ঘটিতেছে।

যে সমস্ত অন্তরের উল্লেখ করাগেল তাহা জ্যোতিষী ভিন্ন অন্যের চক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎ কর। আকাশে যদি দুইটি কল্পিত তারা চলিত একটী গণিত বরুণের স্থলে আর একটি দৃষ্ট বরুণের স্থলে, তাহা হইলে যাহার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তিনিও তারাদ্বয়ের ব্যবধান না দেখিতে পাইয়া উভয়কে এক তারা জ্ঞান করিতেন; এমন কি ১৮৪০ অব্দেও তাঁহার সেই ভ্রম ঘটিত।

বরুণের অনুসন্ধান। এই সকল বিষমতা দেখিয়া ডাক্তার হস্‌সী ১৮৩৪ অব্দে রাজ জ্যোতিষী এআরির নিকট প্রস্তাব করিলেন যে যদি কোন সুদক্ষ গণিতজ্ঞ বলিতে পারেন যে বরুণের ঊর্দ্ধে নভোমণ্ডলের অমুক প্রদেশে গ্রহবিশেষ থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এআরি তাঁহার প্রস্তাবে মনোযোগ করিলেন না, বরং বলিলেন যে বরুণের গতিতে এমন কোন বিষমতা দৃষ্ট হয় না যে তাহা গ্রহবিশেষের আকর্ষণের ফল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে বোবার্ডের সহিতও তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। বোবার্ড যদিও বহিস্থ গ্রহবিশেষের অস্তিত্বে অবিশ্বাস প্রকাশ করিলেন না তথাপি তিনি গণিত বিশারদ হেনসেনের অমত দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন।

১৮৪৫ অব্দে ইংলণ্ডের মিষ্টার আদমস্ এবং ফ্রান্সের ম, লেবেরিএ উভয়ে স্বতন্ত্র ভাবে বরুণের গতির বিষমতার কারণ নিরূপণ জন্য তদীয় কক্ষার ঊর্দ্ধভাগে কোন গ্রহ আছে কিনা, এবং যদি থাকে তবে তাহার পরিমাণ কত ইহারই তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। জ্যোতিষ অনুরাগী অনেকেই এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু যথোচিত সাধন ও অধ্যবসায় অভাবে অনেকেই আফলোদয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসনস্থ থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে ১৮৪৫ অকটোবর মাসে যখন আদমসের গণিত পত্র গ্রীনুইচে উপনীত

হইল তথন এআরি এই চিরাপেক্ষিত ব্যোমচরের পত্রগত অবস্থান দেখিয়া চমকিত হইলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে তত্ত্বকে নিষ্প্রয়োজন এবং যাহার ফলকে আকাশ কুসুম জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করিয়াছিলেন, তাহাকে আজ স্বচক্ষে দেখিয়া কোন মুখে ইন্দ্রায় স্বাহা বলিয়া আহুতি প্রদান করিবেন। এআরি নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার চেষ্টায় এবং আদম্‌সের বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষার স্বরূপে বলিলেন যে আদম্‌স কি শ্রাবণিক বিক্ষোভের কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম? কথাও মিথ্যা নহে যে এই অনতিবিলম্বে আবিষ্কর্ত্তব্য গ্রহের কেবল ভোগ সম্বন্ধে যে বিক্ষোভ তাহাই আদম্‌স বেধ ও গণিত দ্বারা অবধারিত করিয়া ছিলেন। সূর্য্য হইতে ইন্দ্র কতদূরে আছেন তাঁহার তাৎকালিক পত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লেখিত ছিলনা। এখন রাজ জ্যোতিষীর মানসিক বিক্ষোভ জন্য বারুণ বিক্ষোভের এই নবীন গবেষক পিছাইয়া পড়িলেন। লোকে বলে আদমসের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত ছিলনা। ভগ্নোদ্যম না হবেন কেন? এআরি বয়সে দুন, মানে শতগুণ। আদম্‌স যদি স্বীয় গণিতের শুদ্ধত্বের উপর জিদ্ করিতেন, তবে সরকারি বেধালয়ে তাঁহার চাকরি হওয়া ভার হইত। যাহা হউক আদম্‌স ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন। ইনি শ্রাবণিক বিক্ষোভ গণিত করিয়া ছিলেন এবং রাজগণককে যথোচিত উত্তর দিতেও পারিতেন; কিন্তু তিনি দেন নাই। ইতিমধ্যে ১৮৪৬ এর মাঝামাঝি লেবেরিএ প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার সমস্ত গণিত শেষ হইয়াছে এবং তিনি দেখিয়াছেন যে আদম্‌সের গণিতের সহিত তাঁহার গণিতের একতা আছে; এআরির মুখে আর কথা নাই, তিনি অবাক হইলেন। আদম্‌স যে এরূপ গণিত করিবার উপযুক্ত পাত্র তাহা এআরির বিশ্বাস হইল না। তিনি কাগজ পত্র দেখিলেন, বিষয়টি সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াও বুঝিলেন, কিন্তু অসূয়াবশতঃ হউক, বা অন্যকোন কারণ প্রযুক্ত হউক, আদম্‌সের কাগজ অপ্রকাশিত রহিল।

এ দিকে পারিনগরে সুদক্ষ গণিতজ্ঞ লেবেরিএ অতি সুন্দর শৃঙ্খলা পূর্ব্বক বরুণের গতিবিষয়ক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ মনে করিলেন যে দৃষ্ট গ্রহে এবং গণিতাগত গ্রহে যে অন্তর তাহা বোবার্ডের উপপত্তির এবং তৎকৃত সারণীর অশুদ্ধতা প্রযুক্ত ঘটিতেছে কিনা তাহা দেখা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি শনির ও বৃহস্পতির আকর্ষণ জনিত বরুণের যে বিক্ষোভ জন্মে তাহার এবং উক্ত টেবেলের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুনর্ব্বার গণিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে ভুল অনেক ছিল বটে কিন্তু সে সকল পরিমাণে এত কম যে তদ্দ্বারা উল্লিখিত ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা ছিলনা।

দ্বিতীয় কথা এই যে শনির ও বৃহস্পতির আকর্ষণের ফল ধরিয়া এমন কোন কক্ষা কল্পনা করা যাইতে পারে, যে তদ্দ্বারা আধুনিক দর্শনের সহিত মিলিতে পারে কিনা। তাহাও হইল না, কারণ কল্পিত কক্ষার উভয় পার্শ্বের এরূপ ভঙ্গি হইয়া পড়ে, যে তাহা দেখিলে বেধের অসম্ভব ভুল স্বীকার করিতে হয়। এখন যদি এই বিক্ষোভ কোন অজ্ঞাত গ্রহের আকর্ষণ জনিত হয়, তবে তাহা কোথা আছে এই চিন্তা হইল। ইহার কক্ষা বরুণ ও

শনির মধ্যে হইতে পারেনা, কারণ তাহা হইলে মণ্ডলের বিশালত্ব ও গুরুত্ব প্রযুক্ত বরুণের কক্ষা ও শনির কক্ষা উভয়ই বিচলিত হইত এবং অনেক দিন পূর্ব্বে প্রকাশ পাইত; অতএব সিদ্ধ হইল যে অজ্ঞাত গ্রহ বরুণের ঊর্দ্ধে আছে।

আবিষ্কার। ১৮৪৬ অগষ্ট মাসে লে বেরিএ অন্বেষ্টব্য গ্রহের অবস্থান বিষয়ক তৃতীয় পত্র প্রচার করিলেন। এবার উহার ভোগ ও বিক্ষেপের গণিত সবিশেষ যত্নসহকারে সিদ্ধ হওয়াতে নভোমণ্ডলের কোন্ স্থান লক্ষ করিলে দূরবীক্ষণের ক্ষেত্র মধ্যে গ্রহ দৃষ্ট হইবে তাহা বেশ বুঝাগেল। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে লেবেরিএ বরলিন্ নগরে জ্যোতির্বিদ এঙ্কে পত্রদ্বারা অচিরে আবিষ্কর্ত্তব্য গ্রহের জ্ঞাতব্য কতিপয় প্রধান প্রধান বিষয় অবগত করাইয়া, দৌরবীক্ষণিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিলেন। আদম্স্ ও লে বেরিএ উভয়েই নিরূপণ করিয়াছিলেন যে ইষ্ট গ্রহের বিষুবাংশ ২১ ঘণ্টা অর্থাৎ তৎকালে উহা শায়ান কুম্ভের মাঝামাঝি ছিল। এখন সৌভাগ্য বশতঃ বরলিন্ বেধালয়ে তৎকালে কুম্ভের অন্তর্গত তারা পুঞ্জের চিত্র ছিল ঐ রাত্রিতেই এঙ্কের সহকারী গল আদিষ্ট আকাশ নিরীক্ষণ করিবা মাত্র তারার ন্যায় একটি জ্যোতিষ্ককে অপরিচিতের মত বোধ করিলেন, এবং দেখিলেন নক্ষত্র চিত্রে বস্তুতঃ উক্ত জ্যোতিষ্ক নাই। অনন্তর ২৪ সেপ্টেম্বর পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সকল সন্দেহ দূর হইল। এবং ঐ অষ্টম শ্রেণীর তারা অতি-বরুণ গ্রহ বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারের সংবাদ তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। লেবেরিএর যশোকীর্ত্তনে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। তিনি কীর্ত্তিশৈলের উত্তুঙ্গ শিখরোপরি অধিরূঢ় হইলেন। কোন কালে, কোন দেশে, কোন জ্যোতিষী এতাদৃশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ব্যাপারটি যেন বিস্ময়রসাত্মক নাটকাঙ্কের অভিনয় বিশেষ! জ্যোতিষীর কি অনুপমা মূর্ত্তি— গভীর চিন্তা সাগরে মগ্ন! পক্ষাতীত, মাসাতীত, ধ্যানের ভঙ্গ নাই। আবিষ্কর্ত্তব্য গ্রহের উদ্দেশে অন্তরীক্ষের প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। কেবল অঙ্কমালা নিরীক্ষণ। দূরবীক্ষণ নাই, ভাস্করের ন্যায় তাঁহার "ধীরেকং পরমার্থিকং যন্ত্রং।" আয়াস সহকারে, গণিত কৌশলে অঙ্কপংক্তির ন্যাস, বিন্যাস করিতেছেন। সাধন হইতে সাধনান্তর, পথ হইতে পথান্তর অবলম্বন করিতেছেন। উত্তরোত্তর অধিকতর আলোক লাভে পথভ্রমের আর আশঙ্কা রহিল না। ক্রমে ক্রমে মেঘ অপনীত হইল এবং পরিশেষে অঙ্করাশি মধ্যে যেন সুদূর অন্তরীক্ষে ইষ্ট গ্রহ ঝিক ঝিক করিতে লাগিল। গণিত শেষ হইল, লে বেরিএ সিদ্ধ হইলেন। আদিষ্ট আকাশে যন্ত্র সন্ধান হইল, গ্রহ যেন মন্ত্রাহূত হইয়া দৃষ্টিক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল।

এই আবিষ্কার পাঠে ভূগোলার্দ্ধ-আবিষ্কারে ধৃতব্রত, পোতারূঢ় কলম্বসের প্রতি কবিকাব্য স্মরণ হয়।

নির্ভয়ে, নাবিক বীর! চালাও জাহাজ
অস্তাচল অভিমুখে। না থাকিলে ভূমী,

যশোধন ! প্রতিভার মর্য্যাদার তরে,
প্রকৃতি ধরিয়া আদি-বরাহের রূপ,
উদ্ধারিবেন্ ধরণী সাগর-গর্ভ হতে।

' লেবেরিএর তপস্তুষ্টা আদ্যাশক্তি যেন একটি গ্রহ গড়িয়া দিলেন।

লেবেরিএর যশোঘোষণায় উন্মত্ত ফরাসিকেরা যখন গগণ প্রতিধ্বনিত করিতে ছিলেন তখন ১৮৪৬,৩ অকটুবর তারিখে সারজন হরসেল্ এথেনিয়ম পত্রিকায় আদম্সের গবেষণা প্রচার করিলেন এবং আদমস্ যে এ যশের স্বত্বাধিকারী তাহাও সপ্রমাণ করিলেন। অনেক তত্ত্বানুসন্ধানের পর অনেক বাদানুবাদের পর আদম্সের যশোভোগের সমসত্ব দৃঢ়ীকৃত এবং সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইল। ফরাসিকেরা প্রথমতঃ স্বদেশীয়ের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ পূর্ব্বক আদম্সের অধিকার অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে রাজজ্যোতিষী এআরি আদম্সের অধিকার পক্ষে বিস্তর প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলেন। তজ্জন্য অনেকে মনে করিয়া ছিলেন যে এই কল্পানুস্থায়িনী কীর্ত্তি আদম্সের। প্রকৃত পক্ষে আদম্স এবং লে বেরিএ উভয়েই অতুল যশোলাভ করিয়া ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। আমেরিকেয়েরা এই মহতী আবিষ্কৃতিকে আকস্মিক বলিয়া যে উপেক্ষা প্রকাশ করেন তাহা অভদ্রোচিত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

এই গ্রহের নাম রহিল নেপতুন। আমরা ইহাকে ইন্দ্র বলিব।

নেপ্তুনের মূলাঙ্ক। আদম্সের, লে বেরিএর, ও বাস্তব বক্রণের মূলাঙ্কে কত ভেদ তাহা নিম্ন তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

	বাস্তব নেপ্তুন	লে বেরিএর নেপ্তুন	আদম্সের নেপ্তুন
কাল	১ জানুআরি,১৮৩৭	১ জানুআরি ১৮৪৭	৬ অক্টোবর ১৮৪৬
মধ্যমভোগ	৩'৮° ৩২',৭	৩.৮° ৪৭',৪	৫২৩° ২'
মধ্যম দূরত্ব	৩০,৫৪	৩৬-,১৫৩৯	৩৭, ২৪৭৪
উৎকেন্দ্রত্ব		০০৮৮৯৯	০ ১০৭৬১০ ০১২০৬:৫
পরিহৈলিকের ভোগ	৪৬,° ৯'	২৮৪°৪৫'৮	২৯৯°১১'
সামগ্রী (রবির১)	০,০০০০৫১৬	০,০০০ ১০৭২৭	০,০০০১৫০০৩

এই ত্রিবিধ অঙ্কশ্রেণী দেখিয়া বোধ হয় যেন মূলাঙ্কগুলি তিনটি স্বতন্ত্র গ্রহের উপকরণ, সুতরাং পরস্পর সম্বন্ধ বিহীন। তা বলিয়া লেবেরিএ বা আদম্সের আবিষ্কার সিদ্ধ হইল না বলা যাইতে পারে না। আবিষ্কার সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভেদের কারণ্ কেবল দূরত্ব ৩০ না ধরিয়া ৩৬ বা ৩৭ ধরা হইয়াছে। এই এবং সদৃশ সম্পাত্তে দূরত্ব কল্পনা করিয়া সামগ্রী গণিতে হয় বা সামগ্রী কল্পনা করিয়া দূরত্ব গণিতে হয়। দূরত্ব অধিক ধরিলে সামগ্রী অধিক ধরিতে হয় এবং কম ধরিলে, কম ধরিতে হয়। যাহা হউক গ্রহের অবস্থান সম্পূর্ণরূপে গণিত কক্ষাধীন নহে।

ইন্দ্রের বর্ণনা। রবি পরিতঃ ইন্দ্র ৬০১২৬ দিনে বা ১৬৪,৬ বৎসরে একবার ভ্রমণ করেন। ইহাঁর মধ্যম দূরত্ব ২৭৪,৬২,৭১,০০০ মাইল, অপহৈলিক দূরত্ব ২৭৭,০২,১৭,০০০ মাইল, এবং অনুহৈলিক দূরত্ব ২৭১,২৩,২৫,০০০ মাইল। গ্রহটি শুধু চক্ষে দেখা যায় না। ইহার জ্যোতি অষ্টম বা নবম শ্রেণীর তারার সমান। তেজস্বী দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বিম্ব হরিতাভ এবং চাপাত্মক পরিমাণে ২,''৬ দেখায়। মণ্ডলের উপরিভাগে কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যাস পরিমাণ ৩৪,০০০ মাইল, ১০০০ মাইল কম বেশি হইবার সম্ভাবনা ইহার পিণ্ড ভূপিণ্ড অপেক্ষা ৮২ গুণ অধিক। সামগ্রী ভূ সামগ্রীর ১৮ গুণ, সান্দ্রত্ব ,২২। ইন্দ্রের কতক্ষণে আক্ষ্যাবর্ত্তন হয় তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। ঐন্দ্রালোকের বর্ণপট্টিকার ব্যাকৃতি সহকারে অবগতি হইয়াছে যে তন্মণ্ডল এবম্ভূত বায়ুবৎ পদার্থে আবরিত যে তদ্দারা তত্রত্য স্তোকালোকেরও কিঞ্চিৎ নিপীত হয়। উহাতে পার্থিব গ্যাসের ন্যায় কোন পদার্থ নাই; বরং বারুণিক বায়ুমণ্ডলের ভৌতিক পদার্থের রাসায়ণিক সংযোগের সহিত উহার বিশিষ্ট সাদৃশ্য আছে। দেখিলে প্রভাকর বিম্বের ব্যাস আমরা যেমন দেখি তাহার ৩০ ভাগের এক ভাগ দেখায়; এবং মণ্ডলের পৃষ্ঠ পরিমাণ, সুতরাং আলোক ও তাপের পরিমাণ, ৯০০ অংশের একাংশ মাত্রে পরিণত হয়। চণ্ডরশ্মির তেজের এত খর্ব্বতা হইলেও ঐন্দ্রিকগণ সম্বন্ধে তিনি কেবল তারাবৎ প্রতিভাত হন না। এত দূরেও তাঁহারা ৪ কোটি প্রথম শ্রেণীর তারার আলোকের সমান আলোক উপভোগ করেন। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে ইন্দ্রলোক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ও তুষারময়। তথা না আছে আলোক না আছে তাপ। ইন্দ্র হইতে নিরীক্ষণ করিলে পৃথিবী মোটে দেখা যায় না; বুধ শুক্রের তো কথাই নাই। বৃহস্পতিও দেখা যায় না; শনিকে একটি ক্ষুদ্র তারার ন্যায় রবির ১৮° মধ্যে দেখা যায়।

ইন্দ্রের উপগ্রহ। ইহার উপগ্রহ লাসেন কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উপগ্রহের বিম্ব এত ছোট যে তাহার পরিমাণ করা অসাধ্য। জ্যোতি দেখিয়া বোধ হয় ইনি আমাদের চাঁদ অপেক্ষা কিছু বড় হইবেন। মূল গ্রহের ২,২৩,০০০ মাইল অন্তরে থাকিয়া ৫ দিন ২১ ঘ, ২ মি, ৭ সেকেণ্ডে পরিভ্রমণ করেন। ইহার কক্ষা ক্রান্তিবৃত্তে ৩৪° ৫৩' পরিমাণে অবনত। ইহার গতি বক্রা অর্থাৎ যে দিকে ইন্দ্র চলেন তাহার বিপরীত দিকে ইহা চলে।

বোডের নিয়ম আর খাটে না। ইন্দ্রের আবিষ্কারের পর দেখা যাইতেছে যে গ্রহগণের দূরত্ব সম্বন্ধে যে বোডের নিয়ম তাহার বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, যথা

গ্রহ	বাস্তব দূরত্ব	বোডের নিয়ম	অন্তর
বুধ	৩·৮৭	৪	০ ১৩
শুক্র	৭·২৩	৭	০·২৩
পৃথিবী	১০,০০	১০	০·০০

মঙ্গল	১৫২৪	১৬	০.৭৬
ক্ষুদ্র গ্রহগণ	২৭.৩৯	২৮	০.৬১
বৃহস্পতি	৫২.০৩	৫২	০.০৩
শনি	৯৫.৩৯	১০০	৪.৬১
বরুণ	১৯১.৮২	১৯৬	৪.১৮
ইন্দ্র	৩০০.৬৯২	৩৮৮	

রবির নিকটস্থ গ্রহ সম্বন্ধে বোডীয় ও বাস্তব দূরত্বে অধিক অন্তর দৃষ্ট হয় না। শনি, বরুণ, ও ইন্দ্রের বিষমতা দূরত্বে বিস্তর।

ইন্দ্রমণ্ডলে জীবের অস্তিত্ব। গ্রহযাত্রায় এই আমাদের শেষ তীর্থ—সৌর জগতের এই অন্ত্যসীমা। তাপ ও আলোকের স্বল্পতা প্রযুক্ত ইন্দ্রমণ্ডল জীব জন্তুর পক্ষে বাসের অযোগ্য ইহা মনে করা যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রকৃতির কার্য্য এবং অভিপ্রায় দর্শন করিলে এরূপ কল্পনা অসম্ভব বোধ হয়। অতলস্পর্শ সাগর গর্ভেও জীবাণু বিচরণ করিতেছে। তথা যেমন আলোকের অস্তিত্ব নাই তেমনিই জলের চাপের পরিসীমা নাই। মানসূত্রে সংলগ্ন জীবাণু সাগর গর্ভ হইতে আনীত হইবামাত্র তাপের ও আলোকের তীব্রতা এবং বায়ুর সান্দ্রতা জন্য প্রাণত্যাগ করে। তাহাদের পক্ষে গ্যাসের আলোক ইলেকট্রিক আলোক, বা সূর্য্যের আলোক অথবা সুখসেব্য মলয়মারুত সকলই বিষ। তাহারা সেই অসূর্য্যম্পশ্য সুগভীর জলরাশির অধোভাগে থাকিয়া ঐন্দ্রিকগণের ন্যায় বাস্তব ইন্দ্রলোকের সুখভোগে বঞ্চিত হয় না।

কতিপয় পরিভাষিক শব্দের ইংরাজি।

অতিবরুণ,	Beyond orbit of Uranus	ভোগ,	Longitude.
অবস্থান,	Position.	মিষ্টার আদম্স,	Mr. Adams.
আদৃষ্ট,	Predicted	ম. লে, বেরিএ,	M. Le Verrier.
ইন্দ্র	Neptune.	মান সূত্র,	Fathoming line.
এআরি,	Airy.	রাজজ্যোতিষী,	Royal astronomer.
এঙ্ক,	Encke.	বরুণ,	Uranus.
ক্ষুদ্র গ্রহগণ,	Minor planets.	বরুণেন্দ্রযোগ,	Uranus o' Neptune
গ্রহ যাত্রা,	Journey from planet to planet.	বাস্তব,	Real.
চাপাত্মক,	Angular.	বিক্ষেপ,	Latitude.
ডাক্তার হস্সী,	Dr. Hussi	বিক্ষোভ,	Perturbation.
তথ্য,	Fact.	বিদ্ধ,	Obseved.
দৃগগণিতৈক্য,	Agreement between observation and calculation.	বিলোমানুপাতি,	In inverse ratio.
		বেধ,	Observation.
দূরত্বের বর্গের,	Square of distance.	ব্যাসিক,	Radial.
ন্যাস,	Statement.	সন্ধান কৃ,	To point, to Apply.
পরিভ্রমণ,	Revolution.	সত্যাসন্ন,	Approximately true.
পরিহেলিক,	Perihelion	সাধন,	Solution.
পারি,	Paris.	সামগ্রী,	Mass.
ফ্লামষ্টীড,	Flamstead.	সারণী,	Table.
বরলিন্,	Berlin.	হানসেন,	Hansen.
বোড,	Bode.		

বাঙ্গালার পাটের চাষ।

যদিও পাট ভারতবর্ষের স্বভাব জাত উদ্ভিদ্ কিন্তু ক্রিমিয় যুদ্ধের (১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের) পূর্ব্বে এদেশে ইহার অধিক আবাদ ছিলনা। ভারতবর্ষ অপেক্ষা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে চীন সাম্রাজ্যের হংকং প্রদেশে ইহার আবাদ হইয়া আসিতেছে। আমাদের মধ্যে যে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ আছে তাহা নিশ্চয়ই এই পাটের আঁইস হইতে প্রস্তুত হইত না, কারণ পাটের সূতা অতিশয় কর্কশ ও মোটা। তিসি ও গাঁজা প্রভৃতি গাছের ছাল হইতে যে সমুদয় সূতা প্রস্তুত হয় বোধ হয় তাহা হইতেই এই সকল পট্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

পাটের বোট্যানিক্যাল নাম করকোরস্ ক্যাপসুলারিস্, করকোরস্ অলিটোরিয়স্ (Corchorus Capsularis, Corchorus Olitorius)। ইহার সংস্কৃত নাম ঝাট্। উড়িষ্যায় এখনও ইহাকে ঝোট বলিয়া থাকে। সাধারণতঃ আমরা দুই প্রকার পাট দেখিতে পাই। প্রথম—মিষ্ট পাট, দ্বিতীয়—তিক্ত পাট, যাহাকে কোন কোন স্থানে ললিতা কহে।

বাঙ্গালায় গত বৎসর মোট ২২২৮২০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল (এক 'একর' তিন বিঘার কিছু অধিক)।

সচরাচর সিরাজগঞ্জে, নারন গঞ্জে, দেওড়া ও দেশী এই চারি প্রকার পাট কলিকাতার বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার পাট স্থান বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) বাকরা বাদী—ঢাকা জেলার মেঘনার চরে জন্মায় ও ইহার আঁস নরম ও দেখিতে সুন্দর।

(২) ভাটিয়াল—নারন গঞ্জ মহকুমার দক্ষিণস্থ নদীর চরে জন্মায়। আঁস অত্যন্ত মোটা। দড়ির জন্য প্রায়ই ব্যবহার হয়।

(৩) দেওড়া—ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় জন্মায়। ফরিদপুরের নিকটস্থ দেওড়া নামক স্থানের একটি হাটে এই পাট প্রথমে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয়, তজ্জন্য ইহার নাম দেওড়া হইয়াছে। ইহা অধিকাংশই দড়ির জন্য ব্যবহার হয়।

(৪) দেশী—হুগলি, বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগনা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় উৎপন্ন হয়। ইহার আঁসের বর্ণ যদিও দেখিতে খারাপ কিন্তু ইহা নরম ও লম্বা।

(৫) দেশয়াল—সিরাজগঞ্জের নিকটস্থ চরেও বিলে ইহা জন্মে। এই জন্য ইহাকে চরনা দেশয়াল ও বিলান দেশয়াল কহে। ইহার আঁস শক্ত ও উজ্জল।

(৬) জঙ্গীপুরী—পাবনা জেলায় জন্মে। আঁস ছোট ও শক্ত। কাগজের জন্যই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

(৭) করিমগঞ্জী—মৈমনসিং জেলার করিমগঞ্জ গ্রামে উৎপন্ন হয়। ইহার আঁস শক্ত ও লম্বা।

(৮) মিরগঞ্জি—টিস্‌টার মিরগঞ্জ গ্রামে উৎপন্ন হয়। ইহার আঁস উত্তম নহে।

(৯) নারানগঞ্জি—নারানগঞ্জে জন্মায় ও ইহার আঁস উত্তম।

(১০) সিরাজগঞ্জি—সিরাজগঞ্জে জন্মায়। ইহারও আঁস উত্তম।

(১১) উত্তরিয়া—সিরাজ গঞ্জের উত্তরাংশ হইতে ইহার আমদানি হয় তৎজন্য ইহাকে উত্তরিয়া কহে। রঙ্গপুর, গোয়ালপাড়া, বগুড়া, কুচবেহার ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে ইহা জন্মায়।

নিম্নলিখিত নিয়মে পাটের চাষ করিলে উত্তম রূপ ফসল পাওয়া যায়।

শস্য পর্য্যায়—মটর কলাই প্রভৃতি উঠাইয়া লইবার পরেই সেই জমীতে পাট বুনিলে অধিক ফসল হয়; কিন্তু সাধারণতঃ পাটের জমীতে আর কোনও ফসল না দিয়া প্রত্যেক বৎসরই পাট বুনা হয়।

জমী। বসত বাটীর নিকটস্থ উচ্চ দোরসা জমীতে পাটের চাষ উত্তম হয়। ১ হইতে ৩ ফিট্ পর্য্যন্ত আবদ্ধ জলযুক্ত নাবাল জমীতেও পাটের চাষ লাভজনক। কিন্তু কাঁকর মিশ্রিত পাহাড়ে জমীতে পাটের চাষে কিছুই লাভ হয় না।

জলবায়ু। উষ্ণ প্রধান দেশে ভিজা জমীতেই পাটের চাষ উত্তম হয়।

জমী প্রস্তত। যে সকল নীচু জমী প্রথম বর্ষায় ডুবিয়া যায় তাহাতে যদ্যপি পাটের চাষ করা হয় তাহা হইলে শীতকালে হাল দিয়া সেই সকল জমী প্রস্তত করিতে হয় এবং ফাল্গুন চৈত্রমাসে তাহাতে পাট বুনিতে হয়। এবং উচ্চ জমীতে পাট বুনিতে হইলে বর্ষা আরম্ভ হইলেই জমীতে হাল দেওয়া আবশ্যক। জমীতে সপ্তাহ অন্তর একবার করিয়া হাল দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচবার হাল দিলেই যথেষ্ট হয়। পাট চাষের জন্য গভীর খনন ও মাটী গুঁড়াইয়া ধূলার মতন করা নিতান্ত আবশ্যক। কর্দ্দমযুক্ত জমীর ঢেলা সকল পাট বুনিবার পূর্ব্বে উত্তম রূপে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

সার। যে সকল জমীতে নদীর পলি মাটী পড়ে তাহাতে কোনও সার দিতে হয় না। অন্যান্য জমীতে প্রতি বিঘায় ১৫ মন গোবর সার দিলেই যথেষ্ট হয়।

বপন। ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্তই পাট বুনিবার ঠিক সময়। জমীতে উত্তম রূপে হাল দিয়া, সমুদয় আগাছা বাছিয়া যে দিন বাতাসের জোর অল্প থাকিবে সেই দিন বীজ বুনিতে হয়। সাধারণতঃ প্রতি বিঘায় এক হইতে দেড়সের বীজের আবশ্যক হয়। বীজ সকল মাটীর সহিত মিশাইয়া বুনিলেই উত্তম হয়। সমুদয় জমিতে সমান ভাবে বীজ পড়িবার জন্য বপনকারীকে বীজ ছড়াইতে ছড়াইতে একবার উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ও একবার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ জমীর লম্বালম্বী ও আড়াআড়ী যাইয়া বীজ বুনিতে হয়। বীজ বুনিবার পর তাহাদিগকে মাটীচাপা দিবার জন্য একবার মই দিতে হয়।

পাট বুনিবার পর জমীর পাট।বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থানেই বীজ বুনিবার পর আগাছা

কুগাছা উপড়াইয়া ফেলা ব্যতীত আর কোনও কার্য্য করা হয় না। কিন্তু বীজ বুনিবার ১৫ দিন পরে যখন গাছের শিকড় মাটীতে বসিয়া যায় তখন কেবল বিদার দ্বারা একবার জমী আল্গা করিয়া দেওয়া ভাল। কর্দ্দমময় জমি রৌদ্রে শুকাইয়া যাইলে ঐ রূপে আল্গা করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদিও জলবায়ু ও জমীর অবস্থার উপর নিড়ানি দেওয়া নির্ভর করে কিন্তু সাধারণতঃ ৩।৪ বার নিড়ানি দিলেই যথেষ্ট হয়। গাছ সকল ঘন হইলে পাতলা করিয়া দিতে হয় কারণ ঘন হইলে গাছ সকল রোগা হয় ও অধিক বড় হয় না। কিন্তু যাহাতে অধিক পাতলা না হয় সে বিষয়েও লক্ষ রাখা আবশ্যক কারণ অধিক পাতলা হইলে এক একটি গাছের অনেক গুলি ডাল পালা বাহির হয় ও গাছ বড় হয় না। গাছগুলি পরস্পর এক ইঞ্চি ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

পাট কাটিয়া লওয়া। পাটের অগ্র পশ্চাৎ বুননের উপর কাটিবার সময় নির্ভর করে। এই ফসল প্রায় ৪ চারিমাস ক্ষেত্রে থাকে। আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যেই সমুদয় পাট কাটা শেষ হয়। পাটের ফুল হইয়া যখন ফল হইতে আরম্ভ হয় তখনই পাট কাটিয়া লইবার উপযুক্ত সময় হয়।

চলিত কথায় এইরূপ প্রবাদ আছে যে

" হলে ফুল কাট শন।
পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুন॥ "

অর্থাৎ শনের ফুল হইলেই কাটিবে ও পাটে ফল পাকিলে কাটিবে।

কিন্তু পাট কাটিবার পূর্ব্বে যদি তাহার ফল পাকিয়া উঠে তাহা হইলে পাট নিরেস হয়।

জমী হইতে ২।১ ইঞ্চি বাদ দিয়া কাস্তের দ্বারা পাট কাটিতে হয়, ও তাহার পাতা সকল শুকাইয়া ঝরিয়া যাইবার জন্য ২।১ দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। পাট পচাইবার পূর্ব্বে তাহার সমুদয় পাতা ঝাড়িয়া ফেলা ও তাহার ডগা সকল, অর্থাৎ যে স্থান হইতে ফুল বাহির হইয়াছে, কাটিয়া ফেলা আবশ্যক।

পাট পচান। উপরোক্ত রূপে পাট কাটিবার পরে তাহাদিকে একটি ডোবায় ফেলিয়া পচাইতে হয়। যাহাতে তাহারা জলে ভাসিয়া না যায় তৎজন্য তাহাদের দুই ধারে দুইটি খোঁটা পুঁতিয়া রাখা আবশ্যক, ও তাহাদের উপর ঘাসের চাপ্ড়া, ও মাটী ইত্যাদি চাপা দিতে হয়। পাট জলে ডুবাইবার ৮।১০ দিনের মধ্যে পচিয়া উঠে। পাটের পক্কতার, ঋতুর, ও জলের ও পাট ভিজাইবার অবস্থার উপর পাটের পচিবার সময় নির্ভর করে। ১০। ১৫ দিন পরে পাট পচিয়াছে কিনা একবার দেখা আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত না পাটের আঁস সকল সহজেই ছাড়াইয়া আসে সে পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তদারক করিতে হয়। কারণ পাট অধিক পচিলে আঁসের বর্ণ খারাপ হয় ও শক্ত রয় না তৎজন্য এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ আবশ্যক।

আঁস বাহির করিবার নিয়ম। কোন কোন জেলায় এক এক খানি তক্তার উপর পাট

আছড়াইয়া পাকাটি বাহির করিয়া পাটের আঁস ছাড়ান হয়; কিন্তু এই প্রথা উত্তম নহে। ইহাতে পাকাটি সকল প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায় ও আঁসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গাঁইট পড়িয়া যায়। নিম্নলিখিত রূপে আঁস বাহির করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম:—আঁস বাহিরকারী এক হাঁটু জলে নাবিয়া এক একবারে এক মুট করিয়া পাটের গোছা লইবে, পরে তাহাদিগকে ছোট বড় করিয়া দুই অংশে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও যে ধারে ছোট পাকাটি থাকিবে সেই ধারের পাকাটি গুলি আঁস হইতে ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিবে ও সেই আঁস সকল হাতের চেটোয় জড়াইয়া জলের উপর অপরাংশ আছড়াইবে, তাহা হইলে পাকাটি সকল না ভাঙ্গিয়া আঁস বাহির হইয়া আসিবে। এইরূপে আঁস বাহির হইয়া আসিলে তাহাদের এক এক গোছা করিয়া জলের উপর আছড়াইয়া ধুইবে। এইরূপে পাট সকল ধুইবার পর রৌদ্রে ২। ৩ দিন ধরিয়া শুকাইলে বিক্রয় করিবার জন্য গাঁইট বাঁধা হইয়া থাকে।

চাষের খরচ ও উৎপন্ন। জমীর অবস্থার, সার অংশের ও মজুর খরচের উপর চাষের খরচ নির্ভর করে। প্রত্যেক বিঘায় ১০৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক বিঘায় ৫।০ মন পাট পাওয়া যায় এবং ২০৲। ২৫৲ টাকায় বিক্রয় হয়। ইহা ব্যতীত পাকাটি গুলিও অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ঝুলন-যাত্রা।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের মধ্যেই ঝুলন যাত্রা শেষ হয়, কিন্তু যে বার ভাদ্র মাসের প্রথমে শুক্লা দ্বাদশীতে ঝুলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেইবার আমরা কয় বন্ধুতে মিলিয়া বলরামপুরে ঝুলনের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম।

সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু এখনো সেই উৎসবকাহিনী বেশ মনে পড়িতেছে; বলরামপুরে আমাদের একজন আত্মীয়ের বাড়ী, সেখানে হালদার বাড়ীতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের ঝুলন হইয়া থাকে; কথাটা অনেক দিন হইতেই শুনা ছিল, কিন্তু অবসর ও সঙ্গীর অভাবে তাহার পূর্ব্বে আর ঝুলন দেখিতে যাইবার সুবিধা করিতে পারি নাই, কিন্তু আমার এই উৎসব-দর্শনাকাঙ্ক্ষাটা কিছুতেই পরিপাক হয় নাই, শেষে প্রথম ভাদ্রের সেই শুক্লা দ্বাদশীতে বন্ধু বান্ধববর্গের সঙ্গে বলরামপুরে চলিলাম।

বর্ষাকালে নদী পথেই বলরামপুরে যাওয়ার সুবিধা, কিন্তু নৌকার অনুসন্ধানে আমাদিগকে অত্যন্ত হয়রাণ হইতে হইয়াছিল, কারণ আমাদের গ্রামের মালোদের মধ্যে এ সময়ে বাঁশজালে মাছ ধরিবার ধুম পড়িয়া যায়; অবশেষে আমরা আমাদের এক বন্ধুর "ব্যারেৎ"

বাঁশি হালদারকে 'পাকড়াও' করিলাম, লোভ এবং ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া বাঁশি আমাদিগকে বলরামপুরে রাখিয়া আসিতে সম্মত হইল।'

মধ্যাহ্নের পর আমরা স্বয়ং গিয়া বাঁশির বাড়ীতে হাজির হইলাম, শুনিলাম সে তখন নৌকায় গিয়াছে, আমরা অগত্যা স্নানের ঘাটে, যেখানে বাঁশির নৌকা বাঁধা ছিল, সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম শ্রীমান্ বংশীধর তাহার নৌকার বাঁশের মাচান সরাইয়া ছোট কাঠের সেঁউতি করিয়া দুইহাতে জল ছেঁচিতেছে, সেখানে আরো তিন চারি খানি জেলে ডিঙ্গী বাঁধা আছে।

আমাদের গ্রীষ্মকালের সেই সংকীর্ণকায়া স্রোতস্বিনী এখন আর শুভ্র রজত সূত্রবৎ জলরেখা মাত্র নাই, এই ভাদ্রের প্রারম্ভে তাহা পূর্ণ যুবতীর ন্যায় পরিপূর্ণ যৌবন শ্রী লাভ করিয়াছে, বানেরজলে নদীর উভয় কূল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে, অথচ প্রৌঢ়াসুন্দরীর ন্যায় তাহা অচঞ্চল; যেন সর্ব্বশরীরে রূপ উছলিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে প্রবাহিনী সুন্দরী কুলুকুলু কল খর প্রবাহে ক্ষিপ্রগতিতে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আমাদের স্নানের ঘাট আর সে বটতলাতে নাই, সেখানে এখন গভীর জল; স্যাওড়া তলা দিয়া স্নানের ঘাটে যাইবার একটা সরু সুঁড়ি পথ ছিল, এখন আম্র কাননের প্রান্তবর্ত্তী কচুবন মগ্ন করিয়া এবং হারানে বাগ্দির গোলাঘর খানির ভিটে ডুবাইয়া নদীজল সেই সেওড়া তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্যাওড়া গাছের পাশেই একটা ছোট গাবগাছ, গাবের পুরাতন পত্র গুলির মধ্যে প্রচুর নূতন পত্রোদ্গম হইয়াছে, কচি কচি পাতাগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। হারানে বাগ্দির পুত্র নিতাই সেই ক্ষুদ্র গাছটিতে উঠিয়া কোঁচড় ভরিয়া নূতন গাবপাতা পাড়িতেছে; এই কচি কচি গাব পাতায় মোচার ঘণ্টের মত অতি সুন্দর তরকারী হয়, পল্লীরমণীগণের নিকট এই শাক অত্যন্ত মুখরোচক, বিশেষতঃ কথিত আছে গাবপাতা 'তে রাত্রির' বেশী রন্ধনের উপযুক্ত থাকে না, 'দড়িয়া' যায়, তাই পাতাগুলি ফুটিয়া উঠিতেই সে দিকে সকলের লুব্ধদৃষ্টি পতিত হয়।

বেলা পাঁচটার সময় আমরা বিছানা পত্র এবং খাবার লইয়া নৌকায় উঠিলাম, বৃষ্টি হইলে পাছে ভিজিতে হয় এই আশঙ্কায় নৌকার ছৈয়ের উপর একখানি শতরঞ্চি বিছাইয়া দেওয়া গেল। প্রতিকূল স্রোতে নৌকা চালান কঠিন বটে, কিন্তু দুইজন বলবান দাঁড়ী দাঁড় বাহিতে লাগিল, তাহার উপর পাল তুলিয়া দেওয়াতে তরতর করিয়া নৌকা চলিতে লাগিল।

কূল ছাড়াইয়া আমাদের নৌকা মাঝ নদীতে প্রবেশ করিলে দেখিলাম অপরাহ্নের সূর্য্য তখন নদীর অপর পারে আম্রকাননের অন্তরালে অস্ত যাইতেছে, বর্দ্ধিত-কায়া-নদীজল আমবাগানে প্রবেশ করিয়াছে, লোহিত সূর্য্যালোক বৃক্ষরাজির নিবিড় পত্র ভেদ করিয়া নদীর জলে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং বায়ু তাড়িত চঞ্চল বৃক্ষচ্ছায়া ঘূর্ণিত জলের উপর ক্রীড়া করিতেছে। শুষ্কবৃক্ষপত্র জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে, এবং নদীতীরে দুইটি ইটের পাজা

ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল তাহাদের উপর যে দুই পাঁচটা কাল্ কাসিন্দের ও লাল ভেরেণ্ডার গাছ জন্মিয়াছিল, তাহাদেরই অগ্রভাগ জাগিতেছে। তীরের নিকট একজন জেলে ছোট খেপলা জাল ফেলিয়া চিংড়ি মাছ ধরিতেছিল, এবং মুখুয্যেদের অর্দ্ধ নিমগ্ন বাগানের ধারে একটা চালতা গাছের নীচে উচু ভিটের উপর বসিয়া দুজন লোক গাবের আটায় পরিমার্জ্জিত কালো সেরেস্তার সূত্রবদ্ধ বড়সীতে বোলতার টোপ ও কেঁচো গাঁথিয়া তাহা গভীর জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্থিরভাবে বসিয়া মৎস্য শিকারের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

আমরা চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। নদীর পশ্চিম তীরে বাবলাবন, তাহাদের স্কন্ধ পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া গিয়াছে, ঝাঁকড়া শাখাগুলি জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এই সকল গাছের নিকট দিয়া নৌকা চলিতে লাগিল, সহস্র সহস্র লোহিত বর্ণ পিপীলিকা এই সকল বাবলা শাখায় আশ্রয় লইয়াছে, গাছের কাছে জলে কালো কালো জলীয় কীট দ্রুত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সূর্য্য অস্ত গেল। শরৎ কালের অপরাহ্ণ, পশ্চিম আকাশে অস্তগত সূর্য্যের কনক কিরণানুরঞ্জিত খণ্ড বিখণ্ড মেঘস্তর অতি আশ্চর্য্য শোভা বিকাশ করিয়াছে।

লোকালয় অতিক্রম করিয়া আমাদের নৌকা ধানের জমীর ধার দিয়া চলিতে লাগিল, দুই ধারে ধান্য ক্ষেত্র, ধানের পক্ব শীর্ষগুলি সন্ধ্যাসমীরণে হিল্লোলিত হইতেছে, গাছ গুলি ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল শীষগুলি ভাসিতেছে। পাছে আরো জল বাড়িয়া ফসল ডুবিয়া যায় ভাবিয়া কৃষকেরা কাস্তে দিয়া ধান কাটিতেছে, এবং ছোট নৌকা বোঝাই করিয়া এপার হইতে ওপারে লইয়া যাইতেছে, কেহ তামাক টানিতেছে। চাষার ছেলেরা তীরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের নৌকার দিকে চাহিয়া আছে। অদূরে খেয়া নৌকায় লোক বোঝাই হইয়া অপর পারে চলিয়াছে, এবং প্রান্তর প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামখানি হইতে যে সুঁড়ি পথ নদী পর্য্যন্ত আসিয়াছে গ্রাম্য বালিকাগণ সেই পথে গা ধুইতে আসিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, কেহ কলসী বুকে দিয়া পা দাপাইয়া একবুক জলে সাঁতার দিতেছে, বড় বড় মহাজনী নৌকা চুন লবণ বোঝাই লইয়া দূরবর্ত্তী নগরে রওনা হইয়াছে, লবণের নৌকার মধ্যে হইতে নারিকেলের চারার সবুজ পাতা দেখা যাইতেছে।

সন্ধ্যার সময় আমরা কামদেবপুরের খালের নিকট উপস্থিত হইলাম, এই স্থানটিকে ত্রিমোহিনী বলে, এক ক্ষুদ্র নদী আসিয়া এখানে আমাদের নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। এই নদীটি বৎসরের অন্যান্য সময় শুষ্ক থাকে এখন এই পথ দিয়া প্রবল বেগে ঘোলাজল আসিয়া আমাদের নদীতে পড়িতেছে। খালের মুখে ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি বায়ুভরে দুলিতেছে, একজন জেলে একটা লম্বা কাতকরা বাঁশের উপর চড়িয়া আর একটা সমান্তরাল বংশখণ্ড ধরিয়া ক্রমাগত নামা উঠা করিতেছে, বাঁশের আগায় উঠিলেই প্রকাণ্ড একখানা বিস্তীর্ণ জাল নদীজলে ডুবিয়া যাইতেছে, আবার সে বাঁশের গোড়ার দিকে নামিয়া আসিলেই জালখানা

ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জালে পুঁঠি, খয়রা, ট্যাংরা, বাটা প্রভৃতি মাছ জালে ধরা পড়িতেছে—নিকটে একখান নৌকা, জেলের একজন সহচর সেই নৌকায় মাছ গুলি ঝাড়িয়া লইতেছে, জেলেনীরা মাছের ঝুড়ী হাতে লইয়া তীরে দাঁড়াইয়া আছে।

পূর্ব্বধারে শ্মশান, নদীতীরে শ্মশান ঘাটে কত ভাঙ্গা খাটুলি, কত ছেঁড়া কাঁথা, কত কাঁথা ভাঙ্গা কলসী পড়িয়া আছে, শৃগালেরা শবের বালিশগুলি ছিঁড়িয়া তাহাহইতে তুলা-বাহির করিয়া ফেলিয়াছে নদীজলে কতক গুলি সোজা বংশখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দুই তিনটি সম্পূর্ণ নূতন, দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় দুই একদিনের মধ্যেই এখানে শবদাহ হইয়া গিয়াছে; কতদিনের রোগ, তাপ, জ্বালা যন্ত্রনার হাত হইতে মুক্ত হইয়া কাহারা এখানে চিরকালের জন্ত আশ্রয় লইয়াছে তাহার কোন ইতিহাস কেহ বর্ণনা করে নাই, কয়জনই বা তাহাদের কথা জানিত? তথাপি সংসারে শোককাতর বন্ধু বান্ধব এবং বিদীর্ণহৃদয় আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কতদিনের জন্ত এই শোক স্মৃতি অঙ্কিত রহিবে, তাহার পর সকলেই ইহাদের কথা ভুলিয়া যাইবে, ইহারা যাঁহাদের সংসারের অবলম্বন ছিল, যাহাদের জীবনস্বপ্ন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল তাহারাও একদিন হাসিবে, সংসারের কর্ম্ম-স্রোতে জীবন ভাসাইয়া এই বিরহবেদনা বিস্মৃত হইবে, কিন্তু হয়ত কোন স্তব্ধ সন্ধ্যাকালে, কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের নিদারুণ অবসাদের মধ্যে এক একদিন তাহাদের মনে পড়িবে। হায়! নশ্বর মানব, তাহাদের কোমল স্মৃতি ঐ পেতেল বনের মাঝখানে শুধু একখানি সরল দীর্ঘ বংশদণ্ডে আবদ্ধ হইয়া আছে, দেখিলে লোকে একবার বিষাদ ভরে সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়! আজও দেখিলাম, নদীর পূর্ব্বতীরে একটি চিতা জ্বলিতেছিল, বোধ হইল কোন পুরুষের চিতা, কতকগুলি লোক কোমরে গামছা জড়াইয়া শবদাহ করিতেছে, সকলেই নির্ব্বাক, সকলের মুখেই গভীর বিষাদের চিহ্ন; আজ এই পরিষ্কার, শান্তিপূর্ণ, সুন্দর সন্ধ্যাবেলা এই নির্জ্জন স্থানে নিঃশব্দে এমন একটি বিষাদপূর্ণ নাটকের অভিনয় হইতেছে! নিকটে একটি ছয় সাত বৎসরের বালক বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, আর তাহার অদূরে ধানের জমীর আইলের উপর একটি অর্দ্ধ বয়স্কা কৃষক রমণী লুটাইয়া লুটাইয়া আকুল ভাবে কাঁদিতেছে, কেহ তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছে না; হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইয়া যায় সে সময় কেহ মিথ্যা মায়া এবং তুচ্ছ আশার কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে আসিলে তাহা নিতান্ত নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়, আর্ত্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাসের প্রতি নিতান্ত নির্ম্মম পরিহাস ভিন্ন আর তাহা কি?—তাই বুঝি কেহ এই শ্মশানবাসিনী অভাগিনীকে একটীও সান্ত্বনার কথা বলিতেছে না, পৃথিবীতে যে তাহার প্রিয়তম, তাহার জীবনের অবলম্বন, সর্ব্বাপেক্ষা অধীক আত্মীয় ছিল তাহার দুর্ল্লভ দেহ অতি তুচ্ছ সামগ্রীর ন্যায় নদী তীরে ঐ ভস্ম হইতেছে, আজিকার সন্ধ্যার এই লোহিত তপনরাগের সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ভাগিনীর জীবনের সুখ, তাহার হাতের নোয়া, পরিধানের শাড়ী, এবং সিঁথির সিন্দুরের অবসান হইল।

আমাদের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল. কিন্তু এমনতর কত বিরহ ও বিষাদের অভ্যন্তর দিয়া মানব জীবন প্রতিদিন অনন্ত কালসাগরে ভাসিয়া যাইতেছে তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে ? মৃত্যুর বিস্মৃতি তমসাচ্ছন্ন অলঙ্ঘ্য গভীর ব্যবধান অতিক্রম করাই হয়ত আমাদের অমর জীবন লাভের অন্যতম উপায়। তখন বয়স কম ছিল এতটা বিজ্ঞতার সঙ্গে এসকল কথা চিন্তা করিতে শিখি নাই, বিশেষতঃ আমাদের নৌকা যখন আরো খানিকদূর অগ্রসর হইল, তখন একটা প্রকাণ্ড পাণিফলের জঙ্গল আমাদের নৌকার নিকট দিয়া ভাসিয়া যাওয়াতে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, আমরা নৌকার ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই জঙ্গলটা টানিয়া ধরিয়া রাশি রাশি পাণিফল ছিঁড়িতে লাগিলাম। দূরে টোপা পানার নিবিড় বন, কতক ভাসিয়া চলিয়াছে, কতক বা স্থলের সঙ্গে আট্‌কাইয়া আছে, তাহার উপর জল পিপি নামক জলচর পক্ষী পুচ্ছ দোলাইয়া দ্রুত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক একটা পানকৌড়ী একস্থানে ডুব দিয়া আর একস্থানে গিয়া দীর্ঘ গলাটা জলের উপর হঠাৎ বাড়াইয়া দিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যাইতেছে, এবং জলমগ্ন কাশবনের পাশে বসিয়া একটা ডাহুক 'কুয়া-কুয়া' করিয়া নিতান্ত একঘেয়ে সুরে চীৎকার করিতেছে। তাহার সেই বিদীর্ণকণ্ঠস্বরের মধ্যে কেমন একটা অব্যক্ত কাতরতা, একটা ক্ষুধিত, ক্লান্ত নিরাশ জীবনের কঠোর আর্ত্তনাদ ফুটিয়া উঠিতেছিল, এই শুব্ধ সায়াহ্নে, এই বর্ষার বিস্তীর্ণ নদীবক্ষে ভাসিয়া যাইতে যাইতে আমার আমার বোধ হইতে লাগিল যেন তাহা খর প্রবাহ কম্পিতা, বর্ষা পীড়িতা, শিক্ত তট ভূমির মূক বক্ষপঞ্জরের অন্তর্ভেদী করুণ বিলাপোচ্ছ্বাস।

হঠাৎ আমাদের নৌকার দাঁড়ী দুটো 'বলহরি, হরিবোল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এই শব্দ বড় অপ্রীতিকর, শোচনীয় ভাবের সহিত বিজড়িত, হিন্দু শববাহকেরা এই বিকট হরিধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক শবদাহ করিতে যায় এবং দাহান্তে ফিরিয়া আসে। দাঁড়ীদিগের সহসা এরূপ শব্দ উচ্চারণের কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না, পরে শুনিলাম কচ্ছপদিগকে জলের মধ্যে হইতে প্রলোভিত করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে, এই শ্মশান ঘাটের কাছে এইরূপ শব্দ হইলেই কচ্ছপেরা মনে করে কেহ শবদাহ করিতে আসিয়াছে, তাই তাহারা জলের ভিতর হইতে মাথা তোলে। আজও দেখিলাম দশ বারোটা বড় বড় কচ্ছপ আমাদের নৌকার চারিদিকে মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল ব্যাপারখানা কি ?—কচ্ছপগণকে এরূপ ভাবে উঠিতে দেখিয়া আমার বন্ধুগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

নৌকা যখন রাইপুরের ঘাটে আসিয়া লাগিল তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে একটুও মেঘ নাই, চন্দ্র অনেক পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার আলো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং সেই পূর্ণ প্রায় উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে, শরচ্চন্দ্রের সেই অমৃত কিরণে বিশ্ব সংসার হাসিতে লাগিল। নদীর বিস্তীর্ণ বক্ষে সেই কিরণ সম্পাতে বোধ হইতে লাগিল যেন নদীজল রজতময় হইয়া গিয়াছে, বহুদূরে চন্দ্রের পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহার পর যতদূর দৃষ্টি যায়

সীমান্তর পর্য্যন্ত তাহার ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাঁড়ের জলে আলো লাগিয়া তাহা ঝিক ঝিক করিতেছে। আর অদূরে ঐ বাঁশবন, বাঁশের আগা নুয়াইয়া নদীজলে পড়িয়াছে, বায়ুভরে সরসর করিয়া কাঁপিতেছে। তীরে পরিত্যক্ত গৃহের দুই একটি মৃন্ময় প্রাচীরের উপরে চাল নাই, জ্যোৎস্নালোকে সেগুলি নিশ্চল, স্থবির, ধূসর প্রেত দেহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। একটা লক্ষ্মীপেঁচা কোথা হইতে নিঃশব্দ পক্ষ সঞ্চালনে এই প্রাচীরের উপর আসিয়া বসিল, আবার তখনই উড়িয়া গেল; দূরে গ্রামের মধ্যে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অবসর প্রাপ্ত কৃষকেরা নিরুদ্বেগচিত্তে একত্র বসিয়া তবলা ও খঞ্জনী বাজাইয়া 'বেহুলার' গান আরম্ভ করিয়াছে, এখনো 'মনসার ভাসানের' মোহ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। বিশেষতঃ এই শরদাগমে যখন প্রত্যেক তরুলতা উজ্জ্বল শ্যাম স্নিগ্ধ বেশ ধারণ করে, কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের চারিদিকে খানা ডোবা জলে ভরিয়া থাকে ও তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া সাধারণের নয়ন সমক্ষে পল্লীগ্রামের সহজ পুষ্ট বিশদ শারদ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলে, সমস্ত গ্রামখানি ছবির মত সুন্দর দেখায়, প্রাঙ্গনে আউসের পোয়াল গাদা হইতে একটা সিক্ত সোঁধা গন্ধ উঠিতে থাকে আর ঘরের পাশে কদম্বগাছে কদম্বফুল ফুটিয়া এবং বেড়ার ধারে অযত্ন রোপিত রজনী গন্ধার ঝাড় হইতে প্রস্ফুটিত রজনী গন্ধার স্নিগ্ধ গন্ধ বিকীর্ণ হইয়া এই তরল জোৎস্নাময়ী রাত্রিকে রূপরস গন্ধের মোহে ঢাকিয়া ফেলে, তখন এই সকল নিরক্ষর পল্লীবাসীর সংসার সংগ্রাম ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত জীবনের নীরস মরুস্তর সিক্ত করিয়া সেখানে প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় অম্লান কবিত্বের অব্যক্ত মধুরতা বিকশিত হইয়া উঠে। তাহারা কি চায় তাহা তাহারা জানে না, তাহাদের হৃদয় কোন অপার্থিব রত্নের সন্ধানে আকুল হইয়া উঠিয়াছে এই সকল শিক্ষাহীন সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিরহিত কৃষক সন্তান এবং শ্রমজীবীগণ তাহা বুঝিতে পারেনা, কিন্তু তাহাদের ব্যাকুলতা আর গোপন হৃদয়ের অন্ধকার কোণে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না; বহিঃ প্রকৃতির সহিত তাহাদের অন্তঃ প্রকৃতির কোমল মধুর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়, তাই তাহাদের হৃদয় ও মন ঝঙ্কারিত করিয়া বহু পূর্ব্বের পল্লীজীবনের সুখের এবং দুঃখের আশা ভয় বেদনা ও মোহ বিজড়িত একটি করুণ সঙ্গীতোচ্ছ্বাস তাহাদের মুক্তকণ্ঠে নবজীবন লাভ করে।

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা বলরামপুরের ঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ, চন্দ্র পশ্চিম আকাশে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে, নদী স্থির, তীরে তরীগুলি দুলিতেছে, ঘাটে বড় বড় মহাজনী নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, তাহার ভিতরে প্রদীপ গুলি নিবাইয়া আরোহীগণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল একখানি নৌকার উপর একটি লোক শুইয়া শুইয়া বাঁশের বাঁশি বাজাইতেছিল, লোকটি একালের কোন সত্যকার উপন্যাসের বিরহী নায়ক কিনা জানিনা এবং তাহার বাঁশিতে কি গান গীত হইতেছিল তাহাও বলিতে পারিনা, কিন্তু যে সুর আমার কানে বাজিতে লাগিল তাহা নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না, সে রাগিণীতে হৃদয়ের এক অব্যক্ত গভীর বেদনা, ক্লান্ত জীবনের নৈরাশ্যময় অবসন্ন

মর্ম্মকাহিনী ধ্বনিত হইয়া ঊর্দ্ধে চন্দ্রালোকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সুপ্তচরাচরকে যেন এক মোহ বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। ততরাত্রে তখনো যেখানে অগভীর খাতের মধ্যে দিয়া বর্ষার আতট পূর্ণ উদ্বেলিত নদীজল কলকল ধ্বনিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল সেখানে গ্রাম্য চাষারা সারি সারি যে 'বৃত্তি' বসাইয়া গিয়াছিল তাহাতে মাছ পড়িয়াছে কিনা দেখিবার জন্য দুইজন লোক সেই 'বৃত্তি' গুলি টানিয়া তীরে তুলিতেতেছিল, এবং ছোট ছোট মাছগুলি একটা টোকরাতে ঝাড়িয়া লইয়া বৃত্তিগুলি স্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিতেছিল।

আমরা ত্রস্তপদে গ্রামের মধ্যে চলিলাম, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, শুধু গ্রামের অন্য প্রান্ত হইতে মধ্যে মধ্যে কুকুরের চীৎকার আর গ্রাম্য চৌকীদারের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে হালদারদের ঠাকুরবাড়ীতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে আমরা ঝুলন দেখিতে চলিলাম। ঠাকুরবাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দক্ষিণ দ্বারী ঠাকুরঘর, অতি প্রাচীন দেবালয়, কিন্তু সম্মুখের দেওয়ালে ভাস্কর বিদ্যার কতক চিহ্ন তখনো বর্ত্তমান আছে। সম্মুখেই কার্নিসের নীচে একটি লোহিত কান্তি স্থূলোদর গণেশ যুক্তাসনে লিখিবার ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন, তাহার আশে পাশে প্রত্যেক খিলানের কাছে এক একটি পরীমূর্ত্তি দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া পাখা হেলাইয়া যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুর ঘরের চারিদিকে চক মিলান ছোট ছোট ঘর; রমণীগণ চিকের অন্তরালে বসিয়া রামায়ণ শুনিবেন বলিয়া এই সকল গৃহদ্বারে সবুজ বর্ণের জীর্ণ চিক টাঙ্গান হইয়াছে। কদম্ব ফুল ও আম্রপত্র রজ্জু বদ্ধ হইয়া সমস্ত প্রাঙ্গনটি বেষ্টন করিয়াছে। ঠাকুর ঘরের সন্নিকটে একটা যায়গা ইট দিয়া গোলাকারে বাঁধান, প্রতিদিনকার পূজার ফুল, জল, তুলসীপত্র এবং দুর্ব্বাদল এই স্থানে নিক্ষেপ করা হয়, তাহার মধ্যে কচিৎ দুই পাঁচটা ধান পড়িয়া বড় বড় ধান গাছ হইয়াছে। লক্ষ্মী নারায়ণের গৃহের অদূরে বকসীদের পড়ো ভিটার উপর গ্রাম্য পাঠশালা, পাঠশালার ছেলেরা সুবিধা পাইলেই মধ্যাহ্নে পাঠশালা হইতে পালাইয়া গোলাপ ফুলের লোভে এই উৎকৃষ্ট পুষ্পাধারের কাছে সমবেত হইয়া জটলা করে এবং হরিনামের মালা লইয়া কোন মধ্যাহ্নে হালদার বাড়ীর বড়গিন্নি লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাঙ্গন দিয়া দৈবাৎ এবাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইবার সময় এই সকল দুষ্ট গ্রাম্য ছেলেদের দেখিতে পাইলেই তাহারা যে যে দিকে পায় সেই দিক দিয়া পলায়ন করে।

শুনিয়াছি অন্যান্য দিন লক্ষ্মীনারায়ণের দ্বারে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই হালদার পাড়ায় যত বর্ষীয়সী রমণী এবং বিধবাগণের কমিটি বসে, বিশেষতঃ একাদশীর দিন আহারাদির কোন হাঙ্গাম নাই বলিয়া রমণীগণ কিছু সকাল সকালই এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অনেক বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের আলোচনা চলে। তাঁহাদের সকলের হাতেই নানারকম রঙ্গের হরিনামের ঝোলার মধ্যে মোটা মোটা মালা থাকে এবং অনেকেই ফোঁটা তিলক

কাটিয়া আসেন কিন্তু তাঁহাদের আলোচনার বিষয় স্বতন্ত্র; কাহাদের কোন্ বৌ শ্বাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে, কোন্ শ্বাশুড়ী বৌ কাঁটকি, কোন্ যুবক বেশী স্ত্রৈণ এবং কোন্ সুবুদ্ধি ছেলে মায়ের কথা শুনিয়া বৌকে জুতা দিয়া ছেঁচিয়া মাতৃ আদেশ পালনজনিত স্বর্গের পথ মুক্ত করে এই সকল গল্পই তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ রূপে চলিয়া থাকে এবং প্রতিদিন এই একই বিষয়ের নব নব অবতারণায় তাঁহাদের ধৈর্য্য নষ্ট নয় না।

ঝুলন উপলক্ষে আজ কাল এই বৈঠক বন্ধ রহিয়াছে, আমরা দেবালয় প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম লক্ষীনারায়ণ আর তাঁহার গৃহ মধ্যে নাই, তিনি দালানে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, লাল কাপড় মোড়া রজ্জুবদ্ধ দেবসিংহাসনখানি আড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে। সিংহাসন খানি রূপালি রাঙ্গতা দিয়া সাজানো, মধ্যে নারায়ণ ত্রিভঙ্গ বেশে দণ্ডায়মান, পদতলে হিঙ্গুলের রেখা হইতে মস্তকের চূড়া পর্য্যন্ত সমস্ত বাঁকা, শিখি পুচ্ছ হেলিয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণীর চূড়ার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে, অধরে বাঁশরী, কিন্তু ঠাকুরটির দৃষ্টি ঠাকুরাণীর রাঙ্গা নথচক্র ভূষিত মুখ খানির উপর সম্বদ্ধ, ঠাকুরাণীও কম নুন, হাস্য প্রফুল্ল দৃষ্টিতে, মুখ ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া, ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

ঠাকুর ঠাকুরাণীর সম্মুখে এবং দুই পাশে ছোট ছোট জলচৌকীর উপর অষ্ট সখীর মৃণ্ময় মূর্ত্তি, ঝুলন উপলক্ষে মালীরা এগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। ছবি গুলির মধ্যে বড়াই বুড়ীর ছবিই কিছু বিচিত্র, এবং হাস্যরস উৎপাদক; তাহার পরিধানে সাদা থান, ভ্রু হইতে মুক্ত কেশ সমস্ত সাদা, বৃদ্ধত্বের ভরে নত হইয়া পড়িয়াছে, হাতে একখানি লাঠি; নানা রকমের সাড়ী এবং গহনা পরিয়া বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতি সখীগণ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের সকলেরই হাসিমুখ। নিকটে প্রকাণ্ডকায় বিশালোদর পুরোহিত ঠাকুর সাদা পৈতা গলায় দিয়া গামছা স্কন্ধে বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে কাঁশর ঘণ্টা বাজিতেছে, শঙ্খধ্বনি হইতেছে, দেউড়ীতে বসিয়া দুইজন ঢুলি ঢোল পিটাইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে খন্ খন্ করিয়া কাঁশির শব্দ হইতেছে আর পুরোহিত ঠাকুর লক্ষীনারায়ণের সিংহাসন দোলাইতেছেন।

ঠাকুর বাড়ীর সম্মুখে দেবদারু কামিনী পত্র বেষ্টিত কদলীতোরণে তিনটে কাঠের হাঁড়ি টাঙ্গানো ছিল, তাহাতে বাতি জ্বালান হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের নিকট সেজ জ্বলিয়া উঠিল, জ্যোৎস্নাও ক্রমে স্ফুটতর করিয়া চাতালের অন্তরাল হইতে শরৎচন্দ্র কৌতুকহাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে এই মধুর উৎসব দেখিতে লাগিলেন। দর্শকগণ প্রাঙ্গনে বসিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন, রমনীগণ গৃহান্তরবর্ত্তী নেপথ্য দিয়া চিকের অন্তরালে আসিয়া বসিতেছেন, উঠিয়া যাইতেছেন, অস্ফুট স্বরে গল্প করিতেছেন, দুই একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী বারান্দার পাশ হইতে ঠাকুর ঘরে আসিয়া ঝুলন দেখিয়া, এবং একবার গোলাপ ফুলের মত সুন্দর মুখ খানি বাড়াইয়া সমবেত জনগণের প্রতি কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিকের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, চারিদিক উৎসবময়, এই মধুর রাত্রে রমণীয় ঝুলনোৎসব দেখিয়া সত্য সত্যই মনে হয়:—

"উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল
বাজে কঙ্কন বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল,
দে দোল দোল।
আয়রে ঝঞ্ঝা পরাণ বধুর
আবরণ রাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন
বসন খোল্
দে দোল দোল্।"

সন্ধ্যার পর ঠাকুরাণীর আরতি এবং বৈকালিক জলযোগ শেষ হইলে ঠাকুর বাড়ীতে 'গাছ রামায়ণ' আরম্ভ হইল। প্রশস্ত আঙ্গিনাতে সতরঞ্চী পাতাছিল, এবং দর্শকগণ সকলেই সোৎসুক চিত্তে রামায়ণ শুনিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল; রামায়ণ গায়কগণ ধীরে ধীরে আসিয়া আসরে নামিল, চিকের আড়ালে একটা হুড়াহুড়ি, হাসির একটা হট্ট-গোল, বালার সঙ্গে চুড়ীর, মলের সঙ্গে মলের রুণু রুণু শব্দ উঠিল, সকলেই অগ্রবর্ত্তী আসন অধিকার করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল।

রামায়ণ আরম্ভ হইল। এই রামায়ণকে 'গাছ রামায়ণ' বলে কেন তাহা জানিবার জন্ত বোধ করি আমার নাগরিক পাঠকগণ কিঞ্চিৎ উৎসুক হইয়াছেন, এবং বোধহয় এরূপ জিনিষের কথা তাঁহারা এই প্রথম শুনিতেছেন। আমিও যে এই হাস্তকর নাম নির্দ্দেশের কোন সন্তোষজনক কারণ দিতে পারিব এরূপ সম্ভাবনা অল্প, তবে আমার অনুমান হয়, যে হয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই রামায়ণ গান গীত হয় বলিয়া ইহার নাম 'গাছ রামায়ণ;—অথবা গাছ তলাতে (বা যেখানে সেখানে) ইহা গাওয়া হয় বলিয়া ইহার এইরূপ অপূর্ব্ব নামকরণ হইয়াছে।

এই রামায়ণ গায়কেরা সর্ব্ব সমেত ছয় সাত জন লোক, ইহারা সাধারণতঃ ভাট ব্রাহ্মণ, সকলেরই গলদেশে অতি শুভ্র গোচ্ছাকার যজ্ঞোপবীত, নাসিকার উপর দীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত, পরিধানে সুন্দর রূপে কোঁচান সাদা থান, গলদেশে মোটা কাঠের মালা তো'করা ধোপদস্ত চাদর কোমরে বাঁধা, দুই তিনজন গায়কের পায়ে নূপুর বাঁধা, দুজনের হাতে মন্দিরা, কেবল যে লোকটা দলপতি, তাহার হাতে একটা চামর; এই চামর সাধারণ চামরের মত নহে, কেশগুলি কালো গোড়াটা রূপা দিয়া বাঁধানো তাহা হইতে একগাছি শক্ত সুতা ঝুলিতেছে, সেই সুতা গাছটাতে চামর অধিকারীর বাম প্রকোষ্ঠে ঝুলিতে থাকে।

অধিকারী আসরে নামিয়া প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিল, সঙ্গে সঙ্গে

দলস্থ আর সকলে দেবদেবী চরণে প্রণাম করিয়া না বসিয়া নাচিতে লাগিল, প্রবল বেগে মন্দিরা বাজিয়া উঠিল, অধিকারীর সঙ্গীগণ নাচিয়া নাচিয়া গানের ধুয়া ধরিল, "ওরে রে—রেরে, না রেরে" শব্দ উঠিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হাত মুখ নাড়ার বিষম ভঙ্গী!—সহসা এই অপূর্ব্ব তানের মধ্যপথে অধিকারী উঠিয়া দুই হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক সহচরবর্গকে থামাইয়া গান ধরিল।

আজিকার গানের বিষয় 'সীতা মিলন'—লক্ষ্মণ আসিয়া মহর্ষি বাল্মিকির আশ্রমোপকণ্ঠে সীতাদেবীকে বনবাস দিয়া গিয়াছেন, মহর্ষির কুটীরে গর্ভবতী সীতা অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছেন, সেখানে লবকুশের জন্ম হইয়াছে। পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক নিদ্রিত লবকে কুটীরে রাখিয়া সীতাদেবী সন্ধ্যাকালে আশ্রম প্রান্তবর্ত্তী সরযুতে কলসী করিয়া জল আনিতে গিয়াছেন, লব নিদ্রা ভঙ্গে মাতার অনুসরণ করিয়াছে, ধ্যানমগ্ন বাল্মীকি তাহা জানিতে পারেন নাই, ধ্যান ভঙ্গে তিনি দেখিলেন, নিদ্রিত শিশু কুটীরে নাই, পতি পরিত্যক্তা দুর্ভাগিনী রমণী একমাত্র শিশু পুত্রের মুখ দেখিয়া বহুকষ্টে জীবনধারণ করিতেছিলেন, নদী হইতে ফিরিয়া প্রাণের সেই একমাত্র অবলম্বন পুত্রকে দেখিতে না পাইলে কি সাধ্বীর দেহে প্রাণ থাকিবে?—বাল্মিকীর মনে মহাদুশ্চিন্তার সঞ্চার হইল, তিনি কুশ দ্বারা একটি শিশু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ইতি মধ্যে সীতাদেবী লবকে সঙ্গে লইয়া সজল কলসী কক্ষে কুটীরে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন কুটীরে আর একটি শিশু—তাঁহারই পুত্রের অনুরূপ; দেখিয়া তাঁহার চক্ষে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিল, তিনি এই অসম্ভাবিত পূর্ব্ব পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন; দুই পুত্র 'শুক্ল পক্ষের শশি'র ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহারা বনে বনে খেলা করিয়া বেড়ায়, শরজালে সরযূ তরঙ্গ রোধ করে, হিংস্র জন্তুদিগকে বন হইতে বনান্তরে তাড়াইয়া লইয়া যায়; অধিকারী কখন গানে, কখন বক্তৃতায় এই কাহিনী কীর্ত্তিত করিতে লাগিল। লবকুশ পাঠশালায় যায়, ঋষি পুত্রগণ তাহাদের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া উপহাস করে, সঙ্গে করিয়া খেলিতে লয়না, শিশু দুটি কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট আসিয়া বাপের নাম জিজ্ঞাসা করে, সীতাদেবী তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া শুধু অশ্রু মোচন করেন, নয়ন জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যায়—লবকুশ মায়ের অশ্রু দেখিয়া অপমান ভুলিয়া যায়, চক্ষু মুছিয়া বনের ধারে আবার দুই ভাই খেলিতে ছুটিয়া চলে। রামায়ণের দল যখন তানলয়ে এই মধুর কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিল, তখন করুণ সমবেদনায় শ্রোতাদিগের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল; কেহ চাদরে চক্ষু মুছিল, কাহারো অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল ভাসিতে লাগিল। রমণীগণ অঞ্চল টানিয়া সিক্ত চক্ষুপ্রান্ত মার্জ্জনা করিলেন।

ক্রমে সেইবনে রামচন্দ্রের অশ্বমেধের তুরঙ্গ আসিয়া দেখাদিল, তুরঙ্গ কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া ঋষির আশ্রম সন্নিকটে উপস্থিত হইল—অধিকারী তাহার কালো চামর উচু করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নাচিয়া নাচিয়া—

"তুরঙ্গ চলেরে,
অশ্ব—মেধের তুরঙ্গ চলেরে,
রামের—অশ্বমেধের তুরঙ্গ চলেরে।"

বলিয়া ধুয়া তুলিয়া তাহা দেখাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচরবর্গ নূপুর বাজাইয়া নৃত্য পূর্ব্বক অধিকারীর অনুসরণ করিতে লাগিল।

তুরঙ্গের মস্তকে জয় পত্র বাঁধা—"বীরের বেটাবীর হবে যেই তুরঙ্গ ধরিবে সেই।"

অশ্বমেধের তুরঙ্গ কোথাও বাধাবিঘ্ন পায় নাই, আজ বাল্মীকির আশ্রম প্রান্তে লবকুশ সেই তুরঙ্গ ধরিল; অশ্বের সঙ্গে সেনা দল ছিল, তাহাদের সঙ্গে লবকুশের মহাযুদ্ধ হইল, ক্রমে শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ, ভরত সকলেই লবকুশের শরজালে ক্ষতাঙ্গ হইয়া ধুলিশয্যা আশ্রয় করিলেন; হনুমান, জাম্বুবান, নলনীল, অঙ্গদ বিভীষণ বাঁধা পড়িল, অবশেষে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া 'যুদ্ধংদেহি' বলিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে রাম আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে লবকুশকে দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত পুত্রস্নেহের আবির্ভাব হইতেছে, বালকেরা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে তিনি তাহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু লবকুশ "বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চিদড়"—তাহারা স্পর্দ্ধার সহিত উত্তর করিল তিন ভায়ের অবস্থা দেখিয়া যদি তাঁহার মনে ভয় হইয়া থাকে তাহাহইলে তিনি অনায়াসেই পলাইতে পারেন, তাহারা প্রাণ ভয়ে পলায়িত শত্রুর পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করে না। রামচন্দ্র এতটা অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, লঙ্কায় তিনি রাবণ এবং "একলক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতি"র মধ্যে কাহাকেও বংশে বাতি দিবার জন্য জীবিত রাখেন নাই, আজ দুটো শিশুকে ভয় করিবেন? অতএব ধনুকে তীর যুড়িলেন, লবকুশও "চোখা চোখা" বান ছাড়িতে লাগিল; দুইভায়ের বাণ খাইয়া রাম বলিলেন:—

"লবের বাণে জ্বলে মরি—
কুশের বাণ সইতে নারি।"

অবশেষে রামচন্দ্রও ধরাশায়ী হইলেন, যুদ্ধ জয় করিয়া লবকুশ হনুমানটাকে একটা আশ্চর্য্য জানোয়ার ভাবিয়া মাকে দেখাইবার জন্য লইয়া চলিল, জানকীর সহিত হনুমানের পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না; সেই একদিন আর এই একদিন। স্বর্ণ-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কার বক্ষ বিরাজিত অশোকবনে দুরন্ত চেড়ীদলপরিবেষ্টিতা বন্দিনী সীতার নিকট সুবিস্তীর্ণ লবণাম্বু পার হইয়া হনুমানই সর্ব্বপ্রথমে রামচন্দ্রের অভিবাদন বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আর আজ সেই দীর্ঘবিরহ ও ক্ষণিক মিলনের অবসানে জীবনের সুকঠোর মধ্যাহ্নে নদীতীরবর্ত্তী শান্ত সুন্দর অটবীর অভ্যন্তরে মুনিকন্যাগণের মধুর-হাস্য কল্লোল মুখরিত মৃৎকুটীর দ্বারে সেই হনুমানই কতবর্ষ পরে আজন্ম দুঃখিনী নির্ব্বাসিতা অভাগিনীর নিকট বিজয়ী পুত্রের হস্তে সদলবলে আর্য্যপুত্রের নিধন বার্ত্তা প্রদান করিল। দুঃখে কষ্টে ভক্তবীরের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, অভিমানোদ্বেলিত কণ্ঠে, অশ্রু মুছিয়া, হনুমান সীতা-

দেবীকে বলিল "এমন পিতৃঘাতী সন্তানও গর্ভে ধ'রে ছিলি, মা।"—ছিন্নমূল্ তরুর ন্যায় সীতাদেবী সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ভূতলে পড়িলেন, লবকুশ দুধের ছেলে, কিছুই বুঝিতে পারিলনা, মায়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া ধূলায় গড়াইতে লাগিল। তাহার পর মূর্চ্ছাভঙ্গে জানকী অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া রামচন্দ্রের শ্রীচরণ বক্ষে ধরিয়া, সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত, এমন সময় বাল্মীকি আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি কমণ্ডলুস্থিত অমৃত কুণ্ডের জল ছড়াইয়া অচৈতন্য বীরগণের প্রাণে চেতনা সঞ্চার করিলেন; তখন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিনী সীতাদেবী স্বহস্তে 'অমৃতের খণ্ডের' ন্যায় অন্ন ও বনজাত শাক সবজী দ্বারা ব্যঞ্জন রাঁধিয়া তদ্দ্বারা পরিশ্রান্ত ক্ষুধিত কটককে ভোজন করাইলেন, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন কদলীপত্রে আহার করিতে লাগিলেন।

পরদিন অযোধ্যার রাজসভায় বাল্মীকির সহিত লবকুশ নিমন্ত্রণ রাখিতে চলিল, সভায় রামায়ণ গান হইল। শিশুকণ্ঠে, মহর্ষির কোমল মধুরচ্ছন্দে বিরচিত সেই অমৃত গাথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে, অযোধ্যার সকল লোক মুগ্ধ হইল,· কত কাল পরে কত দীর্ঘ বিরহের পর আবার সীতাদেবীর সহিত রামচন্দ্রের মিলন হইল! ইহাই সীতামিলন এবং ইহাই আজি· কার 'পাছ রামায়ণের' গানের বিষয়।

রাত্রি অনেক হইয়াছিল, রামায়ণ দলের অধিকারী নিবেদন করিল, যদি অনুমতি হয়ত আজ এখানেই গান বন্ধ করা যায়। তাহাই হইল। দুই একটি রুগ্ন ছেলে সেখানে বসিয়া রামায়ণ শুনিতেছিল, অধিকারী অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে তাহার কালো চামর বুলাইয়া দিল, বলিল ইহাতেই তাহাদের সকল ব্যাধি সারিয়া যাইবে।

পূর্ণিমার দিন ঝুলন শেষ হইল। সেদিন দলে দলে দেশোয়ালীরা আসিয়া গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের হস্তে জরিজড়ান থোপবিশিষ্ট রেশমের 'রাখি' বাঁধিয়া দিল, ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা কিছু কিছু পয়সা বকশিশ পায়! বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েরা আসিয়া সেই সকল 'রাখি' সংগ্রহ পূর্ব্বক সযত্নে তাহা পুতুলের বাক্সে তুলিয়া রাখিতে লাগিল, এগুলি তাহারা পুতুলের অতি মূল্যবান অলঙ্কার বলিয়া মনে করে। রাখি-পূর্ণিমা পর্ব্বতবেষ্টিত অরণ্য মরু সঙ্কুল সুদূর রাজস্থানের একটি অতি প্রমোদময় শারদোৎসব, বহুদূরবর্ত্তী শস্য শ্যামলা বঙ্গের প্রান্তে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে আজ সেই মধুর উৎসবের আনন্দপূর্ণ আভাস অনুভূত হইতেছে, এবং প্রভাতের এই সমুজ্জল আলো, নীল আকাশে অভ্রের ন্যায় শুভ্র মেঘ খণ্ডের সুমন্দ সঞ্চালন, সতেজ বৃক্ষপত্রের মৃদুকম্পন এবং ধান্য বিহীন বিস্তীর্ণ আউস ক্ষেত্রে বিহঙ্গ কুলের সহর্ষ কাকলী শুনিয়া মনে পড়ে বহু পূর্ব্বে এমনি দিনে হিন্দু রাজগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, এবং রাজপুত বীরগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হাস্য কলরবে অরণ্য প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া মৃগয়া ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন।

আর ঐ কলপ্রবাহ ঝঙ্কারিতা আবর্ত্তময়ী তরঙ্গিনীর কোলের কাছে যে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তাহার ডালে দড়ি ঝুলাইয়া কৃষকের ছেলে মেয়েরা ঝুল খাইতেছে

এবং নিবিড় ভুট্টা ক্ষেত পাহারা দিতে দিতে গাছের ছায়ায় জমিয়া দেশোয়ালীদের মেয়েরা অতি করুণ মধুর স্বরে নির্জ্জন কানন প্লাবিত করিয়া শরতের পীত রৌদ্র ধৌত ধরাতলের স্ফুট মর্ম্মকাহিনীর ন্যায় 'গজল' গাহিতেছে; রাত্রেও তাহাদের এই গানের বিরাম নাই, জ্যোৎস্নার আলোকে মৃৎকুটীরের বারাণ্ডায় বসিয়া গম পিষিতে পিষিতে দুই তিনটি রমণী সমস্বরে গান গাহিয়া যাইতেছে আর ঝুলনের উপসংহার বাজনা বাজিতেছে। যুগান্তরের পূর্ব্বের প্রেমহর্ষচঞ্চল বৃন্দাবনের পত্রপুষ্প সজ্জিত, গোপাঙ্গনা পরিবৃত নিভৃত কুঞ্জকাননের অন্তরালে ঝুলনোৎসবের সেই আনন্দময় কাহিনী, কোমল পুষ্পগন্ধ সমাকুল, প্রাণমন্থনকারী বংশীরব বিজড়িত, তমাল-কদম্ব-ভূষিতাম্বরা কল্লোলময়ী যমুনার ললিত তরঙ্গোচ্ছসিত অতীত স্মৃতির বিচ্ছিন্ন খণ্ডের ন্যায়, আজিকার ভাঙ্গাঝুলনের ঐ বাদ্যোদ্যম এবং দেশোয়ালী রমণীগণের ঐ গানের সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া পল্লীবাসীগণের হৃদয় মুগ্ধ করিতেছে।

রাম রাজার মুলুক।

(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।)

ত্রিবেন্দ্রমে যে ব্রাহ্মণের বাটীতে ছিলাম, তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্রাহ্মণটি গণ্ডমূর্খ হইলেও তাহার বাটীতে বিশেষ কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। রাত্রিতে ইহার ঘরে থাকিতাম; দিবসে এত "নিমন্ত্রণ" আসিত যে ইহার আলয়ে দিবা ভোজন প্রায়ই হইতনা। নিমন্ত্রণ খাইয়াই প্রতিদিন সহর দেখিতে যাইতাম। 'সহর' বলিলে যাহা বুঝায় তাহা ত্রিবেন্দ্রমে নাই, তবে ত্রিবেন্দ্রম স্থানটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং ইহার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। ত্রিবেন্দ্রম নগর সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী এবং সভ্যতা, আচার ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। এই অপূর্ব্ব সহরের বর্ণনায় সমগ্র মালাবার ভূমির কতকটা খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায়। ভৌগলিক বর্ণনায় কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত, ভারতের দক্ষিণ ভাগের শেষ সীমায় অবস্থিত, এবং জলবায়ু স্বাস্থ্যকর হইলেও গ্রীষ্মের আধিক্য অধিকতর। সমতল ভাগে (Interior of the Territory) চিরকালই বসন্ত; বর্ষা কম নহে কিন্তু সমুদ্রের তটে রাজ্যটি সংস্থাপিত বলিয়া বর্ষার জল জমিতে পায়না। সর্ব্বত্রই পাহাড় ও বড় বড় অথচ রমণীয় বন দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও বনে হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি বাস করে। রাজ্যের সর্ব্বত্র নানা প্রকার ফল ও ফুলের লতা ও তরুতে পরিপূর্ণ। রাজধানীটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত, তিন ধারে ক্ষুদ্র পাহাড়, একধারে পাথরের দেওয়াল। রাজধানীতে যাহা কিছু থাকা আবশ্যক, বর্ত্তমান সভ্যতার

নিয়মানুসারে তাহার কিছু কিছু নানা স্থানে বর্ত্তমান আছে ; স্কুল, কলেজ, আদালত, চিত্রশালা, উদ্যান ইত্যাদি সকলই আছে, কিন্তু অট্টালিকা সমূহ ধুমধামব্যঞ্জক নহে। বড় ইমারৎ অথবা আজিকালিকার ফ্যাসনের শোভনীয় অট্টালিকা ইত্যাদি প্রায়ই নাই, না থাকিলেও উৎকৃষ্ট জলবায়ু ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এসহর বাসের যোগ্য। অতি সামান্য খরচে সুখে সংসার চালান যায় এবং হিন্দুয়ানী পরিত্যাগ না করিলে হিন্দুসমাজে একজন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র বিদেশী হিন্দু বেশ আধিপত্যের সহিত জীবন যাপন করিতে পারে। তবে যাঁহারা হিন্দুস্থানীর মত ডাল রুটির উপরে জীবন যাপন করেন এবং যাঁহারা বিলাতী ফ্যাশনের বড়ই পক্ষপাতী তাঁহাদের এস্থানে সুখে দিন কাটান দুষ্কর। এদেশে রেল নাই সুতরাং এরাজ্যে আসিলে আবার দেশে ফিরিবার আশাটা অনেক সময়ে পরিত্যাগ করিতে হয়। ফিরিয়া আসিতে গেলে অনেক টাকার খরচ আবশ্যক। অধিবাসীরা খুব ধূর্ত্ত ও চালাক, সহজে ইহাদিগকে বশে আনা কঠিন ; কপটতা 'মালাবারী' লোকের ভূষণ ও প্রধান অস্ত্র। এদেশের লোকেরা ভীত, মিথ্যাচারী এবং বিদেশীর প্রতি সন্দেহচেতা। কিন্তু বশে আসিলে ইহাদিগকে লইয়া তুমি যেমন ব্যবহার করিতে চাহ তেমনই করিতে পার। ইহারা বিদেশী লোকের সহজে বশে আসেনা এবং সহজে বিদেশীকে বিশ্বাস করেনা, কিন্তু বিদেশী লোক যদি ইহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহার জন্য ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হয় না। অতিথির অপমান করা ইহাদের দেশের আচারের বিরুদ্ধ। এদেশের লোকেরা অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং সকল প্রকার সংস্কারের বড়ই বিরোধী। বিদেশে ইহারা যায়না, বিদেশ সম্বন্ধে ইহারা স্বভাবতঃ অজ্ঞ ও বিদেষী। কিন্তু নূতনত্বের ইহারা বড়ই প্রিয়, কিছু নূতন দেখিলে তাহাতে বড়ই আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করে ; আবার সে জিনিষ পুরাতন হইয়া গেলে পুনরায় কিছু নূতন দেখিবার জন্য আগ্রহ করে। সৌন্দর্য্যের ইহারা বড়ই পক্ষপাতী, কিন্তু সুন্দর ফুল কিম্বা সুন্দর ফল বা চিত্র ইহারা দেখিতে চায়না। সুন্দর মানুষের ইহারা পক্ষপাতী। উত্তম শরীর, সুন্দর কেশ, সৌন্দর্য্য ভরা মুখ, ভাল ভ্রূ বা চক্ষু বিশিষ্ট পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখিলে মালাবারের লোকেরা তাহার দাসের ন্যায় বশীভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু এই সুন্দর নর বা নারীর চরিত্র বা স্বভাবের দিকে তাহাদের দৃষ্টি থাকেনা অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের ইহারা পক্ষপাতী। মালাবারে বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুরে ব্রাহ্মণের পক্ষে যে সকল সুখ ও সুবিধা বর্ত্তমান, অন্য জাতি বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে তাহার শতাংশও এখানে বর্ত্তমান নাই। সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এদেশে আসা ভাল।

আমি প্রথমে জেলখানা দেখিতে গেলাম। ভারতবর্ষের বৃটীশরাজনীতি যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের বোধ হয় জানা আছে যে, ভারতখণ্ডের সমুদয় দেশীয় রাজ্যের জেলখানাগুলির যে ব্যক্তি প্রধান ডাক্তার তিনিই বৃটীশ রেসিডেন্সীর সার্জ্জণ মেজর অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসক, গবর্ণমেণ্টের এই কর্ম্মচারীর হস্তে দেশীয় রাজ্যসমূহের জেল বিভাগ ও

চিকিৎসা বিভাগের ভার থাকে। আমি ত্রিবাঙ্কুরের এই সাহেবের অনুমতি লইয়া কারাগার দেখিতে গেলাম। কারাগারে গিয়া দেখি, স্বর্গেও নরকে যতটা প্রভেদ, দেশীয় রাজার জেলে ও ইংরাজের জেলে ঠিক ততটাই প্রভেদ। ইংরাজ রাজার জেলের আইন বড়ই শক্ত, সেখানে একবার গেলে নরকের নমুনা দেখা যায়; সে "বিষম জায়গায়" মুড়ি মুড়কির এক-দর। প্রাণ বাঁচাইয়া ইংরাজের জেল হইতে ফিরিয়া আসা বড়ই বাহাদুরী বলিয়া গণ্য হয়। ইংরাজের জেলে দয়া, মায়া, মমতা, ইজ্জৎ, আব্রু এ সকল কিছুই নাই; কঠিন পরিশ্রমে, অনাহারে অথবা অপাহারে কয়েদীর কেবল অস্থিচর্ম্ম বাকী থাকে। বেত্রাঘাতে, জেলকর্ম্মচারীদিগের অপব্যবহারে, আইনের কঠোরতায়, কয়েদীর প্রাণ থর হরি কাঁপে; এদেশে অসদাচারীরা সংশোধিত হয়না বরং পাপীকুল মহাপাপীতে পরিণত হয়। ইংরাজের জেল House of Correction নহে, বস্তুতঃ House of Corruption!! আমি অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যের জেল দেখিয়াছি, ইংরাজাধিকৃত ভারতেও অনেক কারাগার রীতিমত পরিদর্শন করিয়াছি; কোনও সময়ে আমার নিজের হাতে জেলের ভার ছিল। তুলনায় দেখিয়াছি, ইংরাজের জেলে যদি শতকরা ৪৮ জন কয়েদী মরে, তাহা হইলে দেশীয় জেলে শতকরা ৬ জনের অধিক মরে না। যাহা হউক, ত্রিবেন্দ্রম জেলে যাহা দেখিলাম তাহা বলিতেছি। বলা বাহুল্য, দেশীয় রাজাদিগের কারাগারে জাতিত্ব, ইজ্জৎ, আব্রু, ধর্ম্ম প্রভৃতি বজায় থাকে। কয়েদীর জাতি ও মর্য্যাদা (সময়ে সময়ে অপরাধ) দেখিয়া তাহাকে কার্য্য দেওয়া হয়। রাজাদিগের কারাগারে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ফকির প্রভৃতিকে প্রায়ই পরিশ্রম করিতে হয় না; এখানে পরিশ্রমের কঠোরতা মোটেই নাই। আহারাদি ও নিয়মাদি এবং বস্ত্রাদি প্রায়ই কয়েদীর ঘরের মত, কিন্তু সকল কয়েদীরই পায়ে 'বেড়ী' থাকে, তাহাতে বিশেষ কোনও কষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয় না। যাবজ্জীবন-কয়েদীগণ দেশান্তরে প্রেরিত হয়না, জেলেই বদ্ধ থাকে। ভাগ্যপ্রসন্ন হইলে, রাজার পুত্র হইবার সময়ে অথবা রাজার জন্মবার্ষিকোৎসবে অথবা নূতন রাজার রাজ্যারোহণ দিবসে কিম্বা অন্য কোনও কারণে মুক্তিও প্রাপ্ত হইতে পারে। শয্যার বন্দোবস্ত ভাল; কয়েদীরা বাহিরে মজুরী করিতে যায়; যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীগণ বর্ষে বর্ষে এক জোড়া নূতন জুতা পাইয়া থাকে, জুতা পরিবার নিষেধ নাই। দেশীয় রাজারা প্রায়ই ফাঁসির বিরোধী, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ব্রাহ্মণের ফাঁসি বা বেত্রাঘাত হয়না, জেলের মধ্যে কয়েদী ব্রাহ্মণেরা কেবল বদ্ধ থাকে, তাহাদিগকে কোনও পরিশ্রম করিতে হয়না। জেলের মধ্যে ব্রাহ্মণ কয়েদী বদ্মায়েসী করিলে "কাল-কুঠরী" (Solitary cell) মধ্যে বদ্ধ হয় অথবা অন্নদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে কয়েদী কাহারও হাতে খায় না, ইচ্ছা করিলে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে পারে। সময়ে সময়ে 'সরকারী উৎসব' উপলক্ষে কয়েদীদিগকে মিঠাই খাওয়ান হয়, এবং কয়েদীর নিজের বাটীতে কোনও মহোৎসব হইলে দরখাস্ত করিয়া কয়েক ঘন্টার জন্য কয়েদী স্বগৃহে যাইতে পারে। দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বথা এই নিয়ম। জয়পুর রাজ্যে তত্রত্য মন্ত্রী রায় বাহাদুর

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে কয়েদীরা তাঁহার বাটীতে গিয়া অনেক বার ভোজন করিয়া আসিয়াছিল।

জেলখানা দেখিয়া পরদিবস ফৌজদারী আদালত দেখিতে গেলাম। এদেশে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, জয়েন্ট, ডেপুটী প্রভৃতি সকল কর্ম্মচারীই দেশীয় লোক, কিন্তু ইহাদের উপাধি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। জেলার মাজিষ্ট্রেটেরা দেওয়ান-পেস্কার, জয়েন্টগণ নায়েব-পেস্কার, এবং ডেপুটীরা তহশীলদার নামে অভিহিত হয়। এই সকল কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশই মাদ্রাজ অঞ্চলের লোক, দুই একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণও আছেন। মালাবারের লোকেরা এখনও এরূপ উচ্চপদ অধিকার করিবার যোগ্য হয় নাই। জেলার কালেক্টরেরা ৮০০ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন প্রাপ্ত হয়েন, জজদিগের বেতন বারশত টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের টাকায় এই বেতন দেওয়া যায়, এই টাকা ইংরাজের টাকার হিসাবে তের আনা মাত্র। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্য সমূহে—বিশেষতঃ রাজপুতানায়—ছোট ছোট কামরায় মাদুরের উপর তুলার মোটা মোটা গদি পাতা হয়, তাহার উপরে শুভ্রবর্ণের 'ফরাস' চাদর, তদুপরে বড় তাকিয়ায় ঠেস দিয়া হাকিমেরা পান চিবাইতে চিবাইতে জানুর উপরে জানু রাখিয়া কাছারী করেন। ত্রিবাঙ্কুরে সে প্রথা নাই, এখানকার সকল কাছারীতেই চেয়ার টেবিলের খুব ব্যবহার দেখিলাম। রীতি নীতি ঠিক ইংরাজী কাছারীর মত; গত বার বৎসর হইতে এখানে পেনালকোড চলিয়াছে; সকল কাছারীতেই উকীল, মোক্তার ইত্যাদি থাকে; কিন্তু হাকিম এবং উকীলদিগের জন্য পরিচ্ছদের কোনও নিয়ম নাই, সকলেই দেশীয় পরিচ্ছদ পরিয়া কাছারী করেন। দেশীয় পরিচ্ছদ মানে মাদ্রাজ অঞ্চলের বস্ত্রাদি। আদালত সমূহ ইংরাজী ডেপুটী বাবু দিগের কাছারী হইতে উৎকৃষ্ট; ঘরগুলি বেশ প্রশস্ত এবং বসিবার স্থানের বন্দোবস্ত খুব সুন্দর। আদালতেও জাতির বিচার খুব; চণ্ডাল, মেথর, পারিয়া, ধেড় প্রভৃতি 'অস্পৃশ্য নীচ জাতি' দের কেহ বাদী, প্রতিবাদী বা সাক্ষী রূপে উপস্থিত হইলে, আদালতের মধ্যে সে ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পায়না। গল্পে শুনা যায়, কোথাকার এক মহারাণীর জ্বর হইয়াছিল, বৈদ্যরাজ অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে অধিকার না পাওয়ায়, মহারাণীর হাতের সূতা ধরিয়া তিনশত হস্ত দূর হইতে বলিয়াছিলেন 'মহারাণীর নাড়ীতে কফের খুব জোর দেখিতেছি'! নীচ জাতির এজাহার গ্রহণ সম্বন্ধে এখানকার হাকিমেরাও ঠিক তাহাই করেন। ফৌজদারী আদালত দেখিয়া দেওয়ানী আদালত দেখিতে গেলাম, এখানকার হাকিমেরা মুন্সেফ নামেই পরিচিত। দেওয়ানী আদালতে উত্তরাধিকারী সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমার বিচার দেখিবার যোগ্য বটে। ত্রিবাঙ্কুরে বিবাহ বলিয়া কোনও ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিলনা, স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, গত দুই শত বৎসর হইতে এখানে রীতিমত বিবাহ প্রথা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু 'পুত্র' দ্বারা পুংনামক নরক ত্রাণ হয়, এ বিশ্বাস এখানকার গোঁড়া হিন্দুরও নাই। রামের পুত্র রামের সম্পত্তির অধিকারী নহে, রামের ভগ্নী-পুত্র (ভাগিনেয়) রামের উত্তরা-

ধিকারী! এদেশের উত্তরাধিকারীত্বের এই নিয়ম ও এই আইন, সুতরাং ত্রিবাঙ্কুরে ভগ্নির খুব মর্য্যাদা; ভগ্নির একটা পুত্র হউক, সকলে এই কামনা করিয়া থাকে, নিজের পত্নীর ছেলে হউক আর না হউক সে বিষয়ে বড় দৃষ্টি বা আকাঙ্ক্ষা নাই। এদেশে ভাগিনেয়ের খুব খাতির। মালাবারের সর্ব্বত্রই মামার "বিষয়" ভাগ্নে পাইয়া থাকে, পিতার সহিত পুত্রের বড় সম্পর্ক নাই। আজি কালি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট Malabar Marriage Bill নামক আইন 'পাস' করিবার জন্য খুব যত্ন করিতেছেন, কিন্তু প্রজা সাধারণ সে আইনের খুব প্রতিরোধী। যাহা হউক, ত্রিবাঙ্কুরের আদালত সমূহে 'মালয়লী' ভাষাই Court language, তবে ইংরাজিতে ওকালতী করিতে নিষেধ নাই। সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী মধ্যে তেলুগু, তামিল, কানাড়ী এবং মালায়লী এই চারিটি ভাষা প্রচলিত; কানাড়ী ভিন্ন উক্ত তিনটি ভাষা Dravidian অর্থাৎ Non-Aryan languages; ইহারা স্বতঃসিদ্ধ ভাষা সংস্কৃতের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেনা। এই তিন ভাষা ভিন্ন ভারতের আর কোনও ভাষাই আদি ভাষা নহে, সকল ভাষারই প্রসূতি সংস্কৃত, সুতরাং আমাদের পক্ষে এই তিন ভাষা শিখিতে বড়ই শ্রম স্বীকার করিতে হয়। এই তিন ভাষা পরস্পর স্বতন্ত্র ভাষা, কাহারও সহিত কাহারও একতা নাই; এখনকার পণ্ডিতেরা ক্রমে ক্রমে অনেক সংস্কৃত শব্দ এই সকল ভাষায় মিলাইতে ও মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তামিল ভাষার সহিত মালয়লী ভাষা উত্তরোত্তর খুব মিলিয়া আসিতেছে, এই জন্য অনেক মালয়লী শব্দ তামিল শব্দে পরিণত হইয়া গিয়াছে; একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—"বেলীয় করণ! কুন্‌চম্ আশী ইংগে কুওয়া" অর্থাৎ—ভৃত্য! এখানে কিছু চাউল লইয়া আইস; ভৃত্য উত্তর দিল "আংগে আশীত্তিল রম্বে আঁটা উণ্ডু, কুন্‌চম্ ইরেক্যো কুন্দয়ম্" অর্থাৎ "এখানে চাউলের মধ্যে খুব পিপীলিকা রহিয়াছে, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।" মালয়লী ভাষায় গণিতের ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি ঠিক ইংরাজি 1, 2. 3, 4 ইত্যাদির তুল্য, অঙ্কশাস্ত্রের Numerical figures ইংরাজি figures বলিলেই হয়, তামিল ভাষাতেও তাহাই। এক্ষণে ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসীদিগের বাসগৃহের কথা বলিতেছি; যাঁহারা প্রস্তর, ইষ্টক বা কাষ্ঠের গৃহ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আদিম ধরণের সমুদয় গৃহই পর্ণকুটীর মাত্র; এমন আশ্চর্য্য ধরণের কুটীর আর কোথাও দেখি নাই; এঘরের বর্ণনা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়; সমুদয় ঘরখানি সম্পূর্ণ গোলাকার, দূর হইতে একটা গোলোকধাঁধা অথবা পর্টুগাল সম্রাটের Emanant খেলিবার ঘর বলিয়া বোধহয়। এই গোলাকার ঘরের মধ্যে অনেক গুলি কামরা থাকে, কেহ বা কামরাও রাখে না। ত্রিবাঙ্কুরের সর্ব্বত্র এই গোলাকার পর্ণকুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর পুরাতন গ্রন্থ সমূহে পড়া যায়, আদিম অধিবাসীগণ এইরূপ ঘরেই বাস করিত। Andrew Murray নামক একজন শিক্ষিত রোমান কাথলিক খৃষ্টান ভদ্রলোক, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই প্রকারের প্রায় তিনশত ঘর আমাকে দেখাইয়াছিলেন। এই 'ময়ে' সাহেবের নিবাস Derboe নগর, ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত

Natal নামক উপনিবেশের একটি সহর ; 'ঘরে' বলিলেন, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরাও ঠিক এইরূপ ঘরে এখনও বাস করে।

একদিন অপরাহ্নে সমুদ্রতটে একাকী উপবেশন করিয়া ভারত মহাসাগরের প্রশান্ত বক্ষস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময়ে একজন ইংরাজি শিক্ষিত বৃদ্ধ মালয়লী আসিয়া তাঁহার মাতৃভাষায় এক গীত আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, তেলুগু তামিল ও মালয়লী ভাষায় গীত শুনিলে মহাগম্ভীরপ্রকৃতি লোকেও হাস্য সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় না ; গীতে ভাব আছে বটে, তাল নাই, রাগিণী নাই, সাঁওতালের 'মাদোল' বাজার ন্যায় এক সুরেই ও এক ভাবেই গীত গাহা হয়। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই গীত কবিতায় অর্থাৎ পদ্যে হয়, গদ্যে হয় না ; এদেশে না গদ্য, না পদ্য ; কেবল কাদম্বরীর লম্বা চোড়া পংক্তির ন্যায় এক অপূর্ব্ব ধরণের কথা গুলি সুর করিয়া আওড়ান হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের একটা গ্রাম্য গীতের নমুনা দিতেছি—

"আড়ক্কু থোইটো পট্টাম্ব উণ্ডুভেল্লয়া ভেলাব্রায়োই মারীন্দে য়োলয়া সোম্ভুস্পন্ন বিশাকানা শাল্লডা চোমে পন্নুঝী মষতষোপুউমা নাল্লো ইরকদে কোশো" ইত্যাদি। বৃদ্ধটি আমাকে খুব হাসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনার নাম কি ?' আমি আমার নাম বলিলাম, বুড়ো বলিলেন 'এত সরল নাম আপনারা ব্যবহার করেন ? যাহাহউক, আপনার নামে তিনটি শব্দ দেখিতেছি, প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দের মধ্যে চন্দ্র শব্দ আছে. ইহার অর্থ কি ?' আমি ব্যাকরণ ধরিয়া বৃদ্ধকে অনেক বুঝাইলাম, বুড়ো বলিলেন 'এরূপ নাম আমাদের মনোমত নহে'। আমি তামাসা করিয়া বলিলাম, তবে কি একটা লম্বা চোড়া এবং খুব শক্ত নাম শুনিলে আপনি খুসী হয়েন ? পক্ক কেশ বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, এমন একটা নাম বলুন দেখি ? আমি বলিলাম, আমার এক ভৃত্যের নাম।

"গজ্রগড্ভ্রাম্বশ্বঙ্গিনীন্ঋীনীঙ্গীড্ডুশ্বীয়ম্" !

খুবহাসি হাসিয়া বুড়ো বলিল "তোমার কাছে অবশ্য হারি মানিতে হইল, কিন্তু ভাই ! এ নামটার উচ্চারণে আমার Jaw breaking হইবার ভয় হইতেছে। তোমদের দেশের স্ত্রীলোকদের দুই. চারিটা ভাল ভাল নাম বল দেখি ?" আমি বলিলাম—মাতঙ্গিণী, সরোজিনী, মনোরমা, কুমুদকুমারী, শশীমুখী, প্রিয়ম্বদা, মনোমোহিনী, ইত্যাদি। রসিক বুড়ো বলিল, "ভাল ! ভাল ! বেশ নামগুলি ; আমাদের দেশের লক্ষ্মীছাড়া মেয়েগুলোর নামে বনের বাঘ বন হইতে পলায়।" আমি বলিলাম, দুই একটা নাম বলুন দেখি, শুনি ? বৃদ্ধ বলিলেন—ভুড়প্যাইমা, ঋীটাৰ্ব্বঋুই, কৈতারীপাপম্বি, সবুরামথা, বেৎলেউন্ডু, ইত্যাদি। আমি বলিলাম, 'ধন্য ! ধন্য ! ভাল, ভাল ; এহেন মধুর নাম শুনে প্রাণ শীতল হোয়ে গেল !!" অনন্তর অনেক রহস্যের কথা তুলিয়া, বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "এতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ত্রিবাঙ্কুরে কিছু আশ্চর্য্য দেখিলেন কি ?" আমি বলিলাম 'রহস্য করিতেছি না,

সত্যসত্যই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি ; সমুদয় ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে একটাও বেশ্যা দেখিলাম না ; স্থানে স্থানে দুই একটা মুসলমানী বেশ্যা আছে বটে, কিন্তু হিন্দু বেশ্যা কোথাও নাই"। উত্তরে তিনি বলিলেন, "কথাটা সত্য ; বাস্তবিক রামরাজার মুলুকে বেশ্যা নাই ; কারণ এই যে, এদেশে পুরুষ নামে মাত্র মানুষ, বস্তুতঃ স্ত্রীলোকই সর্ব্বেসর্ব্বা, এজন্য ত্রিবাঙ্কুরের অপর নাম 'মেয়ের মুলুক।' স্ত্রীলোক যে মুহূর্ত্তে হউক ইচ্ছা করিলেই বিনা কারণ দর্শাইয়া আপনার পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে ; পুরুষে যথাযোগ্য কারণ দেখাইয়াও সহজে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে অধিকারী নহে। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুরুষে সহজে দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণে সক্ষম নয়, কিন্তু এক পতি বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকে অপর পতি গ্রহণ করিতে সমর্থ ; তবে নিয়ম এই যে, এই নূতন পতিকে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। তাহার পরে, স্ত্রীলোকের আর একটা আশ্চর্য্য অধিকার এই যে, ইচ্ছা করিলে যে কোনও পর পুরুষের নিকটে প্রকাশ্যে বা গোপনে গমন করিতে পারে ; পতি তাহা স্বচক্ষে দেখিলে Divorce জন্য আদালতে দরখাস্ত অথবা প্রতিবেশীর নিকটে আবেদন করিতে পারে, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষেরও সাধ্য নাই যে, স্ত্রীলোকের মাথার একটা কেশও স্পর্শ করে !! এদেশে স্ত্রী অবধ্যা, স্ত্রীলোকের সাতখুন মাফ !! বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা বা শূদ্রা স্ত্রী হইলে যে কোনও ব্রাহ্মণের কামনা পূরণ করিতে অধিকারিণী, ইহাতে তাহার পতির দ্বিরুক্তি করিবার ক্ষমতা নাই। কোনও ব্রাহ্মণ, কোনও ব্রাহ্মণেতর স্ত্রীলোককে চাহিলে, ব্রাহ্মণের কামনা পূরণ করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া এখনও দৃঢ় বিশ্বাস! সুতরাং বেশ্যা থাকিবে কেন ?" স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, এদেশে ঘরে ঘরে গুপ্তা বেশ্যা, সেই জন্যই সে দিনকার বড়লাট সাহেবের সভায় চেম্বর্লণ সাহেব গর্ব্ব করিয়া বলিয়া ছিলেন "Prostitution is the profession of Indian women." কথাটা খুব কঠিন বটে, কিন্তু ভারতে ব্রাহ্মণ জাতির লোকেরা মালাবারে, রাজপুতানায়, গুজরাটে, মথুরা, বৃন্দাবনে, এবং দক্ষিণাবর্ত্তে স্ত্রীলোককে লইয়া ধর্ম্মের নামে যে সকল পৈশাচিক কাণ্ড করে, তাহার কেহ খবর রাখেন কি ? ভারতে ব্রাহ্মণের হাতে স্ত্রীমর্য্যাদা কোথায় ? এই অপব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ দিগের অত্যাচারে ও পাপে ভারত রসাতলে গেল ; কোটি কোটি স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে, লক্ষ লক্ষ বিধবার অভিশাপে, ভারতের অন্তিমদশা উপস্থিত ; স্ত্রীলোকের কাতরকণ্ঠ হইতে যে অভিশাপ নিঃসৃত হইতেছে, শতসহস্র অশ্বমেধ বা লক্ষকোটি গোমেধ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সে অভিশাপ হইতে ভারতের আর রক্ষা বা পরিত্রাণ নাই। যে দেশের ব্রাহ্মণ কথকেরা স্ত্রীলোককে গোপিকা সাজিয়া পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিসারিণী হইতে পরামর্শ দেয় এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধ খুলিয়া এই অভিসারকে, মোক্ষের পথ বলিয়া উপদেশ দেয়, সে দেশে আবার স্ত্রীমর্য্যাদার কথা তুলিতে চাও ? যে দেশের ব্রাহ্মণেরা "স্ত্রীলোকের ব্রাহ্মণ-গমনে পাতক নাই" বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, যে দেশের স্পষ্টাচারী ধর্ম্মধ্বজী প্রচারকেরা স্বেচ্ছায় "চিরকুমার" উপাধি ধারণপূর্ব্বক, দশমবর্ষীয়া অনাথিনী বালিকাকে

নির্জ্জনে পাইয়া 'যোগাশ্রম' নামক ভণ্ডামী ভরা আঁধার গৃহে 'স্বামী' সাজিয়া নিজের পাশবীয় বৃত্তি চরিতার্থ করে সে দেশে স্ত্রীমর্য্যাদার কথা না তুলাই ভাল।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানীতে একটা খুব বড় মন্দির আছে, এই মন্দির দেখিবার যোগ্য, এই মন্দির "পদ্মনাভ মন্দির" বলিয়া বিখ্যাত। পূর্ব্বের এক প্রস্তাবে আমি পদ্মনাভপুর ও পদ্মনাভ মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তথায় পদ্মনাভের যে মূর্ত্তি আছে তাহাই আদি মূর্ত্তি, ত্রিবেন্দ্রম যদবধি ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী হইয়াছে, রাজারা ঐ প্রাচীন ও আদি মূর্ত্তির অনুকরণে এখানেও একমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন; এখন এই মূর্ত্তিরই খাতির অধিক।

মালাবার উপকূলে ইউরোপীয়েরা সর্ব্ব প্রথমে ভারতে পদার্পণ করেন এবং এই স্থানেই ভারতে সর্ব্ব প্রথম খৃষ্টীয়ধর্ম্মের পতাকা উড়ে। খৃষ্টীয় ১০৩৬ অব্দে রোমান কাথলিক খৃষ্টানদিগের ফ্রান্‌সিস্‌কান্ সম্প্রদায়ের লোকেরা মালাবার উপকূলে সর্ব্ব প্রথম খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করেন।* এই জন্য এই উপকূলের সর্ব্বত্র দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সিরিয়ান, রোমান কাথলিক, প্রটেস্‌টাণ্ট্‌ ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে বহুসংখ্যায় নানা স্থানে অথবা সর্ব্বস্থানে বাস করে। খৃষ্টানদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, ইহারা সভ্য, শিক্ষিত, স্বাধীনচেতা, রাজ ভক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রায়ই রূপবান। রোমান কাথলিকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহাদেরই খুব ধূমধাম দেখিলাম। প্রটেস্‌টাণ্ট্‌ খৃষ্টানদের অনেকে ত্রিবাঙ্কুরের পুলিষ বিভাগে কার্য্য করে। মালাবার উপকূলের সর্ব্বত্র ইংরাজি ভাষার খুব প্রচলন; কেবল মালাবার উপকূলে নহে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সর্ব্বত্র বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয়না, কিন্তু দেশীয় খৃষ্টান সমাজেই এই ভাষার অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলন হইয়া আসিতেছে। অনেকে ইংরাজি বলে বটে, এবং সর্ব্বত্র সকল সমাজে—অধিক কি অতি নীচজাতি মধ্যেও—ইংরাজির প্রচলন আছে বটে, কিন্তু রীতিমত শিক্ষিত যুবা ভিন্ন ভাল ইংরাজি কোথাও শুনিতে পাইবেনা; স্কুল কলেজের শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন আর যাহা কিছু ইংরাজি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল বর্ব্বর ইংরাজি মাত্র, সাহেবদের খানসামা, বাউর্চ্চি, (Butler) প্রভৃতিরা যে ইংরাজি বলে, ইহা সেই ইংরাজি, সুতরাং ইহার নাম Butler's English দেওয়া গিয়াছে। খানসামা, বাউর্চ্চি, পেয়াদা, খিদ্‌মৎগার প্রভৃতির ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েরা স্কুলে প্রেরিত হয়, এবং যৎসামান্য ইংরাজি শিখিয়া সাহেবদের কথা বুঝিতে পারিলে অথবা সাহেবকে বুঝাইতে পারিলেই স্কুল ছাড়িয়া দেয়। ইহাদের অধিকাংশই খৃষ্টান অথবা অতি নীচ জাতীয় হিন্দু বা মুসলমান। এক একটা নগরে এক একজন মাতব্বর

* খৃষ্টীয় ১০৩৬ অব্দের পূর্ব্বেও এখানে স্থলপথে খৃষ্টানেরা আসিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনও কোনও প্রচারক জলপথে নৌকাযোগে আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু একাদশ শতাব্দী হইতেই গির্জ্জা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়।

বাউর্চ্চি থাকে, ইহাকে গ্রামের বা নগরের লোকেরা Head Butler বলে; এব্যক্তি যখন কোনও বালক বা বালিকাকে পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দেয় তখন ঐ বালক বা বালিকার চাকুরী হওয়া দুষ্কর নহে, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমেই কর্ম্মপ্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করে; "Have you got the Head Butler's certificate ?" যে ব্যক্তি হেড্ বট্‌লার, সে ব্যক্তি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে ছয় আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত ফি লয় এবং ফি পাইলে পরীক্ষার্থীর ইংরাজি ভাষায় কেমন জ্ঞান হইয়াছে তাহার পরিচয় লইয়া থাকে, তদন্তর আবার চারি আনা পয়সা লইয়া 'পাস' করা কর্ম্মপ্রার্থীকে সার্টিফিকেট দেয়, এই সার্টিফিটের নাম Head Butler's Certificate, এই সার্টিফিকেটের বড়ই খাতির! ইহার জোরে সাহেবের চাকুরী পাওয়া কঠিন নহে। মালাবার উপকূলে কিছু দিনের জন্য আমার টমাস নামে একজন খৃষ্টান (বালক) ভৃত্য ছিল, সে আমার চাকুরী ছাড়িবার সময়ে আমার নিকটে এক সার্টিফিকেট প্রার্থনা করে; আমার সার্টিফিকেট লইয়া সে একজন ইঞ্জিনিয়ারের বাঙ্গলোতে গিয়াছিল, সাহেব বলিল "We do not want a B. A or an M. A. to recommend you , টোম্‌কো বট্‌লার বাবা কা সার্টিফিকেট্ মিলা হ্যায়্ কি নেহী ?" সুতরাং একদিন ঐ বালকের পিতার নিতান্ত অনুরোধে. আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া Head Butler মহাপ্রভুর বাটিতে গেলাম। অনেক কথার পরে, সেই অশেষ গুণের আকর স্বরূপ এবং "পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজি Scholar' শ্রীমান হেড্ বট্‌লারজী, আমার বালক ভৃত্যের Examination আরম্ভ করিল !! পরীক্ষার প্রশ্নগুলি মুখে মুখে বলা হয়, অবিকল নমুনা দিতেছি।

প্রশ্ন—বেগুণের ইংরাজি কি ? উত্তর—Bringal. (পরীক্ষক বলিল No—Tomato)

প্রশ্ন—বাজারে যাও ? উত্তর (আমার গুণাকর ভৃত্য বলিল) Market go no delay soon.

প্রশ্ন—আয়াকে ডাক। উত্তর—Aya call.

প্রশ্ন—খানা তৈয়ার হইয়াছে কিনা ? উত্তর—Khana yes ready or no ready.

প্রশ্ন—বড় সাহেব আসিলে তাহাকে সেলাম দিও। উত্তর—Large Master come, give salam Master.

প্রশ্ন—গাড়ী তৈয়ার করিতে বল। উত্তর—Carriage ready call.

প্রশ্ন—আচ্ছা হুজুর। উত্তর--Allright, Sir.

বলা বাহুল্য গুণমণি বালক পরীক্ষায় 'পাস' হইল, তদনন্তর আট আনা পয়সা লইয়া শ্রীমান হেড্ বট্‌লার এই অদ্ভুত সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া চরিতার্থ করিলেন!. ঐ সার্টি-ফিকেট আমার কাছে এখনও মজুদ আছে, উহার অবিকল প্রতিলিপি দেওয়া যাইতেছে।

"Head butler of surtypikut. This paper is surtipikut to tomas sureby not lie for all noing tomas men or woman good boy and fit carvise

master and good pass eksamynation, and poor man and many family or christ bless. god kind master give carvise.

Paul Aratoomathu,

Head butler eksamyn."

এই বট্‌লার সম্প্রদায়ের খৃষ্টানের সংখ্যা সর্ব্বত্রই এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা খৃষ্টান কুলীন!! কারণ এই যে ইহারা মালাবার উপকূলের আদি-খৃষ্টান বলিয়া গণ্য। অনেকে বট্‌লারি ছাড়িয়া দিয়া কৃষিকর্ম্ম করে এবং গ্রামে বাস করে। ইহাদের এক এক স্থানে সহস্র সহস্র ঘরের বসতি, অনেক গ্রাম কেবল খৃষ্টানের গ্রাম বলিয়াই গণ্য। ইহাদের ধর্ম্ম ও উপাসনা প্রণালীতে অর্দ্ধ ভাগ খৃষ্টানত্ব, সিকি হিন্দুয়াণী এবং সিকি ভাগ দানব পূজা মিলান আছে। এই প্রস্তাবের এক স্থানে Murray সাহেবের নামোল্লেখ করিয়াছি, ঐ সাহেব আমাকে ইহাদের কয়েকটা উপাসনালয় দেখাইয়াছিল, ঐ সকল উপাসনালয় Church নহে, Chapel নহে, মশ্‌জিদ্ নহে, মন্দির নহে, অথচ দেবালয়! নাগোর কোয়েল্‌ জেলার একটা গ্রামে একটা উপাসনালয় দেখিলাম, মন্দিরের সম্মুখস্থ দেওয়ালে অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম দশটি অক্ষর এবং মালয়লী ভাষায় তাহাদের নাম খোদা আছে, অবিকল প্রতিলিপি দিতেছি—

1	2	3	4	5
উব্	রুণ্ডে	মুড্	নাল্	আঞ্চি
6	7	8	9	10
আর্	ইয়েড্ড	এট্টে	উনপৎ	পৎ

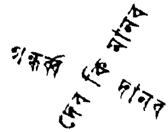
আর একটা উপাসনালয় দেখিলাম, তাহার দ্বারদেশের খুব এক পুরাতন অথচ বৃহৎ প্রস্তরে একটা মালয়লী কবিতা ঠিক নিম্নলিখিত ভাবে খোদা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে মনে কর কবিতাটী এই—

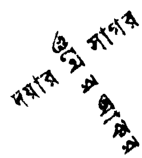
গন্ধর্ব্ব মানব
দেব কি দানব
কে বলিতে পারে ?
দয়ার সাগর
গুণের আকর
রূপে দেব হারে ॥

প্রস্তাবে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে কবিতাটি যেরূপে খোদা আছে, তাহা ঠিক এই—

(বাম ভাগ) (দক্ষিণ ভাগ)

কে বলিতে পারে ? রূপে দেব হারে ॥





তৃতীয় উপাসনালয়ে একটা কবিতা ঠিক চীনদেশের কবিতা লিখিবার প্রণালীতে খোদা আছে। পাঠকের বোধহয় জানা আছে যে, চীনেরা উপর হইতে নীচে লিখিয়া থাকে; আমাদের ন্যায় বামপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে লেখা শেষ করেনা। দৃষ্টান্তে মনে কর, ঐ কবিতাটি এই—

"হায় বিদ্যা, কোথা বিদ্যা, কবে বিদ্যা পাব।
কোন্ বিদ্যা-প্রভাবে, বিদ্যা-বিদ্যমানে যাব ॥
যদি কালী কুল দেন কুলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ॥"

এইরূপে খোদা আছে—

হা	দ্যা	কো	বি	ব ॥	দে	ন।	কি	ন।
য়	ক	ন্	দ্যা	য	ন	ম	ম্বা	
বি	বে	বি	বি	দি	কু	স্ত্রে	শ	
দ্যা	বি	দ্যা	দ্য	কা	লে	র	রী	
কো	দ্যা	প্র	মা	লী	আ	সা	র	
থা	পা	ভা	নে	কু	গ	ধ	প	
বি	ব।	বে	যা	ল	ম	ন	ত	

আর একটা উপাসনালয়ের দেওয়ালে, খৃষ্টের ক্রুসের আকারে একটা ছোট প্রবাদ বাক্য খোদা আছে, ঐ প্রবাদের অর্থ এই যে "আলোকে অন্ধকার পলায়, খৃষ্টের নামে মহা পাপ পলায়।" উহার আকৃতি এইরূপ—

আ
লো
কে
খৃ ষ্টে র না মে ম হা পা প প লা য়।
ন্ধ
কা
র
প
লা
য়।

এক্ষণে আর একটা উপাসনালয়ের বিবরণ দিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। অনেকে জানেন, পৃথিবীতে হিব্রু এবং আরব্য হইতে প্রস্তুত ভাষাগুলি ভিন্ন আর কোনও ভাষা, দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে লিখিত হয়না, কিন্তু মালাবার উপকূলের পুরাতন Dominican সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদের মধ্যে এইরূপ লেখা প্রচলিত আছে, একটা খুব প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে একটা কবিতা এইরূপ খোদা আছে। মনে কর কবিতটী এই—

"হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সমতার তাপে॥"

খোদা এইরূপ—

পে শা র র্ণে ব সু পা চাঁ ত ড়ি ত দ্রা রি হ।
পে তা র তা ম স ঝি বু র ণ্ডু পা ণ র ব॥

এই সকল মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া, মনে মনে ভাবিলাম প্রথম উপাসনালয়ের দেওয়ালে অঙ্কশাস্ত্রের প্রথম অক্ষর কয়েকটি খোদা থাকিবার কারণ কি? বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সম্রাট Constantineএর রাজত্ব কালে Actins এবং Eunomins নামে দুইজন খৃষ্টান "বিশপের" অভ্যুদয় হয়, ইহাদের প্রথমোক্ত ব্যক্তি গণিত শাস্ত্রে বেশ দক্ষ ছিল এবং ধর্ম্মবিষয়েও গণিত মিলাইত, ইহার সময়েই উপাসনালয়ের দেওয়ালে numerical figures খোদা হইতে আরম্ভ হয়। রবার্টশন সাহেব লিখিতেছেন "Actins acquired a knowledge of mathematics and he insisted, on applying the rules of this Science as the measure of religious truth."

এ সম্বন্ধে "History of the Christian Church" By James C. Robertson, M.A., Book II, Chap. II দ্রষ্টব্য।

কাব্য-বিজ্ঞান।

চন্দ্রের ইতিবৃত্ত।

নূতন নূতন যবে
বিশ্বরাজ্য সৃষ্ট হয়েছিল,
একদিন সে রাজ্যের মন্ত্রীবর আসি,
বিশ্বের রাজারে নিবেদিলঃ—
"রজনীতে চন্দ্র কেন ওঠে?
আলোকের কিবা প্রয়োজন?
দিবসের পরিশ্রম যথেষ্ট নহে কি?
রজনী ত বিশ্রাম কারণ।
"আলোকেরই প্রয়োজন যদি,
এরণ্ড সর্ষপ আদি জন্মিবে প্রচুর।
মানব, উদ্যমশীল,—পারিবে না তারা
এক্ষুদ্র অভাবটুকু করিবারে দূর?
"রাজনীতি-বিশারদ মহারাজা তুমি,
কেন তব অপব্যয় এত?
আমি বলি পরামর্শ, অনর্থক উহা,
চন্দ্রটারে কর পদচ্যুত।"
মন্ত্রীর শুনিয়া কথা,
ভগবান চন্দ্রমারে দিলেন বিদায়।
নিশি নিশি অমাবস্যা কতযুগ ধরি
রহিল ধরায়।

কিছুই আপত্তি কেহ কভু না করিল;
অবশেষে, প্রণয়ী দম্পতি,
একদিন হাসি হাসি আসি,
বিভুপদে করিল প্রণতি।

ভগবানে বলিয়া কহিয়া,
অনেক করিয়া অনুনয়,
অভিমত করিল তাঁহার;—
আকাশেতে আবার হইল চন্দ্রোদয়।

চন্দ্র ত গিয়াইছিল;
প্রণয়ীর উদ্‌যোগেতে হইল আবার।
সে অবধি প্রণয়ীরই সম্পত্তি ওখানা;
চন্দ্রটাতে তাহাদেরি পূর্ণ অধিকার।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা

পদার্থ-বিজ্ঞানে এত উন্নতি হইল;—
তাড়িত ছুটিয়া
ধরা প্রদক্ষিণ করি একাদশ বার
নিমেষেই আসিছে ফিরিয়া;
প্রণয় বিজ্ঞানে তবে কেন না হইবে?
—আমরা করেছি আবিষ্কার;
চুম্বনের বিনিময় বিরহী-প্রণয়ী
স্বচ্ছন্দে করিবে এইবার!

পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে ছাদের উপরে উঠি,
প্রণয়ী বা প্রণয়িনী আছেন যেখানে,
মান চিত্রে সেই গ্রাম, নগর অথবা পল্লী
যে দিকে অঙ্কিত, মুখ ফিরি তার পানে;
তিনবার প্রিয়নাম মৃদু উচ্চারণ করি
একটি চুম্বন দিবে বাতাসে ছাড়িয়া।

তিনবার সেই নাম আবার করিবা মাত্র,
শতটি প্রতিচুম্বন পাবে ফিরাইয়া।
ধাতু যথা তাড়িতের সু-পরিচালক,
সেইরূপ, (আমরা করেছি আবিষ্কার)
প্রণয়ীর চুম্বনের পূর্ণিমা-কিরণ।
প্রার্থনীয় পরীক্ষা সবার।

দর্বেশিণী।

"রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
বিস্ময়ে মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ॥" (গীতা)

সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য বশতঃ হউক, বঙ্গ দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোনও সময়ে আমাকে চৌকিদারের সর্দ্দারী অর্থাৎ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী এবং ডেপুটী কালেক্টরী করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে ছার সর্দ্দারীও অধিক দিন টিকিলনা; বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি বর্ণিত "কাণুর পিরীতি বালুর বাঁধের" ন্যায় দেখিতে দেখিতে আমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী নষ্ট হইয়া গেল; আমি চাকুরী ছাড়িলাম, অথবা স্পষ্ট কথায় বলিতে হইলে, গবর্ণমেণ্ট আমাকে চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য করিলেন। ডেপুটীগিরি পদটি ত্যাগ করিতে কেন বাধ্য হইয়া ছিলাম, এত দিন পরে সে পুরাতন অপ্রিয় কথা আর না তুলাই ভাল। একদর্শী আইনের চর্ব্বিত চর্ব্বন অথবা কুট রাজনীতির উদ্গীরিত উদ্গীরণ যত কম হয় ততই মঙ্গলকর। সংক্ষেপতঃ বলিয়া রাখা উচিত, আমার সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছে, ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীর হস্তে পড়িয়া নিত্য নিত্য বহু সংখ্যক দেশীয় হাকিমের ভাগ্যে তাহা ঘটিতেছে দেখিতে পাই-তেছি। বহু দিবস হইতে যাঁহারা সম্বাদ পত্র পড়িয়া আসিতেছেন, আমার নাম শুনিলে বোধ হয় আমার মোকর্দ্দমার কথা তাঁহাদের স্মৃতি পথে উদয় হইতে পারে। আমি যখন ডেপুটীগিরি করিতাম তখন একটি অতীব অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে ঘটনার আদ্যন্ত বিবরণ এ পর্য্যন্ত কোন সমাচার বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় নাই; যে বৎসরে এই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল সেই বৎসরের শেষভাগে আমি গবর্ণমেণ্ট সমীপে ইহার সম্পূর্ণ (রিপোর্ট) বিবরণী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা এখনও সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়নাই। ভরসা করি, "ভারতীর" বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠক মহাশয়েরা এই আশ্চর্য্য ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণী পাঠ করিয়া ইহার কারণ নির্ণয়ে যত্নপর হইবেন। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার

সত্যাসত্যের জন্ম আমি নিজে সম্পূর্ণ দায়ী, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কোনও রাজনৈতিক কারণে কোন কোনও স্থান এবং কর্ম্মচারীর নাম গোপন রাখিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।

বঙ্গদেশে কিছুদিন চৌকিদারের সর্দ্দারী করিবার পরে আমি সুবে বেহারে স্থানান্তরিত হইয়াছিলাম। যে বিস্তৃত মহকুমায় আমি প্রেরিত হইয়া ছিলাম, তথায় একজন ইউরোপীয় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, আমি তাঁহার সহায়ক স্বরূপে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি প্রথম শ্রেণীর এবং আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হাকিম ছিলাম। এই স্থানের নাম মনে করুন ক। এই মহকুমায় বদলী হইয়া আসিবার পূর্ব্বে অন্যান্য যে সকল স্থানে ছিলাম তথায় যে পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হইত, এখানে তাহার চতুর্গুণ পরিশ্রম করিয়াও আদালতের কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিতাম না, সুতরাং মাসের মধ্যে প্রায় ২৫ দিন, রাত্রি ৭।।০টা বা ৮টা কখনও বা ৯টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইত। সাহেব বাহাদুর (জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট) নেটিব হাকিমের উপর সমুদয় কার্য্য সমর্পণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, কেবল বড় বড় ফৌজদারী মোকর্দ্দমা গুলির বিচার বা সেসন সোপর্দ্দ করিতেন। সমস্ত দিন রজক-বাহনের ন্যায় খাটিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রাত্রিকালে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। আমার বাংলো বাসাবাটি গঙ্গাতটে অবস্থিত ছিল; বাঙ্গলোটি প্রশস্ত, রমণীয়, স্বাস্থ্যপ্রদ এবং নগরের বহির্দ্দেশে এক অতীব বিস্তৃত ময়দানের মধ্যে অতি সুন্দর ভাবে অবস্থিত ছিল। ইহার চারিদিকে অতি পুরাতন অত্যুচ্চ মহীরুহ সমূহ দণ্ডায়মান থাকিয়া বাঙ্গলোকে পথিকের দৃষ্টি পথের প্রায় বহির্দ্দেশে গোপনীয় ভাবে ঢাকিয়া রাখিত। বায়ুর সুবিধার জন্য দুই একটি বড় বৃক্ষকে আমি কাটিয়া দিয়াছিলাম, এই নূতন পথ দিয়া মহকুমার জমিদারদিগের অশ্ব এবং অশ্বশকট আমার বাঙ্গালো বাসায় আসিত। যে দিন গাছ কাটা হয়, সে দিন এক জন ধনবান বণিক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে বলিলেন "গাছ কাটাইয়া দিয়া আপনি ভাল করেন নাই, এই গাছে অতি প্রাচীন কাল হইতে এক বলবান ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত।" তিনি আরও বলিলেন "মহাশয় আপনার এই বাঙ্গলো ঘর প্রেতযোনির প্রিয় আবাস স্থান। এ ঘরে বড় বড় ভূত থাকে; এই জন্য অনেকে এ ঘর ভাড়া লয় না; আপনি এই জন্য অতি সামান্য টাকায় এত বড় বাংলো ভাড়া পাইয়াছেন।" বাস্তবিক আমার বাসার নিকটে মনুষ্যাবাস ছিলনা এবং বাঙ্গলোর সম্মুখস্থ সদর রাস্তা দিয়াও দিবসে অতিঅল্প লোক যাতায়াত করিত; দিবা ৫ টার পরে পরদিন ৫টা (প্রভাত) পর্য্যন্ত মনুষ্যের দর্শন পাওয়া ভার ছিল। বণিক মহাশয় বলিলেন "আপনার বাঙ্গলোর নীচে যে সুরধনী গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে ইহার অপর পার্শ্বে এবং আপনার বাসা বাটীর সম্মুখে পূর্ব্বে হিন্দুর শবদাহ হইত।' মৃত দেহের দাহ হওয়ায় বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হয় এই ভয়ে ভূতপূর্ব্ব জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিষ্টর টো—এখান হইতে শ্মশান উঠাইয়া দেন, তদবধি গঙ্গার অন্যদিকে প্রায় এক মাইল দূরে হিন্দুর মৃতদেহ দাহন করা হয় কিন্তু এই আদেশ

জারী হইবার পর হইতেই সাহেবের কুঠীতে (অর্থাৎ এই বাঙ্গলো ঘরে) ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। মিষ্টর টৌ—অনেক দিন এই বাসায় ছিলেন, তাঁহার বদ্‌লী হইবার পরে আর কেহ ইহা ভাড়া লয়েন নাই ; আপনি বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রদর্শী হইয়া কেন এরূপ ভ্রম করিলেন, ধুঝিতে পারিলাম না। এই বাটীর নিকটে গোপ (আহির) জাতীয় অনেক হিন্দু এবং কসাই শ্রেণীর অনেক মুসলমান বাস করিত, ভূতের ভয়ে তাহারা সকলে পলাইয়াছে, এখন এ স্থানটি জনশূন্য। আপনি শীঘ্র এ বাংলো ছাড়িয়া দিউন।” বণিক মহাশয় চলিয়া গেলে আমি আমার সহধর্ম্মিণীকে বণিকের কথা শুনাইলাম। আমার স্ত্রীর তখন বয়স খুব অল্প এবং আমারও বয়স তখন অল্পই ছিল। (আমার এত অল্প বয়সে ডেপুটীগিরি হইয়াছিল যে, অনেক পাঠকে তাহা শুনিলে বোধ হয় বিস্মিত হইবেন।) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “লেখাপড়া” শেষ করিয়া আমার শ্বশুর মহাশয়ের যত্নে এবং তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সহিত তাঁহর বিশেষ বন্ধুতার জোরে আমি নিতান্ত ছেলে বেলায় এক মহাদায়িত্ব সূচক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম ; যখন আমি পূর্ব্ববঙ্গে প্রথমে প্রেরিত হই তখন বাস্তবিক নিজেই বুঝিতাম না “কি দোষে পূর্ব্ববঙ্গের পঞ্চবটীতে আমার বনবাস হইতেছে।” যাহাহউক, স্ত্রী অল্পবয়স্কা হইলেও অল্প বুদ্ধিশালিনী ছিলেন না ; অতি সুন্দর রূপে হিন্দি ও বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন এবং অল্প অল্প সংস্কৃত এবং অল্প অল্প ইংরাজি ও বুঝিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বেও এই প্রস্তাবোল্লিখিত আশ্চর্য্য ঘটনা স্মরণ করিয়া আমাকে সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন। (এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।) 'বণিকের কথা শুনিয়া সহধর্ম্মিণী বলিলেন “ কথাটা অনুসন্ধান করিয়া দেখা ভাল; এ জনরব কোথা হইতে কেমনে উঠিল এবং কি জন্য এখান হইতে পূর্ব্বতন অধিবাসীরা পলাইয়াছে তাহার অনুসন্ধানে ক্ষতি নাই।” পর দিবস আমি প্রাতঃকালে “সহর কোতোয়াল” কে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। বেহারে প্রধান প্রধান নগর বা মহকুমার থানার দারোগাকে সহর কোতোয়াল বলে। বণিকের কথা সত্য কিনা এবং ভূতের জনরবের কোথা হইতে সূত্রপাৎ হইয়াছে ইহার গুপ্ত অনুসন্ধান জন্য দারোগাকে আমি আদেশ করিলাম। ·চারি দিবস পরে কোতোয়াল আমাকে যে বিস্তৃত গোপনীয় রিপোর্ট পাঠাইলেন তাহা পড়িতে পড়িতে আমার রোমাঞ্চ হইল। আমি সহধর্ম্মিণীকে রিপোর্ট শুনাইলাম না, বলিলাম “দারোগা বলিতেছে ভূতের জনরব অনেক দিন হইতে এখানে প্রচলিত আছে।” স্ত্রীও আর কিছু বলিলেন না। ইহার দুই দিবস পরে পুলীশ ইন্‌স্‌পেক্‌টর কোনও সরকারী কার্য্যের জন্য আমার সহিত বাঙ্গলোয় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইন্‌স্‌পেক্‌টর মিথিলা দেশীয় সদ্বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁহার সুন্দর স্বভাব, পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি, দেখিয়া তাঁহাকে ভাল লোক বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল এবং বাস্তবিকই তিনি অতি ভদ্রলোক ছিলেন। সরকারী কার্য্য সমস্ত হইলে ইন্‌স্‌পেক্‌টর বলিলেন “They say that this bungalow is haunted by—”আমি

কিছু উত্তর করিলাম না। তিনি আবার বলিলেন "Many have seen with their own—" আমি তবুও কিছু বলিলাম না, ইন্‌স্‌পেকটর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। আমার অধীনস্থ তদানীন্তন জনৈক মুসলমান সব্ ডেপুটি কলেক্টর তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন "We are now living in an age of superstition," কিন্তু মৌলবী সব ডেপুটী অনেক দিন পরে আমাকে বলিয়াছিলেন "There are more things under the Sun than Horatio has ever dreamt of in his philosophy!"

ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমি একদিন রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় কাছারী হইতে বাসা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম, সে দিন আমার হাতে আবকারী ও মিউনিসিপালিটি সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দোবস্তের ভার ব্যতীত অনেক গুলি ফৌজদারী মোকর্দ্দমা ন্যস্ত ছিল। একজন মুসলমান "দর্ব্বেশিণী" (সন্ন্যাসিনী) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৯ ধারানুসারে (চুরী মোকর্দ্দমায়) অভিযুক্তা হইয়া বিচারার্থ আমার সমীপে পুলীষ কর্ত্তৃক আনীতা হইয়াছিল। এই স্ত্রীলোক উর্দ্দু ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিতা, আরব্য কোরাণ ও মুসলমান ধর্ম্মতত্বে বিশেষ পারদর্শিনী, সৈয়দকুলসম্ভূতা, "সুফি" সম্প্রদায়ভুক্তা, সংসার ত্যাগিণী; অবিবাহিতা এবং অতিউচ্চ অঙ্গের ব্রহ্মবাদিণী বলিয়া প্রসিদ্ধা। তাঁহাকে দেখিলে ভদ্র বংশের লোক বলিয়াই বোধ হয় এবং তাঁহার অনেক গুলি অসাধারণ গুণ বা ক্ষমতার জন্য হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তেরা তাঁহার যথেষ্ট আদর করিত। ইরাণ দেশবাসিনী এই স্ত্রীলোক সুন্দরস্বভাবসম্পন্না বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; নানা দেশে পরিব্রাজন করায় বহুদর্শনজ জ্ঞান তাঁহার যথেষ্ট ছিল একথাও বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানবর্ত্মের পথিক হইয়া, প্রভূত গুণের অধিকারিণী হইয়া, এই স্ত্রীলোক সামান্য চুরী মোকর্দ্দমায় কেমনে লিপ্তা হইল, ইহা আমার নিকটে এক বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এদিকে পুলীশের ইনস্‌পেক্‌টর (যিনি মোকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিয়াছেন) অতীব শিক্ষিত ও সাধুলোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; মিথ্যা মোকর্দ্দমা তাঁহার চক্ষের শূল ছিল একথা আমিও বিশ্বাস করিতাম; তিনি নিজে রিপোর্ট করিয়াছেন "দর্ব্বেশিণী (ফাতেমা সাঁইয়া) চুরী করিয়াছে, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।" যে মোকর্দ্দমায় ফাতেমা (দর্ব্বেশিনী) লিপ্তা ছিল, তাহা এক অতি ঘৃণিত এবং নীচ শ্রেণীর চুরী, শুনিলেই লোকের ঘৃণা হয়। ফাতেমার বিরুদ্ধে যত লোক সাক্ষ্য দিল, তাহারা ফাতেমার গুণ কীর্ত্তণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে "চোর" বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিল। সাক্ষীর মুখে, পুলীশের রিপোর্টে, আইনের যুক্তিতে, সরকারী মোক্তারের তর্কে, নিজের যৎসামান্য বিদ্যা বুদ্ধিতে আমি দর্ব্বেশিনীকে অপরাধিনী স্থির করিলাম; কিন্তু "রায়" দিলাম না; "তিন দিন পরে রায় শুনাইব" এই কথা বলিয়া মোকর্দ্দমা মুলতবী রাখিলাম। পরদিন স্বয়ং ঘটনা স্থানে গিয়া যাহা কিছু জানিতে পারিলাম তাহাতে ফাতেমার অপরাধ আরও প্রমাণীকৃত হইয়া গেল। ইহার ঠিক একদিন পরে

মধ্যাহ্নে কাছারী না হইয়া প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কাছারী হইবার হুকুম হইল। জ্যৈষ্ঠমাস, গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত এই আদেশ হইয়া ছিল; প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দিবস রাত্রে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দর্ব্বেশিনীর মোকর্দ্দমার কথা আদ্যন্ত বর্ণণা করিলাম, তিনি ইহাকে শাস্তি দিতে পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিবস প্রাতে ৮ টার সময় ফাতেমাকে হাজৎ হইতে আমার কাছারীতে আনা হইল, আমি তাহাকে তিন মাসের কঠিন পরিশ্রম সহ কারাদণ্ডের হুকুম শুনাইলাম। দর্ব্বেশিনী বলিল ঈশ্বর আপনার ভাল করুণ, নিরপরাধিনীকে বিনা কারণে আপনি প্রাণে মারিলেন। পুলীষের লোকেরা ফাতেমাকে দাঁড়াইতে দিলনা, অবিলম্বে জেলের রাস্তায় লইয়া চলিল, কিন্তু আদালত হইতে বাহির হইবার সময় দর্ব্বেশিনী আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু স্বরে কি বলিল তাহা শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু সে সময়ে তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে ছিল, এমত বোধ হইল। সমুদয় মুখে (অর্থাৎ চক্ষু, কপোল, কপাল ইত্যাদি স্থানে) এক অপূর্ব্ব অভিনব দেব-শ্রী দেখিতে পাইলাম, এই আধ্যাত্মিক বিদ্যুতের তেজে আমার রোমাঞ্চ হইল, লিখিতে লিখিতে হাত হইতে লেখনী পড়িয়া গেল, আমি আত্মহারা হইলাম। কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঝটিতি বাসা বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম; সেদিন কাজও কিছু কম ছিল। ইহার একাদশ দিবস পরে শুনিলাম, কারাগারে দর্ব্বেশিনীর মৃত্যু হইয়াছে! ডাক্তার রিপোর্ট করিলেন "She died of melancholia, sore throat and *tic doloreaux*." জেলের জমাদার আসিয়া বলিল "সাহেবের বুঝিবার ভুল, এমন অসাধারণ মৃত্যু ও অসাধারণ মানব আর কখনও দেখি নাই; ইহা মৃত্যু নহে, জীবন্মুক্তির পরে নবজীবন।" এই জমাদার কাশীনিবাসী ছিল, জাতিতে ব্রাহ্মণ। নগরের মুসলমানেরা ফাতেমার মৃতদেহ যথারীতি সমাধিস্থ করিল; ঐ কবর আজিও বর্ত্তমান। অনেক ইংরেজ (যাঁহারা এই প্রস্তাবের ঘটনাগুলি শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চ কলেবর হইয়াছেন, তাঁহারা) এই গোরস্থান দেখিয়া বলিয়াছেন "A mysterious Iranian nun indeed." অতি অল্প দিন হইল আমি আমার এক গুণগ্রাহী বন্ধুর ব্যয়ে ঐ কবরের উপরে এক প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর সমাধিস্তম্ভ তৈয়ার করিয়া দিয়াছি। স্তম্ভ প্রস্তরের উপরে এক অতীব উচ্চ অঙ্গের পারস্য কবির বিরচিত এক সুপ্রসিদ্ধ কবিতা খোদিত হইয়াছে, সেই মনোহর শ্লোকটি এই—

"কারে মা ফিক্‌রে মা আজারে মা।
কারসাজে কারে মা দর কারে মা॥"

নগরের মুসমান ভদ্রলোকেরাও ফাতেমার সমাধির নিকটে একটি তৃণবেষ্টিত প্রস্তরখণ্ডের উপরে লিখিয়া দিয়াছে—

অজ্‌তগ্‌ ফের্‌ উল্লা রবিমিন্‌ কুল্লে
জম্বি, য়োগ্না অতুবো ইলে।"

(কোরাণ)

উপরের পংক্তিটি মূল কোরাণ হইতে উদ্ধৃত। আমিও ইহার নিম্নে কোরাণ হইতে আর একটি পংক্তি বসাইয়া দিয়াছি,—

"লা হোল্ বেলা কুবতে ইল্লা
বিল্লাইল্, অলি উল্ আজীম্।"
(কোরাণ)

ইহাতে ও পূর্ণতৃপ্তি না হওয়ায়, "বাঘ-ও-বাহার" প্রণেতা মহাকবি সেখ খসরুর একটি জগত প্রসিদ্ধ কবিতা খোদিত করিয়া দিয়াছি, তাহা এই—

খুসরো গরিব অস্‌ৎ গদা, য়োফ্‌তাদর্ কোয়ে সোমা।
বায়েদ্‌কে অজ্‌বহরে খোদা, সুঁযে গরিবাঁ বিন্ গৃ॥"

মৃতা সাঁইয়া ফাতেমার স্মৃতিচিহ্নকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য আমরা কেন এত যত্ন করিয়াছি, চৌর্য্যাপরাধে অপরাধিনী কারাবাসিনীর জন্য কেন এত প্রাণ কাঁদিয়াছে, ধৈর্য্য সহকারে এই প্রস্তাবের আদ্যন্ত পাঠ না করিলে পাঠক মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি "দ্বিবাচা"ই লিখিয়া আসিতেছি; পারস্য দ্বিবাচা শব্দের অর্থ উপক্রমণিকা। এইবারে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্তাব আরম্ভ হইবে কিন্তু শেষ হইতে এখনও অনেক বাকী। এই অভেদ্য প্রহেলিকাবৎ অদ্ভুত কাণ্ড লিখিতে লিখিতে এতদিন পরেও আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। এই মায়াময় সংসারে যিনি বলিয়াছেন "ভ্রাময়ণ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া" তিনি ভিন্ন এই মহা রহস্যপূর্ণ ঘটনার অর্থ কে বুঝাইতে পারে ?

ফাতেমার মৃত্যুর কয়েক দিবস পরে একদিন সায়াহ্নে আমাদের বাংলার বারান্দায় বসিয়া আমি গঙ্গাজলের স্রোতরাশি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। জ্যৈষ্ঠমাস, ভয়ানক গ্রীষ্ম, সুতরাং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমি গঙ্গাতটে বারান্দায় বসিয়া থাকিতাম, সহধর্ম্মিণীও প্রায় নিকটে বসিতেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল, এমন সময়ে বৃদ্ধ চাপরাসী আসিয়া বলিল "হজুর! পরশ্ব রজনীতে পাহারা দিবার সময় কনেষ্টবল মুলচাঁদসিং বড়ই ভয় খাইয়া ছিল, কাল রাত্রেও সিপাহী নাদির খাঁ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, এজন্য অদ্যরাত্র হইতে যোড়া পাহাড়া করিলে ভাল হয়।" যোড়া পাহাড়ার অর্থ দুইজনে একত্রে পাহাড়া দেওয়া। আমি ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া যোড়া পাহাড়ার হুকুম দিলাম; পাছে স্ত্রীর মনে ভয় হয় এইজন্য তাঁহার সম্মুখে বৃদ্ধ চাপরাসীকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই। বিশ্বস্ত বৃদ্ধ চাপরাসী চলিয়া গেলে, গঙ্গা তটের বারান্দায় রাত্রে ভোজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, ব্রাহ্মণ পাচক এবং পাচিকা আমাদের আহার্য্যদ্রব্য দিয়া গেল, আমরা ভোজন করিতে বসিলাম। রাত্রি আনুমানিক দশটার সময়ে ভোজনাদি সমাপন করিয়া আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়ে আমার অশ্বশকটবান আসিয়া ভয় ও বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "হজুর! দুইজন কনেষ্টবল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে„ এবং চাকর (ভোঁজলা) কাঁপিতেছে। ভোঁজলার মাতা বলিতেছে,

ইহারা ভূত দেখিয়াছে।” সইষের মুখনিঃসৃত শেষ পংক্তিটি অনেক কষ্টে বুঝাগেল; বুঝিতে পারিয়া অকস্মাৎ কি জানি কি কারণে অনেক দিনের এক পুরাতন শ্লোক স্মরণ হইল।

যোগেশ্বরং চারুবিচিত্র মৌলিং
জ্ঞেয়ং সমস্তং প্রকৃতেঃ পরস্তম্॥
তং বেদ গুহ্যং পুরুষং পুরাণং
বরংদিরে বেদবিদাং বরিষ্ঠম্॥

দৌড়িয়া ফাটকের দিকে গেলাম, গিয়া দেখি সইষের উক্তি সত্য। বাস্তবিকই দুই-জন পাহারাদার এবং ভোঁজলা অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে; সইষের অবস্থিতি পর্য্যন্ত ভোঁজলা কাঁপিয়াছিল কিন্তু সইষ আমার নিকটে চলিয়া আসিলে ভোঁজলা কাঁপিতে কাঁপিতে অচেতন হইয়া পড়ে। অনেক কষ্টে ও যত্নে তিন জনের চেতনা সম্পাদন করিলাম, তাহারা তিনজনে প্রায় একই এজাহার দিয়াছিল। ঐ এজাহারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ না করিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

[কনেষ্টবল মূলচাদ সিং ওরফে মুন্সীসিংহের এজাহার]

“কয়েক দিবস হইতে দিনের বেলায় আমাকে থানার কার্য্য করিতে হইতেছে এবং রাত্রে আমি এই বাংলোতে পাহাড়া দিতেছি; পরশ্ব রাত্রে আমি একটা স্ত্রীলোককে বাং-লোর ফাটক দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম, তাহার হাতে মশাল ছিল, ঐ মশাল অতি ক্ষীণ ভাবে জ্বলিতে ছিল, ঐ ক্ষীণালোকে স্ত্রীলোকের চেহারা স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই। স্মরণ হইতেছে, মাগীর মাথায় একটা খুপ্ড়ী অর্থাৎ মৃত মনুষ্যের মস্তকের খুলী ছিল। আমার সম্মুখে ঐ স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কি বলিতে ছিল, বলিবার সময়ে তাহার খুপ্ড়ী পড়িয়া যায়, তাহা আমি দেখিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? সে বলিল তিবরা।* এই কথাটা আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি কিন্তু আমি ইহার মানে জানি না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি জন্য আসিয়াছ? এইকথা শুনিয়া সে মাথার খুলীতে হাত দিল এবং তাহার মধ্যে হাত দিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গায়েব্ (অদৃশ্য) হইয়া গেল। অদ্য রাত্রে আমার পাহাড়া ছিল, ঐ স্ত্রীলোককে আবার আসিতে দেখি-য়াছি। আজ তাহার হাতে সেই মশাল ছিল, খুলীও ছিল। আমি তাহাকে দেখিয়াই ভীত হইলাম; সে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, ভাষা বুঝিলাম না। স্ত্রীলোকটা একটা বিকট মূর্ত্তি দেখাইল, সেরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি কল্পনার অতীত। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আমি কাঁপিতে লাগিলাম, কাঁপিবার সময়ে দেখিলাম স্ত্রীলোকটা সম্মুখস্থ এক বৃক্ষের শাখায় পা

* আমি নিজে পারস্য ভাষা জানি, অনেক বৎসর ব্যাপিয়া পারস্য উর্দ্দু ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছি এই তিন ভাষায় “তিব্রা” শব্দ নাই আরবে তিবকল্ শব্দ আছে কিন্তু তাহার অর্থ যাহা, তাহা এখানে প্রযোজ্য হইতে পারেনা।—লেখক।

রাখিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিল, মনুষ্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব, ইহা দেখিয়াই আমি জ্ঞানশূন্য হই, তাহার পর কি হইল জানি না।"

[সিপাহী নাদির খাঁ, সুবাদার-কনেষ্টবল নং ১৩র, এজাহার]

"মূলীসিং (খড়ীদার) যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক, আমরা উভয়ে একত্রে পাহাঁড়া দিতে-ছিলাম, আমার সহিত ভূতনীর (স্ত্রীলোকের) কথা হয় নাই, মূলী সিংহের সহিত হইয়াছিল। মূলীসিংহ যাহা দেখিয়াছে, আমিও ঠিক তাহাই দেখিয়াছি। ঐ স্ত্রীলোককে আমার ভূতণী বলিয়া বিশ্বাস। আর একবার মূলীসিং উহাকে দেখিয়াছিল, আমি তখন মূলার সঙ্গে ছিলাম না, অদ্য রাত্রেই ঐ ভূতণীকে প্রথম দেখিলাম। কল্য রাত্রে আমি অল্প ভয় খাইয়া ছিলাম; সে ভয়ের কারণ এই যে, পাহাড়া দিবার সময়ে বোধ হইয়াছিল যেন কেহ বৃক্ষের নীচে আলোকদান লইয়া দৌড়িয়া বেড়াইতেছে, আমি কোনও মূর্ত্তি দেখি নাই, আলোক দেখিয়াছিলাম। পাহাড়া ছাড়িয়া উহার অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। আলোকের নিকটে গেলে আলোক দূরবর্ত্তী হইত; পূর্ব্ব দিকে গেলে আলোক পশ্চিমে যাইত, পশ্চিমে যাইলে পূর্ব্বে দেখা পড়িত। আমি কোরাণের শ্লোক পড়িতে পড়িতে বৃক্ষের নিকট হইতে ফাটকে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। মূলী সিং যে আর একদিন ঐ স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিল তাহা আমাকে বলে নাই, চপরাসীকে বলিয়া ছিল, কিন্তু আমি যে আলোক দেখিয়াছিলাম তাহা মূলীসিংকে বলিয়াছিলাম।"

[ভোঁজলা নামক আমার নিজের চাকরের এজাহার]

" মূলীসিং এবং নাদির খাঁ অন্যান্য রাত্রে যাহা দেখিয়াছিল আমি তাহা দেখি নাই, তাহারা আমাকে একথা বলেও নাই। মূলীসিংহ ও নাদির খাঁ কনেষ্টবলগণ আজ রাত্রে স্ত্রীলোককে প্রথমে কেমনে দেখিতে পাইল, কি কি কথা হইল তাহা আমি জানি না; না জানিবার কারণ এই যে আমি তখন ইহাদের সঙ্গে ছিলাম না। আমি ছিলিমে তামাকু রাখিয়া নাদির খাঁর নিকট আগ্ লইতে আসিয়াছিলাম, ঠিক সেই সময়ে ঐ স্ত্রীলোক বিকট মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল, আমি সেই বিকটতা দেখিয়া মাগীকে ভূত বিশ্বাস করিয়া কাঁপিতে থাকি, তাহার পরে আমার অচৈতন্য হয়। অবশ্য আমি অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এই গাছে অথবা এই স্থানে ভূত থাকে কিন্তু ভূত কি ভূতনী তাহা ধারণা ছিল না। ভূত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, ভূতের মূর্ত্তি সম্বন্ধে আমার মনে কখনও ধারণা ছিল না। স্মরণ হয়, অনেক দিন (প্রায় ৪ বর্ষ পূর্ব্বে) একজন দোকানদার আমাকে বলিয়াছিল, সে ভূত দেখিয়াছিল, কিন্তু এখানে নহে, তাহার শ্বশুরের গ্রামে অর্থাৎ ভূরপুরে। দোকানদারের নাম নাথু, সে বলে সেই ভূত নারিকেল গাছের মত লম্বা কিন্তু হাত ছিল না।"

পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে এই তিন এজাহার পাঠ করিয়া হাসিতে পারেন অথবা তাঁহাদের মনোমধ্যে নানা প্রকারের ভাবের উদয় হইতে পারে, কিন্তু এই তিন

জনের মিথ্যা বলিবার কোনও কারণ ছিলনা। আমি যে পদে ছিলাম, সে পদের লোকের নিকট কনষ্টেবলেরা কথা কহিতে আদৌ সাহসী হয় না, বিশেষতঃ এই তিন জনকে ভাল লোক বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল। ডেপুটীর বাসা সম্বন্ধে একটা মিথ্যা ঘটনার কল্পনা করিয়া কল্পনাকে এরূপ গুরুতর করা কনষ্টেবল বা সইষের শক্তির ও বুদ্ধির অতীত, এরূপ সাহসও তাহাদের ছিল না। আমি যে প্রকৃতির লোক ছিলাম তাহাতে তাহারা আমার বাসা সম্বন্ধে একটা মিথ্যা ঘটনা ঘটাইয়া জনরব তুলিবে, একথা স্বর্গস্থ দূত আসিয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করিবনা; তবে কি বাস্তবিক তাহারা ভূত দেখিয়াছিল? বাস্তবিক কি কোনও ভূত আসিয়া ছিল? একথার উত্তরে সেই মৌলবী সব্‌ডেপুটীর উক্তিটা পুনরায় তুলিতে হয়; "There are more wonderful things under the sun than Horatio has ever dreamt of in his philosophy." কিন্তু পাঠক মহাশয়! এই ঘটনার অনুমাত্রও আপনাকে এখনও বলিতে পারিনাই; আরও পড়ুন, এবারে আপনি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবেন। সমগ্র ঘটনা শেষ হইতে এখনও অনেক বাকী।

অচৈতন্য হইতে চৈতন্য পাইয়া সিপাহীরা যখন দুই একটা স্থান দেখাইয়া আমাকে স্ত্রীলোকটার দণ্ডায়মান, গমন, বৃক্ষারোহণ ইত্যাদির নির্দ্দেশ করিতেছিল, সেই সময়ে থানার সব্‌ইনস্‌পেক্‌টার (দারোগা) নিয়মমত রাত্রির Round and patrol (রোঁদ্ গস্‌ৎ) করিয়া আমার বাংলার সম্মুখ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে যাইতেছিল। আমাকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিল এবং সেলাম করিয়া বলিল "ব্যাপার কি?" তাহাকে গোপনে সকল কথা শুনাইলাম। অবশেষে উভয়ে পরামর্শ করিয়া পাহাড়ার "জোর্ বন্দোবস্ত" করিলাম, তাঁহার সঙ্গে ৩ জন চৌকিদার ও দুই জন কনষ্টেবল ছিল, আমি তাহাদের সকলকে বাংলার পাহাড়ায় রাত্রির জন্য নিযুক্ত করিলাম। যাঁহারা ভূতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্য বলিতে পারেন "মানুষের পাহারায় কি ভূত বন্ধ হয়?" ভূত বন্ধ হয় না সত্য, কিন্তু পুলীসের পাহাড়ায় অনেক সময়ে ভূতেও ভয় খায়।

দারোগা চলিয়া গেলে, পাহাড়ার উত্তম বন্দোবস্ত শেষ হইলে, আমি আমাদের সেই বারাণ্ডায় ফিরিয়া আসিলাম। বারান্দায় একটা ছোট গোলাকার টেবিল ছিল এবং তাহার পার্শ্বে দুইখানি আরাম-কুর্সী ছিল, এই আরাম-কুর্সীর নীচে একখানি পাটনা জেলের গালিচাও ছিল; সমুদয় দ্রব্যগুলিকে ঠিক আপনাপন স্থানে দেখিলাম, কিন্তু কুর্সী মধ্যে উপবিষ্টা আমার সহধর্ম্মিণীকে দেখিলাম না। মনে করিলাম, অন্দরে গিয়াছেন; দাসীকে (যম্‌নী অথবা যমুনা বাইকে) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল "আমি মাতাজীকে ছাড়িয়া অনেক ক্ষণ চলিয়া আসিয়াছি। তিনি একাকিনী চেয়ারে বসিয়াছিলেন, অন্দরে নাই।" শুনিয়া বড়ই চিন্তা হইল, দুই একটী কাম্‌রা দেখিলাম, খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, পুনরায় গঙ্গার তটস্থ বারান্দায় আসিলাম এবারে এখানে আসিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে (বাংলার নীচেই) দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, ঘাটের ধাপে একজন

স্ত্রীলোক অর্দ্ধমৃতাবস্থায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। তীরের ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া দেখি আমার সহধর্ম্মিণী ঐ অবস্থায় পতিতা আছেন। অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, তাঁহাকে বাংলা মধ্যে লইয়া গেলাম, উপরের এক ঘরে বসাইলাম, কিন্তু বসিতে পারিলেন না। বহুযত্নে চেতনা সম্পাদন করিয়া জিজ্ঞাসিলাম "ব্যাপার কি?" উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না, আবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, আবার অনেক যত্নে চেতনা করিলাম, এবারে প্রবাল ভস্ম এবং লৌহজারণ একত্রে মধুর সহিত মাড়িয়া খাইতে দিলাম। এ ঔষধ আমার নিকটে ছিল। আমার বাসাবাটীতে, অনুগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মহাত্মারা প্রায়ই পদধূলি দিতেন; বদরিকাশ্রমের এক "যোগীন্দ্র পুরুষ" আমাকে ঐ মহৌষধ দিয়া গিয়াছিলেন, ঔষধের গুণও মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখা গেল, স্ত্রীর চৈতন্য, সাহস ও বল হইল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি?" স্ত্রী বলিলেন "বলিতে রোমাঞ্চ হয়। তোমার কৌতূহল অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি, অপরের নিকটে অবশ্য গোপন করিতাম।" এইকথা বলিয়া সহধর্ম্মিণী যাহা বলিলেন তাহা এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি।

"যাহা বলিব তাহা কল্পনা ও বর্ণনার অতীত। আমি নিজেই দ্রষ্টা হইয়া যখন বুঝি নাই, তুমি শ্রোতা হইয়া কেমনে বুঝিবে? তুমি বারাণ্ডা হইতে চলিয়া গেলে আমি গঙ্গার ঘাটে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে স্রোতের উদ্বেল দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে বোধ হইল যেন কেহ স্নান করিতেছে, ঐ মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের। আমাদের ঘাটে আমরা ভিন্ন অন্য কেহ আসে না এবং আসিতে পারে না, এ স্ত্রীলোকটা কে জানিবার জন্য উৎসুক হইলাম। দাঁড়াইয়া দেখি, অপরিচিতা স্ত্রীলোক; যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিলাম সে মূর্ত্তি মনুষ্যের হওয়া সম্ভব নহে। এমন সৌন্দর্য্য পাপভরা মানব জাতিতে হওয়া অসম্ভব, সে মূর্ত্তি মানুষিক নহে, স্বর্গীয়; সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে যাহা দেখিলাম, সে সমস্তই অলৌকিক। সে বেশ সন্ন্যাসিনীর বেশ; দয়া, কোমলতা, প্রেম, ব্রহ্মজ্ঞান এবং জগতের সমস্ত ভাল জিনিষের যেন সেই মূর্ত্তি—গঙ্গার ঘাটে বর্ত্তমান। ভক্তিভরে আমার শির আপনা হইতে নত হইল, আমি আস্তে আস্তে গিয়া সেই মহিমাময়ীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম; প্রণামের পরে গঙ্গাজল হস্তে লইয়া পাদ্যার্ঘ্য লইবার জন্য তাঁহার পাদস্পর্শের জন্য হাত বাড়াইয়াছি এমন সময়ে দেখি মুহূর্ত্ত মধ্যে সে মূর্ত্তি তিরোধান হইল, আমি ভীতা হইয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম শূন্যে সে মূর্ত্তির ছায়া, আমি হস্তস্থিত জল শূন্যস্থিত পদে নিক্ষেপ করিলাম, জল সে পদে পৌছিল না, কিন্তু উপরের জল নীচে না পড়িতে পড়িতে সেই মূর্ত্তিকে আমার সম্মুখে প্রায় একগজ প্রমাণ ব্যবধানে দাঁড়াইতে দেখিলাম, এবারে সে প্রেমময়ী মূর্ত্তি নাই, এবারে যে ভয়ঙ্কর বিকট মূর্ত্তি দেখিলাম সে মূর্ত্তির বর্ণনা হয় না, সে মূর্ত্তি কল্পনায় আসেনা; ভয় এবং বিকটতা হইতেও সে মূর্ত্তি অধিকতর ভয়ঙ্কর এবং বিকট। আমি ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম, তাহার পরে কি

হইয়াছে তোমরা জান।” কথা শুনিয়া আমার কি ভাব হইল তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। যাহা হউক আমরা সকলে রাত্রে একই ঘরে রহিলাম অর্থাৎ সমুদয় দাসী একই ঘরে রহিল। সমস্ত রাত্রিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার নিদ্রা হইল না, আমি বসিয়া বসিয়া যোগবাশিষ্ট পড়িতে লাগিলাম, চাকরাণীরাও জাগিয়া রহিল।

পরদিন রবিবার, কাছারী বন্ধ। প্রাতেই জয়েণ্ট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম, তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম। তিনি প্রবীণ ছিলেন আমাকে পুত্রের মত ভাল বাসিতেন। সকল কথা অতি গম্ভীর ভাবে জ্ঞানীর ন্যায় শ্রবণ করিয়া বলিলেন “তুচ্ছ করিওনা, এই অভেদ্য প্রহেলিকাময় সংসারে নিত্য নিত্য কোথায় কি সমস্যার পূরণ হইতেছে, আমাদের বুঝিবার শক্তি কোথায়? ধর্ম্মতঃ, সমাজতঃ এবং দেশাচার মত যাহা করা কর্ত্তব্য, করিও। তুচ্ছ করিও না। আমি নিজে রাতে গিয়া তোমার বাংলার আরও ভাল পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।” আমি চলিয়া আসিলাম। নগরের প্রধান প্রধান শাস্ত্রী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। বলা বাহুল্য তাঁহারা যাহা করিতে বলিলেন তাহা যথারীতি করিলাম। সেই অবধি ভূতের ভয় ঐ বাংলার সীমা মধ্যে অথবা নিকটে হয় নাই। কিন্তু ঘটনার শেষ হইল কি? দর্ব্বেশিনীর রহস্যের এতক্ষণে এই সূত্রপাৎ হইল। এবারে পাঠক মহাশয়কে অদ্ভুত হইতে অদ্ভুততর ঘটনাস্থলে যাইতে হইবে।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। মূর্ত্তির রূপ বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইলে, আমার স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “ঐ স্ত্রীমূর্ত্তির কেশ, পরিচ্ছদ ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহি।” সহধর্ম্মিণী যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, সেই বর্ণনা লইয়া ফাতিমার সমস্ত চেহারার সহিত প্রায় মিলে। ফাতিমারও বাস্তবিক ঐরূপ রূপ ছিল। ভোঁজলা ও সিপাহীরা স্ত্রীলোকের (অথবা ভূতনীর) যে বর্ণনা দিয়াছিল, সে বর্ণনা ফাতিমার রূপ ও কাপড়ের বর্ণনা। অথচ ইহাদের কেহই ফাতিমাকে দেখে নাই, ফাতিমার মোকদ্দমার গল্পও ইহারা শুনে নাই। পাঠক মহাশয় কি বলিতে চাহেন, ইহাঁরা সকলেই মিথ্যাবাদী? যদি পাঠক মহাশয়ের এখনও তৃপ্তি না হইয়া থাকে, আইসুন, আপনাকে আমি এমন এক স্থানে লইয়া যাইতেছি, যেখানে আপনার বিজ্ঞান হারি মানিয়া পলাইবে।

ব্রাহ্মণবর্গ কর্ত্তৃক ভূতের শান্তি হইল, আমি কয়েক সপ্তাহ পরেই ‘খ’ স্থানে বদলী হইলাম। ক মহকুমা হইতে খ মহকুমা অধিক বিস্তৃত নহে, কিন্তু এই খ মহকুমার আমি প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিকলেক্টর হইলাম, আমার ক্ষমতা ও বেতন বৃদ্ধি পাইল। তথায় আমি একমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার অধীনে একজন বাঙ্গালী সব্‌ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। আমাকে এখন ক হইতে খ স্থানে যাইতে হইবে; রেল চলে না, অশ্বশকট কষ্টে যায়, নৌকার পথ নাই, সুতরাং আমি বলদশকটের বন্দোবস্ত করিলাম। আমাদের সঙ্গে ৫ খানি গরুর গাড়ী এবং একটা ঘোড়া ও ঘোড়ার সেই পুরাতন সইষ। একজন কনষ্টেবল, দুইজন চাকর, একজন জমাদার, একজন চৌকিদার, একজন চাপরাশী, কয়েকজন দাসী, পাচক, পাচিকা, শকটবান ইত্যাদিতে আমরা প্রায় ২১ জন লোক। একটা যাত্রার দল বলিলেই হয়।

(ক্রমশঃ)

কাহাকে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী পা দিবামাত্র জ্যেঠাইমার আমার প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ—"ওমা কি হবে গো। মেয়ে যে পেল্লায় বড় হয়ে উঠেছে আর এখনো আয়বুড়! লোকে দেখলে বলবে কি! ছি ছি ঠাকুর পো তোমার মুখে অন্নজল রোচে কি করে গা!"

বাবা ব্যস্তসমস্ত পলায়নপর হইয়া বলিলেন—শীগ্‌গিরই হবে—শীগ্‌গিরই হবে; সবই এক রকম ঠিক—সেজন্য কোন ভাবনা নেই তোমার।—

সব ভাল করিয়া শোনা গেল কি না গেল, তিনি কোন রকমে কথা গুলা মুখের বাহির করিয়া চলিয়া গেলেন।—

জ্যেঠাইমা ইহাতে আরো অসন্তুষ্ট হইয়া আপন মনে গণগণ করিতে লাগিলেন—"না আমার কোন ভাবনা নেই—তোমারি যত ভাবনা? এই যে পাঁচজন মেয়ে ছেলে এখনি এখানে আসবে, মণিকে দেখে নানা কথা বলবে তুমিত আর শুনতে আসবে না; আমারি লজ্জায় বাক্‌রোধ হবে।"

জ্যেঠাইমার ভয় দেখিলাম নিতান্ত অকারণ নহে। সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি শুনিয়া আমাদের যত কেহ আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবাসী দিনের পর দিন দলে দলে আমাকে দেখিতে আসেন, আসিয়া আশ্চর্য্য! ঠিক একই রকম ভাষায় পাখীর শেখা বুলির মত আমার অকাল কৌমার্য্যে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে বাবার মূঢ়তার নিন্দাবাদে প্রচুর পরিতৃপ্তি সঙ্গে লইয়া গৃহে ফেরেন। এমন কি এইরূপ সমবেত জল্পনায় জ্যেঠাইমার যথার্থ দুঃখের তীব্রতাও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল; সারগ্রাহিণী সুন্দরীবর্গের শিক্ষা গুণে মরালের অনুকরণে তিনিও এই অনিবার্য্য দুঃখকর ঘটনার মধ্য হইতে নিন্দাবাদের সুখ টুকু ঝাঁকিয়া উপভোগ করিতে লাগিলেন। আমারি জীবন কেবল ইহাতে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি ভাবিয়া দেখিলাম বিবাহের অপেক্ষা—যাহাকে ভালবাসিনা তাহার পত্নী হওয়া অপেক্ষা—এই অশান্তি অসুখও চির সহনীয় চির বরণীয়। বিবাহের কথা মনে করিতেই সমস্ত স্নায়ুপ্রণালী এমনি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে।—

এই রকমে দিন যায়। বাহিরের লোকের তীব্র সমালোচনা, জ্যেঠাইমার বাবাকে ভর্ৎসনা, বাবার তাঁহাকে প্রশান্ত আশ্বাস প্রদান, প্রতিদিন এমনি চলে। কিন্তু বিবাহের নূতন কোন কথা বা ছোটুর কোন উল্লেখ আর শুনিতে পাইনা। তাই অশান্তি অসুখ সত্ত্বেও ইহাতে দিনে দিনে আমি আশ্বস্ত হইতে লাগিলাম, আমার মন হইতে অল্পে অল্পে আশঙ্কার ভাব তিরোহিত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ এতদূর স্বচ্ছন্দভাব অনুভব করিতে লাগিলাম যে আমার গোপন চিন্তাগুলি মনের নিভৃতে আবার বেশ জমাইয়া গুছাইয়া লইয়া তাহার উপভোগে রত হইলাম। লোকে নিজের দুঃখ ভুলিতে পারিলে পরের দুঃখে সহানুভূতি করিতে অবসর পায়। আমি আশ্বস্ত হইয়া জ্যেঠাইমার ও পাড়াপ্রতিবাসীর কঠোর

মন্তব্য গুলিকেও অন্য ভাবে দেখিতে শিখিতেছি ; তাঁহাদের তীব্রোক্তিতে তাঁহাদের আজন্ম গঠিত মতবিশ্বাসের আকুলতা বুঝিয়া ক্রোধ ও বিরক্তির পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির-ভাবে তাহা সহিয়া লইয়া একটা প্রশান্ত নিরাশার ক্রোড়ে যখন আপনার আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি তখন বাবা একদিন আহার কালে বলিলেন—"ছোটু দু একদিনের মধ্যেই এখানে আসছেন। তিনি এলেই বিবাহের দিন স্থির হবে।"

জ্যেঠাইমা আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন "বর নিজেই আগে আসছে, তুমি যে বলেছিলে বরের মা আসবে ? তা বুঝি এলনা ! আজ কাল এই রকমই হয়েছে, ছেলে নিজে না মেয়ে দেখলে হয় না। তা দেখুক কিন্তু আর দেরী না—এই মাসের মধ্যেই বিয়েটা দেওয়া চাই।"

বাবা বলিলেন "আমারো তাই ইচ্ছা।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আমাতে আর আমি নাই। মনের মধ্যে প্রলয় ঝটিকা প্রবাহিত। বাবা আহারান্তে বাহিরে গেলেন। আমার আজন্ম শিক্ষিত ভয় লজ্জা সঙ্কোচ এই বিপ্লব আবেগে কুটার মত যেন উড়িয়াগেল, আমি উত্তেজিত আলোড়িত মস্তকে গৃহে আসিয়া বাবাকে পত্র লিখিলাম—

"শ্রীচরণেষু—

বাবা ; আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই ; ইহা বালিকার খেয়াল মনে করিবেন না। আমি খুবই ভাল করিয়া হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিতেছি বিবাহে আমার সুখ নাই। ইংলণ্ডেত এমন অনেকেই অবিবাহিত থাকেন। থাকিয়া দেশের জন্য কাজ করেন, আমিও দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চাই। আমি বেশ জানি তাহাতেই আমার একমাত্র সুখ। বিবাহ দিয়া আমাকে অসুখী করিবেন না।"

বাবা আফিসে যাইবার পূর্ব্বেই চাকরের হাতে চিঠীখানি তাঁহাকে পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিত কম্পিত চিত্তে ইহার ফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু পরে পদশব্দ হইল, বুঝিলাম বাবা নিজেই আসিতেছেন—লুপ্ত লজ্জা সহসা ফিরিয়া আসিল; মনে হইল কি করিয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইব! তিনি ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমি নত মুখে মাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ বাবা নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তোমার দেখছি ভাবী একটা ভুল সংস্কার জন্মেছে ; বিবাহ করলে কি দেশের কাজ করা যায় না ! আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা অবিবাহিত স্ত্রীলোকেরই বরঞ্চ তাহাতে বাধা বিঘ্ন অধিক। বিবাহে যে তুমি সুখী হবে তোমার জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হবে তাতে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। স্ত্রীলোকের ঐহিক পারমার্থিক, সকল প্রকার মঙ্গলের জন্যই বিবাহ শ্রেষ্ঠ প্রশস্ত পথ। তুমি অনভিজ্ঞ অজ্ঞান বালিকা তোমার কথায় কাজ ক'রে আমি তোমার অমঙ্গলের কারণ হতে পারিনে। এতদিন যোগ্য পাত্রের অভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমার বিবাহ দিতে পারিনি। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় সুপাত্র মিলেছে তোমারও সৌভাগ্য আমারো সৌভাগ্য।

এই সৌভাগ্যে আপনাকে ধন্য মনে করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান ক'রে আনন্দ হৃদয়ে তোমার পতিদেবতাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হও।"

বাবা এইরূপ বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম তাঁহার সংকল্প অটল—আরো বুঝিলাম, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার ক্ষমতা নাই। আমি মর্ম্মে মর্ম্মে দুর্ব্বল বঙ্গনারী, আজ্ঞাবর্ত্তী দুহিতা। জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি—কিন্তু ইহার পরে বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আত্মজলাঞ্জলি ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই।

সমালোচক।

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র সাহিত্যের শোভানুভাবুকতা, মার্জ্জিত রুচি এবং দোষানুসন্ধান বিষয়ে অল্প যোগ্যতার পরিচয় দেয় নাই; কিন্তু তথাপি তাহা যেন একার্থক সাহিত্য সমালোচনা। কালের পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান প্রত্যেক সুপরিচিত সাহিত্যের অভিনব শ্রীর উল্লেখ তাহাতে নাই। তরুণী রুচি মানুষের সাধারণ খুঁটি নাটি হইতে সাহিত্যেও নূতন রং ফলাইয়াছে, এবং বাহিরের নূতনত্বের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়াংশের তুলনা করিলেও দেখা যায় সাহিত্যখাদ্যের এমন কতকগুলি উপকরণ সৃষ্টি হইয়াছে যাহা আমাদের নিকট উপাদেয় বোধ হয় এবং তাহা না থাকিলে উপভোগ্য সাহিত্যকে যেন অনেক সৌন্দর্য্যহীন বোধ হইত। তথাপি বলা যায় না ইহা উন্নতির শেষ রেখায় আসিয়াছে। সে কালের তুলনায় এখন যেমন কতক কতক নূতন বিষয় বেশী দেখিতেছি, হয়ত ভবিষ্যৎ সাহিত্য রসজ্ঞেরা আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর অভিনব বিষয় দেখিতে পাইবেন। উনবিংশশতাব্দীর তাড়িতালোকোদ্ভাসিত, পাথুরিয়া কয়লা সমাচ্ছন্ন, বাষ্পীয়যান ঘর্ঘরিত সভ্যতাকে অনেকে চূড়ান্ত মনে করিয়াছেন, কিন্তু নূতন আবিষ্কারের সান্নিধ্যে তাহারাও অপ্রতিভমুখে ক্রমে অপসারিত হইতেছে। জড় ও মনোরাজ্য উভয়েরই উন্নতির এক প্রকৃতি। সাহিত্যেরও পূর্ণ পরিণতির সীমান্তরেখা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বৈ আর কিছু নয়।

সাহিত্যের বৈচিত্র্যের সঙ্গে, সুতরাং, এখন সাহিত্য সমালোচনাও নূতনবিধ। 'সমালোচন' শব্দটির সংস্কৃত অর্থ, এক কথায়, সম্যক প্রকারে আলোচনা; কিন্তু এখন সাহিত্য সমালোচনা বলিলে যাহা বুঝায় আগেকার অলঙ্কার শাস্ত্রের একাংশে তাহা রূপান্তরে বুঝাইত। জীবন্ত সাহিত্য স্রোতের দোষগুণ বিচারের অর্থসঙ্গতিপক্ষে এখনকার 'সাহিত্য-সমালোচন' কথাটি যথার্থ। অলঙ্কার শাস্ত্রে সাহিত্যের যে দোষ এবং গুণ ভাগ আলোচিত হইয়াছে তাহা ধরাবাঁধা কয়খানি নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থের দোষ গুণ বিচার মাত্র; তাহাকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বলা যায়,—পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা অত্যাবশ্যক বুঝিলেও সেই বিধি নিষেধ গণ্ডীর মধ্যেই কাজ করিয়া যাইতেন, একটুও এদিক্ ওদিক্ নড়িবার যো ছিলনা।

বলা বাহুল্য এ জন্য পরবর্ত্তী সাহিত্যকারদের মধ্যে মৌলিক সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অতি সামান্যই হইতে পারিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন একটা নিয়মের নিগড়ে সকলেরই হাত পা বাঁধা থাকিতে হইলে নিজস্ব কোনও পদার্থ উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে কিনা সহজেই অনুমান করা যায়। নূতন ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন ব্যতীত মৃতভাষায় নবজীবনসঞ্চারের আশা অসম্ভব। তাই এখনকার অভিনব সাহিত্য সমালোচনার স্বভাবের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যালোচনার তুলনা করিতে যাইলে বিভ্রাটে পড়িতে হয়। অন্ততঃ আগে এই আকারের সমালোচনা না থাকিলেও এখন ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু, সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রশ্ন হইতে পারে কবির কবিত্ব, ঔপন্যাসিকের চরিত্রচিত্র, সুকুমার শিল্পীর সুন্দর আলেখ্য সমালোচনার মুখাপেক্ষা করে কি? কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী ইহাঁরা যাহাতে অঙ্গুলীস্পর্শ করেন তাহাই সুন্দর না হইয়া পারেনা। যদি তাহাই হইল, শিল্পী যদি সমালোচনার অতীত হইলেন, সমালোচকের প্রয়োজন কি?

উত্তরে আবার তখনি মনে আসে কবির কবিত্ব সুন্দর সত্য, তাহা বুঝিতে পারি কয়জন? অল্প লোকই পারেন। অনন্ত বিশ্ববিধাতা শিল্পীর হস্তচিত্রাভাষ আমাদের এই পৃথিবীটুকুতেই কত সুন্দর দেখিবার, কত সুন্দর ভাবিবার সামগ্রী আছে কিন্তু কয়জনে ভাবিয়া থাকি? তাহাই দেখাইবার ও ভাবাইবার জন্য দেশবিদেশের ভাবুকেরা প্রয়াস পাইয়াছেন। সৌন্দর্য্য আপনি বুঝিয়া অপরকে বোঝান বড় সহজ কথা নয়। শিল্পী ও সাধারণের মধ্যবর্ত্তী রূপে ইহাঁরা আচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট।

চারু শিল্পের যথার্থ চারুতা সকলকে বুঝাইতে সমালোচক—এ কথা বলিলেও সমালোচককে ঠিক্ বোঝা হইল না। প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্যের বহিরাবরণ উন্মোচন করিয়া যিনি দেখাইতে পারেন তিনিই যোগ্যতম সমালোচক। শুধু দোষভাগের উল্লেখ তাঁহার একটা ছোট খাটো কর্ত্তব্যের মধ্যে। এক কথায়, দোষ ধরিবার জন্যই সমালোচক নহেন; গুণ বুঝিতে পারার ক্ষমতা আছে এই জন্যই তিনি সমালোচক। বিলাতের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠাবান সাময়িকসাহিত্য লেখকদের মধ্যে একজন একস্থানে বলিয়াছেন,—"Indeed, it is doubtful whether advantage to anybody is derived from what is called scathing criticism. Of course, it is well to warn honest folks against foul writings, to nail to the barn-door the literary vermin which infest the fields of literature; but that is not criticism, it is an affair of the police. If a book is worthless why not let it alone? It is as easy as lying to discover faults; they exist in everything. To point out merits is a much more difficult task, and a much more grateful one. One who has the sagacity to do that lays every reader under an obligation."—বাস্তবিক, কেবল যিনি দোষ ধরিতে পটু তাঁহার সমালোচনার কাজ নয়, সে পুলিসেরই কাজ!

আগেই দোষের কথাটা মনে থাকিলে গুণ দেখা সহজ নহে। সাহিত্যের ইতিহাসে, এইরূপে, সমালোচক নামধারী কতকগুলি লোকের হাতে যোগ্য ব্যক্তিদের লাঞ্ছনার কথা উজ্জ্বলঅক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু সুখের বিষয় সত্য কোন দিন কেহ প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই; ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তাহা কোন সময়ের জন্য লুকাইয়া থাকিলেও পরে যথার্থবর্ণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং গুণের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গুণগ্রাহীকে প্রথমে সকলে মনেকরে। স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে কবিঅবমাননার কাহিনী আছে। যাঁহাদের হস্তে ইংরেজি সাহিত্যে একদিন বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, যাঁহাদের কবিকণ্ঠে প্রতীচ্যরাজ্যের দেশবিশেষে একদিন অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুধাসঙ্গীতের তরঙ্গ বহিয়াছিল সেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি কীট্‌স্ এবং টেনিসন্ একদিন কতই না নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। কত সমালোচকাভিমানীর দুর্ম্মুখ লেখনী একদিন ইহাঁদিগকেই মূল্যহীন প্রমাণ করিয়া তবে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল!

সমালোচকের কথায় একটি উন্নত উদার চিত্র কল্পনায় আসে। চির আনন্দ উৎসবময় পবিত্র সাহিত্য ভবন; সেখানকার নিয়ম এই—যোগ্য হইলে রাজা হইতে দীনদরিদ্র তাহার নিমন্ত্রিত। তাহারি কুসুমমালা সুশোভিত সমুন্নত তোরণদ্বারে দেবী বীণাপাণির প্রিয় সন্তান পবিত্র পরিচ্ছন্ন ভাবুকের জন্য উপহার সামগ্রী হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। অযোগ্য অথবা উপদ্রবকারীর শাস্তির জন্য তিনি ভীম দণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান থাকেন না; তাঁহার ঈষৎ ঔদাসীন্যে, একটু গাম্ভীর্য্যে তাহারা সলিল বুদ্‌বুদের মতন বিলীন হইয়া যায়।—কিন্তু, স্বীকার করিতে হইবে অনেক সময়েই ইহার বিপরীত ব্যবস্থা আমরা দেখিয়া থাকি। সাহিত্য সমাজেও আবহমান কাল হইতে কবির নামে অকবি, ঐতিহাসিকের নামে সত্যের অপলাপকারী এবং সমালোচকের নামে সত-নষ্ট-জ্ঞানহীনের অভাব নাই, সুতরাং সর্ব্বদা এরূপ শুভকামনা সফল না হইতে পারে।

'সত্য কথা অথচ অপ্রিয় কথা নয়'—এই নীতি উপদেশের সার্থকতা আমরা যথার্থ সমালোচকে দেখিতে পাই। কথাটি সাধারণ নয়, এবং সাধারণ নয় বলিয়াই সমালোচক অসাধারণ। তাই কবি ভারবী বড় ঠেকিয়াই বলিয়াছিলেন 'হিতং মনোহারিচ দুর্লভং বচঃ।'—এই হিত কথা সত্যকথা মনোজ্ঞ ভাষায় প্রয়োগ করাই যাঁহার স্বভাব তাঁহার অপ্রতিম গুণপনা স্বীকার করিতে হয়, এ ক্ষমতা সকলের অনায়ত্ত।

সাহিত্য রাজ্যে সমালোচকরূপী বিচারকের এক বিষয়ে অসাধারণ সাবধান হইতে হয়,—সে সাহিত্যের অশ্লীলতা। সাহিত্যে সদ্ভাবের উদ্রেক হয়, ইহা মানব হৃদয়কে বিশুদ্ধ ভাবে অনুপ্রাণিত করে, সুপথ দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ইহার বিপরীতে যাহা মনুষ্য সমাজে অস্বাস্থ্যকর মলিন ভাব ছড়াইয়া দেয় তাহা কাহারও বাঞ্ছনীয় হইতে পারেনা। পূর্ণকলস পবিত্র দুগ্ধে একবিন্দু অপবিত্র পদার্থের মতন অশ্লীলতার আভাষ সুসাহিত্যের সম্পূর্ণ রূপান্তর করিয়া দেয়। ইহা দ্বিবিধ। প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন। শেষোক্ত প্রকারই

অধিক মন্দ ;—ইহা নিরাপদে থাকিয়া যায়, অনেক স্থলে প্রশংসিত হয়। ইহাতে বর্ণনা, ঘটনাবিবৃতি অজ্ঞাতসারে আপাত মাধুর্য্যের আস্বাদ দেয়,—পরিচ্ছন্নতার বহির্ব্বাস পরিয়া ইহা পবিত্র সাহিত্যের নামে বিক্রীত হয়। শেষোক্ত প্রকৃতির অশ্লীলতা বাছিয়া লওয়া যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্কতাসাপেক্ষ। এমন অবস্থায় ভাষা পারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়।

সাহিত্যের ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও অপমান আর কিসে ?—জ্যেষ্ঠতাতের বিজ্ঞতা লইয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পাপের পরিণাম দেখাইতেই পাপচিত্রের অবতারণা করিতে হয়, তাহার সমর্থন করা হয় না। আবশ্যকস্থলে সেরূপ সত্যচিত্রের অবতারণা করিতে হয়, সত্য, কিন্তু যিনি তেমন চিত্রের অঙ্কনে তাঁহার বিশ্রী অস্থিমাংস ব্যবচ্ছেদ করেন, চরিত্র চিত্রাঙ্কনে তাঁহার ক্ষমতা সামান্য। শ্লীল, সংযত, শিষ্টভাষা ও নিত্য সহানুভূতিসূচক পরিতপ্ত ব্যাকুল প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া পাপচিত্র যোগ্যহস্তে জীবন্ত ফুটিয়া ওঠে এবং পরিণাম চিত্র তখন কেমন সুন্দর ও সার্থক বোধ হয়! কিন্তু যাঁহারা কুৎসিৎ ভাবের সঙ্গে বর্ণে বর্ণে মিশাইয়া ফুটাইতে চান তাঁহাদের পরিণাম চিত্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে অনেকেই পারে না। এই ভাবে স্বভাব দুর্ব্বল মানবের আপাত সুখ কল্পনায় যিনি আহুতি দেন তিনি মানবশত্রু।

এই সংকটস্থলেই সমালোচকের পরিচয়। যে সমালোচক তাঁহার কঠিন কর্ত্তব্যের কড়াক্রান্তি অসঙ্কোচে বুঝাইয়া দেন, এসব স্থলে ব্যক্তি বিশেষের জন্য তাঁহার পক্ষপাত প্রবৃত্তির লেশমাত্রও নাই। সেখানে ব্যক্তিগত বড়ত্বের মুখাপেক্ষা কোথায়? সমালোচক স্বাধীন, তাঁহার মত বিশুদ্ধ সত্য। সহৃদয় ও ন্যায়পর তাঁহাকে সর্ব্বদাই আপন গন্তব্যের সূক্ষ্ম রেখা পথে চলিতে হয়।

সুসাহিত্য মানসরাজ্যের এমন একটি কিছু যাহার মনোবৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই মনোবৃত্তির যখন ভাব, শোভা ও সুরুচির অনুশীলনে বিকাশিত হয় তখনি ইহার সুন্দর অসুন্দর বুঝিতে পারা সম্ভব। এখন, এই বিকাশিত মনোবৃত্তি—বনাম সাহিত্যরসজ্ঞতা কিয়দংশে শিক্ষা সাপেক্ষ, প্রধানতঃ প্রতিভাসাপেক্ষ। জন্মপ্রতিভা দুর্লভ ; ভাব ও শোভানুশীলনও বিলক্ষণ আয়াস এবং সময়সাপেক্ষ। সাহিত্যরসজ্ঞেরা ইহা জানেন বলিয়াই তাঁহাদের নিকট ইহার এত আদর। এই দুর্লভ আদরের সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ও বিচিত্র বর্ণে পাইবার অভিলাষে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যালোচনা শিক্ষা। সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতিও এই কারণে নূতন আকারাকারিত এবং তাহারি ফলে আমরা ধারাবাহিক রূপে সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করিতেছি। এই দৈনন্দিন সাহিত্যের দৈনন্দিন সমালোচনায় সমালোচককে যে অতিমাত্র সতর্ক ও সুরুচিপ্রবণ বোধ হয় তাহার উদ্দেশ্য সুসাহিত্যেরই প্রচার এবং সাহিত্যের নামে কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর, অসার আবর্জ্জনার বর্জ্জন। পৃথিবীর সমুদায় স্থানেই যুগে যুগে সৎলোকের প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানের মধ্যেই যেমন সাধুতার বহিরাবরণাচ্ছাদিত কতকগুলি অসাধু অসৎলোকের প্রাদুর্ভাব হয় এবং তাহার ফলে যথার্থ উদ্দেশ্যের যথেষ্ট হানি ও সজ্জনদিগের অপমান, সুসাহিত্য ক্ষেত্রেও তেমনি সেই জন্য সর্ব্বদা বহিরাবরণ ঔজ্জ্বল্যের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হয়। সত্য ও সৌন্দর্য্যের দুইটি দিক্ আছে একদিকে বাহিরের বাক্যচ্ছটা ও সজ্জা, আর একদিকে প্রকৃত হৃদয়ের কল্পা ও তাহার সরল স্বাভাবিক শোভা। নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ সত্য ও সৌন্দর্য্য যাঁহার সাধনা তিনি শত ঔজ্জ্বল্যের মধ্য হইতেও সেই এককোণে লুক্কায়িত সাদাসিধা শোভা খানিকে চিনিতে পারেন ও তাহাকে হৃদয়ে স্থান দেন। সে যদি আভরণ বিহীন হয় তবু তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে জানেন না।

অতএব, অসত্য ও অসুন্দরের অপসারণ ব্রতে সমালোচককে যদি ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায়বিশেষের মুখাপেক্ষী হইতে হয় তাঁহার তদপেক্ষা অসম্মান আর কিছুতে নয়। যিনি সত্য বুঝিয়াছেন তাঁহাকে সত্য প্রতিষ্ঠায় পশ্চাৎ পদ দেখিলে নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত বোধ হয়। কেহ যদি সুস্থ শরীরে সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত থাকে তবে সে যেমন তাহার জীবনটাকে দণ্ডেকের জন্যও ভোগ করিতে পারেনা তেমনি শিক্ষা ও বিবেকবুদ্ধি সত্যের অনুসরণে ভয় পাইলেও সেই লব্ধ শিক্ষা এবং বিবেকবুদ্ধির পরিণাম ঠিক্ তেমনি হয়। কর্ত্তব্যের কোন থানেই সমালোচকের কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই; তিনি যাহাই বলিবেন আদ্যন্ত তাহাতে একটি অভিমানহীন বিশুদ্ধ গুণগ্রহণেচ্ছা প্রকাশিত থাকে। এই সত্য সাহিত্য সমালোচক হইতে সাধারণের প্রতিও প্রযোজ্য। অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া অবিচলিত হৃদয়ে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে, আজ হোক্ কাল হোক্, পৃথিবী তাহার গুণ গ্রহণ করে এবং কেবল তাহাই নয়, আপনাকেও বিবেকের সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইতে হয়, আত্মপ্রসাদের পবিত্র পুলকে প্রাণ যেন কোন অপার্থিব সুখানুভব করে। প্রতিভাবান কবি এমন সমালোচকের হস্তেই আপনার সযত্নকৃত কাব্যের বিচারভার অর্পণ করিয়া বলেন "আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্!"

সাহিত্যরাজ্যে সমালোচক সম্প্রদায়ের (?) মধ্যে অনেক সময় বড় বড় মানুষের ওজনে, বড় বড় নামের ওজনে লেখারও ওজন হইয়া থাকে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া যথার্থ সমালোচকদিগকেও লজ্জায় মুখ লুকাইতে হয়। বিচারের নিকট ব্যক্তিগত সম্পর্কে কোনও বাধাবাধকতা নাই। ব্যক্তি বিশেষের কথা তাঁহারা বিচারবিহীন হইয়া শুনিতে চাননা; সাহিত্য ভবনের দ্বারে প্রবেশ সময়ে আবার একটা স্বতন্ত্র পরীক্ষা আছে। কেবল তাহাই নহে, সাহিত্য জগতে যাঁহার কৃত কার্য্য একদিন প্রশংসার সহিত প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল সেই দৃষ্টান্তের বলে তাঁহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক কার্য্যই যে প্রতিষ্ঠাযোগ্য হইবে তাহারি বা নিশ্চয়তা কি? সাহিত্যের আইনে কৃতজ্ঞতার এমন কোনও প্রতিশ্রুতি নাই যিনি একদিন মনোনীত কার্য্য করিয়াছেন তিনি পরে যদি তাহা না পারেন তবেও সেই অকৃতকার্য্যতার জন্য প্রশংসিত হইবেন! সত্য সর্ব্বকালে, সকল জাতিতে এবং সমুদায় অবস্থাতেই সত্য; সুতরাং ইহাকে যেমন সাহিত্যরাজ্যে তেমনি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্ত্তব্য পথেও অবলম্বন রূপে ধরিতে পারি। মানবের অনন্ত উন্নতি পথে, এইরূপে, যদি পরীক্ষার পর পরীক্ষা না থাকিত, মানবের জীবনসংগ্রামপথে যদি সতর্কতার একটা সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট থাকিত তবে উন্নতের পুনরায় পতনের পথ প্রশস্ততর হইত। আমরা মানুষেরা জীবন যাত্রা পথে যথার্থ সত্যকে অনেক বিষয়ে এইরূপ ভুল বুঝিয়া মূঢ়ের ন্যায় ভাবিতেছি আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক, রুচি যথেষ্টই উন্নত হইয়াছে, আর কিছু অবশিষ্ট নাই! এই ভাবে, আমাদের সামান্য শিক্ষারও যে একটি স্বাভাবিক সরল সত্য শোভা আছে তাহাকে দুর্ভাগ্যবশতঃ দাম্ভিকতার মলিন ধূলিকর্দ্দমে বিকৃত করিয়া ফেলি।

এখন, প্রশ্ন হইতে পারে ইহার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষক কে? কয়জন এই সাহিত্য মন্দিরের সেবক? যদি নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি সংখ্যা মাত্র হয় তবে "ইহাই উত্তম" সর্ব্ববাদিসম্মত না হইতে পারে। উত্তরে ইহাই বলা যায় সাহিত্যের সার্ব্বজনীন মন্দির এক; সেখানে সত্য সম্বন্ধে পরস্পর মত ভেদ নাই। দেশ ভেদে রুচির বৈচিত্র্য থাকিলেও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কাহারো সঙ্গে কাহারো অনৈক্য হইতে দেখা যায় না। মানবীয় মনোবৃত্তির চরম উৎকর্ষ সম্পন্না রুচি এখানে মনোনীত সামগ্রী পাইয়া পরিতৃপ্ত হয়; পৃথিবীর সমুদায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি তাহার সহিত একমত। কিন্তু বিচিত্র মানব চরিত্র আলোচনা করিলে, দেখিয়া

আশ্চর্য্য হইতে হয় যথার্থ সাহিত্যের কলঙ্কও সাহিত্যের নামে আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। যেমন ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের ঠাট গায়ে জড়াইয়া অনেক কৃপাপাত্রকে সাধুশ্রেণীভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সাহিত্য জগতেও তেমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সাহিত্য সেবার নামে কোথাও নিরবচ্ছিন্ন অর্থলাভের প্রত্যাশা, সমালোচক নামাবরণে কোথাও শুদ্ধ পরনিন্দা ব্যবসায়। সমালোচনার প্রতি যাহাদের যথেষ্ট নির্ভর তাঁহাদের অনেক স্থলে অকারণ হতাশ হওয়া অসম্ভব নহে। এমন 'সমালোচনা' আছে যাহা কাহারও যথার্থ গুণকে উপেক্ষা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই লিখিত। এই অব্যবসায়ী প্রবৃত্তির বশে সমালোচক হইতে যাইলে আজ্ হোক্ কাল হোক্ তাঁহার যথার্থ বর্ণে তাঁহাকে ধরা দিতে হয়; কিন্তু তথাপি আপাততঃ সদসৎ বিচারাক্ষম পাঠকদের তাহাতে বিলক্ষণ অপকার আছে। সত্য অধিক দিন প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, এবং তাহাদের পরিশ্রম কেবল পরানিষ্ট চেষ্টাতেই পর্য্যবসিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রকৃতির 'সমালোচনার' একটি বিশেষ সুর আছে যাহাতে অনুমান করা যায় ইহা যথার্থ সমালোচনার জন্য লিখিত হয় নাই, অন্য উদ্দেশ্য আছে। ইহা আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়োল্লেখ পূর্ব্বক বিচার করেনা, আগুন্ত স্বকীয় উক্তিদ্বারা মনোভাব প্রকাশ করে। বিষয়ের উল্লেখ হইতেই বিচার আবশ্যক্, সুতরাং প্রকাশ্যে বিষয়টিকে উপস্থিত করিয়া দোষ প্রমাণ করিতে যাইলেই যুক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু অকারণ দোষারোপ করাই মনোগত অভিপ্রায় হইলে বিষয়ের উল্লেখ করিবার সৎসাহস সেখানে আসিতে পারে না।

কৈফিয়ৎ।

মাননীয়া "ভারতী" সম্পাদিকা মহাশয়াসু।

গত বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে 'মীরকাসিম' নামক প্রবন্ধে ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, "মুতক্ষরীণের মলাট দেখিয়া বা নাম শুনিয়া," আমি তাহাকে "ঝুটা ইতিহাস" বলিয়াছি। আমি "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম" নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলাম, "পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর সহিত টোনসনের গুইনিবারার চরিত্রে কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সেই পবিত্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের অসীম সহিষ্ণুতা ও পরার্থপরতা, শৈবলিনীর প্রতি সেই গভীর প্রচ্ছন্ন প্রেম, কাব্যসাহিত্যে অতি বিরল। চন্দ্রশেখর বঙ্কিমের সোণার গাছে মুক্তার ফল বিশেষ। এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কেন যে তিনি সৈয়র মুতক্ষরীণের ঝুটা ইতিহাসের ছাঁচে ঢালিতে গিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি না।"

আমি এখানে 'ঝুটা' কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছি? কাব্য যদি সাচ্চা হয়, তাহা হইলে, কাব্যসমালোচকের নিকট ইতিহাস ঝুটা,—অর্থাৎ নিষ্প্রভ ও মলিন। একটা বড় আদর্শ চরিত্র, যে চরিত্র ইতিহাস ধারণাও করিতে পারে না; সেই চরিত্র, ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে পুরিতে গেলে, কবির আদর্শ খাটো হইয়া যায়। বঙ্কিমবাবু চন্দ্রশেখরের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, কোথাও কোথাও তিনি মুতক্ষরীণের অনুসরণ করিয়াছেন। সেই জন্যই আমি বলিয়াছি,—'মুতক্ষরীণের ঝুটা ছাঁচ'। তিনি অন্য ঐতিহাসিকের নাম করিলেও, আমি ঐরূপ বলিতাম। মুতাক্ষরীণ ইতিহাস হিসাবে সাচ্চা হইতে পারে, কিন্তু কাব্যহিসাবে ইহা ঝুটা বৈ আর কি? মীরকাসিম ও মহম্মদ তকি না থাকিলে, চন্দ্রশেখরের কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হইত না,—প্রতাপ যে কোন যুদ্ধে মরিতে পারিত.

কলিকাতা।
১২ই শ্রাবণ, ১৩০৪।

সশংবদ
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বাবু।

(১)

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস চট্টোপাধ্যায় মনে মনে মহা আপশোষ করিতেন যে কুক্ষণেই তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণীর শুভউদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কারণ প্রথম বয়সে কতকটা ঐ ব্রাহ্মণীর প্রেমে এবং দ্বিতীয় বয়সে কতকটা তাঁহারই ভয়ে ধর্ম্মদাস কৌলিকপেশা রদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং পুনশ্চ দারান্তর পরিগ্রহে সক্ষম হয়েন নাই। বিশেষতঃ অধুনা সন্তানসন্ততিগ্রথিত নিবিড় মায়াজালে কুলীনসন্তান এমনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন যে যদৃচ্ছা-পরিণয়-কল্পনা প্রায় সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং ব্রাহ্মণের সংসার বড় কষ্টেই চলিত; এমন কি অযাচিত অজস্র আশীর্ব্বাদ এবং যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন ইহলোকে তাঁহার অপর কোন জীবিকার উপায়ই পরিদৃশ্যমান ছিল না। তাহাতে আবার, যাহা যুটত তাহাতেই চালাইতে ব্রাহ্মণী সদা-সর্ব্বদা নারাজ হইতেন। এতদুপলক্ষে গৃহিণী ভর্তৃপ্রবরকে লক্ষ্য করিয়া প্রায় বলিতেন;—"কেন চাকরী করুন না। নায়েবী, গোমস্তাগিরি, তাও ত জুটতে পারে। বামুনের ঘরের গরু! চিরটা কাল বসে খাইবেন।"

কিন্তু কন্যা যমুনা বড় আদর করিয়াই বলিত—"না বাবা, তুমি কোথাও যেও না। আমরা একসন্ধ্যা খেয়ে থাকবো সেও ভাল।"

গৃহিণীর রাগ করিবার আরো এক গুরুতর কারণ ছিল। তাঁহার কন্যা যমুনা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিতেছিল। সে দেখিতে প্রিয়দর্শনা হইলেও তাহার উপযুক্ত কুলীন বর মিলিতেছিল না, এবং ধর্ম্মদাসেরও ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল যে তিনি অঘরে কন্যাসম্প্রদান করিয়া কুলকে কলুষিত করিবেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অশিক্ষিত পটুত্ব ছিল, তিনি সনাতন কৌলীন্য প্রথার বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন না। কুটুম্ব 'সু' হইবে, এবং তত্ত্বতাবাস করিয়া সুখ হইবে, বিবাহ সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার সুমহৎ আদর্শ ছিল। এই জন্য যখন তিনি,—ভবিষ্যৎ জামাতৃআলয়ে তত্ত্ব করিবার জন্য যে সকল মাটীর ছাঁচ ক্রয় করিয়াছিলেন সে গুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন,—এবং যখন তাঁহার মনে 'হতচ্ছাড়া মিনসের' বিবাহ-সম্বন্ধে 'হতচ্ছাড়া' বুদ্ধির কথা মনে হইত,—তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে লঙ্কা বাঁটার ঝাঁজের ন্যায় একটা ঝাঁজ বাহির হইত।

এতদুপলক্ষে দম্পতির মধ্যে বচসা প্রায়ই হইত এবং বচসা অপেক্ষা গুরুতরও হইত। কিন্তু বলা উচিত ধর্ম্মদাস একটু ভীতু মনুষ্য, সেই জন্য এইরূপ গার্হস্থ্য কুরুক্ষেত্রের অভিনয় কালে তিনি গৃহিণীর সন্নিকট সন্নিধান পরিহার পূর্ব্বক বিশেষ রণপাণ্ডিত্যের পরিচয়

...ন করিতেন। মনে মনে বলিতেন—'দূর হউক গিয়ে অবশেষ কি স্ত্রীর সঙ্গে একটা জদারী বাঁধাইব।'

কিন্তু ধর্ম্মদাস আপনার কাছে আপনি নাই মানুন, তাঁহার পক্ষে আদত কথা এই যে তাঁহার অন্তরের গূঢ়তম অভ্যন্তরে যমুনার স্নেহের জন্য একটা তীব্র, লালায়িত পিপাসা ছিল। কন্যা-বিরহের কথা মনে হইলে ব্রাহ্মণ একটু শিহরিয়া উঠিতেন। তাহাতে, কৌলিন্য প্রথায় বিশেষ একটি সুবিধাজনক ওজর মিলিয়া ছিল। কারণ যমুনার স্নেহ ছোট ছোট ভাই ভগিনীদের পালন ও রক্ষণের জাগ্রত প্রহরীস্বরূপ ছিল বটে, কিন্তু তাহা দরিদ্র দুঃখার্ত্ত পিতার পক্ষে একেবারে মৃতসঞ্জীবনী মহৌষধ ছিল। দ্বিপ্রহর অবধি পয়সার প্রত্যাশায় চারিদিকে বৃথা ধান্ধা করিয়া অবশেষে ধর্ম্মদাস যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ও ক্ষুন্নমনে বাটী ফিরিতেন তখন পথে চলিতে চলিতে তাঁহার মনে পড়িত একটি ক্ষুদ্র অভুক্ত বালিকা, একখানি স্নেহময় হস্তে, তাঁহারই প্রতীক্ষায় পাখা লইয়া দাবায় এতক্ষণ বসিয়া আছে এবং তাহার নিকটেই সর্ব্বদুঃখবিনাশন এক ছিলিম তামাকু সাজা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ যখন 'মা যমুনো!" বলিয়া বাড়ী ঢুকিতেন তখন তাঁহার স্নেহসিক্ত কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিত।

কিন্তু কন্যার অকৃত্রিম স্নেহের মধ্যে নিমগ্ন ধর্ম্মদাস ততটা অবগত না থাকিলেও অপর সকলেরই জানা ছিল যে বালিকার নিঃসঙ্কোচ নিরুদ্বেগ শরীর খানি নিঃশব্দে একটি সলজ্জ ও কুণ্ঠিত আবরণের অধীন হইয়া পড়িতেছিল; এবং যে সুনির্ম্মল হাস্যরাশি পূর্ব্বে গৃহে এবং প্রাঙ্গণে, শুভ্র দন্ত পংক্তি ও উচ্ছৃঙ্খল কেশদামের মধ্যে উদ্বেলিত ও প্রত্যাহত হইত তাহা এক্ষণে চকিতে অধরে এবং অপাঙ্গে ফেনিল হইয়া উঠিত এবং নিমেষে মিলাইয়া যাইত।

(২)

একদিন জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যাহ্নে গঙ্গাতীরের এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষোপরি কেবল একটিমাত্র তৃষ্ণার্ত্ত বিহঙ্গম, পরম করুণাভরে ও দীন আর্ত্তস্বরে ডাকিতেছিল—ফটি-ঈক-জল্। সেই রৌদ্র নিশীথে প্রকৃতি সর্ব্বত্র নিস্পন্দ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল ঐ এক বিহঙ্গমের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ধরণীর অবসন্ন হৃৎপিণ্ডে, একটি সূক্ষ্ম চঞ্চল আশার ন্যায় একমাত্র ক্ষীণ কম্পান্বিত রক্তধারা প্রেরণ করিতেছিল।

সেই সময় একখানা বড় বজরা, কোথা হইতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া, কি মনে করিয়া বটতলার সম্মুখে ধীরে ধীরে আপনার নোঙ্গরটি নামাইয়া দিল। এ উদ্দেশ্যহীন নিরুদ্যম তরণীর যেন ভব নদীর কোন পারেই ভিড়িবার দরকার ছিল না, যেথায় হয় থামিলেই যেন ইহার হইত, যে দিকে হয় ভাসিয়া গেলেই ইহার চলিত। এ নিমীলিত-চৈতন্য মধ্যাহ্নের জগৎ-ব্যাপি আলস্যে সেও যেন মন্থর হইয়া পড়িয়াছিল। যেখানে তরণী ভিড়িয়াছিল সেই স্থান হইতে দ্বিজ ধর্ম্মদাসের বাটী একরশি তফাত হইবে।

চাকর নফর ছাড়িয়া দিলে, কেবল এক জন তরুণ যুবক তরণীর একমাত্র আরোহী।

তাঁহার নাম শ্রীযুত বাবু নিত্যলাল রায়। তিনি কলিকাতার কোন ধনীলোকের সন্তান, এবং অধুনা প্রিয়জনবিরহে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ভাসাইয়াছেন। তাঁহার ভরসা ছিল কল্লোলিনীর অচ্ছিন্ন, অক্লান্ত কলতানে, বৈতরণী পারের কোন ক্ষীণায়মান কণ্ঠস্বর অশ্রুত হইয়া যাইবে। সে বিষয়ে তিনি কতটা সফল বা নিষ্ফল হইয়াছেন তাহা গোপন রাখিয়া অধুনা এই বলিলেই চলিবে যে, তিনি যে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া এই অভিনব শান্তির বাণিজ্যে তরণীসজ্জা করিয়াছিলেন তাহাতে আর এক্ষণে ততটা প্রত্যয় করেন না। তরণীর গবাক্ষপথে তিনি অন্যমনে চাহিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় সেই নিশ্চল মধ্যাহ্নে এবং তাঁহার বিবিক্ত মনের মধ্যে কোন একটা অব্যক্ত অজ্ঞাত সহানুভূতি ছিল। তখনও যাচকের অসীম ধৃষ্টতাসহকারে পাখী ডাকিতেছিল—ফটি ঈক্-জল। নিনিমেষ, নিষ্পয়োদ, দীপ্ত নভোমণ্ডলে, অভাগ্যের অরণ্য-রোদনবৎ সে যাচ্ঞা, মুহুর্মুহু লীন হইয়া যাইতেছিল। বৈকালবেলা যমুনা ও তাহার মা গা ধুইতে আসিয়া দেখিল যে ঐ বাবুটি বজরার জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া আছেন। মুখখানি নাতিদীর্ঘ গুম্ফশ্মশ্রুতে মণ্ডিত, এবং দেখিতে সুন্দরই বলিয়া তাহারা মনে করিতে লাগিল। কিন্তু মা ততটা লক্ষ্য করে নাই, মেয়ে দেখিতে পাইয়াছিল যে তাহার মধ্যে বিলাস-পালিত ঔদ্ধত্যের একটা স্পষ্ট রেখা অঙ্কিত আছে। যাহাহউক পল্লীবধূর, অপরিচিতের নিকট সহজেই সমীহ হইতে লাগিল। তাহারা অনেকক্ষণ তীরে সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উদ্দেশ্য বাবুটী সরুন, তাহারা গাধুইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ধনীসন্তান নিত্যলাল বাবু আশৈশব দরিদ্রের প্রতি অতটা শিষ্টাচার প্রদর্শনে অশিক্ষিত, বিশেষতঃ ঠিক্ সেই সময় তীরের দিকে চাহিয়া তাঁহার মানসপটে যে এক সৌখীন সাংসারিক খেয়াল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত হইতেছিল, তাহাতে কোথাকার কোন অপরিচিত গ্রাম্যবধূর প্রতি ভ্রূক্ষেপ হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। অগত্যা তাহারা যথাসম্ভব সঙ্কোচের সহিত গা ধুইয়া চলিয়া গেল। পথে মা মেয়েকে বলিল—ছোঁড়াটা কি বেহায়া লা ? মেয়ে একটু হাসিল।

ব্যাপার শুনিয়া, ধর্ম্মদাস চটিয়া লাল ; দুর্ব্বাসার বংশধর কি না ! হুকা হস্তে এবং রক্তনেত্রে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ইচ্ছা ছিল বাবুই হউন আর যিনিই হউন,—"তুমি কেমন লোক হ্যা"—বলিয়া আরম্ভ করিয়া দুকথা শুনাইয়া দিবেন, কিন্তু যখন বজরার সাজসরঞ্জাম তদীয় নয়ন পথের পথিক হইল, তখন আর সাহস কুলাইল না বামুনের ফৌজদারীতে বড় ভয়, বিশেষ নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ—। ফিরিয়া গেলেন।

(৩)

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ উদরের চিন্তায় যাহাদের অনেকটা মানসিক শক্তি ব্যয় করিতে হয়, তাঁহাদের অবশিষ্ট শক্তিটুকু, ম্যালেরিয়ায়, পুত্রকন্যার বিবাহে এবং গৃহিনীর অলঙ্কার চিন্তায় ব্যয় করিলেই গৌরবান্বিত বাঙ্গালিজীবনের পরম নিরীহ আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হইয়া যায়। তাঁহাদের মৎলব ও কল্পনা-লতা কোন্ গাছকে জড়াইয়া উঠিবে তাহা

পূর্ব্বেই অনুধাবন করিতে পারা যায়। লোকে বলে তাহাদের মৎলবের স্থিরতা আছে। কিন্তু যাঁহারা কৃতী পূর্ব্বপুরুষমহোদয়গণকে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক ধন্যবাদ দিয়া দিন যাপন করেন, তাঁহাদের উদরধ্যান ও অজীর্ণ ব্যাধির অন্তরেও অনেকটা মানষিক শক্তির জের পড়িয়া যায়। সুতরাং খেয়ালের আর পরিসীমা থাকে না।

আমাদের পূর্ব্বকথিত নিত্যলাল বাবু মহোদয়ের, কৃষিকার্য্য অথবা ব্যবসারদ্বারা পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত বিষয় বিবর্দ্ধন করিবেন ইহাই দুর্দ্দান্ত খেয়ালছিল; এবং কএকবার দুই পাঁচ সহস্র মুদ্রা সেলামা দিয়াও এতদুপলক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়, আক্কেল নামক দুর্লভ বস্তুটি সংগ্রহ কারতে সমর্থ হয়েন নাই। সে দিন তাঁহার সেই বিবিক্ত অপরাহ্নে, গঙ্গাতীরের পুরস্থিত সতর আঠর বিঘা পতিত জমির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে হঠাৎ মনে হইল এ জমিটাত আমার দরকার। ঐ খানে ফুলের বাগান করিতে হইবে। এবং উৎপন্ন ফুলসকল নিত্য নৌকাযোগে বিক্রয়ার্থ কলিকাতার হোটেলে হোটেলে পাঠাইয়া দিবেন। তাহাতে লাভ হইবার সম্ভাবনা! পাঠকবর্গ পরে কাগজ কলম লইয়া নিত্যলাল বাবুর লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিবার অবসর পাইবেন।

একাধারে অনুচর, নায়েব, এবং মোসাহেব শ্রীযুত সফলরাম দাস মহাশয় ডাঙ্গায় নামিয়া উক্ত জমির মালিকের তত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। মালিক মহাশয়ও যথাকালে, সুবিশেষ 'দাঁও' অনুভব করিয়া, কলিযুগে মানবের উর্দ্ধতম পরমায়ু হিসাব করিয়া, ততদিনের 'লাজে' জমি ছাড়িয়া দিলেন। কেবল ঐ দুর্ব্বাসা ঋষির বংশধর ব্রাহ্মণ নিজের বাস্তভীটা ছাড়িতে কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। 'শুধু ৫ কাঠা ভূমি'!

বামুনের বজ্জাতি দেখিয়া নিত্যলাল বাবুর ভারি রাগ হইল। কিন্তু কি করেন, পিনাল কোডকে একটু সমীহ করিতে গেলে, আশু তৎক্ষণাৎই তাঁহার বাগান বসে না, এবং ঐ ব্রাহ্মণের, যুগপৎ আঁস্তাকুড় ও ঠাকুরঘর দ্বারা অধিকৃত ভূমির উপর, যাথী যুঁথি মল্লিকার ঝাড়ও গজায় না। কিন্তু তিনি বিস্ফারিত কল্পনা নেত্রে তখন বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, যে ঝুড়ি ঝুড়ি ফুল নৌকা বোঝাই হইয়া কলিকাতায় যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকা, আধুলী, সিকী, দুয়ানী প্রভৃতি ফিরিয়া আসিতেছে। এখন ব্রাহ্মণকে, জমিদারগণের সনাতন প্রথা অনুসারে উদ্বাস্ত করিতে গেলে, কল্পনা নেত্রকে দু পাঁচ দিনের জন্যও কিছু ঝাপসা করিতে হয়। সে তর তাঁহার সহিবার তখন সম্ভাবনা ছিল না।

সফল রামকে তিনি বলিলেন—"থাক বামুন ব্যাটার বাড়ী; ওর বাড়ীর চারিদিকেই আমার বাগান বসিবে। তুমি আচ্ছা করিয়া বেড়া দিয়া জায়গাটা একদিনের মধ্যেই ঘিরিয়া ফেল।"

সফল রাম বলিল—"যে আজ্ঞা।"

(৪)

পূর্ব্বে যেখানে কতকগুলা আগাছা আর উলুবনের জঙ্গলের মধ্যে, অনুসন্ধিৎসু উদ্দাম

বায়ু কিয়ৎকাল সঞ্চরণ করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে ও বিরাগভরে দিশি দিশি চলিয়া যাইত এখন সেই থানে চলৎ সমীরণ আর কুসুমগন্ধ বহিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে। কৌতুহলাক্রান্তা তরঙ্গিনীও কথনো কথনো উচ্ছ্বসিত ফেণিল নেত্রে চাহিয়া দেখিতেন যে তাঁহার তীরে কত বিচিত্র বিমিশ্র সুকুমার বর্ণের মেলা লাগিয়াছে। শ্বেত, পীত, লোহিতের যেন একেবারে সম্বৎসর ব্যাপি মহামেলা। এবং উদ্যানস্বামী কথনও স্বয়ং লক্ষ্য করিতেন কি না বলিতে পারি না কিন্তু সেথায় প্রতিদিন দলে দলে কুসুমকামিনী সূর্য্যমুখীরা, আপনাদিগের প্রণয়-স্ফীত বক্ষস্থল, সুমহৎ আগ্রহভরে রোমাঞ্চিত করিয়া, প্রত্যূষ-আরব্ধ সবিতৃবদ্ধ-দৃষ্টি স্ব স্ব প্রণয়-তপস্যা, সায়াহ্নে শুষ্কমুখে সমাপন করিত। প্রকৃতির এই উদার রমণীয় মহলোকের মধ্যে ধর্ম্মদাসের ঐ বাস্তভীটা টুকুর ন্যায় ধরিত্রীর কুত্রাপি এরূপ রূঢ় দর্শন-শালিতা ছিল না।

নিত্যলাল বাবুর পুষ্পকানন গ্রামের সর্ব্বত্র 'বাবুর বাগান' নামে অভিহিত হইত এবং নিত্যলাল বাবুও শুধু 'বাবু' এই নামে সর্ব্বত্র উক্ত হইতেন। বহুব্যয়ে তিনি নানা স্থান হইতে বিবিধ ফুলগাছ আনিয়া আপনার বাগানে রোপণ করিয়াছিলেন এবং সেগুলির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ২৫ জন মালি, শ্রীযুক্ত সফলরাম এবং স্বয়ং নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সে বাগানে গ্রামের কোন ভদ্রলোকের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। ইহাতে তাঁহাদের ক্ষোভের আর সীমা ছিল না।

নিত্যলাল বাবু বজরার উপরেই বাস করিতেন এবং সঙ্গে যে একখানি পানসী ছিল তাহা লইয়া প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাইতেন। কলিকাতার সমস্ত নবাবী চাল সেথানে ব্যক্ত করিবার সুবিধা ছিল না, তথাপি তাহার দুই একটা ক্ষুদ্র উচ্ছ্বাস গ্রামের দারিদ্র্য ও সচ্ছলতাকে কথন কথন উপহাস করিয়া একেবারে অত্যূর্দ্ধে ফুলিয়া উঠিত। গ্রামের মজুমদার মহাশয়ই ডাক সাইটে বড়লোক, কিন্তু তিনিও ২৲ টাকার জিনিসটাকে ১৲ টাকা বলিয়া দর করিতেন। কিন্তু বাবুত বাবুই। তিনি ।৴০ আনার জিনিষটা ১৲ টাকায় খরিদ করিতেন। সেই জন্য গ্রামের ব্যাপারী পসারিরাও ভারি উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণের পদরজঃ বিনিময়ে কলাটা মূলাটা দেওয়া দূরের কথা, আর জিনিষ পত্তরের দর করিবারও যো ছিল না। তাহারা ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিত "যান্ যান্ এ নেওয়া মহাশয়ের কাজ নহে বাবুর কাছে যাইব আর দশটি গণ্ডা আদায় করিয়া আনিব"। কিন্তু তাহার দর হদ্দ দুই আনা।

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি ক্ষোভ এইটুকুই ছিল গ্রামের কেহই এহেন বাবুর প্রকৃত ঐশ্বর্য্যটাকে নয়ন ও শ্রবণদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পাইত না, কারণ দারিদ্র্যের পক্ষে ঐশ্বর্য্যের একটা তীব্র আকর্ষণকারী মদগন্ধ ছিল। সেই মদগন্ধ উন্মত্ত গ্রামবাসীরা নেত্র ও কর্ণপথে বৈভবের বার্ত্তাটি পান করিতে পাইত না বলিয়াই মনের আপশোষে সদাসর্ব্বদা গুন গুন করিত। কিন্তু দরোয়ান ব্যাটা উপযাচক আলাপ-ইচ্ছুদিগকে অতি অসভ্য বর্ব্বরের ন্যায়

বলিত 'কার্ড লেয়াও'। ও কথাটার মানেও আবার অনেকে বুঝিত পারিত না বলিয়া আরো রাগ হইত।

কিন্তু অপরের যাহাই মনে হউক, বাগানের মধ্যে যে বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান বাস করিতেন তাঁহার ঐ গর্ব্বিত যক্ষতনয়ের উপর ভিন্নভাব। যে সময় তিনি গাড়ু হস্তে বটতলার ঘাট হইতে মুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক, শ্রোত্রোপরি শ্বেত যজ্ঞসূত্র সংস্থাপন করিয়া বাটী আসিতেন, এবং আসিবার সময় উদ্যানতত্ত্বাবধান-পরায়ণ অশ্বারোহনোচিত বেশধারী শ্রীযুক্ত নিত্যলাল রায়ের দিকে বঙ্কিম দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেন, তখন তাঁহার ভঙ্গি দেখিয়া সন্দেহ হইত যে ফৌজদারীর ভয় না থাকিলে ব্রাহ্মণপ্রবর এ বাবুকে অন্ততঃ দশবার বাপান্ত করিতেও ছাড়িতেন না। ব্রাহ্মণের সেই ক্রূর দৃষ্টি দ্বারা যেন দৃষ্ট পদার্থকে মনে মনে পয়জার প্রহার করিতে করিতে যাইতেন। কিন্তু নিত্যলাল বাবু এতদিনের মধ্যে একদিনের জন্যও ধর্ম্মদাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; আলাপ করাত দূরের কথা। কোন কোন প্রসিদ্ধ সমাজতত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ বলিতেন 'ওটা বাবুয়ানির কায়দা।

কখন কখন যমুনা ঠিক্ সন্ধ্যাবেলায় আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলিয়া আপনাদিগের কুটীরের বর্হিদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত। সেই সময় হঠাৎ দক্ষিণা সমীরণ সদ্যপ্রস্ফুটিত যূঁইফুলের গন্ধে একেবারে যেন মত্ত হইয়া আসিয়া তাহার স্কন্ধে এবং ললাটে একটা যেন সৌরভের ঝাপটা দিয়া চলিয়া যাইত। তাহার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিত। সে আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিত তাহাদিগের তুচ্ছ দারিদ্র্যকে উপহাস করিয়া অযুত কুসুমের অনন্ত বৈভব বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে পিতা ডাকিতেন—'মা যমুনে!'। একটি সংকীর্ণ স্নেহপ্রবল যমুনার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাহাতে তাহার ব্যথিত কল্পনা হইতে ঐশ্বর্য্যের রহস্যময় মোহকর ছায়া অপসৃত হইয়া যাইত।

(৫)

গঙ্গা লালজলে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রবাহিনীর আর পলক ফেলিবার অবকাশ ছিল না—কেবল এক প্রচণ্ড টানে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে। মনুষ্যেরাও এইরূপ দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হইয়া কখন কখন এমনি টানে এক অনির্দ্দিষ্ট সাগর সঙ্গমে ছুটিয়া যায়।

ভারি বদল—এপার ওপার জুড়িয়া মেঘ করিয়াছে। এমন সময়—দড়াম্।

অর্থাৎ নিত্যলাল যেমন ডাঙ্গা হইতে নৌকায় উঠিতে যাইবেন অমনি—পপাত বসুধাতলে। লেগিংবদ্ধ পদদ্বয় শূন্যমার্গে উত্থিত হইল, কোটে এবং পেণ্টলুনে কিঞ্চিৎ কর্দ্দম সংযোগ হইল এবং রাইডিংক্যাপ্ উত্তমাঙ্গ-ভ্রষ্ট হইল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে একান্ত-হাস্যরস বর্জ্জিত সংসারের এই কদাচিৎ কখনের ক্ষণকাল স্থায়ী পতন-প্রহসনকে গম্ভীর ট্র্যাজিডিতে পরিণত করিবার জন্য প্রায় গ্যালারিতে সহৃদয় দর্শকের অসদ্ভাব ঘটেনা।

যমুনা ও যমুনার মা ঘাটে বাসন মাজিতেছিলেন, না কি করিতেছিলেন। পড়িতে

দেখিয়াই প্রৌঢ়া মাতা দৌড়িয়া নিকটে গেলেন, এবং বলিলেন—ষাট্ ষাট্, ওঠো বাপ্ ওঠো ; লেগেছে বাপ্ ; ওঠো ; মরে যাই ! আহা মরে যাই বাপ্ !

বাবু লজ্জিত হইয়া উঠিলেন—এবং কোমরে যে ব্যথা লাগিয়াছিল তাহা উহ্য রাখিয়া বলিলেন—'না কিছু লাগে নাই'। কিন্তু প্রহসন অভিনেতা নিত্য লাল বাবু সেই সময়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে গ্যালারির অন্যত্র এক নবীনা কিশোরীর রক্তিম মুখমণ্ডল রুদ্ধ হাস্যরসে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।

(৬)

পরদিন প্রত্যুষে বাবু যাই নৌকা হইতে নামিলেন অমনি তাড়াতাড়ি যমুনার মা গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি বাবা ! হ্যাঁ বাবা ! ঠিক বলো, কাল ত কোথাও লাগেনি বাবা !"—যেন তিনি, যদিই লাগিয়া থাকে, তবে সে জন্য সেঁক দিবার জন্য বাটীতে কলাগাছ কাটিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন !

ইতি পূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণীর সঙ্গে বাবু কখন কথা কহিতেন না। কিন্তু এই অযাচিত যত্নে কথঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিলেন—'না গো মা ! কোথাও লাগে নাই।'

শুনিয়া যমুনার মা যতটা আশ্বস্ত হইলেন তাহা অপেক্ষা অনেকটাই খুসি হইলেন। তিনি আহ্লাদে আটখানা—এতবড় বাবু তাঁহাকে মা বলিলেন ! তাঁহার দুঃখ এবার ঘুচিল। হায় দারিদ্র্য !

সেই সময় এক পক্ষী-রূপিনী বঙ্গবধূ, কবে কোন নিদারুন শাশুড়ী তপ্ত লৌহে তাঁহার নয়নদ্বয় নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সেই পুরাতন শোকে গাছের উপর হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলেন—চ'ক্ গেল !

* * * * * *

বাজারে ধর্ম্মদাস যখন পদধূলিবিতরণপূর্ব্বক স্বহস্তে একটা বেগুন ফাউ লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন ব্যাপারী মাগী বলিল—'কেন ঠাকুর ! আমাদের আর ভোগাও কেন ; কলকেতার বাবু হয়েছেন তোমার বেটা, তোমার গিন্নিকে তিনি মা বলেছেন, তোমার আবার দুঃখ কি ?'

বাপান্তপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন—'কি বল্লি ! আমার গিন্নিকে কে মা বলেছে ?'

রাগে গর গর করিতে করিতে ব্রাহ্মণ বাটীতে বাজার লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। আসিয়াই অগ্রে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—'বাম্নী, সেই ছুঁচো ব্যাটা তোকে মা বলেছে নাকি !'

ব্রাহ্মণীও চটিয়া লাল—বলিলেন—"ষাট্ ষাট্ বাছা হ'লো ওর ছুঁচো ব্যাটা।" এবং প্রাকৃত ভাষায় ইহাও বলিলেন যে যদি ব্রাহ্মণের ঘরের গরু ধর্ম্মদাস ফের ও কথা মুখে আনেন তাহা হইলে স্বামীরূপ অভাগ্য-পুত্রকে তিনি এক রূপ ছপ্ ছপ্ শব্দকারী পদার্থদ্বারা শারীরিক শাস্তি দিবেন।

অগত্যা ব্রাহ্মণ "মা যমুনোকে" ডাকিলেন। মেয়ে স্নেহবর্ষী কণ্ঠে বলিল 'দেখ বাবা !

সে দিন ঐ বাবুটা ধড়াস্ করে এক আছাড় খেয়েছিল। মা গিয়ে খুব আহা উহু কল্লে। আর ত কিছুই জানি না বাবা!'

কিন্তু তিনি জানুন আর নাই জানুন সে দিন যমুনার মা রন্ধনশালায় যে অত ব্যস্ত ছিলেন তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহার অভিনব পুত্রকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাইয়াছেন—সে দিন পীঠা পুলি করিয়া খাওয়াইবেন!

যথাকালে ধুতি চাদর পরিয়া বাবু নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন। ধর্ম্মদাসও মনের রাগ মনেই চাপিয়া তাঁহাকে পিঁড়ি পাতিয়া বসিতে দিলেন। বাবু তখন চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ধর্ম্মদাসের সাংসারিক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কয় পুত্র কয় কন্যা ইত্যাদি কত অনাবশ্যকীয় কথাই হইল। কিন্তু ধর্ম্মদাসের মনটা কেবল বলিতেছিল—ধর্ম্মদাস! আর নয়, ছুঁচো ব্যাটার ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দাও; আর নয় ধম্মু! আর নয়!

এক উভয় সঙ্কটাপন্ন চোর ছিল। ঐকদিকে গৃহস্থের আঁস্তাকুড় অপর দিকে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ, সুতরাং চোর পলায়ন করেন কোথা দিয়া! ধ র্ম্মদাসের অবস্থাও তদ্রূপ। এদিকে ব্রাহ্মণী ভীতি ওদিকে ফৌজদারী ভীতি সুতরাং গলা টিপেন কিম্বা ঘাড় ধরেণ কি করিয়া? যা হউক কালে সবই হইল। ধর্ম্মদাসও একটু নরম হইলেন, বাবু ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ঘন ঘন ভাবও ঘনতর হইয়া উঠিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে পুরাতন ক্রোধের বকেয়াটুকু কিছুতেই গেল না।

ক্রমে ব্রাহ্মণীর চিরসঞ্চিত আশাও পূরণ হইল। বাবু তাঁহাদিগকে দিতে থুতেও আরম্ভ করিলেন। এক একদিন এক একরকম উপঢৌকন আসিত। আজ ব্রাহ্মণীর জন্য একযোড়া গরদের কাপড় আসিল। কাল ধর্ম্মদাসের পুত্রদিগের জন্য ২ ডজন সার্ট আসিল। পরশ্ব একখানা কারুকার্য্য খচিত ব্রাস্ আসিল। দেখিতে দেখিতে দরিদ্রের কুটীরের চারিদিক অট্টালিকার যেনো জলে থই থই করিতে লাগিল, এবং গ্রামের পুরস্ত্রীরা যখন ধর্ম্মদাসের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া দেখিতেন যে তাহার মেটে দাবায় সাটিনের বর্ডার দেওয়া অদ্ভুত জাজিম পাতা রহিয়াছে তখন তাঁহারা হাসিবেন কি ঈর্ষ্যা করিবেন ভাবিয়া পাইতেন না।

কিন্তু এত সুখ ঐশ্বর্য্যের তোড়ে ভাসিতে ভাসিতেও একখানি মুখ দিন দিন বড় শুকাইয়া যাইতে লাগিল;—সে যমুনার! বাবুর, প্রতি উপঢৌকনটিই যখন বাড়ীতে আসিত তখনই তাহার বুকের মধ্যে যেন কে একখানা ছুরী বসাইয়া দিত। আবার মা যখন তাহা লইয়া লোকের নিকট বড়াই করিত কন্যা তখন যেন মরমে মরিয়া যাইত। উপঢৌকনের সামগ্রীটি ছুঁইতে পর্য্যন্ত তাহার শতবার বাধা ঠেকিত। সে ভাবিত হে ঠাকুর!—আমি যখন মাদুরে বসিয়া বাবার মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিতাম তখন আমাদের যে সুখ ছিল সে সুখ আবার কতদিনে ফিরিয়া আসিবে।

পূর্ব্বে ভাই গুলি আধময়লা উড়ুনি লইয়া পাঠশালায় যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া সে গুলি দিদির জিম্মায় ফেলিয়া দিত। দিদি সকলের হাত মুখ ধোয়াইয়া দিয়া মুড়িমুড়কি খাইতে দিত।

এখন তাহারা হোয়াইট্‌ওয়ের বাটীর সাট গায়ে দিয়া পাঠশালায় যায় এবং ফিরিয়া আসিয়া উপঢৌকনের পেস্তা কিস্‌মিস্ খায়। দিদির চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়।

ক্রমেই পুঞ্জীভূত উপঢৌকন—অপমানতরঙ্গ তুলিয়া সেই ক্ষুদ্র বালিকাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। একদিন হৃৎপিণ্ড আঘাত করিল। বাবু তাহার জন্য একযোড়া এয়ারিং পাঠাইয়া দিলেন।

বালিকা স্ফীত বক্ষে, জলার্দ্র নয়নে মনে মনে বার বার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল 'পৃথিবীর কোন বাবুর তাহাকে অলঙ্কার দিবার কি অধিকার'?—মা তখন এয়ারিং লইয়া মধু তিলীর বাটীতে দেখাইতে গিয়াছিলেন।

'বলি হ্যাঁ লা —তুই যে তোর "দাদা"কে দেখিয়া শিহরিয়া বেড়াস্, তা দেখ্ দেখি তোর দাদা তোকে কেমন মতির এয়ারিং দিয়াছে"। এই কথা মা বলিলেন। মেয়ে হাত পাতিয়া এয়ারিং লইল। মা ভাবিল এমনত কখন দেখি নাই, মেয়ের ভাব বুঝি বদলাইয়াছে!

কিন্তু তাহার পর দিন নিত্যলাল বাবু তাঁহার বজরার উপর একটি পুঁটুলী কুড়াইয়া পাইলেন। তাহার মধ্যে এক তাল দুর্গন্ধ গোময় এবং ঐ এয়ারিংটা ছিল। যমুনা তাহা ডাঙ্গা হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বালিকার ঔদ্ধত্য দেখিয়া নিত্যলাল বাবু একটু হাসিলেন। তাহার অপেক্ষা কত বজ্জাত প্রজাকে তিনি শাসন করিয়াছেন!

(৭)

উপন্যাসে অনেক লোমহর্ষণ 'অকস্মাৎ' পাঠ করা গিয়াছে—তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য অনেক ঘটনা সমাবেশ ও উপলব্ধি হইয়াছে। কিন্তু অধুনা বাঙ্গালা দেশে প্রায় বৎসর বৎসর যে কত লোমহর্ষণ অকস্মাৎ উপস্থিত হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতেও আমরা একান্ত অক্ষম।

সে বৎসর ফাল্গুন মাসে গ্রামে এক মরণের বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিসূচিকায় ঘর ঘর মরিতে লাগিল। ধর্ম্মদাসের বাটীতেও সে বন্যা ঢুকিল—সব ভাসিয়া গেল, পুত্রের স্নেহ গেল, কন্যার আদর গেল, পিতার যত্ন গেল, ভগিনীর ভালবাসা গেল, সোদরের প্রণয় গেল,—কেবল অনন্ত হাহাকারের ধ্বনি দুইটিকণ্ঠে জাগ্রত রহিল। হায় হায়! দুনিয়ার কারিকরের কি মর্জ্জি! আমরা বুকে করিয়া ইঁটকাট বহিয়া তিলে তিলে সংসার গড়িয়া তুলি—বানের জলে একদিনে সব ভাসিয়া যায়।

দুইটি প্রাণী মাত্র বাকী—যমুনা ও তাহার মা। দুজনের স্মৃতিই শ্মশানবৎ, তাহাতে স্বামী, পুত্র, কন্যা ও পিতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর চিতা ধূ ধূ জ্বলিতেছিল। কিন্তু অদূরে বাবুর বাগানে নব বসন্ত সমাগমে মত্ত মধুপের নবীন মেলা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

বাবু পলাতক। গ্রামের শ্মশানে প্রথম চিতা না জ্বলিতে জ্বলিতেই বাবুর পানসী গঙ্গার বাঁক পার হইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল। যঃ পলায়তি সজীবতি, কবির উপদেশ।

(৮)

আবার আষাঢ় মাস। আবার ঘাটে বড় পিছল। কিন্তু কর্ণোপরি যজ্ঞসূত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক যে সাবধানী ব্রাহ্মণ পা টিপিয়া গাড়ুহস্তে ঘাট হইতে বাটী ফিরিতেন তিনি আর নাই। যাহারা হাস্যরবে গঙ্গাতীর মুখরিত করিয়া খেলিয়া বেড়াইত তাহারাও চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেথায় প্রত্যহ বসিয়া দক্ষিণদিকে অনিমিক্ নয়নে যমুনার মা কাহার প্রতীক্ষা করিত। একটু চুরটের গন্ধ পাইলেই ছুটিয়া বাটীর বাহির হইত। হায় পরিণাম!

বাগানের মালীরা ৫ মাসের মাহিনা না পাইয়া এবং বাগানের মালিকেরও কোন সন্ধান না পাইয়া—ট-বর্গবহুল স্ব স্ব ভাষায় শ্যালক নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বাগানের গাছগুলি উপড়াইয়া বেচিয়া ফেলিল এবং অবশেষে আপনাদের পথ দেখিল। বজরার মাঝিমল্লারাও গতানুগতিক হইল। আবার উলুখড়ও বাতাসে উড়িতে লাগিল—কা কস্য পরিবেদনা।

অবশেষে একদিন বাবু আসিলেন। যমুনার মা বসিতে পীঁড়া দিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রোতা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আঃ থামোনা গা," যমুনার মা থামিল। তখন বাবু বলিতে লাগিলেন—"আমার বাগানের সখ্ আর নাই। বজরা খানা বিক্রয় করিয়াছি। আমি আর এখানে থাকিব না। তোমার কন্যা ও তুমি আমার সঙ্গে চল কলিকাতায় বাসা করিয়া রাখিব।"

অগ্র পশ্চাত না ভাবিয়া যমুনার মাতা যাইবার জন্য তখনই উদ্যত। মেয়ে বলিল—"মা যাব না।" অনেকক্ষণ মা মেয়েকে বোঝাইল। মেয়ে অবশেষে বলিল "আমি কিছু জানিনা—আমায় যা বলিবে তাই করিব।"

(৯)

মধ্যগঙ্গায় পানসিতে তিনজন মাত্র আরোহী। মাতা, কন্যা ও বাবু। এমন সময় সয়তান আসিয়া নিতালালের কানে কানে বলিল—"মেয়েটি—বেশ!" বাবু তাহার জবাব দিলেন—"যমুনা! কাছে আয় না। সরে আয়।"

কিছুক্ষণ পরে একটা শব্দ হইল—"বাবাগো কোথায় তুমি!"—এবং উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত রক্তিমাভ জলরাশির মধ্যে বিধাতার স্বরচিত নাটিকার সমাপ্তি হইল।

ক্রোধের কারণ অবগত নহেন ; আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের অদৃষ্ট সূত্র সার লেপেলের করধৃত নহে।

'সাটারডে রিভিউ' পত্রিকায় সার লেপেলের এই প্রলাপ রচনা প্রকাশ করার পর বিলাতের অন্যতম অনুদার পত্রিকা "ডেলিমেল" তাঁহার উচ্চকণ্ঠ আরও এক গ্রাম উচ্চে তুলিয়া লিখিলেন—"ভারতের দুই বহু দূরবর্ত্তী বিভিন্ন প্রদেশে এক সময়েই শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় সিপাহী বিদ্রোহের কথা মনে পড়িয়া যায়।" কিন্তু ভারতে এই প্রকার বিরুদ্ধাচরণের জন্য 'ডেলীমেল' কিছুমাত্র ভীত নহেন, কারণ ভারতের অধিকাংশ প্রজাই রাজভক্ত, এবং অনেকেই রাজ্য শাসন নীতির আলোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। "কিন্তু সার উইলিয়াম ওয়েডরবর্ণ এবং মিষ্টার কেনের মত লোকের প্ররোচনায় আমাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য সেখানে দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে।"

"কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশ যে দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের কষ্টই ভারতবর্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহাদের মত অজ্ঞ আর ত্রিসংসারে কেহ নাই, কারণ মধ্যভারতে যেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেখানে কোনই হাঙ্গামা নাই। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে যাহা ঘটিয়াছিল আজকাল তাহাই আবার ঘটিতে বসিয়াছে ; পূর্ব্ববারের মত এবারও দাঙ্গাবাজদিগের সঙ্গে মিটমাট করা হইতেছে। ১৮৫৭ সালে নেটিভরা ভাবিয়াছিল তাহাদের বাহাদুরীতে আমরা ভয় পাইয়াছি, এবারও তাহারা তাহাই ভাবিয়াছে ; তদ্ভিন্ন আর একটা বিষয়ে সেবারের সঙ্গে এবারকার আশ্চর্য্য মিল আছে সেটি হিন্দুমুসলমানের একতা। এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত প্রবন্ধাবলীতে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে ; ফেব্রুয়ারী মাসের ডেলীমেলে ঐ সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সমস্ত বিলাতী সংবাদপত্রের মধ্যে ডেলীমেলই কেবল সম্পাদকীয় স্তম্ভে পুনঃ পুনঃ সতর্কতা ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন।"

"চর্ব্বিমাখান টোটা কাটার হুজুগে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হয়, প্লেগসম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য ১৮৯৭ সালের বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। বোম্বে গবর্ণর লর্ড সাণ্ডহার্ষ্ট পুনার প্লেগ বিদূরীত করিবার জন্য দায়ী, তিনি নিতান্ত নির্ব্বিবাদী লোক, যদি তিনি নেটিভদের কুসংস্কারে আঘাত প্রদানের ভয়ে সঙ্কুচিত না হইতেন তাহাহইলে এই সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত না। যখন ভারতীয় জাহাজ সমূহের য়ুরোপীয় এবং আসিয়িক বন্দরে প্রবেশ বন্ধ হইয়াগেল, যখন বিলাতী সংবাদ পত্রাদিতে বোম্বে গবর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্যের সমালোচনা চলিতে লাগিল, কেবল তখনই তিনি প্লেগ দমনে মনোযোগী হইলেন। দেশীয় মতামত সংগঠনের কর্ত্তারা তখন প্রাণের ভয়ে ট্রেনে চড়িয়া প্লেগাক্রান্ত দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, কেবল য়ুরোপীয় সৈন্যদলের উপরই কালা আদমীদিগের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের গুরুতর এবং বিপজ্জনক ভার সমর্পিত হইয়াছিল।"

"ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন দেশের লোক হইলে এইরূপ অস্বাস্থ্যকর কার্য্যের ভার তাহারা

দেশীয়দিগের স্কন্ধেই নিক্ষেপ করিত, ইহাতে আর কোন ফলই লাভ হইত না, কেবল সহস্র সহস্র লোকের পরিবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে যম মন্দিরের পথ পরিষ্কৃত হইত। কিন্তু এই সকল কর্ত্তব্যপরায়ণ পদস্থ ইংরাজ এবং তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গ কার্য্য-ভার গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া চিকিৎসা বিভাগের নিয়োগক্রমে কর্ত্তব্য অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, এবং বলাবাহুল্য, তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।"

"কিন্তু অবিলম্বেই একদল নেটীভ আন্দোলনকারী এই ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, হাঁস পাতাল, ঔষধ এবং ডাক্তারদের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ চলিতে লাগিল। যাঁহারা এসময় ভারতবর্ষে ছিলেন এবং এই সকল অভিযোগ সংখ্যা সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন যে প্রত্যেক পথের প্রান্তভাগে এক একটা ঠিকে মুহুরী বসিয়া থাকে, চারি গণ্ডা পয়সা পাইলেই তাহারা হাজার নাম সংযুক্ত একখান দরখাস্ত লিখিয়া দিতে পারে। এক টাকা হইলেই ইণ্ডিয়াতে যেমন একজন লোককে ফাঁসি দেওয়ার জন্য সাক্ষীর যোগাড় করা যায় সেইরূপ একটাকা খরচ করিলেই সেখানে কোন আন্দোলনের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে আবেদন পত্রে হাজার হাজার নাম সংযোগ করা সহজ সাধ্য হয়। ভারতের কোন রাজকর্ম্মচারী কি ভারতপ্রবাসী কোন পরিব্রাজকের নিকট এরূপ আবেদন পত্র পৌছে না এমন দিন নাই। শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে এমন লোক নাই যিনি এক মুহূর্ত্তের 'নোটীসে' তাঁহার পারিবারিক নীতি কি ধর্ম্মনীতি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে দীর্ঘ সমাসসঙ্কুল প্রবন্ধ লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে না পারেন। ভারতে কি এমন আধ ডজনও সংবাদ পত্র আছে যাহারা আমাদের মিসনারীবর্গকে, আমাদের সিভিল ও মিলি-টারী কর্ম্মচারীগণকে, আমাদের রেলোয়ে এবং আমাদের উন্নতির প্রতি প্রত্যহ অতি কাপুরুষের মত ঘৃণিতভাবে আক্রমণ না করে? দশজনের মধ্যে নয়জন ব্রাহ্মণ কি বাঙ্গালী বাবু এরূপ ইচ্ছা করেন নাকি যে আমরা ভারত ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের দেশলুণ্ঠনের পক্ষে সুবিধা করিয়া দিই?—যাঁহারা মিষ্টমুখ ইংলণ্ড প্রবাসী নেটিভদিগের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া যান তাঁহারা কখন ভারতের ইতিহাস পাঠ করেন নাই। * * * কালা আদমীরা সকল বিষয়েই কালো। ব্যাঘ্রকে খেলা শিখান যাইতে পারে, তাহাকে পোষ মানানও কঠিন নয়—কিন্তু তথাপি সে ব্যাঘ্র, একদিন সে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবেই।"

"লণ্ডনে যাঁহারা ভারতীয় ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন কি প্রবন্ধ লেখেন তাঁহাদের কথা প্রকাশিত হইবা মাত্র তাহা ভারতের নিকৃষ্টতম পত্রিকার কর্ণগোচর হইয়া থাকে। লর্ডজর্জ্জ হ্যামিল্টন যতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন আমরা তাঁহার নিকট তদপেক্ষা অধিক আশা করি। লর্ড এলগিন যে এমন প্রয়োজনীয় সময়ে কলিকাতায় না আসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে সিমলায় বসিয়া আছেন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর।"

কিন্তু 'ডেলী মেলের' ভারতবিদ্বেষী অথচ ভারতের ঘটনা পরম্পরা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লেখকের নিকট যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর আমাদের নিকট তাহা কিছু মাত্র

বিস্ময়কর নহে, এবং ভরসা করি লর্ড এলগিনও তাহা তেমন বিস্ময়কর বলিয়া অনুমান করেন না। কারণ তিনি জানেন ভারতের কোথাও বিদ্রোহ নাই, টালার হাঙ্গামা বা পুণার প্লেগবিভ্রাট একটা সাময়িক এবং স্থানীয় গণ্ডগোল মাত্র, ইহাতে ভারত রাজপ্রতিনিধির চিন্তার কিম্বা মস্তিস্ক বিলোড়িত করিবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু যাঁহারা এই সকল সামান্য এবং স্থানীয় অশান্তিকে ১৮৫৭ সালের দেশব্যাপী রোমহর্ষক সিপাহী বিদ্রোহের সহিত তুলনা করে তাহাদের চীৎকার যতই তীব্র হোক, কিম্বা তাহাদের ভাষাতে যে পরিমাণেই নেটিভ বিদ্বেষ ও গাত্রজ্বালা প্রকাশিত হউক ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাস ও অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের যে কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা নাই একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে যদি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ইংলণ্ডবাসীকে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহাদের এপ্রকার রচনা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাহা কিয়ৎপরিমাণে সুসিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।

যাহা হউক আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বিলাতি সংবাদ পত্রের এই প্রকার আলোচনাও উপেক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু ভারত মাতার শ্যামল অঙ্কে প্রতিপালিত, ভারতের অন্নজলে বর্দ্ধিতদেহ বিলাতপ্রবাসী পার্শী ভাউনগরী আমাদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষপূর্ণ গালাগালি বর্ষন করেন তাহার অপেক্ষা বিস্ময়কর ও শোচনীয় ব্যাপার আর কিছু নাই। "ফর্ট নাইটলি রিভিউ" নামক বিখ্যাত বিলাতি পত্রিকার এক সংখ্যায় সংপ্রতি তিনি ভারতে রাজভক্তিহীনতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এই প্রবন্ধের ভাবানুবাদ প্রকাশ করিলাম। ভাউনগরী স্বাধীনচিত্ততা ও স্পষ্টবাদিতার ভাণ করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এবং সংবাদ পত্রগুলিকে কিরূপ ঘৃণিত ও অপদার্থ রূপে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিবেন ভাউনগরী কিরূপ স্বজাতি বৎসল; গুণগ্রাহী, মহৎচরিত্র, স্বদেশবৎসল বিদেশীদের মধ্যে এই স্বজাতিদ্বেষী নিন্দুক নরপুঙ্গবটি আসন পাইবার কিরূপ উপযোগী। গরীবের ছেলে জামা জোড়া পরিয়া যদি দৈবাৎ কোন রাজপুত্রের পার্শ্বচর হইবার অধিকার পায় সেই সময় কোন দিন সে তাহার আপনার সহোদর ভ্রাতাকে ছিন্ন বস্ত্রে মলিন মুখে সম্মুখে দেখিলে বন্ধুবান্ধব মণ্ডলীর মধ্যে নিজেকেই অপরাধী বলিয়া মনে করে, এবং কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "ও তোমার কে হয়?" তাহা হইলে সেই জামাজোড়াওয়ালা দরিদ্রনন্দন ওষ্ঠ প্রান্তে ঘৃণা এবং একটা নিদারুণ উপেক্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক অসঙ্কোচে উত্তর দেয় "ও একটা কোন্ ছোট লোকের ছেলে হবে, চিনি না।"—আমাদের সম্বন্ধে মাননীয় (?) ভাউনগরীর উত্তরটাও অনেক পরিমাণে এই রকম, অথবা ইহা অপেক্ষাও অধম, কারণ কেহ আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আগেই তিনি লিখিতেছেন:—"ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগের এই পেশাদারী চীৎকার বার বৎসরের বেশী আরম্ভ হয় নাই। কতকগুলা উচ্চাভিলাষী মৎলববাজ লোক এই আন্দোলনটাকে (কংগ্রেস) বছর দশেকের মধ্যে ভারতবর্ষে অসন্তোষের বীজবপ-

নের একটা প্রকাণ্ড 'ইঞ্জিন' করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের যাহারা আদি প্রতিষ্ঠাতা তাহাদের এরকম কোন মতলব ছিল না। লর্ডরিপনের রাজত্বকালে ইলবার্টবিলের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় হইতে এই কংগ্রেসের সুর বদলাইয়া গিয়াছে। * * * অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষ কতকগুলা উচ্চমস্তিষ্ক যুবকের সভা সমিতিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, দুরাকাঙ্খস্থানীয় রাজনৈতিকেরাই ইহার সর্দ্দার হইয়া দাঁড়াইল। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতে তাহারা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে যে যাহারা কতকগুলি লোকের দোহাই দিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজের প্রতিবাদ করিতে পারে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ তাহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন। এই নূতন যুগের আরম্ভের পূর্ব্বেও একালের মত ভারতে সভাসমিতি এবং খবরের কাগজ ছিল কিন্তু তাহাদের পরিচালন ভার বৃটীশ রাজত্বের প্রতি বীতস্পৃহ ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত ছিলনা, কিম্বা সে কালের সেই সকল পত্রিকা এরূপ :অবিমিশ্র রাজনৈতিকত্ব লাভ করে নাই। বাঙ্গলার রাজা রামমোহন রায়, কৃষ্ণদাস পাল, বোম্বের সার জেমসেটজি জিজি ভায়, জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ভাউদাজি, সোরাবজি সাপুরজি ; দক্ষিণ ভারতের সার টি মাধব রাও প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা সংবাদ পত্রের মতামত সংগঠিত ও কর্ত্তব্য নিয়মিত হইত। তাহার পর হইতেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় সংবাদ পত্রের এই পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন।" * *

অনন্তর দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ভাউনগরী বলিতেছেন "ইহাতে দেশীয় লোকের মতামত সন্নিবিষ্ট হয় না, সুতরাং ইহাতে যে সকল অভিযোগের উল্লেখ থাকে, কখন তাহাব প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে এই সকল পত্রিকার অধিকাংশেরই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। বোম্বে প্রেসিডেন্সীর সংবাদ পত্র সমূহের একটা বিশ্বাসযোগ্য ফর্দ্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য এই প্রদেশই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী এবং সুশিক্ষিত ; এখানে ২১১ খানা কাগজ আছে, তন্মধ্যে ৩৮ খানির গ্রাহক সংখ্যা হাজার কি তাহার কিছু অধিক, প্রকৃতপক্ষে তিনখানি সাপ্তাহিক সম্বন্ধেই একথা খাটে। ২৬ খানা কাগজের গ্রাহক সংখ্যা নাই বলিলেই হয়, তিন চারি খানি ভিন্ন অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদকের আয় দুই তিনশত টাকার অধিক নহে, অবশিষ্ট কাগজ গুলি যে সকল লোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় তাহারা কোন মাসে ৮০৲ টাকার অধিক উপার্জ্জন করেনা, তাহাদের মধ্যে কাহারো সংবাদ দাতা কি পত্র প্রেরক থাকিলে সেই সকল লোক এক এক কলমে লেখার জন্য কয়েক আনা হিসাবে মাত্র পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। মোটের উপর কথা এই যে অধিকাংশ দেশীয় পত্রিকাই অতি নীচ, নির্ব্বোধ ব্যবসাদার লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই সকল লোকের হাতে কাগজ গুলি প্রজাসাধারণের মনে বিষ প্রয়োগ করিবার কলমাত্র, তাহারা শুধু তোতাপাখীর মত কতকগুলি অসুবিধার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া থাকে ; নেটিভ কংগ্রেস ওয়ালারা এই সকল অসুবিধার কথা লইয়া আন্দো-

লন করে, বৃটীশ কমিটী তাহাতেই উৎসাহ প্রদান করেন, আর সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ এই বৃটীশ কমিটীর পরিচালক, মন্ত্রদাতা, সুহৃদ্ একাধারে সমস্তই। দেশের যত লোক রাজা, প্রজা, সওয়ার, সেঠিয়া এমনকি রাজকর্ম্মচারীগণের নিকট হইতেও ভ্রূকুটী ভঙ্গী পূর্ব্বক তাহারা কিঞ্চিৎ অর্থ আদায় করিয়া লয়। কেহ সমাজ মধ্যে প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য, কেহ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট মিথ্যা অভিযুক্ত হইবার ভয়ে, কেহবা সাধারণের সম্মুখে অপ্রতিভ : না হইবার আশায় ইহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য প্রদান করে।”

এই বক্তৃতা লিখিয়া সার এম এস, ভাউনগরী বিলাতের লোকের কাছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে ভারতের খবরের কাগজ গুলা অতি অগণ্য, তাহাদের মতামত নিতান্তই মূল্যহীন। কংগ্রেস একদল দুরাকাঙ্খ, দুর্ব্বিনীত দেশীয় লোকের রাজনৈতিক ব্যাধি, সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণের খেয়ালের ফলে দেশের লোকের উপর জোর দস্তি করিয়া যে কিছু টাকা আদায় হয় তদ্দারাই কংগ্রেসের খোরাক চলে। তুচ্ছ কথা তু গায়ে পড়িয়া ভাউনগরী সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণের প্রতি যেরূপ অভদ্র ভাষায় গালি বর্ষন করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা সেই ভারতহিতৈষী মহোদয়ের নিকট লজ্জিত হইয়াছি। কারণ তাঁহার নিঃস্বার্থ ভারতপ্রীতির জন্য আমাদের নিমিত্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে গিয়া তাঁহাকে আমাদেরই একজন স্বদেশবাসীর শ্লেষপূর্ণ অসংযত এবং কঠোর উক্তি শ্রবণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মহত্ব বিনষ্ট হয় নাই এবং আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে একন্য তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত হইবেন না। ভারতের হিতাকাঙ্খারূপ যে সুবৃহৎ ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সমুন্নত পর্ব্বতের প্রভাতরৌদ্রোদ্ভাসিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের ন্যায় অটল ভাবে এবং পূর্ণগৌরবে প্রকাশমান রহিবে, কিন্তু ভাউনগরী ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত অসংযতবাক্ নিন্দুকের হীন নিন্দাবাদ এবং স্বার্থপরতা সংমিশ্রিত তুচ্ছ ধিক্কার সেই পর্ব্বতের পদপ্রান্তবর্ত্তী বনভূমির ন্যায় চির অন্ধকারে সমাবৃত থাকিবে।

কলা।

কদলী, রম্ভা, বন-লক্ষ্মী, ভানু-ফল, বারণ-বল্লভ—ইত্যাদি সুন্দর, সুমিষ্ট, প্রীতিকর সংস্কৃত নামগুলিতে যে ফল অভিহিত তাহাকে বাঙ্গালা ভাষায় কলা বলে। অতি প্রাচীন সময়ে ইহা মোচা নামেও পরিচিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ভাষায় মোচা বলিলে কলা না বুঝাইয়া উহার মৌলিক আধার বুঝাইয়া থাকে। মোচা হইতে পালী উপভাষায় ও আরবী ভাষায়

প্রচলিত 'মৌজ' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। এই শেষোক্ত কথা হইতে বৈজ্ঞানিক অভিধান 'মিউসা' হইয়াছে। কিন্তু এই কথা সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লিনিয়স্ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ইউফর্বসের ভ্রাতা ও অগষ্টসের চিকিৎসক এন্টোনিয়স্ মিউসার স্মরণার্থে ফরাসীদেশীয় বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্লুমিয়ার এই জাতীয় বৃক্ষের এইরূপ নাম দেন। গ্রীকভাষায় ইহাকে 'এরিইএনা' বলে। এস্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এই কথাটি 'বারণ' কথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আরও বোধ হইতেছে যে, কদলীবৃক্ষ এসিয়া হইতে অতি প্রাচীন কালে গ্রীসে আনীত ও রোপিত হয়। 'ব্যানানা' কথাটি ইংরাজীতে কলার নামান্তর মাত্র; আর ইহা যে গ্রীক ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজীতে একসময়ে কলাকে Adam's fruit বলিত, পরন্তু প্রবাদ আছে যে আদিপুরুষ আদম স্বর্গোদ্যানে এই ফল খাইয়া পাপ ভ্রষ্ট হইয়া কালে কলঙ্কিত হন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে বিস্তর মতদ্বৈধ আছে।

রাজাকলা এসিয়ার ফল। ভারতবর্ষ, হিমালয়ের নিকটবর্ত্তীস্থান সমূহ, চীন, ও ইউফ্রেতিস্ শেঠ, উপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলি ইহার আদিম জন্মস্থান। এই সকল স্থান হইতে নিকটস্থ ব্যক্তি দ্বারা এবং অন্যান্য বিষুবরেখার সমীপবর্ত্তী ও গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ইহার চাষ বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে। ডাক্তার রক্সবরা বলেন যে, চট্টগ্রামের বন্যকদলী বৃক্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কদলী উৎপন্ন হইয়াছে। বন্য কদলী বৃক্ষ নেপাল, হিমালয়ের পার্শ্বে, নীলগিরি ও ঘাট পর্ব্বতেও দৃষ্ট হয়। ইহা বিচিতে পরিপূর্ণ, শাঁস কম, যাহা কিঞ্চিৎ থাকে তাহা অতি স্নিগ্ধগুণাত্মক। কৃষির উন্নতিতে উত্তম জাতীয় বৃক্ষের ফল হইতে শিমুল বিচির মত বিচি গুলি আর দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সকল জাতীয় কদলী যে ঐ এক বন্য জাতি হইতে সম্ভূত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। উর্ব্বরা ভিজা ভূমিতে বিশেষতঃ আসামুদ্রিক প্রদেশের মৃত্তিকায় ইহার অতি উত্তম চাষ হইয়া থাকে। এই কারণে বর্ম্মা, শ্যাম, ভারতসিন্ধুর দ্বীপপুঞ্জে, বঙ্গোপসাগরের ও ভারতবর্ষীয় মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কদলী জন্মিয়া থাকে। জেমেকায় যদি ইহার চাষ না হইত, তাহা হইলে উহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইত কিনা সন্দেহ। আমেরিকার আদিম বাসিগণের ইহা প্রধান খাদ্যদ্রব্য মধ্যে পরিগণিত, তাহারা বর্ম্মার কেরেনদিগের ন্যায় সর্ব্বদা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং যথায় যায় ইহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। য়ুরোপের মধ্যে স্পেনের দক্ষিণে ও কিউবায় অত্যন্ত শীতাধিক্যেও ইহার চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ে ইহার বৃক্ষ ৬,৫০০ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে কলার তেউর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পুতিয়া থাকে। নূতন পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ নূতন মৃত্তিকায় অথবা বন পরিষ্কৃত করিয়া ইহার বেশ চাষ হয়, বৎসর কতক এইরূপে রাখিলে উক্ত ভূমি কলার চাষের অনুপযুক্ত হইয়া উঠে অর্থাৎ উহাতে

আর গাছ বড় বাড়ে না, ফল ভাল হয় না। তখন উহাতে অন্য চাষ করিলে ভাল হয়। মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহার বিস্তর চাষ আছে। "কোদালে কলা জলে বেগুণ" সেখানকার এক প্রচলিত প্রবাদ আছে। ইহার অর্থ এই যে, কলার চাষ করিতে হইলে গাছের চতুঃপার্শ্বস্থ মাটী ভাল করিয়া কোদাল দিয়া মাঝে মাঝে উস্কাইয়া দিবে আর বেগুনের চাষ করিতে হইলে, গাছে মাঝে মাঝে জল দিবে। শেষোক্ত চাষের পক্ষে জল নিতান্ত আবশ্যক কিনা তাহা আমি তত বলিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু প্রথমোক্তটির বিষয় বলা যাইতে পারে যে, উহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিমূলক নহে। বোম্বাই অঞ্চলেও ইহার চাষের জন্য চাষীদিগকে বিশেষ যত্ন করিতে দেখা যায়। মাটী বেশ যত্নের সহিত প্রস্তুত হইলে গর্ত্ত খনন করিয়া, উহাতে শুষ্কপাতা সার ও মাটী দিয়া তেউর পুতিয়া থাকে। ঐ তেউর গুলিতে প্রতি সপ্তাহে এক-বার বা দুইবার জল দেয়। তত্রত্য কোনও কোনও স্থানে ইক্ষু বা তাম্বুলের সহিত পালায় ইহার চাষও লোকে করিয়া থাকে। অর্থাৎ পানের চাষ হইলে সেই ভূমিতে আকের চাষ করা হয়। আকের চাষ হইয়া গেলে, ভূমি এক বৎসর কাল ফেলিয়া রাখে, তাহার পর হয় উহাতে পুনরায় আক না হয় কলার চাষ করে। থানা জেলায় ইহার যেরূপ সুন্দর চাষ হইয়া থাকে আর কোনও স্থানে সেরূপ হয় না। মিঃ জেম্‌স্‌ কাম্বেল বলেন ইহার কৃষির উন্নতি সংসাধনের নিমিত্ত বালিযুক্ত লঘু মৃত্তিকা আবশ্যক। ইহা এপ্রেল বা মে মাসে দগ্ধ করিয়া বর্ষারম্ভে কর্ষিত করিতে হয়। তার পর মাটী বাছিয়া ফেলিয়া আধফুট গভীর এক একটি গর্ত্ত করিয়া উহাতে খোয়াল পচা মাছ ও গোবর দিয়া তেউর গুলি বসাইয়া সমস্ত ঘাস ও শুক্‌ন পাতায় ঢাকিতে হয়। প্রথম চারিমাস কাল চারাগুলিতে মাসে একবার সার দিতে হয়—প্রথম তিনবার খোয়াল দিয়া, আর মাছ পাইলে শেষ বারে মাছ দিয়া। যতবার সার দিবে, ততবার তার উপর মাটী এবং মাটীর উপর ঘাস ও পাতা দেওয়া আবশ্যক। মৎস্য-সার অপেক্ষাকৃত সুলভ ও কম পরিমাণে জল আবশ্যক করে। ইহাতে পোকা হয়, পোকা হইলে যতদিন না সে গুলি মরিয়া যায় ততদিন—৮।১০ দিন জল আদৌ দিবে না। তিনবার এইরূপে সার দেওয়া হইলে, যতদিন না পুনর্ব্বার বর্ষারম্ভ হয়, ততদিন প্রথমতঃ দ্বাদশ দিবস কাল দুইদিন অন্তর, তৎপরে ছয়দিন অন্তর জল দেয়। কলা গাছ বড় শীঘ্র বাড়িতে থাকে এমনকি ইহার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়।

আমাদিগের দেশের লোক বোধ হয় শুনিলে হাসিবেন যে, বোম্বাই অঞ্চলে কলার অতি উত্তম মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে। মোরিসস্‌ দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ইহার চূর্ণ হইতে একপ্রকার আরারুট ও বার্লির ন্যায় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহা রোগী ও শিশুর খাদ্য।

আরব দেশে যে প্রকার মহদুপকার উষ্ট্র কর্ত্তৃক সংসাধিত ভারতবর্ষে সেইরূপ কদলী বৃক্ষ হইতে হয়। ইহার কিছু পরিত্যক্ত হয় না। ইহার শুষ্ক গুঁড়িও জ্বালানি কাঠের কাজ করে।

মীর কাসিম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মফল!

"Every transaction since Plassey—the suppression of the risings within, repulse of the two formidable invasions from without, the crushing of the Dutch—had confirmed and strengthened the predominance of the English. Mirja'far had become simply a tool in their hands, an unwilling tool, it is true, but a tool whom the circumstances of every year forced to be more submissive. Against this position the whole soul of Mir Kasim revolted."—Col. Malleson.

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাবের নাম মীর কাসিম। ইনি এ দেশের ইতিহাসে কাসিম আলি নামেও পরিচিত। ইঁহার অধঃপতনের পর যাঁহারা মুরশিদাবাদের মুসলমান "মসনদে" উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে পারেন নাই। সেই জন্য কাসিম আলির ইতিহাস এ দেশের মুসলমান-শাসনের শেষ চিত্রপট!

পলাশির যুদ্ধেই মুসলমান-শাসন-শক্তির ভিত্তিমূল উৎখাত হইয়াছিল! যুদ্ধাবসানে মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ যখন মনসুরগঞ্জের রাজসিংহাসনে পদার্পণ করিয়া রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করেন, ইংরাজেরা তখনই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা লৌকিক প্রথা-রক্ষার্থে মীরজাফরকে "নজর" প্রদান করিয়া তাঁহাকে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার "সুবাদার" বলিয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেও, কি মীরজাফর কি পাত্র-মিত্রগণ, সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে,—মীরজাফর উপলক্ষ মাত্র, ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব এবং তাঁহার সঙ্গীণ-সহায় শ্বেতাঙ্গ সহচরগণই মুরশিদাবাদের ভাগ্যবিধাতা!*

* For the moment, the grandees at Murshedabad regarded Clive as the symbol of power, the arbiter of fate, the type of omnipotence who could protect or destroy at will. One and all were eager to propitiate Clive with presents; such has been the instinct of Orientals from the remotest antiquity.—Early Records of British India, p. 261

তাঁহাদিগের সঙ্গে গুপ্তসন্ধিপত্র সম্পাদন করিবার সময়ে লোভান্ধ মীরজাফর প্রকাশ্যে ও গোপনে ইংরাজদিগকে যে আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, রাজকোষে তদনুরূপ অর্থভাণ্ডার দেখিতে পাইলেন না! সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও মীরজাফর ঋণমুক্ত হইতে পারিলেন না;—তাঁহার সিপাহী-সেনা বেতন না পাইয়া অধীর হইয়া উঠিল; আত্মীয় অন্তরঙ্গ সমুচিত পুরস্কার-লাভার্থ বিবিধ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিল;—মীরজাফর অনন্যোপায় হইয়া ক্লাইবের কণ্ঠলগ্ন হইয়া উঠিলেন। লোকে সহজেই বুঝিতে পারিল যে, মীরজাফর নামমাত্র,—ক্লাইবই মুরশিদাবাদের প্রবলপ্রতাপ নবীন নরপতি! তখন দলে দলে হিন্দু মুসলমান আমীর ওমরাহেরা ক্লাইবের শুভদৃষ্টি লাভার্থ প্রবল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়া পড়িলেন! সুচতুর কর্ণেল ক্লাইব উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া পাত্রমিত্রদলের মধ্যে গৃহবিবাদের সূচনা করিয়া, একদলের অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন।* মীরজাফরের রাজ্যাভিনয়ের উৎকট উচ্চাভিলাষ অচিরে বিষাদ-বিজড়িত করুণ ক্রন্দনে পরিণত হইয়া পড়িল!

কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসিগণ অকাতরে অর্থলাভ করিয়াও শান্ত হইলেন না; তাঁহারা জলে স্থলে প্রবল প্রতাপে স্বাধীন বাণিজ্যের নূতন পন্থায় আরোহণ করিয়া দরিদ্র বঙ্গবাসীর ক্ষুধার অন্নে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন!† মীরজাফর "এক মাসের মধ্যেই" এই সকল অন্যায় উৎপীড়নের গতিরোধ করিবার জন্য কাতর ক্রন্দনে ক্লাইবের কর্ণকুহর পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন!‡

অর্থাভাবে মীরজাফরের নিকট রাজমুকুট বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; প্রকৃত শাসনক্ষমতাবিস্তারে অক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার পলিতকেশ আরও জরাপলিত হইয়া উঠিতে লাগিল;—লোকে সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ত্রুটি করিল না!§

মীরজাফরের আত্মাপরাধ বৃক্ষে এত অল্পদিনের মধ্যেই যে এমন বিষময় ফলফল বিকশিত হইয়া উঠিবে, তাহা কে জানিত! পূর্ণিয়া শত্রুসঙ্কুল, বিহার বিদ্রোহোন্মুখ, রাজধানী

* We were necessitated to strengthen ourselves, by forming a party in his own court.—Scrofton.

† As it is the nature of man to err with great changes of fortune, many, not content with the undisputed advantages accruing from the revolution, immediately began to trade in salt, and other articles, *which had hitherto been prohibited to all Europeans.*—Orme, ii. 189.

‡ Meerjaffeer complained of these *encroachments* within a month after his accession.—Ibid.

§ They now regretted the fall of Sirajaddowlah, and the old saying of *Bless our former ruler* was on the tongues of the wise and the simple.—Scott's History of Bengal, p. 380.

হাহাকার পূর্ণ, রাজকোষ ধনরত্নহীন, বাদশাহজাদা সিংহাসনলাভার্থ অগ্রসর হইতেছেন ;- এক সঙ্গে এই সকল অদৃষ্টবিড়ম্বনা মিলিত হইয়া মীরজাফরকে ইংরাজের ক্রীতদাস করিয়া তুলিল। তিনি গলপাশ মোচন করিতে পারিলেন না ; কেবল প্রত্যেক ঘটনায় তাহা উত্তরোত্তর তাঁহার গলদেশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চলচ্ছক্তি রহিত করিতে লাগিল !

যাঁহারা মীরজাফরের পাপ পথের প্রধান সহচর, তাঁহারা এ সকল দুঃখ দুর্দ্দশার মূলানুসন্ধান না করিয়া, মীরজাফরকেই যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন।* লোকে বুঝিল যে, কলিকাতার ইংরাজ দরবারই প্রকৃত নবাব-দরবার, মীরজাফর কেবল সেই দরবারের সূত্রানুচালিত ক্রীড়াপুত্তল মাত্র !

মীরজাফর আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া গোপনে গোপনে ইংরাজের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য আয়োজন করিতে ত্রুটি করিলেন না ; কিন্তু ভাগ্যদোষে সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল !† আড্‌মিরাল ওয়াটসন্ অকালে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন, কর্ণেল ক্লাইব দিন দিন মীরজাফরের কুৎসা রটনা করিয়া বিলাতে সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন, যাবাদ্বীপের ওলন্দাজবণিকেরা ভাগীরথী বক্ষে যুদ্ধ জাহাজ লইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটন করিবার আয়োজন করিয়া তুলিল ;—ইংরাজেরা বুঝিলেন যে, এ সকল কেবল মীরজাফরের স্বাধীনতা লাভের কুটীল কৌশল !‡ ওলন্দাজদিগের অভিযান জয়যুক্ত হইল না, মীরজাফর হতবুদ্ধি হইয়া ইংরাজদিগের নিকট তীব্র তিরস্কার লাভ করিতে করিতে একহস্তে অশ্রুসম্বরণ করিয়া অপর হস্তে ক্লাইবের নামে এক বহুমূল্য "জায়গীর" লিখিয়া দিয়া—কোনরূপে সিংহাসন রক্ষা করিলেন !§ ইহার কিছু দিন পরে প্রিয় পুত্র মীরণের অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইল !¶

* In laying open the state of this Government, I am concerned to mention that the present Nabob is a Prince of little capacity and not at all blessed with the talent of gaining the love and confidence of his principal officer. His mismanagement threw the country into great confusion in the space of a few months, and might have proved of fatal consequence to himself but for our known attachment to him.—Clive's letter to the court of Directors, 23 December, 1757, para. 2.

† No sooner was Meer Jaffier advanced to the Subahship, than he began to feel his own strength ; and to look on us rather as rivals than allies ;—his first thoughts were, how to check our power, and evade the execution of treaty.—Scrofton.

‡ Col. Malleson's Decisive Battles of India.

§ The complicity of Meer Jaffier in Duch expedition was beyond all doubt. Indeed it might be conjectured that Clive got his *jaghire*, not because he had defeated Shajyada, but because Meer Jaffier was in mortal terror lest Clive should punish him for his intrigues with the Duch.—Early Records of British India. p. 226.

¶ "মীরণের (বজ্রাঘাতে) মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস"—এই কথা শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়ের "মুরশিদাবাদ-কাহিনী" নামক ঐতিহাসিক চিত্রের টীকায় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। লেখক কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা লিখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। ইংরাজী-ইতিহাসে "বজ্রাঘাতে মৃত্যুর" কথাই স্থানলাভ করিয়াছে।

শোক-সন্তপ্ত-বৃদ্ধ মীরজাফরকে সান্ত্বনা করিবার কেহই রহিল না। যাঁহারা মীরজাফরের চক্রান্তে প্রভূত অর্থলাভ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ-সাধনের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানা দিগ্দেশে চলিয়া গিয়াছেন ;—কেহ বা বিলাতের বিস্ময়াপন্ন নাগরিকদিগের কৌতূহলোদ্দীপন করিয়া স্বদেশে "নূতন নবাব" সাজিয়া পলাশিযুদ্ধের অলৌকিক বীরত্বকাহিনীর বর্ণনালালিত্যে বন্ধুজনকে অনুরঞ্জিত করিতেছেন!* যাঁহারা কলিকাতা দরবারে সদস্যের আসন গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই নবাগত অর্থগৃধ্নু অনাত্ম বন্ধু! তাঁহারা আমোদর পূর্ণ করিবার জন্য মীরজাফরের অধঃপতন চিন্তা করিতে লাগিলেন!†

ক্লাইব বিলাতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে কিছুদিনের জন্য হলওয়েল এ দেশের ইতিহাসে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রথমে চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন।‡ কিয়ৎকলে পরে ঔষধ পত্র বিসর্জ্জন দিয়া কলিকাতার কলেক্টার অথবা "জমীদার" পদে আরোহণ করেন। এই পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে হলওয়েলের অর্থোপার্জ্জনের ত্রুটি ছিল না, পদগৌরবেরও অন্ত ছিল না। সিরাজদ্দৌলা যখন কলিকাতা অবরোধ করেন, তৎকালে কলিকাতার গভর্ণর শ্রীল শ্রীযুক্ত ড্রেক সাহেব বাহাদুর এবং প্রধান প্রধান ইংরাজ সেনানায়কগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করায়, অবরুদ্ধ ইংরাজ-সেনা হলওয়েলকেই অধিনায়ক পদে বরণ করিয়াছিল। হলওয়েল দুর্গত্যাগ করেন নাই, হলওয়েল দুই দিবস পর্য্যন্ত অক্লান্ত অধ্যবসয়ে দুর্গরক্ষা করিয়া অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং "অন্ধকূপ হত্যায় §" নিষ্কৃতিলাভ করিয়াও মুরসিদাবাদে কারাক্লেশ বহন করিয়াছিলেন,—এই সকল কথা নানা লতাপল্লবে সুশোভিত করিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাতের অধ্যক্ষ সভার কর্ণগোচর করিয়া কিছু দিনের জন্য হলওয়েল দশজনের মধ্যে একজন হইয়া উঠিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং কীর্ত্তিকাহিনীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যখন বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে আত্মসম্মানরক্ষার্থ সসম্ভ্রমে পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হয়।¶ এই মহাপুরুষ মুসলমান নবাবদিগকে দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন

* Macaulay's Lord Clive.

† Governor Clive departing for Europe, the 8th of February, 1760, Mr Holwell succeeded by his rank to the Government ; the established Committee entrusted with the conduct of all political occurences, with the country Government, consisted of the President, Peter Amyatt Esqr. Major Cailland, W. B, Sumner Esqr, and W. Macquire Esqr.—India Tracts, P. 22.

‡ Long's Selections from the Records of Government of India, vol. I.

§ অন্ধকূপহত্যার বিস্তৃত সমালোচনা 'সিরাজদ্দৌলা' নামক ঐতিহাসিক চিত্রে বিবৃত হইয়াছে।

¶ The many unmerited and consequently unjust marks of resentment which I have lately received from the present Court of Directers, will not suffer me longer to hold a service, in the cause of which, my steady and unwearied zeal for the honor and interest of the Company, might have expected a more equitable return.—Permit me, therefore, Gentlemen, to resign the Service, and at the same time to request the favor of your indulgence to reside in Bengal, until I can fully collect my scattered concerns in trade, previous to my quitting India.—Holwell's letter to the President, 29 September 1760 (India Tracts, pp. 377—378).

না ;—সময়ে অসময়ে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কত কুৎসা রটনা করিতেন, এবং অবসর পাইলেই তাহাদিগের শাসনক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। ক্লাইবের স্বদেশগমনে ইঁহার হস্তে কলিকাতার শাসনভার সমর্পিত হইবা মাত্র হলওয়েলের গুপ্ত সংকল্প প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি অন্ধকূপ হত্যার করুণ কাহিনীতে সভ্য জগতে অশ্রুপ্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার সহযোগীগণ তাঁহাকে লক্ষাভাগের সময়ে এক লক্ষ টাকার অধিক পুরস্কার প্রদান করেন নাই। হলওয়েল তখন নিম্নপদস্থ সদস্য মাত্র, তাঁহাকে নীরবে আত্মগ্লানি পরিপাক করিতে হইয়াছিল। সেই হলওয়েল সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবামাত্র তাঁহার প্রবল প্রতিহিংসা যে তীব্রতেজে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা সর্ব্বথা স্বাভাবিক। হলওয়েলের বিষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, হতভাগ্য মীরজাফর তাহাতে পতঙ্গবৎ পতিত হইলেন !

মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মুরশিদাবাদের রাজসিংহাসন পুনরায় উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা, এবং এইরূপ সহজ উপায়ে আত্মোদর পরিপূর্ণ করা যাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য, তাঁহাদের পক্ষে মীরজাফরকে কলঙ্ককালিমায় অনুলিপ্ত করিয়া তাঁহার সিংহাসনচ্যুতি সংঘটন করিবার উপযোগী ইতিহাস রচনা করা কঠিন হইল না।* যিনি স্বহস্তে—"অন্ধকূপ হত্যার" অলৌকিক ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই সিদ্ধহস্তের প্রশস্ত লেখনী পুনরায় ইতিহাস রচনার ভার গ্রহণ করিল। হলওয়েল পুনরায় সুললিত বচনবিন্যাস কৌশলে অশ্রুবিগলিত নেত্রে মীরজাফরের বিরুদ্ধে আর একটী হত্যাকাহিনী রচনা করিলেন ! অন্ধকূপ হত্যার সত্য মিথ্যা লইয়া এখনও নানারূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, কেহ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া হলওয়েলের তথাকথিত অন্ধকূপহত্যার অলীকত্ব প্রমাণ করিয়া দিতেছেন ; কেহ বা নানারূপ কূটতর্কে বচনবাহুল্যে সে সকল সিদ্ধান্ত উড়াইয়া দিয়া, হলওয়েলের প্রতিহিংসাতাড়িত উন্মত্ত কল্পনাসম্ভূত লোমহর্ষণ হত্যাকাহিনী প্রত্যক্ষ সত্যবৎ শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছেন ! কিন্তু হলওয়েল বর্ণিত মীরজাফরের কাহিনী যে সর্ব্বথা স্বকপোলকল্পিত তদ্বিষয়ে আর কোন রূপ বাগ্‌বিতণ্ডার সম্ভাবনা নাই ;

* (Clive's) successor in the Government, *who had been particulary instrumental in bringing down Sou Rajah Dowla, and consequently, in occasioning the first revolution in Bengal,* had arrived at his dignity. * * * * Being blest with a genius, uncommonly fertile in expedients for *raising money,* and further unclogged by those silly notions of punctilio, which often stand in the way between some people and fortune, he had projected and put in practice several *inferior manœuvres* ; but his *Chef d'oeuvre,* this master scheme, though formed almost as soon as he came to power, time did not allow him the honor of executing.—Reflections on the present state of our East Indian affairs P. 37.

স্বদেশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবর্গ সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সাগ্রহে লিখিয়া গিয়াছেন যে, হলওয়েলের হত্যাকাহিনী "সর্ব্বৈব মিথ্যা,—তাহাতে সত্যের লেশ মাত্রও বর্ত্তমান নাই !"*

হলওয়েল কেবল কাহিনী রচনা করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া কাহাকে মসনদে উপবিষ্ট করাইবেন, সেই ভাগ্যধরের ভাগ্যবিবর্ত্তনের মূল্যস্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানী বাহাদুর এবং সদস্যবর্গের ক্ষুৎক্ষামোদর পরিপূর্ণ করিবার জন্য কি পরিমাণ পুরস্কার গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদি সমস্ত কথা স্থির করিয়া ফেলিলেন। ক্লাইবের স্বদেশ প্রত্যাগমনে ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গভর্ণরপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ভান্সিটার্টের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় হলওয়েল সংকল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন না;—সহযোগীদিগের সহিত সতৃষ্ণনয়নে ভান্সিটার্টের আশাপথ চাহিয়া রহিলেন। যে সৌভাগ্যশালী মুসলমান রাজকর্ম্মচারী এই সকল কুটীল কৌশলবলে সিংহাসন লাভাশায় উদগ্রীব হইয়া মীরজাফরের অধঃপতনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি মীরজাফরের জামাতা,—তাঁহারই নাম ইতিহাস বিখ্যাত মীর কাসিম !

* In justice to the memory of the late Nabob Meer Jaffier, we think it incumbent on us to acquaint you that the horrible massacres wherewith he is charged by Mr. Holwell, in his Address to the Proprietors of the East India Stock (page 46) are *cruel aspersions* on the Character of that Prince, *which have not the least foundation in truth.*—The several persons there affirmed, and who were generally thought to have been murdered by his orders, are *all now living*, except two, who were put to death by Meeran, without the the Nabob's consent or knowledge.—Letter to Court, Sep 30,1766 Suppliment,

দর্ব্বেশিনী।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বেহারে খুব গ্রীষ্ম। দিবসে সূর্য্যের খুব তাপ, খুব রৌদ্র; রাত্রেও খুব গরম কিন্তু বায়ু চলিলে ঠাণ্ডা হয়। বন্দোবস্ত করিলাম, সন্ধ্যা ৬টা হইতে পরদিন প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত গাড়ী চলিবে; সমস্ত দিন আমরা পথে বিশ্রাম করিব এবং আহারাদি সমাপন করিয়া আবার ৬টা হইতে সমস্ত রাত্রি গাড়ী চালাইয়া প্রাতে ৯টার সময় গাড়ি থামাইব। এই নিয়মে গাড়ী চলিতে লাগিল। ক হইতে খ মহকুমা অনেক দূর সুতরাং কয়েক দিন ব্যাপিয়া গাড়ী চলিল; যে পথ দিয়া গাড়ী চলিতেছে ঐ পথের অধিকাংশ আমারই এলাকাভুক্ত অর্থাৎ ঐ স্থানগুলি আমারই খ মহকুমার অন্তর্গত এবং আমিই উহার Subdivisional Officer অথবা চৌকিদারের দলপতি।

দ্বিতীয় দিবস রাত্রে (প্রায় ১১টার সময়) নয়োজং নামক মহাবিস্তৃত ময়দানের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া গাড়ী আস্তে আস্তে চলিতেছে, এমন সময়ে শুনিলাম কে যেন প্রাণ ভয়ে অতিউচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে "মেরী জান্ যাতী হ্যায়।" * গাড়োয়ান্, চাপরাশী, কনেষ্টবল, পাচক প্রভৃতি সকলেরই কর্ণে এই ধ্বনি পৌঁছিল। আমি গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া নীচে নামিলাম এবং গাড়ী থামাইয়া কনষ্টেবল উদয় সিং ও চাকর বল্‌বোয়া গুজরকে সঙ্গে লইয়া তরবারী এবং রাইফেল দ্বারা সশস্ত্র হইয়া, যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে দৌড়াইলাম। যাইতে যাইতে আবার শব্দ শুনিলাম, স্পষ্ট বোধ হইল নৈঋর্ত কোণ হইতে শব্দ আসিতেছে। আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইলাম চীৎকার করিয়া বলিলাম "ভয় নাই, পরিত্রাণের জন্ত আমরা যাইতেছি।" এই বলিয়া বন্দুক হইতে আওয়াজ করিলাম। ভাবিলাম দস্যুরা কোনও পথিককে এই ভয়ানক ও বিস্তৃত মাঠে মারিয়া ফেলিতেছে। নৈঋর্ত কোণে গেলাম; শব্দও নাই, মনুষ্যও নাই! এক একটা করিয়া সকল স্থান দেখিলাম, কোথাও কাহাকে পাইলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি, আবার পশ্চিম হইতে আওয়াজ আসিল "মেরীজান্ যাতীহ্যায়।" তথায় গেলাম, কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। চাঁদনী রাত্রি, ময়দানে জঙ্গল নাই, চারি দিক দেখা যায়, কিন্তু কোনও মনুষ্য বা জীব দেখিলাম না। আর একবার শব্দ হইল "মেরীজান্ যাতী হ্যায়", এবারের শব্দটা যেন ময়দানের মধ্যস্থিত একটা প্রাচীন শুষ্ক সরোবরের পার্শ্বস্থ কোনও ভগ্ন মৃণ্ময় দেওয়ালের পশ্চাৎ হইতে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, মনুষ্যের যত্নে যতদূর হইতে পারে তাহা করিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিলাম না। অতিশয় ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সরকারী রোজ্‌নামচায় বিবরণটা কায়দামত লিখিয়া রাখিতে হইল। তৃতীয়দিবসে কিছুই হইল না; চতুর্থ দিবস রাত্রে প্রায় দুইটার সময় অকস্মাৎ চাকরাণী সেই যম্‌নী বা যমুনাবাই চীৎকার করিয়া বলিল "হুজুর! আবার সেই শব্দ হইতেছে।" আমার নিদ্রা খুব কমই হইয়াছিল, আমি জাগিয়া উঠিলাম। এই স্থানটার নাম মথুরডাা। আমরা আবার সেই রূপে সশস্ত্রে গেলাম এবং অনুসন্ধান করিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিয়া আমি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম এবং একাকী গেলাম; কোমরে ইংরাজী তরবারী এবং হাতে বন্দুক। একাকী যাইতে সহধর্ম্মিণী নিষেধ করিলেন, শুনিলাম না। কিন্তু ঘোড়া কোন্ দিকে ছুটাইব চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে "মেরী জান্ যাতী হ্যায়" সেই শব্দ একটা ছোট জঙ্গলের মধ্য হইতে আসিল, বলাবাহুল্য কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ঐ শব্দ জঙ্গলের প্রায় অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়াছিল। আমি জঙ্গলেই গেলাম, কিন্তু কোথাও কেহ নাই! একটি পাখীরও ধ্বনি শুনিলাম না! কিন্তু

* জান্ অর্থে প্রাণ, উর্দ্দ ভাষায় ইহা স্ত্রীলিঙ্গ। মেরী অর্থে আমার, যাতীহ্যায় অর্থে যাইতেছে, লেখক

এবারে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই শব্দ অনুসরণ করিয়া শব্দকর্ত্তা বা শব্দকর্ত্রীকে দেখিব। ইহা যে দস্যু কর্ত্তৃক পথিকাক্রমণ নহে তাহা এখন বুঝিতে পারিলাম। জঙ্গলের অনুসন্ধান শেষ হইলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে নীরব আছি এমন সময়ে সেই শব্দ যেন অতি নিকটে এক মৌয়া ফুলের গাছের নীচে হইতে আসিতেছে বোধ হইল। তথায় গেলাম, যাইবা মাত্রই ঐ ধ্বনি প্রায় ৪ শত হস্ত দূর হইতে আসিতেছে শুনিলাম। সেই স্থান অনুসন্ধান করিতেছি এমন সময়ে অতি দূর হইতে আবার ঐ শব্দ আসিল। সেই দূরবর্ত্তী স্থানে যাইব কি না যাইব ভাবিতেছি এমন সময়ে বোধ হইল যেন জঙ্গল হইতে ঐ শব্দ নিঃসৃত হইল, আবার জঙ্গলে গেলাম। কিন্তু অনুসন্ধান ব্যর্থ হইয়া গেল! পুনরায় জঙ্গলের পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠোন রব আছি এমন সময়ে সেই জঙ্গল হইতে এমন এক মহাদুর্গন্ধ পরিপূর্ণ বায়ুস্রোত অকস্মাৎ বহিতে লাগিল যে, কাহার সাধ্য তথায় মুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করিতে পারে। আমি পলাইলাম, গোশকটের নিকট আসিয়াই গাড়ী হাঁকাইতে হুকুম দিলাম; কেহ কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল না। স্ত্রীকে বলিলাম "কিছুই দেখিলাম না।" পর দিন ৮ টার সময় পথপার্শ্বস্থিত একটা থানায় আমরা অবতরণ করিলাম। দারোগাকে পথের ঘটনা বলিলাম, তিনি বলিলেন "এখানে এরূপ কখনও হয় নাই।"

তৎপর দিবস দিবা তিনটার সময় আমরা খ নগরে পৌছিলাম; রজনী প্রভাত হইলে আমি চার্জ্জ লইয়া আদালত এবং খাজানা বুঝিয়া লইলাম। ডেপুটী সাহেব চলিয়া গেলেন আমি কার্য্য করিতে লাগিলাম। এখানকার বাঙ্গলো বাসাবাটীও মন্দ ছিলনা, জল বায়ু যদিও খুব স্বাস্থ্যপ্রদ নহে তথাপি স্থানটি মন্দ নহে। ক মহকুমা হইতে খ মহকুমায় কার্য্য কম নহে, বিশেষতঃ এখানকার সব্‌ডিবিসন অফিসার হওয়ায় আমার অবসর খুব কম রহিল। বেহারের মধ্যে খ মহকুমা অন্যতম বদমাসের মহকুমা বলিয়া প্রসিদ্ধ। একদিন একজন বিখ্যাত ও বলবান জমিদারের দেওয়ানের নামে যে সকল চার্জ্জ ছিল তাহা এই; প্রথমতঃ অন্যায় জনতায় মিলিত হওয়া, দ্বিতীয়তঃ পুলীশ কর্ম্মচারীকে সরকারী কর্ম্মে ব্যাঘাত দেওয়া, তৃতীয়তঃ চুরীর উদ্দেশে অনধিকার প্রবেশ করা। আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল; আসামীর উকিলের বক্তৃতা প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে সম্বাদ পাইলাম আমার বাটীতে সহধর্ম্মিণীর মূর্চ্ছা হইয়াছে। মোকর্দ্দমা বন্ধ করিয়া শীঘ্র বাসায় আসিলাম, ভাবিলাম এখানেও কি ভূতের ভয়? স্ত্রীর চেতনা সম্পাদন করিয়া যাহা শুনিলাম তাহা এই; তিনি বলিলেন "আজ দিবসে ঠিক সেই বিকট স্ত্রী মূর্ত্তি আবার দেখিয়াছি। ছাদের কিনারায় সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মুখে "মেরী জান্ যাতী হ্যায়" শব্দ স্বকর্ণে শুনিয়াছি। এই মূর্ত্তি অবিকল সেই মূর্ত্তি যাহাকে গঙ্গার ঘাটে দেখিয়াছিলাম। আমার কল্পনা নহে, আমি মনশ্চক্ষের দ্বারা দেখি নাই, চর্ম্মচক্ষে দিবালোকে দেখিয়াছি।" খ মহকুমার সব্‌ডেপুটী কালেক্টর বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার পিতা ভূতশান্তির এক সামান্য উপায় জানিতেন, তাঁহার পিতা ঐ সময়ে নগরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি

যাহা জানি তাহা অতি সামান্য হইলেও ধর্ম্মজনিত ও শাস্ত্রোচিত কর্ম্ম বটে। আমি বলিলাম—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

তাঁহার উপায় অনুষ্ঠিত হইল, ভূতের (অথবা অজ্ঞাত কারণের) শান্তি হইল। আমার কিন্তু ভীতি বা চিন্তা গেলনা, আমি হয়রাণ পরেশাণ হইয়া পড়িলাম।

ইহার পরে আর ভূতের বা ভয়ের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই, কিন্তু সেই দর্ব্বেশিনী ফাতেমাকে একবার আমি দেখিয়াছিলাম। ফাতেমার মোকর্দ্দমার অনেক পূর্ব্বে আমি একবার হরিদ্বারে গিয়াছিলাম, তথায় কনখলে একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডার বাটীতে যাত্রীরূপে অবস্থান করিয়াছিলাম। আমি অনেক বৎসর পরে আর একবার হরিদ্বারে গিয়াছিলাম তখন কুম্ভযোগ হইয়াছিল, সে কুম্ভ গতবারের কুম্ভ। যে সময়ের কথা ব'লিতেছি, সে সময়ে আমার চাকুরী গিয়াছে, স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, ইত্যাদি। এবারে হরিদ্বারে গিয়া আমি আমার সেই প্রাচীন পাণ্ডা ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহার নাম অথবা ঘরের ঠিকানা আমি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অনেক চেষ্টায় তাহার ঠিকানা করিতে না পারায় আর একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে রহিলাম কিন্তু সে স্থানে থাকিবার কষ্ট হইল। দুই দিবস পর্য্যন্ত পাণ্ডার অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও পাওয়া গেলনা। তাহার পরে গঙ্গায় স্নান করিয়া আহ্নিক করিতে বসিলাম, আহ্নিকের পরেই একটি ছোট কুঞ্জবনের পশ্চাতে "আসন" করিয়া ধ্যানে বসিলাম। ধ্যানে কে যেন আমার সম্মুখে একটা মশাল ধরিয়া আছে বোধ হইল, সেই মশালের আলোকে দেখিলাম ও পড়িলাম

"গোপীনাথ।"

পাঠক মহাশয়! শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, আমার সেই পূর্ব্ব পাণ্ডার নাম গোপীনাথ মিশ্র। গোপীনাথ শব্দ পাঠ করিয়াই আমার সেই ব্রাহ্মণের নাম এবং তাঁহার যে স্থানে বাটি সেই মহল্লার নাম স্মরণ হইল। পরদিন আমি সেই মহল্লায় গেলাম, কিন্তু সেই পাড়ার তখন শ্রীবৃদ্ধি ও প্রভূত পরিবর্ত্তন দেখিলাম। পুরাতন নূতন হইয়াছে, নূতন পুরাতন হইয়াছে দেখিলাম। সুতরাং সহজে বাটীটার ঠিকানা হইলনা, যাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কি কারণবশতঃ বলিতে পারি না প্রশ্নের উত্তর দিল না। সেই গলিতে কুম্ভ উপলক্ষে লোকে লোকারণ্য, যেন নরমস্তকের সমুদ্র দেখিতেছি বলিয়া বোধ হইল। হঠাৎ এক ব্যক্তি পশ্চাত হইতে আসিয়া ('তখন দিবা এবং প্রাতঃকাল') আমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিল "ঐ সম্মুখের বাটী", আমি দেখিলাম লোকটা স্ত্রীলোক; ভাল করিয়া দেখিলাম, যেন সেই ফাতেমার মূর্ত্তি। তাহাকে ধরিতে গেলাম কিন্তু সেই নরমস্তক সমুদ্রের মধ্যে কোথায় সে মিলিয়া গেল, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না, ইহার এক মিনিট পরেই গোপীনাথ মিশ্র আসিয়া বলিলেন "বাবু! আপনি কবে আসিয়াছেন।" আমার মুখ

হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না, গোপীনাথ আমাকে ঘরে লইয়া গেল, তাহার পরে অপর ব্রাহ্মণের বাটী হইতে আমি আমার দ্রব্যাদি আনাইয়া গোপীনাথের বাটিতে চতুর্দ্দশ দিবস রহিলাম।

ইহার এক বৎসর পরে আমি গয়ায় গিয়া ভূতপিণ্ড দিয়াছিলাম। কে ভূত, কাহার পিণ্ড দিতেছি, কিছুই জানি না; লোকের কথায় পিণ্ড দিলাম। এখন পাঠক মহাশয় বিবেচনা করুন, এ সকল অদ্ভুত কাণ্ডের কারণ কি। গয়ায় পিণ্ড দিবার সময় গোপীনাথ আমার সঙ্গে ছিল। যাঁহার পদকৃপায় এই সকল চিন্তা, ভীতি ও বিপদ হইতে বাঁচিয়াছি, তাঁহাকে এখন নমস্কার করিতেছি।

"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং।
সর্ব্বদেব নমস্কারঃ ঈশ্বরং প্রতি গচ্ছতি॥"

এই সকল ভীতি ও বিপদের মধ্যেও আমি সেই বেদাদি গুহ্য দয়াময় প্রভুর কৃপা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম; যেখানেই দেখ সেই দুঃখহারী হরি সর্ব্বত্রই পূজ্য।

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরানে ভারতে তথা।
আদৌ মধ্যে তথা চান্তে হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

সেখ সাদির সেই জগদ্বিখ্যাত পারস্য শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিতেছি।

"চশম্ কুশা বাসদৎ দীদায়ে মানী বেয়ার।
হর্ বরখে দফ্তরেস্ৎ মার্ফতে, কীর্দ্গার॥"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

মসূরী পাহাড়ে তিন দিন।

কয়েক বৎসর হইল যখন আমরা রুড়কী কলেজে পড়ি একবার খেয়াল ক্রমে মসূরী পাহাড় দর্শন ঘটে। ঘটনাটি এইরূপ। মার্চ মাসের ১লা তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়া ২১শে তারিখে আমাদিগের দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়। এই পরীক্ষাই আমাদিগের শেষ পরীক্ষা। ক্রমাগত ২১ দিন ধরিয়া পরীক্ষা দিয়া শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। তাহার উপর আবার ফলাফলের চিন্তা; কারণ এই পরীক্ষায় যাঁহারা প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে হইবেন তাঁহাদেরই guaranteed post পাইবার কথা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময় যখন এফ্.এ, এবং বি.এ, পরীক্ষা দিই তখনও চিন্তা হইত, কিন্তু এরূপ চিন্তা কখনও হয় নাই, কোনও নূতন জায়গায় যাওয়ার জন্য মনটা বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ২৫শে তারিখে পরীক্ষার ফল বাহির হইল এবং জানিতে পারিলাম যে

আমরা দুইজন বাঙ্গালীই (বাঙ্গালী ছাত্র আমরা মোট দুইজন ছিলাম) কাজ পাইব। বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল। তখনই বসিয়া কমিটি করিতে লাগিলাম যে কোথায় যাওয়া যায়, রূড়কী ত আর ভাল লাগেনা। অবশেষে স্থির হইল যে যেখানেই যাওয়া হউক ৩০শে তারিখ পর্য্যন্ত ছুটি লইয়া রাখা যাক্। ৩১শে তারিখ হাজির হওয়া চাই কারণ সেদিন আমাদিগের সার্টিফিকেট ও প্রাইজ বিতরণ হইয়া কলেজ বন্ধ হইবে। তখনই কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট দরখাস্ত করিয়া ছুটি লওয়া গেল।

পরদিন (২৬শে তারিখ) স্থির করিলাম হয় জ্বালামুখী না হয় মসূরী যাইব। আমরা দুইজন এবং আমার একটি আত্মীয় আমার সঙ্গে রূড়কীতে থাকিতেন তাঁহাকে জুটাইয়া লইয়া তিন জনে ষ্টেশনে আসিলাম। সেখানে আসিয়া স্থির হইল যে মসূরী যাওয়াই ঠিক কারণ সময় অতি অল্প; এত অল্প সময়ের মধ্যে জ্বালামুখী যাওয়া ঘটিবে না। গত বৎসর ঠিক এইরূপ সময় আমরা হরিদ্বার হইয়া হৃষিকেশ, লছমন ঝোলা বেড়াইয়া আসিয়াছিলাম সেই জন্যই আমার এবার জ্বালামুখী যাওয়ার ইচ্ছা হইতেছিল। মসূরী যাওয়া ঠিক করিয়া আমরা আউদ রোহিল খণ্ডের রেলে বেলা আন্দাজ ৩টার সময় সাহারাণপুরে পৌছিলাম, সাহারাণপুর রূড়কী হইতে ২১ মাইল দূরে। এখানকার জেলা ইস্কুলের হেডমাষ্টার তা— বাবুর সহিত আমার আত্মীয়ের একদিন সামান্য আলাপ হইয়াছিল। সেই আলাপের জোরে আমরা তাঁহার বাসায় যাওয়াই স্থির করিলাম। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি— সুদূর পশ্চিমে আসিয়া কলিকাতার নিয়ম খাটাইলে চলে না; এখানে পরিচয় না থাকিলেও বাঙ্গালীর বাড়ীতে অতিথি হওয়া যায় এবং গৃহকর্ত্তাও আদর অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। আমরা হেডমাষ্টার বাবুর বাড়িতে যাওয়ার কিছু পরেই তিনি স্কুল হইতে আসিলেন এবং পরিচয় লইয়া যথেষ্ট আদর করিলেন। বৈকাল বেলায় একটি গাড়ীভাড়া করিয়া সাহারাণপুর বোটানিকাল গার্ডেন এবং গবর্ণমেণ্টের ঘোড়ার আড়গড়া বেড়াইয়া আসিলাম। এই আড়গড়ায় সরকারী রেশালার জন্য ঘোড়া উৎপাদিত হয়। সাহারাণপুর বোটানিকাল গার্ডেনের আম খুব প্রসিদ্ধ! গার্ডেনের মধ্যে একটি ছোট খাট মিউজিয়াম আছে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না, ৪টার পর বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শুনিলাম ইহাতে নানা জাতীয় কাষ্ঠের নমুনা আছে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়াই মসূরী যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইল। মসূরী যাইতে হইলে ডাকগাড়ী করিয়া রাজপুর যাইতে হয়। ঠিক পাহাড়ের নীচেই এবং সাহারাণপুর হইতে ৪৮ মাইল উত্তরে। রাজপুর হইতে মসূরী ৬ মাইল; গাড়ী যায় না; ঘোড়া ডাণ্ডি অথবা ঝাম্পান চড়িয়া যাইতে হয়। কেহ কেহ হাঁটিয়াও যান। মসূরী পাহার দার্জ্জিলিং এবং সিমলা হইতে উচ্চ; দার্জ্জিলিং লাইনে যে ঘুম ষ্টেশন আছে তাহার সমান। সিমলা এবং নাইনিতাল পর্য্যন্ত cart road আছে, গাড়ীতে যাওয়া যায়। দার্জ্জিলিং এর ত কথাই নাই টানা—রেল আছে। কেবল মসূরী যাওয়াই কিছু অসুবিধা।

মস্থরী যাওয়ার ডাকগাড়ীর বন্দোবস্ত দুইজনের আছে—লাল্‌তা প্রসাদের এবং স্মিথ রডওয়েলের। লাল্‌তা প্রসাদের গাড়ী কিছু সস্তা এবং দেশীলোকের, সেই জন্য তাহার গাড়ীতে যাওয়াই স্থির করিলাম। বিশেষতঃ সেই সময় লাল্‌তা প্রসাদের গাড়ী পথে উল্টাইয়া একটি সাহেব মারা পড়ায় সাহেবেরা আর বড় কেহ তাহার গাড়ীতে যাইতেছেন না সুতরাং কিছু বেশী সস্তায় পাওয়া যাইবে এরূপ আভাস তা—বাবু দিলেন। তিনি নিজে লাল্‌তা প্রসাদের লোককে ডাকিয়া আনাইয়া একখানি গাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। এক হপ্তার রিটার্ণ টিকেট যাওয়া আসায় ৩৬৲ টাকা স্থির হইল। সে সময় চড়াই (exodus) সুরু হয় নাই সেই জন্য এত কমে পাওয়া গেল, নতুবা সুধু যাইতেই এক খানি গাড়ি ৪০৲ টাকা লয়। দিব্য করিয়া আহার করিয়া তা—বাবুর নিকট বিদায় লইয়া রাত্র আন্দাজ ৯ টার সময় আমরা তিন জনে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীগুলি চারি চাকার এবং পা লম্বা করিয়া শোয়া যায়। অবশ্য আমাদিগের তিন জনেরই শুইবার জায়গা হইল না; আধ শোয়া আধবসা হইয়া যাত্রা করিলাম। ঘোড়া দুইটী দেখিয়া অভক্তি হইয়াছিল কিন্তু তাহা আমাদিগের ভ্রম শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম। গাড়োয়ান মধ্যে মধ্যে বিউগল বাঁজাইতে লাগিল। রাত্রে কত জায়গায় ঘোড়া বদলাইয়াছিল টের পাই নাই। কিন্তু এক জায়গায় বড় বেশী সোরগোলে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দেখি এখানে একটি গিরি সঙ্কট। ইহার নাম মোহন পাশ, এখানে রাস্তা শিবালিক পর্ব্বত ভেদ করিয়া ডুন উপত্যকায় পড়িয়াছে। এখানে খানিক পথ ঘোড়ার বদলে বয়েল যুতিতে হয়। পূর্ব্বের লিখিত সাহেবটি এইখানে মারা পড়িয়াছিলেন। পরদিন ভোরে (২৭শে তারিখে) রাজপুর পৌছিলাম। এখানে লাল্‌তা প্রসাদের এবং স্মিথ রডওয়েলের হোটেল আছে। আমরা প্রাতরাশাদি সমাধা করিয়া দুইটি ঘোড়া এবং একটি ঝাম্পান ভাড়া করিলাম, ঘোড়ার ভাড়া ২৲ টাকা এবং ঝাম্পানের ভাড়া ৪৲ টাকা; ঝাম্পানটী আমার সমপাঠি বন্ধুর জন্য। তিনি ঘোড়ায় চড়িতে অভ্যস্ত ছিলেন না (এই গল্পটি যদি তাঁহার চক্ষে পড়ে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন—এখন অবশ্যই তিনি ভাল সোয়ার হইয়াছেন, কিন্তু তখন একেবারে অনভ্যস্ত ছিলেন)। আমাদিগের বাক্স বিছানার জন্য কুলী করিলাম। তাহারা পিঠে মোট ফেলিয়া দড়ি দিয়া কপালের সহিত বাঁধিয়া লইল। শুনিলাম ইহারা খুব বিশ্বাসী, জিনিসপত্র ঠিক পৌছাইয়া দেয়, কখনও এ...নষ্ট হয় না। বোঝাও খুব লইতে পারে; এক এক জন দেড়মণ বোঝা পিঠে করিয়া অক্লেশে উপরে উঠিয়া যায়। দুই একটা পড়িয়া গিয়া মারাও পড়ে। আমরা যখন উপরে যাইতেছিলাম দেখিলাম একজন কুলীকে নীচে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছে, বেচারী বোঝা লইয়া রাস্তার দেয়ালে ঠেসান দিয়া জিরাইতে ছিল। দেয়াল ভাঙ্গিয়া খদে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আমি ও আমার আত্মীয়টি ঘোড়ায় উঠিলাম আর আমার বন্ধু বিবাহের বরের মতন

ঝাম্পানে উঠিয়া চলিলেন। মসূরীতে আমাদিগের পরিচিত একটি বাঙ্গালী ছিলেন; নাম প্র—বাবু, ফিচ্ কোম্পানীর বাড়ীতে কাজ করেন। আমরা তাঁহারই বাসায় যাইতেছিলাম। ইহার পূর্ব্বে পাহাড় অনেক দেখিয়াছি কিন্তু পাহাড়ে রাস্তা কখনও দেখি নাই। ইঞ্জিনিয়ারিং কেতাবেই পাহাড়ে রাস্তা আঁকা বাঁকা প্রভৃতির কথা পড়িয়াছিলাম এখন তাহা চক্ষে দেখিয়া ভারী আমোদ হইতে লাগিল। যেখান হইতে ঠিক পাহাড়ে চড়াই সুরু হইয়াছে সেখানে একটি টোল ঘর আছে। টোল দিতে হইল—আমাদিগকে নহে ঘোড়াওয়ালাকে। এখান হইতে পাহাড়ের গা দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রাস্তা উপরে গিয়াছে। নীচে হইতে উপরে মসূরী দেখা যায়। মসূরীর অনেক নীচে একটি ভাঁটি আছে। সেখান পর্য্যন্ত একটি গাড়ী যাওয়ার রাস্তা আছে। আমি মাইল ষ্টোন দেখিতে দেখিতে চলিলাম। রাত্রে গাড়ীর ঝাঁকানিতে কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম সেইজন্য এক একটি মাইল ষ্টোন পার হই আর মনে মনে আহ্লাদ হয়। অনেকটা উপরে গিয়া রডডেনড্রন ফুল দেখিলাম। সুন্দর লাল থোপা থোপা ফুল। নামই শোনা ছিল পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। পথে দুইটি জায়গায় ডাণ্ডিওয়ালাদের বিশ্রাম করিবার আড্ডা আছে—একটির নাম বোয়ালোগঞ্জ আর একটির নাম ঝড়িপাণি। এদুটি জায়গাই অনেক উপরে, প্রায় মসূরীর কাছে। ঝড়িপাণিতেই মসূরীর সেণ্ট্ জর্জ্জেস্ স্কুল। আমাদিগের সমপাঠিদিগের মধ্যে দুইজন সেণ্ট জর্জ্জেসের ছাত্র ছিলেন; সেইজন্য নামটা পরিচিত বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে মসূরীতে পৌঁছিলাম। তখন বেলা প্রায় ৯৷১০ টা হইবে। আমরা একেবারে ফিচ্ কোম্পানীর দোকানের সামনে গিয়া হাজির হইলাম। সেখানে শুনিলাম বাবু আহার করিতে বাড়ী গিয়াছেন। একটি লোক তাঁহার বাড়ী দেখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহার বাড়ী নিকটেই একটি গলির মধ্যে। গলিটি ঠিক হিমালয়ান হোটেলের সামনে উত্তর মুখে গিয়াছে। তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিলাম, তিনি ত আমাদিগকে দেখিয়া মহাখুসী। আমাদিগের জিনিষপত্রগুলি ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু আমার ঝাম্পানি বন্ধুর তখনও দেখা নাই। এদিক ওদিক দুই একটি লোক খুঁজিতে পাঠান গেল; খানিকটা পরে তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবাড়িটি মসূরীর বাঙ্গালীদের মেস্, লোক সংখ্যা মোট তিনটি, একটি আমাদিগের পরিচিত প্র—বাবু; অপর দুইজনের মধ্যে একজন স্মিথ রডওয়েলের আফিসে কর্ম্ম করেন এবং আর একজন হিমালয়ান হোটেলের হেড ক্লার্ক।

মার্চ মাসেও তখন খুব শীত। গরম জলে স্নান করিতে হইল। পাহাড়ী ব্রাহ্মণ রাঁধিল—দেখিলাম মন্দ রাঁধে না; অবশ্য তাহাকে শিখাইতে হইয়াছে। আহারাদির পর খানিকটা গল্প করিয়া সহর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। বাড়ির বাহির হইয়াই দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া দেখাইয়া প্র—বাবু বলিলেন ঐটি বদ্রিনারায়ণের পাহাড়। শুনিলাম শীতকালে বদ্রিনারায়ণের মন্দিরটি বরফে একেবারে ডুবিয়া যায় আবার বরফ গলিবার

সময় হইলে পাণ্ডারা যাইয়া বরফ কাটিয়া কুটিয়া মন্দিরটিকে বাহির করেন। আমরা ক্রমে বাজারের মধ্যে দিয়া লাইব্রেরীর নিকট আসিলাম। এ বাজারটি ছোট, ইহার নাম লাই-ব্রেরী বাজার। সেখান হইতে আরও খানিকটা এদিক ওদিক বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিলাম। প্রায় সব বাড়িরই টিনের ছাদ। একটি পাহাড় লম্বালম্বি পূর্ব্ব পশ্চিম গিয়াছে তাহারই দক্ষিণ গায়ে একটি রাস্তা তাহার নাম মল্ এবং উত্তর পার্শ্বে একটি রাস্তা তাহার নাম ক্যামেল্ ব্যাক্। এই দুই রাস্তার মধ্যে উচ্চ জায়গার উপরে সাহেবদিগের বাড়ী। দার্জ্জিলিংএর অব্জারবেটারি হিলের দুই পার্শ্বে আমার মনে হইতেছে এইরকম রাস্তা আছে। যে সব দোকান বড় রাস্তা হইতে নীচে তাহাদের নাম বড় বড় অক্ষরে ছাতের উপরে লেখা আছে। দেখিলাম মন্দ উপায় নহে; রাস্তার লোকের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লাইব্রেরীর সামনে খানিকটা খোলা জায়গা আছে। ইহার নিকটেই মস্থরী স্কুল, মস্থরীস্কুলেরও তিনটি ছাত্র আমাদিগের সহিত পড়িতেন। মল্ হইতে একেবারে নীচে ডেরাডুনের সমতল ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সুন্দর "birds eye view" বোধ হয় আর ছাত্রগণের পার্ব্বত্য আবাসে নাই। ক্যামেল ব্যাক্ হইতে হিমালয়ের মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—পাহাড়ের পর পাহাড়, চূড়ারপর চূড়া। বৈকালে আবার বাহির হইলাম, এবার অন্য দিকে। মস্থরী হইতে এক মাইল দূরে লাণ্ডোর নামে একটি ছোট সহর আছে আমরা সেই দিকে চলিলাম। কোন খানটায় মস্থরী শেষ হইয়াছে এবং লাণ্ডোর আরম্ভ হইয়াছে তাহা বড় টের পাইলাম না; আমার নিকট একই সহর বলিয়া বোধ হইল। আমরা ইংরাজদিগের ক্লাবের পাশ দিয়া গেলাম, ক্লাবটি খুব ধুম ধামের। লাণ্ডোরে বেশ একটি বাজার আছে। এখানে ইংরাজ সৈন্যদিগের একটি রুগ্ন নিবাস আছে। একটি দোকানে আমরা কয়েক গাছি ছড়ি কিনিলাম। এখানে অতি সুন্দর ছড়ি দুই আনা তিন আনায় পাওয়া যায়। বাণ কাঠের ছড়ি খুব মজবুত হয়। আর এক প্রকার লম্বা ছড়ি দেখিলাম তাহার তলায় লোহার আল আছে, সেগুলি বরফের উপর বেড়াইবার জন্য। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিলাম। বাড়িটি ছোট। আমাদিগের শুইবার কষ্ট হইবে বলিয়া হিমালয়ান হোটেলের বাবুটি ম্যানেজারকে বলিয়া হোটেলে আমাদিগের শুইবার জন্য একটি ঘর ঠিক করিয়া আসিয়াছিলেন। রাত্রে আহারাদির পর শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা সকলে হোটেলে চলিলাম। হোটেল অতি নিকটেই। সেখানে খাটের উপর বিছানা করাই ছিল কিন্তু তাহার উপর আমাদিগের নিজের বিছানা পাতিয়া শুইলাম। আমাদিগের সঙ্গে তাঁহারা তিন জনও আসিয়াছিলেন তাঁহারা ঘণ্টা খানেক থাকিয়া গল্প সল্প করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরাও কম্বল মুড়িদিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন ভোরে (২৮ শে তারিখ) উঠিয়া আবার বাসায় আসিলাম। সেদিন আমরা কেম্‌টি ফলস দেখিতে যাইব। ছয় খানি ডাণ্ডি ভাড়া করিয়া আমরা ৬জনে চলি-

লাম। এখানে দুই রকম ডাণ্ডি পাওয়া যায়—বেরিলী ডাণ্ডি, এবং দড়ি ডাণ্ডি। বেরিলী ডাণ্ডি গুলি ভাল এবং চেয়ারের মতন বসিয়া যাওয়া যায়; ভাড়াও কিছু বেশী; দড়ি ডাণ্ডি গুলি ঝোলার মতন, ভাড়া কম। এক এক ডাণ্ডিতে ৬ জন করিয়া বেহারা লওয়া গেল। ৪জন কাঁধে করে এবং ২ জন সঙ্গে দৌড়াইয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে অন্যদের ভারলাঘব করে। গেম্‌টি ফল্‌স্‌ মস্থরী হইতে চাক্‌রাতা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার উপর, ৬ মাইল দূরে। এই রাস্তা দিয়া বরাবর সিম্‌লাও যাওয়া যায়। ঝরণাটি অতি সুন্দর। অনেক উচ্চ হইতে জল পড়িতেছে এবং নীচে বড় বড় কাল পাথর তাহাতে সাদা ফেণা বেশ দেখাইতেছে। ঝরণার নিকটে যাইবার একটি পাক্‌ ডণ্ডি (সঙ্কীর্ণ পথ) পাহাড়ের গা দিয়া নীচে গিয়াছে। খানিকটা যাইয়া পড়িয়া যাইবার মতন হওয়ায় বড় ভয় হইল; ফিরিয়া আসিলাম। আমার আত্মীয়টি ও মস্থরীর আলাপীরা নামিয়া গেলেন; আমিও আমার সমপাঠি বন্ধু দুইজনে উপরে বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। গেম্‌টি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈকালে খানিকটা বেড়াইয়া রাত্রে আহারাদির পর আবার পূর্ব্বের মতন হোটেলে শুইতে গেলাম। পরদিন আমাদিগের মস্থরী ছাড়িতে হইবে সমস্ত আগ্লাপি ভ্যালীর দিকটা দেখা হইল না। আমার আত্মীয়টি ও প্র—বাবুরা অনেক রাত্র পর্য্যন্ত তাস খেলিলেন, আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পর দিন (২৯ শে তারিখ) প্রাতে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া তিন খানি ডাণ্ডি করিয়া আমরা নীচে যাত্রা করিলাম। নামিবার সময় ঘোড়া চলেনা—হয় ডাণ্ডি করিয়া না হয় হাঁটিয়া নামিতে হয়। শুনিলাম সাহেবেরা প্রায়ই হাঁটিয়া নামেন। প্র—বাবুও দুই একবার হাঁটিয়া নামিয়াছিলেন। আমাদের মস্থরীর বন্ধুরা আমাদিগের সঙ্গে প্রায় সহরের প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিলেন। বিদায় লইবার সময় উভয় পক্ষেরই কষ্ট হইয়াছিল, কষ্টটা কিন্তু তাঁহাদিগেরই বেশী কারণ বাঙ্গালীর মুখ খুব কমই দেখিতে পান। রাজপুরে আসিয়া আবার লালতা প্রসাদের গাড়ীতে উঠিলাম। আমরা এবার ডেরাডুন দেখিয়া যাওয়া স্থির করিয়াছিলাম। যাওয়ার সময় রাত্রে আসিয়াছিলাম সেই জন্য দেখা হয় নাই। ডেরাডুনে আমাদিগের পরিচিত র—বাবু ছিলেন, আমরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তখন বেলা প্রায় ১২ টা। রাত্র ৮টা ৯ টার সময় গাড়ী লইয়া আসিতে বলিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় দিলাম; সে বাজারে চলিয়া গেল। জিনিষ পত্র বাসায় রাখিয়া র—বাবুর সহিত সহর দেখিতে বাহির হইলাম। এখানে অনেক গুলি বাসিন্দা ইংরাজ আছেন, গ্রীষ্মকালে মস্থরী যান আবার শীতকালে ডেরাডুনে আইসেন। কলিকাতার বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রায়ই এখানে থাকেন। আমরা প্রথমে ডেরাডুন ফরেষ্ট স্কুল দেখিতে গেলাম। স্কুলটি বেশীবড় নয়। ইংরাজ এবং দেশীয় ছাত্রদিগের বাসস্থান স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই আছে। এস্কুলে মান্দ্রাজি ছাত্রের সংখ্যা কিছু বেশী দেখিলাম, বাঙ্গালী খুব কম। স্কুলে তখন পরীক্ষকদিগের সমিতি বসিয়াছিল সেই জন্য মিউজিয়ম

দেখিতে পাইলামনা। স্কুলের প্রফেসর কাঞ্জিলাল মহাশয়ের সহিত আলাপ হইল। ফরেষ্ট স্কুল হইতে আমরা গ্রেট ট্রিগনমেট্রিকাল সরভে আফিস গেলাম। এখানে অনেক গুলিবাঙ্গালী হিসাবনবীশ কাজ করেন। অঙ্ক কসিতে হইলে বাঙ্গালী না হইলে উপায় নাই। বহুকাল পূর্ব্বে যে সব triangulation হইয়া গিয়াছে তাহার হিসাব এখনও চলিতেছে। এখানে একটি গুণ ভাগ করার কল (arithmometer) দেখিলাম। মস্ত মস্ত গুণ যাহা logarithm দিয়া কসিতে হয় অতি সহজে এই কল হইতে তাহার ফল পাওয়া যায়। সরবে ডিপার্টমেণ্টের একটি সাহেবের স্মরণার্থ একটি সুন্দর বৃহৎ ঘড়ি আছে। এই আপিসে র—বাবুর ভ্রাতা কর্ম্ম করেন, তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সব দেখাইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা বাড়ি ফিরিলাম। বাড়ির সম্মুখেই সরবে আফিসের বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় বাবুর বাড়ি। তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া আসিলাম। ইনি একজন বিজ্ঞ গণিতশাস্ত্রজ্ঞ, নিবাস ঢাকা জেলায়। ইঁহার একটি জামাতা কেম্ব্রিজের বি, এ। তাঁহার সহিত আমাদিগের রুড়কিতে পরিচয় হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় ফরেষ্ট স্কুলের দুই তিনটি বাঙ্গালী ছাত্র আসিলেন। তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তায় কাটিল। ঘটনা চক্রে বৎসর খানেক পরে আর একবার ইঁহাদের সহিত দেখা হইয়াছিল; তখন আমি রাজপুতানায় আজমীর সহরে কর্ম্ম করি। ইঁহারা তখন survey tour এ বাহির হইয়াছিলেন। রাত্রে আহারা- দির পর আমাদিগের গাড়ী আসিল। র—বাবুদের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; ঘুমাইয়া পড়িলাম। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখি সাহারাণপুরে আসিয়াছি। সকালেই একটি ট্রেন ছিল; তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া রুড়কীতে আসিলাম। ষ্টেশনে আমাদিগের প্রিন্সিপাল Major (এখন Lient-col.) C—র সহিত দেখা হইল। তিন দিনের মধ্যে আমরা মন্থরী বেড়াইয়া আসিলাম শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ৩০ শে তারিখ বেলা ৮ টার সময় আমরা আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

সে আমার।

শুধু রজনীর নহে সে আমার,
সে আমার সারা দিবসের।
শুধু বসন্তের নহে সে আমার,
সে আমার সারা বরষের।
কেবল সুখের নহে সে আমার,
সুখের দুঃখের সমানে।
কেবল নহে সে কণ্ঠের সঙ্গীত,
সে-ই অশ্রুধারা নয়ানে।
শুধু যৌবনের নহে সে আমার,
সে আমার সারা জনমের।
শুধু এ জন্মের নহে সে আমার,
সে আমার চিরজীবনের।
এমন পৃথিবী এ সৌরজগতে
রহিয়াছে আরও কতখান ;
সে সকল যদি হয় চেতনের
ক্রম-উন্নতির বাসস্থান ;
যদি, এ সৌরজগতে পৃথিবীর চেয়ে
সমুন্নত গ্রহ রহে গো,
তবে, সে সব গ্রহেরও হবে সে আমার,
শুধু পৃথিবীর নহে গো।
এ সৌরজগৎ তুচ্ছ অতিশয়
সারা ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়—
কত কোটি কোটি এমন প্রকার
যাহার শরীরে শোভা পায়।
আর, জীবলোক যদি এ সৌরজগতে
বিশেষতঃ নাহি বদ্ধ রয়,
তবে, সৌরজগতেরো নহে সে কেবল,
সে আমার সারা বিশ্বময় ! !

যে আনন্দ প্রাণে উঠিছে উছসি
প্রকাশিব তাহা কেমনে ?
ক্ষমতা আমার বালুকণ শুধু
ভাব-হিমালয় তুলনে।
অসীম বিশ্বের বিধাতারে যদি
অসিত প্রস্তরে গড়ায়ে,
রেখেছে মানুষ বারাণসীধামে
সঙ্কীর্ণ মন্দিরে বাসায়ে;
তবে, আমারো এ ভাব, কি কহিব বল,
ছন্দঃ প্রতিমায় গড়িব।
তাহা, জগৎ হইতে গোপনে রাখিয়া
আমিই কেবল হেরিব !
প্রতিমা হইতে সে ভাবস্বরূপ
কভু অনুমিত হবে না।
বিশ্বনাথে লোকে প্রস্তর ভাবিবে,
তা কভু আমার সবে না।

ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহগণ

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে নষ্ট গ্রহ। প্রায় ৩০০ বৎসর অতীত হইল কেপ্‌লার জানিতে পারিয়াছিলেন, যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কোন গ্রহ ছিল, বা আছে। সূর্য্য হইতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, এবং মঙ্গল এ চারি গ্রহের দূরত্বের একটি ক্রম আছে, কিন্তু বৃহস্পতি সম্বন্ধে দূরত্বের সে ক্রম দেখা যায় না।

১৭৭২ অব্দে অধ্যাপক বোড গ্রহগণের দূরত্ব সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব নিয়ম আবিষ্কার, বা প্রচার করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহারাই নামানুসারে উহা বোডীয়-নিয়ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। নিয়মটি এই যে সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্ব যদি ৪ ধরা যায়, আর ঐ ৪এ ক্রমান্বয়ে ০,৩,৬,১২, ২৪ইত্যাদি যোগকরা যায়, তবে বুধাদি গ্রহগণের দূরত্ব ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত অঙ্কপত্রের তৃতীয় স্তম্ভের অঙ্কদ্বারা ব্যক্ত হইবে।

গ্রহের নাম	বোডীয়-নিয়মনুসারে দূরত্ব	বাস্তব দূরত্ব
বুধ	৪ + ০ = ৪	৩.৯
শুক্র	৪ + ৩ = ৭	৭.২
পৃথিবী	৪ + ৬ = ১০	১০.০
মঙ্গল	৪ + ১২ = ১৬	১৫.২
	৪ + ২৪ = ২৮	
বৃহস্পতি	৪ + ৪৮ = ৫২	৫২.৯
শনি	৪ + ৯৬ = ১০০	৯৫.৪
বরুণ	৪ + ১৯২ = ১৯৬	১৯১.৮

এই সারণীর তৃতীয় স্তম্ভের পঞ্চম রাশি ২৮ এর স্থানে কোন গ্রহ নাই; অর্থাৎ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটি গ্রহের অভাব রহিয়াছে। এই অজ্ঞাত গ্রহের অনুসন্ধান জন্য একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। সভার সভ্য সংখ্যা চতুর্বিংশতি। সভ্যগণ জ্যোতিষ চক্রকে ২৪ অংশে বিভাগ করিয়া এক এক সভ্য এক এক অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধরাশি পরিমিত নক্ষত্র মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অগাধ বায়ুসাগরে নানাজাতীয় ছোট বড় তারামৎস্যের অভাব নাই; কিন্তু সাবধিক সলিলখণ্ডে নির্দ্দিষ্ট জাতীয় মৎস্যবিশেষ বড়শীবিদ্ধ হইবে এ আশা অতি দুরাশা। যাহাহউক ঐ চব্বিশ জন মৎস্যবেধক একদিন নহে দুদিন নহে, বহুকালাবধি নির্ণিমিষ লোচনে স্বীয় স্বীয় তরণ্ডিকা প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। টোপ ঠোকরায় না ফাতাও নড়ে না। কেহই কিছু করিতে পারিলেন না।

শিরিসের আবিষ্কার। অনন্তর ১৮০১, ১লা জানুয়ারি তারিখে এই চিরস্মরণীয় ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম রজনীতে, অধ্যাপক পিআজ্জী (তিনি নষ্টগ্রহ অন্বেষণ সভার সভ্য ছিলেন না) পালমিরোর সুবিমল নভোমণ্ডলের আনুকূল্যে ক্ষোদিষ্ঠ গ্রহগণের প্রথমটির আবিষ্কার করিলেন। তিনি প্রতিনিশিতে ন্যূনাধিক ৫০টী তারা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই রজনীতে যে ৫০ তারা দেখিলেন, তাহাদের অবস্থান যত্ন পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিলেন। এই ৫০ জ্যোতিষ্কের মধ্যে প্রথম দ্বাদশ নিঃসংশয়ে তারা বলিয়া প্রতীতি হইল, এবং ত্রয়োদশটী আকার প্রকারে বৃষের অন্তর্গত অষ্টম শ্রেণীর তারা বলিয়া প্রতিভাত হইল। পর রাত্রিতে স্বীয় রীত্যানুসারে ঐ ৫০ তারা পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ নিশিতেও সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ একাদিক্রমে পঞ্চাশ তারার উক্ত চতুর্বিধ অবস্থান মিলাইতে লাগিলেন, মিলাইতে মিলাইতে দেখিলেন, যে ত্রয়োদশ পদার্থটি অবশিষ্ট তারাগণের সহিত সমলক্ষণ নহে; এমন কি সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যে সমস্ত তারা এতাবৎকাল পরীক্ষণ করিয়াছিলেন তাহাদের হইতেও ভিন্নভাবাপন্ন। এই অব্যক্তকর্ম্মা ব্যোমচরের অবস্থান চতুষ্টয়ই পৃথক, অর্থাৎ ইহা সচল,—ইহা গ্রহ। গ্রহটি শিশিলীতে

আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া সেই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামানুসারে উহা সিরিস নামে অভিহিত হইল।

সিরিসের বিবরণ। সিরিস যে কক্ষায় ভ্রমণ করে তাহা বোডীয়-নিয়মাধীন। অতএব এইটিই যে নষ্টগ্রহ তাহার আর সন্দেহ রহিল না। বুধ হইতে নষ্টগ্রহের অন্তর বোডীয় নিয়মানুসারে ২৪, সিরিসের বাস্তব অন্তর ২৩½।· এই আবিষ্কার দ্বারা জ্যোতিষী মণ্ডলে মহাকুতূহল জন্মিল, এবং শাস্ত্রোন্নতির সাধনীভূত যে উৎসাহ তাহা দ্বিগুণিত হইল। পিআজ্জী আরও কয়েকবার এই নবাবিষ্কৃত গ্রহ পরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু যখন আকাশের সে অংশ পর্য্যবেক্ষণের অনুকূল কাল অতিবাহিত হইল, তখন সিরিস দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়িল। অনন্তর কতিপয় মাস অতীত হইলে, তত্তৎ তারা সুশোভিত সিরিস্ অধিষ্ঠিত নভোভাগ প্রদোষের অনতিবিলম্বে ক্ষিতিজের উপরে লক্ষিত হইল, সিরিস্ চলিতেছিল, চলিতে লাগিল। কিন্তু আবার যখন কালবশতঃ সিরিস্ অদৃষ্ট হইবে তখন এই নিধির কিরূপে পুনঃ প্রাপ্তি হইবে, এই চিন্তায় যখন জ্যোতিষী ব্যাকুলিত ছিলেন, তখন গস্ নামক একজন নবীন জর্ম্মন গণিতজ্ঞ এই বিষম সমস্যা পূরণ করিয়া স্বকীয় বাস্তব অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভের ভিত্তিমূল সংস্থাপিত করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গ্রহগণ রবি পরিতঃ বৃত্তাভাস কক্ষে পরিভ্রমণ করেন। বৃত্তাভাসের অন্যতর অধিশ্রয়ণে রবির অবস্থিতি। কক্ষার তিন বিন্দুমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইলেই কক্ষার পূর্ণ আকার নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহা গণিতসাধ্য। কেপলরীয নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক গণি-
এই প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয়। গস্ সিরিসকে এই প্রতি
করিয়া উপপত্তি সহকারে তদীয় কক্ষানিরূপণে কৃতকৃতার্থ
খেচর অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করিতে থাকে তাবৎকা
নহে, কিন্তু গণিতজ্ঞের লেখনী হইতে উহার পরিভ্র
নভোপ্রদেশ নেত্রায়ত্ত হইল, গসের আদিষ্ট কা
করিলেন, অমনই তন্বাঙ্গী সিরিস্ শ্যামক্ষেত্রে ... হইল। তদবধি সিরিস্ যেন গণিত সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিশনিশ আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

		দূরত্ব	১১
	১১	৮	৪
	৬	৮৪	৯
.৪	৬	৮৫	৯
৭৫	১৭	৮৬	১১
৭৬	১২	৮৭	

কিন্তু এই নূতন গ্রহ লাভকরিয়া জ্যোতিষীদিগের পরিতৃপ্তি লাভ হইল না; কারণ যদিও এটী সূর্য্য হইতে ঠিক গণিত দূরে ভ্রমণ করিতেছে তথাপি কি অধঃস্থ মঙ্গল কি ঊর্দ্ধস্থ বৃহস্পতি কাহারও সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না; গ্রহটি অতি ক্ষুদ্র, শুধু ক্ষুদ্র নহে ইহার কক্ষা ক্রান্তিবৃত্তে ১০° পরিমাণে অবনত। গ্রহ কক্ষার এত অবনতি কোন কালে শুনা যায় নাই। সিরিসের ভগন কাল, ৪·৬০৪ বৎসর। সিরিস্ মণ্ডলের ব্যাস ১৬০ মাইলের বেশী হইবে না পৃথিবীর ব্যাস ৭,৯২৭ মাইল, অর্থাৎ ভূব্যাস সিরিসের ব্যাস অপেক্ষা ৫০ গুণে অধিক; পৃথিবী এবং সিরিস্ সমসান্দ্র হইলেও পৃথিবীর সামগ্রী সমষ্টি সিরিসের সামগ্রী সমষ্টি অপেক্ষা ১,২৫,০০০ গুণে অধিক; সুতরাং ১,৫৬০ সিরিস একত্র

করিলে আমাদের চাঁদের মত হইবে। সান্দ্রত্ব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হিসাব করিলে পৃথিবীর সামগ্রী লইয়া আড়াইলক্ষ সিরিস্ গড়িতে পারা যায়, এবং চন্দ্রমণ্ডলের সামগ্রীতে তিন হাজার সিরিস্ নির্ম্মিত হইতে পারে; সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদেরা সিরিসে গ্রহগণের সাধারণ লক্ষণের অভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধ চিত্ত হইলেন।

পালাসের আবিষ্কার। ১৮০২ অব্দের মার্চ মাসে, অর্থাৎ সিরিসের পুনরাবিষ্কৃতির ৩ মাস পরে, ওলবর্ষ কন্যার যে অংশে সিরিস্ দেখিয়াছিলেন, সেই অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে সিরিসের সদৃশ আর এক ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কার করিলেন! ইহার নাম পালাস রহিল। পালাস প্রকাশিত হইলে সকলে বুঝিলেন যে নভোমণ্ডলের যে খণ্ড এ কাল পর্য্যন্ত গ্রহশূন্য বলিয়া জ্ঞানছিল, সেই খণ্ডে কেবল সিরিস্ নহে অন্যান্য গ্রহগণও ভ্রমণ করিতেছে; এবং তাহাদের ক্ষুদ্রত্বের কারণ এই যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে বহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বলয়াকারে ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাদের সামগ্রী সমষ্টি লইলে একটি প্রধান গ্রহের সামগ্রী সমষ্টির কম হইবে না।

ওল্‌বর্ষের মত। —ওলবর্ষের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যগত মেখলায় অন্যান্য গ্রহ বিচরণ করিতেছে। তিনি দেখিলেন সিরিসের কক্ষার অবনতি অপেক্ষা পালাসের কক্ষার অবনতি অত্যন্ত অধিক ৩৪°৩২'। পালাসের কক্ষা রাশিচক্র অতিক্রম করিয়া এতদূর উত্তর ও দক্ষিণে যায় যে পৃথিবী হইতে উহাকে কথন শীবিদ্ধ ২২°সীমার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্তকক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব এত (·২৩৮৪৮) যে দুদিন নহে, বহুকাল ৩ ধরিলে অপহৈলিক ব্যবধান ৫ ধরিতে হয়।

লেন। টোপ ঠোকরায় না ফাতা অনন্যসাধারণ লক্ষণ দেখিয়া ওল্‌বর্ষের প্রতীতি হইল

শিরিসের আবিষ্কার। অ'র সীমান্তে পুরাকালে যথাসম্ভব কলেবরবিশিষ্ট গ্রহ উনবিংশ শতাব্দের প্রথম রজনীতে, অধ্য ৎপাত প্রযুক্ত বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণীকৃত হইয়াছে। ছিলেন না) পালমিরোর সুবিমল নভোমণ্ড আভ্যন্তরিক অগ্ন্যুৎপল্লবে সহসা বিধ্বস্ত হয়, [illegible] তিনি প্রতিনিশিতে ন্যূ এবং কতিপয় খণ্ড আদিকক্ষাক্ষেত্রে ঘুরিতে থাকিবে, কিন্তু কক্ষার [illegible] ভিন্ন ভিন্ন হইবে। মূলগ্রহ হইতে সিরিস্ অত্যন্ত বক্রভাবে অপাকৃত হইয়াছিল এবং পালাস প্রায় কক্ষাক্ষেত্রে চালিত হইয়াছিল। ওল্‌বর্ষ বুঝিয়াছিলেন যে খণ্ডগুলি যে যেদিক্ দিয়া ভ্রামিত হউক না কেন, সকলকেই কোন না কোন সময়ে উপদ্রব স্থলে একবার আসিতে হইবে; অতএব নভোমণ্ডলের স্থানবিশেষ নিরীক্ষণ করিলে বহু সংখ্যক গ্রহক অর্থাৎ ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সূর্য্য হইতে দেখিলে সিরিস্, ও পালাসের কক্ষা যে স্থানে কাটাকাটি হইয়াছে তথা হইতে ছয়রশি অন্তরে অর্থাৎ কন্যার দক্ষিণ বাহু এবং তিমি নামা উপরাশি এই দুই স্থান অন্বেষণ করিলে বিস্তর গ্রহক দেখা যাইবার সম্ভব এই আশাতে তিনি এবং হার্ডিং গবেষণা আরম্ভ করিলেন। ১৮০৪, ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে হার্ডিং জুনো নামক গ্রহক আবিষ্কার করিলেন, এবং ১৮০৭, ২৮ মার্চের

রজনীতে বেস্তা নামক গ্রহক ওল্‌বর্ষ দ্বারা প্রকাশিত হইল। ক্ষুদ্র তারাগণের মধ্যে সিরিস্‌ পালাস্‌ জুনো বেস্তা এই চারিটী কেবল শুধুচক্ষে দেখা গেলেও যাইতে পারে, এবং কেহ কেহ দেখিয়া থাকিতে পারেন।

অপর ক্ষুদ্র গ্রহগণের আবিষ্কার ও সংখ্যা।—উক্ত চারিটি গ্রহ পাইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্থির করিলেন, যে ওল্‌বর্ষের কল্পিত গ্রহের এই খণ্ড চতুষ্টয়। এই চারিটি পাইয়া সকলে সন্তুষ্ট রহিলেন, এবং আরও যে খণ্ড থাকিবার সম্ভব তাহার কোন আন্দোলন হইল না। ১৮৩০ অব্দে জ্যোতির্বিদ হেঙ্ক্‌ পুনঃ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন। একাদিক্রমে ১৫ বৎসর কাল পর্যবেক্ষণ করিয়া ১৮৪৬, ১৫ ডিসেম্বরের সন্ধ্যার পর পঞ্চম গ্রহক আবিষ্কার করিলেন এবং ইহার নাম হইল আষ্ট্রীয়া। ১৮৪৭, ১৫ জুলাই গনস্‌ কর্ত্তৃক হিবি প্রকাশিত হইল, ঐ বৎসর ইংরাজ জ্যোতিষী হাইণ্ড দ্বারা আইরিস্‌ ও ফ্লোরা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৮৪৭ হইতে প্রতি বৎসর একটি দুইটী কোন বৎসর দশ বারটি গ্রহক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যথা—

বৎসর	গ্রহসংখ্যা	বৎসর	গ্রহসংখ্যা	বৎসর	গ্রহসংখ্যা	বৎসর	গ্রহসংখ্যা
১৮০১-১৮০৭	৪	১৮৫৬	৫	১৮৬৭	৪	১৮৭৮	১২
৪৫	১	৫৭	৮	৬৮	১২	৭৯	২০
৪৭	৩	৫৮	৬	৬৯	২	৮০	৮
৪৮	১	৫৯	১	৭০	৩	৮১	১
৪৯	১	৬০	৫	৭১	৫	৮২	১১
৫০	৩	৬১	৯	৭২	১১	৮[illegible]	৪
৫১	২	৬২	৬	৭৩	৬	৮৪	৯
৫২	৮	৬৩	২	৭৪	৬	৮৫	৯
৫৩	৪	৬৪	৩	৭৫	১৭	৮৬	১১
৫৪	৬	৬৫	৩	৭৬	১২	৮৭	৭
৫৫	৪	৬৬	৬	৭৭	১০	৮৮	১০
	৩৭		৫৪		৮৮		১০২

১৮৮৮ পর্য্যন্ত ২৮১ গ্রহক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পালিসার সর্ব্বপেক্ষা অধিক সংখ্যক গ্রহক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত গ্রহক সংখ্যা ৬৮, পিটারের ৪৭, লুথারের ২৩, ওয়াটসনের ২২, বাকী ১২১টি ১৯ জন জ্যোতির্বিদ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। সর্ব্বপেক্ষা ফরাসি জ্যোতিষীরা অধিক (৬০) গ্রহক প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রহক গুলি অতি ক্ষুদ্র, কাহারও মণ্ডল ২০০ বা ৩০০ মাইলের অধিক নহে।

গ্রহকগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—এ গুলি অতিক্ষুদ্র তারার ন্যায়। ইহাদিগের গতি না থাকিলে গ্রহগণ মধ্যে পরিগণিত হইবার আর কোন লক্ষণ নাই! একটি

মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর তারার মত উজ্জ্বল, দুইটি সপ্তম শ্রেণীর, পাঁচটি অষ্টম শ্রেণীর, সতরটি নবম শ্রেণীর, চোয়াল্লটি দশম শ্রেণীর, সাতাত্তরটী একাদশ শ্রেণীর, পঁয়তাল্লিশটী দ্বাদশ শ্রেণীর। অনেক গুলিকে অধঃসমাগমেও অর্থাৎ রবির বিপরীত দিকে থাকিলেও বৃহদ্‌ রবীক্ষণ ভিন্ন দেখা যায় না। দূরত্বের অল্পতা ও আকাশের নির্ম্মলতা প্রভৃতি সুবিধা থাকিলে সিরিস্‌কে শুধুচক্ষেও দেখা যাইতে পারে। ইহার আলোক ঈষল্লোহিত। কেহ কেহ বলেন উহার বায়ু মণ্ডল আছে। পালাসের পীতালোক, জুনোর রক্তিম, এবং বেস্তার উজ্জ্বল শুক্ল। ১৮৫৮ অব্দে বর্ষাকালে বেস্তাকে শুধু চক্ষে দেখা গিয়াছিল।

গ্রহক গণের দূরত্ব ইত্যাদি।—সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যদি ১০ ধরা যায় তবে গ্রহক গণের মধ্যে যেটি সূর্য্যের খুব নিকটবর্ত্তী সেটির দূরত্ব ২১.৩২৭ হইবে; আর যেটি সূর্য্যহইতে অত্যন্ত দূরে সেটির দূরত্ব ৩৯.৫২৩ হইবে। মঙ্গলের দূরত্ব ১৫.২৩৭ অতএব অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী গ্রহকও মঙ্গলের কক্ষা অতিক্রম করিয়া ৬.০৯০ অন্তরে পরিভ্রমণ করে। যে গ্রহক সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী সেটি বৃহস্পতি কক্ষার ১২.৫০৫ এর মধ্যে ঘুরিতেছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে ব্যবধান ৩৬.৭৯১। আবার নিকটস্থ গ্রহক ফ্লোরা হইতে দূরস্থ গ্রহক হিলদার ব্যবধান ১৮.১৯৬ অতএব মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যস্থিত অর্দ্ধাধিক নভোভাগে প্রায় ৩০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ বিচরণ করিতেছে। সূর্য্য হইতে ফ্লোরা উনিশ কোটি মাইলের অধিক এবং হিলদা হইতে ৩৬ কোটি মাইলের অধিক দূরে পরিভ্রমণ করে। ফিদিস ও মাইয়ার কক্ষে অত্যন্ত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই দুইটি যখন খুব কাছাকাছি হয় তখন তাহাদের অন্তর ভূকক্ষার ব্যা, বহক. ... মাত্র;—বলিলেও হয় যে ফিদিসবাসীরা মাইয়ারবাসীদিগের ডাক শুনিতে পায়।

ফ্লোরার ভগণকাল প্রায় ৩ বৎসর, হিলদার ৬ বৎসরের অধিক।

লোমিয়ার কক্ষের উৎকেন্দ্রত্ব ০.০২৩ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প; ইথার কক্ষের উৎকেন্দ্রত্ব সর্ব্বাপক্ষে অধিক ০.৩৮১।

মাসিলিয়ার কক্ষার অবনতি ০° ৪১′ সর্ব্বাপেক্ষা কম।

পালাসের কক্ষার অবনতি ৩৪, ৪২, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বেস্তা সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং উজ্জ্বল।

অনেকগুলি গ্রহক এত ক্ষুদ্র যে আবিষ্কারের পর সে গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

কোন কোনটিকে হারানর পর আবার পাওয়া গিয়াছে।

গ্রহকগণের ব্যাস। এই সুদূরস্থিত ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণের ব্যাস পরিমাণ স্থির করা অতি কষ্টসাধ্য উপপাদ্য। ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি বড় তাহার ব্যাস চাপাত্মক ০.৪″ বিকলার অধিক নহে। অধিকাংশই সূচ্যাগ্রস্থিত জ্যোতিবিন্দুবৎ। আলোক দেখিয়া মণ্ডলের অনুমিত আয়তন এবং যথাসাধ্য যন্ত্রলব্ধ ব্যাস, এতদুভয়কে সমঞ্জসীভূত করিলে

নিম্নলিখিত কতিপয় গ্রহকের সত্যাসন্ন ব্যাসমান পাইতে পারা যায়।

বেস্তার ব্যাস	২৪৮ মাইল	হাইজিইয়ার ব্যাস	৯৯ মাইল	আইরিসের ব্যাস	৮৭ মাইল
সিরিসের "	২১৭ "	ইউনোমিয়ার "	৯৩ "	আম্ফিট্রাইটের "	৮১ "
পালাসের "	১৬৭ "	হিবির "	৯০ "	আর্লিওপের "	৭৮ "
জুনোর "	১২৪ "	লিটিয়িয়ার "	৯০ "	মেট্রিসের "	৭৪ "

সাফো, মায়া, আতলন্তা এবং একো এই চারিটির ব্যাস ১৯ মাইলের অধিক নহে। ইহাদের অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর গ্রহক আছে সে গুলি উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণেও দৃষ্টিগোচর হয় না।

কতগুলি গ্রহক থাকা সম্ভব ? গ্রহক সমষ্টি দ্বারা মঙ্গল যে পরিমাণে আকৃষ্ট হন তাহার হিসাব করিয়া লে বেরিয়ে স্থির করিয়াছেন, যে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে গ্রহক সমূহের সামগ্রীর পরিমাণ পৃথিবীর সামগ্রী পরিমাণের তিনভাগের এক ভাগ হওয়া আবশ্যক। গ্রহকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে গ্রহক তাহার সামগ্রী লইয়া গণিত করিলে তাহার মত ৫০০ গ্রহক না হইলে পৃথিবীর সামগ্রীর তিনভাগের একভাগ হইতে পারে না। বিস্তর গ্রহক অতিক্ষুদ্র সুতরাং গ্রহকগণের সংখ্যা বহু সহস্র হওয়া সম্ভব।

ওলবর্ষের মত এখন আর সমর্থন করা যায় না। সিরিস্, পালাস, জুনো ও বেস্তা, এই গ্রহক চতুষ্টয় অগ্ন্যুপনিপ্ন প্রযুক্ত শকলীদূত গ্রহবিশেষের খণ্ড ক্ষুদ্র গ্রহরূপে পরিণত হইয়া রবিপরিতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই ওলবর্ষেরমত। এ কল্পনা উক্ত গ্রহক চতুষ্টয় সম্বন্ধে নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর যে অব্যক্ত দূরত্ব তাহাকেই দূরত্ব পরিমাণের জ্যোতিষী একক ধরা হয় এবং তদনুসারে এই চারিটির দূরত্ব যথাক্রমে ২·৭৬৯, ২·৭৭১, ২·৬৬৮, এবং ২·৩৬১ ; দূরত্ব প্রায় সমান। এখনকার কামান হইতে যে বেগে গোলাবাহির হয় তাহার বার গুণ বেগে কল্পিত গ্রহ যদি ফুটিত তবে উক্ত জ্যোতিষ্ক দিগের যে মধ্যম ব্যবধান দেখা যাইতেছে তাহাই ঘটিত। কিন্তু ওলবর্ষেরমত প্রকটিত হইবার পরে শত শত গ্রহকের আবিষ্কার হওয়ায় দৃষ্ট হইতেছে যে মধ্যম ব্যবধান অত্যধিক, অতএব এ মত আর রক্ষা করা যায় না।

আর এক বিষম আপত্তি এই যে, ওলবর্ষের এবং তাঁহার সমসাময়িক জ্যোতির্বিদগণের বিশ্বাস ছিল যে, যে স্থানে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়াছিল সেই স্থান দিয়া সমস্ত গ্রহখণ্ডের কক্ষা যাইবে ; কিন্তু প্রথম আবিষ্কৃত গ্রহচতুষ্টয়ের কক্ষায় কোন সাধারণ বিন্দু দেখা যায় না। শুধু তাহা নহে এই কিঞ্চিদল্ল ৩০০ গ্রহকের কক্ষা এরূপ ভাবে একের ভিতর দিয়া অন্যটি গিয়াছে যে কক্ষা গুলি ধাতুনির্ম্মিত বলয় হইলে সে গুলির মধ্যে কোন একটা ধরিয়া তুলিলে-অপর গুলি বৃহৎ এক ছড়া আঙ্গটার মত হইয়া ঝুলিত। যদি বল মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যগত গ্রহ যখন বিদলিত হইয়াছিল তখন খণ্ডগ্রহগণের কক্ষা একস্থান দিয়া যাইত ; কিন্তু একথা খাটে না কারণ খণ্ড গুলির আকর্ষণ এত অল্প যে তাহারা আদিম অবস্থা হইতে ... হইতে পারে না।

অধিকন্তু ওলবর্ষের মতের প্রতিকূলে একটি ভৌতিক বিরোধ আছে। মনে কর তাঁহার মত সমর্থনার্থ স্বীকার করা গেল যে আগ্নেয় গিরির ভয়ানক উপদ্রব কালে ভূগর্ভ হইতে পদার্থকণা তত বেগ ও বলে বহির্গত হয় যত বেগ ও বল ওলবর্ষের কল্পিত গ্রহকে চূর্ণ করিবার কালে প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া এমন মনে করা যায় না যে অখিল ভূমণ্ডলের শক্তি সংঘাত যুগপৎ প্রযুক্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বেগে নিক্ষেপ করিবে। কামানে খানিকটা বারুদ দিলে গোলা ২,৩ মাইল যাইতে পারে বটে, কিন্তু কামান হইতে গোলা যদি না বাহির হইতে পারে এবং কামানে হাজার গুণ বারুদ দেওয়া যায় তবে কামান ভাঙ্গিয়া চারিদিকে খান খান হইয়া পড়িবে কি? ওলবর্ষের গ্রহ চূর্ণ কবিবার জন্য যত বল প্রয়োজন হয় তাহার কোটি অংশের একাংশ বল গ্রহ-অভ্যন্তরে সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিরোধান্তর ;—এই প্রভূত ক্ষোদিষ্ট গ্রহগণ এরূপে পৃথগ্‌ভূত না হইয়া তারাগ্রহবৎ এক বিশাল পিণ্ডাকারে পরিণত না হইল কেন? এগুলি বিদলিত বৃহৎ গ্রহের ভগ্নাংশ হইলেও কোন না কোন খণ্ড মঙ্গল অপেক্ষা বিপুল এবং পৃথ্বী অপেক্ষা অল্প এরূপ না হইবার কারণ কি? যদি স্বীকার কর যে এই নিগূঢ় ব্যাপার অগ্ন্যুৎপাতসম্ভূত এবং অসকৃত্‌অগ্ন্যুপদ্রব জনিত গ্রহখণ্ড সকল নানাদিগ্‌দেশে ভ্রামিত হইতেছে এবং গুরুকায় বৃহস্পতির আকর্ষণে কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া গ্রহোচিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বন করিতেছে। কিন্তু বলা হইয়াছে যে গ্রহকগণ-ব্যাপৃত নভোমেখলার বিশাল বিস্তার এ মতের পরম বিরোধী।

নীহারিকাবাদ অনুসারে ইহাই সম্ভাব্য যে কেন্দ্রবিমুখ বল প্রযুক্ত সৌরমণ্ডলের নিরক্ষ প্রদেশ হইতে বিশ্লেষিত পদার্থ রাশি সমূহ বৃহস্পতির প্রবলা আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে নিযুক্ত এবং প্রতিনিয়ত বিক্ষুব্ধ হইয়া তদীয় অধোভাগে বৃহদাকার গ্রহরূপ ধারণ করিতে পাবে নাই। ক্ষুদ্র গ্রহগণের কক্ষার মধ্যগত কতিপয় নভোভাগে গ্রহ নাই, এ সকল স্থলে গ্রহ থাকিলে তাহাদিগেব ভগণ কাল বৃহস্পতির ভগণ কালের $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৫}$, $\frac{৩}{৭}$ ইত্যাদির ন্যায় ঠিক নিরাবয়ব ভগ্নাংশ হইত, সুতরাং বৃহস্পতি কর্ত্তৃক অত্যন্ত আকৃষ্ট হইত এবং তত্তৎ মেখলায় তাহাদিগের অবস্থিতি করিবার শক্তি থাকিত না।' এই কারণ বশতঃ উক্ত মেখলা সকল গ্রহশূন্য দেখা যায়। যেমন ৩.২৮ অন্তরে গ্রহ থাকিলে তাহার ভভ্রম কাল বৃহস্পতির ভভ্রম কালের অর্দ্ধ হইত, ঠিক এই ৩.২৮ এ গ্রহ নাই এবং কোন কালে থাকিবারও সম্ভাবনা নাই। ২.৯৬ এ আর একটি গ্রহশূন্য মেখলা আছে, এখানে গ্রহ থাকিলে তাহার ভগণ কাল বৃহস্পতির ভগণ কালের $\frac{৩}{৭}$ হইত ; তদবৎ ২.৮২ তে পরিভ্রমণ কাল $\frac{২}{৫}$; ২.৫এ $\frac{১}{৩}$। এ সমস্ত স্পষ্ট বৃহস্পতির আকর্ষণের কার্য্য।

গ্রহগণের উৎপত্তি। নীহারিকাবাদী লাপলাসের মত এই যে ক্ষুদ্র গ্রহগুলি আদৌ বাষ্পীয় পদার্থরূপে অবস্থিত ছিল ; ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া গোল পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে! বহুস্থানব্যাপী বায়বীয় পদার্থ বিশেষ কালসহকারে সান্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া যেমন

বৃহদাকার বৃহস্পতিরূপে উদিত হইয়াছে তেমনি স্থানান্তরের বাষ্পরাশি বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া কালক্রমে সারবত্বা লাভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহপুঞ্জের আকারে ভ্রামিত হইতে পারে।

এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহে কি জীব আছে? না থাকিবেই বা কেন? অনু-বীক্ষণ যন্ত্র সহকারে বারিবিন্দু মধ্যে নানা জাতীয় কত শত প্রাণী নয়নগোচর হয়! গোবরে পুরীষধোভাগে, লোষ্ট্রতলে কত ক্রীড়োন্মত্ত কৃমিকুল সঞ্চরণ করে! কীটোপ-সেবিত এক এক পত্র এক এক জগৎ। পরন্তু গ্রহক মধ্যে অনেকই মরুভূমি, কোন রূপ জীবের বাসোপযোগ্য নহে। তথাপি অবিশ্রান্তা নির্ম্মাণবিদগ্ধা প্রকৃতি কোনটিতে কোন রূপ প্রাণীসৃষ্টি করেন নাই তাহা স্বীকার করা যায় না। যেমন স্থান তদুপযুক্ত জীব জন্মিয়া থাকিবে। প্রকৃতির পক্ষে কিছু বড় নাই কিছুই ছোট নাই। আত্মশ্লাঘায় বিমূঢ় হইয়া এই সকল ক্ষুদ্রকায় গ্রহকে অবজ্ঞা করা অবিবেষ, কারণ বেস্তা সিরিস পালাস বা জুনোকে হেয়জ্ঞান করিবার যদি আমাদের কোন অধিকার থাকে তবে বার্হস্পত্যদিগের নরলোককে তাচ্ছিল্য করিবার অধিকার কত? পৃথিবীর তুলনায় বেস্তা যত ছোট গুরুর তুলনায় পৃথিবী তদধিক ছোট।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

আতলন্তা,	Atlanta.	পিটার,	Peter.
আম্ফিট্রাইট্,	Amphritrite.	ফিদিস,	Fides.
অবনতি,	Inclination.	ফ্লোরা,	Flowra.
অব্যক্ত,	Abstract.	বোডীয় নিয়ম,	Bodian law.
আষ্ট্রিয়া,	Astraea.	ভৌতিক,	Physical.
আইরিস্,	Iris.	মাসিলিয়া,	Massilia
ইউনোমিয়া,	Eunomia Zodiacal	মেখলা,	Zone.
উপরাশি,	Constellaion (not)	মৈয়া,	Maia.
একো,	Echo.	লাপলাস্,	Laplace.
ওয়াটসন্,	Watsyn.	লিটিষিয়া,	Laetitia.
ওল্বর্ষ,	Olbers.	লুথর্,	Luther
কালিওপ্,	Calliope.	লোমিয়া,	Lomia.
কেন্দ্রবিমুখ,	Centrifugal.	বেস্তা,	Vesta.
ক্রম,	Degree, law.	সিরিস্,	Ceres.
খেচর,	Heavenly body.	শিশুমার্,	Ursa minor.
গস,	Gauss.	সান্দ্রত্ব,	Density.
গ্রহক,	Planetoids.	সাফো,	Sappho.
জুনো,	Juno.	সামগ্রী,	Mass.
তরণ্ডিকা,	Float.	সাবধিক,	Limitted.
তিমি,	Cetus.	হাইণ্ড,	Hind.
নীহারিকাবাদ,	Nebular Theory.	হাইজিয়া,	Hygeia.
পিআজ্জি,	Piazzi.	হার্ডিং,	Harding.
পালমিরো,	Palmero.	হিবি,	Hebe.
পালিসার,	Palisar.	হিলদা,	Hilda.
পালাস,	Pallas.	হেঙ্ক,	Henke.

কাহাকে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত অথচ কিছুই চোখে পড়িতেছে না; মস্তিষ্ক চিন্তাতরঙ্গে আলোড়িত, অথচ কি ভাবিতেছি কিছুই জানি না। মন স্থানহিসাবেও অতিদূরে, সময় হিসাবেও অতিদূরে, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতেছি কি না করিতেছি! মাঝে মাঝে কেবল সচেতন বেদনার অনুভূতি, দেহবন্ধন হইতে পলায়নের জন্য একটা নিষ্ফল ব্যাকুলতা, অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিবার জন্য নিদারুণ প্রয়াস, দুর্ব্বল এক হস্তে দৃঢ় লৌহ শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য বৃথা চেষ্টায় প্রাণান্ত পরিশ্রান্তি, অক্ষম কষ্ট ও অসহায় ক্রোধ! আর ছোটু যাহাকে এত ভালবাসিয়াছি এত বন্ধু মনে করিয়াছি—সেই আমার এই কষ্টের কারণ! সহসা ভাবিতে ভাবিতে প্রাণের মধ্যে দৈববাণী শুনিলাম,—"তাহা হইতেই পারেনা, চিরদিন সে তোমার বন্ধু ছিল—চিরদিন বন্ধু থাকিবে, এ বিপদে সেই তোমাকে উদ্ধার করিবে"।—অন্ধকার সমুদ্রে মুহূর্ত্তে যেন দিশা উন্মুক্ত হইয়া গেল; তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতে সংকল্প করিলাম বুঝিলাম তাহাতেই আমার একমাত্র আশাভরষা। পুরাকালের স্বর্ণপ্রস্তুতউপায় চিন্তানিমগ্ন রসায়ণ বিদের মত এই আবিষ্কারের আনন্দ আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল,—কিন্তু কাহাকে ইহার ভাগ দিব? আমার কে সখী এখানে!

একটু পরে একজন চাকর আসিয়া আমার হাঁতে একখানি কার্ড আনিয়া দিল। কি আশ্চর্য্য! ডাক্তার! আনন্দে নহে বিস্ময়ে আমার হৃদ্‌কম্পন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। আমি কলের পুতুলের মত চাকরকে বলিলাম—"আসিতে বল।"

সে চলিয়া গেলে তখন মনে হইল, আমার কি এখন তাঁহার সহিত দেখা করা উচিত! কিন্তু উচিত অনুচিত ভাবিবার তখন আর অবসর আছে কি? প্রায় তখনি তিনি আসিয়া পড়িলেন। এইখানে বলা আবশ্যক, আমি এতক্ষণ ড্রয়িংরুমেই ছিলাম। অন্তঃপুরের গোলমাল ছাড়াইয়া দুপর বেলা প্রায়ই আমি এই বিজন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করি।—বাবা না থাকিলে এখানে বাহিরের লোক কেহই প্রায় আসেন না, কদাচ কেহ আসিলেও আমি আগে খবর পাই।

ডাক্তার আসিয়া প্রথম অভিবাদনের পর বলিলেন—"আপনাকে ভারী রোগা দেখাচ্ছে—আপনার কি এখনো অসুখ যাচ্ছে?"

অসাধারণ সহানুভূতির কথা নহে, যে কোন আলাপী আমাকে এখন দেখিতেন—সম্ভবতঃ ইহাই বলিতেন; তবে ইহাতে আমি এতদূর বিচলিত হইলাম কেন? বহুকষ্টে অশ্রু সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম "আপনি এখানে যে? কোথা থেকে আসছেন?"

তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"আমি এখানে আসব তা আপনি জানতেন না? মিষ্টার এম্‌কে ত (আমার বাবা) আগেই লিখেছি!"

হাসি পাইল, যেন বাবা সব কথা আমাকে বলিতে যাইবেন! বলিলাম "কই না, আমি তা শুনিনি। কোনো কেসে এসেছেন বুঝি?"

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"না আপনাদের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

আশ্চর্য্য হইলাম আমাদের সহিত দেখা করিতে এতদূর আসিয়াছেন! বিস্ময়ের আবেগে সহসা বলিয়া ফেলিলাম,—"আশ্চর্য্য বই কি? কলকাতা থাকতে কবার দেখা করতে এসেছেন—তা এতদূরে"—

তিনি একটু হাসিলেন; হাসিয়া চসমার মধ্য হইতে আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"আমার বিশ্বাস ছিল—অনেক কথা খুলে না বলাতেই আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার জীবনের অনেক ভুলের মত দেখছি এও আর একটা ভুল! আমি যে কেন আসতুম না তাকি বোঝেননি আপনি?

"কি করে বুঝব?"

তিনি আইগ্লাসটা একবার খুলিয়া আবার ভাল করিয়া চোখে আঁটিয়া উন্নত মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বেশী আসতে ইচ্ছা করত বলেই আসিনি।"

"তাহলে কি মনে করব এখন ইচ্ছা নেই বলেই"—

তাহলে আর একটা ভুল করবে তাহার পর একটু আসিয়া বলিলেন "একটু যে অবস্থান্তর ঘটেছে তা অস্বীকার করতে পারিনে। তখন শুনেছিলুম আপনি engaged; এখন সে সঙ্কোচ ঘুচেছে—তাই তাই"—

ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলাম! একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হইল, তাই—তাই—কি? তিনি একটু থামিয়া আবার বলিলেন—"তাই আমার জীবন প্রাণ সর্ব্বস্ব আপনাকে সমর্পণ করতে এসেছি—এখন আপনি যা করেন"

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া উঠিল; একটা মধুরতার আবর্ত্তে আমি আবর্ত্তিত হইতে লাগিলাম।—কি করিয়া বলিব তাহা কি মধুর! পুরুষের নিকট হইতে—যে পুরুষকে ভালবাসি তাহার নিকট হইতে প্রথম শোনা সে আমারি! "পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে তবে ইহাই তাই তবে ইহাই তাই!" কিন্তু পৃথিবী সত্যই স্বর্গ নহে সেইজন্য এত অমিশ্র অসীম সুখ জীবনে কাহারো অধিকক্ষণ থাকেনা। মুহূর্ত্ত না যাইতে সুখের অসীমতা দুঃখ আসিয়া সীমাবদ্ধ করে। কিছু পরেই প্রকৃতিস্থ হইলাম, স্বপ্ন ভাঙ্গিল; অনতিক্রমণীয় বাধা বিঘ্ন আবার চক্ষের উপর স্তূপাকৃতি দেখিলাম।—বুঝিলাম এত মধুর আলোক শুধু অন্ধকারের পূর্ব্বসূচনা, তাঁহার এই আত্মসমর্পণ শুধু চির বিদায় গ্রহণ করিতে; এ মিলন শুধু চিরবিচ্ছেদ, চিরব্যবধানের জন্য।—

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি—তুমি,—আমার কেমন সমস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে মাপ করবেন,—বিলাত থেকে এসে যেদিন আপনাকে দেখেছি সে দিন থেকে বুঝেছি আপনি ছাড়া আমার জীবন নিস্ফল; সেই থেকে বহুদিনের"—

হঠাৎ বলিলাম—"কিন্তু আপনি না engaged!"

"আমি engaged! এখবর কোথায় পেলেন?"

"আপনার মা নাকি বলেছিলেন?"

তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন "মায়ের কথা!

যে মেয়েটিকে তাঁর পছন্দ হয়—অবশ্য সেজন্য মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী সরস্বতীর যে আবশ্যক তা বলতে পারছিনে—তাকেই তিনি বৌ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এখন বহু বিবাহ প্রচলিত না থাকায় তাঁর বোধ হয় বিশেষ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যাক, আমার কথার কি কোন উত্তর নেই ?"

কি উত্তর দিব ? আমি কি সমস্ত প্রাণে তাঁহারি নহি ; তবে কোন প্রাণে বলিব আমি অন্যের হইতে চলিয়াছি। তবুও বলিলাম, কি করিয়া বলিলাম ঠিক জানিনা,—

"আমি engaged ; বাবা অন্যের সহিত আমার বিবাহ স্থির করিয়াছেন।"

একটা শোক নিস্তব্ধতায় আনন্দোচ্ছাস নিমেষে ডুবিয়া গেল। কিছু পরে তিনি বলিলেন,—যেন আপনার বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশি সংহত একত্রীভূত করিতে করিতে আপন মনেই বলিলেন—"কিন্তু মিষ্টার এম এরূপ ব্যবহার করবেন ? আমাকে—থাক সে কথা তাঁর সঙ্গে।—আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারো কি তাই ইচ্ছা ?"

তখন আমার লজ্জা সঙ্কোচ জ্ঞান ছিলনা আমি পুরুষের মত সুস্পষ্ট ভাবে বলিলাম—"না অন্য কাউকে ভাল বাসতে আমার শক্তি নেই।"

একটা বৈদ্যুতিক স্ফুরণ তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহা কি আনন্দের ? কিছু পরে তিনি বলিলেন "সে কথা কি আপনার বাবাকে বলেছিলেন ?"

আমি বিস্ময়ে বলিলাম "সে কথা বাবাকে কি করে বলব ? এইটুকু বলেছিলুম আমার বিবাহে ইচ্ছা নেই—তাতে আমি সুখী হবনা।"

"তিনি কি বল্লেন ?"

"বল্লেন আমাকে বিবাহ করতেই হবে।—বুঝলুম তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে আমি অক্ষম। তাঁকে সুখী করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু ভালবাসার কি একটু সামান্য কর্ত্তব্যও নেই ! তুমি—আপনি যাকে ভাল বাসেন, যে আপনাকে ভাল বাসে আপনা ব্যতীত যার জীবন মরণ সমানই,—তার প্রতি—কেবল তার প্রতি না—নিজের প্রতিও এতে যে গুরুতর অন্যায় করা হচ্ছে তার প্রতিকারের চেষ্টাও কি কন্যাধর্ম্মের বিরোধী ? আমার বিশ্বাস মিষ্টার এম্ সমস্ত জানলে কখনই আপনাকে অন্যের সহিত বিবাহে বাধ্য করবেন না"।

চুপ করিয়া রহিলাম। যাহা বলিতেছেন সবইত ঠিক। নীরব দেখিয়া তিনি অধীর ভাবে বলিলেন—"আপনার সঙ্কোচ হয় আচ্ছা আমি বলব, আমাকে অনুমতি দিন"। আমি বলিলাম—"না না আপনার বলতে হবেনা ; আমিই বলব। কিন্তু বাবাকে না, তাঁকে বলে কোন ফল নেই, তিনি আমার ভাব বুঝবেন না, নিশ্চয়ই sentimental দুর্ব্বলতা বলে মনে করবেন।—আমি তাকে বলব ; যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা, তাকে—ছোটুকেই বলব।—তার উদারতার প্রতি আমার খুব বিশ্বাস আছে। আমি বেশ জানি তার থেকেই আমি মুক্তি পাব। যদিও আমি তাকে কখন হৃদয় দিতে পারব না ; কিন্তু আমি ছেলে বেলা থেকে তাকে ভালবাসি, বন্ধু মনে করি, তার স্মৃতি চিরদিন আমার মনে সুখ জাগায় সে যে আমার কষ্টের কারণ হবে আমি কিছুতেই মনে করতে পারিনে।"

"ছোটু ! ছোটুর সঙ্গে বিবাহের কথা ? নিশ্চয়ই—তার যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকে অবশ্যই সে সহায় হবে"।

অতিরিক্ত আশানন্দে তিনি নিতান্ত যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া এইরূপ বলিলেন। আমি বলিলাম—"তাকে চেনেন কি ?"

তিনি সে কথার উত্তর করিলেন না ; বোধ হইল যেন তাহা শুনিতে পাইলেন না।

নিজের ভাবে ভোর হইয়াই বলিলেন”—“কেমন যেন সমস্ত মায়ার খেলা মনে হচ্ছে! আপনি তাহলে তাকে বলবেন। আমি এখন যাই, তার সঙ্গে কথা কয়ে কি ফল হয় যেন শুনতে পাই। হয়ত নিজেই আসব; যদি আবার কালই আসি কিছু মনে করবেন না; আপনার বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।”

বলিয়া কেমন যেন অতি সহসা তিনি চলিয়া গেলেন, আমাকে একটি কথা কহিবার পর্য্যন্ত আর সময় দিলেন না।

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন   সুর—ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

তুমি মধুর অঙ্গে নাচগো রঙ্গে
নূপুর ভঙ্গে হৃদয়ে,
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনিনি!
প্রেমে অধীরা, কণ্ঠ মদিরা
পরাণ পাত্রে এ মধু রাত্রে
ঢালগো!
নয়নে চরণে বসনে ভূষণে গাহগো,
মোহন রাগ রাগিনী
ওগো নব অনুরাগিনী!
মম শোনিত স্রোতে বহিবে গান,
লহরে লহরে উঠিবে তান,
শিহরি উঠিবে অবশ প্রাণ,
রিনি রিনি রিনি রিনি নি!
শুনি তব পদ গুঞ্জন, জগত শ্রবণ রঞ্জন
আপন হরষে, আপন পরশে
তব চরণ মন্ত্রে পরাণ যন্ত্র বাজিবে।
সুখ স্মৃতিগুলি আমারে ঘিরিয়া নাচিবে!
রিনিকি রিনিকি রিনি রিনি,
ওগো পরাণবিলাসিনী।

(আ)

।।৩।।[প১ ধ১। নো১ র্স১ ন১। নর্স১ র্র১ র্স১। নো১ নোধ১ ধপ প১
[তু মি ম ধু র অ — ঙ্গে না চ — গো

শেষ।

পধ১ নোর্স১ নো১। ধ১ পঁ১ পঁ১। পধ১ নো১ ধ১। মপ১ ধপ১ ম১। গ৩। ম১
র — ঙ্গে নূ পু র ভ — ঙ্গে হৃ — দ য়ে ঝি

ধ১ ধ১। নো১ র্স১ র্স১। র্সধ১ র্স১ নোধ১। প১ প১ ধ১।]—৩। —৩।[র্স১ র্গ১ র্গ১।
নি কি ঝি নি কি ঝি নি নি — তু মি] — — [প্রে — ম

(আ-প্র)

র্গা১ র্মা১ র্গা১ । র্গর্রা৩ ।—৩ । র্রা২ র্রা১ । র্রা১ র্গা১ র্রা১ । র্রর্সা৩ ।—৩ ।] র্সা১ র্সা১ র্সা১ ।
অ — ধী রা — ক ণ্ঠ ম — দি রা --] প রা ণ

র্সা১ র্রা১ র্সা১ । নো১ নো১ নো১ । ধনো১ র্সা১ নো১ । ধপ১ নো১ নো১ ।
পা — ত্রে এ ম ধু রা — ত্রে ঢা — ল

ধ৩ । ম১ ম১ প১ । ম১ প১ ধ১ । প১ ধ১ নো১ । ধ১ নো১ র্সা১ । ধনো১ র্সা১
গো ন য় নে চ র ণে ব স নে ভূ ষ ণে গা —

নো১ । ধ৩ । র্সা১ র্গা১ র্গা১ । র্মর্গা১ র্মা১ র্রা১ । র্সা২ না১ । র্রর্সা৩ । গা১ মা১ ধা১ ।
হ গো মো হ ন রা — গ রা গি নী ও গো ন

নো১ র্সা১ র্সা১ । র্সনো১ ধর্সা১ নো১ । ধ১ প১ ধ১ ॥—৩ ।—১ ম১ ম১ ।[ম১ ম১ ম১ ।
ব অ সু রা — গি নী — — — — ম ম [শো নি ত

(আ-প্র)

নো১ ধ১ ন১ । ন১ র্সা১ ন১ । র্সা৩ । প১ র্সা১ ন১ । র্সা১ র্সা১ র্সা১ । ন১ নর্সর্রা১
স্রো — তে ব হি বে গান ল হ রে ল হ রে উ ঠি

র্সা১ । [{নো১ ধ১ পমগ১ ।}] নো১ ধ২ । ম১ ম১ ম১ । গ১ গ১ ম১ । প১ ধ১
বে [{তা — ন }] তা ন শি হ রি উ ঠি বে অ ব

নো১ । র্সা৩ । প১ র্সা১ ন১ । র্সা১ র্সা১ র্সা১ । নো১ র্সা১ নোধ১ । প১ প১ ধ১ ॥
শ প্রাণ রি নি রি নি রি নি রি নি নি — তু মি

—৩ ।—৩ । [ম১ ম১ ম১ । ধ১ ধ১ নো১ । র্সা২ ন১ । র্সা৩ । প১ র্সা১ ন১ ।
— — [শু নি ত ব 'প দ গু ঞ্জ ন জ গ ত

র্সা১ র্সা১ র্সা১ । নস১ র্রা১ র্সা১ । {নো১ ধ১ পমগ১}] নো১ ধ২ । র্সা১ র্গা১ র্গা১ ।
শ্র ব ণ র — ঞ্জ {ন — }] ন — আ প ন

র্মর্গা১ র্মা১ র্গা১ । র্গর্রা৩ ।—৩ । র্রা১ র্রা১ র্রা১ । র্রা১ র্গা১ র্রা১ । র্রর্সা৩ ।—১ র্সা১ র্সা১ ।
হ — র যে — আ প ন প — র শে — ত ব

র্সা১ র্সা১ র্সা১ । নর্সা১ র্রা১ র্সা১ । নো১ নো১ নো১ । ধনো১ র্সা১ নো১ । ধপ১
চ র ণ ম — স্ত্রে প রা ণ য — ন্ত্র বা

নো১ নো১ । ধ৩ । ম১ ম১ প১ । ধ১ প১ ধ১ । প১ ধ১ নো১ । ধ১ নো১ র্সা১ ।
— জি বে সু খ স্মৃ তি গু লি আ মা রে ঘি রি য়া

ধনো১ র্সা১ নো১ । ধ৩ । র্সা১ র্গা১ র্গা১ । র্গা১ র্মা১ র্রা১ । র্সা১ র্সা১ ন১ । র্রর্সা৩ । গা১
না — চি বে রি নি কি রি নি কি রি নি রি নি ও

মা১ ধা১ । নো১ র্সা১ র্সা১ । সনো১ ধর্সা১ নো১ । ধ১ প১ ধ১ ।
গো প রা ণ বি না — গি নী — —

(আ-প্র)

নিদাঘ দিবসে।

এক নিদাঘ দিবসে আমি বেহালা বাজাইতেছি, বাটীতে কেহ নাই সকলে নিমন্ত্রণ গিয়াছে, আছে কেবল বৃদ্ধ ভৃত্য রামা। সহসা দ্বারে করাঘাত শব্দ হইল, তৎপরে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ, দৃঢ় ও বলবান।

কোন কথা না বলিয়া সে কেদারায় বসিয়া প'ড়িল। তাহার পলিত কেশ দেখিয়া মনে সহজেই সম্মান উদয় হয়। মৃদুস্বরে আগন্তুক বলিলেন "আমি আপনার প্রতিবাসী—গীত বাদ্য আমার বড় প্রিয় আপনাকে সুন্দর বাজাইতে শুনিয়া আপনার সহিত আলাপ করিতে বড়ই ইচ্ছুক হইয়াছি।"

আমি ভাবিলাম একটা আস্ত পাগল।

"আপনার বেহালায় অতি চমৎকার সুর বাঁধা, আপনিও দক্ষ্যবাদ্যকর।"

হায় আত্ম প্রশংসা। এই আত্মপ্রশংসায় আমার অবিশ্বাস অন্তর্হিত হইল।

আমি বলিলাম "বেহালা খানি অতি চমৎকার।" আগন্তুক বেহালা লইয়া দুই পার্শ্ব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন।

"এমন উত্তম বেহালা অতি অল্পই আছে, ইহার মূল্য প্রায় দুই শত মুদ্রা"

আমি বলিলাম "ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য"

আগন্তুক বেহালা লইয়া দুই এক বার ছড়ি চালনা করিয়া বলিলেন "ইহাতে আমি পারদর্শী নই, আমি সারেঙ্গ বাজাই, যখন আমরা অধিক পরিচিত হইব তখন আপনার সহিত প্রাণ খুলিয়া গীত বাদ্য করিব।"

"সেত উত্তম—আমিও সুখী হইব।"

"আপনি কি রাগিণী বাজাইতে ছিলেন,

"ভৈরবী।"

"আহাহা কি চমৎকার।"

যদি আপনি বিরক্ত না হ'ন, তাহাহইলে আর একবার বাজাইতে অনুরোধ করি। আপনার বাদ্য অতি হৃদয়স্পর্শী।"

এরূপ অনুরোধ কে অগ্রাহ্য করিতে পারে? আমি বেহালা গ্রহণ করিলাম। "আপনি অধিক বলিবেন না, আমার লজ্জা হয়; আমার কি এমন ক্ষমতা।"

"আপনি উত্তম বাজান কিনা জানি না, কিন্তু আপনি একাগ্রমনে বাজান। একাগ্রতাই ঐ বিদ্যার প্রাণ।"

একাগ্রমনে বাজাইতে লাগিলাম, যখন শেষ হইল দেখিলাম আগন্তুক গৃহের সমস্ত দ্রব্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমার প্রতি ফিরিয়া বলিলেন "অতি সুন্দর, রাগটি কি সুন্দর রূপে আলাপ করিলেন। ধন্যবাদ, আপনার নির্জনতা ভ[illegible]র জন্য আবার ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি কিছু খাম খেয়ালী, অনেক কষ্ট সহিয়াছি [illegible]হাশয়।"

আগন্তুক কপাল স্পর্শ করিলেন।

বলিলেন "আমার প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইয়াছি—আরও ভয়ানক দুঃখে পড়িয়াছিলাম—অনেক দিন পাগল হইয়াছিলাম।"

আমার ভয় আবার আসিতে লাগিল, তাঁহার চক্ষের এক অপূর্ব্ব ভাব দেখিলাম।

তিনি বলিলেন "এখন ভাল হইয়াছি, সে শোক গীত বাদ্যে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি, আপনাকে আমার ইতিহাস বলিব। যে গুপ্ত কথা বলিব তাহা বড় ভয়ানক।"

আমি বলিলাম "আপনার শোকময় ইতিহাস আবার জাগাইতে ইচ্ছা করি না।"

আগন্তুক বলিলেন "কিন্তু ইহাতে আমি শান্তি পাইব। তখন আমার বয়স বাইশ। সংসারে সফলকাম হইবার যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই আমার ছিল। সৎনাম—অতুল ধন সকলই ছিল।

সেই সময় আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিধুভূষণ বাবু বলিয়া একজন প্রৌঢ় ছিলেন। তিলোত্তমা ও মুরলা দুইটী সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যার তিনি জন্মদাতা। সেই কন্যাদ্বয়ের রূপজ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের বাটীতে প্রায়ই গমনাগমন করিতাম। দুইটী কে সমান স্নেহ করিতাম; শীঘ্রই দেখিলাম তাহারা উভয়েই আমার প্রতি আসক্ত হইতে লাগিল।

আমার আগমন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, সেই সঙ্গে তিলোত্তমার সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল; আমি তাহার পাণিপ্রার্থী হইলাম। মুরলার (জ্যেষ্ঠ কন্যার) দুঃখ অসীম; কিন্তু সে চাপিয়া গেল, আরও সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীর প্রতি ঘৃণা বাড়িয়া গেল।

মুরলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, শীঘ্রই শেষ হইল। তৎপরে আমার সহিত তিলোত্তমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর তিলোত্তমাকে লইয়া বাটীতে আসিলাম। বিনা কষ্টে অতি সুখে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। তার পর শ্বশুরালয়ে আসিলাম। শুনিলাম মুরলা বিধবা হইয়াছে। হতভাগিনী!

কিছু দিনের পরে তিলোত্তমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। সে পীড়ার চিহ্ন—কেবল যন্ত্রণাদায়ক মস্তকের বেদনা। সে ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হইতে লাগিল।

বৃদ্ধ পারিবারিক চিকিৎসক প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে আসিত, আমাকে অদ্ভুত প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিত; আমি মনে করিতাম বৃদ্ধ বয়সে তাহার বুদ্ধি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। তিলোত্তমার অবস্থা আরও মন্দ হইল—সে শয্যা গ্রহণ করিল।

তাহার ভগিনীর আত্মত্যাগ অদ্ভুত। সে কখনও শয্যা পার্শ্ব ত্যাগ করিত না। আমি ক্রমেই হতাশ হইতেছি। একদিন সন্ধ্যায় যখন মুরলা তিলোত্তমার নিকট ছিল না তখন প্রবেশ করিলাম। ছল ছল নয়নে তিলোত্তমা আমার হাত ধরিয়া বলিল "প্রিয়তম আমার শেষ দশা উপস্থিত।" আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। সে বলিল 'চুপকর—কি ভয়ানক, আমার ভগ্নী বিষে আমায় জর্জ্জরিত করেছে।'

'অসম্ভব—তুমি প্রলাপ বকিতেছ তিলোত্তমা।'

'না—গতরাত্রে আমায় নিদ্রিত মনে করিয়া ঔষধে বিষ মিশাইতেছিল, দেখিলাম।'

'কি ভয়ানক'

'সে আমার সুখে অসুখী, সে তোমার প্রেম চায়, প্রতিজ্ঞা কর তাহার আর মুখ —খিবে না।'

ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিলাম। একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া সে ঢলিয়া পড়িল; তাহার পর সমস্ত নিস্তব্ধ।

সে সময়কার আমার শোক অবতীর্ণ। কিয়ৎক্ষণ পরে মুরলা গৃহে আসিল, আমি তাহাকে শয্যা পার্শ্বে টানিয়া আনিয়া বলিলাম 'দেখ্ পাপীয়সী, তোর কাজ দেখ্, আমি সব জানি।' সে আমার পদতলে পড়িয়া সমস্ত পাপ স্বীকার করিল, বলিল যে আমার প্রেম লাভের জন্য সে ঈদৃশ কার্য্য করিয়াছে।

আমি বলিলাম 'আমি তোমায় বিচারালয়ে প্রেরণ করিব না, তোমার পিতামাতা তাহা হইলে মরিয়া যাইবেন। তোমার মুখ দর্শন করিতে চাই না—তুমি—

সে ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'এ মুখ আর দেখাব না আমি শপথ করছি এ মুখ আর দেখাব না।'

পরদিবস তাহার শয্যার তাহার মৃত দেহ পাওয়া গেল। যে বিষ সে তাহার ভগিনীকে দিয়াছিল সে তাহাই পান করিয়াছে।

সব শেষ হইল। শ্মশান হইতে ফিরিবার সময় বৃদ্ধ চিকিৎসক নির্জ্জনে আমায় ডাকিয়া বলিল 'ধন্য মহাশয়—আপনি বিষের প্রক্রিয়া অতি উত্তম রূপ জানেন।'

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম 'ইহার অর্থ কি ?'

'ইহার অর্থ তুমি খুন করিয়াছ। বহুকাল তোমার পত্নীর মৃত্যুর বিষয় সন্দেহ করিতাম, আজ তাহার প্রমাণ পাইয়াছি, যে ঔষধ দ্বারা তোমার শ্যালিকার প্রাণ বধ করিয়াছ, সেই ঔষধের শিশি আজ পরীক্ষা করিয়াছি।'

আমি বলিলাম 'কি আমাকে দোষী' সাব্যস্থ করেন—আমার প্রিয়তমা পত্নীকে অমি বিষ দিয়াছি—কেন কিসের জন্য ? বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া ডাক্তার বলিল 'দেখ, তাহাদের মৃত্যুতে কে লাভবান ; তুমি তাহাদের বিষয় পাইয়াছ—থাক্ সে বিচার আমার নয়—বিচারকের।'

অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, "আমি অপরাধী। ও হো কি ভীষণ।" আগন্তুক এই সময়ে বলিল "আপনি আমার স্থলে হইলে কি করিতেন ?"

আমি বলিলাম "ঠিক বলিতে পারিনা !"

আগন্তুক বলিল "আমি তাড়াতাড়ি করি নাই, আমি স্বীকার করিলাম, আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসিয়াছিল।

আমি বলিলাম 'ডাক্তার আমি দোষী; কিন্তু তুই সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশে কলঙ্ক অর্পণ করিতে পারিব না ; আমি আত্মহত্যা করিব ; কিন্তু তোমায় কিছু দিব।'

ডাক্তার বলিল 'বেশ তাহাই হউক, আমি কিছু বলিব না।'

আমি বিষয়াদি বন্দোবস্তের জন্য কিছু সময় চাহিলাম, ডাক্তার বলিল, সে সমস্ত কালই আমার সহিত থাকিবে। এইরূপে তাহার জন্য যে জাল ফেলিয়াছিলাম, তাহাতে সে জড়িত হইল।

শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ডাক্তারকে লইয়া আমার এক জমিদারীর বন্দোবস্ত করিবার জন্য ট্রেনে উঠিলাম।

গভীর রাত্রি। মাঝে ধীরে ধীরে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া নিদ্রিত ডাক্তারকে তুলিয়া রেল লাইনের উপর ফেলিয়া দিলাম। ডাক্তার ট্রেনের চাকার নিম্নে পড়িল, চাকা তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

পরে ষ্টেসনে ট্রেন থামিলে, আমি সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, বলিলাম "শিশীর হইতে নামিতে গিয়া ডাক্তার চাপা পড়িয়াছে। কেহ সন্দেহ করিল না। আমি বাঁচিলাম।

এই উত্তেজনায় আমার মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল আমি পাগল হইলাম

সহসা উঠিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া আগন্তুক বলিল "কি করিলাম-গুপ্ত কথা শুনিলে ?" হ সেই সুখ আ

"আমি ত শুনিতে ইচ ১

ভয়প্রদর্শন করিয়া আগন্তুক বলিল "সে হইবে না, একথা একজনের চেয়ে বেশী জানিবে না; দুইজনের মধ্যে একজন দূর হইবে।"

সে আমার দিকে অগ্রসর হইল; আমি টেবিলের পার্শ্বে তৎক্ষণাৎ লুকাইলাম, কারণ একজন বদ্ধ পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছি। "তোমায় জানালা হইতে নীচে ফেলিয়া দিব" বলিয়া সে জানালা খুলিতে গেল। সেই সময়ে দ্বারে করাঘাত হইল, আমি দ্বার খুলিতে দৌড়াইলাম।

একটী ভদ্রবেশধারী ব্যক্তির সহিত দুইজন ভীষণ দর্শন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল।

ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি বলিল "আমি ডাক্তার জগদীশচন্দ্র দত্ত। স্থানীয় বাতুলালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, আমাদের একজন বন্দী পলায়িত, অনুসন্ধানুযায়ী দেখিতেছি সে আপনার বাটীতে লুক্কায়িত।"

আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম ঠিক সময়েই আসিয়াছেন।"

"ইহার বিশ্বাস পত্নীকে সে বিষ খাওয়াইয়াছিল।"

"ইনিই আমাকে জানালার বাহিরে ফেলিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।"

"ঐ আর এক খেয়াল, এখনই আপনাকে মুক্ত করিব।" বলিয়া ডাক্তার দুই জন লোকের দিকে ইঙ্গিত করিল।

দুই ব্যক্তি পাগলকে আক্রমণ করিল।

পাগল চীৎকার করিয়া বলিল "ডাক্তার এ লোকটা আমায় ধরিয়াছে আমি ইহার প্রাণ লইব।"

বলিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল; ডাক্তারের দুই যম সঙ্গী বিনাকষ্টে তাহাকে ধরিল।

ডাক্তার আমাকে বলিল "আপনাকে দেখিয়া ইহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে যাবৎ না ইহাকে লইয়া যাইতে পারি তাবৎ কি লুক্কায়িত থাকিতে পারেন?"

আমি পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশ করিলাম।

"ওঃ ধন্যবাদ মহাশয়।" বলিয়া, ডাক্তার আমাকে চাবি বন্ধ করিল।

তার পর দাপাদাপি লাফালাফির শব্দ শুনিতে পাইলাম।

চেয়ার কোচ পড়িবার শব্দ হইতে লাগিল; বুঝিলাম পাগলটা আবার হাত ছাড়া হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সব স্থির হইল। আঃ বাচিলাম পাগলটা নিশ্চয়ই ধৃত হইয়াছে।

* * * *

এই সব গোলযোগে বোধ হইল ডাক্তার আমাকে মুক্তি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই গৃহে বদ্ধ রহিলাম। তার পর অস্থির হইয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলাম। ভৃত্য আসিয়া আমায় বাহির করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "পাগলটা গিয়াছে ত?"

সাশ্চর্য্যে ভৃত্য বলিল "কোন পাগল মহাশয়?

সব পরে দেখিলাম আমার দামী বেহালা, সোনার ছড়ি, রূপার ফুলদানি ইত্যাদি সমস্ত ...হৃত হইয়াছে। অদ্ভুত জুয়াচুরি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

ধনো১ না — থিবে না ঈশ্বরের ম১ ধ১। তাহার পর স গো প সে সময় তাহাকে শয্যা সব জানি।' প্রেম লাভের জ

য়া সমস্ত পাপ ছ।

ক্ষীণতনু অপমানে নতশির
হে কলঙ্ক-বেদন !
যুগ ধরে ধরে রহিব কি চিরঅন্ধ,
নেব না আপনার মায় ?
বিসহায় জীবরক্ত, বিপন্নের আর্ত্তনাদ
দিয়ে পূজা দিব রাক্ষসীর পায় ?
মা তুই জননী হয়ে কেমনে রহিবি স্থির ?
সন্তানের হেরি এ দুর্দ্দশা !
প্রাণ লয়ে আমাদের খেলাইবি মায়াবিনী
এ নিঠুর খেলা প্রাণনাশা !
ডরি না প্রাণের ভয়ে, প্রাণের অধিক প্রাণ
হৃদয়ের দুর্লভ-স্বপন !
করুণার প্রস্রবণ মাতৃস্নেহ অনুপম
তার এই নিঠুর মরণ !
ঘুচে নিরাশ ব্যথা, এই মর্ম্ম আকুলতা
একদিন হয় আশা !
পিতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ
ফুটে উঠে উপহার মাঝে, ব্যর্থপূজা ! ব্যর্থ অশ্রু !
গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে, মিলন নহি
নব নব আনন্দের সাজে।
বিরহী প্রবাসীজনা ধন্য মানে তুন
কত সাধ আশা মনে তার ;
নববেশে হাসিভরা স্নেহের কমল
—আগ্রহে লইবে উপহার !
আজি শুষ্ক মুখে ভাবে, হায় ! তারে কি
অন্ন পুরো যোগানই দায় !
শূন্যহাতে কেমনে বা ! দাঁড়াইবে গৃহদ্বারে !
মিলন-আনন্দ মৃত প্রায় !
দরিদ্র আতুর যত, সারাবর্ষ অন্নাভাবে
কাটায়েছে অর্দ্ধ উপবাসে ;
একদিন তৃপ্ত-ক্ষুধা, হবে তবু পূজা দিনে,
রহিয়াছে সেই সুখ আশে।—

ভয়প্রদর্শন করিয়া আগন্তুক বলিল "সে হইবে... নাম তব
জানিবে না ; দুইজনের মধ্যে একজন দূর হইবে।"

সে আমার দিকে অগ্রসর হইল ; আমি টেবিলের পার্শ্বে ... এই
একজন বদ্ধ পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছি। "তোমায় জানালা ...
বলিয়া সে জানালা খুলিতে গেল। সেই সময়ে দ্বারে করাঘাত হ...
দৌড়াইলাম।

একটী ভদ্রবেশধারী ব্যক্তির সহিত দুইজন ভীষণ দর্শন ব্যক্তি গৃহপ্রবেশী,

ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি বলিল "আমি ডাক্তার জগদীশচন্দ্র দত্ত।
কর্ত্তৃপক্ষ, আমাদের একজন বন্দী পলায়িত, অনুসন্ধানুযায়ী দেখিতেছি ...
লুক্কায়িত।"

আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম ঠিক সময়েই আসিয়াছেন।"

"ইহার বিশ্বাস পত্নীকে সে বিষ খাওয়াইয়াছিল।"

"ইনিই আমাকে জানালার বাহিরে ফেলিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।"

"ঐ আর এক খেয়াল, এখনই আপনাকে মুক্ত করিব।" বলিয়া ডাক্তার দুই জন লোকে...
দিকে ইঙ্গিত করিল।

দুই ব্যক্তি পাগলকে আক্রমণ করিল।

পাগল চীৎকার করিয়া বলিল "ডাক্তার এ লোকটা আমায় ...
প্রাণ লইব।"

বলিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিল ; ডাক্তারের ...ই লাজ
করিল।

ডাক্তার আমাকে বলিল "আপনাকে ... নাচিছে উল্লাস রঙ্গে,
ইহাকে লইয়া যাইতে পারি তাবৎ কি ...

আমি পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশ করি... মালিনী

"ওঃ ধন্যবাদ মহাশয়।" বলিয়া... কার ততবাড়ে হর্ষ তার

তার পর দাপাদাপি লাফালাফির শ... করুণারূপিণী ?

চেয়ার কোচ পড়িবার শব্দ হইতে ... কাঁদিছে কাতর রবে
য়াছে। কিছুক্ষণ পরে সব স্থির হইল ...ব তারে হায় ?

* *

এই সব গোলযোগে বোধ হই... লদানে, কলঙ্কিত পূজাস্থান,
পর্যন্তসেই গৃহে বদ্ধ রহিলাম ...তে বঙ্গ ভেসে যায় !

ভৃত্য আসিয়া আমায় বাহি... এ আসুরী পূজা কে শেখালে বাঙ্গালীকে,

সাশ্চর্য্যে ভৃত্য ব...

ধন্যে... সার পর ... কে গড়িল রাক্ষস দেবতা ?

না ... কোমল-অন্তরা দেবি ! তব আগমন আর

ম... ধ...। ... কেমনে গো হবে বল হেথা ?

গো প ... * * * * *

তবে কি রহিব মোরা চির অন্ধকার মাঝে ;

চিরদিন করিব ক্রন্দন ?

অনাহারে ক্ষীণতনু অপমানে নতশির
হৃদে বহি কলঙ্ক-বেদন !
শত যুগ ধরে ধরে রহিব কি চিরঅন্ধ,
চিনিব না আপনার মায় ?
অসহায় জীবরক্ত, বিপন্নের আর্ত্তনাদ,
পূজা দিব রাক্ষসীর পায় ?
মা তুই জননী হয়ে কেমনে রহিবি স্থির ?
সন্তানের হেরি এ দুর্দ্দশা !
প্রাণ লয়ে আমাদের খেলাইবি মায়াবিনী
এ নিঠুর খেলা প্রাণনাশা !
ডরি না প্রাণের ভয়ে, প্রাণের অধিক প্রাণ
হৃদয়ের দুর্ল্লভ-স্বপন !
করুণার প্রস্রবণ মাতৃস্নেহ অনুপম
তার এই নিঠুর মরণ !
প্রাণের নিরাশ ব্যথা, এই মর্ম্ম আকুলতা
মাতৃপদ পূজিবার আশা !
সকলি স্বপন মিছে ? ব্যর্থপূজা ! ব্যর্থ অশ্রু !
নাহি, নাহি, মাতৃ-ভালবাসা ?
বল দেবি তাহা নহে, বলগো আমরা নহি
রাক্ষসীর খেলাবার ধন।
যদিও দরিদ্র দীন, দুর্ব্বল অধম হীন
তবু তোর সন্তান আপন !

*　　*　　*　　*　　*

ভাগ্যদোষে আমাদের, অন্ন-প্রসবিনী বঙ্গ
আজি হায় অন্ন-কাঙ্গালিনী।
শ্যামল প্রান্তর তার, ধূলিময়, তৃণময়,
অন্নপূর্ণা তুই ভিখারিনী !
ভিখারিনী সাজে তবে আয় মা বঙ্গের গৃহে ;
চাহিব না অন্ন মোরা আর।
শুধু নিয়ে আয় তোর স্নেহভরা-মাতৃহৃদি
নিয়ে আয় করুণা অপার।
যেন তোর মুখ দেখে, বুঝিতে পারি মা সবে,

আমাদেরি বেদনার ভার!—
আমাদের চেয়ে আরো, শতগুণে বাজে তোরে
মর্ম্মে মর্ম্মে ঝরে অশ্রুধার।
সমস্ত ব্রাহ্মণ্ড এবে, বিমুখ মোদের পরে;
কাঁপে পৃথ্বি পড়ে ঘর বাড়ী!
প্রলয় কটাক্ষে ঘোর উঠিতেছে হাহাকার
মরিতেছে কত নর নারী!
রুষ্ট দেব, রুষ্ট রাজা, ওই দেখ কারাগারে
কাঁদে প্রজা মরমে ব্যথিত!
ছাড়ি প্রিয় জন্মভূমি, ছাড়ি প্রিয় পরিজন
চির তরে কেহ নির্ব্বাসিত।
দেবতার কোপবহ্নি, নিদারুণ মহামারী
শোক-ছায়া ফেলি শত ঘরে,
গ্রাম পল্লী জনপদ, উচ্ছন্ন করিয়া সব,
ফিরিতেছে ভারত ভিতরে।
এ দুর্দ্দিনে জননি গো! তুই যে ভরসা শুধু
আয় তবে এ পুণ্য দিবসে,
এই দুঃখ মলিনতা এই অশ্রু এই ব্যথা;
দূর কর অমৃত পরশে।
দলিত ব্যথিত দীন সকলের তরে তোর
মাতৃ কোল হোক প্রসারিত!
ভুলি ক্ষুধা, ভুলি ব্যথা, ভুলি লাজ অপমান,
মাতৃস্নেহ পেয়ে অবারিত!

জামাই-জাঙ্গাল।

(জনপ্রবাদ-মূলক গল্প)

উপক্রমণিকা।

বহুকাল পূর্ব্বে, বোধ হয় মুসলমান রাজত্বেরও পূর্ব্ব হইতে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বাস করিতেন। তাঁহাদের রাজ্য বর্ত্তমান এক একটি জেলার অপেক্ষাও আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল। কদাচিৎ কখন কাহারও বৃহত্তর হইত। তাঁহারা ধনে

এখনকার জমীদারগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না কিন্তু ক্ষমতায় তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নরপতি বিশেষ ছিলেন। প্রায় প্রত্যেকেরই সহস্রাধিক অস্ত্র তরবারী, বড়ষা সড়কি এবং ঢাল ; কোথাও কোথাও ২।৪টি বন্দুকের ব্যবহার দেখা যাইত কিন্তু সেও অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে। রাজারা, কোন কারণে পরস্পরে মনান্তর হইলে যুদ্ধ করিতেন, প্রত্যেকে ৫।৭ শত ঢাল তরবারীওয়ালা সৈন্য লইয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে উপস্থিত হইতেন! যুদ্ধে দুই একশত হতাহত হইলেও সেজন্য কাহারও নিকট রাজাদিগকে দায়ী হইতে হইত না। ফলতঃ তাঁহারা সর্ব্বাংশেই স্বাধীন ছিলেন কেবল মধ্যে মধ্যে যখন কেহ সম্রাট বা রাজচক্রবর্ত্তী হইতেন তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া যৎকিঞ্চিৎ রাজকর প্রদান করিতেন বা স্বীয় সেনা দিয়া সম্রাটকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করিতেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় হুগলি জেলায় প্রায় ৪।৫ জন এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। তন্মধ্যে একজন মহানাদে (মানাদে) এবং আর একজন ত্রিবেণীতে রাজত্ব করিতেন। ত্রিবেণীর রাজার রাজত্ব পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক ছিল। বোধ হয় ত্রিবেণীর রাজা গঙ্গাস্নানাদিতে আসিয়া ত্রিবেণীতে বাস করিয়াছিলেন সেই জন্যই মহানাদের অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও ত্রিবেণীতে আর একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই মহানাদ রাজবাটীর ধ্বংশাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে কিন্তু ত্রিবেণীর রাজবাটীর চিহ্নমাত্রও নাই; পুরাতন রাজবাটী ভাগীরথী ও সরস্বতীগর্ভে আত্মগোপন করিয়াছে।

(২)

আজ বৈশাখী অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ। ত্রিবেণীর মুক্তবেণীর ঘাটের উপর প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকার পূর্ব্বদিকে ভাগীরথী ও দক্ষিণদিকে সরস্বতী। অট্টালিকাটি এই দুইটি প্রবল স্রোতস্বিনীর বিয়োগস্থলে নির্ম্মিত বলিয়া বিশেষ দৃঢ় কিন্তু শ্রীহীন। উভয় নদী হইতেই কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন কৃষ্ণবর্ণ বাতায়নশালী প্রাসাদপ্রাচীর দেখিতে পাওয়া যাইত এবং কখন কখন উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া দুই একটি সুন্দর সুগৌর মুখকমল প্রাতরাকাশের লোহিত শোভা দর্শন করিত বা সরস্বতীর পরপারের আম্রকাননোত্থিত কোকিল-ঝঙ্কার শ্রবণ করিত।

১

আজ সূর্য্যগ্রহণ। ঘাট লোকে লোকারণ্য; কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়! স্থল হইতে আচিবুক জল পর্য্যন্ত কেবল কৃষ্ণবর্ণ মস্তক ; মধ্যে মধ্যে দুই একটি বৌদ্ধের মুণ্ডিত-মস্তক। তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গদেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। জলে বিচিত্র কেতনমালা শোভিত নৌকারাজী। নৌকার পর নৌকা; নৌকার আর শেষ নাই। যেন স্থলে নরমুণ্ড ও জলে নৌকা উভয় স্রোত আসিয়া এই ত্রিবেণী ঘাটে মিলিত হইয়াছে। প্রায় সকল নৌকা হইতেই শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশর ধ্বনি হইতেছে।

এত জনতা, কিন্তু রাজবাটীর ঘাটে জনতা নাই। কালান্তক যমদূতের ন্যায় ভীষণাকার, কৃষ্ণবর্ণ, অস্ত্রধারী প্রহরীগণ রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘাটের চতুর্দ্দিকের জনতা সরাইয়া দিতেছে। রাজান্তঃপুরবাসিনীরা এই ঘাটে স্নান করিতেছেন। তাঁহারা স্নান সমাপন করিয়া রাজবাটী মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র প্রহরীরা জনতা ছাড়িয়া দিল। প্রবল জল-স্রোতের সম্মুখে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে সে জল যেমন সগর্জ্জনে প্রবাহিত হইয়া থাকে প্রহরী বর্গ অপসৃত হইবামাত্র নরপ্রবাহ সেইরূপ তেজে, সেইরূপ গর্জ্জনে ঘাট প্লাবিত করিল, তাহাতে এক ভীষণ নরসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া কত ক্রন্দন কত চীৎকার কত কাতরোক্তি উত্থিত হইল।

একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর নৌকায় বহুমূল্য অলঙ্কারধারিণী সম্ভ্রান্ত রমণীগণ সিক্ত-বস্ত্রে অপেক্ষা করিতেছেন। সূর্য্যগ্রহণে স্নান করিয়াছেন আবার মুক্তিতে স্নান করি-বেন। সহসা তাঁহাদের নৌকার নিকট স্ত্রী কণ্ঠের কলহ চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইয়া জলে স্থলে ব্রাহ্মণদিগের অবগাহন মন্ত্র ভাসাইয়া দিল। উল্লিখিত নৌকা হইতে একজন স্থূল কলেবরা গৌরাঙ্গী বর্ষীয়সী ঈষৎ গ্রীবা বক্র করিয়া কলহস্থান দেখিয়া বলিলেন,—

"আরে গেলযা! শ্যামা, এখানেও কোন্দল কর্ত্তে এসেছিস নাকি? ব্যোমকেশ কোথা গেল, মাগীকে ডাকতে পাঠাওত।"

ব্যোমকেশ বোধ হয় কর্ম্মচারীর নাম। ব্যোমকেশ অপর একজন পরিচারিকাকে বলিলেন "শ্যামাকে ডাকাও।"

সে যতক্ষণ শ্যামাকে ডাকিতে গেল ততক্ষণ শ্যামা কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর তানে তুলিয়া তাহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

শ্যামার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথমে ধীরে ধীরে কলহ আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী বীরে-ন্দ্রাণীকে যত দুর্ব্বল মনে করিয়াছিল সে বাস্তবিক তত দুর্ব্বল নহে বরং তাহার অপেক্ষাও অধিক বলশালী কণ্ঠস্বর রাখে দেখিয়া, অগত্যা নিজেও সাধ্যমত বাক্যসংগ্রাম আরম্ভ করিল। সুতরাং এই দুই রমণীরত্নের কর্কশ কণ্ঠস্বরে ক্ষণেকের জন্ম লোকারণ্যের অস্ফুট কোলাহল চাপা পড়িল। অকস্মাৎ ব্যোমকেশ প্রেরিত পরিচারিকার আহ্বানে শ্যামাকে যুদ্ধের বিনা অবসানেই ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইতে হইল। সুতরাং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকেও বিরত হইতে হইল। যদি কেহ শ্যামার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে তাহার মুখে বাস্তবিক ক্রোধের চিহ্ন নাই বরং যেন ওষ্ঠ প্রান্তে একটু হাসির চিহ্ন আছে।

• • •

২

ত্রিবেণীর রাজা দিবাকর শর্ম্মা আহারে বসিয়াছেন। সম্মুখে রাজ্ঞী হৈমবতী হীরকা-লঙ্কার শোভিত সুগোল মৃণালভুজে একখানি মূল্যবান রত্নখচিত তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতেছেন। রত্নখচিত তালবৃন্ত শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। যাহারা এখনও তারকে-

শ্বরের নিকট সিন্দূরের ২৷৩ টাকা মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালপাতার পাখা দেখিয়াছেন তাঁহারা কতকটা বুঝিতে পারিবেন সে এই দেশী তাল পাতার পাখাই বহু মূল্য রত্নখচিত হইতে পারে।

রাজা নীরবে আহার করিতেছেন, রাজ্ঞীও নীরব। ক্ষণকাল পরে রাজা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন।—"তুমি পরিচয় পাইলে কি করিয়া?"

"কাল স্নানের সময় সেই সুন্দর মেয়েটিকে দেখিয়া আমার বড়ই মন চঞ্চল হইল, ইচ্ছা হইল মেয়েটিকে লইয়া কোলে করিয়া মুখচুম্বন করি। আমি দিগম্বরীকে সন্ধান লইতে পাঠাইয়া দিলাম; দিগম্বরী তাঁহাদের একটা পরিচারিকার সহিত কলহ করিয়া কথায় কথায় তাঁহাদের পরিচয় জানিয়া লইয়াছে"। রাজা সহাস্যে বলিলেন

"দিগম্বরীর বাহাদুরী আছে; কলহের মধ্যে পরিচয় লইল কি করিয়া?"

"দিগম্বরী আমার আদেশে পরিচয় আনিতে গিয়া প্রথমেই তাঁহাদের ঝির সহিত কোন সূত্রে কোন্দল আরম্ভ করিল। কথায় কথায় বলিল 'জানিস আমি রাজবাটীর দাসী' তখন সে পরিচারিকা কহিল 'আমিও রাজবাটীর দাসী আমি মানাদের রাজবাটীতে থাকি আমি তোকে ভয় খাব নাকি?' তাহাতেই জানিতে পারিলাম তাহারা মহানাদের রাজান্তঃপুরচারিণী।"

"সেকি মহানাদের রাজপরিবার আমার রাজ্যে আসিয়াছিলেন আমি কোন সংবাদ পাইনাই। তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করা দূরে থাক তাঁহাদের পরিচারিকার সহিত বিবাদ হইল। কাজটা ভাল হয় নাই।"

রাণী লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আমিত আর মহানাদের রাণীর সহিত বিবাদ করি নাই, দাসীতে দাসীতে ওরূপ হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাঁহারা গুপ্তভাবে আসিয়াছিলেন তাই আমাদের কোন সংবাদ দেন নাই। দিগম্বরী বিবাদের স্থলে তাঁহাদের পরিচয় লইয়াছে।"

রাজা অন্য মনে আহার করিতে করিতে বলিলেন

"আমগুলা এখনও তেমন সুমিষ্ট হয় নাই।"

"এই সবে মাত্র বৈশাখ মাসের আরম্ভ এখনি কি আম সুমিষ্ট হইবে? উদ্যানরক্ষক বৃক্ষের প্রথম ফল বলিয়া দেবসেবার ও রাজসেবার জন্য লইয়া আসিয়াছিল। কাল দেব সেবা হইয়াছে আর আজ—"

রাজা বাধা দিয়া বলিলেন—"আজ এই রাজসেবা হইল। মেয়েটিকি বড় সুশ্রী?"

"তা না হইলে আমি কি এত অনুরোধ করি?"

"আচ্ছা ঘটকরাজকে আজই ডাকাইয়া পাঠাইব।"

৩.

পর দিন প্রাতে ঘটকরাজ স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিস্তৃত ললাট চন্দনচর্চ্চিত করিয়া ত্রিবেণীরাজ সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে যথা বক্তব্য বলিয়া

পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। ঘটকরাজ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন, রাজসাক্ষাতে বিদায় লইয়া একেবারে মহানাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথ বড় অধিক নহে কিন্তু সুগম নহে, বিশেষ অমাবস্যার পর হইতে বৃষ্টি হওয়াতে পথ বড় দুর্গম হইয়াছিল। ঘটকরাজ বামহস্তে তালপত্র ও দক্ষিণ হস্তে একগাছি স্থূলাকার দীর্ঘ, সুপক্ক তৈলসিক্ত বংশ যষ্টি লইয়া অতি সাবধানে কদ্দমাক্ত পথে যাইতে লাগিলেন। পথ কর্দ্দমাক্ত না হইলে দুই প্রহরের মধ্যেই মহানাদে উপস্থিত হইতে পারিতেন, কিন্তু সকর্দ্দম পথে চলা দুরূহ বলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহানাদে উপস্থিত হইলেন। সে দিবস আর রাজসাক্ষাতে না গিয়া কোন পরিচিত বন্ধুর বাটীতে রাত্রি যাপন করিলেন। ঘটকের বন্ধু কোন্ দেশে নাই?

দিবা এক প্রহরের সময় মহানাদের রাজা পুরন্দর শর্ম্মা পুরন্দরের ন্যায় রাজসভায় বসিয়াছেন। রাজসভা একটি অতি বৃহৎ দালান। সম্মুখে ৯টি খিলানযুক্ত প্রকাণ্ড বারান্দা, পশ্চাতে অন্তঃপুর। সভাগৃহ-প্রাচীরে অতিরিক্ত কারুকার্য্য, কত ফুল কত লতা তাহার সংখ্যা নাই। কত ফুলের ভিতর হইতে লতা বাহির হইয়াছে আবার কত লতা গিয়া ফুলের ভিতর মিশিয়াছে। প্রাচীরের বালীর কার্য্যে এই কারুকার্য্য। প্রাচীর গুলি হংস ডিম্ববৎ শ্বেত ও মসৃণ। প্রাচীরে চিত্রেরও অসদ্ভাব নাই, অসংখ্য চিত্র প্রায় পরস্পরের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া আছে। অধিকাংশই দেব দেবীর চিত্র ও পৌরাণিক চিত্র, দুই এক খানা অন্য চিত্রও আছে। রাজবাটির একখানি প্রতিরূপ আছে। মনুষ্যমূর্ত্তি প্রায়ই নাই। কেবল একখানি চিত্রপটে একটি বৃদ্ধের শ্বেত কেশ শ্বেত শ্মশ্রু দৃষ্টি গোচর হইতেছে। মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন কিন্তু ভ্রূযুগল ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। চিত্রগুলিতে অঙ্কন পারিপাট্য অপেক্ষা বর্ণ পারিপাট্যই অধিক। সকল বর্ণই উজ্জ্বল।

গৃহ প্রাঙ্গনে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতা, তদুপরি শ্বেত আস্তরণ। কর্ম্মচারীবর্গ যোগীর ন্যায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজের নিজের কায করিতেছেন। অপেক্ষাকৃত উন্নত কর্ম্মচারীগণ উন্নত আসনে এবং রাজা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আসনে মখমল মণ্ডিত উপাধানের উপর অঙ্গভার ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। রাজার আসনের নিম্নে দুই পার্শ্বে অমাত্য ও কোষাধ্যক্ষ বসিয়াছেন। রাজার নিকটে রাজচিহ্ন স্বরূপ একখানা বহুমূল্য তরবারী নিদ্রিত সর্পের ন্যায় শয়ান রহিয়াছে।

অমাত্য মধ্যে মধ্যে এক একখানি হরিদ্রারঞ্জিত তুলট কাগজে কি হিসাব পত্র দেখিয়া রাজাকে দিতেছেন। রাজা কোনটা বা সমস্ত কোনটার অর্দ্ধেক কোনটার দুই চারিছত্র পড়িয়া অমাত্যকে প্রত্যর্পণ করিতেছেন, কোনটাতে স্বয়ং স্বাক্ষর করিতেছেন। রাজা অমাত্য ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে কখন কখন দুই একটি কথা বার্ত্তা হইতেছে। অন্যান্য কর্ম্মচারীবর্গ সসম্ভ্রমে নীরব হইয়া বসিয়া আছেন।

রাজা অতি সুপুরুষ। রাজা হইলেই সুপুরুষ হইতে হয় বলিয়াই সুপুরুষ নহেন বাস্তবিকই সুপুরুষ। বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ অতিক্রম করিয়াছেন। অতি বলিষ্ঠ বীরোচিত গঠন, মূর্ত্তি কিন্তু কিছু উগ্র, নিতান্ত শান্ত নহে। দেখিলে বোধ হয় রাজা সকল রিপু জয় করিয়া ক্রোধের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। পরিধানে বারানসী পট্টাম্বর। গ্রীষ্মকাল তাই অঙ্গে অন্য কোন আচ্ছাদন নাই কেবল অতি সূক্ষ্ম স্বর্ণখচিত একখানা উত্তরীর ভিতর দিয়া বাহুতে হীরকখচিত অনন্ত বলয়, কণ্ঠে হীরক হার এমনি কি উপবীত পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। মস্তকে নিবীড় কুঞ্চিত কেশ স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত। বদনমণ্ডলে শ্মশ্রু নাই কেবল সুসংযত গুম্ফ মুখশ্রীকে আরও প্রস্ফুটিত করিয়াছে।

৪

রাজা সভায় বসিয়া আছেন এমন সময় ঘটকরাজ সভা মধ্যে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া বলিলেনঃ—

"জয়স্তু নরবর পুরন্দর পুরন্দর বলিশালী।
রঘুমণিসম প্রজাপালক ধর্ম্মে ধর্ম্মাত্মাজ দানে শ্রীবাল॥"

রাজা সহাস্যে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আগচ্ছ আগচ্ছ শুভমাগচ্ছ।"

অমাত্য নির্দ্দিষ্ট আসন দেখাইয়া দিলে ঘটকরাজ রাজ-অনুমতি লইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন আর কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কিনা? অমাত্য রাজার মন বুঝিয়া আপাতত কোন কার্য্যের সম্ভাবনা নাই জানাইলেন।

রাজা তখন একান্তে ঘটকের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন। প্রায় ৩।৪ দণ্ড বাক্যালাপের পর ঘটকরাজ পূর্ণমনস্কাম ও পূর্ণ মুদ্রাথলি হইয়া আগামী আষাঢ় মাসে বরষার প্রারম্ভে শুভ বিবাহের দিনস্থির করিয়া প্রস্থান করিলেন; রাজাও অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

রাণী রাজার নিকট হইতে কন্যা নলিনীর বিবাহ প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদে অধীর হইলেন আবার কন্যার বিরহাশঙ্কায় একটু ম্লানও হইলেন। একদিনে ঘটক আসিলেন আবার সেই দিনেই বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া চলিয়া গেলেন কাজটা যেন বড়ই তাড়াতাড়ি বলিয়া বোধ হইল কিন্তু কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কারণ গত বৎসর উৎকলের অন্তর্গত যাজপুরের অধীশ্বর শ্রীমান কোলাহল প্রসাদ তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া সপ্তগ্রাম হইতে বর্দ্ধমান যাইবার পথে ২।৩ দিন পুরন্দর শর্ম্মার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। উৎকলেশ্বর মহানাদ-রাজকন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা পুরন্দর বড় সঙ্কটে পড়িলেন। যাজপুরেশ্বর প্রবল প্রতাপশালী, সঙ্গে প্রায় সহস্রাধিক সৈন্য আসিয়াছিল। তাঁহার খণ্ডাইৎ দিগের তরবারীর সম্মুখে তিষ্টিতে পারে এরূপ বীর দক্ষিণ ভারতে বোধ হয় অল্পই ছিল।

যাজপুরেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী আর তিনি স্বয়ং যাজপুর রাজের তুলনায় সামান্ত তৃণ মাত্র। অনেক বিষয়ে এ পরিণয়সূত্র মহানাদরাজের পক্ষে অনুকূল হইলেও কোলাহলের প্রায় ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম এবং অন্যূন বিংশতিটি পরিণীতা স্ত্রী দেখিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আর এক কথা এই যে কোথায় যাজপুর আর কোথায় মহানাদ! বোধ হয় এক মাসের পথ ব্যবধান। রাণী যখন শুনিলেন যে যাজপুর রাজকন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী তখন আর তাঁহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। যদি কোলাহল প্রসাদ বলপ্রয়োগে কন্যাকে বিবাহ করেন তাহা হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। রাজা অবশেষে অনেক চিন্তার পর এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তিনি মাননীয় অতিথিকে জানাইলেন যে কন্যার অষ্টম বর্ষ শেষে এক মহা বিপদ আছে, হয় কন্যার মৃত্যু হইবে নচেৎ কন্যা বিবাহিতা হইলে বিধবা হইবেন। যাজপুররাজ শুনিয়া বলিলেন "ভাল আমি তীর্থে যাইতেছি তীর্থ ভ্রমণ পুর্ব্বক বৎসরের পরে আবার আসিয়া আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিব। চাইকি আগামী বর্ষের প্রথমে গ্রহণ উপলক্ষে ত্রিবেণীতে আসিলেও আসিতে পারি।

রাজা রাণী আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু একেবারে আবার সুস্থিরও হইতে পারিলেন না। সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গেলে কবে কোলাহল প্রসাদ আসিয়া কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন এই চিন্তাতে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এমন সময় আমাদের ঘটকরাজ আসিয়া তাঁহার নলিনীর সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে এক প্রকার নিশ্চিন্ত করিলেন। ত্রিবেণীনাথ দিবাকর শর্ম্মার পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র প্রভাকর শর্ম্মার সহিত পরিণয় কথায় রাজা ও রাণী সহর্ষে সম্মতি দান করিলেন।

আপনারা নায়িকার নাম জানিতে পারিয়াছেন 'নলিনী' নায়কেরও নাম শুনিলেন 'প্রভাকর', বেশ মিল হইলনা? "প্রভাকর নলিনী" কি "নলিনী প্রভাকর" নাম দুটিতে কিছু কবিত্ব থাকিলেও নায়ক নায়িকার হৃদয়ে কিছুমাত্র কবিত্ব জন্মে নাই। ১৬ বৎসেরর চন্দ্রশেখর ও ৬।৭ বৎসরের শৈবলিনীতে ভালবাসা জন্মিয়াছিল কেননা উভয়ে একত্রে এক বৃন্তে দুইটি কুসুমের ন্যায় লালিত পালিত কিন্তু আমাদের নায়ক নায়িকার মধ্যে ভালবাসা দূরে থাক চাক্ষুষ দৃষ্টির পর্য্যন্ত আদান প্রদান হয় নাই। ইচ্ছা ছিল বটে ষোড়শী নায়িকা দুর্গের ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া কপোলে হস্ত দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া থাকিবেন দক্ষিণ মরুত আসিয়া তাঁহার আলুয়িত কেশদাম লইয়া ক্রীড়া করিবে, সূর্য্যের রক্তিম প্রভা আসিয়া নায়িকার আরক্তিম বদন মণ্ডলে পড়িয়া আরও আরক্তিম করিয়া রক্ত কমলের গঞ্জনা স্থল করিয়া তুলিবে এমন সময়ে সপ্তবিংশবর্ষ বয়স্ক বীর নায়ক অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে আসিয়া দূর হইতে এই নায়িকাকে দেখিবেন তার পর দৃষ্টি বিনিময় ক্রমে ক্রমে প্রাণ বিনিময় অবশেষে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ মারমারি কান্না কাটনার পর মাল্য বিনিময়। আমরাও ভরসা করিয়া পাঠক পাঠিকার নিকট হইতে ঘটক বিদায় প্রত্যাশা করিতে পারিব। কিন্তু তা হইল কই? কপাল!

উভয় রাজাই বিবাহের আয়োজনে ব্যাপৃত রহিলেন। উভয়ের ইচ্ছা যেন আমার কোন অংশে ত্রুটি প্রকাশ না হয়। সুতরাং কার্য্য সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ করিবার জন্য উভয়েই বিশেষ উৎসুক। যত দিন নিকট হইতে লাগিল ততই উভয় পক্ষের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম হইতে রাজকার্য্য একরূপ স্থগিত রহিল। সকলেই বিবাহের আয়োজনে উন্মত্ত হইলেন অবশেষে সত্য সত্যই আষাঢ় মাস আসিল সত্য সত্যই বিবাহের দিন আসিল। ঘটকরাজ কটীতে উত্তরীয় বাঁধিয়া মস্তকের পঞ্চ শিখায় পঞ্চপুষ্প বাঁধিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। শুভ মুহূর্ত্তে রাজকুমার প্রভাকর পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিয়া বন্ধুবর্গ পরিবৃত হইয়া সহস্রাধিক বরযাত্রী সমভিব্যাহারে লইয়া মহানাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুবৃহৎ মনোহর রাজপ্রাঙ্গনে বহুমূল্য আস্তরণ পাতিয়া মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত বরাসনে, বর শ্রীপ্রভাকর শর্ম্মা উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে আলোক মালায় যেন তাঁহার প্রভা শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। রাজপুত্র এক এক বার ঈষৎ বামে বা দক্ষিণে হেলিতেছেন আর তাঁহার উষ্ণীষ হইতে অঙ্গুরী হইতে বলয় হইতে বস্ত্র হইতে যেন শত সহস্র তারকা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। উষ্ণীষের নিম্ন হইতে কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিতকেশ রাশি যেন গড়াইয়া গড়াইয়া স্কন্ধে পড়িতেছে। সুন্দর গৌরবর্ণ মুখ খানির চারিদিকে এই কৃষ্ণকেশ, এই বিষমতা, মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়াছে।

রাজপুত্রের নিকট তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুবর্গ, সকলেই সুবেশে সজ্জিত, সকলের কণ্ঠেই মাল্য দাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সভাস্থলে ন্যায়ের বিচারে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে গিয়া নিজে ন্যায় ও সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিতেছেন! এক পার্শ্বে জন কয়েক শান্তমূর্ত্তি বৌদ্ধ ভিক্ষু হরিদ্রাবর্ণের আচ্ছাদনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া তালবৃন্ত হস্তে লইয়া ধীরভাবে ন্যায়ের মীমাংসা শুনিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে মুণ্ডিত মস্তক আন্দোলন করিয়া কাহারও বাক্য সমর্থন করিতেছেন, কদাচিৎ দুই একটা কঠিন স্থানের মীমাংসা করিতেছেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত যাঁহার স্বপক্ষে কথা কহিতেছেন তিনি আনন্দে স্ফীত হইতেছেন আর যাঁহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতেছেন তিনি নাস্তিক, বেল্লিক বৌদ্ধ, পাষণ্ড ইত্যাদি ভদ্রজনোচিত সম্ভাষণে মীমাংসার সুগম পথ অবলম্বন করিতেছেন। সভার এক প্রান্তে কয়েকটি গায়ক একজন শ্রেষ্ঠ গায়ককে ঘিরিয়া উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার তানপুরার সহিত কণ্ঠস্বর এবং মস্তক সঞ্চালনের সহিত বিকট অঙ্গভঙ্গীর শোভা সন্দর্শন করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছেন।

যথালগ্নে পাত্রী পাত্রস্থ করা হইল। সকলে বলিলেন যেন রাম সীতার মিলন হইল, কিন্তু আলঙ্কারিকেরা আপত্তি করিলেন যে গৌর বর্ণ নায়ক নবদুর্ব্বাদল শ্রীরামের সহিত কি

প্রকারে তুলনীয় হইতে পারেন ? ইহা লক্ষণ উর্ম্মিলার মিলন হইয়াছে ! সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন।

অবশেষে ব্রাহ্মণেরা দধি, লাড্ডু, খই, শর্করা ক্ষীর এবং কদলি আম্র পনস প্রভৃতি ফল মূলের যথা বিধানে সংকার করিলেন। বৌদ্ধ ও শূদ্রেরা চিপিটক পিষ্টক প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং নানাবিধ ফল মূল উদরসাৎ করিলেন। বেশ সুশৃঙ্খলে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বর বাসরে নীত হইলেন আমারাও সাত বৎসরের জন্য পাঠক পাঠিকাকে বিশ্রাম লাভ করিতে অবসর দিলাম।

(৬)

৭ বৎসর অতীত হইয়াছে সেই শুভ বিবাহের পর হইতে সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল সাগরে বিলীন হইয়াছে। এখন প্রভাকর আর ১৫ বৎসরের বালক নহেন দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক। নলিনী আর ৯ বৎসরের বালিকা নাই ষোড়শী যুবতী। উভয়ের রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

এই সাত বৎসরের মধ্যে অনেক ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। আমাদের নায়ক এখন আর রাজকুমার নহেন এখন স্বয়ং রাজা, কারণ প্রায় ৩ বৎসর হইল রাজা দিবাকর শর্ম্মার লোকান্তর হইয়াছে। এই সাত বৎসরের মধ্যে মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধের সংখ্যা পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণ। মধ্যাহ্নে খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রৌদ্রে বিদীর্ণ-প্রায় শুষ্ক ভূমিতে প্রায় হস্তাধিক পরিমাণে জল জমিয়াছে। মহানাদের অধিকাংশ পথেই প্রায় এক হাঁটু জল। এখনও আকাশ অন্ধকার হইয়া আছে তবে আপাততঃ বৃষ্টি পড়ে নাই। চতুর্দ্দিকের জলাশয়ে অসংখ্য ভেক অনন্ত চীৎকার করিয়া পর্জ্জন্য দেবের স্তুতি করিতেছে। রাজার ভাগিনেয় বিক্রম শর্ম্মা, রাজবাটীর সম্মুখে বৃহৎ পুষ্করিনীর বাঁধা ঘাটে দাঁড়াইয়া জলের প্রতি চাহিয়া আছেন। এখনও সগর্জ্জনে জলরাশি আসিয়া পুষ্করিনীর জলে পড়িয়া জলকে আবিল করিতেছে। জলের উপর শ্বেত বর্ণের ফেণ রাশি ভাসিয়া বেড়াইতেছে এমন সময় বিক্রম দেখিলেন দূরে রাজপথে একজন লোক বৃহৎ অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজবাটী অভিমুখে আসিতেছেন। অশ্বারোহীর সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত, স্থানে স্থানে সেই কর্দ্দমের ভিতর দিয়া গাত্রবস্ত্রের স্বর্ণকার্য্য চিকমিক করিতেছে। বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব জলসিক্ত হইয়া যেন নিকষা পাষান নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইতেছে। অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল ঝরিতেছে।

অশ্বারোহী বিক্রম শর্ম্মার নিকটস্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিক্রমকে অভিবাদন করিলেন। বিক্রম সহাস্যে কহিলেন

"কে'ও প্রভাকর ? ভাই আমি চিনিতে পারি নাই ক্ষমা করিও। আমি তোমার

আকৃতি দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম বুঝি সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া স্থলে না পড়িয়া জলে পড়িয়া কাদা মাখিয়াছ।”

প্রভাকর এ পরিহাসে কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি অন্য সময়ে হয়ত বিরক্ত হইতেন না কিন্তু এখন বয়োজ্যেষ্ঠ শ্যালকের নিকট হইতে পতন জন্য সহানুভূতি না পাইয়া বড় বিরক্ত হইলেন। বলিলেন—“আপনি সকলি বলিতে পারেন। যখন ভগ্নী দিয়াছেন তখন আমায় বানর কেন যাহা বলিবেন তাহাতেই সম্মত আছি। যাহাই হইনা কেন আপনাকেও ভগ্নী-পতি বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে।”

বিক্রম সহাস্যে বলিলেন—“রাগ করিলে নাকি? আমি তামাসা করিয়া বলিয়াছিলাম; চল বস্ত্র ত্যাগ করিবে চল, কেমন করিয়া কোথায় পড়িলে! আঘাত লাগেনাইত?”
“না লাগেনাই। যে পথ! তাহাতে আবার অকস্মাৎ বৃষ্টি আসিল, মাঠের মাঝ খানে বৃষ্টি তাই কোথাও দাঁড়াইতে স্থান পাইলাম না।”

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজার বসিবার প্রকোষ্ঠের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে বিক্রম বলিলেন।

“পথের নিন্দা কর কেন ভাই? তোমার দেশের পথ কি এই মহানাদ অপেক্ষা ভাল?”

“আমাদের ত্রিবেণীর পথ আপনার মহানাদের পথ অপেক্ষা ভাল নহে বটে কিন্তু আমার পিতা হইলে নিজের বাটী হইতে এ পর্য্যন্ত আগাগোড়া পথ বাঁধাইয়া জামাতাকে লইয়া যাইতেন।”

প্রকোষ্ঠ মধ্যে রাজা পুরন্দর শর্ম্মা বাতায়নে দাঁড়াইয়া আকাশের ভীমকান্তি দর্শন করিতেছিলেন। রাজাকে কেহ দেখিতে পান নাই কিন্তু জামাতার গর্ব্বিত বাক্য রাজার কাণে গেল; তিনি কিছু বলিলেন না কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি যেন অগ্নিদেবের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমাত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমাত্য আসিয়া দেখিলেন রাজার মূর্ত্তি অতিশয় ক্রোধ-ব্যঞ্জক কিন্তু রাজা সে ক্রোধ সম্যক দমন করিয়াছেন। মন্ত্রী আসিবামাত্র রাজা কহিলেন

“এই মুহূর্ত্ত হইতে যত শীঘ্র পার ত্রিবেণী পর্য্যন্ত এক পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। কোন আপত্তি কোন বাধা শুনিবনা যত অর্থ ব্যয় হয় হোক, কিন্তু তিনদিনের মধ্যে পথ প্রস্তুত করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে হয় ভাল”

মন্ত্রী কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না কয়েক দণ্ড মধ্যে গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল শত সহস্র লোক কোদালি লইয়া পূর্ব্ব দিকের মাঠে ধাবিত হইতেছে। অর্দ্ধেক রাত্রে সকলে শুনিল যে তিন দিনের মধ্যে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত করিতে হইবে রাজার আদেশ।

সুতরাং বিক্রম শর্ম্মাও এ কথা শুনিলেন। তিনি রাজার এরূপ অসম্ভব আবদার শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর মস্তকে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন;

বুঝিতে পারিলেন যে রাজপ্রকোষ্ঠের নিকট দিয়া যাইবার সময় প্রভাকর যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা রাজার কর্ণগোচর হইয়াছে তাই বোধ হয় তিনি এ পথ নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন, বিক্রম রাজাকে চিনিতেন তিনি বুঝিলেন যে এই পথ নির্ম্মাণে কাহারও না কাহাও সর্ব্বনাশ হইবে।

পরদিন অপরাহ্নে মন্ত্রী আসিয়া সম্বাদ দিলেন পথ প্রস্তুত প্রায়। রাজা শুনিয়া অবিলম্বে বিক্রমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বিক্রম সমস্ত দিন প্রায় রাজার নিকটেই ছিলেন কিন্তু ঘুণাক্ষরে রাজার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইলনা। বিক্রম আসিলে রাজা বিনা আড়ম্বরে একেবারে স্পষ্ট স্বরে বলিলেন :—

"সকলে আমার কথা শ্রবণ কর। আমার জামাতা প্রভাকর কোন বিষয়ে আমাকে তাচ্ছিল্য করিয়াছেন। আমি স্বকর্ণে—সে কথা শুনিয়াছি এবং বিক্রমের সে কথা অবিদিত নাই। আমি আজ তাহার প্রতিশোধ লইব। আজ চন্দ্র অস্ত যাইবা মাত্র আমি নিজ হস্তে আমার জামাতাকে এই নব নির্ম্মিত পথে বিনাশ করিব। কাহারও অনুরোধ উপরোধ মানিব না অনেক ভাবিয়া আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তবে আমি এই পর্য্যন্ত কৃপা করিতে পারি যে আমি আমার জামাতার নিকট হইতে শত পদ পশ্চাতে থাকিব ইহাতে যাহা হয় হউক।"

রাজা এই কথা বলিয়াই সহসা কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। কাহারও কোন কথা শুনিতে অপেক্ষা করিলেন না। প্রভাকর তখন ছাদের উপর নলিনীর নিকট বসিয়া অস্ত গমনোন্মুখ শশাঙ্কের প্রতি চাহিয়া আছেন।

রাজা যখন নিজের অভিমত ব্যক্ত করিলেন তখন চন্দ্র অস্ত যাইতে আর অল্পই বিলম্ব আছে। বিক্রম উন্মাদের ন্যায় প্রভাকরের নিকট ছুটিলেন ভগ্নীকে অপসৃত হইতে দিবার পূর্ব্বেই বলিলেন।

"ভাই পলাও যত শীঘ্র পার এই তরবারী লও সর্ব্বনাশ উপস্থিত যত শীঘ্র পার আর সময়—নাই।"

এই বলিয়া সংক্ষেপে, অতি সংক্ষেপে রাজার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন। নলিনী শুনিয়া একটি অব্যক্ত ধ্বনিমাত্র উচ্চারণ করিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত হইলেন! প্রভাকর পথ নির্ম্মাণের কথা শুনিয়াছিলেন এক্ষণে রাজার এই পৈশাচিক কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন :—

"দিবাকর শর্ম্মার পুত্র প্রভাকর শর্ম্মা পলায়ন করিতে জানেন না। রাজা আমার নলিনীর পিতা আমারও পিতা তাঁহার আদেশ পালন করিব। পিতৃ হত্যা করিতে নাই নচেৎ তাঁহাকে আজ শিক্ষা দিতাম যাহা হউক রাজার শত পদ অগ্রে থাকিয়া রাজার

আদেশে তাঁহার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিব। চোরের ন্যায় গৃহস্বামীর অজ্ঞাতে পলায়ন করিব না আমাদের বংশে কেহ পলায়ন করেন নাই।"

এই বলিয়া প্রভাকর মূর্চ্ছিতা নলিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিক্রমকে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে অনুরোধ করিয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

রাজবাটীর সম্মুখে লোকে লোকারণ্য। প্রভাকর স্বীয় সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ আরবী তুরগে আরোহণ করিয়া রাজবাটীর দ্বার হইতে প্রায় শতাধিক পদ দূরে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মুখে ভয় বা চিন্তার নাম মাত্র নাই মধ্যে মধ্যে উৎসুক নয়নে অস্তগামী চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে রাজবাটীর দ্বারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

চন্দ্রদেব ধীরে ধীরে পশ্চিম গগণ প্রান্তে দিগন্তে ঢলিয়া পড়িলেন। এত বড় জনতা কিন্তু কাহারও মুখে শব্দ নাই সকলে নীরব, সকলে বিস্মিত, সকলে স্তম্ভিত। এমন সময় রাজা সুন্দর শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজবাটী হইতে নিক্রান্ত হইয়া কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই উচ্চস্বরে আপনার পূর্ব্ব আদেশ জ্ঞাপন করিয়াই উন্মুক্ত অসি হস্তে জামাতার প্রতি, ধাবমান হইলেন। প্রভাকর পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন তিনি কেবল বলিলেন

"প্রভাকর শর্ম্মা স্ত্রীলোক নহেন। কি বলিব আপনি গুরুলোক!"

কথা শেষ হইতে না হইতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল নক্ষত্র বেগে উভয় অশ্ব পূর্ব্বমুখে ছুটিতেছে। অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে অশ্ব আর দেখা গেল না কেবল অশ্বের পদধ্বনি শ্রবণ করা যাইতেছে। যখন অশ্বদ্বয় নয়ন পথ ও শ্রবণ পথেরও অতীত হইল তখন জনতা মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বিক্রম, অমাত্য, সেনাপতি এবং—অন্যান্য রাজ পরিবার বর্গ ও প্রজাবর্গ অশ্বারোহণে রাজাকে অনুগমন করিলেন। রাজঅন্তঃপুর-ক্রন্দনরোলে গগণ বিদীর্ণ করিল। এমন সময় ঘনকৃষ্ণ মেঘ ধীরে ধীরে পশ্চিম গগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিল। নরকের অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার, শ্বশুরের এই পৈশাচিক ব্যবহার যেন নরচক্ষু অন্তরালে সম্পন্ন করাইবার জন্যই সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিল; সংজ্ঞাহীনা নলিনী ছাদের উপর পড়িয়া ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ভয়ে নয়ন মুদিলেন। হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন সেখানেও তাই।

* * * * * *

ত্রিবেণীর প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে, ত্রিবেণীরাজ্যের সীমার মধ্যে, প্রভাকর শ্বশুর নির্ম্মিত নব-বর্ত্মে অশ্বচালনা করিতে করিতে পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না কেবল শব্দে বোধ হইল যে যেন শ্বশুরের অশ্ব নিতান্ত নিকট বর্ত্তী হইয়াছে। প্রাণপণে অশ্ব চালনা করিলেন। ক্ষণ পরে আবার পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন এমন সময় বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলেন উত্তোলিত কৃপাণ হস্তে তাঁহার পিতৃতুল্য

শ্বশুর তাঁহার নলিনীর পিতা তাঁহার পশ্চাতে; ৮।১০ পদ মাত্র মধ্যে ব্যবধান। প্রভাকর অকস্মাৎ স্বীয় তরবারীতে হস্তার্পণ করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্ত আকাশে উঠাইয়া বলিলেন "আমি যদি সতী পুত্র হই তবে আর যেন তোমাকে অগ্রসর হইতে না হয়।"

পৃথিবী কাঁপাইয়া অনন্ত গর্জ্জনে বজ্রপাত হইল। প্রভাকরের অশ্ব চমকিত হইয়া সম্মুখে অমিত বলে লম্ফ প্রদান করিল। অল্পক্ষণ পরেই ত্রিবেণীরাজ অক্ষত শরীরে স্বীয় প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। নলিনী তখনও ছাদে অজ্ঞান অবস্থায় শায়িত।

পর দিন অতি প্রত্যূষে, অন্ধকার থাকিতে থাকিতে প্রভাকর আবার সেই পথে অশ্ব চালনা করিয়া মহানাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেখিতে পাইলেন একস্থানে নব নির্ম্মিত পথ বৃষ্টির জলে বাঁধন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এ দিকে পথ ও দিকে পথ মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাত পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পর পারে কতকগুলি লোক যেন কি দেখিতেছে। আলোক কিঞ্চিৎ স্পষ্ট হইলে তিনি দেখিলেন যে পরপারে বিক্রম ও অন্যান্য রাজপরিজন যেন এই ভাঙ্গনে নামিবার উপক্রম করিতেছেন। তাঁহারা প্রভাকরকে দেখিয়া আনন্দে হরিধ্বনি দিয়া উঠিলেন। উভয়দিক হইতেই সকলে ধীরে ধীরে ভাঙ্গন মধ্যে নামিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রভাকর বিক্রমের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বিক্রম ভগ্নীপতিকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। সকলেই প্রভাকরকে সম্বর্দ্ধনা করিল। কিন্তু রাজা কোথায়? প্রভাকর বলিলেন রাজা কোথায়? এতক্ষণ কেহ রাজার কথা ভাবেন নাই সকলে প্রভাকরের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়াছিলেন। এখন প্রভাকরের কথায় সকলেই চমকিত হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময় একজন সেনানী দেখিতে পাইলেন যেখানে প্রভাকর দাঁড়াইয়া আছেন ঠিক তাহার পদতলে একটি প্রথিতাবশেষ অশ্বের কর্দ্দমাক্ত পদ বাহির হইয়া রহিয়াছে। সকলে অবিলম্বে মাটি সরাইতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় হইলে অনেকটা মাটি সরান হইল। অবশেষে সকলে দেখিলেন যে অশ্বের উদরের নিম্নে, অসিহস্তে মহারাজ পুরন্দর শর্ম্মা মহানিদ্রায় নিদ্রিত। ভাঙ্গনের মাটি পড়িয়া তাঁহার অভিমান গর্ব্ব ক্রোধ তেজ একটি নিঃশ্বাসের সহিত পেষণ করিয়া দিয়াছে।

যে স্থানে এই রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল আজিও লোকে সেই স্থানকে 'ছিনে আকনা' বলে। উক্ত স্থান মগরা ষ্টেষন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে। আর যে রাস্তা, পুরন্দর জামাতার প্রাণনাশের জন্য প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন আজিও সেই প্রাচীন পথ বিদ্যমান আছে। তাহার বর্ত্তমান নাম "জামাই জাঙ্গাল"

বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বেঙ্গল প্রভিন্সাল রেলওয়ে ঐ জাঙ্গালের নিকট দিয়া দিয়া অনেকটা আসিয়াছে। এখনও জাঙ্গাল ও উহার উপরে বৃক্ষশ্রেণী দেখিলে উহাকে প্রাচীন রাজপথ বলিয়া বোধ হয়। জাঙ্গালটি মহানাদ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্তই বিস্তৃত।

মীরকাসিম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মূল্য-নিরূপণ।

Admitted to the deliberations of the English Councillors, Mir Kasim, feeling his way carefully, soon came to the conclusion, that *there was not one amongst them who could not be bought.* His father-in-law had bought their predecessors, he would ascertain their price and buy them.——Col. Malleson.

বাঙ্গালীর চরিত্রহীনতার ছিদ্রলাভ করিয়া বৃটীশ বণিক তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণায় মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলার পরাজয় সাধন করিবামাত্র, চারিদিক হইতে বঙ্গভূমির উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল,—ফরাসিবণিক প্রতিহিংসা-তাড়িতহৃদয়ে ইংরাজের সর্ব্বনাশ সাধনের ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, শাহাজাদা পিতৃসিংহাসন-তাড়িত অশান্ত অন্তঃকরণে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার সুবাদারী হস্তগত করিবার জন্য সেনাসংগ্রহে উন্মত্ত হইয়াছিলেন; মারহাট্টা অশ্বসেনা পুনরায় বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গভূমি বিপর্য্যস্ত করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিল। বৃটীশ বণিক মীরজাফরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ সঙ্গিনস্কন্ধে যুদ্ধশিবিরে বিনিদ্র নয়নে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের কর্ম্মচারীবর্গ কোম্পানীর বাণিজ্যব্যবসায়ে শিথিলযত্ন হইয়া আত্মোদর পূর্ণ করিবার জন্য সওদাগারি করিতে লালায়িত, মীরজাফরকে করতলগত রাখিয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার অদৃষ্ট-নির্ণয় ব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তৃপদে আরূঢ় হইবার জন্য ক্লাইব নানাস্থানে দুর্গনির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর। এইরূপ অবস্থার সন্ধান পাইয়া বিলাতের বণিক-সমিতি শিহরিয়া উঠিলেন;—তাঁহাদের মূলধন যে এইরূপে ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গমূলে ভূগর্ভ নিহিত হয়, ইহা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে!* তাঁহারা ক্লাইবকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা বাণিজ্যাধিকারের জন্য ব্যাকুল হইলে কি হইবে? তাঁহারা বহুশত যোজন ব্যবধানে থাকিয়া বঙ্গীয় ইংরাজদরবারের কার্য্যপ্রবাহের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন না;—কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গ রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য লালায়িত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ স্নেহ প্রদর্শন করিলেন না।

এই অভিনব নীতি পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী অশুভ ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। হলওয়েল যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, কোম্পানীর তহবিলে তখন টঙ্কার টানাটানি। তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে ধনকুবের জগৎশেঠের নিকট ঋণগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন,

* Long's Selections from the Records of the Government of India, vol. I.

এবং তাহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়া ভবিষ্যতে শেঠবংশের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে ত্রুটি করিলেন না।* এই সময়ে ইংরাজদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা এরূপ সংকটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, মীরকাসিম বুঝিলেন—ইহাই সুসময়!

প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লবেই শত্রু মিত্র সকল লোকের দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার মূল কি তাহা ইংরাজেরা বুঝিয়াছিলেন; ইংরাজের দুর্ব্বলতার মূল কি তাহা বাঙ্গালীদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে কাহারও কোনরূপ ইতস্ততের কারণ রহিল না;—ইংরাজ বাঙ্গালী, উভয়েই স্বার্থের সিংহাসনতলে দয়া ধর্ম্ম বলিদান করিয়া পূর্ব্ব কথা, ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা, গুপ্তসন্ধিপত্র, স্বাভাবিক স্নেহবন্ধন,—সর্ব্বপ্রকার অন্তরায় অন্তঃকরণ হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মীরজাফরের বিরুদ্ধে চক্রান্তজাল বিস্তৃত হইল। কি কৌশলে মীরজাফরের সিংহাসনে মীর কাসিম উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহার আমূল বিবরণ সবিশেষ কৌতুকাবহ। মীরকাসিম ইংরাজদিগকে বিশ্বাস করিতেন না; তিনিও সিরাজদ্দৌলার ন্যায় ইংরাজদিগকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা, তিনি হৃদয়বেগে অধীর হইয়া বাল্যজীবনেই ইংরাজ বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মীরকাসিম একজন রাজকর্ম্মচারী মাত্র,—সুতরাং তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ বিরাগের পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইংরাজেরা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন; তিনিও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরাজদিগের মতিভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাই মীরকাসিমের পদোন্নতির প্রথম সোপান।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী কর্ণেল ক্লাইব বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে কর্ণেল কেলড্ সেনাপতি এবং হলওয়েল গভর্ণর পদে আরোহণ করেন। ৫ই মে তারিখে গভর্ণর হলওয়েল সেনাপতি কেলড্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন:—

মীরকাসিমের জন্য কর্ণেল ক্লাইব যে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন, সে কথা এখানেই নিবেদন করিতেছি; এ সম্বন্ধে নবাবকেও পত্র লিখিয়াছি। আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে তাহাতে রাজা রামনারায়ণের প্রভুভক্তি এবং কার্য্যদক্ষতায় সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখা যাইতেছে; নবাব হয়ত শীঘ্রই তাঁহাকে এবং তাঁহার নিম্নস্থ রাজ পুরুষগণকে পদচ্যুত করিবেন। আমার সঙ্গে এবিষয়ে আপনার মত পার্থক্য না থাকিলে, আপনি কাসিম আলির পদোন্নতির চেষ্টা করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।†

সুচতুর মীর কাসিম বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজেরা শীঘ্রই মীরজাফরকে পদচ্যুত করিবেন;—হয়ত অন্য কেহ নবাব হইবেন, না হয় শাহাজাদাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া তাঁহার ফরমানের দোহাই দিয়া ইংরাজেরাই নবাবী করিবেন। ইহা কাসিমআলির

---

* A time may come, when they may stand in need of the Company's protection, in which case they may he assured *they shall be left to Satan* to be buffeted.—Letter from J. Z. Holwell to Mr. Warren Hastings, dated Fort William May 8, 1760.

† Letter from J. Z. Holwell to Col. John Cailland, dated Calcutta, may 5, 1760.

নিকট প্রীতিকর বোধ হইল না; তিনি যে কোন উপায়ে ইহার গতিরোধ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে পাটনার নবাবী হস্তগত করিতে পারিলে তৎপক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইবার কথা; কাসিম আলি প্রথমতঃ তজ্জন্যই হলওয়েলের শরণাগত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে সহসা ইংরাজদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য মীরজাফরকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব উঠিবামাত্র কাসিম আলির গুপ্তসঙ্কল্প প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি হলওয়েলের মূল্য নির্ণয় করিয়াছিলেন; সুতরাং হলওয়েলের যোগে মীরজাফরকে পদচ্যুত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। হলওয়েল এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে সেনাপতি কেলড্‌কে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্য সুদীর্ঘ ভূমিকাপূর্ণ পত্রে তাঁহার মত সংগ্রহের চেষ্টায় লিখিলেনঃ—

"অন্ততঃ দুই দিনের জন্য একবার কলিকাতায় আসুন। আপনার সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরামর্শের আবশ্যক। শাহজাদা ন্যায়ানুমোদিত সম্রাট, এ দেশ তাঁহারই। অথচ তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছি। কাহার জন্য—মীরজাফর? তাঁহার শাসননীতি যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আপনার প্রথম আক্ষেপোক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি। আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন—'মীরজাফরের শাসননীতির আদ্যন্ত সমস্তই জরাজীর্ণ।' তাঁহার অধঃপতন, তাঁহার বংশের অধঃপতন অনিবার্য্য!' তাঁহার সহায়তা করিয়া কি হইবে?" *

হলওয়েলের উদ্দেশ্য, সিদ্ধ হইল না। কেলড সম্প্রতি বিলাত হইতে শুভাগমন করিয়াছেন। হলওয়েলের পত্রে যে সকল যুক্তিজাল বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বিবেচনায় যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। তিনি সরলভাবের পত্র মনে করিয়া সরলভাবেই নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইলেন:—

আপনার ২৪শে তারিখের পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আমার কলিকাতা গমনের প্রয়োজন কি? আমরা এক্ষণে যাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছি তিনি মন্দ লোক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা ভাল লোক কোথায় পাইবেন? সে জন্য চেষ্টা করিতে হইলে হয়ত আরও কত বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইবে। দেশে শান্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেই আমাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আমরা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটন করিয়া পুনরায় অশান্তি আনয়ন করিব কেন? অশান্তি আনয়ন না করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটন করা অসম্ভব। যদি রাষ্ট্রবিপ্লব আপনাপনি সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হয়, তখন আমরা নির্ব্বিবাদে তাহা দর্শন করিলেও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। কিন্তু একজনকে পদচ্যুত করিয়া আর একজনকে মসনদে বসাইয়া দিয়া লাভ কি? যাঁহাকে সিংহাসনে বসাইব, তিনি হয়ত এইরূপই অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তা হইবেন,

* The more we see of this Government, the more is verified your just observation at your first knowlege of it, that it is rotten to the core: what then can be expected from a system rotten to the very heart of it, in every sense.—Ruin must attend the family, inspite of our efforts to save them; and we must as assuredly be partakers in a greater or less degree thereof,—to say nothing of our drawing our sword in support of such a system, against the legal though unfotunate Prince of the country.—Extract from a letter from J. Z. Holwell to Col. John Cailland, dated Fort William, 24th may, 1760.

হয়ত তিনিও এইরূপ কুক্রিয়াসক্ত হইবেন, কিন্তু হয়ত তিনি মীরজাফরের ন্যায় নির্ব্বোধ এবং কাপুরুষ না হইলে তাঁহাকে ইচ্ছানুসারে চালিত করা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে। মীরজাফরই যে ওলন্দাজদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা কখনও নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হয় নাই। আর মীরজাফরকে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলেই বা কি ? তাঁহাকে আমাদের ইচ্ছামত চালিত করিবার আয়োজন করিলেইত হইল। শাহজাদার জন্য আমিও নিতান্ত ব্যথিত। কিন্তু এ সকল মুহূর্ত্তে সুসম্পন্ন করিবার মত প্রস্তাব নহে। মারহাট্টা এবং জাঠেরা অযোধ্যার উজীরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; আব্দালী রণজয় করিয়াও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিতেছে না। আমার বোধ হয় পাঠানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইতে হইবে!"

এই পর্য্যন্ত লিখিবার পরেই হলওয়েল লিখিত আর একখানি পত্র হস্তগত হইয়া সেনাপতির সকল ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল। সে পত্রখানির আর সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্ণেল কেল্ড তৎসম্বন্ধে এইমাত্র লিখিলেন :—

"এই মাত্র আপনার ২৫ শে তারিখের পত্র হস্তগত হইল। আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুসারে কার্য্য করিতে আপত্তি নাই,—হেষ্টিংস একবার বৃদ্ধ নবাবকে বুঝাইয়া দেখুন আমি ছোট নবাবের সঙ্গে কথা পাড়িয়া দেখিব। কিন্তু দেখুন,—সম্প্রতি আমরা পাটনা পর্য্যন্ত গমন করি; বর্ষাকালে ধীরে সুস্থে পরামর্শ স্থির করিয়া নিরাপদ পন্থায় গমন করিলেই হইবে। তখন আমরা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিব;—যাহাতে আমাদের গৌরব নষ্ট না হয়, আমাদের দেশের এবং আমাদের নিয়োগকর্ত্তৃগণের সুবিধা হয়, এমন উপায় অবলম্বন করাই সঙ্গত। কিন্তু—মীরজাফরকে যেন ভাসাইয়া দেওয়া না হয়! *

(1) Bad as the man may be, whose cause we now support, I can not be of opinion that we ca[illegible]t rid of him for a better, without running the risk of much greater inconvenien[illegible] [illegible]g on such a change.

(2) [illegible] revolution can take place without a certainty of troubles.

(3) It [illegible]ver[illegible] may raise a man to the dignity, just as unfit to govern, as little to be depen[illegible] in short, as great a rogue as our Nabob ; but perhaps not so great a co[illegible] great a fool and of consequence much more difficult to manage.

(4) As to his breach of his treaty, by introducing the Dutch last year, that was never so clearly proved, I believe, but as to admit of some doubt.

(5) We may continue our march on to Patna. -The rains will give us time to negotiate, to see we go on sure grounds, and make such a plan of the alliance, as will do us honor, and be an advantage to our country and our employers .—but let us not abandon the Nabob.

Extracts from the letter from John Cailland, to The Hon'ble J. Z. Holwell Esq., President and Governor of Fort William, dated Camp at Balkissen's Gardens, 29th May, 1760.

* এই সুদীর্ঘ পত্র অংশতঃ অনুবাদিত এবং অংশতঃ উদ্ধৃত হইল। মূল পত্র India Tracts এবং First Report, 1772 উভয় গ্রন্থেই নিবিষ্ট রহিয়াছে।—

যুবরাজ মীরণ বৈদ্য রাজা রাজবল্লভকে দেওয়ানী পদে বরণ করিয়াছিলেন। কায়স্থ রাজবল্লভ ও তাঁহার পিতা মহারাজা দুর্ল্লভরাম মীরজাফরের অধঃপতন সাধনের চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, ক্লাইবের কৃপায় কলিকাতায় পলায়ন করিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে সহসা মীরণের মৃত্যু হইল; রাজবল্লভ পাটনার নবাব হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্ল্লভরাম অবসর বুঝিয়া শাহাজাদার ফরমান আনাইয়া ইংরাজদিগকে দেওয়ানী দিয়া স্বয়ং সেনানায়ক হইবার মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। ভান্সিটার্ট যখন কলিকাতার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তৎকালে এই সকল তুমুল কোলাহলে তাঁহার ন্যায় নূতন লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিল। অগত্যা হলওয়েলই এ সকল বিষয়ের মূলাধার হইয়া পড়িলেন। মীর কাসিম হলওয়েলের শরণাগত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির আয়োজন করিতে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি ভান্সিটার্টকেও লিখিলেন, কিন্তু হলওয়েলকে মনের কথা খুলিয়া লিখিলেন।*

সংকল্প সিদ্ধির জন্য কাসিম আলির কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন; তিনি কিরূপে কলিকাতায় গমন করিবেন তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া হলওয়েল এবং ভান্সিটার্টকেই লিখিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা, "সাময়িক পরামর্শের জন্য কাশিমআলির কলিকাতায় আসা আবশ্যক"—এই মর্ম্মে নবাবকে অনুরোধ জানাইবা মাত্র নির্ব্বোধ মীরজাফর সহর্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন! †

কাসিম আলি কলিকাতায় আসিলেন; কর্ণেল কেল্ড কলিকাতায় আসিলেন; ইংরাজ দরবারের কর্ত্তব্য নির্ণয়ার্থ হলওয়েল এক সুদীর্ঘ মন্তব্যলিপি প্রস্তুত করিলেন; খোজা পিদ্রুঁর সঙ্গে মীর কাসিমের সৌহার্দ্দ্য থাকায় হলওয়েল তাঁহাকে কোম্পানীর পক্ষে মধ্যবর্ত্তী নিয়োগ করিলেন;—কাসিমআলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হলওয়েল সকল কথাই একরূপ মোটামুটী মীমাংসা করিয়া লইলেন,—তাহার পর দরবার বসিল! ‡

* At this period Mr. Holwell received frequent letters from Mir Cossim Ally Khan, containing the strongest professions and assurances in favor of the company, if, by our support; he was promoted to the succession of the Dowanee, and other posts enjoyed by the late chuta Nabob, his brother-in-Law. These letters were duly communicated to Mr. Vansittart, to whom he likewise wrote, but with more reserve.—India Tracts, p. 88.

† These matters being debated in committee, it was judged eligible to obtain permission for Kasim Ali Khan's paying a visit to Calcutta, a circumstance, he himself intimated in a letter to the Governor and Mr. Holwell, the times gave good pretence for it. * * * * To gain this point, the Governor and Mr. Holwell wrote to the Suba with good success.—India Tracts, p. 89.

‡ Mr. Holwell being well apprized that Coja petruse (to whom the company owed much in the last revolution, but much more in this) had the greatest weight with, and influence with Cossim Aly Khan, had secured him on the side of the Company, and at a private interview with him, at Mr Holwell's garden, * * * Mr. Holwell formed a rough plan of the terms which must be insisted on for the Company.—India Tracts, p. 89

এই দরবারের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ; কি কৌশলে প্রধান প্রধান সদস্যদের মত পার্থক্য দূর হইয়া গেল তাহার রহস্য কিন্তু ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ইংরাজ দরবারে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে :—

Fort William Sep. 15th. 1760.

At a Select Commitee

Present

The Hon'ble Henry Vansittart, Esq., President.

Colonel Cailland.

Wm. Brightwell Sumner

J. Zephaniah Holwell

William Mac Guire Esqrs.

Ressolved unanimously, that the entering into an alliance with the Prince is a necessity and expedient measure. The President is accordingly desired to press Cassim Aly Khan on the subject of our expenses and our great distress for money, so as to draw from him some proposal of means for removing those difficullties, by which probaly we may be able to form a judgement, whether he might not be brought to join in this negotiation, and in procuring the Nabob's consent.*

এই মন্তব্যলিপির মর্ম্মানুসারে ১৫ সেপ্টেম্বরের রজনীতে ভান্সিটার্ট কাশিম আলির সহিত শুভ পরামর্শে মিলিত হইলেন; এবং হলওয়েল দুর্ল্লভরামের সঙ্গে গুপ্ত সন্দর্শন সমাধা করিলেন। এই উভয় গুপ্ত সন্দর্শন শেষ হইলে, শাহজাদার পক্ষাবলম্বন করা ঘটিয়া উঠিল না ; কলিকাতার দরবার মীরকাসিমের পক্ষাবলম্বন করাই স্থির করিলেন। মীর কাসিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সকলকেই যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণে সম্মত হইলেন, সন্ধিপত্র লিখিত হইল!

এই গুপ্ত সন্ধিপত্রের মর্ম্মানুসারে কোম্পানী বাহাদুরের জন্য যে সকল নূতন লাভের পথ পরিষ্কৃত হইল যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে। যাঁহারা মন্ত্রণার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন

* First Report, 1772. এই দরবারে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন না। যাঁহারা মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন না, হলওয়েল তাঁহাদিগকে ঘুণাক্ষরেও দরবারের কথা জানিতে দেন নাই। তজ্জন্য তাঁহারা উত্তরকালে বিলাতের অধ্যক্ষ সভার নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। মহাসভায় সাক্ষ্যদিবার সময়ে মেজর কর্ণাক বলিয়া গিয়াছেন, সকলে উপস্থিত থাকিলে কখনই এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় হইতে পারিত না!

উত্তরকালে তাঁহারা কে কিরূপ পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিলেন, এখানে কেবল-তাহারই তালিকা প্রদত্ত হইল :—

RESOLUTION IN FAVOR OF CASSIM, 1760

Mr. Sumner	...	...	£ 28000
„ Holwell	...	...	„ 30000
„ M'c Guire	...	...	„ 20625
„ Smith	..	...	„ 15354
Major York	...	..	„ 15354
General Cailland		...	„ 22916
M. Vausittart	...	...	„ 58333
Mr. M'c Guire 5000 G. Ms.			„ 8750

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুকুট-মোচন !

"A tool, a cipher in the hands of the foreigners for whom he had betrayed his master, Mir Ja'far was allowed to rule, never to govern : Well for him that he did not possess the power to dive into futurity and behold the representative of his name and office, an unhonored pensioner of the people he had called in to subdue his country !"—Col. Malleson.

মীরজাফরকে সিংহাসন দান করিয়া আবার সে সিংহাসন কাড়িয়া লওয়া হইল কেন? উত্তরকালে ইহার রহস্যোদ্‌ঘাটনের জন্য স্বয়ং হলওয়েল লিখিয়া গিয়াছেন, "মীরজাফর এবং তৎপুত্র মীরণের কথা তুলিও না ; তাহাদিগকে সিংহাসন দান না করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেই অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইত!" * ইংরাজেরা যে কি জন্য এই ন্যায়সঙ্গত কার্য্য সাধন না করিয়া মীরজাফরের পক্ষে ফাঁসিকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে রাজ সিংহাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিচিত নাই। স্বার্থ—স্বার্থ—স্বার্থ ; তাহার নিকট সকল কর্ত্তব্য ভাসিয়া গিয়াছিল ; তাই তাঁহারা সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনে মীরজাফরকে বসাইয়া ছিলেন ;—এখন আবার স্বার্থরক্ষার জন্যই আর একজনকে সিংহাসন দান করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। কর্ত্তব্য নির্ণয়েই যাহা কিছু ইতস্ততঃ, যাহা কিছু কালক্ষয়, যাহা কিছু গৃহকলহ ;—একবার কর্ত্তব্য নির্ণয় সম্পন্ন হইলে, ইংরাজের আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। সংকল্প সাধনের সময়ে সমস্ত গৃহকলহ শান্তিলাভ করে,—বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়া সহস্র বৃটন একাত্মা হইয়া আত্মকার্য্য উদ্ধার করিবার

* Meer Jaffier Aly khan, and his Son Miran, were more deserving a *halter* than a *Subahship* of Bengal.—Holwell (India Tracts, p. 102)

জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই গুণে নথাগ্র গণনীয় বণিক সমিতি শতবাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল; এই গুণে তাহারা বঙ্গবিহার উড়িষ্যার রাজসিংহাসন বিক্রয় করিবার অধিকার লাভ করিল। মীরকাসিম সহাস্য মুখে মুরসিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, গভর্ণর ভান্সিটার্ট সসৈন্যে তাঁহার দুইদিন পরে কলিকাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

উত্তর কালে মীরজাফরের "মুকুট মোচনের" রহস্য নির্ণয় করিবার জন্য বিলাতের মহাসভা অনেক আড়ম্বর করিয়াছিলেন;* কলিকাতার ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও দুইদলে বিভক্ত হইয়া বাদানুবাদপূর্ণ পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিয়া সত্যোদ্‌ঘাটনের সহায়তা করিয়াছিলেন;† কিন্তু ভান্সিটার্ট যখন মুকুট মোচনের জন্য মুরশিদাবাদাভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন কেহ কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, মীরজাফরকে সিংহাসন চ্যুত করা আদৌ অভিপ্রেত ছিলনা;—শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য তাঁহার জামাতাকে মন্ত্রীত্ব পদ প্রদান করাই লক্ষ্য ছিল। এ কথা সত্য হইলে গভর্ণর সাহেব সসৈন্যে যাত্রা করিলেন কেন, এবং সন্ধিপত্রে সিংহাসনের কথা উল্লিখিত রহিল কেন, তাহা কিন্তু বুঝিতে পারা যায় না!

গভর্ণর ভান্সিটার্ট এবং সেনাপতি কেলড সসৈন্যে কাশিমবাজারের কুঠিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। ভান্সিটার্ট নূতন গভর্ণর, সুতরাং তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য মীরজাফর কাশিমবাজারে শুভাগমন করিলেন; কিন্তু প্রথম সন্দর্শনে ইংরাজ গভর্ণর গুপ্তসংকল্প দণ্ডস্ফুট করিলেন না। দ্বিতীয় সন্দর্শনে মীরজাফর জানিল যে তাঁহার শাসন শৈথিল্যের জন্য বাংলা বিহার উড়িষ্যা উৎসন্নে যাইতেছে, কার্য্যকুশল রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া সুশাসনের সহায়তা সাধনের জন্যই বন্ধুগণ শুভাগমন করিয়াছেন। তৃতীয় সন্দর্শনের পূর্ব্বেই প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মীরজাফর চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ইংরাজের "লালকুর্ত্তি,"—সেনা তরঙ্গের মধ্যে মীরকাসিমের পতাকা, এবং সম্মুখে গভর্ণরের পত্র,—বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তাঁহার কালপূর্ণ হইয়াছে! ‡ মীরজাফর একবার, বীরের ন্যায় অসিহস্তে আত্মরক্ষা করিতে বা তদর্থে দেহবিসর্জ্জন করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু পুত্রশোকার্ত্ত বৃদ্ধ অহিফেণাশক্ত অযোগ্য নরপতির গুপ্তসংকল্প মুহূর্ত্তেই আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সেই ইংরাজ—সেই আত্মীয়—সেই কুটীল কৌশল—সেই রাজপ্রসাদে! মীরজাফর শিহরিয়া উঠিলেন * জীবনের মমতা জাগিয়া উঠিল, সিরাজদ্দৌলার কথা স্মৃতিপটে উজ্জ্বল

* First Report 1772

† Vansittsrts' Memorial; Letter from certain gentlemen of the Council at Bengal, Holwell's Refutation of the same, etc. etc.

‡ A glance from the window of his palce shewd him the red-coated English soldiers rallying round the standard of his Kinsman in revolt against him.—Malleson's Decisive Battles of India, p. 140.

হইল, আত্মাপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য বিধাতার ন্যায়দণ্ড না জানি ভবিষ্যতের তিমির গর্ভে আরও কত কি লুকাইয়া রাখিয়াছে! * মীরজাফর আর সাহস করিয়া ফিরিঙ্গীর গতিরোধ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে মুকুট মোচন করিয়া সিংহদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন!† এই স্থানে গভর্ণরের সঙ্গে তাঁহার তৃতীয় সন্দর্শন সমাপ্ত হইল!‡

মুরশিদাবাদের রাজ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মীরজাফর কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া পরবর্ত্তী যুগের ইংরাজ ইতিহাস লেখক লিখিয়া রাখিয়াছেন:—"এই প্রভাতে মীরজাফর হয়ত পলাশীর কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়াছিলেন। পলাশিক্ষেত্রে তাঁহার স্নেহভাজন তরুণ নরপতি যেরূপ সকরুণ আবেদনে মুকুট রক্ষার্থ উত্তেজনা করিয়াছিলেন, সে দিন সে কথায় কর্ণপাত করিয়া রাজভক্তি প্রকাশ করিলে আজ হয়ত মীরজাফর বঙ্গবিহার উড়িষ্যার উদ্ধার কর্ত্তা "সিপাহি সালার" বলিয়া কত সমাদরে স্বদেশে পদগৌরব বিস্তার করিতে পারিতেন; তাঁহার স্বদেশের দশাও এমন হইত না!" §

সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া মীরজাফর এসকল কথা ভাবিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আজ যাঁহার চক্রান্তে মীরজাফরের পদচ্যুতি সংঘটিত হইল, সেই কাসিম আলি খাঁ কুক্রিয়াসক্ত বৃদ্ধ বিশ্বাসঘাতক শ্বশুরের প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ওষ্ঠদংশন করিয়াছিলেন। তিনি কোনরূপে স্বদেশের কলঙ্কমোচন করিবেন বলিয়া

---

* Well, indeed, that eventful morning, might the thoughts of the old man have carried him back to a period little more than three years distant, when, on the field of Plassey, he, too, in secret compact with these same English, had betrayed his kinsman and master to obtain the Seat which another Kinsman was now by similar means wresting from him.—Malleson's Decisive Battles of India, p. 139.

† Vansittart's Memorial, setting forth the causes of the change in the Subaship of Bengal.

‡ All these conditions being agreed to, Cassim Ally Khân was proclaimed; and the old Nabob came out to the Colonel, declaring that he depended upon him for his life: and the troops then took possession of all the gates and notice was sent to the the Governor, who came immediately; and the old Nabob met him in the gateway —Consultations, Fort William, 24th. October, 1750.

§ He could not but contrast his position, threatened by the men to whom he had sold his country, with that which he would have occupied, if at Plassey, he had been loyal to the boy relative who had, iu the most touching terms, implored him to defend his *turbon.* With the prestige of having been the main factor in the destruction of the insolent foreigners who had since dictated to him he would have weilded a real power; his country would have been secure.—Malleson's Decisive Battles of India, p. 140.

কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সরলভাবে সম্মুখসমরে বিদেশী বণিকের দর্পচূর্ণ করিয়া শ্বশুরের সিংহাসন স্বাধীন করিয়া দিলে কাসিম আলির নাম কলঙ্কযুক্ত হইত না; তিনি শ্বশুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া গোপনে ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া রাজ-সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়া, কেহ তাঁহার উদ্দেশ্যের বিচার করিতে চাহেন না, তাঁহাকেও মীরজাফরের ন্যায় নিন্দা করিয়া থাকেন। কাসিম আলির এই কলঙ্ক অলীক কলঙ্ক নহে;—ইহা দুরপনেয়! কিন্তু দুরপনেয় হইলেও, মীর জাফর এবং মীর কাসিম—উভয়ের অপরাধের মধ্যে কিছুমাত্র তারতম্য নাই কি?

সিরাজদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন ইংরাজেরা তখন বণিক্, মুসলমানই তখন এ দেশের রাজা। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষা করিলে মুসলমান সিংহাসন রক্ষা করা হইত, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য মীরজাফর ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন? তিনি কি স্বদেশের কোন দুঃখ ক্লেশ অত্যাচার অবিচার দূর করিবার জন্য—আবশ্যক হইলে তদর্থে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য—অন্নদাতা মুসলমান নরপতির মুণ্ডচ্ছেদের সহায়তা করিয়াছিলেন? মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে জানু পাতিয়া যে ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার পরিণাম কি হইয়াছিল? যে বালক শিরস্ত্রাণ রক্ষার্থ তাঁহাকে কারতকণ্ঠে বারম্বার অনুনয় করিয়াছিলেন তাঁহার হৃদয়শোণিতে কাহার পাপ-কাহিনী লিখিত হইয়াছে? আর মীর কাসিম? ফিরিঙ্গীর প্রবল পরাক্রম বিস্তৃত হইয়া মোগল গৌরব আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই তিনি মুসলমান সিংহাসনের স্বাধীনতা সংস্থাপনার্থ গুপ্তমন্ত্রণায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। কাহারও নিকট কোরাণ স্পর্শ করিয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করেন নাই, পদবিচ্যুত হতভাগ্য নরপতির মুণ্ডচ্ছেদেরও কলঙ্ক বহন করেন নাই! মীরজাফর আত্ম-সম্ভোগের জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, মীর কাসিম আত্ম বিসর্জ্জনের জন্য সেই পথ অবলম্বন করেন। পথ এক, উদ্দেশ্য পৃথক্;—যাঁহারা মীর জাফর এবং মীর কাশিমের সমগ্র ইতিহাস আদ্যন্ত অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারাই সত্যানুরোধে স্বীকার করিবেন, মীরজাফরের পথ এবং উদ্দেশ্য তুল্যরূপে নিন্দনীয়, মীর কাসিমের পথ যতই নিন্দনীয় হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য কিছু মাত্র নিন্দনীয় নহে!

দীপান্বিতা।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এমন কি কলিকাতাতেও দেওয়ালী উপলক্ষে সাধারণ নাগরিকবৃন্দের মধ্যে একটা উন্মাদকর অতি তীব্র আনন্দোৎসব চলিয়া থাকে। বহুদূরবর্ত্তী বঙ্গের পল্লী-প্রান্তে শান্তিপূর্ণ গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে, দরিদ্রের গৃহে সেই উন্মত্ত উল্লাসের অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়; সেই নৈশ দীপমালা বিভূষিত সুসজ্জিত অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী নগরাবলীর অধিবাসীবৃন্দের আলোকদীপ্ত নয়নের বিস্ময় কৌতুকোদ্ভাসিত ভাব দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের চক্ষে প্রতিফলিত দেখা যায় মাত্র। যে আনন্দস্রোত একটি নাতিশীতোষ্ণ হেমন্তের প্রথম সন্ধ্যায় দেশের এক প্রান্তস্থ নরনারীর হৃদয় আলোড়িত করিয়া যায়, তাহাই মন্দীভূত হইয়া দেশের অন্য প্রান্তের মনুষ্যহৃদয়ে সুমন্দ সন্ধ্যাসমীরণে বনলতার ন্যায় মৃদুকম্পন উপস্থিত করে।

কিন্তু কালীপূজার রাত্রিই কেবল পল্লীবাসীদিগের নিকট উৎসবময়ী নহে, কালীপূজার পূর্ব্বদিন হইতেই আবালবৃদ্ধ সকলের মধ্যেই একটা আসন্ন উৎসব-মুখরিত উল্লাস-চাঞ্চল্য অনুভব করা যায়। চতুর্দ্দশীতে চোদ্দশাক খাওয়া পল্লীবাসীদিগের একটা অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম। সেইদিন সকালে উঠিয়াই বালক বালিকাগণ চোদ্দরকম শাকের অন্বেষণে বাহির হয়, কিন্তু চোদ্দরকম শাক সংগ্রহ করা নিতান্ত সহজ নহে, সকল রকম শাক এক স্থানেও পাওয়া যায় না, আহারোপযোগী শাক গ্রামের যে অংশেই পাওয়া যাক্, তাহারা তাহ ছিঁড়িয়া আনে; তাহার পর যদি দুই একদফা অকুলান পড়ে তাহা হইলে মহাবিপদ, আর কোন শাক আছে তাহাই আবিস্কার করিবার জন্য ছেলে মেয়েরা একত্র বসিয়া যায় এবং একদুই করিয়া জগতের সকল রকম শাকের নাম করে—কিন্তু ঠিক চতুর্দ্দশটি আর বাহির হয় না,—তাহারা গণিতে আরম্ভ করে, ১ কলমী, ২ হেলাঞ্চা, ৩ নটে, ৪ পালং ৫ কচু, ৬ চুকো, ৭ পনকা, ৮ ছোলা, ৯ মটর, ১০ শরিসা, ১১ সজিনা, ১২ পুঁই ১৩ সুযি্যকুমড়োর ডগা—বহু কষ্টে এবং অনেক কল্পনাব্যয় করিয়া তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি বিবিধ স্বাদ বিশিষ্ট শাক একত্র করিয়া তের রকম হইল, শেষে অনেক চিন্তার পর একজন বলিয়া উঠিল, "এক রকম শাকের নাম এখনো বলা হয় নি," সকলে আশ্বস্ত হইয়া 'কি, কি' বলিয়া গোল করিয়া উঠিল। তখন আবিস্কারক হাসিতে হাসিতে বলিল "গাধাপুন্যে।"—সকলেই বড় আনন্দিত হইল, গাধাপুন্যের শাক অখাদ্য নহে; কবিরাজী মতে গাধাপুন্যের শাক শোথের অতি উত্তম ঔষধ। এই শাকের বীজ লাগাইতে হয় না, আপনিই হয়, এবং কোন গৃহস্থের বাড়ী ইহা জন্মিলে, "এগুলি কাজে আসিবে" ভাবিয়া সে তাহা সযত্নে রক্ষা করে।

কিন্তু এই শাক অন্বেষণ করিতে ছেলেদের সময়ে সময়ে অনেক পাড়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কোথায় কোন পচা পুকুরে হেলাঞ্চা বা কলমী আছে তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায় সকল

পুকুরে হেলাঞ্চাশাক পাওয়া যায় না, তাহা না পাওয়া গেলে নদীর ধারে গিয়া শুশুনির শাক তুলিয়া আনে ; নদীতীরে যেখানে বালুকারাশি ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর আপনাদিগের অতি শীতল, স্বচ্ছ উৎস ধারা ঢালিয়া দেয় তাহার সন্নিকটে পুরু মখ্‌মলের গালিচার মত কোমল পুঞ্জ পুঞ্জ শুশুনির শাক জন্মিয়া নদীতীর আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। অনেক সময় অসহায়া দুঃখিনী বিধবাগণ কিম্বা জেলে, বাগ্দীর ছেলেরা স্নান করিতে আসিয়া কোঁচর ভরিয়া এই শাক তুলে, ভদ্র লোকের ছেলেপিলে এবং বর্ষীয়সী রমনীগণের মধ্যেও এইরূপে শাক তুলিবার প্রথা দেখা যায়, নদী হইতে উঠিয়া যাইবার সময়, গামছায় করিয়া 'ভাসানজলে' সুন্দর রূপে ধৌত করিলেই ইহার মধ্যেকার বালি কিম্বা মলামাটি সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়। পল্লীগ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস শুশুনির শাক অনিদ্রা নিবারণের মহৌষধ।

আহারাদির পর কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করিয়া মেয়েরা মাটীর প্রদীপ গড়াইতে আরম্ভ করিল। বেলা থাকিতে থাকিতে প্রদীপগুলি তৈয়ারি করা দরকার, রৌদ্রে একটু না শুকাইলে প্রদীপ জ্বলিবে না ভাবিয়া তিন চারি জন মেয়ে তাহাতে হাত দিল, এবং প্রদীপ যাহাতে ভাল হয় এজন্য অনেকে নদীর ধারে কিম্বা কোন গর্ত্ত হইতে ভাল এঁটুলি মাটী আনাইয়া লইল। প্রদীপ প্রস্তুত হইলে, রৌদ্রে একটু শুকাইয়া ছোট ছোট সলিতা দ্বারা তাহা সাজাইয়া রাখে এবং সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে চতুর্দ্দশটী—প্রদীপ বাড়ীর চারিদিকে জ্বালিয়া দেয়, কিন্তু পরদিন জ্বালিতে হইবে বলিয়া অধিকাংশ প্রদীপই সাবধানে রাখিয়া দেয়।

অমাবস্যার দিন আনন্দের পরিমাণ আরো বেশী। গ্রামের মধ্যস্থলে মালীপাড়া, গৃহস্থগণের কাছে বায়না পাইয়া মালীরা কালী প্রতিমা গড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের ছোট ছোট ঘরের মধ্যে উনেনের পাশে, পর চালার খড়ের গাদার কাছে, ঢেঁকির ঘরে, যেখানে সেখানে কালীর প্রতিমা পড়িয়া আছে, আজ সকাল হইতে সেগুলিতে রংদিতে আরম্ভ করিল। কালী প্রতিমা চিত্রিত অধিক পরিশ্রম কিম্বা নৈপুণ্যের অবেশ্যক হয় না। অনেকের প্রতিমা মালীবাড়ী নির্ম্মিত হয় না, মালীরা তাহাদের বাড়ী আসিয়া কাঠামো বাঁধিয়া ঠাকুর গড়ে; আজ মালীদের কিছুমাত্র অবসর নাই, চারি পাঁচটা তুলি এবং নারিকেলের মালাই য়ে তিনচার রকম রং গুলিয়া নিবিষ্ট চিত্তে প্রতিমা চিত্রিত করিতেছে, বেলা চারিটার মধ্যে চিত্র কার্য্য শেষ হইয়াগেল।

বেলা পড়িতে না পড়িতে চারিদিক হইতে ঢাকবাজিয়া উঠিল। পাড়ার ছেলেরা সাড়া পাইয়া 'ঐ বাজনা এসেছেরে' বলিয়া উৎসব গৃহে সমাগত হইল। ঢাক আসিয়াছে কিন্তু তখনো ঠাকুর আসে নাই, একটা ঢাক এবং একখানা কাঁসি সঙ্গে লইয়া একদল ছেলে মালীবাড়ীতে ঠাকুর আনিতে গেল, এবং একটা লোকের মাথায় সেই—দিগ্বসনা, ভূষণহীনা, লোলজিহ্ব প্রতিমা তুলিয়া ঢাক বাজাইতে বাজাইতে বাড়ী লইয়া আসিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকল প্রতিমা মালীবাড়ী হইতে স্থানান্তারিত হয়, পূজাবাড়ীতে আনীত হইলে অনেকে

একত্র হইয়া ডাকের গহনা দিয়া প্রতিমা সাজাইতে বসে; বারাণ্ডায় কলুঙ্গার উপর একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছে, ল্যাম্পের শিখায় সমস্ত কলুঙ্গা কালীপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই ল্যাম্পের আলোকে ঝোড়া হইতে ডাকের সাজ বাহির করিয়া তিন চারিজনে প্রতিমা সাজাইতেছে। মাথায় মুকুট, একহস্তে খর্পর, অন্যহস্তে রক্তাপ্লুত নরমুণ্ড, কর চতুষ্টয়ে নানা রকম ডাকের গহনা; গলায় মুণ্ডমালা তাহার উপর মোমের ফুলের লালমালা, কটিতট বেড়িয়া সারি সারি নরহস্ত, মস্তকে আজানুলম্বিত ঘন কৃষ্ণবর্ণ, কেশ,—মস্তকের উপর রাঙ্গতার ছটা, লোহিতবর্ণ লোলাজিহবা প্রসারিত, উজ্জ্বল ত্রিনয়ন, পদতলে ঢুলু ঢুলু নেত্র ঈশান নিপতিত, শ্বেতবর্ণ, হস্তে শিঙ্গা, কর্ণে ধুতুরা ফুল, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা, তাহার উপর চিত্র বিচিত্র সর্প কুণ্ডলাকারে অবস্থান করিতেছে, মসী-কৃষ্ণবর্ণ এবং হিঙ্গুলরাগরঞ্জিত জিহ্বা দীপালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে, সেই জিহ্বা অসুর-রক্তপানলোলুপ কি "ভিখারীর সর্ব্বত্যাগী বুকখানি মাড়াইয়া" লজ্জাভরে প্রসারিত কে বলিবে?

চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে একখানি চাঁদোয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তাহার নীচে এক পাশে দুইখানি তক্ত পোষের উপর বসিয়া কতক গুলি ছেলে মেয়ে গণ্ডগোল করিতেছে; এক পাশে ঢুলিরা বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানিতেছে, চাটাইয়ের উপর দুই পাঁচটা ঢোল পড়িয়া আছে, গোটাদুই ঢাক চিত্র বিচিত্র ফরাসী ছিটের জামা গায়ে দিয়া শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের পাখ্না উঁচু করিয়া বসিয়া আছে, যেন কখন্ ঢাকির ঘাড়ে চড়িয়া বিকট বাদ্যধ্বনিতে ক্ষুদ্র গ্রামখানা এবং গ্রামস্থ বালক বালিকাগণের শিশুহৃদয় তোলপাড় করিয়া তুলিবে উৎসুক চিত্তে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে; নিজেশূন্য গর্ভ হইলেও উচ্চনাদে তাহারা তাহাদের সে দীনতা ঢাকিয়া রাখিতে অত্যন্ত সচেষ্ট।

ক্রমে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল। উৎসব-ভবনের প্রাঙ্গনে যে 'আড়' বাঁধা হইয়াছিল, তাহার উপর প্রায় আধহাত ব্যবধানে অল্প অল্প গোবর রাখিয়া ছেলেরা তাহাতে মৃৎপ্রদীপ ন্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইল; ক্রমে একদুই করিয়া সকলের বাড়ীতেই বহু সংখ্যক প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, এমন কি কুতূহলী পল্লীরমণীবর্গ পর্য্যন্ত পায়ের মল খসাইয়া, ময়লা কাপড় পরিয়া, ঘোমটা টানিয়া, সারি বাঁধিয়া আলো দেখিতে বাহির হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সসঙ্কোচ-পদক্ষেপ, সলজ্জ-দৃষ্টিক্ষেপন তাঁহাদিগের কুলের পরিচয় দিতে লাগিল, তাহার পর যখন মাতৃ-ক্রোড়বর্ত্তী তিনবৎসরের শিশু সন্তানটি কোন এক দোকানের সম্মুখস্থিত একটি উজ্জ্বল আলোক শিখার দিকে তাহার কোমলতাপূর্ণ চঞ্চল, মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার মাতার দীর্ঘ অবগুণ্ঠন সজোরে উন্মুক্ত করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল "দ্যাখ মা, কেমন আলো," তখন সেই লজ্জাবনত মুখী সাধ্বী ভদ্ররমণী বিষম বিব্রত হইয়া ত্রস্তভাবে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন এবং অত্যন্ত নিম্নস্বরে শিশুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "চুপকর দস্যি, লোকে চিন্‌তে পারবে যে।"

পল্লীগ্রামের শোভা বড় সুন্দর। অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন;

কানন বেষ্টিত অপ্রশান্ত, বঙ্কিম গ্রাম্যপথ, গ্রামপ্রান্তস্থ ক্ষুদ্র নদীর নিস্তরঙ্গ তরল বক্ষ, শ্যামল বৃক্ষ শ্রেণী, বহু দূরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্র,—একখানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ যবনিকায় সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; কেবল উর্দ্ধাকাশে অনন্ত নক্ষত্র কুল আজ অত্যন্ত শুভ্র, অধিকতর জ্যোতির্ম্ময়, নিম্নে বৃক্ষপত্রে অসংখ্য খদ্যোত অতি স্নিগ্ধ, ক্ষীণ প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে, যেন প্রকৃতি রাজ্ঞী তাঁহার দ্যুতিময় রত্ন মণ্ডিত ঘনকৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কোন অজ্ঞাত বিজন অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বাস বায়ুতে শুষ্ক বৃক্ষপত্র ঝরিয়া পড়িতেছে, হেমন্তের নির্ম্মল শিশির বিন্দু তাঁহার চক্ষু প্রান্ত হইতে খসিয়া সেকালিকা ও রজনা গন্ধর কালকা গুলিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে, আর এই সুসজ্জিত, আলোক মালা-পূর্ণ, উৎসব মগ্ন গ্রামখানি আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে পরম ঔৎসুক্যভরে প্রেমিক যুগলের মিলন সন্দর্শন আশায় বসিয়া আছে।

প্রত্যেক বাড়ীই দীপমালায় সুসজ্জিত। যাহাদের কোঠাবাড়ী তাহাদের বাহিরের বারান্দায়, ছাদে, কার্ণিসের উপর সারি সারি দীপ জ্বলিতেছে, ছেলে মেয়েরা উপরে চড়িয়া চিলে কোঠার ছাদে দুই পাঁচটা প্রদীপ সারি সারি বসাইয়া দিতেছে, ছাদের উপর হইতে পাছে মই পিছলাইয়া যায় ভয়ে একজন তাহা ধরিয়া রাখিয়াছে আর একটি মেয়ে হাত তুলিয়া অতি সন্তর্পণে এক একটি করিয়া প্রজ্জলিত মৃৎপ্রদীপ আনিয়া দিতেছে; যাহাদের খড়ের ঘর তাহারাও বারান্দায় প্রদীপ সাজাইয়া দিয়াছে। কাহারো বাড়ীর সম্মুখে আমবাগান, কলা, পেয়ারা, দাড়িমগাছে পরিপূর্ণ ছোট বেড়, একদিকে একটা বাঁশের ঝাড়, চারি-দিকে সুপারী ও নারিকেল গাছের সারি—সেই সমস্ত গাছের আড়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ গুলি মৃদু আলোক ধারা বিকীর্ণ করিতেছে, বৃক্ষ পত্রের ব্যবধান পথে সেই আলো অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

ক্ষুদ্র বাজারখানিও আজ আলোকে ভরিয়া গিয়াছে; দোকানদারেরা স্ব স্ব দোকা-নের সম্মুখে বাঁশের খুঁটা পুতিয়া তাহার উপর নানারকম ভঙ্গীতে বাখারী বাঁধিয়া দিয়াছে, তাহার উপর সারি সারি মাটীর ডেল্‌কো জ্বলিতেছে। স্থানে স্থানে মালসার ভিতর আল-কাতরা ঢালিয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কেহ বা আলকাতরার বড় বড় পিপা জ্বালাইয়া দিয়াছে, ধু ধু করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে, প্রজ্জলিত অগ্নি উর্দ্ধে অনেক দূর পর্য্যন্ত ধূমময় শিখা বিস্তার করিয়াছে, আর সমস্ত গ্রামের ছেলেরা তাহার চারিপাশে দাঁড়া-ইয়া সেই অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছে; বাজারের দুই পাঁচটা কুকুর এই অনভ্যস্ত দৃশ্য দেখিয়া দূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত চিৎকার করিতেছে, এবং সহসা কোন বালক-হস্ত নিক্ষিপ্ত অতর্কিত ঢিল খাইয়া লাঙ্গুল গুটাইয়া বিশ পঁচিশ হাত দূরে পলাইয়া যাইতেছে ও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিকট শব্দ করিতেছে। একটা দোকানের সম্মুখে পাঁচ ছয়হাত উঁচুতে একটা বড় 'ফনেস' টাঙ্গান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে একটা উজ্জল আলো, তাহার চারি-পাশে, মানুষ, বানর, হাতী, ঘোড়া, উঠ, গরু প্রভৃতির ছোট ছোট প্রতিকৃতি—কাগজে

নির্ম্মিত, ধূমের জোরে ছবিগুলি ক্রমাগত ঘুরিতেছে, আর 'ফনেসের' ঘেরের কাপড়ে তাহাদের ছায়া পড়িতেছে ; ছেলেরা স্থিরভাবে নীচে দাঁড়াইয়া ঘাড় তুলিয়া তাহা দেখিতেছে ।

গ্রামের এক প্রান্তে গ্রাম্য দেবতা কালীর পীঠস্থান—কালীবাড়ীতে আজ বড় ধূম। প্রাচীন দালান খানি আজ আলোকে সুসজ্জিত ; সম্মুখের দ্বার উন্মুক্ত, উচ্চবেদীর উপর প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি স্বর্ণ রৌপ্যালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বেদীর নিম্নে ঘটের উপর একটি নারিকেল, তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া তাহার তিন চারিটী পাতা দেবীর পদমূল পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। গৃহ মধ্যে ধূনুচীতে ধূপ জ্বলিতেছে, ধূনার সুগন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে, রমণীগণ দলে দলে আসিয়া দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, তাহার পর চৌকাটের কাছে মস্তক নত করিয়া হৃদয়ের অকৃত্রিম এবং গভীর ভক্তিতে দেবীর মহিমাকে আরো প্রদীপ্ত করিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে। কয়েকজন ভক্ত দেবীর সম্মুখে, একটু দূরে গললগ্নীকৃত বস্ত্রে দাঁড়াইয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা' বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে, এই গম্ভীর অন্ধকারপূর্ণ রাত্রে তাহাদিগের সেই তীব্র কণ্ঠস্বর যেন কালিকা দেবীর পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অসাড় হৃদয়ও বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছে—সে স্বরে কোমলতা নাই, ভক্তির স্নিগ্ধতা নাই, তাহা নিরাশাপূর্ণ এবং কর্কশ, কাতরতাব্যঞ্জক হইলেও সম্পূর্ণ নীরস ; পুত্র মাতাকে যে স্বরে আহ্বান করে এ সে স্বর নহে।

কালীর দালানের নিকটেই একটা প্রকাণ্ড তমাল গাছ ; বেশী উচ্চ নহে কিন্তু অনেক দূর লইয়া বিস্তৃত, তাহার নীচে একজন সন্ন্যাসী একখানা বাঘছালের উপর যুক্তাসনে বসিয়া-আছে, চেলারদল তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সন্ন্যাসীর সর্ব্বশরীর ভস্মাবৃত, মস্তকে জটাভার, পরিধানে কৌপিন, একটি সিন্দুরচর্চ্চিত ত্রিশূল মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে, একটা গৈরিক রঙ্গের ঝুলি মাথার উপর তমালের ডালে ঝুলিতেছে। সন্ন্যাসীর সম্মুখে বড় একটা কাঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছে, মধ্যে মধ্যে গাঁজা সাজা হইতেছে এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার লম্বা চিমটাটিতে করিয়া আগুন তুলিয়া কলিকায় ভরিতেছে, ও চক্ষু মুদিয়া প্রাণপণ শক্তিতে গাঁজার দম্ মারিয়া একমুখ ধূমের সহিত বোম্‌ভোলা "বলিয়া হাঁক ছাড়িতেছে ; তাহার পর সেই প্রসাদী কলিকাটি লাভ করিবার জন্য চেলাদের মধ্যে ভারি হুলস্থূল বাধিয়া যাইতেছে। গাঁজার গন্ধে চারিদিক ভরিয়া উঠিতেছে।

অনেক রাত্রে কালীবাড়ীর পূজা আরম্ভ হইল। একটা ঢাক, একজোড়া ঢোল এবং খানদুই কাঁশি মাথার কাছে রাখিয়া ময়লা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া একটা পুরাতন বড় মাদুড়ের উপর পড়িয়া ঢুলিয়া ঘুমাইতেছিল। পুরোহিত ঠাকুরের ঘণ্টার ঠং ঠং শব্দ শুনিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, তাহার পর স্ব স্ব বাদ্য যন্ত্র লইয়া দালানের ঠিক সম্মুখে আসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। বাজনা শুনিয়া পূজা আরম্ভ হইয়াছে ঠিক করিয়া গ্রামবাসীগণের মধ্যে যাহার যে মানসা ছিল তাহা লইয়া তাহারা একে একে পূজাদিতে

আসিতে লাগিল ; কেহ রোগমুক্ত হইয়াছে বলিয়া, কেহ পুত্রলাভ করিয়া ধূমধামের সহিত পূজাদিতে আসিল ; সঙ্গে বাদ্যভাণ্ড, জোড়াপাঁঠা, পট্টবস্ত্র, সুরঞ্জিত শঙ্খ, স্বর্ণবিনির্ম্মিত নথ, পাত্রে নানাবিধ ফল, পুষ্প, চন্দন, ধূপাধারে ধূপ। পুরোহিত পূজা শেষ করিলেন, বলির বাদ্য বাজিল, সদ্যস্নাত, মন্ত্রপূত কৃষ্ণবর্ণ ছাগশিশু দুটিকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া কামার খড়্গের এক আঘাতেই তাহাদের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল, হাড়িকাটও তাহার চারিদিকের মৃত্তিকা রক্তস্রোতে ভাসিতে লাগিল, আরো জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিল, কয়েকটা ছেলে পাঁঠার রক্ত লইয়া পরস্পরের গায়ে ছড়াইয়া দিয়া আনন্দ বোধ করিতে লাগিল। রুধিরপ্লাবিত ছাগমুণ্ড একখানি থালের উপর লইয়া দেবীর পদতলে স্থাপনকরা হইল। দেবী তাঁহার করাল জিহ্বা বিস্তার করিয়া নিশ্চল, শূন্যদৃষ্টিতে এই নিরপরাধ নিরাশ্রয় জীব শিশুর মৃত্যু, এই শোনিতস্রাব চাহিয়া দেখিতেছেন ; তাঁহার চরণমূলে কতদিন হইতে এমনি রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, যুগান্তের পূর্ব্বহইতে এমনি রক্তপাত দেখিয়া দেখিয়া বুঝি তাঁহার দেবহৃদয়ও পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছে, নতুবা তাঁহার অভয় চরণতলে যে সকল নিরপরাধ, অবোধ জীব প্রতিদিন নিহত হয় সেই সকল নিরাশ্রয় পশুর কাতর আর্ত্তনাদে মাতৃ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া করুণাস্নেহপ্লাবনে দুর্দ্দমনীয় শোণিততৃষা ভাসিয়া যাইত।

পূজাশেষ হইলে যাহারা পূজা করিতে আসিয়াছিল, পূজারী ঠাকুর তাহাদিগের গল-দেশে এক এক গাছি ফুলের মালা পরাইয়া থালাতে দেবীর কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিলেন, তাহারা প্রণাম করিয়া প্রণামীর টাকা পুরোহিত হস্তে প্রদান পূর্ব্বক সদলবলে প্রস্থান করিল। প্রসাদের পরিমাণের অল্পতা দেখিয়া পুরোহিতের লোভাতিশয্যে কেহ কেহ বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিল, বিশেষতঃ পুরোহিত ঠাকুর দুইটি পাঁঠারই মুণ্ড নিজের ভোগের জন্য রাখিলেন বলিয়া রামজয় সরকার তাহার জ্যেড়তুতোভাই পরমানন্দ কে বলিল "দেখছ দাদাঠাকুরের আক্কেলটা, দুটো মুণ্ডুর একটা আমাদের দে,না দুটোই নিজে রাখলে, মায়ের ভোগের জন্যে পাঁচসের সন্দেশ আনলাম, পাঁচটা বৈ ফেরত দিলেনা, আমাদের বেহারী ঠাকুর এরচেয়ে লোক ভাল, এখন হতে তার পালিতে পূজো দিতে আস্‌বো।"-পরমানন্দের বয়স বেশী হইয়াছিল, সে প্রাচীন এবং বিজ্ঞ ; ছোটভায়ের অসন্তোষ দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল, বলিল "ছিঃ ও কথা বলেনা, মায়ের প্রসাদ যা পাওয়া যায় সেই ভাল প্রসাদ কি বেশী পাওয়া যায় ?"

কাঁসারীপাড়ার বারয়ারী তলায় আজ ভারিধুম। একটা তেমাতা রাস্তার ধারে অনেক খানি যায়গা পরিষ্কার করিয়া চাটাই দিয়া টাপোর ঘেরা হইয়াছে. সেই টাপোরের নীচে সদ্য নির্ম্মিত কাঁচা বেদীর উপর কালীর প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ; সম্মুখেই দুই একটা ক্ষীণ আলো-জ্বলিতেছে, পাশে একডালি ফুল এবং নৈবিদ্যের উপকরণ সামগ্রী পড়িয়া রহিয়াছে, ঘটের সম্মুখে একখান কুশাসন পাতা, আসন শূন্য, পুরোহিত মহাশয় এখনো আসেন নাই, যজমান

বাড়ীতে পূজা না সারিয়া তিনি এ বারোয়ারী কাণ্ডে হাতদিতে সাহস করেন না, কারণ বারোয়ারী পূজাটা উঠ্‌বন্দী মহাল, আজ আছে কাল নাই, কিন্তু যজমানের বাড়ীর পূজা মৌরুসী জমা, সেখানে আগে যাওয়া চাই।

বারোয়ারীর কাজে সকলেই কর্ত্তা, কার্য্যের কোন রকম শৃঙ্খলা নাই। সন্ধ্যার সময় পাণ্ডারা ও পাড়ার অনেক যুবক একত্র হইয়া দুধ ও চিনি মিশ্রিত এক গামলা ভাঙ্গের শ্রাদ্ধ করিয়াছে, রাত্রি যতই বেশী হইতেছে, ততই তাহাদের নেশা পাকিয়া আসিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, মাতামাতি বাড়িতেছে। রাত্রে কবির গান হইবে, তাহার আসর ঠিক করিবার জন্য কয়েকজন পাণ্ডা ও উদ্যোগী যুবক আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

অন্যদিকে গ্রাম্যদেবতা কালীবাড়ীতে নৈবেদ্য পাঠাইবার আয়োজন চলিতেছে। বড় বাজারের মধ্যে দিয়া সমারোহ পূর্ব্বক নৈবেদ্য লইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং সে নৈবেদ্য অসাধারণ হওয়া দরকার। একখানা প্রকাণ্ড বারকসে এই নৈবেদ্য সাজান হইয়াছে। বারকসখানির পরিধি একখানা বড় গরুরগাড়ীর চাকার সমান, নৈবেদ্যের উপকরণও তদনুযায়ী। আধমন ভিজে আতব চাউল চূড়াকারে সাজান, তাহার উপর একটি পাঁচসেরি ওজনের গোল্লা সন্দেশ, চারি পাশে নানারকম ভিজে, পাটনাই মটর, মুগের ডাল, বরবটী ইত্যাদি ; প্রত্যেক রকম ভিজনে আড়াই সেরের কম নহে. গোটাচারেক নারিকেলের শাঁস পাঁচটা শশা চাকা চাকা করিয়া কাটা, আধ হাঁড়ি গুড়ে বাতাসা, তিনচারিখানা আক। বারকস খানি দুইটি সমান্তরাল বংশখণ্ডের উপর বসাইয়া দড়ি দিয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া চারিজন গোয়ালার ঘাড়ে চাপাইয়া কালীবাড়ী পাঠান হইল, সঙ্গে ঢাক ঢোল মসাল আর একপাল ছেলে।

অনেক রাত্রে বারোয়ারী তলায় পুরোহিত মহাশয়ের শুভাগমন হইল ; অনেক যজমান বাড়ীতে পূজা করিয়া আজ তিনি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, তাহার উপর কিছু বেশী রাত্রি হওয়াতে পাণ্ডারা তাঁহাকে দুই একটা কটু কাটব্যও বলিয়াছে। তিনি কোন বাক্যব্যয় না করিয়া হাত পা ধুইয়া পূজায় বসিলেন। অনেকদিন পরে আজ বারোয়ারী তলায় মহিষ বলি হইবে, তাই সেখানে পূজার বাজনা বাজিবা মাত্র সমস্ত গ্রামের লোক মহিষ বলির আমোদ দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। বলির জন্য একটি মহিষশিশু আনিবার কথা ছিল, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও মহিষ শাবক না পাওয়াতে তাহারা বারো টাকাদিয়া একটা অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের মহিষ আনয়ন করিয়াছে। বারোয়ারী তলায় একটা বটগাছের কাছে দুই গাছি খাটোদড়ি দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার ঘাড় নরম করিবার জন্য দুইজন লোক সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই তাহার ঘাড়ে ঘি মাথাইতেছে ও বেলুন দিয়া ডলিতেছে।

তাই মধ্যরাত্রে বাজনা শুনিয়া ছেলে বুড়ো সকলে মহিষবলি দেখিবার জন্য বারোয়ারী তলায় ছুটিয়া আসিয়াছিল। নিকটে ধনঞ্জয় মিত্রের বাড়ীতে লোকজন খাইতে বসিয়াছে,

লুচির উপর পাঁঠা পড়িয়াছে মাত্র, মহিষ বলি দেখিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া সকলে তাড়াতাড়ি খানকত লুচিও মাংস মুখে গুঁজিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সান্যাল বাড়ীতে আহারের এখনো বিলম্ব আছে, বৃদ্ধ কালীকৃষ্ণ সান্যাল কিছু তান্ত্রিক মতাবলম্বী লোক, তাঁহার পুরোহিত যে তাড়াতাড়ি পূজা সারিয়া আর পাঁচজন যজমানের কাজ সারিতে যাইবেন তাহা হইবার যো নাই, তিনি জানেন রীতিমত পূজা করিতে হইলে প্রায় সমস্ত রাত্রি লাগে, তাই প্রতিবৎসরই তাঁহার বাড়ীতে পূজার প্রকরণটা কিছু বিস্তারিত ভাবে হইয়া থাকে। কালী পূজার রাত্রে পূর্ব্বদিক ফরসা হইবার অধিক আগে তাঁহার বাড়ীতে কাহারো পাত পড়িত না, তাই যাহাদের শুধু আহারের অনুরোধেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া তাহারা কালীপূজার রাত্রে এবাড়ীতে প্রসাদ পাইবার জন্য আগ্রহ করিত না; কিন্তু সান্যাল-বাড়ী ছোকরা বাবুদের একটা প্রকাণ্ড আড্ডা, আমোদপ্রিয় পল্লী যুবকগণের আবশ্যকীয় পান, তামাক, গান বাজনা, তাস, পাশা প্রভৃতি সকল জিনিসেরই এখানে বন্দোবস্ত আছে। আফিসের নব্য আমলা, স্কুল কলেজ হইতে নাম কাটা গ্রাম্য জমীদারের বংশধর বর্গ, এবং তাঁহাদের মোসাহেবের দল সভাস্থল যুড়িয়া বসিয়া আছেন। দেওয়ালে একটি বিবসনা সুন্দরী পরী, বাহু বিস্তার করিয়া সুদৃশ্য পাখা মেলিয়া কোন দূরতর রাজ্যে উড়িয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট, তাহার একহাতে একটি সুন্দর ঘড়ি, টক্ টক্ করিয়া শব্দ হইতেছে, দুই তিন হস্ত ব্যবধানে উৎকৃষ্ট ফ্রেমে বাঁধান বড় বড় ছবি, দেবসভা, সমুদ্রমন্থন, নন্দন-কাননে অপ্সরী গণের প্রমোদ নৃত্য, ইত্যাদি নানা প্রকারের চিত্র বিচিত্র ছবি। প্রত্যেক চিত্রের নিকটে এক একটা ছোট ব্রাকেট তাহার উপরে কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল, একটা ভিস্তি জল লইয়া যাইতেছে, জলের ভারে দেহ নত হইয়া পড়িয়াছে, একটা ঘোড়ার সহিস এক বোঝা ঘাস মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, একজন দরজী চসমা চোখে দিয়া কাপড় শিলাই করিতেছে, একজন অন্ধ বামহস্তে লাঠি ধরিয়া দক্ষিণহস্ত বিস্তার পূর্ব্বক অতি মন্থর গমনে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে ইত্যাদি। ফরাসের উপর একধারে তাস আর এক-ধারে পাশা চলিতেছে। বংশলোচন সান্যালের মধ্যমপুত্র বাঁয়া তবলা বাজাইতে খুব ওস্তাদ। তিনি মস্তক, গ্রীবা এবং মুখের নানারকম ভঙ্গী করিয়া কখন দ্রুত, কখন ধীর গতিতে তবলা বাজাইতেছেন আর তাঁহার নিকটে বসিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক একটি যুবক একটা স্থূলোদর সেতারের তারে ঝঙ্কার দিয়া অতি গম্ভীর আওয়াজে গাহিতেছেন—"কার এ রমণী নীরদ বরণী, শবহৃদিপরে সমরে নাচিছে।" এবং তাস পাশা খেলিতে খেলিতে এক এক-জন যুবক ভাববশে "আহা, হা" করিয়া উঠিতেছে, পরক্ষণেই সেদিকে কিছুমাত্র খেয়াল না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ইস্তকবিস্তি কাবার করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দ্যূতক্রীড়াশক্ত কোন যুবক আরো অধিক চীৎকার করিয়া জানাইতেছে যে তাহার সহযোগী এইবার কচে বারো মারিতে পারিলে স্বর্ণদ্বারা তাহার করপল্লব বাঁধাইয়া দিবে। সভার যখন এই রকম অবস্থা সেই সময় ভগ্ন পাইক আসিয়া সংবাদ দিল "কাঁশারী পাড়ায় মোষ বলি হচ্ছে, বেশী দেরী নেই আসুন।"

খেলা ফেলিয়া সকলে বারয়ারীতলায় ছুটিল, গানবাজনা সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। বারয়ারীতলা জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। বারয়ারীতলায় একটা নূতন হাড়ি কাঠ পোঁতা হইয়াছে, পাঁঠাবলির হাড়িকাঠ হইতে তাহা অনেক বৃহৎ, অপেক্ষাকৃত দূরে সংস্থাপিত। চারিজন লোক নূতন দড়ী দিয়া মহিষটাকে বাঁধিয়া হাড়িকাঠের কাছে লইয়া আসিল। এই গভীর অন্ধকার পূর্ণ নিশীথ রাত্রে চারিদিকের আলোকরশ্মি নিভিয়া গিয়াছে, কেবল পূজামণ্ডপের নীচে দুইচারিটি মসাল দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, নানারকম বর্ণের দোলাই, বালাপোষ, র‍্যাপার গায়ে দিয়া দর্শকবৃন্দ চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে; চারিজন লোকেও মহিষটাকে আয়ত্তে রাখিতে পারিতেছেনা, সে একবার মসালের দিকে, একবার বা দর্শক মণ্ডলীর প্রতি ভীতিবিহ্বল প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, এবং শৃঙ্গ নত করিয়া এক-এক দিকে ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে।

হাড়িকাঠের কাছে একটি অগভীর গর্ত্ত কাটা হইয়াছে, মহিষটাকে সেই গর্ত্তের মধ্যে নামাইয়া হাড়িকাঠের মধ্যে তাহার গলা পুরিয়া খিল আঁটিয়া দিল, আর চারিজন লোক তাহার পদচতুষ্টয়ে চারি গাছ দড়ী বাঁধিয়া তাহার পশ্চাৎ দিক হইতে নির্দ্দয় রূপে টানিতে লাগিল, তাহার সর্ব্বশরীর সিক্ত, ললাট সিন্দূররঞ্জিত। নিকটে অসুরাকৃতি কামার অতি বৃহৎ খড়্গহস্তে দণ্ডায়মান, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরা, কোমরে গামছা বাঁধা, হঠাৎ দেখিলে তাহাকে যমদূত বলিয়া ভ্রম হয়।

হাড়িকাঠে মহিষের গলা বাধান হইলে একজন লোক বলিল "কৈরে মরিচ বাঁটাকৈ, আঁচ না দিলে মজা হবে কেন?"—একজন লোক অবিলম্বে খানিক মরিচ বাঁটা লইয়া উপস্থিত হইলে তাহা মৃত্যুমুখপাতিত মহিষের নাকে মুখে গুঁজিয়া দেওয়া হইল, মহিষ প্রবল যন্ত্রনায় কিরূপ ছট্ ফট্ করে তাহা দেখিয়া আমোদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই এই উপায় অবলম্বন করা হইল, এই নিষ্ঠুর আমোদ দেখিবার জন্য সকলে বিস্ফারিত চক্ষে নিশ্বাস রুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে!

খুব জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিল, কামার খাঁড়া খানি ভাল করিয়া বাগাইয়া ধরিল। সমস্ত বৈকাল বেলাটা ধরিয়া তাহাতে সান দেওয়া হইয়াছে, মসালের বিক্ষিপ্ত আলোক খাঁড়ার উপর পড়িয়া এক একবার চক্ চক করিয়া উঠিতেছে।

মরিচ বাঁটার ঝাল নাকে মুখে প্রবেশ করিবা মাত্র মহিষ ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া উঠিল, নিকটে যে সকল লোক দাঁড়াইয়া ছিল, এই গর্জ্জন শুনিয়া তাহারা দশহাত পিছাইয়া গেল, যে চারিজন লোক মহিষের পাবাঁধা দড়ী ধরিয়া টানিতেছিল, মহিষের পদের আস্ফালনে তাহারা স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, আর বিলম্ব করা অনুচিত মনে করিয়া কামার যেমন খাঁড়া উচু করিয়া তুলিল, অমনি মহিষ উপর দিকে এমন এক প্রবল ঝিঁকে মারিল যে হাড়িকাঠ মাটীর ভিতর হইতে উঠিয়া পড়িল, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া একজন এক পায়ের দড়ী ছাড়িয়া দিল, অবশিষ্ট তিনজন তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিলনা।

তাহাদিগকে ভূমিসাৎ করিয়া মহিষ চারি পায়ে ভর দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সিংনীচু করিয়া লেজ তুলিয়া হাড়িকাঠটা গলায় বাধাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে একদিকে ছুটিয়া চলিল, কাহারো সাধ্য হইল না তাহাকে ধরে! সকলে শুধু সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, এবং যেদিকে সে ছুটিয়া চলিল সে দিকের লোকেরা ভয়ে পৃষ্টভঙ্গ দিল, একজনের গায়ের উপর আর দশজন পড়িতে লাগিল, অন্ধকারের মধ্যে একটা মহাকলরব উত্থিত হইল। পাঁচসাতজন লোক মহিষের পশ্চাতে ছুটিল, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রাম্যপথ দিয়া উর্দ্ধপুচ্ছে সে কোন দিকে পলাইল, কেহ তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না।

অর্দ্ধেক আমোদ নষ্ট হইল বলিয়া দর্শকবৃন্দ আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গেল। উৎসৃষ্ট মহিষ হাড়িকাঠ লইয়া পলাইল দেখিয়া পাণ্ডারা হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কারণে তাহারা মা কালীর অসন্তোষভাজন হইয়াছে ভাবিয়া একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহাদিগের বুক কাঁপিতে লাগিল।

পরদিন সকাল বেলা নদীর অপর পারে নিশ্চিন্তপুরে মহিষটাকে পাওয়া গেল। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দুপুরের সময় বলি দেওয়া হইল, কিন্তু একটা অকল্যাণের আশঙ্কা কিছুতেই কাঁশারীপাড়ার লোকেদের মন হইতে বিদূরিত হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইলে অনেকেই কালী প্রতিমা নিঃশব্দে নদী জলে বিসর্জ্জন করিয়া গেল। জবা ও পদ্মফুলে স্নানের ঘাট ভরিয়া উঠিল, এবং গ্রামের ছেলেরা স্নান করিতে আসিয়া সেই সকল ফুল ধরিবার জন্য আস্ফালন, লম্ফন এবং সন্তরণে নির্ম্মল জলরাশি আবিল করিয়া তুলিল।

বেলা শেষ হইলে ভিন্ন ভিন্ন পাড়া হইতে প্রতিমা বাহির হইয়া বাজারের দিকে চলিল এক এক পাড়ার প্রতিমাগুলি একত্র বাহির হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রথমে খাস নিশান, তাহার পর বাদ্যভাণ্ড, শেষে পাঁচ সাত দশখানি প্রতিমা সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিমাখানি সকলের পশ্চাতে, গ্রাম্য জমীদারের বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় সঙ্গে অনেক পাইক বরকন্দাজ চলিল, পাছে তাহারা অন্য জমীদারের লোক লস্করের সঙ্গে মারামারি বাধায় এই জন্য তাহাদের সঙ্গে লালপাগড়ী, ছোট ছোট রুলহাতে, চাপরাস আঁটা পুলিশের সিপাহী। তাহাদের আগে আগে দারোগা সাহেব পরম গম্ভীর ভাবে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছেন, পায়ে নাগোরা জুতা, পরিধানে সাদা পাণ্টুলানের উপর কালো কোট, মাঁথায় টুপি, দারোগা সাহেবের বয়স তিনকুড়ি ছাড়াইয়াগিয়াছে, শুধু অহিফেণের জোরে টিকিয়া আছেন, এবং কোরাণের মান রক্ষা করিবার জন্য তিনটি বিবি বর্ত্তমানে আজ ছয়মাস হইল একটি 'খোপ সুরাত বিবি' 'নেকা' করিয়াছেন,—পুনশ্চ তাহার মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুষার শুভ্র দাড়ি গোঁপে কলপ লাগাইয়া কটারঙ্গের নিশান উড়াইতেছেন।

গ্রাম্য বাজার লোকে লোকারণ্য, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, চাষার ছেলেরা পূজা

দেখিবার কাপড় পরিয়া কেহ মেরজাই গায়ে দিয়া কেহ ঘাড়ের উপর ভাজকরা ধোপদস্ত চাদর ফেলিয়া সারিবাঁধিয়া চলিয়াছে, ঢাকিদের ঢাকের কাছে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালীতলায় আসিয়া সমস্ত প্রতিমাকে দুই সারি করিয়া রাস্তার ধারে নামান হইল, কাঁশারীপাড়ার বারোয়ারী প্রতিমা ঠিক সন্ধ্যার সময় আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া সেখানে উপস্থিত করা হইল। যাহারা তক্তারামায় প্রতিমা সাজাইয়া বাহির করিয়াছিল, তাহারা তক্তারামার বেলের মধ্যে বাতি জ্বালিয়া দিল, অনেকে মশাল, রঙ্গ মশাল, মহাতাপ জ্বালিয়া লইল; এবং অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিলে সকলে একত্র হইয়া নদীর দিকে চলিল। সমবেত ঢাকের বাদ্যে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, দর্শকগণ অনেকে নদীতীর পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া আসিল।

গ্রামের দীপমালা নিভিয়া গিয়াছে। কল্য যে গ্রাম খানি উৎসবমগ্ন, হাস্য কলরব সমাচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহা নীরব অন্ধকারাবৃত; কেবল নদীতট প্রত্যাবৃত ঢাকীরা বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া আলোক হীন, উৎসব শূন্য গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পথে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া একটি আনন্দময় অতীত উৎসবের কাহিনী ঘোষণা করিতে লাগিল।

কাহাকে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহা আনন্দ! বাবা সম্মত। কিন্তু ডাক্তার ত আর সে পর্য্যন্ত আসেন নাই তাঁহাকে এ সুখবরটা কিরূপে জানাই? চন্দ্রময়ী নিশা! আমি উদ্যানে বসিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে রাস্তার দিকে চাহিয়া আছি—মনে হইল যেন তিনি যাইতেছেন। উঠিয়া-দ্রুতগতিতে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু তিনি তখন এতটা দূরে চলিয়া গিয়াছেন যে আমাকে দেখিতে পাইলেন না; আমি আবার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু বৃথা, সেই সুদীর্ঘ রাস্তার মোড়ে তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। কাতর চিত্তে পথিপার্শ্বের একটি সুপ্রশস্ত ভূমিতে উঠিলাম—সেখান হইতে দেখিব তিনি কোথায় গেলেন; কিন্তু তখনি একজন বালিকা সাজিহাতে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল "একি প্রভা যে"! আমরা ছেলেবেলা কৃষ্ণমোহন বাবুর পাঠশালায় একত্র পড়িয়াছি। সে বলিল 'তুমি কোথা থেকে? আমি আজ সবে এখানে এসেছি, ফুল তুলে তোমাকে দিতে যাচ্ছিলুম।"

আমি বলিলাম—"এইরূপ ভাই বিপদ,—তাঁকে খবর দিতে যাব তা পারছিনে"।

সে বলিল—"এস আমাদের বাড়ী"। এমন সময় তাহার ভাই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া হাজির। প্রভা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "জানিস ডাক্তার কোথায়?" সে বলিল—জানি

বইকি—মণি তুমি আমার এই ঘোড়ায় চড় ; আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই"। ঘোড়ায় চড়িলাম—ঘোড়াটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একটা পাহাড়ে উচ্চভূমিতে উঠিল; প্রভা ও তাহার ভাই কোথায় পড়িয়া রহিল তাহার ঠিক নাই। ট্রট, গেলাপ—তাহার পর চারিপায়ে উল্লম্ফন করিয়া পক্ষীরাজের মত উড়িয়া চলিতে লাগিল। আমি প্রাণপণে রাশ ধরিয়া রহিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল বুঝি পড়ি পড়ি। রাস্তা দিয়া একটা উট চলিয়া যাইতেছিল,—বিপদ দেখিয়া উষ্ট্রবাহক তাহার পিঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল—ঘোড়াটাও হঠাৎ থামিল—আমি সেই অবকাশে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু এখানেই বিপদের শেষ নহে। রাত্রিকাল—অপরিচিত বিজন ভূমি, নিতান্ত একাকী, এখন কি করিয়া গৃহে ফিরি? হাঁটিয়া রাস্তায় উঠিলাম,—রাস্তাটা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল—অবশেষে একটি চোরা গলির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে উচ্চভূমি মধ্যে একটি মাত্র ছোট্টগলি, গলির মোড়ে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরে ঢুকিলাম,—কোমল মুখশ্রী এক বৃদ্ধা আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"এস মা এস ; যাবে কোথায় ? বস।"

আমি বলিলাম—"আমি পথহারা" !

বৃদ্ধা বলিলেন—"বস মা একটু কফি খাও, সামনে বাগান দেখছ আমি নিজে হাতে কফিগাছ পুঁতেছি"

ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল দীপের কাছে মেজের উপর নানারকম দ্রব্য সামগ্রী ফেলাছড়া। আমি বলিলাম এখানে এসব জিনিষ পত্র পড়ে কেন? বৃদ্ধা বলিলেন—"সে আসবে বলে চলে গেছে এখনো আসেনি ; এখনি আসবে"

আমি বলিলাম "কে গো?" বুড়ি বলিলেন—আমার সোনার চাঁদ বৌগো"

বুঝিলাম—তিনি পাগল। তাঁহার বৌ মরিয়াছে; বধূর অলঙ্কার তৈজসাদি লইয়া তাহার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন। আমার চোখ দিয়া জল পড়িল। বুড়ি বলিলেন—"মা তুমি কে গো? আমার বৌ কি ঘরে ফিরে এলে? ও ছোটু আয়রে! আহা সেই যে বাছা আমার, মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেছে—এখনো ঘরে ফেরেনি"! আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল,—অশ্রুজলে আমি জাগিয়া উঠিলাম।—

উঠিয়া ঘড়ি দেখিলাম,—ডাক্তার যাইবার পর আধ ঘণ্টাও অতিবাহিত হয় নাই—আর আমি পাঁচ মিনিটও ঘুমাইয়াছি কিনা সন্দেহ।—মনের মধ্যে কেমনতর একটা নিরাশার গুরু ভার লইয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। ছোটুকে ত সব বলিব ভাবিতেছি—বলিলে পরিত্রাণ পাইব এমনো মনে করিতেছি, কিন্তু যদি আমার ভুল হয়? আমি তাহাকে যেমন ভাল লোক মনে করিতেছি সে তেমন নাও হইতে পারে! বাস্তবিক আমি তাহাকে কি চিনি!—আর যদি এমনতরই হয় ছোটু আমাকে এখনো ভালবাসে? সেইজন্যই আমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে? তাহা হইলে আবার একজনের কিরূপ কষ্টের কারণ হইব! অতিশয় ব্যাকুল অশান্ত হৃদয়ে আকাশের দিকে চাহিলাম,—ঈশ্বরের

অনুগ্রহলোলুপ হইয়া কাতরচিত্তে অনন্ত নিরীক্ষণ করিলাম।—আকাশে সান্ধ্য মেঘে নানাবর্ণের তরঙ্গবিন্যাস। শ্বেত কৃষ্ণ নীল লাল পীত হরিৎ নানা আভায় একত্রে স্তরে স্তরে পুঞ্জীকৃত। শাদায় কালোর ছায়া, লালে নীলের বেষ্টন; ধূসরে গোলাপির সংমিশ্রণ। দেখিয়া মনে হইল; এইত সংসারের নিয়ম! দুঃখ ছাড়া কোথায় সুখ; অশ্রুহীন হাসি কোথায়? আমার প্রাণান্ত আকাঙ্খাতে, সাধনাতেই কি তবে ইহার অন্যথা হইবে? আমি কে? সৃষ্টির একটি অনুকণা; বিধাতা আমার জন্য কি তাঁহার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিলাম জানিতেও পারিলাম না। আনমনে বাজাইতে লাগিলাম—

হায় মিলন হোলো!
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!
হাতে করে মালাগাছি সারা বেলা বসে আছি
কখন ফুটিবে ফুল আকাশে আলো।
আসিবে সে বরবেশে, মালা পরাইব হেসে
বাজিবে সাহানা তানে বাঁশি রসালো!
সেই মিলন হোলো!
আসিল সাধের নিশা তবু পূরিলনা তৃষা—
কেমন কি ঘুমে আঁখি ভরিয়ে এল!

আর জানিতাম না; এই কটি লাইনই বারবার বাজাইতেছি সহসা পশ্চাৎ হইতে ইহার অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া কে গাহিল

শুভক্ষণে ফুলহার পরান হোলনা আর
হাতের সুগন্ধী মালা হাতে শুখাল।
নিশিশেষে আঁখি মেলে বাসি মালা দিনু গলে
নয়নের জলে আর আঁধারে কালো।
হায় মিলন হোলো!

গীত বাদ্যের সুর কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব কম্পন উঠিল; কে গাহিতেছেন তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত না করিয়াই আমি মুগ্ধ আবেশ-বিভোর হইয়া গানের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বাজাইয়া চলিলাম। তিনি যখন থামিলেন, যখন ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিলাম তখন বর্ত্তমান অতীতে, যৌবন বাল্যে বিলুপ্ত! আমি বিস্ময়ে বিভ্রমে বলিতে যাইতেছি—তুমি ছোটু—তুমি ছোটু। কিন্তু বলা হইল না, প্রাণের কথা ঠোঁটে আসিয়া মিলাইয়া গেল তখনি বাহিরে পদ শব্দ শুনিলাম, আত্মস্থ হইয়া বুঝিলাম বাবা আসিতেছেন; সভয়েসঙ্কোচে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা আসিয়া বলিলেন—"এই যে

বিনয় কুমার। মণি তুমি এঁকে চিনেছ কি? ইনিই ছোটু!"

এখনো কি স্বপ্ন দেখিতেছি? নিশ্চয়ই!!!

উপসংহার।

তেমনি উজ্জ্বল মধুর সন্ধ্যায়, তেমনি মেঘের স্তর, তেমনি বর্ণ বিন্যাস, ছায়া আলোর তেমনি লীলাখেলা; কেবল মনের ভাব আজ অন্য রকম।

আজ আমি দিশাহারা একাকী নৈরাশ্য পূর্ণ ব্যথিত চিত্তে অকুল আকাশ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছি না—সুখ কোথায়—সুখ কোথায়? সুখ কেবল দুঃখের অন্ধকারে, হাসি কেবল অশ্রুর তাপে, ফুটিতে না ফুটিতে টুটিয়া ঝরিয়া যায়। আজ কানন তলে দুজনের প্রেমে মগ্ন দুজনে; আকাশের বর্ণমিলন সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে অন্য ভাবের সুর বিকম্পিত, আজ মেঘে মেঘে লাল কালোর মিলন দেখিয়া আমি ভাবিতেছি অশ্রু আছে বলিয়া,—হাসির এত মাহাত্ম্য, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ এত মধুর! তিনিও কি ঠিক এইরূপই ভাবিতেছিলেন! আমার নীরব চিন্তা ভঙ্গ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—" Happiness is not happy enough but must be drugged by the relish of pain and fear."

অতি সুখে দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি অনুতাপ ব্যথা জাগিয়া উঠিল, আমি এত সুখী, আর মিষ্টার জি,? যদি সত্যই তিনি আমাকে ভাল বাসিয়া থাকেন—তাঁহার প্রতি কত দূর অন্যায় করিয়াছি? আমার ভাবনা কি তাঁহার মস্তিষ্ক স্পর্শ করিল! তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন? "ওঃ একটা মস্ত খবর আছে!—কুসুমের সঙ্গে জির বিবাহ? এখন ত বুঝছ তিনি কাকে ভাল বাসতেন? আর জি তোমার ideal of a lover—

আর বেশী কিছু না বলিতে দিয়াই আমি বলিলাম—' সত্যি নাকি? কবে?"

"আমাদের বিবাহের এক সপ্তাহ আগে।"

গাছের আড়াল হইতে নবোদিত চন্দ্রের জ্যোতি তাঁহার মুখে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে সেই রূপের জ্যোতি পান করিতে লাগিলাম।

* * * * * * * *

দুই কলায় মাত্র অসম্পূর্ণ ত্রয়োদশীর নির্ম্মল চন্দ্র নীলাম্বর তলে ভাসিয়া উঠিয়াছে, শেফালিকা রাশি আমাদের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া সুগন্ধে জ্যোস্নালোক বিকম্পিত করিতে করিতে কাননতলে তারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। শরতের জ্যোৎস্না ঈষৎ ম্লানাভ, তাহার ছায়া ছায়া আলোক আমাদের অতি সুখে ম্রিয়মান হৃদয়ের মত বিষাদ স্নিগ্ধ অতি কোমল মধুর।

থাকিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম—" আচ্ছা আপনি—কি ক'রে——"

" আবার আপনি? তবে আমি শুনবনা।"

"আচ্ছা আচ্ছা তুমি—কি করে তুমি আমাকে এতটা দুঃখ দিলে? যখনি আমার কথা থেকে বুঝলে তোমার সঙ্গেই বাবা সম্বন্ধ করছেন—তখন সেটা—

"বুঝলেম বটে, কিন্তু কি করে জানব—যা বুঝছি তাই ঠিক, ভুলও ত হতে পারে?

"তাই আমাকে অমন কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখে গেলে—বেশ যাহক!

"বুঝছ না—আমি ভাবলুম কেবল তোমার বাবার সঙ্গে একটিবার কথা কয়ে তখনি আসব তাপর বিনয় কুমার তোমার ছোটু হয়ে দাঁড়াবে—"

"ভারী একটু কৌতুক নাটক অভিনয় হবে—সে লোভটা আর সামলাতে পারলে না! তা আমার কেন ইতি মধ্যে যতই কষ্ট হোক না! এমনি তোমার ভালবাসা!

"তা বই কি! আর তোমার এমনি ভালবাসা, আমাকে দেখে চিনতেই পারনি। আমি তোমাকে প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলুম!"

"সেটা কিনা খুবই আশ্চর্য্যের কথা! যখনি বাড়ী এসেছ তখনি ত পরিচয় জেনেছ। জেনে শুনে আর চিনতে পারবে না! বরঞ্চ এ অবস্থাতে তুমি যে বরাবর আপনাকে ঢেকে রেখেছিলে—একবার পুরাণ গল্প করতে ইচ্ছাও হয়নি—এটাই মহা আশ্চর্য্য! তোমার ভালবাসা এখানেই বোঝা যাচ্ছে।"

"ঠাকরুণ যে engaged ছিলেন সেটা ভোলেন কেন? তাপর যখন দেখলুম মহাশয়া বাল্য বন্ধুকে চিনতেই পারলেন না তখন ভাবলুম মানে মানে চুপ করে যাওয়াই ভাল; কি জানি যদি আপনি ভেবে নেন পুরাণ পরিচয়ে আমি আমার বন্ধুত্বের দাবী করছি সেটা আমার অসহ্য হোত, তুমি ত আর আমাকে ভালবাসনি তুমি ভাল বেসেছ নূতন লোককে বিনয় কুমারকে—"

"তুমিও, আর আমাকে ভালবাসনি, তুমি ভাল বেসেছ তোমার বাল্য সখীকে?"

আগে মনে করিতাম প্রেমে বুঝি মতামত স্বতন্ত্র ভাব একাকার হইয়া যায় এখন দেখিতেছি ছায়ালোকের মত আকর্ষণ বিকর্ষণের মত প্রেমে দ্বন্দ্ব কলহ মানাভিমান অবিচ্ছেদ্য তাহাতেই ইহা চির নবীন চির জীবন্ত! এমন এক দিনও যায় না যে দিন আমাদের প্রেমালাপে এ দ্বন্দ্ব না বাধে।

অন্ততঃ আমাদের জীবনে, প্রেমালাপ অনবরত এইরূপ দ্বন্দ্বময়। আমি বলি তুমি আমাকে ভালবাস না, ভালবাসিয়াছ তোমার বাল্য সখীকে, তিনি বলেন তুমি আমাকে ভালবাস নাই ভালবাসিয়াছ নূতন লোক বিনয় কুমারকে। এখন পাঠক মীমাংসা করুন—ঠিক কি? কাহাকে ভালবাসিতে ভালবাসিয়াছি কাহাকে?

সূর্য্য।

১। সূর্য্যের মহিমা। এই জবাকুসুম সকাশ প্রকাশাত্মা ভগবন্ সবিত আলোক, তেজঃ, গতি, ও শোভার আকর; ইনি ভূতভাবন। ইহাকে সর্ব্ব কাল সর্ব্বত্র

সর্ব্বলোক ভক্তিভাবে পূজা করেন। ভাস্করের প্রভাব ও সেই প্রভাবের ফল দর্শন করিয়া মনুষ্য মাত্রই বিস্ময়বিমূঢ় হৃদয়ে তাঁহার স্তুতি পাঠ করেন। গায়ক, চিত্রকর, কবি, প্রত্যেকেই সাবিত্রী প্রভায়, শ্রোতাভিরাম লয়, নয়নাভিরাম শোভা এবং মনোভিরাম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া সেই জগৎ প্রসবিতার চরণে প্রণাম করেন। এই প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ডমণ্ডলই জগতের হৃদয়, জগতের প্রাণ। বসুমতী কোটি যোজনান্তরে থাকিয়াও সেই জগদ্ধৃদয়ের স্পন্দনে স্পন্দিতা হন। অত্যুচ্চ ইন্দ্রলোক তাঁহার হৃদুচ্ছাসে উচ্ছসিত হয়। প্রাচীনেরা সৌর মণ্ডলের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না থাকিয়াও বুঝিয়াছিলেন যে এক আদিত্যই প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যের কারণ। তপনের তাপই জীবের জীবনী শক্তি। অরণ্যে তরুগণের প্রবলোপম নব কিশলয়ের উদ্গম্, সুবিমল সরোবরে প্রফুল্ল কমলরাজির হিল্লোল গিরিকন্দর বিনির্গত প্রস্রবনের কুলু কুলু ধ্বনি, শাখাবলম্বী বিহগকুলের মঞ্জুল গীতোৎসব, প্রান্তরে সুবর্ণবর্ণ যবগোধূমের আন্দোলন, ফলপুষ্প বিভূষিত দ্রাক্ষালতার শৈলাঙ্ক আরোহণ, সকলেরই মূল তিনি।

সমস্ত জীবের কল্যান নিধান উষ্ম রশ্মির কিরণ প্রসাদে যাবদীয় শস্য উৎপন্ন ও পরিপক্ক হইতেছে। তাহারই তাপে সাগর বারি বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া পুনঃ আসার রূপে পৃথিবীর তৃপ্তি সাধন এবং নদনদীর পরিপূরণ করিতেছে। স্রোতস্বতী পণ্যপূর্ণ পোতসমূহ সাগরে প্রেরণ করিতেছে। তাঁহারই তাপে তরলিত বায়ুমণ্ডল সমীরিত হইয়া জাহাজ সকল দেশ দেশান্তরে প্রেরণ পূর্ব্বক বণিক সম্প্রদায়ের সুতরাং নরসমাজের সমৃদ্ধি সাধন করিতেছে। স্বয়ং অগ্নিই তাপ। তৃণ কাষ্ঠাদি ইন্ধন সমূহ তাপের রূপভেদ মাত্র; অঙ্গার ও তথৈবচ। সূর্য্যকিরণ সম্ভূত বিশাল বৃক্ষ সমূহ কালসহকারে অঙ্গারে পরিণত হইয়া খনি মধ্যে নিহিত ছিল। সেই অঙ্গার সেই সঞ্চিত সূর্য্যাতপ এক্ষণে এন্‌জিন্ চালাইতেছে; সেই অঙ্গার সেই সঞ্চিত আলোক এখন গ্যাস আলোক হইয়া নাগরিকদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে। এই কোটি কোটি তারাগণের মধ্যে এক মাত্র সূর্য্যের কৃপায় আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, এত সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছি।

২। পৃথিবী হইতে রবির দূরত্ব। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ কিঞ্চিদধিক ৩৯৬৩ মাইল। সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তি সময়ে রবি যদি ক্ষিতিজ বৃত্তে থাকেন এবং তখন যদি ভূগর্ভ হইতে একটি রেখা এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে আর একটী রেখা টানিয়া রবিবিম্বের মধ্যস্থলে সংলগ্ন করা যায় তবে ঐ রেখাদ্বয়ের অন্তর্গত কোণকে রবির পরম লম্বন বলে। এই পরম লম্বনের পরিমাণ ৮·৮১১ বিকলা (চাপাত্মক)। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ এবং রবির পরম লম্বন জানা থাকিলে ত্রিকোণমিতির করণ সূত্র সহায়ে পৃথিবী হইতে রবির দূরত্ব নিরূপণ করা যাইতে পারে।

পরিলেখেস্থ-সূর্য্য, পৃ-পৃথিবী
এবং সৃক স্পর্শরেখা।

পৃক ভূব্যাসার্দ্ধ = ৩,৯৬৩·৫ মাইল

কসূপৃ কোণ সূর্য্যের পরম লম্বন = ৮·"৮১১

$$\text{জ্যা } ৮·"৮১১ = \frac{৩৯৬৩·৫}{\text{সূ পৃ}}$$

$$\text{অতএব রবির দূরত্ব সূ পৃ} = \frac{৩৯৬৩·৫}{\text{জ্যা } ৮·৮১১}$$

লগ, ৩৯৬৩·৫ = ৩·৫৮০২৪১

লগজ্যা ৮০৮১১ = ৫·৬৩০৫৬৯৭

মাইল ৯,২৭, ৮০,০০০ = ৭·৯৬৭৪৫৪৪ ।

অতএব পৃথিবী হইতে সূর্য্য স্থূলতঃ ৯ কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূরে আছেন। অর্থাৎ রবির দূরত্ব ভূব্যাসের ২৩,০০০ গুণে অধিক ।

সৌরজগতে সমস্ত দূরত্ব কোটি, দশকোটি শতকোটি মাইল ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা ব্যক্ত হয়, কিন্তু কোটির প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গমকরা সহজ নহে। রেলগাড়ী যদি অবিরামে প্রত্যহ ঘণ্টায় ৩০ মাইল যায় তবে কোটি মাইল যাইতে ৩৭ বৎসর লাগে, সুতরাং এই হিসাবে সূর্য্যলোকে যাইতে সাড়ে তিনশত বৎসর লাগে, কামানের গোলা প্রতি সেকণ্ডে ১,১৩০ ফুট যায়, এই বেগে গোলা যদি বরাবর চলে তবে ১৫বৎসরে রবিমণ্ডলে পৌঁছিতে পারে। দিনে এক দুই করিয়া ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যদি টাকা গণিতে কুড়ি সপ্তাহ লাগে এক কোটি মোহর কোঁড়াদিয়া গাঁথিয়া মালা করিলে মালা প্রায় ২০০ মাইল লম্বা হইবে এবং উহা কলিকাতাকে মাঝারে রাখিয়া থন্যান, তারকেশ্বর, তমলুক ডাএমণ্ডহারবর মাতলা বসির হাট ও মদনপুর ইত্যাদি দিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারে। আলোকের গতি প্রতি সেকণ্ডে ১,৮৬,৫০০ মাইল, সুতরাং রবিমণ্ডল হইতে ভূলোকে আলোক আসিতে ৮ মি ১৭½সে লাগে।

সূর্য্য সিদ্ধান্তের মতে রবির দূরত্ব ভূব্যাসের ৮৪০ গুণের কম। বাস্তব পরিমাণের পৌনে তিন গুণের কম। সিদ্ধান্ত মতে ভূব্যাসার্দ্ধ ৮০০ যোজন।

যোজনানী শতান্যষ্টৌ ভূকর্ণ দ্বিগুণনিতু।
তদ্বর্গতো দশগুণাৎ পাদং ভূপরিধি র্ভবেৎ॥ ১।৫৯॥

এই সূত্র অনুসারে

$$\frac{(২ \times ৮০০)^২}{} \times ১০ = ৫০৯৫.৫৫৬ \text{ যোজন ভূ পরিধি।}$$

রবিকক্ষা ৪৩৩১৫০০ যোজন

ততো হর্ক-বুধ শুক্রানাং খখর্থৈক সুবার্ণবাঃ॥ ১২।৮৬॥

এবং কোন কক্ষাকে পৃথিবীর ব্যাসদিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে পৃথিবীর পরিধি দিয়া

ভাগদিলে সেই কক্ষার ব্যাস পাওয়া যায় এবং ইহাকে ভুব্যাসদিয়া হীন করিয়া বিয়োগ ফলের অর্দ্ধ লইলে ইষ্ট গ্রহের দূরত্ব পাওয়া যায়। তবেই রবির দূরত্ব

কক্ষা ভূকর্ণ গুণিতা মহিমণ্ডল ভাজিতা,।
তৎকর্ণা ভূমিকর্ণোনা গ্রহোচ্চাং খং দলীকৃতাঃ॥ ১২।৮৪॥

$$= \frac{১}{২}\left(\frac{৪৩৩১৫০০ + ১৬০০}{৫০৯৫৫\cdot৫৬} - - ১৬০০ \right) = ৬৭,২০৪ \text{ যোজন।}$$

যোজনের পরিমাণ যে কত তাহা স্থিরকরা অসাধ্য। কাহার মতে ১৮ ইঞ্চ হাতের ১৬০০০ হাতে এক যোজন হয়, আবার কাহারও মতে ৩২০০০ হাতে এক যোজন হয়; ফলতঃ যোজনে ৪½ মাইল হইতে ১০ মাইল যায়!

হস্তৈ শ্চতুর্ভির্ভবতীহ দণ্ডঃ ক্রোশসহস্র দ্বিতয়েন তেষাং।
স্যাদ্ যোজনং ক্রোশচতুষ্টয়েন। লীলাবতী॥
দ্বাদশাঙ্গুলিকঃ শঙ্কুস্তদ্দ্বয়ন্তু শয়ঃ স্মৃতঃ।
তচ্চতুষ্কং ধনুঃপ্রোক্তং ক্রোশো ধনুসহস্রিকঃ॥
তচ্চতুষ্কং যোজনং স্যাৎ।
এতন্মতে ষোড়শ সহস্র হস্তৈ র্যোজনং ভবতি। দ্বাত্রিংশৎ সহস্র হস্তৈ রপি যোজনং। শব্দকল্পদ্রুমঃ॥

৩। পৃথিবীর কক্ষাগতির বেগ। পৃথিবী একবৎসরে অর্থাৎ ৩৬৫¼ দিনে রবির চতুর্দ্দিকে একবার ভ্রমণ করেন, সুতরাং ভূকক্ষাকে ৩৬৫¼ দিয়া ভাগ দিলে রবি বা পৃথিবী এক দিনে কতদূর যান তাহা স্থির করা যাইতে পারে। পৃথিবী হইতে রবির যে দূরত্ব তাহাই ভূকক্ষার ব্যাসার্দ্ধ, অতএব কক্ষাপরিধি ২৭৯,২৭,৮০,০০০ = ৫৮,২২,২০,০০০ মাইল; ইহাকে ৩৬৫¼ দিয়া ভাগ দিলে ভাগ ফল ১৫,৯৬,০০০ মাইল হইল। এই ১৫,৯৬,০০০ মাইল পৃথিবী প্রতিদিন স্বীয় কক্ষে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করেন। পৃথিবীর কক্ষাগতি প্রতি ঘণ্টায় ৬৬,৫০০ প্রতিদণ্ডে ২৬, ৬০০ প্রতি মিনিটে ১১০৮ এবং প্রতি সেকণ্ডে ১৮ মাইলের অধিক। সাধারণতঃ রেলগাড়ী ১ ঘণ্টায় যতদূর যায় পৃথিবী ১ সেকণ্ডে ততদূর যান।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি বশতঃ তদীয় নিরক্ষ প্রদেশস্থ কোন বিন্দু ঘণ্টায় ১০৩৭ বা মিনিটে ১৭ মাইল আবর্ত্তিত হয়। পৃথিবীর কাক্ষ্যা বা বার্ষিকী গতি আহ্ন্যা বা দৈনিকী গতি অপেক্ষা ৬৪ গুণে বেগবতী।

৪। রবিবিম্বের ব্যাস। পৃথিবী হইতে রবির দূরত্ব ৯,২৭,৮০,০০০ মাইল এবং প্রত্যক্ষ রবিবিম্বের চাপাত্মক ব্যাস ৩২′ ৩″৬৪; অর্থাৎ বিম্বের ব্যাসের উভয় প্রান্তে সংলগ্ন

দুই দৃক সূত্রের অন্তর্গত কোণ ৩২´ ২·´´৬৪। অতএব যদি দূরত্বকে দূ বলি আর ব্যাসার্দ্ধকে ব্যা বলি, তবে।

জ্যা ১৬´ ১·৮ = ব্যা/দূ

অতএব ব্যাসার্দ্ধ ব্যা = ৯,২৭,৮০,০০০ × জ্যা ১৬´ ১·´´৮

লগ-৯,২৭,৮,০০০০ = ৭·৯৬৭৪৫৪৪,

লগ, জ্যা ১৬´ ১·´´৮ = ৭·৬৬৮৬৫৮১,

লগ, ৪৩২ ৬২০ মাইল = ৫·৬৩৬ ১১২৫ ব্যাসার্দ্ধ,

অতএব ব্যাস = ৮,৬৫,২৪০ মাইল

সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে রবিবিম্বের ব্যাস ৬৫০০ যোজন।

সার্দ্ধানি ষটসহস্রানি যোজনানী বিবস্বতঃ।
বিস্কম্ভো মণ্ডলস্য··· ··· ॥ ৪।১ ॥

রবি মণ্ডলের ব্যাস ভূব্যাসাপেক্ষা ১০৯ গুণে অধিক। এই প্রকাণ্ড গোলের উপরি ভাগের ক্ষেত্র ফল ভূগোগের পৃষ্ঠফল অপেক্ষা ১১৯৪০ গুণে অধিক।

গোলের পৃষ্ঠফল বাহির করিবার সূত্র,

ব্যাসের বর্গকে ৩·১৪১৬ দিয়া গুণ করিলে লব্ধরাশি পৃষ্ঠফল হয়। অতএব পৃথিবীর পৃষ্ঠফল = ৭৯২৭ × ৩·১৪১৬ = ১৯, ৭৪,১০,০০০ বর্গ মাইল।

ভাস্করের ভূব্যাস ১৫৮১$\frac{২৪}{২৫}$; তিনিও ঐ নিয়ম অনুসারে পৃথিবীর পৃষ্ঠফল ৭৮, ৫৩০৩৪ বর্গ যোজন ধরিয়াছেন। লল্লাচার্য্য এই পৃষ্ঠফল সম্বন্ধে বড়ই ভুল করিয়াছেন। তিনি ২৮৫ ৬৩ ৩৮ ৫৫৭ যোজন পৃষ্ঠফল বলিয়াছেন। ভাস্কর তাহার ভ্রমের কারণও দর্শাইয়াছেন।

প্রোক্ত যোজন সংখ্যয়া কুপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দাবব্ধয়—৪৯৬৭
স্তদ্‌ব্যাসঃ কুভুজঙ্গসায়কভুবঃ সিদ্ধাংশকেনাধিকাঃ ১৫৮১$\frac{২৪}{২৫}$।
পৃষ্ঠক্ষেত্র ফলং তয়া যুগগুণত্রিংশচ্ছরাষ্টাদ্রয়ো ৭৮,৫৩,০৩৪
ভূমে কন্দুক জালবৎ কুপরিধিব্যাসাহতে প্রস্ফুটং ॥

৩৫২। গোলাধ্যায়ে ॥

নগশিলীমুখবান ভুজঙ্গম জ্বলনবহ্নিরসেষুগজাশ্বিন; ২৮৫৬৩৩৮৫৫৭॥
কুবলয়স্য বহিঃ পরিযোজনান্যথ জগুঃ খলু কন্দুক জালবৎ।১॥

শিষ্যধীবৃদ্ধিদে ভূগোলাধ্যায়ে।

রবিমণ্ডলের ঘনফল পৃথিবীর ঘনফলাপেক্ষা ১৩ লক্ষ ৫ হাজার গুণে অধিক। গোলের পৃষ্ঠফলকে ব্যাসদিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৬ দিয়া ভাগদিলে লব্ধাঙ্ক গোলের ঘনফল হয়।

পৃথিবীর ঘনফল = ১৯৭৪১০০০০ × ৭৯২৭ = ২৬০৮১,১৫,১১,৬৬৬

ভাস্করের মতে পৃথিবীর ঘনফল = ৭৮৫৩০৩৪ × ১৫৮১ $\frac{২}{৪}$ = ২০৬৯২৭৯৯১৪ যোজন।

তাঁহার নিয়ম এই ৬

বৃত্তক্ষেত্রে পরিধিগুণিতব্যাস পাদঃ ফলং তৎ
ক্ষুণ্ণং বেদৈরুপরি পরিতঃ কন্দুকস্যেব জালম্।
গোলস্যৈবং তদপিচফলংপৃষ্ঠজং ব্যাসনিঘ্নং।
ষড়্ভির্ভক্তং ভবতি নিয়তং গোলমধ্যে ঘনাখ্যম্॥ ৯৭।
লীলাবত্যাং ক্ষেত্র ব্যবহার ঃ।

রবিমণ্ডলের চাপাত্মক ১ বিকলায় ৪৪৩ মাইল। দূরবীক্ষণের নেত্রকাচে যে এড়ো মাকসার জাল থাকে তাহাতে উক্ত বিম্বের ১৪৯ মাইল আচ্ছাদিত হয়। যে গোলের ব্যাস হাত তাহাকে যদি পৃথিবী মনেকরা যায় তবে যে গোলের ব্যাস ১০৯ হাত তাহা রবিমণ্ডলের অনুরূপ হইত।*

৫। রবিমণ্ডলের সান্দ্রত্ব। কোন পদার্থকে যদি কোন সংখ্যক ভাগে এবং কোন আকারে এরূপ খণ্ড খণ্ড করা যায় যে প্রত্যেক খণ্ডের ঘনফল ও প্রত্যেক খণ্ডের সামগ্রী সমান হয় অর্থাৎ প্রত্যেক খণ্ড ঘনফলে ও ওজনে সমান হয় তবে উক্ত পদার্থকে সমসান্দ্র পদার্থ বলে। এরূপ পদার্থের ঘনফলের একককে অর্থাৎ উহার এক এক ঘন বা এক এক ঘন ফুটে যে পরিমাণে সামগ্রী থাকে তাহাকেই উহার সান্দ্রত্ব বলে। সমঘন ফল পদার্থদ্বয়ের সান্দ্রত্বের যে অনুপাত তাহা তাহাদের সামগ্রীর অনুপাত অনুযায়ী। সান্দ্রত্বকে সাধারণতঃ সাপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। ভূব্যাস অপেক্ষা রবিমণ্ডলের ব্যাস ১০৯ গুণে অধিক। গোলের ঘনফল ব্যাসের ঘনফলের অনুপাতী। অতএব রবিমণ্ডলের ঘনফল ভূমণ্ডলের ঘনফল অপেক্ষা ১২ ৯৫, ০০০; কিন্তু রবিমণ্ডলের সামগ্রী ভূমণ্ডলের সামগ্রী অপেক্ষা ৩ ৩০, ৫০০ গুণ মাত্র সুতরাং $\frac{৩৩০৪০০}{১২৯৫ ০০০}$ = ·২৫৫ অর্থাৎ সৌর সান্দ্রত্ব পর্থিব সান্দ্রত্বের পাদ মাত্র বলিলে হয়, তবেই জল অপেক্ষা বড় অধিক ভারি নহে এবং পাথুরে কয়লা অপেক্ষা ওজনে কম। পৃথিবীর সান্দ্রত্ব জলাপেক্ষা ৫·৬৭ গুণ; রবির সান্দ্রত্ব জলাপেক্ষা ১·৪২। অথবা রবিমণ্ডলের সান্দ্রত্ব আরও অধিক হইতে পারে কারণ আমরা যে মণ্ডল দেখি রবির বাস্তব মণ্ডল তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবার সম্ভাবনা।

৬। রবিবিম্বের আকার। রবিমণ্ডল স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তিত হয়। অক্ষে আবর্ত্তিত পদার্থ গোল হইতে পারেনা। উহা গোলাভাসত্ব প্রাপ্ত হয়। কেন্দ্রদ্বয়ে গোলত্বের

---

* রবিমণ্ডলের বিশালত্বের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এই তথ্যটি চিন্তা করা উচিত। রবিবিম্বের ব্যাস চান্দ্রকক্ষের ব্যাসের প্রায় দ্বিগুণ। যে গোলের পরিধি চান্দ্রকক্ষের ব্যাসের সমান এরূপ ছয়টি গোলের সমষ্টি অপেক্ষাও রবিমণ্ডল বড়।

অপচিতির প্রযুক্ত বৃত্তাভাসত্ব জন্মে। গোলত্বের অপচিতির প্রধান কারণ কেন্দ্রবিমুখ বল আর মণ্ডলের উপরি মাধ্যাকর্ষণের বল। গোলাভাসত্বের পরিমাণ অর্থাৎ কেন্দ্রদ্বয়ে গোলত্বের স্থলে যে পরিমাণে সপাটত্ব জন্মে তাহা উক্ত দুই বলের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। রবিমণ্ডলের আক্ষ্য আবর্ত্তনের বেগ অল্প তজ্জন্য তদীয় নিরক্ষ বৃত্তের কোন কণার কেন্দ্র বিমুখবল ভূমণ্ডলের নিরক্ষবৃত্তীয় কোন কণার কেন্দ্রবিমুখ বলের ছয় অংশের একাংশ। কিন্তু সৌরমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ পার্থিব মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা ৩০ গুণে অধিক; অতএব রবিকেন্দ্রের সপাটত্ব ভূকেন্দ্রের সপাটত্বের ৬×৩০=১৮০ ভাগের একভাগ। কিন্তু ভূকেন্দ্রের সপাটত্বের পরিমাণ $\frac{১}{৩০০}$ অতএব সৌরমণ্ডলের সপাটত্বের পরিমাণ $\frac{১}{১৮০ \times ৩০০}$ $= \frac{১}{৫৪০০০}$; তাহা হইলেই রবিমণ্ডলের কেন্দ্রগত ব্যাসের এবং নিরক্ষবৃত্তগত ব্যাসের যে অন্তর তাহা এক বিকলার বিংশতি অংশের একাংশ অপেক্ষাও ন্যূন, সুতরাং তাহা বেধ সাধ্য নহে এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রবিমণ্ডল গোল।

৭। রবিমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণ।—গোলস্থিত সামগ্রী সমূহ গোলের মধ্যস্থ বিন্দুমাত্রে নিহিত হইলে যে রূপ আকর্ষণ হইবে সমস্ত গোলেরও সেইরূপ আকর্ষণ, গোল নিরেটই হউক আর ফাঁপা হউক। আর আকর্ষণ সামগ্রী অনুলোমী এবং দূরত্বের বর্গের বিলোমী; অর্থাৎ সামগ্রী এক হইলে আকর্ষণ এক হইবে, সামগ্রী দুই হইলে আকর্ষণ দুই হইবে; কিন্তু আকর্ষক হইতে আকৃষ্টের দূরত্ব সম্বন্ধে হিসাব এরূপ নহে। ভূমধ্য হইতে অর্দ্ধভূব্যাস উর্দ্ধে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে পৃথিবীর আকর্ষণ যত, দুই ব্যাসার্দ্ধ উর্দ্ধে (দুইএর বর্গ ৪) আকর্ষণ $\frac{১}{৪}$, তিন ব্যাসউর্দ্ধে (তিনের বর্গ ৯) আকর্ষণ $\frac{১}{৯}$। এখন ভূব্যাস ৭৯২৭ মাইল, রবিমণ্ডলের ব্যাস ৮৬৫২৪০ মাইল, তবেই রবিমণ্ডলের ব্যাসার্দ্ধ ভূমণ্ডলের ব্যাসার্দ্ধ অপেক্ষা প্রায় ১০৯ গুণে অধিক এবং সূর্য্যমণ্ডলের সামগ্রী ভূমণ্ডলের সামগ্রী অপেক্ষা ৩,৩০,৫০০ গুণে অধিক। অতএব পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যদি ১ ধর তবে রবির মাধ্যাকর্ষণ $\frac{৩৩০৫০০}{১০৯২}$ = ২৭.৮১৮ প্রায় ২৮ হইবে অর্থাৎ এখানে যে জিনিসের ওজন ১ সের সে জিনিস সূর্য্যমণ্ডলে স্প্রীং তুলায় ওজন করিলে ২৮ সের হইবে। সূর্য্যমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণ এত অধিক যে কামান হইতে গোলা বাহির হইয়া অবিলম্বে কামানের অত্যল্পদূরে পতিত হয়। ভূমণ্ডল হইতে মানুষ যদি সূর্য্যমণ্ডলে যায় তবে আকর্ষণের জোরে পিষ্ট হইয়া পাতলা পাতের মত হইয়া পড়িবে; অথবা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে।

ভূপৃষ্ঠে পদার্থের পতন মান এক সেকণ্ডে ১৬.০১ ফুট অর্থাৎ পৃথিবীর কোন উচ্চ·

স্থান হইতে একটী বাঁটুল বা কোন দ্রব্য পড়িলে উহা প্রথম সেকণ্ডে ১৬.০১ ফুট অধঃপতিত হয়, রবিমণ্ডলে এক সেকণ্ডে ১৬.১ × ২৭.৮১৮ = ৪৪৭.৮ ফুট পড়িবে।

৮। সৌরলাঞ্ছন।—সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের জন্য রঞ্জিত কাচবিশিষ্ট দুরবীক্ষণ ব্যবহার করা উচিত। রঞ্জিত কাচ দ্বারা চক্ষুর পীড়াদায়ক তাপের অপনয়ন হয়। রঞ্জিত কাচ বিনা অহরহ মরীচিমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া গালিলিওর চক্ষুষ্মত্তার নাশ হইয়াছিল। এবম্ভূত উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে রবিমণ্ডলে সতত নানারূপ কাল চিহ্ন উপলব্ধি হয়; এই চিহ্নগুলিকে সৌরলাঞ্ছন বলে।

কি ভয়ানক কথা! যিনি স্বয়ং শুচি যিনি লোকলোচন তাঁহার আবার চক্ষুরোগ! তাহাতে কলঙ্ক আরোপ! কি দুঃসাহস! চাঁদেরই কলঙ্ক দেখি, চাঁদই মৃগ লাঞ্ছন,—জ্যোতির্ম্ময় দিবাকরেও দাগ আছে? পূর্ব্বকালের খৃষ্টানদিগেরও বিশ্বাস ছিল যে সূর্য্য স্বভাবতঃ নির্ম্মল। তাঁহার নির্ম্মলত্বে সন্দেহ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। জেসুইট সম্প্রদায়ী জনৈক ধর্ম্মপ্রচারক রবিমণ্ডলে কলঙ্ক অবলোকন করিয়া তাঁহার গুরুকে সে বিষয় জানাইলে, গুরু শিষ্যের মতিভ্রম হইয়াছে বুঝিয়া বলিলেন "বাপু! আমি আরিষ্টোটেলের গ্রহাবলি বারম্বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি তুমি যাহা বলিতেছ তাহার কথা তো কোথাও দেখি না, তোমার চক্ষের বা যন্ত্রের দোষ জন্মিয়াছে"। অনেক দিন পরে বাবাজী সৌরলাঞ্ছন সম্বন্ধে স্বীয়মত প্রকাশ করিবার অনুমতি পাইলেও নিজের নাম গোপন করিয়া প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন। অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর কথা নাই। প্রাচীনেরা শুধু চক্ষে ক্ষিতিজ সমীপে রবিমণ্ডলে শ্যামাঙ্ক দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলিকে তাঁহারা গ্রহ বা মেঘ মনে করিতেন অর্থাৎ তত্ত্বতঃ সে গুলি যে কি তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন না। লেখা আছে যে চীন জ্যোতিষীরা কজ্জলিত কাচ সহায়ে খৃ. অ. ৩০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে পঁয়তাল্লিশটি কুল, খর্জ্জুর বা অণ্ডাকার সৌরলাঞ্ছন দর্শন করিয়াছিলেন। আমেরিকার আদিবাসীদিগের প্রমুখাৎ স্পেনীয়েরা শুনিয়াছিলেন যে সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্ক দেখা গিয়াছিল।

সূর্য্যমণ্ডল যে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক নহে তাহা আর্য্য ঋষিরাও বিশ্বাস করিতেন, নচেৎ

আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েণ রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন।

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃ শনৈঃ।
তেনাস্মিন শ্যামিকা জাতা শাতনোর্চিষস্তথা

এরূপ বচনাদি দ্বারা আর কি বুঝা যাইতে পারে।

চিহ্নগুলি স্থায়ী নহে। কখন কখন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কখন কখন প্রকাণ্ড চিহ্ন মণ্ডলের পূর্ব্বাংশে উদিত হইয়া ক্রমশঃ মধ্যভাগে উপনীত হয় এবং প্রায় ১৪ দিন উদিত থাকিয়া পশ্চিমাংশে অস্তমিত হয়। অনন্তর ১৪ দিন অদৃশ্য থাকিয়া আবার পূর্ব্বাংশে কখন কখন

যেখানে প্রথমে উদিত হইয়াছিল সেই স্থানে পুনরুদিত হয় এবং পূর্ব্ববৎ মণ্ডলের এদিক হইতে ওদিকে চলিয়া যায়। একবার মণ্ডল ভ্রমণে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা লাগে।

সৌরলাঞ্ছন গুলি দেখিতে প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং কদাকার। ইহার এক এক খণ্ডকে কুণ্ড বলে। প্রায় প্রত্যেক কুণ্ড ঈষৎ শ্যামল অঞ্চল বেষ্টিত। এই শ্যাম অঞ্চলকে কুণ্ডের উপচ্ছায়া বলে। ইহা কুণ্ডের মত কাল নহে। সামান্যতঃ অঞ্চলের আকার কুণ্ডের আকার সদৃশ। এক এক লাঞ্ছনের এক এক উপচ্ছায়া। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে দুই কিম্বা তদধিক লাঞ্ছন এক উপচ্ছায়া দ্বারা বেষ্টিত। লাঞ্ছনের আকার প্রায় সরা বা পিরিচের মত। পিরিচের তলা হইল কুণ্ড, আর ঢাল হইল উপচ্ছায়া।

কোন কোন লাঞ্ছনের উপচ্ছায়া থাকেনা এবং কুণ্ড বিহীন উপচ্ছায়াও দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু উপচ্ছায়া বিশিষ্ট কুণ্ডই সাধারণ।

৯। লাঞ্ছনের আকার পরিবর্ত্তন। লাঞ্ছনের আকারদিন দিন কখন কখন ঘণ্টায় পরিবর্ত্তিত হয়। লাঞ্ছনগুলি প্রথমতঃ অতি ক্ষুদ্র থাকে (এত ক্ষুদ্র যে যন্ত্র দিয়াও দেখা যায় না) কিন্তু অতি শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং এক দিবসের মধ্যেই পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়; তাহার পর পরিচ্ছিন্ন উপচ্ছায়া পরিবেষ্টিত হইয়া দশ, কুড়ি এবং কখন কখন চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে ; অনন্তর কুণ্ড একটি আলোক রেখা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়। এই আলোক রেখা হইতে বিস্তর শাখা বহির্গত হয়, এবং শাখা গুলি যাবৎ না সমস্ত কুণ্ড উপ-চ্ছায়া দ্বারা অচ্ছাদিত হয় তাবৎ বাড়িতে থাকে। কখন বা কুণ্ডের কিয়দংশ উপচ্ছায়া আসিয়া পড়ে, কখন বা আকার অপরিবর্ত্তিত থাকে কিন্তু অবস্থানের ও দিকের পরিবর্ত্তন হয়।

ঘণ্টামাত্র কাল মধ্যে লাঞ্ছনের আকারের স্পষ্ট পরিবর্ত্তন টের পাওয়া গিয়াছে। লাঞ্ছন যখন ছয় সপ্তাহের অধিক থাকেনা তখন উপলব্ধি হয় যে রবিমণ্ডলের উপরিভাগের অর্থাৎ লাঞ্ছনের স্থিতিকালের স্থিরতা নাই। কোন লাঞ্ছন উদিত হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ত-র্হিত হয়, আবার কোন লাঞ্ছন সপ্তাহ বা মাসাবধি থাকে। ১৮৪০ খৃ, অব্দে একটি লাঞ্ছন নয় বার রবিমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিল অর্থাৎ সেটিকে আটমাস পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল।

১০। সৌর লাঞ্ছনের আয়তন ও সংখ্যা। সৌরলাঞ্ছন কখন কখন এত বৃহৎ হয় যে তাহা শুধুচক্ষে পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে। ১৮৪৩ অব্দে একটি লাঞ্ছন সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিনা দূরবীক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহার প্রস্থ চাপাত্মক ১৬৭ বিকলা অর্থাৎ অনন্য সাপেক্ষ পরিমানে ৭৪,০০০ মাইল। ,

লাঞ্ছনের সংখ্যার কিছু ঠিক নাই। কখন কখন বিম্ব সম্পূর্ণরূপে লাঞ্ছন বিনির্মুক্ত থাকে অর্থাৎ একটিও দাগ বা চিহ্ন দেখা যায় না। মণ্ডলের এরূপ নিষ্কলঙ্ক ভাব সপ্তাহ বা কতি-পয় মাস পর্য্যন্ত থাকে। কখন বা সমস্ত বিম্ব লাঞ্ছনে আচ্ছন্ন হইয়া যায় কখন বা অসংখ্য ক্ষুদ্র লাঞ্ছন দেখা যায়, এবং কখন বা বহুব্যাপত লাঞ্ছনপুঞ্জ নয়ন গোচর হয়। ১৮৪৮ খৃ

অব্দে একটি বৃহল্লাঞ্ছন পুঞ্জে ২০০এর অধিক স্বতন্ত্র লাঞ্ছন দেখা গিয়াছিল। ১৮৩৭ এ এক লাঞ্ছন পুঞ্জ মণ্ডলের ৫ বর্গকলা স্থান অর্থাৎ ৩৫৩ কোটি বর্গ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপিয়া ছিল।

১১। কৃষ্ণ কুণ্ড। লাঞ্ছনের কাল বর্ণ কুণ্ড সম্পূর্ণরূপে আলোক বিহীন কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। কারণ অত্যন্ত প্রখর কৃত্রিম আলোক রবিমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইলে কাল চিহ্নের মত দেখায়। স্যার উইলিয়াম হরসেলের মতে উপচ্ছায়ার আলোক উজ্জ্বলাংশের আলেকের অর্দ্ধমাত্র এবং কুণ্ডের আলোক উজ্জ্বলাংশের আলোকের শতাংশের একাংশ মাত্র।

আলোক ও তাপের যে ক্রম অনুসারে হ্রাস হয় তাহা দেখিয়া প্রতীতি হয় যে সৌর মণ্ডল বায়ুকোষে আবৃত। মণ্ডলের মধ্যাসন্ন স্থানের স্বাভাবিক দীপ্তি চূর্ণালোক বা বৈদ্যুতিক আলোক অপেক্ষা ১৫০ গুণ অধিক। অথবা বিম্বের ব্যাসার্দ্ধ যদি ১২ অঙ্গুলি ধরা যায় এবং মধ্য স্থলের আলোকের পরিমাণ যদি ১০০ ধর তবে মধ্যে ১০০

মধ্য হইতে ৪ অঙ্গুলি অন্তরে		৯৬
৮	..	৭৭
,, ১০	,,	৫১
প্রান্তে		১৩।

১২। বিম্বের কোন অংশে লাঞ্ছনের আবির্ভাব। রবি মণ্ডলের নিরক্ষ বৃত্তের উভয় পার্শ্বে চাপাত্মক ৩০ অংশ বিস্তৃত যে মেখলা তাহারই মধ্যে লাঞ্ছন সকল দৃষ্ট হয়। ৩০° এবং ৪৫° এর মধ্যে তিনটি মাত্র লাঞ্ছনের কথা লেখা আছে। নিরক্ষ বৃত্তে কিম্বা উহার ৮° এবং মধ্যে লাঞ্ছন প্রায় দৃষ্ট হয় না। ৮° ও ২০° অক্ষ সমান্তর বৃত্ত মধ্যেই লাঞ্ছনের প্রাচুর্য্য। মণ্ডলের দক্ষিণার্দ্ধ অপেক্ষা উত্তরার্দ্ধে লাঞ্ছনের সংখ্যা অধিক এবং আকার বৃহৎ। যখন বহু সংখ্যক লাঞ্ছন পুঞ্জাকারে দৃষ্ট হয় তখন সেগুলি প্রায়ই নিরক্ষ বৃত্তের সমান্তরে এক রেখায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে।

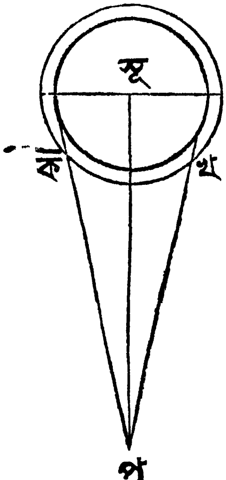
১৩। বিম্বের দীপ্তিমৎ অংশ সর্ব্বত্র সমোজ্জ্বল নহে। কৃষ্ণ লাঞ্ছন ভিন্ন বিম্বের অবশিষ্ট অংশ অবশ্যই স্বপ্রকাশ কিন্তু স্বপ্রকাশাংশ সর্ব্বত্র সমান উজ্জ্বল নহে। এক খণ্ড সালোক মেঘস্তরের আকার যদি বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত না হয় এবং উহার গভীরতা যদি সর্ব্বত্র সমান না হয় তবে ঐ মেঘস্তর যেমন কর্ব্বুরীকৃত দেখায় রবিবিম্বের ভাস্বদংশও তদ্বৎ কল্‌মাষিত দেখায়। কৃষ্ণলাঞ্ছনের ন্যায় এই কর্ব্বুরিত দৃশ্য কোন মেখলা বিশেষে আবদ্ধ নহে। সমস্ত মণ্ডলে এমন কি আবর্ত্তন কেন্দ্র পর্য্যন্ত এইরূপ চিত্রিত দৃশ্য লক্ষিত হয়। কমলা নেবুর খোসার বন্ধুরতা জন্য খোসা যদ্রূপ দেখায় উক্ত কর্ব্বুরীকৃত অংশও তদ্রূপ দেখায়, কিন্তু বন্ধুরতা পক্ষে কিঞ্চিন্ন্যূন। অধুনাতন কালে মিষ্টার নেসমিথ প্রকাশ করিয়াছেন যে সৌরমণ্ডল সুসংহত স্তূপীকৃত কিমপি রেখাবৎ আলোক সত্বায় আবৃত। অচি-

রোদ্গত করবীর পত্রের অগভীর, সপাট, এবং কথঞ্চিৎ অবিরল স্তরের সহিত উক্ত আলোক রেখার তুলনা হইতে পারে।

১৪। উল্মুক। রবিবিম্বের নিরক্ষবৃত্তের প্রান্তে সমুজ্জ্বল আলোক রেখা সতত দৃষ্ট হয়। ইহাকে উল্মুক বা উল্কা বলে। মণ্ডলের সমতল পৃষ্ঠোপরি আলির ও উজ্জ্বল ন্যায় সমধিক উন্নত স্থানই উল্কা। ইংলণ্ডের মিষ্টার ডস্‌র পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বিষয়টি প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বিম্বের ঠিক প্রান্তে একটি অসাধারণ আকার বিশিষ্ট উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পান। রেখাটি বিম্বের পরিধি ব্যক্তকবৃত্ত অতিক্রম করিয়া শৈলরাজির ন্যায় বিদ্যমান ছিল। উল্মুক সকল লাঞ্ছন সমীপে উপচ্ছায়ার ঠিক বহির্ভাগে দৃষ্ট হয়। যেস্থানে লাঞ্ছন ছিল বা লাঞ্ছনের পুনরুদয়ের সম্ভাবনা সেই স্থানে উল্মুক দেখা যায়। উল্মুক প্রবাল বিশেষের সদৃশ বিরূপাকার কিন্তু চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। স্যার উইলিয়াম হরসেল চাপাত্মক ২´ ৪৬´´ অর্থাৎ ৭২০০০ মাইল একটি উল্মুক দেখিয়া ছিলেন।

১৫। রবিমণ্ডলের বাহ্যকোষ যে সসার নহে তাহার প্রমাণ। রবিবিম্বের উপরি ভাগে অচিরকালমধ্যে ভূয়ো ভূয়ো নানারূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে এ মণ্ডলের সারবত্তা নাই। মণ্ডলেব প্রকাণ্ড পিণ্ডের সসারত্ব স্বীকার করিলেই বা কি ? যে অংশ সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই তাহা নিশ্চয়ই দ্রব বা বায়বীয়। সৌর-লাঞ্ছনের ঘণ্টায় ১০০ মাইল গতি দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হয় যে যে ভাস্বৎ পদার্থে উক্ত মণ্ডল আবরিত তাহা অবশ্য বায়ুবৎ কারণ দ্রব পদার্থ এতবেগে কখন চালিত হইতে পারে না।

১৬। সৌর লাঞ্ছন গ্রহ বিশেষ নহে। লাঞ্ছন গুলি বিম্বের উপরি ভাগেই আছে তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সেগুলি যদি গ্রহবৎ মণ্ডলের বহির্ভাগে কিয়দ্দূরে পরিভ্রমণ করিত তাহা হইলে যে সময় ব্যাপিয়া তাহাদিগকে বিম্বের উপরিভাগে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায় সে সময় পরিভ্রমণের সমস্ত কাল হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট কাল অধিক হইত। রেখাময় ছেদ্যক দ্বারা প্রস্তাবটি স্পষ্টীকৃত করা যাইতেছে। সূ সূর্য্য পৃ পৃথিবী কখগ রবি পরিতঃ অস্বচ্ছ পদার্থের পরিধি অর্থাৎ এই বৃত্তে লাঞ্ছন পরিভ্রমণ করে। পদার্থ যতক্ষণ কক্ষাংশ কখ এ থাকে ততক্ষণ উহার গতি সূর্য্য-বিম্বের উপর দিয়া হইতেছে বোধ হয়। এই কখ সমস্ত পরিধির অর্দ্ধাংশের ন্যূন। লাঞ্ছন যতক্ষণ বিম্বোপরি দেখা যায়, প্রায় ঠিক ততক্ষণ অদৃশ্য থাকিয়া পুনরুদিত হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে বিম্ব দিয়া পশ্চিমে আসিতে যতক্ষণ লাগে, পশ্চিম হইতে আবার পূর্ব্ব দিকে আসিতে প্রায় ততক্ষণ লাগে। অতএব লাঞ্ছন মণ্ডলের বহিঃস্থিত কোন পদার্থ নহে।

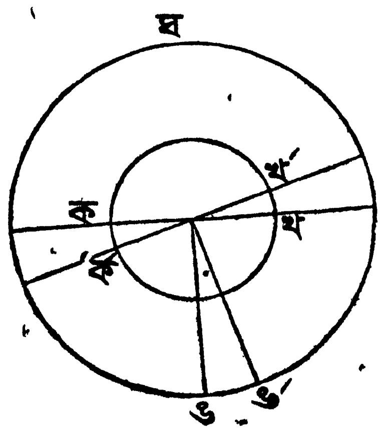


১৭। **শ্যাম লাঞ্ছন রবিমণ্ডলের সপ্রভ অংশগত নিম্ন স্থান।** ১৭৬৯ অব্দে গ্লাসগো নিবাসী ডাক্তার উইল্‌সন্ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে রবি মণ্ডল উপর্য্যুপরি দুইটি বায়ুকোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত, বহিঃস্থ কোষটি সপ্রভ, অন্তরস্থ কোষটি নিষ্প্রভ। যাহাকে কৃষ্ণ লাঞ্ছন বলে তাহা সপ্রভ কোষের রন্ধ্রমাত্র ঐ রন্ধ্রের অধোভাগে নিষ্প্রভ কোষে রন্ধ্র আছে, ঐ রন্ধ্রের ভিতর দিয়া রবির সসার অঙ্গের যে স্থানটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই কুণ্ডবলে। উক্ত জ্যোতির্বিদ প্রথমতঃ ২২ নোবেম্বর রবিবিম্বের পশ্চিম প্রান্তের অনতিদূরবর্ত্তী একটি লাঞ্ছন লক্ষ করিলেন এবং দেখিলেন যে উপচ্ছায়া কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সমান চওড়া পরদিন দেখিলেন উপচ্ছায়ার পূর্ব্বাংশ চওড়ায় কমিয়াছে কিন্তু অন্যান্য অংশের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

২৪ এ দেখিলেন যে পূর্ব্বদিকের উপচ্ছায়া একেবারে গিয়াছে; কিন্তু পশ্চিম পার্শ্বের উপচ্ছায়া তখনও অদৃশ্য হয় নাই। লাঞ্ছনটি আবার বিম্বের পূর্ব্ব প্রদেশে পুনরুদিত হইল এবার পশ্চিম পার্শ্বে উপচ্ছায়া নাই কিন্তু অন্যান্য দিকে স্পষ্ট রহিয়াছে। পরদিন লাঞ্ছনের পশ্চিম দিকে উপচ্ছায়া দেখা গেল, কিন্তু অন্যান্য দিকের অপেক্ষা কম চওড়া। ১৭ তারিখে লাঞ্ছন বিম্বের মধ্য পার হইয়া গেল এবং এখন উপচ্ছায়া কুণ্ডের সকল দিকেই সমান চওড়া দেখাইতে লাগিল। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইল যে রবিমণ্ডলের উজ্জ্বলাংশ অপেক্ষা উপচ্ছায়া কিছু নীচু আর উপচ্ছায়া অপেক্ষা কুণ্ড আরও নীচু। ডাক্তার উইলসনের হিসাবে উক্ত লাঞ্ছনটি ৪০০০ মাইল গভীর।

স্যার উইলিয়ম হরসেল এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ অনেকবার করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ অব্দে তিনি দেখিয়াছিলেন যে লাঞ্ছন যখন রবির পশ্চিম অঙ্গের নিকট উপনীত হয় তখন উহার প্রস্থ ক্রমশঃ সঙ্কোচিত হয় কিন্তু দৈর্ঘ্য অপরিবর্ত্তিত থাকে, কুণ্ডটি পরে অস্থূল রেখার ন্যায় হইয়া যায় এবং অবশেষে তিরোহিত হয়। অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরাও বারম্বার বেধ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

১৮। রবিমণ্ডলের আবর্ত্তন কাল নিরূপণ। সামান্যতঃ রবিমণ্ডল একবার ঘুরিয়া আসিতে লাঞ্ছনের ২৭½ দিন লাগে। কিন্তু বস্তুতঃ লাঞ্ছন ঘুরে না ঘুরে রবি; তবে সওয়া সাতাইশ দিনে যে রবির একবার আক্ষ্যাবর্ত্তন হয় তাহা কেবল অনুমান আক্ষ্যাবর্ত্তনের বাস্তব কাল উহা অপেক্ষা দুইদিন কম। কারণ যদি কক'খ সূর্য্য হয়, আর ঙ ঙ ঘ ভূকক্ষা হয় তবে পৃথিবী যখন ঙতে তখন কক'খ যে মণ্ডলার্দ্ধ তাহাই আমাদিগের সম্বন্ধে বিম্বরূপে প্রতিভাত হইবে। পৃথিবী যদি অচল ভাবে ঙতে থাকিতেন



তবে লাঞ্ছনের খ হইতে মণ্ডল ঘুরিয়া আবার খ এ আসিতে যে সময় লাগিত তাহা রবির আক্ষ্যাবর্ত্তনের কালের সমান হইলে। কিন্তু যতক্ষণে লাঞ্ছনের এই ভ্রমাত্মক পরিভ্রমণ সম্পন্ন হইতে থাকে, ততক্ষণে পৃথিবী স্বীয়কক্ষে ঙ হইতে ঙ তে উপনীত হন, এখন মণ্ডলের র্ক খ র্থ যে অর্দ্ধাংশ তাহাই বিম্বরূপে দেখিব। সুতরাং লাঞ্ছন পশ্চিমাঙ্গ হইতে আবার পশ্চিমাঙ্গে আসিতে যে সময় লইল সেই সময় মধ্যে মণ্ডলের এক আবর্ত্তনের অধিক হইল।

যদি এক অবাস্তব আবর্ত্তন ২৭১/৪ দিনে হয় তবে বর্ষমধ্যে $\frac{৩৬৫\frac{১}{৪}}{২৭\frac{১}{৪}}$ = ১৩·৪ অবাস্তব আবর্ত্তন হয়। রবির যদি বাস্তব আবর্ত্তন না থাকিত তবে রবিপরিতঃ পৃথিবীর গতি নিবন্ধন ভূগতির বিপরীত দিকে রবির একটি অবাস্তব আবর্ত্তন ঘটিত। অতএব বর্ষমধ্যে রবির ঐ ১৩·৪ আর এই ১ মোট মোট ১৪·৪ আবর্ত্তন আমরা দেখি সুতরাং আবর্ত্তনের বাস্তব কাল $\frac{৩৬৫\frac{১}{৪}}{১৪·৪}$ = ২৫·৩ দিন। অতএব আবর্ত্তনের কাল অপেক্ষা বাস্তব কাল দুই দিন কম।

১৯। **রবিমণ্ডলের সর্ব্বত্র তাপমান সমান নহে।** অত্যন্ত তাপগ্রাহী তাপমান যন্ত্রে রবিমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আলোক পাতিত করায় প্রকাশ পাইয়াছে যে মণ্ডলের সর্ব্বাংশের তাপ সমান নহে। মণ্ডলের মধ্য হইতে আগত কিরণ প্রান্ত হইতে আগত কিরণ অপেক্ষা উষ্ণতর। কৃষ্ণ লাঞ্ছন হইতে যে পরিমাণে তাপ উদ্গত হয় পার্শ্বস্থ উজ্জ্বল প্রদেশ হইতে তাহা অপেক্ষা অল্প তাপ উদ্গত হয়।

সৌর মণ্ডলের যে খণ্ডের যদ্রূপ অবস্থান সেই খণ্ডের তদ্রূপ দীপ্তির তীব্রতা। উপান্ত অপেক্ষা মধ্যস্থলে আলোক অধিক। রবিমণ্ডলের ফটোগ্রাফ দেখিলেই দীপ্তির তারতম্য বুঝাযায়।

রবির উত্তাপের ২৩৮ কোটির অংশের একাংশ মাত্র ভূমণ্ডলে আইসে। সুতরাং তাপের পরিমাণ মানবের জ্ঞানগম্য নহে। সম্বৎসরে আমরা যে তাপ ভোগকরি তাহার সমষ্টি দ্বারা সমস্ত ভূপৃষ্ঠোপরি শত ফুট গভীর বরফ দ্রবীভূত হইয়া যাইতে পারে, অথবা ৬০ মাইল গভীর নির্ম্মল জল উত্তপ্ত হইতে পারে।

রবিমণ্ডল হইতে সাক্ষাৎ সমন্ধে যে আলোক পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ গৃহস্থ লোকে যে মোমবাতী ব্যবহার করে তাহার ৫৫০৩ টা বাতী একত্রে জ্বালিয়া দর্শকের একফুট অন্তরে রাখিলে যত আলোক হয় তাহার সমান। একটা বাতী ১২ ফুট অন্তরে জ্বলিলে যত আলোক হয় চন্দ্রের আলোক তদবৎই হয়। চন্দ্রালোক অপেক্ষা সূর্য্যালোক ৮,১০,০৭২ গুণে অধিক। মতান্তরে ৬,১৮,০০০, এবং ৩,০০০ গুণে অধিক বলে।

২০। **সৌরলাঞ্ছন জন্য পার্থিব তাপের ন্যূনাধিক্য।** বৃহদাকার ও বহুসংখ্যক লাঞ্ছনের আবির্ভাব হইলে যে পৃথিবীতে তাপের হ্রাসতা জন্মে ইহা কেবল কল্পনা মাত্র নহে। পারি নগরে একাদিক্রমে ২৬ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা দ্বারা উপলব্ধি হইয়াছে যে

যে বৎসর লাঞ্ছনের সংখ্যা অধিক সেই বৎসর তাপ ½ ডিগ্রী পরিমাণে কম হয়, কিন্তু ত তৎ বর্ষে হউনাইটেড ষ্টেটের কোন কোন স্থানে পূর্ব্বোক্ত ফলের বিপরীত ফল ঘটিয়াছে অতএব বোধ হয় এই বিপরীত ফলের কারণ সৌর লাঞ্ছন নহে ইহার কারণ আর কি ছিল। সৌর লাঞ্ছনের সহিত বৃষ্টি, মেঘ, ঝড়, বায়ুর চাপ ইত্যাদি আন্তররীক্ষক ব্যাপ রের সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। মিষ্টার এলবিন বলেন যে যে বৎসর অত্যধিক লাঞ্ছন বা ে বৎসর অত্যল্প লাঞ্ছন দেখা যায় সেই সেই বৎসরে বৃষ্টিও কম হয় এবং তাপও কম হয়।

২১। সৌর মণ্ডলের নিরক্ষ বৃত্তের অবস্থান! সৌর-লাঞ্ছন দ্বারা যেমন সূর্য্যে আক্ষ্য আবর্ত্তন নিরূপিত হয় তেমনই তদ্দ্বারা ক্রান্তিবৃত্ত সম্বন্ধে রবিমণ্ডলের নিরক্ষ বৃত্তে অবস্থান স্থিরকরা যাইতে পারে। বেধদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে ক্রান্তিবৃত্তের ও রবি মণ্ডলের নিরক্ষ বৃত্তের অন্তর্গত কোণ প্রায় ৭° পরিমিত। জ্যৈষ্ঠের ও পৌষের মাঝামাঝি বোধ হয় যেন লাঞ্ছন গুলি বিম্বদিয়া সরল রেখায় গমন করিতেছে অন্যান্য সময়ে কথঞ্চি বৃত্তাভাস পথে গমন করে; আর ভাদ্রের ও ফাল্‌গুণের মাঝামাঝি গম্যমান পথে বক্রতা আধিক্য ঘটে।

২২। সৌর লাঞ্ছনের কাল চক্র! লাঞ্ছন সংখ্যা সকল বর্ষে সমান নহে কোন কোন বর্ষে রবিবিম্ব একদিনের জন্যও লাঞ্ছন বিরহিত দেখা যায় না। আবার কোন কোন বর্ষে কতিপয় সপ্তাহ বা কতিপয় মাসাবধি একটি মাত্র লাঞ্ছন দৃষ্টি গোচর হয় না উপর্য্যুপরি ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া অবগতি হইয়াছে যে লাঞ্ছনের আবির্ভাব বর্ষচক্র বশেষের বশানুযায়ী। লাঞ্ছন সংখ্যা একাদিক্রমে ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বাড়ে তাহা পরি আবার ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত কমিতে থাকে অর্থাৎ বৃদ্ধি বা হ্রাসের চরম সীমা হইতে পুন বৃদ্ধি বা হ্রাসের চরম সীমা পর্য্যন্ত যে ব্যবহিত কাল তাহা কিঞ্চিদধিক ১১·১১ বৎসর।

বর্ষান্বয়ে সৌরলাঞ্ছন।

বর্ষ	লাঞ্ছনসংখ্যা	বর্ষ	লাঞ্ছনসংখ্যা	বর্ষ	লাঞ্ছনসংখ্যা	বর্ষ	লাঞ্ছনসংখ্যা
১৮২৬	১১৮	১৮৪১	১০২	১৮৫৬	৩৪	১৮৭১	৩০৪
২৭	১৬১	৪২	৬৮	৫৭	৯৮	৭২	২৯২
২৮	২২৫	৪৩	৩৪	৫৮	২০২	৭৩	২১৫
২৯	১৯৯	৪৪	৫২	৫৯	২০৫	৭৪	১৫৯
৩০	১৯০	৪৫	১১৪	৬০	২১১	৭৫	৯১
৩১	১৪৯	৪৬	১৫৭	৬১	২০৪	৭৬	৫৭
৩২	৮৪	৪৭	২৫৭	৬২	১৬০	৭৭	৪৮
৩৩	৩৩	৪৮	৩৩০	৬৩	১২৪	৭৮	২৪
৩৪	৫১	৪৯	২৩৮	৬৪	১০৩	৭৯	৪৯
৩৫	১৭৩	৫০	১৮৬	৬৫	৯৩	৮০	৪১৬
৩৬	২৭২	৫১	১৪১	৬৬	৪৫	৮১	৭৩০
৩৭	৩৩৩	৫২	১২৫	৬৭	২৫	৮২	১০০২

৩৮	২৮২	৫৩	৯১	৬৮	১০১	৮৩	১১১৫
৩৯	১৬২	৫৪	৬৭	৬৯	১৯৮	৮৪	১০৭৯
৪০	১৫২	৫৫	২৮	৭০	৩০৫	৮৫	৮১১
						৮৬	৩৮১
						৮৭	৯৭১

লাঞ্ছন সম্বন্ধে এই একটি কৌতুকের বিষয় দেখা যায় যে লাঞ্ছন সংখ্যার অত্যল্পতা ঘটিবার আসন্ন সময়ে লাঞ্ছন গুলি মণ্ডলের নিরক্ষ প্রদেশে অবলোকিত হয় এবং সংখ্যা যখন বাড়িতে থাকে তখন উহার অক্ষাংশে দৃষ্ট হয়। সৌর গোলে বর্ষ বিশেষে উত্তরে, দক্ষিণে লাঞ্ছন সংখ্যার বিলক্ষণ বিষমতা ঘটে।

২৩। লাঞ্ছনের কালচক্রত্বের সহিত বৃহস্পতির ভগন কালের সম্বন্ধ। বৃহস্পতির ভগন কাল ১১·৮ বৎসর। অতএব বার্হস্পত্য প্রভাব দ্বারা সৌর মণ্ডলের দীপ্তিকোষে যে বিক্ষোভ জন্মে ইহা উপক্ষেপের অবিষয় নহে। বৃহস্পতি ঠিক ১১·৮৫ বৎসরে অনুহেলিকে অর্থাৎ সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে আসেন। কিন্তু লাঞ্ছনের সংখ্যাধিক্যের কাল ততঠিক নহে যাহা হউক হারাহারি ১১·১১ বৎসর বটে। তবেই ৭৪ বৎসর বা ২০০ দিন দিন পূর্ব্বে লাঞ্ছনের অত্যধিকতা ঘটে। এই যে ২০০ দিন ইহা সমস্ত বেধের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই ধরা হইয়াছে। সৌর জগতে বার্হস্পত্য চক্রের ২০০ দিন পূর্ব্বে লাঞ্ছন সংখ্যার চরম সীমা প্রাপ্তির কারণান্তব থাকিবার কি সম্ভাবনা আছে? কেহ কেহ অনুমান করেন যে উল্কাপাতের সহিত সৌরলাঞ্ছনের সম্বন্ধ সম্ভব।

২৪। অয়স্কান্তের সহিত সৌরলাঞ্ছনের সম্বন্ধ। এক্ষণে একটি অতি বিস্ময়জনক অত্যদ্ভুত আধিভৌতিক ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে। পার্থিব অয়স্কান্তের সহিত সৌরলাঞ্ছনের সম্বন্ধ! সকলেই জানেন যে চুম্বক ধর্ম্মক্রান্ত অয়ঃশলাকা যে দিকে থাকে তাহা ঠিক উত্তর নহে। চৌম্বিক উত্তর একটি স্বতন্ত্র দিক। স্থান বিশেষে বাস্তব আর চৌম্বিক উত্তরে যে অন্তর তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অবধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু শলাকার ধর্ম্ম এই যে উহা স্বীয় উত্তররেখায়ও স্থির হইয়া থাকে না একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে যায়। প্রাতে ৮ টার সময় ইহার পরমান্তর প্রাপ্তি হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে স্বীয় উত্তরে উপনীত হইয়া আবার ক্রমশঃ পশ্চিমে ঝুঁকিতে থাকে অবশেষে অপরাহ্ণ সওয়া একটার সময় পরম সীমা পায়; সুতরাং অয়ঃশলাকার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইতে প্রতিদিন পাঁচঘণ্টা বা ঋতু বিশেষে তাহার কিঞ্চিৎ অধিক লাগে। কিন্তু রাত্রি ৮টার সময় ফের পূর্ব্বে আইসে পুনঃ ১১টা রাত্রিতে পশ্চিমে যায়, আবার সকাল ১১টার সময় পূর্ব্বে আইসে।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র অয়ঃশলাকার এবম্ভূত গতি দৃষ্ট হয়, কেবল অক্ষাংশ ভেদে আন্দোলনের ভেদ দেখা যায়। নিরক্ষ প্রদেশে এক বিকলা মাত্র চলে, পারিনগরে নয় বিকলা এবং উত্তর বা দক্ষিণে যত বেশি যাইবে চুম্বকের ততই দোলন অধিক হইবে।

প্রত্যেক স্থানে অয়ঃশলাকা পূর্ব্বে বা পশ্চিমে যতদূর ঝুঁকিয়া যায় ততদূর ঠিক এক সময়ে ঝুঁকে, এমন কি শলাকার দোলন দেখিয়া ঘড়ী মিলাইতে পারা যায়।

তাপের ন্যূনাধিক্য, বিদ্যুতের গতির ন্যূনাধিক্য, জলের বাষ্প, বায়ুর চাপ ইত্যাদি কারণ বশতঃ অয়ঃশলাকার দৈনিক আন্দোলন ঘটে। মাসিক আন্দোলনেও এই সকল কারণ দৃষ্ট হয়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে আন্দোলন অধিক হয়; অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে রবির তেজ বায়ু মণ্ডলের বৈদ্যুত শক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া পার্থিব বৈদ্যুত শক্তিতে ন্যূনাধিক্য জন্মায় এবং অয়ঃশলাকাদ্বারা তাহা সূচিত হয়।

আন্দোলনের পরিমাণ দিনে দিনে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে কম বেশি হয়। এক বৎসরের হারাহারি ফল গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে ১১ বৎসরের মধ্যে ঐ ফল এক হইতে দ্বিগুণ হয় এবং ইহা সৌরলাঞ্ছনের কালচক্রের সহিত মিলিয়া যায়।

সৌরলাঞ্ছনের সহিত অয়ঃশলাকার এই অভাবনীয় সম্বন্ধ যদিও জ্যোতিষীজগতে সর্ব্বসম্বাদী নহে তথাপি পরীক্ষার ফল দেখিলে সংশয়ের কারণ থাকে না।

কি আশ্চর্য্য এক ক্ষুদ্র দুর্ব্বল লৌহশলকা সতত কম্পিত কলেবর সতত মেরু অনুসন্ধিৎসু! ইহাকে ব্যোমযানে লইয়া অভ্রভেদ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে আরোহণকর, ইহাকে ভূগর্ভে নিহিত করিয়া সূর্য্যালোক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরহিত কর, হস্তসহস্রের অধিক গভীর খনিতে রাখ, নানারূপে অবস্থান্তরিত কর, ইহা কৃষ্ণ পরায়ণ প্রহ্লাদের ন্যায় কাতর কম্পিত-হৃদয়ে উত্তরপরায়ণ হইতে দেখিবে।

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোপি হেতু
র্নখলু বহিরুপাধিন্‌প্রীতয়ঃ সংশ্রয়স্তে।
বিকশতিহিপতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ শীতেরশ্মাবুদ্‌গতে চন্দ্রকান্তঃ॥ উত্তর রাম চরিতং।

অকূল সাগরোপরি কুহডিকাগ্রস্ত নাবিক, বিজন ভীষণ মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণা বিড়ম্বিত পর্য্যটক, দুর্গম বিশাল নিবিড় অরণ্যে চিত্রচিকীর্ষু ক্ষেত্রব্যবহার বিশারদ, এই অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ অন্বেষী, পদার্থ বিদ্যাবিদ্‌ সকলেই এই প্রকৃতিদত্ত গহনা বৃত্তি বিশিষ্ট শলাকাকে সচিন্ত নয়নে দর্শন করেন। ভক্ত বলেন ভগবানের কি মহিমা, পণ্ডিত বলেন কারণ কি?

যে বৎসর এই ক্ষুদ্র অকপট শলাকার আন্দোলন অত্যধিক সেই বৎসর সৌরলাঞ্ছনের সংখ্যার অত্যাধিক্য ঘটে, যে বৎসর দৈনিক আন্দোলনের পরিমাণ অত্যল্প সেই বৎসর সবিতৃমণ্ডলে কলঙ্ক বাষ্পোদগম বা বাযব উপদ্রব প্রায় দৃষ্ট হয় না। তবে কি এই ভ্রাম্যমাণ মহীমণ্ডল অপরিমেয় মিহির মণ্ডলে তাড়িত সূত্রে বাঁধা? দিনকর কি চুম্বকাত্মক? কিন্তু লোহিত লৌহবৎ উত্তাপ সত্ত্বে তাড়িত প্রবাহের অস্তিত্ব কোথা? তপন প্রজ্বল্যমান অনলকুণ্ডের অধিক। তবে কি এই অনলকুণ্ড হইতে ক্ষণ প্রভার অন্তঃপ্রবাহ ৯ কোটি

মাইল অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডলে ওতঃপ্রোত ভাবে বিচরণ করিতেছে? বিশ্বম্ভরা কেবল মৃণ্ময়ী নন। ইনি একখানি বিশাল প্রবল অয়স্কান্ত মণি।

২৫। উত্তরোষার সহিত সৌরলাঞ্ছনের সম্বন্ধ।—আবার এক অদ্ভুত ব্যাপার! মায়াময়ী প্রকৃতির কার্য্যকৌশলের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণে ব্যাপৃত কীটোপম মানুষ কর্ত্তৃক কতই চমৎকারিণী আবিষ্কৃতি হইতেছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বক্ষিতিজে সুশোভনা মনোহরা উষাসদৃশ উত্তর কপালে যে আলোক অবলোকিত হয় তাহাকে উত্তরোষা বলে। এই উত্তরোষার সংখ্যাদির সহিত দিনকরের লাঞ্ছনাদির বিলক্ষণ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কি আশ্চর্য্য! সুমেরু সন্নিহিত অতিহিমালয় প্রদেশে অতুল আকাশানল উষার আবির্ভাব অনুভব করিয়া লাফো বাবাজীর গুপ্তিরুদ্ধ অয়ঃশলাকা আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে স্পন্দিত হইতে থাকে এবং যাবৎ না ঐ আকাশরঙ্গিনী ভানুমতীর তিরোধান হয় তাবৎ মহোপহত শলাকার নৃত্যের বিরাম হয় না।

২৬। রবিমণ্ডল সসার পদার্থ নহে।—রবি কিরণ যখন ত্রিশির কাচে প্রবেশ পূর্ব্বক বক্রভাবে বহির্গত ও প্রসারিত হইয়া কোন যবণিকায় পতিত হয় তখন ঐ বিশ্লিষ্ট আলোককে বর্ণপট্টিকা বলে। দৃষ্টিবিজ্ঞান বিশারদেরা লোহিতাদি মৌলিক বর্ণবিশিষ্ট পট্টিকায় কতিপয় তির্য্যক্ কৃষ্ণরেখা দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে ভূমণ্ডলে যে সকল তৈজিক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় প্রায় তত্তাবৎ দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল বিরচিত। সৌরাকাশে যে লৌহ নিকেল ও অন্যান্য সুপরিচিত ধাতু আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। এবং যে স্থলে রবিমণ্ডলের সান্দ্রত্ব ভূমণ্ডলের সান্দ্রত্বের পাদমাত্র অথচ পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির ২৮ গুণ আকর্ষণ শক্তি সে স্থলে বোধ হয় রবিপিণ্ডের অধিকাংশ সসার বা তরল পদার্থ নহে। লৌহ ও নিকেল প্রভৃতি সুদূরদ্রাব্য পদার্থ সকল সৌরমণ্ডলে স্থিতিস্থাপক বাষ্পাকারে অবস্থিত। এই জন্য রবিমণ্ডলের তাপ পার্থিব আগ্নেয় গিরির তাপাপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। রবিমণ্ডলের মধ্যভাগ দ্রব বা সসার পদার্থ হইতে পারে; কিন্তু পিণ্ডের অধিকাংশ যে বায়ুবৎ পদার্থে বিরচিত তাহা অসম্ভব নহে।

স্যার উইলিয়াম হরসেলের মত এই যে সৌরমণ্ডল অস্বচ্ছ এবং তেজোময় আবরণে পরিবেষ্টিত। এই আবরণ না দ্রব না বায়ব; ইহা স্বচ্ছবায়ুমণ্ডলে স্বপ্রভ মেঘবৎ ভাসমান। এই স্বপ্রভমেঘবৎ আবরণের অধোভাগে উক্ত বায়ুমণ্ডলে এক নিষ্প্রভ মেঘস্তরের অস্তিত্ব অনুমিত হয়; এই স্তরের উপরিভাগ বাহ্যস্তরের আলোকে আলোকিত। এই নিষ্প্রভ মেঘমণ্ডল দ্বারা রবিপিণ্ডের সন্নায় এবং অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কুণ্ড পরিরক্ষিত হইয়া থাকে, নিষ্প্রভ ও স্বপ্রভ উভয় বিধ মেঘস্তর বিদারিত হইলে সৌরশরীর শ্যামলাঞ্ছন বৎ প্রতিভাত হয়। বিবর উভয় স্তরে সমায়ত হইলে লাঞ্ছন সমশ্যাম দেখায়। বহিঃস্তরের বিবর বৃহত্তর হইলে লাঞ্ছনের শ্যামকুণ্ড ধূসরাঞ্চল পরিবেষ্টিত দেখায়। রন্ধ্র যদি কেবল বহিঃস্তরে ঘটে তবে কৃষ্ণকুণ্ড বিরহিত কেবল ধূসর লাঞ্ছন দৃষ্ট হয়। উভয় স্তর বিদারিত হইবার

কারণ এই যে অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মবিশিষ্ট গ্যাস অতিবেগে নিম্নস্তর ভেদ করিয়া স্ফোটনান্তর বিস্তৃত হইয়া বহিঃস্থ সপ্রভ স্তর ভেদ করে।

২৭। রবির দীপ্তি কোষের প্রকৃতি। রবিমণ্ডল যে উজ্জ্বল আবরণে পরিবেষ্টিত তাহাকেই দীপ্তি কোষ বলা যায়। দীপ্তি কোষের আবরণ জলীয় বাষ্পের অবস্থা বিশিষ্ট কোন পদার্থ বিশেষ। দীপ্তিকোষ সমুজ্জ্বল তেমনই সন্তপ্ত, এবং তাপবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা জানা যায় যে সৌরলাঞ্ছন অপেক্ষা দীপ্তিকোষ হইতে অধিকতর তাপ উদ্গত হয়; কিন্তু তা বলিয়া সৌরলাঞ্ছনের কুণ্ড অপেক্ষা যে দীপ্তিকোষ বস্তুতঃ অধিক তপ্ত তাহা নহে, কারণ সমতাপ বিশিষ্ট সসার, ও বায়ুবৎ পদার্থের মধ্যে বায়ুবৎ পদার্থ হইতে কমজোর তাপ উদ্গত হয়। তাপের বহির্গতি জনিত যে সকল কণা শীতলীভূত হইয়া অন্তরীক্ষে প্রলম্বিত আছে বোধ হয় সেই সকল কণা দীপ্তি কোষের উপকরণ।

রবির বায়ুবৎ আবরণ দীপ্তিকোষ অতিক্রম করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ কালে রবিমণ্ডলের উপর ৮০.০০০ মাইল উর্দ্ধে পর্ব্বতাকার পদার্থবিশেষের উদ্গতি লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্যই অন্তরীক্ষের অতি উর্দ্ধপ্রদেশে মেঘবৎ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। পার্থিব মেঘের উচ্চতার সহিত পার্থিব গগণের বিস্তৃতির যে রূপ অনুপাত সেইরূপ অনুপাত যদি সৌরমেঘের উচ্চতার সহিত সৌরগগণের উচ্চতার থাকে তবে রবিমণ্ডলের উর্দ্ধে সৌরগগণ অন্ততঃ দশলক্ষ মাইল হইবে।

২৮। উপচ্ছায়া কি? দীপ্তিকোষ হইতে বিনির্গত আলোক সূত্র সকল কুণ্ডের মধ্যস্থলাভিমুখে গমন করে। দীপ্তিকোষের যে আলোক আলোক সূত্রেরও সেই আলোক, প্রত্যেক আলোক সূত্রের পার্শ্বে কৃষ্ণ রেখাবৎ একটি অবকাশ থাকে; আলোক সূত্র আর কৃষ্ণ রেখার বিমিশ্রণে যে শ্যামছায়া জন্মে তাহাই উপচ্ছায়া। লৌহ ফলকে খোদিত শ্যাম, শুক্লরেখা দ্বারা এইরূপ ছায়া ব্যঞ্জিত হয়। আলোক সূত্রের কুণ্ড অভিমুখে যে গমন তাহা কুণ্ডাভিমুখ প্রবাহের অস্তিত্ব সূচক; অর্থাৎ মণ্ডলস্থ প্রবাহ বিশেষ দ্বারা আলোক সূত্র কুণ্ড অভিমুখে চালিত হয়। বোধ হয় এবং এই সংসর্গাধীন দীপ্তিকোষাত্মক পদার্থ দ্রবীভূত হয় এবং পরিণামে নিরালোক হইয়া পড়ে।

দীপ্তিকোষে কোনরূপ বিপ্লব ঘটিলে ফস্‌ফরাত্মক স্তরের যে বেধ তাহা স্থানে স্থানে অধিকতর হয় এবং যে যে স্থলে সপ্রভ আবরণ অত্যধিক হয় সেই সেই স্থলেই উপরিভাগ অধিক উজ্জ্বল দেখায়। ইহাকেই জ্যোতিষীরা উল্মুক বলেন!

২৯। সৌরলাঞ্ছনের গতি। রবিমণ্ডলের লাঞ্ছন গুলি অচল নহে। কারণ সকল লাঞ্ছনের অবাস্তব ভ্রমন কাল সমান নহে। এক স্থলে বেধ দ্বারা নিরূপিত হইল যে রবির আক্ষ্য আবর্ত্তন ২৪ দিন ৭ ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়। এবং স্থলান্তরে দেখা গেল যে আবর্ত্তন পূর্ণ হইতে ২৬ দিন ৬ ঘণ্টা লাগে। অতএব ভূতল সম্বন্ধে আমাদের মেঘের যেমন গতি রবিমণ্ডল সম্বন্ধে লাঞ্ছনের তেমনই গতি স্বীকার না করিলে ঔক্তব্য আবর্ত্তনের কালভেদ বুঝাইবার অন্য কোন রূপ উপায় দেখা যায় না।

লাঞ্ছনের গতি উত্তর বা দক্ষিনে অতি অল্প হয়। সাধারণতঃ লাঞ্ছন সকল মণ্ডলের নিরক্ষ প্রদেশ হইতে চলিতে থাকে কিন্তু অন্যত্র হইতে নিরক্ষ প্রদেশের দিকে কদাচ আইসে। সে গুলির গতি যে নিরক্ষ বৃত্তের সমান্তর রেখায় হয় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্য স্থানের অপেক্ষা নিরক্ষ প্রদেশের লাছন দ্রুতগামী। নিরক্ষ বৃত্তে আবর্ত্তনের দৈনিক গতি চাপমানে ৮৬৫ কলা; ২০° অক্ষাংশে উক্তগতি ৮৪০ কলা এবং ৩০ অক্ষাংশে ৮১৬ কলা মাত্র। অতএব রবি মণ্ডলের নিরক্ষ প্রদেশস্থ লাঞ্ছনের একবার আক্ষ্য আবর্ত্তন হইতে ২৫ দিন লাগে কিন্তু ৩০ অক্ষাংশে স্থিত লাঞ্ছনের ২৬½ দিন লাগে।

ভূমণ্ডলের মত সমস্ত রবি মণ্ডল যুগপৎ আবর্ত্তিত হয় না। নিরক্ষ বৃত্ত হইতে কেন্দ্রের দিকে আবর্ত্তনের বেগের ক্রমাহ্রাস দৃষ্ট হয়।

অক্ষাংশ	আবর্ত্তনকাল	অক্ষাংশ	আবর্ত্তনকাল	অক্ষাংশ	আবর্ত্তনকাল	অক্ষাংশ	আবর্ত্তনকাল
০	২৫·১৮৭ দিন	১২	২৫·৫৮৮ দিন	২৪	২৫·৯৭৫ দিন	৩৬	২৬.৮৯১ দিন
২	২৫.১৯৩ "	১৪	২৫ ৪৬০ "	২৬	২৬·১০৭ "	৩৮	২৭·০৬৮ "
৪	২৫.২১০ "	১৬	২৫·৫৪৩ "	২৮	২৬·২৪৮ "	৪০	২৭·২৫২ "
৬	২৫·২৩৮ "	১৮	২৫·৬৩৬ "	৩০	২৬·৩৯৮ "	৪২	২৭·৪৪০ "
৮	২৫·২৭৭ "	২০	২৫·৭৯৩ "	৩২	২৬·৫৫৫ "	৪৪	২৭·৬৩৩ "
১০	২৫·৩২৭ "	২২	২৫·৮৫২ "	৩৪	২৬·৭১৭	৪৬	২৭·৯২৬ "

২৯। সৌর লাঞ্ছনের গতির কারণ। অংশুস্ফুরণ জনিত সৌর তাপের অবশ্য অনবরত অপচিতি হইতেছে। যদি বিশিষ্ট কারণ বশতঃ মণ্ডলের প্রদেশ বিশেষে অংশুস্ফুরণের কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে তবে তৎপ্রদেশে তাপের উপচিতি অবশ্যই ঘটিবে। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ কালে পার্থিব মেঘ সদৃশ পদার্থ পিণ্ড সৌর গগণে দৃষ্ট হয়। ঐ মেঘমালার প্রাদুর্ভাব হইলে অবাধে যে অংশুস্ফুরণ হইতেছিল তাহার ব্যাঘাত জন্মে এবং কাজে কাজেই মুহুর্মুহুঃ তাপের উপচিতি হইতে থাকে। এই তপ্ততর স্থানাভিমুখে বায়বীয় পদার্থের ধর্ম্মবশতঃ রবির বায়ুমণ্ডল চালিত হয়। যে স্থলে এইরূপে বায়ু স্তূপীকৃত হইতে থাকে সেই স্থলের মধ্য হইতে উত্তপ্ত বায়ুর ঊর্দ্ধগতি হয় এবং তদ্দ্বারা দীপ্তিকোষের উপকরণীভূত পদার্থের কিয়দংশ দ্রবীভূত হয় এবং কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হয়। এখন দীপ্তিকোষে যে রন্ধ্র হইল তাহার চতুর্দ্দিকে অঙ্গুরীয় আকারে দীপ্তিকোষের তেজোময় পদার্থ সমাক্ষিপ্ত হয় এবং উপছায়ার উপান্ত পরিতঃ তিগ্ম আলোকের অঞ্চল সদৃশ আকার ধারণ করে।

সমস্ত দীপ্তিকোষ যদি বিন্দুবিশেষের দিকে চালিত হয়, তবে উহা পার্থিব ঝটিকা (ঘুরণীর cycloneএর) ন্যায় উক্ত স্থানোপরি ঊর্দ্ধাধঃ অক্ষপরিতঃ ভ্রামিত হয়। সৌর লাঞ্ছনের এইরূপ চক্রগতি বেধ দ্বারা পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি হইয়াছে। শঙ্খাবর্ত্ত আকারে বিরচিত লাঞ্ছনও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। লাঞ্ছের এরূপ আকার ঊর্দ্ধাধঃ অক্ষপরিতঃ ভ্রমণের ফল মাত্র।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

অক্ষ সমান্তর,	Parallels of latitude.
অনুলোম,	Direct.
অয়ঃশলাকা,	Magnetic needle.
অবকাশ,	Interstices.
আক্ষ্য,	Axial.
আন্দোলন,	Oscillation.
আযাতন,	Magnitude.
আলি,	Ridge.
আলোক সূত্র,	Filament of light.
ইন্দ্রলোক;	System of Neptune.
উত্তরোষা,	Aurora Borealis.
উপছায়া,	Peuumbra.
উল্মুক,	Facula.
ঊর্দ্ধাধঃ,	Vertical.
কপাল,	Hemisphere.
করণ সূত্র,	Rule.
কষনাশ্ম,	Touch stone
কাল-চক্রত্ব,	Periodicity.
কাক্ষ্য,	Orbital.
কুণ্ড,	Neucleus.
কুর্ব্বরীকৃত,	Mottled.
কেন্দ্রবিমুখ,	Centrifugal.
ক্ষিতিজ,	Horizon.
গুপ্তি,	Cellar.
গোলাভাস,	Spheroid.
চাপাত্মক,	Angular.
ছেদ্যক,	Illustration.
তাপমান,	Temperature.
তাপবীক্ষণ,	Thermoscope.
ত্রিশির কাচ,	Prism— কলম
দীপ্তিকোষ,	Photosphere.
দৃক্সূত্র,	Visual line.

নিম্নস্থান,	Depression.
নিরক্ষ প্রদেশ,	Equatorial Region.
নিরেট,	Solid.
পরম লম্বন,	Equatorial Horizontal (Parallax.
পরিছিন্ন,	Well defined.
পৃষ্ঠফল,	Superficial area
প্রলম্বিত,	Precipitated.
প্রাচীন কীর্ত্তিকোবিদ,	Antiquary.
বাবাজী,	Father.
ভাস্বৎ,	Luminous.
ভূগর্ভ	Centre of earth.
মাধ্যাকর্ষণ,	Gravity.
মেখলা,	Belt.
রঞ্জিত কাচ,	Coloredglass.
যবনিকা,	Screen.
লাঞ্ছন,	Spot.
লগ, বা লগারিথিম,	Logarithm.
বর্ণ পট্টিকা,	Spectrum.
বায়ুকোষ;	Atmosphere.
বাহ্যকোষ,	Outer envelope.
বিকলা,	Second of arc or time.
বিপ্লব,	Commotion.
বিষ্কম্ভ,	Diameter.
বিলোম,	Inverse.
বেধ,	Depth.
শঙ্খাবর্ত্ত,	Spiral curve.
সপাটত্ব,	Flatness.
সান্দ্রত্ব,	Density.
সাপেক্ষিক,	Relalive.
সায়ন মহাবিষুব সংক্রান্তি,	Instant of Vernal [Equinox.
সারবত্তা,	Solidity.
স্প্রীংতুল।	Spring balance.

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর　　　　স্থর—মহারাষ্ট্রীয় প্রবন্ধ

শঙ্করাভরণ—তালফেরতা।

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলেজলে, নভতলে, বনে উপবনে,
নদীনদে, গিরিগুহা পারাবারে,—
নিত্যজাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্য রস ভঙ্গিমা;
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব;
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল,
শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনিরে শুনি মর্ম্মর পল্লবপুঞ্জে;
পিক কূজন পুষ্পবনে বিজনে;
মৃদু বায়ু হিলোল-বিলোল-বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে;
শ্যামল কান্তার পবে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর
কতদিকে কত বাণী
নব নব কত ভাষা
ঝর ঝর রসধারা।
নব আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব,
অতি গম্ভীর অতি গম্ভীর
নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে—
যেনরে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে,
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে
উঠে রব ভৈরবতানে,—
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে,
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্যকরে অম্বরতলে,
দিকে দিকে কত বাণী

নব নব কত ভাষা
ঝর ঝর রসধারা !
আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব ;
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে,
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ;
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে
শ্বেতভুজে শ্বেতবীণা বাজে ;
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনেরে
দিকে দিকে কত বাণী
নব নব কত ভাষা
ঝর ঝর রসধারা !

||৫||—২ । সন্‌২ ন্‌১ । সন্‌১ ধ্‌ন্‌১ । স১ ন্‌সন্‌১ ধ্‌১ । প্‌২ ।
বি শ্ব বী — না — ব রে

স২ স১ । ন্‌১ স১ । রগ১ ম১ ম১ । গ২ ।—২ রগ১ । মপ১—১ । গম১ র১
বী শ্ব জ ন মো — হি ছে — — — — — —

স১ ।—২ । র১ গ১ ম১ । প২ । ম১ গ১ র১ । গ২ । গ১ ম১ প১ । ম১
— — স্থ লে জ লে ন ভ ত লে ব নে উ প

গ১ । র১ গ্‌১ ম১ । গ১ র১ । স১ র্‌১ স১ । র১ গ১ । র২ স১ । —১ স১ ।
ব নে ন দী ন দে গি রি গু হা পা রা বা — রে

সন২ ন১ । র্সনধ১ ন১ । র্স২ ম১ । প১ প১ । ম১ প১ ধ১ । নোধ১
নি ত্য জা — গে স র স স — ঙ্গী —

প১ । ম১ গ১ র১ । গ২ । র২ গ১ । প২ । ম১ গ১ র১ । গ২ । ম১
ত ম ধু রি মা নি ত্য নৃ ত্য র স ভ ঙ্গি

গম১ র১ । স১ ন্‌স১ । ধ্‌ন্‌১ সর১ রসন্‌১ । ধ্‌ন্‌১ ন্‌ধ্‌১ । প্‌৩ । প্‌১ প্‌১ ।
মা — — — — — — — — — ন ব
— ন ব
— আ

শেষ।

ন১ ন২ । ন২ । র্স১ ন১ র্স১ ধন২ । প১ ধ২ প১ ম১ । গ১ রগ২ ।—১ ম১ গ১ ।
ব স স্তে ন ব আ ন ন্দ উৎ স ব ন ব — অ তি
আ ষা ঢ়ে ন ব আ ন ন্দ উৎ স ব ন ব — অ তি
শ্বি নে — ন ব আ ন ন্দ উৎ স ব ন ব — অ তি

॥৪॥ র১ গর১ গ১ গ১ ।—২ ম১ গ১ । র১ গর১ গ১ গ১ ।—২ ম১
ম — ঞ্জু ল — অ তি ম — ঞ্জু ল — শু
গ — ম্ভী র — অ তি গ — ম্ভী র — নী
নি — র্ম্ম ল — অ তি নি — র্ম্ম ল — অ

গ১ । র২ গ১ প১ । ম২ গ১ গর১ । গ২ র১ গর১ । স২ স১ ন্১ । স৪ ।
নি ম ঞ্জু ল গু ঞ্জ ন কু ঞ্জে — — শু নি রে
ল অ ম্ব রে ড ম্ব রু বা জে — — যে ন রে
তি নি র্ম্ম ল উ জ্জ্ব ল সা জে — — ভু ব ন

—১ স১ ন্১ । স২ র১ গ১ । গ২ ম১ গ১ । রগ২ র১ গর১ । স২ স১ ন্১ ।
— শু নি ম র্ম্ম র প ল্ল ব পু ঞ্জে — — পি ক
— প্র ল য় ঙ্ক রী শ ঙ্ক রা না চে — — ক রে
— ন ব শা র দ ল ক্ষ্মী বি রা জে — — ন ব

স২ র্সন১ ন১ । ন২ র্সন১ ধ১ ন১ । র্স৩ ।—২ ধ১ ন১ । র্স৪ ।—২ ন১ ন১ ।
কু জ ন পু — ষ্প ব নে — বি জ নে — মৃ দু
গ র্জ্জ ন নি — র্ঝ রি ণী — স ঘ নে — হে র
ই ন্দু লে খা — অ ল কে — ঝ ল কে — অ তি

র্স২ র্র১ র্স১ । ন২ র্স১ ন১ । ধ২ নে১ ধ১ । প২ ধ১ প১ । ম২ প১ ম১ ।
বা যু হি লো ল বি লো ল বি ভো ল বি শা ল স
ক্ষু ব্ধ ভ য়া ল বি শা ল নি রা ল পি য়া ল ত
নি র্ম্ম ল হা স বি ভা স বি কা শ আ কা শ নী

গ২ ম১ গ১ । র১ গর১ গ২ ।—৪ । র১ গ১ ম১ প১ । ম১ গ১ ম১ র১ । স১
রো ব র মা — ঝে — ক ল গী ত সু ল লি ত বা
মা ল বি তা — নে — উ ঠে র ব ভে — ব ব তা
লা ম্বু জ মা — ঝে — শ্বে ত ভু জে শ্বে ত বী ণা বা

র১ গ১ মগ১ । র২ স২ ॥৫॥—২ স১ স১ স১ । ন২ ন২ ন১ । র্স১ ন১ ধন১ প১
— জে — — — — শ্যা ম ল কা ন্তা র প রে অ নি
— নে — — — — প ব ন ম ল্লা র গী ত গা হি
— জে — — — — উ ঠি ছে আ লা প মৃ দু ম ধু

প১ ।‌ ন২ ন২ র্স১ । ধন১ ধনর্স১ র্স৩ । র্র২ র্র১ র্স১ ন১ । র্স২ র্স১ ন১ ধ১ ।

ল স ঞ্চা রে ধী — রে রে ন দী তী রে স র ব

ছে আঁ ধা র রা — তে উন্ মা দি নী সৌ দা মি নী

র বে হা গ তা — নে চ ন্দ্র ক রে উ ল্ল সি ত

ন২ ন১ ধ১ প১ । ধ২ ধ১ প১ ম১ । প২ ম১ গ১ র১ । গ২ স১ র১ স১ । র১

নে উ ঠে ধ্বনি স র স র ম র ম র ক ত দি কে

র স ভ রে নৃ ত্য ক রে অ ম্ব র ত লে দি কে দি কে

ফু ল্ল ব নে ঝি ল্লী র বে ত ন্দ্রা আ নে রে দি কে দি কে

গ১ র২ স১ ।—১ স১ স১ র১ গ১ । ম১ প১ ধ১ ন১ র্স১ ।—২ র্স১ ন১ ধ১ । প১

ক ত বা — নী ন ব ন ব ক ত ভা ষা — ঝ র ঝ র

ক ত বা — নী ন ব ন ব ক ত ভা ষা — ঝ র ঝ ব

ক ত বা — নী ন ব ন ব ক ত ভা ষা — ঝ র ঝ র

ম১ গ১ র১ গ১ ।

র স ধা রা ।

র স ধা রা ।

র স ধা ধা ।

(অ—প্র)

ভ্রম সংশোধন।

গত মাসের সূচীপত্রে "মসূরী পাহাড়ে তিনদিন" এই প্রবন্ধের লেখকনামায় ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম সংযুক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের লেখক "বিদেশে বাঙ্গালী" ইতি অভিধান ধারী।

ভাইফোঁটা।

আজি—
মধুর প্রভাতে বাঙ্গালীর ঘরে কিসের উৎসব!
নাহিক প্রতিমা নাহি পুরোহিত শুধু হাসিরব!
কোন্ মন্ত্রবলে উঠিল জাগিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ,
কে শিখালে আজি ক্ষীণ বাঙ্গালীরে সঙ্গীত মহান!
ত্যজি দলাদলি ভুলি হিংসাদ্বেষ সকলেতে আজ,
কার ডাক শুনে এসেছে ছুটিয়া পরি নবসাজ!
কত পর্ব্ব আছে বঙ্গে, পাঁজি ভ'রে নাহি যায় গোণা,
বারমাস মাঝে তেরটী পার্ব্বণ চিরকাল শোনা!
পুঁথির পার্ব্বণ থাকে পুঁথি মাঝে বলে না হৃদয়,
আনন্দ আবেগে প্রাণের দীনতা নাহি দূর হয়!
নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে বঙ্গদেশে সারা
ওঠেনা এমন প্রতিজন-প্রাণে সুখের ফোয়ারা!
উঠিবে কেমনে? শুধু প্রাণহীন উৎসবের ভাণ
প্রাণের দীনতা কেমনেতে তাহে হবে অবসান?
ঐক্যের বন্ধন নাহি তার মাঝে, চাহে হৃদয়
নিজ মনমত আপন উৎসব সবে গড়ে লয়!
কেহ পূজে কৃষ্ণ, কেহ পূজে কালী, কেহ বা গণেশ
কারো ঘরে আজ কারো অন্যদিন নাহি তার শেষ!
কে করিতে পারে কত সমারোহ, কেবা ছোট বড়
রেষারেষি মাঝে উৎসবের ছায়া ক্রমে ক্ষীণতর!
আজ নাহি দ্বেষ নাহি বিসম্বাদ ঘুচেছে সব,
মধুর মিলনে উঠেছে ফুটিয়া জাতীয় উৎসব!
ভগিনীর কোলে আসিয়াছে ভাই সুখের তরঙ্গ,
হাসিয়া হাসিয়া চলেছে ছুটিয়া ব্যাপি সারা বঙ্গ!
মূরতি গড়িয়া পূজিবার আর নাহি প্রয়োজন,
পুরোহিত ডাকি সাজাতে হবে না পূজা আয়োজন!
নাহি ছোটবড় নাহি উঁচু নীচু সকলে সমান,
হৃদয়ের টানে ভেঙ্গে গেছে সব ক্ষুদ্র ব্যবধান!

জন্মান্তর হ'তে বিধাতার বাঁধা এ স্নেহ বন্ধন,
পারে কি কখন করিতে খণ্ডন যশমান ধন !
নির্ম্মল চন্দনে ভগিনীর স্নেহ হৃদি বাঁধ টুটি,
ভায়ের কপালে ভাইফোঁটা হয়ে উঠিয়াছে ফুটি,
পূত নববাস আশীষ মন্তর স্নেহ ধূপবাস,
ভাইবোনে ঘিরি রচিছে মধুর মিলনের পাশ !
পিতার আননে হেরি এ মিলন ফুটিয়াছে হাসি,
মাতার নয়নে উথলি উঠিছে সুখ অশ্রু রাশি !
দেব আশীর্ব্বাদ সকলের পরে হতেছে বর্ষিত,
ভাইফোঁটাদিনে আনন্দ মিলনে বঙ্গ হরষিত !
শরত প্রভাতে মিলন আকাশে সোনার রবি,
হৃদয়ের মাঝে মরি কি মধুর মিলন ছবি !
প্রকৃতি পরাণে মানব হৃদয়ে একই সে খেলা,
অন্তরে বাহিরে বাহিরে অন্তরে স্নেহের এ মেলা !

কাজির বিচার।

জগদ্বিখ্যাত আরব্যোপন্যাসের নায়ক বোগ্দাদাধিপতি "হারুণ্ অল্ রশীদ্" একদিন সিংহাসনে বসিয়া পাত্র-মিত্র-সভাসদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কন্যা এবং পুত্রবধূ এই দুইয়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কাহাকে অধিক ভালবাসে ?"

সভাসদ্গণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে সকলে অধিক ভালবাসে, সুতরাং পুত্রবধূকেও সমধিক ভালবাসিবার কথা। অন্যেরা প্রতিবাদ করিলেন, পুত্রবধূ পরের মেয়ে, সুতরাং কন্যাকেই স্ত্রীলোকে অধিক ভালবাসিবে। কেহ বলিলেন, পুত্রবধূ পরের মেয়ে হইলেও ঘরে থাকে, কন্যা পরের ঘরে চলিয়া যায়, অতএব পুত্রবধূরই প্রতি স্নেহ গাঢ়তর হয়। অপরেরা ঠিক এই যুক্তিতেই উক্ত মত খণ্ডন করিয়া বলিলেন, যে সর্ব্বদা কাছে থাকে, তাহার প্রতি ততটা স্নেহোদ্রেক হয় না; যে দূরে থাকে, সেই অধিক স্নেহের অধিকারিণী হয়। এইরূপে বাদানুবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না।

এক বৃদ্ধ বিচক্ষণ সভাসদ্ এতাবৎকাল নীরবে বসিয়া ছিলেন। খালিফ্ তাঁহাকে বলিলেন—"মৌলবী সাহেব, আপনি কেন স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছেন না ?" বৃদ্ধ খালিফের এই প্রকার উক্তিতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন—"হে ঈশ্বর প্রেরিত মহম্মদীয় ধর্ম্মের রক্ষক, স্ত্রীলোকেরা যে পুত্রবধূ অপেক্ষা কন্যাকেই অধিক ভাল-

বাসে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি একটি গল্প জানি, অনুমতি হইলে নিবেদন করিতে পারি।" খালিফের অনুমতিক্রমে প্রবীণ মৌলবী এইরূপ গল্প আরম্ভ করিলেন :—

"পুরাকালে এক নগরে এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করিত। তাহার এক পুত্র আর এক কন্যা ছিল। এই কন্যা ও পুত্রবধূটি একই সময়ে আসন্নপ্রসবা হইলেন। পুত্রবধূর নাম ওয়াজিহন্ (সুন্দরী) এবং কন্যার নাম জহুরণ্ (প্রকাশমানা) ছিল। এক রাত্রে একই সময়ে ওয়াজিহন্ ও জহুরণ্ দুইজনের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তখনও ধাত্রী আসিয়া পৌছে নাই। বিধবা দেখিলেন পুত্রবধূ ওয়াজিহনের পুত্রসন্তান এবং কন্যা জহুরণের কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে। ইহা বিধবার সহ্য হইল না। সে ওয়াজিহনের পুত্রকে জহুরণের সূতিকাগৃহে স্থাপন করিয়া, দৌহিত্রীকে আনিয়া পুত্রবধূর নিকট রাখিয়া দিল। বাড়ীতে আর জনপ্রাণীও ছিল না;—প্রসূতিরা গতচেতনা ছিলেন; একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ এ বিনিময় ব্যাপারের সাক্ষী রহিল না।

দুই বৎসর অতীত হইল। ওয়াজিহন্ কন্যাকে এবং জহুরণ পুত্রকে লালন পালন করিতেছেন;—কাহারও মনে অনুমাত্র সন্দেহেরও সঞ্চার হয় নাই।

একদিন সায়ংকালে ওয়াজিহন্ কক্ষে নমাজ পড়িতেছিলেন। তাঁহার পালিত শিশু-কন্যাটি কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। জহুরণের পুত্রটি নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা হইলে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শঙ্কার ভাব প্রত্যেক মাতৃহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে এবং তাবৎ জীবজগতে মাতৃস্নেহের একটা প্রবাহ বহিয়া যায়। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সেই প্রার্থনাপরায়ণ জননীর হৃদয়ে সেই মাতৃস্নেহ প্লাবিত সন্ধ্যাকালে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার স্তনে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিয়া দিল, "এ সন্তান তোমারি।"

সেই অবধি তিনি অতি নিপুণতা ও সাবধানতার সহিত সেই বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন এবং সঞ্চালনের ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামীর সহিত ঐ বালকের সমস্তই আশ্চর্য্যরূপে মিলিতে লাগিল। একদিন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট একথা বলিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইলেন—"বাঁদি, যদি বারদিগর্ (দ্বিতীয় বার) ও কথা মুখ হইতে বাহির করিবি, তবে তোর জিহ্বাটা জ্বলন্ত লৌহ দিয়া পোড়াইয়া দিব।" এইরূপ ব্যবহারের পর, ওয়াজিহনের বুঝিতে বাকী রহিল না, যে তাঁহার গুণবতী শাশুড়ীই সেই সন্দিগ্ধ অপকার্য্যের কর্ত্রী! অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সেই নগরের কাজির নিকট বিচার প্রার্থনী হইলেন।

কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কোনও সাক্ষীসাবুদ আছে?" ওয়াজিহন্ বলিলেন—"আমার সাক্ষী স্বর্গে ঈশ্বর এবং মর্ত্ত্যে আমার এই মাতৃহৃদয়।" কাজি মহাশয় বড় বিপদে পড়িলেন। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া এই মোকর্দ্দমার কিনারা করিবেন? দুই চারিদিনে নগরময় একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ক্রমে আপনার পূর্ব্বপুরুষ (নাম করিলে

গোস্তাকি হইবে) তদানীন্তন বোগ্দাদাধিপতির কর্ণেও একথা পৌছিল। তিনিও অপর সকলের ন্যায় সমুৎসুক হইয়া কাজির বিচার ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই তিন মাস অতীত হইয়া গেল, অথচ মোকর্দ্দমার কিছুই হইল না। অবশেষে খালিফ্ হুকুম দিলেন —তিন মাসের মধ্যে কাজি যদি বিচার সমাধা না করিতে পারেন, তবে তিনি সপরিবারে নির্ব্বাসিত হইবেন, এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাজি সাহেব যার পর নাই দুশ্চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে ভাবিলেন—আমার নির্ব্বাসন ত হইবেই, এতএব সে অপমান সহ্য করা অপেক্ষা এখন হইতেই ফকিরী গ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করি। যদি ঈশ্বর দয়া করেন—যদি কোনও উপায় স্থির করিতে পারি—তবেই ফিরিব, নতুবা মক্কায় গিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ ব্যয় করিব।

এইরূপে কাজি গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে, পর্ব্বত পার হইয়া, নদী পার হইয়া জঙ্গল ভেদ করিয়া চলিলেন। অষ্টাদশ দিবসের পর সন্ধ্যাকালে এক দরিদ্র গৃহস্থের বাটিতে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সেই গৃহস্থের একখানি মাত্র ঘর, তাহাতেই সে সপরিবারে শয়ন করিত। অতিথিকে বলিল—"মহাশয়, আপনি যদি ঐ গোশালায় রাত্রিযাপন করিতে প্রস্তুত হন, তবে অবস্থিতি করুন।" কাজি স্বীকৃত হইলেন।

পথশ্রমে তিনি নিতান্ত কাতর ছিলেন। গৃহস্থ প্রদত্ত কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করিয়া অবিলম্বেই নিদ্রিত হইলেন। অনেক রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইল। পৃথিবীর যাবতীয় দুর্ভাগ্য মনুষ্যের মত তিনিও সেই ঘোরান্ধকারময়ী স্তব্ধ রজনীতে স্তব্ধভাবে আপনার অদৃষ্টান্ধকারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে, জনকত অস্ত্রধারী দস্যু সেই গোশালায় প্রবেশ করিল। দুইটি গাভী এবং তাহাদের দুইটি বৎস বাঁধা ছিল;—দস্যুরা গাভী এবং একটি বৎসকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে গাভী ও বৎসটি অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিল। গাভীটি "হা বৎস" এবং বৎসটি "হা মাতা" বলিয়া রোদন করিতে ছিল। কাজি বিদ্যাবলে পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তিনি এই ক্রন্দন ব্যাপারের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে শুনিলেন, গাভীটি বলিতেছে—"বাছা তোর মা গিয়াছে, আমার সন্তান গিয়াছে; আয় তুই আমার সন্তান হইয়া থাক্, আমি তোর মা হইয়া সান্ত্বনালাভ করি।" বৎসটি বলিল—"মা, তুমি আমায় খাওয়াইবে কি? তোমার বৎস স্ত্রীজাতীয় ছিল; আমি পুরুষ; তোমার অল্পপরিমিত স্তনদুগ্ধে কেমন করিয়া আমার ক্ষুধা নিবারণ হইবে?"

এই কথা শুনিতেই কাজি সাহেবের মস্তিষ্কে সহসা একটি সত্যের বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। ভাবিলেন—"ঠিক কথা। ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকে দুর্ব্বল এবং পুরুষ জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়াছেন। উভয়ের দেহপুষ্টির জন্য সমান আহার কখনও প্রয়োজন হইতে পারে

না। যাহা নিষ্প্রয়োজনীয়, তাহাও এই অপূর্ব্ব কৌশলে সৃষ্ট বিশ্বজগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই পুংবৎসমাতা গাভী এবং স্ত্রীবৎসমাতা গাভীর স্তন্যপরিমাণ সমান নহে।

এতদিনে সে মকর্দ্দমার কিনারা হইল। কাজি প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় ঈশ্বর ও মহম্মদকে শত ধন্যবাদ দিয়া প্রফুল্ল মনে দেশে ফিরিলেন। বোগ্দাদে রাজসন্নিধানে সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদিনে দেশময় এ কথা প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছিল। খালিফ্ কাজিকে আজ্ঞা করিলেন—"তুমি বাদী প্রতিবাদী সাক্ষী প্রভৃতি সমস্ত লইয়া এই রাজধানীতে আসিযা সর্ব্বসমক্ষে বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবে।"

নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথা সময়ে কাজি রাজসভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। রাজ্যের সমস্ত গণ্য মান্য লোক—আমির, ওমরাহগণ—উপস্থিত হইয়াছেন, বিচার কার্য্য আরম্ভ হইল।

কাজি পূর্ব্ব হইতে প্রায় একশত চতুষ্পদ পশু রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে গুলি সভাপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। খালিফ্ কহিলেন—"এ সব কি হইবে?" কাজি কহিলেন—"এ সকল সাক্ষীশ্রেণী ভুক্ত।"

সকলে একান্ত কৌতূহলের সহিত বিচার প্রণালী দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে বাদিনী তাঁহার মোকর্দ্দমার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। প্রতিবাদিনী দোষ অস্বীকার করিল। তখন বৃদ্ধা ধাত্রীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। সে বলিল—"সন্তান দুইটি ভূমিষ্ঠ হইবার বোধ হয় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আমি উপস্থিত হইয়াছিলাম। ওয়াজিহনের নিকট "কন্যা এবং জহুরণের নিকট পুত্র সন্তান দেখিয়াছিলাম।" প্রতিবেশীনীরা সাক্ষ্য দিল "আমরা সন্তান জন্মের রাত্রি প্রভাত হইলে দুইজনের সূতিকাগারে উপস্থিত হইযাছিলাম। ওয়াজিহনের কোলে কন্যা এবং জহুরণের কোলে পুত্রসন্তানই দেখিয়াছিলাম।"

ইহার পর কাজি বলিলেন—"এখন বাক্‌শক্তি সম্পন্ন সাক্ষীদিগের পরীক্ষা শেষ হইল; এইবার সেই শক্তি হইতে বঞ্চিত সাক্ষীগুলির পরীক্ষা লওয়া যাইতেছে;—মাননীয় সভাসদ-বর্গ এবং সর্ব্বসাধারণ মনোযোগ করুন।"

পূর্ব্বকথিত পশুপাল হইতে একটি পুংবৎসযুক্ত এবং একটি স্ত্রীবৎসযুক্ত গাভী আনা হইল, বৎস দুইটি সমবয়স্ক। দুইটি সমভার রৌপ্যপাত্রে গাভী দুইটির দুগ্ধ দোহন করণান্তর তুলা-দণ্ডে পরিমিত করা হইল। সর্ব্বসাধারণ প্রত্যক্ষ করিল, পুংবৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধ অধিক হইয়াছে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে মহিষ, ছাগ, ভেড়া, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হরিণ প্রভৃতি বহু পশু-মাতার পরীক্ষা লওয়া হইল এবং প্রত্যেক বারেই ফল পূর্ব্বানুরূপ হইল।

পরীক্ষা শেষ হইলে কাজি বলিতে লাগিলেন—"হে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান সভাসদ্‌গণ, আপনারা জানেন, ঈশ্বর স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতিকে বলবত্তর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন। এই কারণে সর্ব্ব জীবের আদিম খাদ্যভাণ্ডারে তিনি পুরুষের জন্য অধিক এবং স্ত্রীজাতির জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প খাদ্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাহাও আপনারা প্রত্যক্ষ করি-

লেন। এক্ষণে (ওয়াজিহন্ ও জহুরণ্কে দেখাইয়া) এই স্ত্রীলোক দুইটির স্তনদুগ্ধ এইরূপে তুলনা করিয়া দেখা যাউক, যাহার দুগ্ধ পরিমাণ অধিক হইবে, তাহাকেই পুত্রসন্তানের মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে। কেমন, এ প্রকার নিষ্পত্তিতে আপনাদের সকলের সম্মতি আছেত?"

সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"আছে।"

তখন কথিত প্রকার পরীক্ষা হইল। বলা বাহুল্য ওয়াজিহনের দুগ্ধই গুরুতর হইল। ওয়াজিহন্ সভাসমক্ষে আপনার পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন। জহুরণ্কে তাঁহার কন্যা প্রত্যর্পিত হইল।

খালিফ্ এই বিচারপদ্ধতি দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। স্বীয় কণ্ঠদেশ হইতে বহুমূল্য মণিহার মোচন করিয়া স্বহস্তে কাজিসাহেবের গলে পরাইয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে রাজধানীর প্রধান কাজির (Chief Justice) সম্মানসূচক পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

দণ্ডস্বরূপ সেই শাশুড়ি-মাগীকে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থিত এক জনহীন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করা হইল।

নেপালে এক সপ্তাহ।

বাল্যকাল হইতেই আমার নেপাল দর্শনের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। নেপাল প্রবাসী আমার কোন পুজনীয় আত্মীয়ের মুখে তদ্দেশ সম্বন্ধে এত গল্প শুনিতাম যে হিমালয়ের বক্ষ বিরাজিত বহুসংখ্যক নদীগিরি এবং অরণ্যানার প্রান্তবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র কিন্তু সম্পদ সম্পন্ন স্বাধীন হিন্দু রাজ্যটি একেবারে আমার শিশুহৃদয় দখল করিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু তখন নেপালের পথ বিপদ সঙ্কুল, আমার ন্যায় বালকের পথে যাওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক নহে তাই আমার শৈশবের আগ্রহ অপরিতৃপ্তই রহিল।

যখন বড় হইলাম তখন অনেক চেষ্টার পর গুরুজনদের সম্মতি পাইলাম। সম্মতি পাইয়াও আমাকে দুই সপ্তাহ বিলম্ব করিতে হইল, কারণ পাশ ভিন্ন কাহারো নেপালে প্রবেশাধিকার নাই, এই পাশের যোগাড় করিতে দুই সপ্তাহ লাগিল।

পাশ যখন হস্তগত হইল তখন আনন্দে আশ্বিন মাসের একদিন মুঙ্গের হইতে অপরাহ্ণ ৪—৪৫ মিনিটের গাড়ীতে সিগোলি যাত্রা করিলাম। বড় হইয়াছি কিন্তু নেপাল সম্বন্ধে বালসুলভ আগ্রহ আমার এখনও তিরোহিত হয় নাই। পরদিন বেলা পাঁচটার সময় সিগোলি পৌছিয়াই ভাবিতে লাগিলাম কখন নেপালে আসিব, কখন সে স্বাধীন রাজ্য দেখিব!

ট্রেনহইতে নামিয়া আমার সন্ধানে কোন লোক আসিয়াছে কিনা তাহার খোঁজ করিতেই সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল। সেদিন অমাবস্যা—সন্ধ্যার অল্প পরেই ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এই অন্ধকারের মধ্যে অপরিচিত স্থানে আমার কোন, পরিচিত ব্যক্তির সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, এমন সময় সহসা আমাদের পুরাতন

ভৃত্য পিতাঠাকুরের নেপাল প্রবাসের একমাত্র অনুচর চন্দ্রিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে লইয়া যাইবার জন্যই ষ্টেসনে আসিয়াছিল, তাহার নিকট শুনিলাম আমার জন্য একটি হস্তী আসিয়াছে। কিন্তু এ অমাবস্যা রাত্রিতে এ ভীষণ অন্ধকারে হস্তীপৃষ্ঠে যাওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া সেরাত্রে একটি মুদীর দোকানে থাকা স্থির হইল।

যথাসময়ে আমরা মুদীর বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের জন্য যে গৃহটি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা ভয়ানক অন্ধকার ও অপরিষ্কার। কিন্তু কি করা যায়, অগত্যা সে রাত্রি সেখানেই কাটাইতে হইল। আমাদের দেখিয়া একজন নেপালী বলিল "বাবুজি আউনুহোস, এতা বস্নুহোস, আছৈ রাতি ভরোকছ, আইলে জানু ছন্নন, ভোলি তাঁপাই হুঝ চাঁতলা।" *

নেপালীর কথার অর্থগ্রহ হইল না, অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছি এমন সময় আমার ভৃত্য সহাস্যে উত্তর করিল "বাবাজি সবৌ আয়ো বন্দা, তিস্রো কুরা বুঝমু হন্নন। আইলে এতাই বসছো।" †

আহারান্তে শয়ন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চক্ষু মুদিতে পারিলাম না, অতি কষ্টে রাত্রি কাটাইয়া প্রত্যুষে নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ক্রমে তিনদিন অতীত হইলে চতুর্থ দিবস গিরিসন্নিকটে উপনীত হইলাম। এইবার এই দীর্ঘ পথ পর্য্যটনের পর পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া আমার মনে এমন আনন্দ হইল যে তাহা বলা যায় না। দেখিলাম গগনস্পর্শী শৈলমালা ধরিত্রীর বক্ষ যুড়িয়া পড়িয়া আছে, পদপ্রান্ত গহন অরণ্যরাজিতে পরিবেষ্টিত, উন্নত শৃঙ্গ সমূহ শরতের পীত সূর্য্যকিরণে হেমাভ। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম এই পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া যখন নেপালে যাইতে হইবে তখন নেপাল দর্শন হয়ত জন্মে নাই। আমাদের চতুর্দ্দিকে বিশাল অরণ্য, দক্ষিণে ও বামে অভ্রভেদী পর্ব্বত শৃঙ্গ, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তাহাদের ছায়া ক্রমে অস্ফুট হইতে অস্ফুটতর হইয়া শূন্যে বিলীন হইয়াছে, মধ্যদেশ শুভ্র তুষাররাশিদ্বারা সমাচ্ছন্ন—যেন শুভ্রবস্ত্র পরিহিত বিশালকায় দৈত্য নেপালের প্রবেশ পথে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া আমরা যাত্রা পুনরারম্ভের আয়োজন করিলাম।

এই স্থানে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ দুর্গ আছে, এই দুর্গে তিন চারিশত সুশিক্ষিত নেপালী সৈন্য অবস্থিতি করে; তাহারা আমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল "কোহো, গণ ওলে, গণ ঝায়া ?—অর্থাৎ তোমরাকে, কোথায় যাইতেছ, কোথা হইতেই বা আসিতেছ ?—এখানে বলা আবশ্যক যে প্রহরীদিগের এই ভাষা নেপালী ভাষা নহে, নেপালের আদিম অধিবাসীদিগের এই ভাষা, অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য, যাহারা নেপালী ভাষায় অভ্যস্ত তাহারাও অনেক সময় ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারেনা।

যাহা হউক নেপালী সৈন্যের প্রশ্ন শুনিয়া আমার ভৃত্য উত্তর করিল "বাবুজি ডাকদরকে

---

* বাবু আসুন, এইখানে বসুন। অনেক রাত্রি হইয়াছে, আজ এইখানেই থাকুন পরে কাল সকালে যাইবেন।

† বাবু এখানে নতুন এসেছেন, তোমাদের ভাষা জানেন না। আজ এইখানেই থাক্‌বেন।

ছোরা হুন মুঙ্গের বাই আউনুওবে নেপাল মা জান্নন। হামি হুরু তিনকে মহরা হু।" *

অনন্তর তাহারা আমার পাশ দেখিতে চাহিল, পাশখানা তাহারা লইয়া আমাকে আর একখানা পাশ দিল। এই স্থানে আমাকে হস্তী ছাড়িয়া দাণ্ডীতে উঠিতে হইল।

ক্রমে ভীমভেদী, অন্তগিরি প্রভৃতি ছ'টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু দুরারোহ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিষাগর পর্ব্বত সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম, এই পর্ব্বতটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা কাষ্টারোহ্য। সন্ধ্যা হইল দেখিয়া আমরা সে রাত্রিরমত সেখানেই অবস্থান কবিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে রওনা হওয়া গেল, কি ভয়ানক শীত! গায়ে পাঁচ ছয়খানি কাপড় জড়াইয়াও শীত যায় না। ক্রমে যতই উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম শীতে ততই হাতপা অবসন্ন হইতে লাগিল। অতি কষ্টে বিষাগর পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ ভাগে উপস্থিত হইলাম। এস্থানের দৃশ্য অতীব সুন্দর, সমতল ক্ষেত্রে এরূপ দৃশ্য দেখা অসম্ভব, এই মোহন দৃশ্যে স্বর্গের কল্পনাতীত সুষমারআভাস অনুভূত হয়। চতুর্দ্দিক চিরন্তনঅনন্ত তুষার রাশিতে সমাচ্ছন্ন, আমাদের পশ্চাতে শৈলবেষ্টিত অসংখ্য অরণ্য শ্রেণী, সম্মুখে গগনভেদী যোজনব্যাপী শুভ্র হিমাচল।

হিমালয়ের দক্ষিণ ও বামভাগ যে সকল ক্ষুদ্র শৈলমালায় পরিপূর্ণ তাহারই মধ্য দেশে নেপাল রাজ্য বিশাল ভূভাগ অধিকার করিয়া হিন্দু জাতির গৌরব রক্ষা করিতেছে।

ক্রমে বিষাগর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বেলা দ্বি প্রহরের সময় আমরা নেপালে উপস্থিত হইলাম। স্নান ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়াই বেলা সাড়ে তিনটার সময় রাজধানী দেখিতে বাহির হইলাম।

আমাকে অধিক দূর যাইতে হইলনা, রাজধানী বহুসংখ্যক কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্দিরে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে পশুপতিনাথের মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নানাবর্ণে সুরঞ্জিত ও বিবিধ কারুকার্য্য শোভিত। মন্দিরাভ্যন্তরে পশুপতি নাথের লিঙ্গমূর্ত্তি সংস্থাপিত, কতদিন পূর্ব্বে কোন ধার্ম্মিক রাজা এই মন্দির এবং দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই।

আমরা মন্দিরে উপনীত হইলে পূজারীজি আমাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন "বাবুজি বিত্রিমা আউনু হোস।" সুতরাং অবসর পাইয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেব দর্শন করিলাম, পূজারীকে যৎকিঞ্চিৎ দর্শনী দিয়া রাজভবন অভিমুখে চলিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হওয়াতে চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্না প্লাবিত কিন্তু ভয়ানক শীতে হাত পা অবশ হইয়া গেল, কাজেই সে রাত্রিরমত রাজভবন সন্দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিলাম।

পরদিন প্রভাতে তরুণ সূর্য্য যথা নিয়মে সমুদিত হইল, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, চতুর্দ্দিক ভয়ানক কুয়াশাচ্ছন্ন। বেলা একটু অধিক হইলে কুয়াশা কাটিয়া গেল, সূর্য্যদেব অত্যুজ্জ্বল আভায় সুন্দর শোভা ধারণ করিলেন। আমরাও যাত্রা করিলাম এবং অবিলম্বেই রাজভবনে পৌঁছিলাম।

* বাবু ডাক্তার বাবুর ছেলে, মুঙ্গেরে থাকেন ও নেপালে যাচ্ছেন। আমি ওঁদের চাকর।

স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের গৌরব ধ্বজা নিজ বিরাট মস্তকে ধারণ করিয়া রাজভবন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অন্যান্য সাধারণ গৃহের ন্যায় ইহাও কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং ইষ্টকাচ্ছাদিত কিন্তু ত্রিতল। আমাদের কাছে 'পুরজি' ছিল তাহা দেখাইয়া পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। গৃহাভ্যন্তর অতীব সুন্দর বিবিধ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত, নানা দ্রব্যে শোভিত, মহামূল্য মণিমুক্তায় খচিত। দেখিলেই রাজপ্রাসাদ বোধ হয়, প্রাতঃসূর্য্যের স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল কিরণ উহাদের উপর প্রতিফলিত হওয়াতে উহাদিগকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

রাজভবন দুই ভাগে বিভক্ত, একভাগ 'বাহার কাছারী', অন্য ভাগের নাম 'অন্দর মহল'—উহা ১০।১২ ফিট উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, ভিতরে যাইবার দুইটি মাত্র দ্বার; ঐ দ্বারদ্বয়ে সর্ব্বদাই দুই তিন শত সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী অশ্বারোহী সৈন্য অবস্থান করে। রাজানুমতি ভিন্ন কেহই পুরপ্রবেশের অধিকারী নহে।

রাজদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, সৌভাগ্যবশতঃ আমি রাজার দর্শন পাইয়াছিলাম; রাজা অতি সুপুরুষ, গৌরবর্ণ, বয়স বিংশতি বর্ষের অধিক বোধ হয় না। মহারাজা বীর সম্‌সেরজঙ্গ রাণাবাহাদুরের (প্রধান মন্ত্রী) কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত, রাজপরিবারস্থ প্রায় সকলেই ইংরাজীভাষায় সুন্দর কথা কহিতে পারেন। এখানে একটা এন্‌ট্রেন্সস্কুল আছে, শিক্ষকগণ প্রায় সকলেই বাঙ্গালী, এই স্কুল হইতে প্রায় প্রতিবৎসরই দুই একজন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি নেপালরাজের এই প্রকার সমাদর একটি আশার কথা। স্বাধীনতার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বিদ্যমান থাকিলে তাহা দেশের নৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়; রুদ্ধ, একদেশদর্শী জাতীয় অভিমতকে তাহা উদার এবং বিস্তৃত করিয়া দেয়, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জাগ্রত মানব সমাজে সে জাতির স্থান হইতে পারে। রাজার স্বভাব অতি বিনীত, তাঁহার ব্যবহারে কোন প্রকার অহঙ্কার প্রকাশিত হয় না। সকলের সঙ্গেই তিনি অমায়িক ভাবে আলাপ করেন।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, কিন্তু আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষা মিটিল না। সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, স্নান ও আহারাদি সমাপন করিয়া পুনশ্চ রেসিডেণ্ট সাহেবের বাড়ী দেখিতে চলিলাম। নেপাল রাজধানীর পথঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর একটি করিয়া থানা আছে, সেখানে দশবারোজন শান্তি রক্ষক সিপাহী নিযুক্ত থাকে।

শীঘ্রই আমরা রেসিডেণ্ট সাহেবের বাড়ী পৌঁছিলাম। তাঁহার বাসা নেপালী ধরণে নির্ম্মিত নহে, য়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত, শুনিলাম ৺ হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক পূর্ত্ত বিভাগের কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। রেসিডেণ্টের অনুপস্থিতি বশতঃ সেদিন তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল না। রেসিডেণ্টের অধীনে তিনশত শিপাহী

সৈন্য অবস্থিতি করে। রাজ্যেশ্বরের অনুমতি ব্যতীত ইহারা স্ব স্ব সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। শুনা গেল, আগে এরূপ নিয়ম ছিলনা, কারণ দুই তিন বৎসর আগে একদল শিপাহী মদিরোন্মত্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ পূর্ব্বক নাগরিকবর্গের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল।

সন্ধ্যাকালে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলাম নেপাল ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ও জমাহির থাপা প্রভৃতি কয়েকজন শিকারে যাইবেন। আমি কখন শিকার করিতে যাই নাই তাই শিকার দর্শন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইল, অথচ আমার গুরুজন দিগের আশঙ্কা এত প্রবল যে তাঁহাদের সম্মতি কিছুতেই পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে সম্মতি আদায় করিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যুষে হস্তী আরোহণে শিকার যাত্রা করা গেল। আমাদের ৩৭ জন লোক ও পাঁচটা বৃহৎ শিকারী হাতী ছিল। বেলা এক প্রহরের সময় আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম, একটির পর একটি এইরূপে কত অরণ্য অতিক্রম করিলাম, ভয়ঙ্কর অন্ধকার, পথ একে ত নাই, তাহার উপর যদি বা থাকে ত তাহা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং কণ্টকাবৃত। বৃক্ষগুলি এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট যে তন্মধ্যে সূর্য্যকর প্রবেশ করিতে পারে না।

অবশেষে একটি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শিকারীগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইল। একটি হস্তীতে আমি, জমাহীর থাপা আর কম্পাউণ্ডার এই তিনজন। জমাহীর থাপা লোকটী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, বর্ণটি গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, ভয়ানক দীর্ঘ এবং অত্যন্ত চওড়া, স্বভাব অতি সুন্দর, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও বাহ্যাড়ম্বর ও অহঙ্কার শূন্য। ইনি অত্যন্ত সাহসী, এবং শিকারে কদাচ তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইয়া গেল কিন্তু কোন শিকারই মিলিল না, জমাহীর থাপা প্রতিজ্ঞা করিলেন আজ শূন্যহস্তে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, তাই মাহুতকে দ্রুত গতি হাতী চালাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বৃক্ষ লতা ভেদ করিয়া, তৃণ গুল্ম নিষ্পেষিত করিয়া পত্র পুষ্প ছিন্ন করিয়া দ্রুতবেগে হস্তী অগ্রসর হইল, এমন সময় অদূরে অকস্মাৎ শার্দ্দূল গর্জ্জন শ্রুত হইল, অবশেষে আমরা ব্যাঘ্রের দুই শত হস্ত দূরে উপস্থিত হইলাম।

উপায়ান্তর না দেখিয়া জমাহীর থাপা বন্দুক হস্তে হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন, আমাদিগকে উপদেশ দিলেন যে যদি বাঘ আসে তাহা হইলে আমরা যেন তাহাকে আক্রমণ করি।

গজেন্দ্র গমনে তিনি অগ্রসর হইলেন, তাঁহার মনে যে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইল না। তিনি সহসা ব্যাঘ্রের ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার গুলি ছুঁড়িলেন। ব্যাঘ্র পূর্ব্বেই আহত

হইয়াছিল, এবার গুলি খাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একলম্ফে তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল এবং মুখব্যাদান পূর্ব্বক তাঁহার বাম হস্তে দংশন করিল। দরবিগলিত ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অতি সাবধানে বামহস্তে বন্দুক তুলিয়া তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া আর এক গুলি মারিলেন। গুলি তাহার গায়ে লাগিল না, কিন্তু সে ভীত হইয়া ভীমগর্জ্জনে কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঁচ ছয় হস্ত দূরে সরিয়া গেল। সেই অবসরে বন্দুক বোঝাই করিয়া তিনি তাহার প্রতি আর এক গুলি নিক্ষেপ করিলেন, তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইল, তাহার প্রাণহীন দেহ তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। আমরা অবিলম্বে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তিনি ব্যাঘ্রকে হস্তীপৃষ্ঠে উঠাইয়া অনতিবিলম্বে আমাদের পাশে আসিয়া বসিলেন, তিনি তাঁহার বেদনার কথা একবারও বলিলেন না, তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষে কৃতকার্য্যতা জনিত আনন্দ ফুটিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা অতীত হইল—আর পথ দেখা যায় না। দিবসে কাহারো আহার হয় নাই, আমরা সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অতি কষ্টে অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রাত্রি ১১টার সময় বাসায় পৌঁছিলাম।

পরদিন দুর্গোৎসব। আজ সকল লোকের হৃদয় আনন্দাপ্লুত। জনকোলাহল এবং বাদ্যোদ্যম আমাদের সেই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গের সমতল ক্ষেত্র এবং শারদোৎসবের আনন্দপূর্ণ কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিল। হিমালয়ের বক্ষে, স্বাধীন নেপালরাজ্যে আসিয়াও জন্মভূমির সুকোমল স্মৃতি প্রস্ফুট পুষ্প গন্ধের ন্যায় আমার হৃদয় মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। মনে হইল আমাদের সেই চিরপরাধীনা, অবজ্ঞাতা মাতৃভূমির সঙ্গে সব বিষয়ে নেপালের প্রভেদ থাকিলেও এ যেন আমাদেরই সেই দেশ, নেপালীরাও হিন্দুজাতি, তাহারা আমাদের মতই ভক্তি গদ্গদ চিত্তে হৈমবতীর পূজা করিয়া থাকে।

এই প্রীতিকর স্মৃতিসৌরভকে পাথেয় করিয়া লইয়া আমরা প্রভাতে নেপালী পল্টন দেখিবার জন্য গৃহত্যাগ করিলাম। আজ চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য, সে ভীড়ের মধ্যে অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য? অগত্যা ভগ্নমনোরথে আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

বেলা অধিক হইলে যখন দেখিলাম জনতা ঈষৎ মন্দীভূত হইয়াছে তখন আমরা পূজা দেখিতে বাহির হইলাম। পূজা সকালেই আরম্ভ হইয়াছিল, আমরা যখন উৎসব প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম তখন বলিদানের সময়। আমাদের দেশের ন্যায় এই দেশের বলিদানে খড়্গ ও হাড়িকাঠের ব্যবহার নাই, এমনকি বড় বড় মহিষ বলির সময়ও তাহার আবশ্যক হয় না। আমাদের দেশে মহিষ বলি অতি ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু এখানে তাহা অতি সামান্য ঘটনা।

পূজার প্রথম দিন আমাদের আর কোথাও যাওয়া হইল না, নবমী পূজার দিন অতি প্রত্যূষে নেপালী পল্টন দেখিবার জন্য হস্তী আরোহণে ললিতপতন নামক স্থানে যাত্রা করিলাম।

কাটামুণ্ডে অবস্থিত সৈন্তের সংখ্যা অধিক নহে, কারণ তাহাতে দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় ত্রিশ হাজার সুশিক্ষিত গুর্খা সৈন্য পর্ব্বত গহ্বরে লুক্কাইত থাকে, কিয়দংশ সৈন্য চড়াইতে থাকে, অবশিষ্ট সমস্ত গুর্খা ললিত পতনে ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে অবস্থান করে। নেপালে বয়ঃপ্রাপ্ত প্রায় সকল অধিবাসীই কিয়ৎ পরিমাণে যুদ্ধ কার্য্যে অভিজ্ঞ। প্রাচীন কালে এ দেশে তীর ধনুকের ব্যবহার ছিল, ইংরেজদিগের সহিত ইহাদের যুদ্ধের কিছু পূর্ব্ব হইতে বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা ললিতপতনে উপস্থিত হইলাম। আমাদের আহারাদির জন্য পূর্ব্ব হইতেই একটি গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বেলা তিনটার সময় ছাউনীতে উপস্থিত হইলাম।

নেপালী সৈন্যের পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাহাদিগের পরিধানে সুরুয়াল (পেন্ট্‌লুন), গায়ে মালপোষ (কোট), কটিদেশে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণধার "খুকরী", স্কন্ধে সঙ্গীন বিশিষ্ট বন্দুক, এবং মস্তকে অপূর্ব্ব শিরস্ত্রাণ। প্রথমে অশ্বারোহী, পরে পদাতিকগণের কাওয়াজ আরম্ভ হইল। তাহাদের সুন্দর যুদ্ধ কৌশল, অস্ত্র শস্ত্রের দ্রুত চালনা এবং তৎপরতা দর্শনে তাহাদিগকে কোন শিক্ষিত যুদ্ধ নিপুণ জাতি অপেক্ষা সমরবিদ্যায় হীন বলিয়া অনুমান হয় না। বর্ত্তমান নেপালী সৈন্যগণ য়ুরোপীয় আদর্শে শিক্ষিত, এবং সমর বিভাগের কর্ম্মচারীগণ য়ুরোপীয় শব্দেই অভিহিত। যে সকল লোক সৈন্য বিভাগে নবপ্রবিষ্ট হয় তাহাদিগকে 'নউ' বলে, যাহারা বহুদিন এই বিভাগে কাজ করিয়াছে এবং দুই একটি যুদ্ধ জয় করিয়াছে তাহাদিগকে 'পল্টু' বলে। প্রথমোক্ত সৈন্যগণের বেতন সাত আট টাকা হইয়া থাকে শেষোক্তগণ মাসিক বিশ পঁচিশ টাকা বেতন পায়।

শুনিয়াছিলাম বিজয়ার দিন সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়া কৃত্রিম সমর কৌশল প্রদর্শন করে, আজ বেলা আড়াইটার সময় কাওয়াজ আরম্ভ হইবে, যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে তাহাদের বেতন ও পদবৃদ্ধি হওয়ারও নিয়ম আছে।

যথা সময়ে আমরা প্যারেড গ্রাউণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজা রাজমন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই ধীরে ধীরে আসিয়া সেখানে সমবেত হইলেন। তখন কর্ত্তৃপক্ষীয়ের আদেশানুসারে সমস্ত সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল, একদলের অধিনায়কত্ব সেনাপতি চন্দ্র সমসের স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, অন্যদলের নেতৃত্ব, সার জনরেল জম সমসেরের উপর পতিত হইল। দুই সৈন্যদলে তখন কৃত্রিম যুদ্ধ বাধিল—অস্ত্রের ঝনঝণা, বীরগণের শ্রবণভেদী যুগপৎ হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহাদের কি ত্রস্ত পদচালনা, অস্ত্র পরিচালনের কি অসাধারণ নৈপুণ্য! দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না! প্রত্যেক সৈন্যের মস্তকে সুদৃঢ় শিরস্ত্রান, হস্তে সৌরকর প্রদীপ্ত অস্ত্রফলক, গাত্রে বিচিত্র বর্ম্ম। সৈন্য পরিচালকগণ অশ্বারোহণে স্বস্বসৈন্যবর্গকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। উৎ

সহিত সৈন্যগণ অকুতোভয়ে বিশাল বিক্রমে বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, কেহ প্রাণ লইয়া পলায়ণ করিতেছে, কেহ পলাইতে পলাইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শত্রু সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তখন উভয় পক্ষ জয়নাদ পূর্ব্বক আবার পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে। কেহ কাহারো দেহে আঘাত না করিয়া অতি সাবধানে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। কৃত্রিম হইলেও ইহাতে যে কম নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয় এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। দেখিয়া সত্য সত্যই মনে হয় যেন দুই রাজার সৈন্যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, এ যেন রঙ্গভূমি নহে, আমরা যেন বর্ত্তমান ভারতে নাই, যেন পৌরাণিক ভারতে অমিততেজা কুরুপাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া বিস্তীর্ণ ভারতের গৌরবান্বিত সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল, সুতরাং সেদিনের মত সখের সংগ্রাম বন্ধ হইল। আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সেই দিন রাত্রি নয় ঘটিকার সময় নেপাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি গৃহাভিমুখে রওনা হইলাম।

এখানে নেপালীদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে কোন কোন কথার আলোচনা করিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা ও বারানসী নগরে নেপালী দেখিয়াছেন, ইংরেজদেরও কয়েকটি গুর্খা রেজিমেণ্ট আছে। ইহারা হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, খর্ব্বাকার, স্থূল দেহ এবং অত্যন্ত কর্ম্মঠ, অসভ্য হইলেও বীরত্ব ও মহত্বে ইহারা অনেক সভ্যজাতির সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। স্বাধীনতার প্রতি ইহাদিগের অটল অনুরাগ এবং স্বজাতির মধ্যে অসাধারণ ঐক্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। ইহাদিগের স্বভাব অত্যন্ত বিনীত, সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হয় না কিন্তু একবার ক্রোধ হইলে তাহারা অত্যন্ত ভীষণ কান্তি ধারণ করে। ইহাদের স্ত্রীজাতির প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে তাহার প্রাণনাশেও কুণ্ঠিত হয় না। নেপালী রমণীদের মধ্যে অনেকেই সুন্দরী এবং তাহাদের ব্যবহার অতীব মনোমুগ্ধকর। নেপালীরা যেমন নির্ভীক সেইরূপ প্রফুল্ল চিত্ত। ইহারা প্রায় ধুতি পরিধান করেনা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহাদের পরিচ্ছদের নাম সুরুয়াল। স্ত্রীলোকদিগের কাপড় প্রায় ত্রিশ বত্রিশ হাত লম্বা, উহাদ্বারা ইহারা সর্ব্বদা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। পুরুষেরা মস্তকে টুপী পরিলেও রমণীগণ মস্তকাবরণ ব্যবহার করেনা, সাধারণ রমণীগণ অপেক্ষা রাজপরিবারভুক্তা মহিলাগণের পরিধেয় বস্ত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহারা অলঙ্কারের অধিক পক্ষপাতী নহে, কিন্তু কেশের প্রতি অত্যন্ত যত্ন পরায়ণ, কেশ বিন্যাসে ইহারা প্রচুর নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। ইহারা ফুল বড় ভাল বাসে, ফুল পাইলেই মাথায় পরে।

নেপালীদিগের ভাষা বেশ সুললিত, যখন ইহারা স্বদেশীয় ভাষায় পরস্পর কথোপকথন করে তখন তাহা শুনিতে বেশ মিষ্ট লাগে; এই ভাষা দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। নেওয়ার অর্থাৎ নেপালের আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই।

পাঠক পাঠিকাদিগের কৌতূহল নিবারণের জন্য নিম্নে আমরা কতিপয় নেপালী ও নেওয়ারী শব্দ এবং তাহাদের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ প্রকাশ করিলাম।

নেওয়ারী শব্দ।	নেপালী শব্দ।
ল = জল।	রাতি = রাত্র।
মি = অগ্নি।	আইলে = অগ্য।
খুসি = নদী।	থিয়ে = ছিল।
ধুনলা = খাওয়া।	রাস্রো = সুন্দর।
ওনে = যাওয়া।	গুরু = ভারি।
ঝায়া = আসা।	পুছনু = জিজ্ঞাসা করা।
সন = কোথায়।	রুনছু = ক্রন্দন করা।
থামো = শীতল।	সিথ = সহিত।
হাকি = আন।	কিন = বোন।
ছেঁ = বাটী।	বাস্কো = বাজার।
রাতো = লাল।	মানিস্ = মনুষ্য।
মাসি = কালি।	অলিবাতি = অল্প।

সংস্কৃত ভিন্ন হিন্দি ও উর্দ্দুর সহিত নেপালী ভাষার কিছু কিছু সংস্রব আছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে নেপাল স্বাধীন রাজ্য। সমস্ত ভারত আজ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত; বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত নেপালের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহা অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন নহে, ইহাকে কোন মতেই অসভ্য দেশ বলিতে পারা যায় না; ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে নেপালের রাজা তদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রণালী প্রচলনের জন্য যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতেছেন, শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য এখান হইতে যাহারা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নেপাল গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহাদিগকে উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করা হয়। স্বর্গীয় মহারাজ জং বাহাদুর নেপালী সাহিত্যের উন্নতির জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার পরিশ্রম অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে; নেপালী ভাষায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ, শকুন্তলার ন্যায় নাটক, মেঘদূতের ন্যায় কাব্য এবং শিশুপালকের ন্যায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া সাধারণ্যে আদৃত হইয়াছে। শিক্ষার উন্নতির জন্য এদেশে প্রচুর আলোচনা চলিতেছে এবং এদেশে কল কারখানা বিস্তৃত করিবার জন্য পরিশ্রমী বুদ্ধিমান ছাত্রগণকে দেশ বিদেশে প্রেরণ করা হইতেছে। তন্মধ্যে একটি ছাত্র সংপ্রতি এদেশে ইনজিনিয়ারিং পাশ করিয়া আসিয়াছেন। কার্য্য সৌকর্য্যার্থ ইহারা জলের কল, গ্যাসের আলো প্রভৃতির বিষয়ে বৈজ্ঞানিক উন্নতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বদেশরক্ষার্থ যে সকল গোলাগুলির আবশ্যক তাহাও ইহারা এইদেশে নির্ম্মাণ করে, সে জন্য ইহাদিগকে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় না। নেপালে একটি বৃহৎ কারখানা আছে ইহার অধ্যক্ষ ইতিপূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ছিলেন, বিশেষ কোন কারণে তাঁহাকে বিদায় দিয়া উপরোক্ত নেপালী ইঞ্জিনিয়ারকে সেই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শত্রু পক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করি-

বার জন্য গিরি পথ গুলি সুরক্ষিত করা হইয়াছে, এই সকল পর্ব্বতের উপর নির্ভীক এবং যুদ্ধ প্রিয় গুরখা সৈন্য সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট থাকে।

বর্ত্তমান রাজা সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি দয়ালু, দানশীল এবং শান্তিপ্রিয়, প্রজাবর্গের উপর তাঁহার বাৎসল্যের অভাব নাই, প্রজাবর্গের দুঃখের কথা শুনিলে সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয়। প্রজাবর্গের অবস্থা সন্দর্শনের জন্য তিনি প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট কালে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। বিদেশীগণ নেপালে উপস্থিত হইলে সেই সকল বৈদেশীক অতিথির প্রতি রাজার সযত্ন দৃষ্টি নিপতিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেকের ধারণা নেপালে সুবিচার হয় না, বিদেশীর প্রতি এখানে অত্যাচার হয় এবং সামান্য অপরাধ করিলেও অবিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, এই ধারণার মূলে কোন সত্য নিহিত নাই, ইহা হয়ত কোন কুৎসাপরায়ণ লোকের স্বকপোল কল্পিত অলীক অভিযোগ। নেপালীরা অমায়িক, আমোদ প্রিয় এবং সরল হৃদয়। কপটতায় ইহারা অভিজ্ঞ নহে, ইহারা অত্যন্ত আতিথেয়, অনাথের বান্ধব, এবং শত্রুর অপরাজের শত্রু।

ইংরেজ শাসনাধীন না হইলেও এই রাজ্য যে সুসভ্য তাহার আরো প্রমাণ আছে। প্রজাগণের রোগ নিবারণের জন্য রাজা তাঁহার অধিকার সীমার মধ্যে আটটী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এই সকল চিকিৎসালয়ে উপযুক্ত বেতনে শিক্ষিত চিকিৎসক এবং তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন পথশ্রান্ত পথিক দিগের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য তিনি স্থানে স্থানে কূপখনন ও আহার্য্য প্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পথিমধ্যে অতিথিশালারও অভাব নাই, অতিথিগণ এই সকল স্থানে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হয়। এই সকল অতিথিশালায় ধনবান ও দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য প্রদর্শন করা হয় না। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অন্নহীন প্রজাবর্গের নিকট হইতে কর আদায় করিবার জন্য অনেক সভ্য দেশের ন্যায় এখানে কোন প্রকার উৎপীড়ন হয় না।

নেপালের ভূমি আমাদের দেশের ভূমি অপেক্ষাও অধিকতর উর্ব্বরা, এইজন্য ধান্য চাউল গম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে এখানে বিক্রীত হইতে দেখা যায়।

কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এদেশেও বর্ত্তমান বর্ষে অনাবৃষ্টি জনিত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। নেপালরাজ এই দুর্দ্দিনে প্রজার দুঃখ দেখিয়া উদাসীন নহেন, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং দুস্থ প্রজার নিকট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন। আইনের ছাঁচে প্রজাকে নিক্ষেপ করিয়া গুরুতর পেষণদ্বারা এখানে রাজস্ব আদায় করা হয় না, এখানেও আইন আছে বটে কিন্তু আইনের পশ্চাতে রাজার করুণা এবং উদার সহৃদয়তা সমুন্নত রাজ ছত্রের ন্যায় দুর্ভিক্ষতাপদগ্ধ প্রজাবর্গকে শান্তিপূর্ণ সুশীতল ছায়া দান করিতেছে।

নেপালে প্রতিবৎসর পাঁচ ছয় বার 'দরবার' বসে। প্রতিবার তিন চারি দিবস ধরিয়া

'দরবার' চলিয়া থাকে। নেপালের অধিবাসীগণ এই সকল দরবারে তাহাদের অভাব ও অভিযোগের কথা রাজার কর্ণগোচর করে, এই উপলক্ষ্যে রাজাকে প্রায় সকলেই যথাসাধ্য 'নজর' দেয়। নজরের টাকার অর্দ্ধাংশ রাজা গ্রহণ করেন, অবশিষ্টাংশ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে জমা হয়, এবং এই দুর্ভিক্ষ ফণ্ডের টাকা দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারণেরই চেষ্টা করা হয়। নেপালের টাকা আমাদের দেশের আধুনিক টাকার সাড়ে ছয় আনা অংশ মাত্র। খাস নেপালে ইংরাজী টাকার প্রচলন নাই, কোথাও কোথাও ইংরাজী টাকা এবং নেপালী টাকা উভয়ই ব্যবহৃত হয়। নেপালের পয়সা ইংরাজী পয়সার মতই, কিন্তু পরিধিতে কিছু কম, এখানেও এক টাকায় চৌষট্টি পয়সা, তবে আঁধুলি, সিকি দুয়ানী প্রভৃতি টাকার ভগ্নাংশের ব্যবহার নাই।

নেপালের প্রত্যেক সহরে এক একজন শাসনকর্ত্তা আছেন, এক একজনের অধীনে পাঁচ ছয়টি সুবা; বিচারের জন্য বিভিন্ন বিচারালয় আছে, এখানে উকীল মোক্তারের হাঙ্গামা নাই, বিচারের সমস্ত ভার বিচারপতির উপর ন্যস্ত থাকে। নেপাল রাজ্যে ব্রাহ্মণের ফাঁসির ব্যবস্থা নাই, প্রাণের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণের প্রাণ গ্রহণে যে মনুষ্যের অধিকার আছে ইহা তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহেনা। হত্যাপরাধের বিচার কাটামুণ্ডুতেই হইয়া থাকে, দোষ প্রমাণ হইলে অপরাধীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা আছে, অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ব্রাহ্মণ জাতির ফাঁসি হইতে পারে, অনেককে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

নেপালের প্রায় সকল প্রধান নগরেই জেলখানা আছে। জেলখানায় স্ত্রী ও পুরুষের জন্য বিভিন্ন কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে, জেলখানায় কয়েদীগণের আহারাদির বন্দোবস্ত ভাল। কয়েদীগণকে কঠিন পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হয় না, এতদ্ভিন্ন বন্দীগণ বৎসরে প্রত্যহ একবার বাটী যাইতে পারে। এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা থাকায় যাঁহারা মনে করেন নেপালে অপরাধীগণ প্রশ্রয় পাইয়া অধিক পরিমাণে অপরাধ করে তাঁহাদের ভ্রমদূর করিবার জন্য একথা বলা যাইতে পারে যে নেপালে চোরদিগের সংখ্যা অধিক নহে, ইহারা চৌর্য্যবৃত্তিকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। এদেশে কাঠ অত্যন্ত সুলভ, যাহার যত আবশ্যক জঙ্গল হইতে কাটিয়া আনিলেই হইল, কিন্তু শাল সেগুণ শিশু প্রভৃতি মূল্যবান কাঠ কাটিতে হইতে বনজঙ্গ কাপ্তেনের নিকট ইহতে হইতে অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে হয়।

ভারতে সূর্য্যগ্রহণ।

পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, আগামী ২২শে জানুয়ারিতে ভারতবর্ষে একটী পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইবে। প্রায় প্রতিবৎসরে পৃথিবীর নানা অংশে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ণগ্রাস গ্রহণ প্রায়ই লক্ষিত হয় না। সৌরমণ্ডল পরীক্ষা অতীব কঠিন ব্যাপার, অতি বৃহৎ দুরবীক্ষণ সাহায্যেও জ্যোতির্বিদগণ সকল সময়ে সূর্য্যমণ্ডল পরিদর্শন করিতে পারেন না,—সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল রশ্মিজাল ও আলোকচ্ছটা পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়ে। সূর্য্যগ্রহণ কালে চন্দ্র দ্বারা সৌরমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, ক্ষীণ-জ্যোতি হইয়া পড়িলে, জ্যোতিষীগণ সূর্য্য পরিদর্শনের একমাত্র অবসর প্রাপ্ত হন,—এই কারণে সূর্য্যগ্রহণকাল বিজ্ঞানবিদ্‌গণ অতি বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। আগামী সূর্য্য-গ্রহণ পরীক্ষার জন্য, ইতিমধ্যেই য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান বিজ্ঞান সভা হইতে অনেক জ্যোতিবিদ্ নিযুক্ত হইয়াছেন; যে প্রকার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় এই গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণে গ্রহরাজ সূর্য্য সম্বন্ধে অনেক গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে।

গত বৎসর উত্তর য়ুরোপ খণ্ডস্থ নরওয়ে প্রদেশে একটী পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হইয়াছিল; নানাদেশীয় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সেই গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণার্থে বহু আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রহণকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় জ্যোতিষীগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সূর্য্যগ্রহণ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় জ্যোতিষীগণের এই প্রকার বৃথা আয়োজন ও অর্থব্যয় প্রায়ই ঘটিয়া থাকে;—গত ১৮৭৭, খৃষ্টাব্দে দক্ষিণভারত, সিংহলদ্বীপ ও আষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কতিপয় স্থানে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল; ভারতবর্ষ অপেক্ষা আষ্ট্রেলিয়া কতকটা সুগম বিবেচনা করিয়া প্রধান প্রধান বৈদেশিক জ্যোতিষীগণ, শেষোক্ত স্থানে সমাগত হইয়া যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঠিক পূর্ণগ্রহণ কালে সহসা একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া, পণ্ডিতগণের বহু আয়োজন নিমেষে ব্যর্থ করিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ এই প্রকারে ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের উৎসাহের মাত্রা অনুমাত্র হ্রাস হয় নাই—গ্রহণ দর্শন উদ্দেশে বিদেশ যাত্রাকালে, চিরতুষারাবৃত মেরুপ্রদেশও তাঁহাদের নিকট সুগম হইয়া পড়ে; বৈদেশিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের অদম্য অধ্যবসায়, উৎসাহ এবং অনুসন্ধিৎসার মহিমা, আমাদের ন্যায় পরাবলম্বী, অধঃপতিত, অজ্ঞ জাতি কি বুঝিবে?

বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের দেশে যে সূর্য্যগ্রহণ হইতেছে, তাহার দর্শন পক্ষে কোন প্রকার অন্তরায় হইবে বলিয়া বোধ হয় না। জানুয়ারি মাসটা, বৎসরের অপরাপর সময় অপেক্ষা বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত দিবসের যে সময় গ্রহণ হইবে, তাহাও পরিদর্শন পক্ষে অতীব সুবিধাজনক;—উদয় বা অস্তকালে গ্রহণ হইলে, পর্য্যবেক্ষণের বড় অসুবিধা হয়; আকাশ মেঘনির্মুক্ত থাকিলেও তৎকালে প্রায়ই দর্শক ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে গভীর বাষ্পের ব্যবধান থাকে, কাযেই পরিচ্ছন্ন মণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না,—কিন্তু উপস্থিত সূর্য্যগ্রহণ অপরাহ্ণ

এক ঘটিকার সময় লক্ষিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কারণে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের কোনও অন্তরায় হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্যগ্রহণে পূর্ণতার কাল প্রায়ই অতি অল্প হইয়া থাকে,—অর্দ্ধমিনিট চন্দ্রদ্বারা সৌরগোলক সম্পূর্ণ আবৃত থাকিলে জ্যোতির্বিদগণ পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই অত্যল্প সময়েই তাঁহারা ফোটোগ্রাফ্ যন্ত্রদ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের নানা অবস্থার ছবি তুলিয়া, এবং দূরবীক্ষণ ও রশ্মিনির্ব্বাচক (Spectroscope) যন্ত্রসাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে নানা পর্য্যবেক্ষণ সম্পন্ন করিয়া থকেন ;—আগামী জানুয়ারির সূর্য্য গ্রহণের পূর্ণতার কাল দুই মিনিটেরও অধিক সুতরাং সময়াভাবেও পরিদর্শন কার্য্যের কোনও অসুবিধা হইবে না।

সূর্য্য গ্রহণের পূর্ণগ্রাস সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না,—যে সকল স্থান গ্রহণ কালে, সূর্য্য ও চন্দ্রের কেন্দ্র সংযোজক রেখায় পতিত হয়, কেবল তথায় পূর্ণ গ্রহণ দৃষ্ট হয়। গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, বোম্বাই নগর হইতে দারজিলিং পর্য্যন্ত এক সরল রেখা টানিলে, ঐ রেখা যে সকল স্থান ভেদ করিয়া যাইবে, আগামী গ্রহণে তৎ তৎ স্থানে স্পষ্ট পূর্ণ গ্রাস লক্ষিত হইবে, এতদ্ব্যতীত উক্ত রেখার উভয় পার্শ্বে ২০ মাইলের অন্তর্গত স্থানেও পূর্ণতা দেখা যাইবে। উল্লিখিত রেখা, বোম্বাই মধ্য প্রদেশ ও বিহারের রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থান ছেদ করিয়া গিয়াছে,—গ্রহণ দর্শনেচ্ছুগণের এ প্রকার সুবিধা প্রায়ই হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলপথে, পাটনা ও কাশীর মধ্যবর্ত্তী সকল স্থানেই পূর্ণ গ্রহণ দৃষ্ট হইবে,—বক্সার নামক স্থানটী ঠিক পূর্ণ গ্রহণ রেখার উপরে পড়িয়াছে ; এতদ্ব্যতীত পূর্ণিয়ার উত্তরাংশ ও দার্জিলিঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে পূর্ণগ্রাস লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু এই শেষোক্ত স্থান গুলি শীতকালেও অনেক সময় মেঘাচ্ছন্ন থাকে,—সুতরাং তথায় গ্রহণ দর্শনের সুযোগ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যে সকল বৈদেশিক পণ্ডিত পর্য্যবেক্ষণার্থে ভারতে সমাগত হইবেন, তাঁহারা কোন্ স্থান হইতে গ্রহণ দর্শন করিবেন, অদ্যাপি তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। বিলাতের বিখ্যাত টাইম্স্ পত্রে জনৈক জ্যোতিষী লিখিয়াছেন,—সমুদ্র তীরবর্ত্তী বোম্বাই নগরী বা তৎ সন্নিহিত স্থান পর্য্যবেক্ষণের জন্য নির্ব্বাচন করা ভাল নয়,—কারণ পূর্ণগ্রহণের একঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সৌরমণ্ডল ক্রমশঃ ক্ষয়গ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, আকাশের সাধারণ তাপ ধীরে ধীরে মন্দীভূত করিয়া তুলিবে,—এতদ্দ্বারা সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানস্থ জলীয় বাষ্প রাশি সহসা শীতল হইয়া কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে, পরীক্ষাক্ষেত্র নির্ব্বাচন একটা প্রধান ব্যাপার, সুতরাং যে সকল স্থানে মেঘবাত্যাদি দৈব উপদ্রবের সুদূর সম্ভাবনাও বর্ত্তমান, তাহা অপর সহস্র প্রকারে সুবিধাজনক হইলেও জ্যোতির্ব্বিদ্গণ সর্ব্বথা পরিহার করিয়া থাকেন। উক্ত পত্রলেখক বলেন, মধ্য ভারত, বেহার বা বেনারস্ অঞ্চলের কোনও নগর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষেত্র রূপে স্থির করা ভাল। উপস্থিত ব্যাপারে ভারতগবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত উদ্যোগী হইয়া পড়িয়াছেন ; যাহাতে রাজব্যয়ে কয়েকটী জ্যোতিষী গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন তাহার

ব্যবস্থা হইতেছে এবং পর্য্যবেক্ষণোপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয়ার্থে কয়েক শত টাকাও নাকি, গবর্ণমেণ্ট জ্যোতিষীদের হস্তগত হইয়াছে ; কিন্তু দেশবিদেশ হইতে যে সকল জগদ্বিখ্যাত প্রবীন আচার্য্যগণ, এ প্রদেশে সমাগত হইয়া ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের যথোচিত সৎকারের কি ব্যবস্থা হইতেছে বলিতে পারি না।

বৈচিত্র্যময় জগতের নানা প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ এক অদ্ভুত ঘটনা ;—প্রকৃতিদেবী মহিমাময় সূর্য্যদেবকে নানা নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াও পরিতৃপ্ত নহেন,—তাঁহার অপার ক্ষমতা সাহায্যে তুচ্ছ চন্দ্র দ্বারা সহসা মহান্ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া জগৎকে এক বিভীষিকা প্রদর্শন করেন। এক সূর্য্য গ্রহণ পরিদর্শন কালে জনৈক জ্যোতির্ব্বেত্তা, তাঁহার এক সহযোগী জ্যোতির্ব্বিদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"পূর্ণ গ্রহণ কালে কি ভাল লাগে ?" তাঁহার জ্যোতিষী বন্ধু বলিয়াছিলেন,—"স্পেক্ট্রোস্কোপ্, টেলিস্কোপ্ দূরে ফেলিয়া, এক সুকোমল শয্যায় শয়ান থাকিয়া নির্ণিমেষ লোচনে আকাশে দৃষ্টিপাত আর প্রকৃতির মহিমা গানকরা। ছোট বড় সকল লোকেরই ইহা কর্ত্তব্য ;—দূরবীক্ষণের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে চক্ষু আবদ্ধ রাখিয়া, বাহিরের সুমহান্ দৃশ্য হইতে বঞ্চিত হওয়া, মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় ;"—কথাটা প্রবীন জ্যোতির্ব্বিদের উপযোগী না হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য। দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল সূর্য্য কয়েক মিনিটের মধ্যে, কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, যখন জাগ্রত জগৎকে মুহ্যমান করিয়া তোলে, যখন মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় দিবস-অন্ধকার আসিয়া ধীরে ধীরে দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,—তখন সেই ভয়াবহ পবিত্র দৃশ্যের দর্শন-লালসা পরিহার, বাস্তবিকই অতীব কঠিন। চন্দ্র দ্বারা সৌরমণ্ডল আচ্ছাদিত হইতে আরম্ভ হইলেই, অন্ধকার হয় না,—গ্রহণারম্ভের কিঞ্চিৎ পরে, প্রথমে প্রায়ই আকাশের স্বাভাবিক নীলবর্ণ অন্তর্হিত হইয়া, এক প্রকার লোহিতাভ কৃষ্ণবর্ণের বিকাশ হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব পদার্থ মাত্রই পীতবর্ণে রঞ্জিত দেখায় ; পরে সূর্য্য মণ্ডল সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইলে, চতুর্দ্দিক্ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অন্ধকার এত অধিক হয় যে প্রদীপের সাহায্য ব্যতীত পুস্তকাদি পাঠ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে,—এই সময়ে আকাশস্থ প্রথম, দ্বিতীয় এবং কখন কখন তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্রও স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া যখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সূর্য্যকে প্রায় পূর্ণ গ্রাস করিয়া ফেলে, তৎকালে সৌরমণ্ডলের নানা প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়,—জ্যোতির্ব্বেত্তা তৎতৎ অবস্থার কারণান্বেষণ করেন। সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের প্রান্তদেশ, এক অভিন্ন বক্র রেখাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না,—"করাতের" প্রান্তভাগ যে প্রকার পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, চন্দ্রের প্রান্ত কতকটা সেই প্রকার দেখায়। গ্রহণকালে চন্দ্রের এই প্রকার আকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া, দার্শনিকগণ বহুকাল ইহার প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই ; পরে কয়েকটী সূর্য্যগ্রহণ পরিদর্শন করিয়া, বেলি (Francis Baily) নামা জনৈক জ্যোতিষী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহার উৎপত্তি তত্ত্ব নিরূপণ করেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, বেলি সাহেব

নির্দ্দিষ্ট কারণই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক বেলি বলেন,—গ্রহণকালে চন্দ্র দ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত হইতে আরম্ভ হইলে, চন্দ্রলোকস্থ অসম পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি বহির্গত হইতে থাকে, এবং মণ্ডলের প্রান্তদেশে বিচ্ছিন্ন দন্ত শ্রেণীর ন্যায়, উক্ত চন্দ্রে পর্ব্বত শিখর সকলই দেখিতে পাওয়া যায়; সূর্য্যের আলোকাধিক্যতা প্রযুক্ত গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে সে গুলি দৃষ্টিগোচর হয় না; পরে সূর্য্যাবয়ব যতই ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করে, ভ্রমরকৃষ্ণ চন্দ্রমণ্ডলের প্রান্তে পর্ব্বতমালা ততই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রহণ কালে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার ব্যতীত আরো অনেক দৃশ্য নয়নগোচর হইয়া থাকে;—পূর্ণগ্রাস কালে কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রমণ্ডল হঠাৎ এক অপূর্ব্ব রজতাভ ক্ষীণ আলোকচ্ছটায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে; জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে ছটামুকুট (Corona) নামে অভিহিত করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত উক্ত সময়ে ছটামুকুট বেষ্টিত চন্দ্রের প্রান্ত হইতে গোলাপী বর্ণের অগ্নিশিখার ন্যায় পদার্থ ক্রমাগত উদ্গত হইতে থাকে,—দার্শনিকগণ এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলিকে বর্ণমণ্ডল (Prominences, red clouds, red protruberance, red flames) ইত্যাদি বিবিধ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। * পূর্ব্বোক্ত ছটামুকুট পূর্ণ গ্রহণ কালে নগ্ন চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া, ইহার অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কালের দার্শনিকগণও পরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু প্রাচীনেরা ইহার উৎপত্তি তত্ত্ব স্থির করিতে পারেন নাই। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক কেপ্‌লার বলিতেন,—পৃথিবীর আকাশ যে প্রকার বায়ু ইত্যাদি বাষ্পে পরিপূর্ণ, চন্দ্রের চতুর্দ্দিকেও তদ্রূপ এক বাষ্পাবরণ (atmosphere) আছে; গ্রহণ কালে সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হইলে, অপর পার্শ্ব হইতে সৌরালোক আসিয়া, চন্দ্রের উক্ত বাষ্পাবরণ আলোকিত করে,—ছটামুকুট সূর্য্যালোক দীপ্ত চন্দ্রের বাষ্পাবরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আচার্য্য কেপ্‌লারের মতবাদ বহুকাল অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল; কিন্তু আধুনিক দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক চন্দ্রের বাষ্পাবরণ হীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রচারিত হইলে, সকলেই কেপ্‌লারের উক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ফরাশী জ্যোতিবী লা হিউ এবং অধ্যাপক পাওয়েল প্রমুখ প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ ছটামুকুট উৎপত্তির নানা অদ্ভুত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগের উপযোগী যন্ত্রাদির অভাবে তৎকালে যে যাহা বলিতেন, লোকে তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিত। আলোক উৎপাদক ঈথরের কম্পন পরীক্ষার্থে, পোলারিস্কোপ নামক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইলে ছটামুকুট পর্য্যবেক্ষণ ও তাহার উৎপত্তির কারণ নিরূপণের বেশ সুবিধা হইয়া পড়িল;—পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, আলোক মাত্রেই ঈথর নামক এক সর্ব্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম ও ভারহীন পদার্থের কম্পন হইতে উৎপন্ন হয়,—

* পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের যে বঙ্গানুবাদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে গুলি ইংরাজি শব্দের ঠিক্ ভাব প্রকাশক বোধে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রযুক্ত হইল;—১২৯৫ সালের "ভারতী ও বালকের" ৪৬৫পৃষ্ঠা দেখ। শ্রীজঃ—

এই আলোক কয়েক জাতীয় স্বচ্ছ স্ফটিক প্রস্তর বা বাষ্পাদি ভেদ করিয়া আসিলে আলোক উৎপাদক উক্ত ঈথরের কম্পনপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়,—উল্লিখিত যন্ত্রদ্বারা যে কোন আলোক পরীক্ষা করিয়া, ঈথর কম্পনপ্রকৃতির কোনও বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলেই, নিশ্চয়ই উক্ত আলোক কোনও পদার্থ ভেদ করিয়া বিকৃত হইয়াছে বলিয়া দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সূর্য্যগ্রহণে মসীয় লিয়ে (M. Liais) নামক জনৈক জ্যোতিষী পূর্ব্বোক্ত পোলারিস্কোপ যন্ত্রদ্বারা ছটামুকুটের আলোক পরীক্ষা করিয়া তাহা নিশ্চয়ই কোনও গভীর বাষ্পাবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন,—সূর্য্যের বাষ্পাবরণ তাহার স্বীয় আলোকে দীপ্ত হইয়া ছটা মুকুট উৎপন্ন করে, একথা তৎকালাবধি সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সূর্য্য কেবল একটি অত্যুজ্জ্বল জড়পিণ্ড বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। আমাদের পৃথিবীর ন্যায় সৌরলোকেও যে বাষ্পাবরণ আছে, একথা পূর্ব্বে কেহই অবগত ছিলেননা। *

কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রগোলক প্রান্ত হইতে উত্থিত যে লোহিতাভ মেঘ সদৃশ বর্ণমণ্ডলের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,— তাহার অস্তিত্ব প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ অবগত ছিলেন না; প্রায় দুইশত বৎসর হইল ইহার আবিষ্কার হইয়াছে। এগুলি গ্রহণকালে দৃশ্যতঃ চন্দ্রের ঘন কৃষ্ণঅঙ্গ হইতে অতি লঘু মেঘমালার ন্যায় বাহির হইয়া রজতশুভ্র ছটামুকুটের নিম্নদেশে ভাসিয়া বেড়ায়,—প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নানা অনুসন্ধান ও গবেষণাতেও এই অদ্ভুত লোহিতমেঘের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই,—এই দৃশ্য বাস্তবিক ঘটনা, কি দৃষ্টি বিভ্রমের ফল, এই স্থূল প্রশ্নটিও বহুকাল অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল। গত ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, ভারতবর্ষে যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহাতে রশ্মিনির্ব্বাচক যন্ত্র † সাহায্যে গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আচার্য্য জ্যানসেন ও লকিয়ার প্রমুখ জ্যোতিষীগণ, বর্ণ মণ্ডলের প্রকৃতি ও উৎপত্তি নিরূপণ করেন। ইতি পূর্ব্বে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশীয় সূর্য্যগ্রহণকালে অধ্যাপক জ্যানসেন, উক্ত লোহিত মেঘ যে, সৌরমণ্ডলজাত পদার্থ তাহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তই করিয়াছিলেন, তৎপরে ভারতীয় গ্রহণে হার্সেল, রেয়েট্, জ্যানসেন প্রভৃতি প্রধান দার্শনিকগণ, রশ্মিনির্ব্বাচক যন্ত্র দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সকলেই স্ব স্ব বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) জ্বলন্ত জলজান (Hydrogen) বাষ্পজ আলোকরেখা দেখিতে পাইলেন,—তাহাতে প্রতিফলিত সৌরালোকের চিহ্নমাত্র দৃষ্ট

* সূর্য্যের বাষ্পাবরণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, পাঠক পাঠিকাগণের ধৈর্য্য চ্যুতি আশঙ্কায়, উপস্থিত প্রবন্ধে তাহার সকল গুলি উল্লেখ করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যক "ভারতীতে" পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত "সূর্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন। শ্রীজঃ—

† রশ্মি-নির্ব্বাচক যন্ত্র বা Spectroscope দ্বারা কোন প্রজ্বলিত পদার্থের প্রত্যেক মৌলিক অংশ দগ্ধ জাত আলোক পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়, এবং সেই বিশ্লিষ্ট আলোক সকলের বর্ণ পরীক্ষা করিয়া, উক্ত যৌগিক জ্বলন্ত পদার্থ কোন্ কোন্ উপাদানে নির্ম্মিত তাহা নির্দ্ধারিত। এই যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ, "ভারতী"তে প্রকাশিত মৎরচিত "অদৃশ্য কিরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

হইল না। পর্য্যবেক্ষণের এই ফল দেখিয়া,—লোহিতমেঘাকার আলোক মণ্ডল যে সূর্য্য পৃষ্ঠস্থ প্রজ্জ্বলিত বাষ্পরাশি তাহা সকলেই একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিলেন।* এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সমাজে আজও অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

বর্ণমণ্ডলের উপরিভাগ সাধারণতঃ জলজান বাষ্পে আচ্ছাদিত থাকে, এবং নিম্নভাগে লৌহ ইত্যাদি কয়েকটি ধাতব বাষ্প, আরো কতকগুলি অজ্ঞাত পদার্থের জ্বলন্ত বাষ্প দৃষ্ট হয়। এই অত্যুজ্জ্বল জ্বলন্ত বাষ্পময় বর্ণমণ্ডল হইতে উত্থিত বাষ্পরাশিই, গ্রহণকালে ছটামুকুটের নিম্নস্তরে লোহিত মেঘরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এগুলির আয়তন এত বৃহৎ এবং বর্ণমণ্ডল হইতে ইহারা এত বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়, যে তাহার পরিমাণ বাস্তবিকই বিস্ময় জনক,—ডি লা রু (De L Rue) নামক জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সূর্য্যগ্রহণে একখণ্ড লোহিতমেঘের উচ্চতা ৪৪০০০ মাইল গণনা করিয়াছিলেন। বর্ণমণ্ডল হইতে লোহিতাভ বাষ্পরাশি কোন্ শক্তির প্রভাবে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই,—বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহাদের উত্থানপতন বৈদ্যুতিক তাড়ন (Electrical Repulsion) এবং সৌর-মাধ্যাকর্ষণের ফল বলিয়া থাকেন,—বলা বাহুল্য এপ্রসঙ্গে সকল কথাই আজও অনুমাণমূলক।

গ্রহণকালে সূর্য্য পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই প্রকারে প্রাচীন ও আধুনিক অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ সৌর সৃষ্টি রহস্যের নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ; চন্দ্রের কুটিল গতি বহু পর্য্যবেক্ষণ ও গণনায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই, সূর্য্য গ্রহণ কালে চন্দ্রমণ্ডলের গতি পরীক্ষা করিয়া, ইহার জটিলতা ক্রমেই বোধগম্য হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের সৌর-গ্রহণে পূর্ণতার স্থিতি, অপরাপর গ্রহণের তুলনায় অত্যন্ত অধিক, সুতরাং এই পর্য্যবেক্ষণে সৌর বাষ্পাবরণ ও বর্ণমণ্ডল সম্বন্ধে নানা রহস্যের উদ্ভেদ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। গ্রহণ কালে চন্দ্রের ছায়া কত বেগে ভূপৃষ্ঠ পরিভ্রমণ করে, তৎনিরূপনার্থে, জ্যোতির্ষীগণ কয়েকটি গ্রহণে নানা পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন ; গত ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের গ্রহণে ফর্‌বিস্ নামক জনৈক পণ্ডিত, চন্দ্রচ্ছায়ার গতি প্রতি ঘণ্টায় স্থূলতঃ ৩০½ মাইল গণনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই গ্রহণে তাহার পুণর্গণনা হইবে। পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন,—সৌর মণ্ডলে সময় সময় এক প্রকার কৃষ্ণ চিহ্ন (Solar Spots) দেখিতে পাওয়া যায় †, এ গুলির আকার এত বৃহৎ যে কখন কখন ইহারা নগ্ন চক্ষুগোচর হইয়া পড়ে, বৈজ্ঞানিকগণ বহুপর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণায় উক্ত সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই,—অনেক দার্শনিক পূর্ব্ববর্ণিত সৌর বর্ণমণ্ডলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন। শুনা যাইতেছে, আগামী সূর্য্যগ্রহণে উক্ত সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি তত্ত্ব স্থিরীকরণে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ বিশেষ যত্নবান হইবেন্।

* এই লোহিতাভ বর্ণ-মণ্ডল বা লোহিতমেঘ, ও পূর্ব্ববর্ণিত শুভ্রচ্ছটা মুকুট সম্পূর্ণ পৃথক।

† এই কৃষ্ণচিহ্নের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে, গত আষাঢ় সংখ্যক "ভারতীতে" মৎরচিত "সৌর কলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মীর কাসিম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন নবাব।

In a short time he (Mir Kasim) came to hate them (the English) with all the intensity of a bitter and brooding hatred. He had full reason to do so; for the annals of no nation contain records of conduct more unworthy, more mean, and more disgraceful than that which characterised the English Government of Calcutta during the three years which followed the removal of Mir Jafar. —Col. Malleson.

ইংরাজেরা কি উদ্দেশ্যে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, সে কথার কেহ বিচার করিল না। তাঁহারা যথাশাস্ত্র ধর্ম্মশপথ করিয়া মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন;—হাতে ধরিয়া মীরজাফরকে সিরাজদ্দৌলার শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া ছিলেন;—সর্ব্বাগ্রে সসম্ভ্রমে মীরজাফরকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই আবার মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করায়, ইতিহাসে ইংরাজের নাম কলঙ্কযুক্ত হইয়া উঠিল! * অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইংরাজ লেখকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ইহার জন্য ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়কে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন!

এ দেশের লোক বাস্তভিটার সুখ দুঃখ লইয়াই সমধিক ব্যস্ত; তাহারা আর এ সকল রাজনৈতিক ব্যাপারের ভাল মন্দ বিচার করিতে চাহিত না। যে রাজা হয় হউক তাঁহাকেই রাজস্ব দান করিয়া পুত্রকলত্র লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি;—ইহাই তাহাদের বহুদিবস গত পুরাতন পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! সুতরাং একদল বিদেশীয় বণিক আসিয়া ইচ্ছামত একজনের সিংহাসনে আর একজনকে বসাইয়া দিতেছে বলিয়া কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না; বরং কেহ কেহ মীরজাফরের অধঃপতনে পুরাতন শাস্ত্র বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া শাস্ত্রবাক্যে অধিকতর আস্থাবান হইয়া সে কালের ঋষিবংশের গুণানুকীর্ত্তন করিয়াই এ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত করিয়া ফেলিল। এই সকল কারণে সর্ব্বথা বিনা রক্তপাতেই রাষ্ট্রবিপ্লব সুসম্পন্ন হইয়া গেল! †

* Thus was Jaffier Aly Khan deposed, in breach of a treaty founded upon the most solemn oaths, and in violation of a national faith.—India Tracts.

† The people of Bengal cared nothing about the change of Nawabs; and thus the English could already depose and set up Nawabs at will.—Early Records of British India, p. 273.

দেশের লোকে বাও নিষ্পত্তি করিল না বটে; কিন্তু এই রাষ্ট্রবিপ্লবেই ইংরাজশক্তি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

মীরজাফর স্বার্থসিদ্ধির আশায় ইংরাজদিগকে প্রভুপদে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করিয়া ইংরাজের বাহুবলে রাজ্য শাসন করিবেন বলিয়াই মীরজাফর সাহস করিয়া সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে গুপ্ত মন্ত্রণায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রকাশ্যে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করা কোনও ক্রমে সম্ভব ছিল না। মীরকাসিমও স্বার্থসিদ্ধির আশায় ইংরাজকে প্রভুপদে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজের সহায়তায় সিংহাসনলাভ করিয়া আত্মবলে রাজ্যশাসন করিবেন বলিয়াই মীরকাসিম শ্বশুরের সিংহাসন কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উভয়েই স্বার্থসিদ্ধির জন্য গর্হিত পন্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মীরজাফরের স্বার্থ—আত্মসুখ সম্ভোগ, মীরকাসিমের স্বার্থ—আত্মসুখত্যাগ এবং মোগল রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা! মীরজাফরকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াও ইংরাজের কণ্ঠলগ্ন হইতে হইয়াছিল; মীরকাসিমকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিংহাসনে পদার্পণ করিবা মাত্র ইংরাজের গলপাশ মোচন করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল * ইহাই যে মীরকাসিমের গুপ্ত সংকল্প, কেহ ঘুণাক্ষরেও তাহার আভাস পান নাই। সুতরাং যাঁহারা মীরকাসিমের সিংহাসন লাভের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কার্য্য যতই দোষাবহ হউক, তাঁহাদিগকে অতিমাত্রায় তিরস্কার করা অসঙ্গত।

সিরাজদ্দৌলার অধঃপতন সাধন করিবার সময়ে ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা ইংরাজ বাণিজ্য সুসংস্থাপিত হইল, ইংরাজশক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল, ইংরাজের পদোন্নতির সূত্রপাত হইল, এবং বাংলা বিহার উড়িষ্যায় রামরাজ্য সুবিস্তৃত হইল! মীরজাফর সিংহাসনে পদার্পণ করিতে না করিতেই ইংরাজদিগের সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন যে নিয়ত সামরিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে গিয়া ইংরাজ বানিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে; ইংরাজশক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অর্থাভাবে ইংরাজকুঠি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে; ইংরাজের পদোন্নতির সূত্রপাত না হইয়া সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়া উঠিতেছে; বাংলা বিহার উড়িষ্যায় রামরাজ্য সুবিস্তৃত হওয়া দূরে থাকুক, অহিফেনাশক্ত বৃদ্ধ মীরজাফর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুক্রিয়াশক্ত অশান্ত মীরণের শাসন কৌশলে দেশের মধ্যে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে! তখন আত্মকার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া ইংরাজ বণিক শিহরিয়া উঠিলেন;—যে কোন ছল ছুতায় হউক, মীরজাফরকে পদচ্যুত করাই লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেই সকল আপদের শান্তি হইবে কিনা, নবীন নরপতি অধিকতর অযোগ্য ভূপতি হইবেন কিনা,—এ সকল

* From the first Meer Cassim was bent on emancipating himself from the English.—Early Records of British India, p. 273.

কথা কেহ বিচার করিয়া দেখিলেন না। মীরকাসিম সময় বুঝিয়া পুরস্কারের অঙ্ক বাড়াইয়া দিলেন; লোভান্ধ ইংরাজ বণিক একটি ভ্রম অপনোদন করিবার আশায় আর একটি গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইলেন। ইহাই বোধ হয় মানুষের স্বভাব!

মোগল রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা মীরকাসিমের গুপ্ত সংকল্প; সুতরাং ইংরাজদমন করাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। মীরকাসিমের নিকট এই লক্ষ্য সর্ব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল; তাই তিনি ইহার জন্য সর্ব্বপ্রকার আত্মত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং সিংহাসনে পদার্পণ করিবা মাত্র ন্যায় অন্যায়ের তুলাদণ্ড অতলজলে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সিংহসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে মোগল রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যত অনায়াস-সাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া তাহা আর তেমন বোধ হইতে পারিল না। মীবকাসিম যে কি দুষ্কর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তিনি দিবানেত্রে দেখিতে পাইলেন যে যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া যে রাজ সিংহাসন ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহা এক খণ্ড নীরস প্রস্তর ফলকমাত্র; তাহার ভিত্তিমূল বহুপূর্ব্বেই শিথিল হইয়া গিয়াছে! বাজকোষে অর্থ নাই!* সেনাদল বিদ্রোহোন্মুখ! অবসর বুঝিয়া পাত্রমিত্রগণ সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন! ইংরাজের ভয়ে কাহাকেও কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া "ক্লাইবের গর্দ্দভ" মীর মহম্মদ জাফর খাঁ বাহাদুর মোগল রাজশক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছেন! আর কি তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইতে পারে?

এরূপ ক্ষেত্রে অন্য লোকে হয়ত নিতান্ত ভগ্নমনোরথ হইয়া বিদেশীয় বণিকসমিতির সূত্রানুচালিত ক্রীড়াপুত্তল হইয়া উঠিতেন;—অসম্ভবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিতে সাহসী হইতেন না। কাসিমালির প্রকৃতি সেরূপ উপাদানে গঠিত হইয়াছিল না। সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার কুশাগ্রবুদ্ধি প্রখর হইতেও প্রখর ছিল; লোকচরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে অদ্বিতীয় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন; কার্য্য কুশলতায়, অকুতোভয়তায়, ক্ষিপ্রকারিতায় এবং উল্লেখ সাধনোপযোগী উপায়োদ্ভাবনে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ভূয়োদর্শন গুণে সমধিক বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিপদে ধৈর্য্য, বৈরনির্য্যাতনে কঠোরতা, সংকল্পসাধনে অপরাজিত অধ্যবসায় কাসিম আলির স্বভাবসুলভ ক্ষমতা বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।† তিনি অবিচলিতহৃদয়ে সংকল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন।

* To meet all these demands, he found in the treasury only about 50000 Rupees and plate and jewels to the amount of between 3 and 4 lakhs more.—Broome's Rise and Progress of the Bengal Army, vol. I. 316.

† He was a man of considerable ability, far above the ordinary run of his countrymen, active and energetic, an excellent man of business and attentive to all details himself; he was shrewd and of quick discernment, expert in estimating the characters

মীর কাসিম যখন সিংহাসনে পদার্পণ করেন, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই মোগল রাজশক্তি ধীরে ধীরে অস্তগমন করিতেছিল! এরূপ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে সংকল্প সাধন করা দূরে থাকুক, তাহার জন্য চেষ্টা পর্য্যন্তও হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজদিগের গৃহ-কলহে মীর কাসিমের পথ কথঞ্চিৎ সহজ হইয়া উঠিল। মীরজাফরের সিংহাসনচ্যুতি লইয়া ইংরাজ দরবারে তুমুল তরঙ্গ উঠিয়া পড়িল;—একদল মীরজাফরের জন্য হা হুতাশ করিতে লাগিলেন; আর একদল মীর কাসিমের প্রশংসাবাদে সভাতল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন;—দুইদলে পরস্পরের দোষ প্রদর্শনের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা চলিতে লাগিল। কার্য্যকুশল চতুর নবাব বুঝিলেন,—ইহাই উপযুক্ত অবসর!

বৃদ্ধ অহিফেণাশক্ত দুর্ব্বলচিত্ত বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে কেহই সচ্চরিত্রের আদর্শ-স্থানীয় বলিয়া মনে করিতেন না।* তথাপি তাঁহার পদচ্যুত লইয়া ইংরাজমণ্ডলীতে গৃহ-কলহ উপস্থিত হইল কেন, তাহা এক ঐতিহাসিক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে! উভয় দলের বাদানুবাদপূর্ণ কটু কাটব্যে ইতিহাস ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে; এতদিনের পর তাহার ভিতর হইতে সত্যনিষ্কাষণের চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র; মীরজাফরকে পদচ্যুত করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল! ইহা সত্য কথা। কিন্তু তাহার সহিত পুরস্কারের গন্ধ না থাকিলে ইংরাজ বণিকের দুর্ণামে ইতিহাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত না!

গভর্ণর ভান্সিটার্ট ইংরাজবণিক দরবারের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই গভর্ণর হলওয়েল এবং সেনাপতি কেলড মীরজাফরের সিংহাসনচ্যুতির সমুদায় ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। হলওয়েলের মন্ত্রণাক্রমে ভান্সিটার্ট প্রকাশ্য দরবারের আদেশ গ্রহণ না করিয়া অল্প কয়েক জন সদস্যের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করেন। কাসিম আলি এই অল্প কয়েকজন সদস্যকেই পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; সুতরাং ইংরাজ দরবারের অন্যান্য সদস্যগণ পুরস্কার লাভাশায় বঞ্চিত হইয়া ঈর্ষ্যাবশতই যে গৃহ কলহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, ইহাই অধিকাংশ ইংরাজ লেখকদিগের বিশ্বাস।† যাঁহারা মীরজাফরের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভান্সিটার্টের বিরুদ্ধে

of those with whom he had to deal, and where his own immediate interests or passions were not concerned, he appears to have had the good of the province generally at heart, and to have administered the government both in the Judicial and Revenue Departments with vigour and justice.—Broome's Rise and Progress of the Bengal Army, vol. I. 315.

* He who could pledge the most solemn oaths of fidelity to a sovereign of whose throne he was about to take possession could scarcely be regarded as a pattern of moral excellence.—Thornton's History of the British Empire in India, vol. I. 406.

† Notwithstanding the obvious advantages already obtained, and the improved prospects held out by the change, the personal interests of the opponents led them to

দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তাহাদের নাম আমিয়ট ; ইলিস ; মেজর কর্ণাক্ ; স্মিথ ; এবং ভেরেলেষ্ট। ইংরাজের সরকারের তদানীন্তন সদস্যদিগের মধ্যে আমিয়ট কেবল মাত্র হলওয়েলের কনিষ্ঠ ছিলেন ; হলওয়েলের পদত্যাগে তাঁহারই গভর্ণর হইবার কথা। তাঁহার অবশ্যপ্রাপ্য অধিকারে নবগত ভান্সিটার্ট পদার্পণ করায় তিনি সবিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইলিশ যদিও নবাগত তথাপি তিনি পাটনার গোমস্তা হইবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; ভান্সিটার্ট ঐ পদে ম্যাক্‌গুয়ারকে নিয়োগ করায় কোপনস্বভাব ইলিস অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। মেজর কার্ণাক সম্প্রতি বিলাত হইতে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভান্সিটার্ট কিছু দিনের জন্য কেলডকেই পাটনায় সর্ব্বময় কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া মেজর কার্ণাককে উপেক্ষা করায় তিনিও সবিশেষ অপমান বোধ করিয়াছিলেন। স্মিথ এবং ভেরেলেষ্ট পুরাতন সদস্য, কিন্তু তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গোপনে সমুদায় পরামর্শ শেষ করায় তাঁহারাও ভান্সিটার্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছিলেন।* যাঁহারা ভান্সিটার্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ভান্সিটার্টের সমস্ত কার্য্যই অন্যায় ও অভদ্রোচিত ; কেবল উৎকোচলোভেই তিনি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতার দরবারে গভর্ণরের পক্ষই প্রবল হইল ; প্রতিবাদকারিগণ সুদীর্ঘ মন্তব্যলিপি রচনা করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু বাংলা বিহার উড়িষ্যায় ভান্সিটার্টের

condemn the whole proceeding, and a series of disgraceful disputes commenced, which were finally productive of the destruction of many of those concerned and of the most disastrous consequences to the interests of the company generally, from which they were only rescued by the gallantry of the Army and the ability of its leaders.—Broome's Rise and Progress of the Bengal Army, vol. I. 318.

* Foremost among the opponents of Mr. Vansittart, who was rendered generally unpopular by his having been brought from another Presidency, was Mr. Amyatt, the Senior Member of council next to Mr. Holwell; this gentleman never forgave the fact of his own supercession; he was supported by Mr. Ellis, who had just arrived from England and Major Carnac, a man of violent passions, and who took offience at Mr. Vansittart's refusal to appoint him to succeed Mr. Amyatt at Patna, a situation which was conferred on Mr. Mcguire; Major Carnac joined this party, his pride having been wounded by Mr. Vansittart's resolution to retain Col. Cailland in the command of the troops until affairs were settled. Mr. Smyth, and Mr. Verelest took the same side, considering themselves slighted as Members of council in not having been officially informed of the arrangements in contemplation which were entirely conducted by the Select Committee.—Broome's Rise and Progress of the Bengal Army, vol. I. 318.

মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। তিনি সকল কার্য্যেই কাসিম আলির পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন।

নূতন নবাব "নাসির-উল্-মোল্ক ইম্তিয়াজ্-উদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাসিম আলি খাঁ নস্‌রৎ জঙ্গ বাহাদুর" সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াই অর্থসঞ্চয়, বিদ্রোহদমন, শাহজাদার অভিযানের গতিরোধ এবং প্রজারক্ষার উপায় উদ্ভাবনার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রত্যেক কার্য্যেই ইংরাজের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ভান্সিটার্ট প্রমুখ সদস্যগণ কাসিম আলির পৃষ্ঠপোষণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং সুচতুর নূতন নবাব এই সকল ছিদ্র পথেই আত্ম সংকল্প সাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

অর্থসংগ্রহের জন্য কাসিম আলি যে সকল নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা কাহারও বিস্ময়োৎপাদন করিল না। নূতন নবাবের আদেশে মোগল রাজপ্রাসাদের ইতিহাস-বিশ্রুত বিলাসতরঙ্গ সহসা তিরোহিত হইয়া গেল;—নৃত্যগীত অর্দ্ধপথে স্তম্ভিতপদে অবসন্ন হইয়া পড়িল; হাস্য কৌতুক রাজপ্রাসাদ হইতে সসম্ভ্রমে বহুদূরে দণ্ডায়মান হইল; ঐশ্বর্য্যচ্ছটা অপসারিত হইয়া গেল; অগণিত দাস দাসীর সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিল;—যাহা না থাকিলে সংসার চলে না কেবল তাহাই রহিল; অন্যান্য সকল বিষয়েই ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়া গেল! রাজপুতরাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজা প্রতাপসিংহ বৃক্ষপত্রে ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিতেন! মোগলরাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার আশায় কাসিম আলি আত্ম সুখসম্ভোগের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিরোহিত করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ সাধন করিলেন। এবিষয়ে কাসিম আলির সমকক্ষ নরপতি বঙ্গসিংহাসনে পদার্পণ করেন নাই!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ বণিকের জমিদারীলাভ!

Mir Kasim was shrewd and of quick discernment.—Broome's Bengal Army.

মীরজাফরের অসঙ্গত বাৎসল্য বশতঃ কয়েকজন সামান্য পদস্থ রাজানুচর বঙ্গবিহার উড়িষ্যায় সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মীরজাফরের দুর্দ্দশার দিনে সুবা বাংলা বিহার উড়িষ্যার অধিকাংশ রাজকর কুক্ষিগত করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কিমুরাম, মন্নুলাল এবং চিকন লালের নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহারা সকলেই নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ভৃত্যরূপে নবাব সরকারে প্রবেশ করে; মীরজাফরের ভাগ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের এতদূর পদোন্নতি হইয়াছিল যে সে সময়ে মন্ত্রীমহাশয়দিগকেও এই সকল ভৃত্যবর্গের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে হইত। স্বার্থসাধনই ইহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য; সুতরাং

ইহারা মীরজাফরের অধঃপতন সময়ে ধনরত্ন কুক্ষিগত করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িতেছিল। সুচতুর নূতন নবাব ইহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন।

সেকালের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে নরপালদিগের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হইলে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির উপরেও রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ভার নিক্ষিপ্ত হইত। মীরজাফরের শাসন সময়েও তাহাই হইয়াছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত জটিল বিষয়ের ভার অপেক্ষাকৃত সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারীর প্রতি নিক্ষিপ্ত না হইয়া এই সকল সামান্য ভৃত্যবর্গের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া লওয়া দূরে থাকুক রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয়েরও সদুত্তর প্রদান করিতে পারিল না। কাসিম আলির আদেশে ইহাদিগের এবং ইহাদের অধীন রাজকর্ম্মচারীদিগের পদচ্যুতি হইল এবং ইহাদের মধ্যে যাহার যাহা কিছু ছিল সমস্তই রাজভাণ্ডারে আনীত হইল। এই সময়ে অর্থের নিতান্ত টানাটানি;—মুর্শিদাবাদের নবাবসেনা বেতন না পাইয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে; শাহজাদার অভিযানের গতিরোধ করিবার জন্য পাটনা প্রদেশে কর্ণেল কেলডের অধীনে যে সকল গোরাসৈন্য ছিল তাহারা তনখার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে, বিহারের নবাবসেনা দীর্ঘকাল বেতন না পাইয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসবিখ্যাত রাজকোষে কেবল মাত্র পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া কাসিম আলি অধীর হৃদয়ে ওষ্ঠ দংশন করিয়াছিলেন এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদির তৈজস পাত্র অথবা মণি মরকতাদি যাহা কিছু হস্তগত হইয়াছিল তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়াছিলেন; অবশেষে রাজস্বাপহারক রাজকর্ম্মচারীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদের কুক্ষিগত অর্থভাণ্ডার উদ্ধার করিয়া লইলেন।

কাসিম আলি অতি অল্পদিনের মধ্যে এরূপ সুকৌশলে অর্থ সংগ্রহ করিলেন যে সিংহাসনারোহণের একমাসের মধ্যেই তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সেনাদলকে শান্ত করিলেন; ইংরাজ বণিক সমিতিকে আড়াইলক্ষ টাকা প্রদান করিয়া তাঁহাদের মাদ্রাজের অর্থকষ্ট দূর করিয়া দিলেন; এবং পাটনা প্রদেশের নবাব সেনার জন্য পাঁচলক্ষ এবং ইংরাজ সেনার জন্য দুইলক্ষ মোট সাতলক্ষ টাকা কর্ণেল কেলডের নিকট প্রেরণ করিলেন। *

নূতন নবাবের অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি অনেকের পক্ষেই কিছু নূতন ধরণের বোধ হইতে লাগিল। পদচ্যুত রাজকর্ম্মচারীবর্গ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন; বিদায়প্রাপ্ত দাসদাসীগণ পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিল; যাহাদের অযথা সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য রাজকোষে পুনরানীত হইল তাহারা চারিদিকে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল;—অতি অল্পদিনের মধ্যে কাসিম আলির বিরুদ্ধে ইংরাজদরবারে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইল! কাসিম আলির সিংহাসনারোহণে যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহারা ইহার প্রত্যেক কাহিনী লইয়া আত্মমত সমর্থনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; গভর্ণরপ্রমুখ সদস্যগণ জানিতেন যে

* Vansittart's. Narrative, Vol. I. 140.

এ সময়ে অর্থসংগ্রহ করা কত প্রয়োজন; সুতরাং তাঁহারা কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না। বরং গভর্ণর ভান্সিটার্ট স্পষ্টই বলিয়া উঠিলেন যে কাসিম আলি দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, এ দেশ তাঁহারই;—তিনি কিরূপে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, বিদেশীয় বণিক সমিতি তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিবার কে?

মীরজাফরের শাসন সময় হইতে ইংরাজেরাই এ দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন, রাজ্যশাসনের প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন;—তাঁহারাও বুঝিয়াছিলেন এবং লোকেও জানিয়াছিল যে ইংরাজেরাই প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। মীরজাফর ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কাসিম আলি এই বিশ্বাস দূর করিয়া মোগল সিংহাসন স্বাধীন করিবার জন্য অগ্রসর; সুতরাং ইংরাজ গভর্ণর যখন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উঠিলেন যে মীরকাসিমই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তিনি কিরূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন বিদেশীয় বণিকসমিতি তাহার ছিদ্রানুসন্ধানের অধিকারী নহে, তখন কাসিম আলির পথ সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজশক্তি শনৈঃ শনৈঃ বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনমার্গে যে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিল, ভান্সিটার্টের ব্যবহারে তাহা স্খলিত হইয়া গেল। কাসিম আলি এইরূপ সুযোগ লাভ করিয়া আপনাকে সর্ব্বাংশে স্বাধীন ও ইংরাজকে সর্ব্বাংশে পদাশ্রিত বণিক রূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই চেষ্টার মধ্যেই কাসিম আলির শাসন কৌশলের পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। ইংরাজ বণিক বাণিজ্যলোভে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া মোগল সিংহাসনের ছায়াতপে বসিয়া যথা কথঞ্চিৎ উদরান্নের সংস্থান করিতেছিল। দেশের সহিত, শাসনক্ষমতার সহিত, বঙ্গবাসীর সুখ দুঃখের সহিত, মোগল গৌরবের উত্থান পতনের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। সে দিন,—বড় অধিকদিনের কথা নহে,—তিন বৎসর পূর্ব্বে নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলেও মুর্শিদাবাদের রাজপথে ভ্রমণ করিবার সময়ে ইংরাজ বণিকের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত; কথায় কথায় ইংরাজ গোমস্তাকে করজোড়ে রাজসদনে দণ্ডায়মান হইতে হইত! উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিলে শৃঙ্খলিত চরণে নবাবের অশ্বশালে কারাক্লেশ বহন করিতে হইত; আর এই তিন বৎসরের মধ্যেই কি ভাগ্য বিবর্ত্তন! মীর কাসিম দেখিয়াছিলেন যে, কেবল দুইটি মাত্র মতিভ্রমের জন্য মোগলের স্কন্ধে ইংরাজ বণিক জানু বিস্তার করিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন। মীরজাফর কুক্ষণে তাঁহাদের সেনাসহায়তা গ্রহণ করিবার জন্য ও তদর্থে মাসিক তন্খা প্রদান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং কুক্ষণে রাজকোষে যাহা নাই ততোধিক উৎকোচ দানে সিংহাসন ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতিভ্রমের ফলে ইংরাজের ঋণ অপরিশোধনীয় হইয়া উঠিয়াছে; ইংরাজ সেনার সহায়তা ভিন্ন রাজ্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোগল রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই উভয়বিধ অমঙ্গলের গতিরোধ করিতে হইবে। ইংরাজের ঋণ কড়া

ক্রান্তি পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে; ইউরোপীয় প্রণালীমতে দেশীয় সেনাদল গঠন করিয়া ইংরাজসেনার সহায়তা গ্রহণ করার আবশ্যকতা দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা অবশ্যই সময় এবং অর্থ সাপেক্ষ। কাসিম আলি ধীরে ধীরে এই পন্থায় আরোহণ করিবার জন্যই সিংহাসনারোহণের চেষ্টা করিতেছিলেন।

রাজকোষে আশানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইলে মীর কাসিম, ইংরাজের ঋণ শোধ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিতেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন যে তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইবে না; ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, আয় বৃদ্ধি করিয়া, কষ্ট সঞ্চিত অর্থের প্রত্যেক কপর্দ্দক ইংরাজের হস্তে তুলিয়া দিয়াও ঋণ শোধ হইবার উপায় হইবে না। যতদিন পর্যন্ত দেশীয় সেনাদল গঠিত না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত সামরিক অস্ত্র শস্ত্র এদেশে প্রস্তুত করিবার উপায় না হয়, ততদিন রাজ্য রক্ষার জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়াই মাসিক তন্‌খা দিয়া ইংরাজ সেনাবসাইয়া রাখিতে হইবে। এই তন্‌খা লইয়া সর্ব্বদাই কলহ হইবে এবং আজি ইহা কালি উহা বলিয়া ইংরাজ সেনাপতিগণ তন্‌খার অঙ্ক ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিবেন। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য মীর-কাসিম এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

মীরজাফর্ ইংরাজ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে নদীয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের রাজকর আদায়ের ভার ইংরাজদিগকে দিতেন। তাঁহারা তত্তৎস্থানে জমিদারদিগের উপর তাড়না করিয়া রাজকর আদায় করতঃ তাহা হইতে প্রাপ্যমুদ্রা গ্রহণ করিতেন। ইহাতে সুফল ফলিত না;—দেশ উৎপীড়িত হইত, ইংরাজশক্তি বিবর্দ্ধিত হইত; অথচ ইংরাজঋণ আশানুরূপ পরিশোধিত হইত না। এইরূপে ইংরাজঋণের জন্য সমগ্র রাজ্য ঋণ পাশে আবদ্ধ থাকা অপেক্ষা তিনটি মাত্র স্থান একেবারে ইংরাজকে সঁপিয়া দিয়া অবশিষ্ট স্থান সর্ব্বাংশে স্বাধীন করিয়া লইবার জন্য মীরকাসিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর চট্টগ্রাম ইংরাজকে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। এই তিন স্থান হইতে যাহা আদায় হইবে তাহা ইংরাজের হইবে, তদ্ভিন্ন তাঁহারা নবাবসরকার হইতে আর কপর্দ্দক প্রাপ্ত হইবেন না এবং এই তিন স্থান হইতে রীতিমত রাজকর আদায় হউক বা না হউক তাহার জন্যও নবাব সরকার দায়ী হইবেন না। ভান্সিটার্ট প্রমুখ সদস্যগণ মীরকাসিমের অনুকূল থাকায় ইংরাজদরবার এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছিলেন; এবং ইহা যে সর্ব্বতোভাবে ইংরাজের কল্যাণপ্রদ হইল তাহা মনে করিয়া সবিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা যে এত সহজে এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন ইহাতে কাসিম আলিও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

ইংরাজের আহ্লাদের কারণ এই যে এত দিনের পর তাহাদের একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইল। কাসিম আলির আহ্লাদের কারণ এই যে তিনটি মাত্র স্থানের বিনিময়ে সমগ্র বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ইংরাজ কবল হইতে উদ্ধার-লাভ করিল!

কাসিম আলির আহ্লাদের আরও কারণ ছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় মেদিনীপুর এবং

বর্দ্ধমান উৎসন্নে গিয়াছিল ;—অধিকাংশ গ্রাম নগর জনশূন্য হইয়াছিল ; বহুসংখ্যক শস্য ক্ষেত্র বিজন বনে পরিণত হইয়াছিল, এবং অরাজকতার অবসর লাভ করিয়া রাজা ও জমিদারগণ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বশে আনিতে, পুনরায় সুশাসন সংস্থাপন করিতে এবং যথাকালে রাজকর সংগ্রহ করিতে সময় ও অর্থব্যয় আবশ্যক। সেনাক্ষয় করিয়া, অর্থব্যয় করিয়া এই দুই স্থান পদানত করিতে পারিলেও তাহাতে সবিশেষ অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আর চট্টগ্রাম,—তাহার কথা চিরদিনই স্বতন্ত্র। মোগল শাসনের সূত্রপাত হইতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যুদ্ধ কলহ ;—আরাকাণাধিপতির সহিত কত যুদ্ধ যুঝিতে হইয়াছে ; অবশেষে মগ এবং ফিরিঙ্গি দস্যুদল চট্টগ্রাম অঞ্চলেথানা দিয়া বসিয়া তথা হইতে জলপথে ও স্থলপথে নিম্ন বঙ্গ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মগ ফিরিঙ্গির অত্যাচারে চট্টগ্রামে শান্তি নাই, তথাকার শাসনকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থও তথায় সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় চট্টগ্রাম হাতের বাহির হইয়া গেলে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই! সুতরাং ইংরাজেরা এই তিনটি স্থান লইয়া নবাবকে ঋণপাশ হইতে মুক্তিদান করিতে সম্মত হওয়ায় কাসিম আলি সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

উভয় পক্ষের সম্মতি সূত্রেই এই সকল ব্যবস্থা সন্ধিপত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।* কাসিম আলি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সন্ধিপালনের জন্য বর্দ্ধমান মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম ইংরাজদিগকে সম্প্রদান করিলেন। এই সূত্রে ইংরাজের সঙ্গে বঙ্গদেশের তিনটি প্রধান বিভাগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল ; এবং এই সময় হইতে এই তিনটি স্থানের অরাজকতা ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইবার সূত্রপাত হইল।

* For all charges of the Company, and of the said army, aud provisions for the field &c, the lands of Burdwan, Midnapur, and Chittagong shall be assigned, and Sunnuds for that purpose shall be written and granted. The Company is to stand all losses, and receive all the profits of these three countries ; and will demand no more than the three assignments aforesaid.—Clause fifth of the treaty concluded between Mr. Vansittart, the gentlemen of the Select Committee and the Nabab Meer Mahammed Kasim Aly Khan, dated the 27th of September, 1760.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ দমন।

The brunt of the fight fell upon the English, the conduct of his own troops whenever they were brought under fire convinced Mir Cassim of the necessity of a reform in his army as stringent as that which he had introduced into his treasury.—Col. Malleson.

মীরজাফরের শাসনশিথিলতার অবসরলাভ করিয়া সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রাজা ও জমিদারবর্গ কিয়ৎ পরিমাণে সাবধান ও স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ে শাহজাদা সাহ আলম ভারতবর্ষের সম্রাটপদবীতে আরোহণ করিবার আশায় সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বিহার প্রদেশে উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহী জমিদারদলের পক্ষে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারকে উপেক্ষা করিবার অধিকতর সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মীর কাসিম সিংহাসনে পদার্পণ করিবার সময়ে বিহার প্রদেশের অধিকাংশ স্থান, মেদিনীপুর, বৰ্দ্ধমান ও বীরভূম মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের শাসনবহির্ভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা মেদিনীপুর এবং বর্দ্ধমান প্রাপ্ত হইয়াও নিরুদ্বেগে রাজকর সংগ্রহ করিতে পারিলেন না; সুতরাং বিদ্রোহদমন জন্য ইংরাজ ও নবাব সেনাদলকে সর্ব্বাগ্রে মেদিনীপুর প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল।

কর্ণেল কেলড পাটনাভিমুখে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই কাপ্তান মার্টিন হোয়াইটের অধীনে একদল গোরা ও কালাসিপাহী এবং কতকগুলি গোলন্দাজ সেনা মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হইল। মীর কাসিম স্বয়ং সিপাহি সেনার অধিনায়ক হইয়া ইংরাজ সেনানায়ক মেজর ইয়র্ক ও তাঁহার সেনাদলের সহিত বর্দ্ধমান অঞ্চলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন * কাপ্তান মার্টিন হোয়াইটকে মেদিনীপুর অঞ্চলে রীতিমত যুদ্ধকলহ করিতে হইল না; ইংরাজ সেনার পদার্পণ মাত্রেই বিদ্রোহীদল বনে জঙ্গলে পলায়ন করিতে লাগিল; একরূপ নিরুদ্বেগেই মেদিনীপুর বশীভূত হইল। তখন কাপ্তান সাহেব মেদিনীপুরে অল্প সংখ্যক সেনা সংস্থাপন করিয়া অবশিষ্ট সেনাদল লইয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বীরভূমের জমিদার প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বাহুবলে বাহুবল পরাস্ত করিবার আশায় সাধ্যানুসারে সেনা সংগ্রহ করিয়া আক্রমণাশঙ্কায় সতর্কভাবে রাজ্যরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাদল বীরভূমের দুর্গম প্রদেশে কেরোয়া নামক স্থানে গড়খাই করিয়া থানা দিয়া বসিয়াছিল। আসদ জামান খাঁ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; তাঁহার প্রবল প্রতাপে বীরভূমের নাম সার্থক হইয়াছিল। তিনি বিংশতি সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কেরোয়াতে ছাউনী ফেলিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য নবাব সেনা কিছু দিনের জন্য বুধগ্রামে ছাউনী ফেলিতে বাধ্য হইল।†

মীর কাসিম ও মেজর ইয়র্ক বুধগ্রামে এবং কাপ্তান হোয়াইট বর্দ্ধমানের উত্তরে ছাউনী ফেলিয়া বসিয়া রহিলেন। শত্রুসেনার গতিবিধি সুনির্ণীত হইলে, উভয় সেনাদল লইয়া আসদ জামান খাঁকে যুগপৎ আক্রমণ করা স্থির হইলে, কাপ্তান হোয়াটকে উত্তর পূর্ব্বাংশ দিয়া বীরভূমে অগ্রসর হইবার আদেশ করা হইল।

* Seir Mutakherin, Vol II. 156—158

† Broome's Rise and progress of the Bengle Army, Vol. I. 319.

কাপ্তান হোয়াইট দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসদ জামান খাঁ যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন সে স্থান স্বভাবত দুর্গম এবং সম্মুখদেশ হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং তিনি সসৈন্যে একরূপ নিশ্চিন্ত হৃদয়ে কালযাপন করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে কাপ্তান হোয়াইটের সেনাদল সহসা তাঁহার শিবিরের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। সামরিক ব্যাপারে এইরূপ অকস্মাৎ শত্রুসেনা আপতিত হইলে যাহা হইয়া থাকে, আসদ জামান খাঁর সেনাদলেরও তাহাই হইল;—তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল! সেই সময়ে মেজর ইয়র্ক এবং মীর কাসিম সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ায় পলায়নপর বিদ্রোহী সেনাদলের পরাজয় ব্যাপার সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া গেল।* এইসূত্রে বীরভূমে এবং বর্দ্ধমান সহজেই পদানত হইল; পুনরায় নবাবের শাসন-ক্ষমতা জয়যুক্ত হইল।

এই বিদ্রোহদমনোপলক্ষে নবাব সেনাদলকে যে সকল খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হত হইয়াছিলে তাহাতে তাহারা নবাব সেনার মুখোজ্জ্বল করিতে পারে নাই! মোগলের ভাগ্যোদয়ের দিনে মোগল সেনার বীরদর্পে বঙ্গভূমি কম্পান্বিতা হইয়াছিলেন; মোগলের সৌভাগ্যতপন যখন ধীরে ধীরে অস্তগমন করিতেছিল, তখন মোগল সেনার পূর্ব্ব গৌরব অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিল। নিরন্তর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া সেনাদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল;—তাহাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, রীতিমত বেতন পাইবার আশা সুদূর পরাহত হইয়া উঠিয়াছিল; কাহার জন্য, কিসের জন্য যে তাহারা জীবনবিসর্জ্জন করিতে ছুটিয়াছে, হতভাগারা অনেক সময়ে তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না! একবার তাহারা সিরাজদ্দৌলাকে বাঁধিয়া আনিয়া মীরজাফরকে সিংহাসন বসাইয়া দিতেছে, আবার মীরজাফরকে বাঁধিয়া রাখিয়া মীরকাসিমকে মসনদে উঠাইতেছে;—এরূপ অনিশ্চিত ক্ষেত্রে সেনাদলের রীতিনীতি শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ ও চরিত্রবল সকলই হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা লুণ্ঠন লোভে বা বাট্টা পাইবার প্রত্যাশায় কলের পুতুলের মত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত এবং কখন কখন গুলি গোলা ছুটিতে না ছুটিতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার উপক্রম হইয়া উঠিত!

মীর কাসিম শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়া মোগল সেনার প্রকৃত দুর্দ্দশার কারণ গুলি একে একে বুঝিয়া লইলেন;—বুঝিলেন যে ইহারা বীরচরিত্রের উচ্চ আদর্শ হইতে বহু নিম্নে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; মোগল-রাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা দূরে থাকুক, এই চরিত্রহীন আদর্শহীন অবসাদগ্রস্থ ছত্রভঙ্গ সেনাদল লইয়া একদিনের জন্যও নিশ্চিন্তহৃদয়ে রাজ্যরক্ষা করা অসম্ভব। কাসিম আলির চরিত্রের প্রধান গুণ—কর্ম্মকুশলতা, তিনি যখন যাহা প্রয়োজন বলিয়া উপলব্ধি করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। সেনাদল গঠন করা কত প্রয়োজন তাহা বুঝিতে যখন আর কিছুমাত্র

* Seir Mutakherin, Vol II. 159.

সন্দেহ রহিল না, তখন কাসিম আলি মোগল সেনার আমূল সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।*

এদিকে কর্ণেল কেলড মীর কাসিম প্রদত্ত অর্থ ভাণ্ডার লইয়া পাটনায় পদার্পণ করিয়া ইংরাজ ও নবাব সেনার পূর্ব্ববেতন কিয়দংশ পরিশোধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে লইয়া শাহজাদার অভিযানের গতিরোধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইংরাজসেনার সমস্ত পূর্ব্ববেতন পরিশোধিত হইল; কিন্তু নবাব সেনার সমস্ত বেতন পরিশোধিত হইতে পারিল না। ইহাতে নবাব সেনাদলের আন্তরিক অসন্তোষ বিদূরিত না হইয়া ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতে লাগিল।

কর্ণেল কেলড পথিমধ্যে মুঙ্গের দুর্গে এন্‌সাইন্ জন ষ্টেবল্‌সের অধীনে একদল সেনা রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পাটনায় উপনীত হইয়া সেই সেনাদলের পৃষ্ঠপোষণ জন্য আরও একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। এই সেনাদলে সর্ব্বসমষ্টিতে ৫৫০ জন যোদ্ধ্ পুরুষ সম্মিলিত হইল, তন্মধ্যে তিন পল্টন সিপাহী, পঞ্চাশ যাটজন ফিরিঙ্গী এবং দুই পল্টন মোগল অশ্বারোহী ছিল। † মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী করকপুরের রাজার বিদ্রোহদমনের জন্য এই সেনা দলের উপর আদেশ হইল। বিদ্রোহী রাজা তৎসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুই সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে আপন সেনা নায়ককে অগ্রগামী হইয়া ইংরাজ শিবির আক্রমণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। রাজ সেনা মুঙ্গেরের তিন মাইল দূরে আসিয়া ছাউনি ফেলিল। পরদিন প্রভাতে ইংরাজ শিবির আক্রান্ত হইবে হইবে এইরূপ জনরব শ্রবণ করিয়া ইংরাজসেনানায়ক রজনী এক ঘটিকার সময়ে অলক্ষিত ভাবে বিদ্রোহী সেনাদলের সুষুপ্ত শিবির সবেগে আক্রমণ করিলেন।

বিদ্রোহী সেনাদল সুপ্তোত্থিত হইয়া সহসা নিশারণে আক্রমণকারিদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না! কিন্তু তাহারা রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া পুরাতন পরিখার পার্শ্বে আসিয়া সমবেত শক্তিতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইল; এইখানে উভয় সেনাদলের শক্তি পরীক্ষা হইতে লাগিল। সে পরীক্ষায় বিদ্রোহী সেনাদল ইংরাজের সুশিক্ষিত গোরাসৈন্যের নিকট পশ্চাদ্‌পদ হইল না; ফিরিঙ্গিদল তাহাদের অমিতবিক্রমের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে সিপাহী সেনা সদর্পে অগ্রসর হইল। এইবার তাহারাবীরের ন্যায় বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া ধীরে দৃঢ়পদে অমিততেজে বিদ্রোহী সেনা শিবির লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল। শত্রু সেনার প্রতিরোধ বশতঃ অনেকে ধরাশায়ী হইতে লাগিল; কিন্তু যাহারা জীবিত রহিল তাহারা হটিল না; বীর বিক্রমে অগ্রসর হইয়া শিবির ভেদ করিয়া শত্রুব্যূহ

---

* The conduct of his own troops on this occasion convinced Meer Kasim Khan of their utter inefficiency, and he immediately set about a reform of his army.—Broome's Rise and progress of the Bengle Army, Vol. I. 320.

† Broome's Rise and progress of the Bengle Army, Vol. I. 320.

বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীদল প্রভাতের অরুণালোকের সহায়তায় করকপুরের রাজধানীর দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; —বিজয়োন্মত্ত মোগল অশ্বারোহী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিল।

করকপুরের রাজধানীর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তরে বিদ্রোহী রাজা সসৈন্যে দণ্ডায়মান হইয়া আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; মোগল অশ্বসেনা ও তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী সেনানায়ক ষ্টেবল্‌স-পরিচালিত পদাতিক সিপাহীরা করকপুরে উপনীত হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে কেহ কাহাকেও ক্ষমা করিল না; জীবন পণ করিয়া বিদ্রোহী রাজা সসৈন্যে অস্ত্রচালনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মানুষের শক্তিতে যাহা হইবার তাহা হইল, আর যুদ্ধজয়ের আশা রহিল না; বিজয়ী মোগল সেনাদল রাজধানীর পল্লীতে পল্লীতে,—কুটীরে প্রাসাদে বিপণীতে বিনোদ মন্দিরে—সর্ব্বত্র অগ্নি সংযোগ করিয়া করকপুরের হাস্যময়ী রাজধানী শ্মশানভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল! বিদ্রোহ শান্তিলাভ করিল। সেনানায়ক ষ্টেবল্‌সের পদোন্নতির সূত্রপাত হইল। যে মোগল সেনার চরিত্রহীনতার জন্য কাসিম আলি মর্ম্ম-পীড়িত, মুসলমানের গৌরব অবসাদগ্রস্ত, ইতিহাস কলঙ্কঘোষণায় নিযুক্ত, অন্ততঃ এক বারের জন্য সেই মোগল সেনার বীরকীর্ত্তির কথা ইংরাজদিগের মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়িল। তাহাদের সে দিনের বীরত্ব কাহিনী আজিও ইংরাজদিগের সামরিক ইতি-হাস পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।*

ইহার পর প্রধান সেনাপতি কেলড আর অধিকদিন পাটনা অঞ্চলে অবস্থান করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই মেজর কার্ণাকের হস্তে সেনা বিভাগের ভার সমর্পণ করিয়া মাদ্রাজ যাত্রা করিতে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শাহজাদার অভিযান।

He was most desirous to persuade the English to embrcae his claims, and support him with a foice to enable him to advance upon Delhi and take possession of his capitac and his throne.—Broome's Bengle Army.

* The alarm however speedly spiead, and he (Ensign Stables) found the enemy strongly posted under cover of an old entrenchment but he did not hesitate to attack them, and finally succeeded through the gallantry of the sipahis in forcing the camp at the point of the bayonet.—Broome's Rise and progress of the Bengal Army, vol. I. 321.

মোগল রাজশক্তির অধঃপতন সময়ে ভারতবর্ষে অনেক গুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল; — হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং অযোধ্যার উজির মোগল বাদশাহের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইয়াও স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; বঙ্গবিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিম বাদশাহের সুবেদার হইয়াও কর প্রদান করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; ইউরোপীয়গণ সওদাগর হইয়াও সর্ব্বত্র পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন; মহারাষ্ট্র সেনানায়কগণ মোগল রাজশক্তি সমূলে উৎখাত করিয়া পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য দেশলুণ্ঠনে নিযুক্ত হইয়াছিল; — ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অরাজকতার প্রবল প্রতাপ বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার সন্ধান লাভ করিয়া নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছিলেন; আহমদ শাহ আবদালী আসিয়া পাণিপথের শেষ সমরে মহারাষ্ট্র প্রতাপ পদদলিত করিয়া ভারতবর্ষকে হীনবল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এইরূপ তুমুল রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে মীর কাসিম যেমন মোগলরাজশক্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বাহু হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর একজন মুসলমান যুবকও সেইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষাতাড়িতহৃদয়ে সেনাদল সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইহার নাম শাহজাদা শাহ আলম; — দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া শাহজাদার নামের গৌরব তখন পর্য্যন্তও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তাহার উপর আবার আহমদশাহ আবদালীর ন্যায় একজন পরাক্রান্ত মুসলমান বীর এবং অযোধ্যার নবাবের ন্যায় একজন অর্থশালী মুসলমান ওমরাহ শাহজাদাকে অভয়দান করায় তাঁহার পথ সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। দিল্লী এবং আগরার মোগল রাজধানী তখনও শত্রুকবলে; সুতরাং শাহজাদা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দিকেই প্রথমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সিরাজদ্দৌলার সময়েই ইহার সূচনা হইয়াছিল; মীর কাসিম যখন সিংহাসনে পদার্পণ করেন, শাহজাদা তখন বিহারের অধিকাংশ স্থানে অধিকার বিস্তারকরিয়া শোণনদীর তীরস্থ দাউদ নগরে এবং ফল্গুতীরস্থ গয়াধামে সেনা সমাবেশ করিয়া পাটনার অনতিদূর পর্য্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ বিহারে নিরুদ্বেগে করসংগ্রহ করিতেছিলেন।*

শাহজাদা দীর্ঘকাল দক্ষিণ বিহারে অধিকার বিস্তার করায় অনেক বিদ্রোহী জমিদার তাঁহার পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং নবাবসেনাদল হইতে সিপাহী ও জমাদারগণ পলায়ন করিয়া তাঁহার সেনাশিবিরে আশ্রয় লাভ করিতেছিল। শাহজাদা সম্রাটপদে অধিরোহণ করিতে পারিলে মীর কাসিম যে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার মসনদ উপভোগ করিতে পারিবেন, অথবা তাঁহার ইংরাজ বন্ধুগণই যে অবলীলাক্রমে মোগল সাম্রাজ্যের বাণিজ্য

* His head quarters were established at Behar, but Daudnugger on the Soane, and Gyah on the Falgu, were also occupied by large detachments of his troops, and the revenues of the province were collected in his name up to within a few miles of the city of Patna.—Broome's Rise and progress of the Bengal Army, vol. I. 322.

ব্যবসায়ে একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। সুতরাং শাহজাদার অভিযানের গতিরোধ করা উভয়ের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কর্ণেল কেলড মান্দ্রাজ গমন করিবার পর তৎপদে মেজর কার্ণাক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াই শাহজাদাকে সসৈন্য আক্রমণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।*

মীর কাসিম আরও তিন লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিলেন, এবং ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পুনরায় ছয় লক্ষ টাকা পাঠাইয়া সেনাদলের পূর্ব্ববেতন পরিশোধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদের দেনা পাওনার হিসাব করিবার জন্য নহবৎরায়কে পাটনায় প্রেরণ করিলেন। সিপাহীসেনা ইহাতেও সহজে যুদ্ধযাত্রা করিতে সম্মত হইল না; অবশেষে ইংরাজসেনার দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং ইংরাজসেনাপতির ভর্ৎসনাবাক্যে লজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে সম্মত হইল।

কামগার খাঁ এবং রাজা বুনিয়াদ সিংহ সসৈন্যে শাহজাদার শিবিরে মিলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু শাহজাদার দরবারে কামগার খাঁর আধিপত্য প্রবল হওয়ায় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া পালোয়ান সিংহ এবং বলবন্ত সিংহ প্রভৃতি অন্যান্য জমিদারবর্গ শাহজাদার পক্ষাবলম্বন করেন নাই। এরূপ সময়ে শাহজাদাকে আক্রমণ করা মীর কাসিমের ও ইংরাজদিগের পক্ষে সুবুদ্ধির কার্য্য হইয়াছিল।

বিহার নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে সোয়ান নামক ক্ষুদ্র পল্লীর নিকটে মোহানী নদীর একটি ক্ষুদ্রশাখার তীরে শাহজাদা সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মেজর কার্ণাকপরিচালিত বঙ্গসেনা এই ক্ষুদ্রনদীর অপর তীরে আসিয়া উপনীত হইলে উভয় সেনাদলে যুদ্ধারম্ভ হইল।† এই যুদ্ধে শাহজাদার সেনাদল অমিতবিক্রমে বঙ্গসেনার গতিরোধের আয়োজন করিয়াছিল; কিন্তু একটি আকস্মিক ঘটনায় যুদ্ধের গতি সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শাহজাদা একটি সুশিক্ষিত রণহস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধভূমিতে স্বয়ং সেনাচালনা করিতেছিলেন। সহসা একটী গোলা আসিয়া তাঁহার নিকটে পতিত হইল, মাহুত তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, হস্তী আহত কলেবরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে পলায়ন করিল; ইহাতে বাদসাহী সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন-পর হইল।‡

মেজর কার্ণাক উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া প্রচণ্ডবেগে শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবন করিতে

* Major Carnac now assumed command of the Bengal force; and that officer determined upon an immediate attack upon the Emperor.—Broome's Rise and progress of Bengal Army, vol. I. 322.

† মিলের ইতিহাসে এই যুদ্ধ গয়ার যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত স্থানে তাহা নহে। ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে একবল ক্রম স্বকৃত সামরিক ইতিহাসে ইহার প্রকৃত স্থাননির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

‡ Ironside's Narrative, p. 24.

গিয়া সহসা বাধা প্রাপ্ত হইলেন। ফরাসিবীর মসিয় লা সিরাজদ্দৌলার অধঃপতনের পর শাহজাদার শিবিরে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংরাজসেনার গতিরোধ করিবার জন্য সসৈন্য সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া মেজর কার্ণাক আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

মসিয় লার পিতার নাম জন লা। তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া চিরজীবন ফরাসিদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ফরাসি বলিয়াই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার বীরপুত্র মসিয় লা ফ্রান্সদেশের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইংরাজের অত্যাচারে চন্দননগর হইতে তাড়িত হইয়া মসিয় লা সিরাজদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ সেনাপতির চক্রান্তজালে আবদ্ধ ; মসিয় লার মত অকৃত্রিম বন্ধুকে বিদায় দান করিয়া বিদ্রোহী রাজকর্ম্মচারীদিগের কুটীল কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। মসিয় লা ইংরাজদিগের চিরশত্রু বলিয়া তাঁহাকে ইংরাজেরা বঙ্গবিহার উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন আজ সেই সকল পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মসিয় লা সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছেন। সকলে হটিয়া গেল ; ইংরাজের গোলা খাইয়া অনেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল ; কিন্তু পঞ্চাশ জন সাহসী সেনা, তের জন সেনানায়ক এবং তাহাদের অধিনায়ক মহাবীর লা পদমাত্র বিচলিত হইলেন না। * ইংরাজ সেনাপতি এই অকুতোভয়তা ও শৌর্য্য বীর্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই সেনাদল পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং মসিয় লার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বীরোচিত অভিবাদন করিয়া জীবনবিসর্জ্জন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। মসিয়লা অনেক অনুনয় বিনয়ে যুদ্ধভূমি ত্যাগ করিয়া ইংরাজশিবিরে আগমন করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু প্রাণ থাকিতে অস্ত্রত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ইংরাজ সেনানায়কগণ পরম সমাদরে ক্ষুদ্র ফরাসী সেনাদল বেষ্টিত মহাবীর মসিয় লাকে ইংরাজ শিবিরে আবদ্ধ করিয়া বীরত্বের মর্য্যাদারক্ষা করিলেন।† এইরূপে যুদ্ধজয় হইল ; এইরূপে শাহজাদার সেনাদল পশ্চাৎপদ হইল ; কিন্তু এই যুদ্ধে

---

* Mooshur Lass finding himself abandoned and alone, resolved not to turn his back : he bestrode one of his guns, and remained firm in that posture, waiting for the moment of his death. This being reported to Major Carnac he detached himself for his men, with Captain Knox and some other officers, and he advanced to the man on the gun without taking with him either a guard or any Telingas at all. Being arrived near, his troop alighted from their horses, and pulling their caps from their heads, they swept the air with them as if to make him a *salaam :* and the salute being returned by Mooshur Lass in the same manner, some parley ensued in their own language.—Seir Mutakherin, vol. II. 164.

† Iron side's Narrative, p. 24.

কেহই কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। শাহজাদা পুনরায় সসৈন্যে সমবেত হইয়া পাটনাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যুদ্ধজয়ের অব্যবহিত পরেই ইংরাজ সেনাপতি শাহজাদার শিবিরে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে শাহজাদার পাটনা আক্রমণের সংবাদে নগর রক্ষার জন্য তথায় সেনা প্রেরণ করিতে হইল।

যিনি রাজদূত হইয়া শাহজাদার শিবিরে গমন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম মহারাজ সিতাব রায়। তাঁহার নাম বাংলার ইতিহাসে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধি সাহস ও রণশিক্ষায় সিতাব রায় সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন; সেই জন্য ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকেই দৌত্য কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

সিতাব রায় শাহজাদাকে ইংরাজের প্রার্থিত সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত করিতে পারিলেন না! তিনি অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন এবং অবশেষে নিতান্ত মর্ম্মাহত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন যে আজ ইংরাজ যে নিয়মে সন্ধি প্রার্থনা করিতেছেন তাহা শাহজাদা গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু শীঘ্রই শাহজাদাকে সন্ধিপ্রার্থী হইয়া ইংরাজের শরণাগত হইবে হইবে, তখন ইংরাজ এই সকল নিয়মে সন্ধিসংস্থাপন করিতে কদাচ সম্মত হইবে না।" *

সিতাব রায় যাহা বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই শাহজাদার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; সেনাদল বেতন না পাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল; ইংরাজদিগের অক্লান্ত অধ্যবসায় চিরপ্রসিদ্ধ,—তাঁহারা ক্রমাগত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শাহজাদার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে শাহজাদাই সন্ধিপ্রার্থী হইয়া ইংরাজ শিবিরে বক্সী কায়ম‌উল্লা খাঁকে দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি মেজর কার্ণাক বলিলেন, তিনি স্থায়ী সন্ধি বিদ্রোহের কর্ত্তা নহেন; তবে শাহজাদা যদি কুচক্রী কাম্‌গার খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া এখনই সসৈন্যে শোন নদীর অপর তীরে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হন তবে মেজর সাহেব তাঁহার প্রস্তাব কলিকাতার ইংরাজ দরবারে পাঠাইয়া দিতে পারেন। ইংরাজেরা যুদ্ধ কলহে ক্ষান্ত হইলেন না; ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহাদের সেনাদল শাহজাদার শিবিরের নিকটস্থ হইল। শাহজাদা তখন যুদ্ধার্থ সেনাদল সজ্জিত করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তখন তাঁহার রণসাধ ক্ষান্ত হইয়াছিল। তিনি যুদ্ধে বিরত হইয়া সন্ধিসংস্থাপনাশায় ইংরাজ শিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি ক্ষান্ত হইলেন না —তিনি সসৈন্যে শাহজাকে আক্রমণ করি-

* His Majesty would himself shortly seek those terms of pacification, which he now refused, and would not find them; or if he found any at all, they would fall short of those now proffered, and not rebound so much to His Majesty's honor and advantage.—Seir Mutakherin, vol. II. 166.

লেন। ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইল ;—শাহজাদাকে পলায়ন করিতে হইল এবং কাম্‌গার খাঁকে পদচ্যুত করিয়া সন্ধিপ্রার্থী হইয়া বৃটীশ শিবিরে স্বয়ং শুভাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। *

গয়াধামের নিকট বাদশাহী এবং সুবাদারী শিবিরের মধ্যস্থলে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের মোগল রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাদা শাহ-আলমের সঙ্গে ইংরাজবণিক সমিতির সেনানায়ক মেজর কার্ণাকের শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইল। ইহাই প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে বৃটীশ রাজশক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার মূল সূত্র। ইহার পর দিবস শাহজাদা স্বয়ং ইংরাজ শিবিরে শুভাগমন করিলেন ; তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। তিনি ইংরাজ দিগের ব্যবহারে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বয়ং আসিয়া ইংরাজ শিবিরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। দিল্লীর মোগল সিংহাসনের অধিপতি আসিয়া ইংরাজের আতিথ্য গ্রহণ করায় সমস্ত যুদ্ধ কলহ শান্তিলাভ করিল এবং ইংরাজ শিবিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে 'বাদশাহ' বলিয়া ঘোষণা-পত্র প্রচার করা হইল। রাজা রামনারায়ণ অতিথি সৎকারের জন্য দৈনিক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষের মোগল রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাদা শাহ আলমকে বশীভূত করিয়া ইংরাজসেনাপতি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া বিহারের রাজধানী পাটনায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আলেকজাণ্ডার চ্যাম্পিয়ন এবং রাজা দুর্ল্লভরামের উপর সেনা চালনার ভার সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে গয়া প্রদেশে রাখিয়া দিয়া সেনাপতি মেজর কার্ণাক বাদশাহ শাহ আলমকে লইয়া পাটনাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পাটনা অনেক দিনের পুরাতন স্থান। হিন্দু এবং বৌদ্ধ নরপালদিগের পাটলিপুত্র ; মুসলমানের শাসন সময়েও বিহারের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল। এই মোগল রাজধানীতে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ এবং পরিখা বেষ্টিত নগর প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হইত। নগরের একদিকে ভাগীরথী বেলাভূমি চুম্বন করিয়া রহিয়াছেন, অপর তিন দিকে দৃঢ়োন্নত প্রাচীর। এই প্রাচীরের বাহিরে নগরোপকণ্ঠে ইংরাজেরা একটা কুটী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শাহজাদা আসিয়া বাঁকীপুরে শিবির সংস্থাপন করিলেন, ইংরাজেরা পাটনার পশ্চিমদ্বারের নিকট ছাউনী ফেলিয়া রহিলেন এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী শাহজাদা সমুচিত সমারোহে নগর প্রবেশ করিয়া পাটনা দুর্গে বাসস্থান প্রাপ্ত হইলেন।

ইংরাজের সহিত শাহজাদার সৌহার্দ্দ্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করাই শাহজাদার প্রধান লক্ষ্য। তিনি ইংরাজদিগের সেনা সহায়তা গ্রহণ করিয়া লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনে

* Broome's Rise and progress of the Bengal Army, vol. I. 327.

বসাইয়া দিতে পারিলে যে ইংরাজের বাহুবল চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ইহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু কলিকাতায় ইংরাজ দরবারের গৃহকলহে এবং ইংরাজদিগের তৎকালে আশানুরূপ সেনাবল না থাকায় শাহজাদার আশাপূর্ণ হইতে পারিল না; তিনি আপাততঃ দৈনিক ১০০০ মুদ্রার আতিথ্য সৎকার লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতেই বাধ্য হইলেন! *

* The prospect of an advance upon Delhi, and the advantages to be expected from restoring the Monarch to his throne, appear for a moment to have dazzled the eyes of the Council, and to have been considered as feasible; but it was finally abondoned, partly from a conviction of the want of means and material, and partly owing to the dissensions and disputes in Council, in which any plan proposed by one party was certain of meeting with opposition from the other.—Broome's Rise and progress of the Bengal Army, vol. I. 329.

শ্যাম বাউল

শ্যাম বাউলের নাম একালে আর কাহারো মুখে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। শ্যামবাউল নবদ্বীপের কোন 'কীর্ত্তনীয়া' সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল, সে নিজে বৈষ্ণব। একালে কীর্ত্তনের প্রাদুর্ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং থিয়েটার ও যাত্রা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীযুগে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মধুর ভাবপূর্ণ কীর্ত্তনে রাঢ় ও বঙ্গ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, এবং তৎকালে মহাজন বিরচিত পদাবলীর অত্যন্ত আদর ছিল। এই সকল কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্যাম বাউলের স্থান অতি-উচ্চে ছিল, তাহার সুললিত কণ্ঠে গীত পূর্ব্বরাগ, মান, মাথুর, কুঞ্জভঙ্গ এবং বাসর সজ্জা প্রভৃতি পদাবলী শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দের চক্ষু হইতে অজস্রধারে প্রেমাশ্রু ক্ষরিত হইত। তখন বঙ্গদেশে গ্রামে গ্রামে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের চতুষ্পাঠী ছিল, সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অত্যন্ত আদর ছিল এবং ব্রাহ্মণ কন্যাগণ একাল অপেক্ষা তখন অধিক শ্রমশীলা ছিলেন। পল্লীগ্রামে একালেও হবিষ্যনিরতা পলিতকেশা, ভক্তিমতী ব্রাহ্মণ বিধবার অভাব নাই, কিন্তু অধিক স্থলেই তাঁহাদিগকে অবসর কালে হরিনামের মালা লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বৈঠকে পরনিন্দার আলোচনায় মনঃসংযোগ করিতে দেখা যায়। সেকালের ব্রাহ্মণীগণ শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যেরূপ 'যজ্ঞি' রাঁধিতেন, যেরূপ ভক্তিভরে

অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিতেন, ভোজকাজে নানাবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া ভোক্তাদিগের তৃপ্তি বিধানের জন্য যে প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেন একালে তাহা অত্যন্ত বিরল। এখন পল্লীগ্রামেও 'যজ্ঞি' রাঁধিতে ভাড়াটে পাচক নিযুক্ত হয়, বঙ্গ গৃহলক্ষ্মীগণ একালে পশমের শিল্প নৈপুণ্যে কৃতী বটে কিন্তু লাল, সবুজ, নীল, কাল এবং সাদা এই পাঁচ রকম সূতা দিয়া সেকালে আমাদের দেশে যেমন কাঁথা শিলাই হইত তাহা একালে আর দেখা যায় না; কাজ সহজ হইলেও এই সূচি বিদ্যার মধ্যে আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত, অনেক পুরাতন গৃহস্থের ঘরে এখনো সেকেলে কাঁথা অনেক আছে যাহার শিলাই প্রণালী দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কোন কাঁথায় পাঁচরঙ্গ সূতা দিয়া পদ্ম আঁকা, নীল জলে গলাউঁচু করিয়া রাজহংস ভাসিতেছে, চারিদিকে গোচারণের মাঠের দৃশ্য; কোন কাঁথায় বিবাহ যাত্রীর উৎসব চিত্র, বিবাহ করিয়া বর নববধূ লইয়া গৃহে যাত্রা করিয়াছে, আটটা 'কাহারে' পাল্কী বা চতুর্দ্দোল কাঁধে লইয়া স্খলিত পদে দৌড়িতেছে, তাহাদের কাহারো হাতে লাঠি উঁচু করা, কেহ হুঁকা টানিতে টানিতে পাল্কীর সঙ্গে ছুটিয়াছে, লাল পোষাক পরা পাইকেরা থাস ঘাড়ে লইয়া আগে আগে ছুটিতেছে, কাহারো মাথায় ফল ও ফুলের বাগান, সঙ্গে সারি সারি হাতি ঘোড়া ও এইরূপ অনেক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে লক্ষ্মীপূজা অন্নপ্রাশন বিবাহ উপলক্ষে আলিপনার যেরূপ চিত্র কৌশল দেখা যাইত এখন আর তাহা দেখা যায় না। তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মণগৃহেই এক একটা চরকা থাকিত, ব্রাহ্মণীগণ অবসর পাইলেই পৈতা কাটিতেন, সূক্ষ্ম পৈতার তখন অত্যন্ত আদর ছিল, এবং অনেক উপায়হীনা বিধবা ব্রাহ্মণী শুদ্ধ পৈতা বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সূতা কাটার এই রকম প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া কোন কোন গ্রামে শ্যামবাউলের কীর্ত্তন হইবার কথা উঠিলে পল্লীবাসীগণ বলিত—

"বাজলো শ্যাম বাউলের খোল
যত মাগী চরকা তোল।"

রমণী সমাজে শ্যাম বাউলের কীর্ত্তনের এতই প্রতিপত্তি ছিল।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ চিরকাল শক্তিমন্ত্রোপাসক। ভবানন্দ মজুমদার এই বংশের আদি পুরুষ, মজুমদার মহাশয় স্বয়ং অন্নপূর্ণার উপাসক ছিলেন, অন্নপূর্ণা শক্তিরই রূপান্তর, কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার বিভিন্ন স্থানে কালী মূর্ত্তি এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে; তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরে সুবৃহৎ আনন্দময়ী নাম্নী কালীর মন্দির ও কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটে শিবনিবাস নামক স্থানের মন্দিরত্রয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু পক্ষান্তরে এই বংশে বিষ্ণুভক্তিরও নিদর্শন বিরল নহে, কৃষ্ণনগরের সুবিখ্যাত বারোদোল ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই বারোদোল উপলক্ষে লক্ষ্মী নারায়ণের দ্বাদশটি বিভিন্ন নামীয় মূর্ত্তি কৃষ্ণনগর রাজভবনে একত্রিত করা হয়, তন্মধ্যে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, বিরু-

ইর মদন গোপাল এবং শ্রিহট্টের কৃষ্ণরায়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিগ্রহের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহের জন্ত তাঁহাদের পীঠস্থানে কৃষ্ণনগর রাজদত্ত যে সকল দেবত্র জমী আছে তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। বলাবাহুল্য এই সকল বিগ্রহের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে এক একটি রোমাঞ্চকর জনশ্রুতি আছে, এবং অনেক ভক্ত তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকে।

অতএব দেখা গেল শক্তি-উপাসক এই রাজবংশে বিষ্ণুভক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছে। শক্তি মন্ত্রোপাসকগণ প্রায়ই বিষ্ণুবিদ্বেষী হইয়া থাকেন, কৃষ্ণনগর রাজবংশে যখন বিষ্ণুভক্তি প্রবেশ করিয়াছে তখন একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কোন বিশেষ কারণেই এরূপ হইয়াছে। কোন্ রাজার সময়ে যে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা কৃষ্ণনগরের প্রাচীন অধিবাসীগণের জানা থাকিতে পারে; আমরা কোন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে গল্প শুনিয়াছি যে রাজা গিরীশচন্দ্রের সময় হইতে এই রাজবাড়ীতে কীর্ত্তন গানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে কীর্ত্তন হইবার নিয়ম ছিল না, নদীয়া জেলায় কীর্ত্তন গানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব সত্বেও রাজা গিরীশচন্দ্রের পূর্ব্বে কোন কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় এই রাজভবনে কীর্ত্তন করিতে পারে নাই। শ্যাম বাউলই রাজা গিরীশচন্দ্রের সম্মুখে তাঁহার আপনার অসাধারণ সঙ্গীতদক্ষতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও পুরুষানুক্রমে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ শাক্তই হোন বা বৈষ্ণবই হোন তাহাতে সাধারণের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, এবং এই রাজবাটীতে, কীর্ত্তন না হওয়ার প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাতে তেমন বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না, কিন্তু শ্যাম বাউলের ন্যায় একজন সামান্ত বৈরাগী— পণ্ডিতও নহে বিজ্ঞও নহে কিরূপে যে অসাধারণ বুদ্ধিমান, দৃঢ় চিত্ত রাজা গিরীশচন্দ্রেকে তাঁহার বংশ প্রচলিত চিরন্তন বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহার গৃহে কীর্ত্তন গাহিবার অনুমতি প্রদানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহার গল্প সাধারণের নিকট কৌতুহল জনক হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাজা গিরীশচন্দ্র প্রায় প্রত্যহই কর্ম্মচারীবর্গের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ত দরবারে বসিতেন, সর্ব্ব সাধারণে সেখানে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের প্রার্থনা তাঁহার গোচর করিতে পারিত। শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া বলিয়া শ্যাম বাউলের খ্যাতি ছিল, সে কৃষ্ণনগরের বাটীতে একবার কীর্ত্তন গাহিবার অভিলাষে রাজ সন্নিধানে সাক্ষাৎ করিতে গেল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে সে রাজ দরবারে গিয়া গললগ্নীকৃত বাসে দণ্ডায়মান থাকে, তাহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দিকে কাহারো লক্ষ্য করিবার অবসর হয় না, কর্ম্মচারীবর্গ প্রতিদিন তাহাকে রাজবাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়াও তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না, সে কাহারো নিকট তাহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করে না; এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন রাজা তাঁহার প্রধান অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন এলোকটি কে, কেনই বা সে প্রত্যহ একভাবে দরবারে আসিয়া

দাঁড়াইয়া থাকে। রাজার কথা শুনিয়া দেওয়ানজী কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপু তুমি কে? কেনই বা প্রতিদিন এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাক, তোমার কোন নালিশ থাকিলে তাহা মহারাজের নিকট প্রকাশ করিতে পার, তিনি জানিতে ইচ্ছুক আছেন।"—শ্যাম সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক রাজাকে আপন পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া বলিল "ঠাকুর, (কৃষ্ণনগর-রাজ এই নামেই সাধারণ কর্ত্তৃক সম্বোধিত হইয়া থাকেন) রাজধানীতে আমি একপালা কীর্ত্তন গাহিব, আমার অনেক দিনের আশা, আমার এই বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে"—রাজা বলিলেন "এ রাজবাড়ীতে যাহা কখন হয় নাই তুমি তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেছ?"—শ্যাম সবিনয়ে উত্তর করিল "অন্যায় প্রার্থনা হইলে রাজদ্বারে কখন তাহা উত্থাপন করিতাম না। দেবতার গুণানুকীর্ত্তন করিতে যে কোন বাধা আছে আমার ক্ষুদ্র মতিতে তাহা বোধ হয় না।"

রাজা "আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ যে কার্য্য নিষেধ করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রচলিত করিবার কোন কারণ দেখিনা।"

শ্যাম—"মহারাজের নিকট অধিক বাচলতা করি আমার এমন অভিপ্রায় নহে, আমার প্রার্থনা যদি অন্যায় হয়, তাহাহইলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে দুঃখের কোন কারণ নাই।"

রাজা—অনেক বিবেচনার পর বলিলেন "শুনিয়াছি তোমার কীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হয়, আমারও একবার তাহা শুনিবার ইচ্ছা ছিল, আমি তোমাকে কীর্ত্তন গাহিবার অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু এক বন্দোবস্তে, তুমি গৌর চন্দ্রিকা গাহিতে পাইবে না, মান, মাথুর, প্রভাস যাহা ইচ্ছা গাও কিন্তু একেবারে মূল বিষয় আরম্ভ করিতে হইবে।"

শ্যামবাউলও নাছোড়, রাজাকে যখন সে এতটা নরম করিয়াছে তখন শেষ পর্য্যন্ত সে না দেখিবে কেন? তাই পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া কহিল "ঠাকুর আপনার আদেশে আমি কৃতার্থ হইলাম, আপনার অনুমতি অনুসারেই আমি কীর্ত্তন গাহিব, কিন্তু তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ অপকার হইবে। সকল কীর্ত্তনীয়াই মুখবন্ধে গৌরচন্দ্রের গুণানুবাদ গাহিয়া থাকেন, ইহা আমাদের চিরন্তন প্রথা। আজ সেই প্রথার ব্যতিক্রম করিলে আমার সমব্যবসায়ীগণ এবং ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দ আমার প্রতি অত্যন্ত দোষারোপ করিবেন, এমনকি তাহাতে আমার পসারেরও বিস্তর হানি হইবে।"

রাজা সহাস্যে বলিলেন "কেহই আপন আপন কৌলিক প্রথা পরিত্যাগ করিতে চাহে না; তুমি সামান্য কীর্ত্তনীয়া দলের অধিকারী তোমাদের সম্প্রদায়নির্দ্দিষ্ট প্রথা ছাড়িতে আপত্তি হইতে পারে, আমি একজন রাজা আমি সহজে আমার কৌলিক প্রথা ছাড়িয়া দিব, তুমি এই প্রকার আশা কর?"।

শ্যাম কৃতাঞ্জলি পুটে উত্তর করিল "আমার দুরাশা সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠাকুরের নিকট কি আমি একবার উত্তর প্রার্থনা করিতে পারি যে গৌরচন্দ্র বাদ দিয়া আমার প্রতি কীর্ত্তন গাহিবার আদেশ হইল কেন?"

রাজা কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিলেন "তোমার গৌরচন্দ্র একজন সাধারণ মনুষ্য মাত্র, একটা সাধারণ লোকের গুণানুকীর্ত্তন শুনিবার মত অবসর আমার নাই।"

শ্যাম বাউল—রাজার কথায় মনে ক্লেশ অনুভব করিল, বিষণ্ন স্বরে বলিল "ঠাকুর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, পতিতের উদ্ধারের জন্ম নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মনুষ্য মাত্র একথা শুনিলেও আমাদের পাপ হয়। আমরা সেই মহাপ্রভুরই দাসানুদাস।"

রাজা—"কিন্তু আমরা নই, গৌরাঙ্গ যে অবতার ছিলেন যদি তাহা প্রমাণ করিতে পার তাহা হইলে অবশ্য তোমার কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা শুনিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যতক্ষণ তুমি একথা প্রমাণ করিতে না পারিবে ততক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার অনুমতি পাইবে না।"

শ্যাম বাউল দেখিল রাজা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সবিনয়ে বলিল "ঠাকুর, আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন বৈরাগীমাত্র, কীর্ত্তন করিয়া যাহাকিছু পাই তাহাতে দুইবেলার অন্ন সংস্থান হয়, তর্কের কোন কথা জানি না, মহারাজ যাহা অবিশ্বাস করেন আমি কেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করাইব? তবে একটা কারণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অবতার বলিয়া ধারণা হয়, মহারাজাও বোধ করি তাহা অস্বীকার করিবেন না।"

রাজা সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কারণ?"

শ্যামবাউল বলিল "চিরকাল শুনিয়া আসা যাইতেছে নারায়ণ যখনই পাপীর উদ্ধারের জন্ম ধরাধামে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন তখনই তিনি রাজাকে শত্রুরূপে পাইয়াছেন। দৃষ্টান্তের অভাব নাই, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু সত্য যুগের রাজা—নৃসিংহ অবতারের শত্রু; রাবণ ত্রেতাযুগের দিগ্বিজয়ী রাজা, চন্দ্র তাহার মসালচির কাজ করিতেন, স্বয়ং যম তাহার ঘোড়ার ঘাস কাটিতেন, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত গিয়াছিল, সেই রাবণ রামাবতারের শত্রু; কংশ, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি অনেকেই দ্বাপরের ভুবন বিখ্যাত রাজা—দ্বাপরের অবতার শ্রীকৃষ্ণের শত্রু; আর আপনি স্বয়ং মহারাজ এই কলিযুগের রাজা—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নারায়ণের অবতার বলিয়াই আপনি তাঁহার নাম সহ্য করিতেও অক্ষম, নতুবা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ গিরীশচন্দ্র কখন নবদ্বীপ-চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে অমত করিতেন না। কিন্তু ভয় নাই মহারাজ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগেই ভগবানের অবতার তাঁহার বিদ্বেষী রাজন্তবর্গকে নিহত করিয়াছেন; ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে প্রেমাবতার, প্রেম ভিন্ন অন্য অস্ত্র লইয়া তিনি অবতীর্ণ হন নাই, তাঁহার প্রতি আপনার যতই বিদ্বেষ থাক এই যুগাবসান কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে তিনি প্রেম বিতরণ করিবেন। মহারাজের মঙ্গল হউক—আমি বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

রাজা গিরীশচন্দ্র শ্যাম বাউলের বাক্য কৌশল শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন, আনন্দিত অন্তরে বলিলেন "শ্যাম, তুমিই যথার্থ ভক্ত এবং প্রেমিক, আমি অনুমতি দিলাম তুমি রাজ বাড়ীতে তোমার ইচ্ছানুরূপ কীর্ত্তন গাহিতে পারিবে।"

সেই দিন হইতে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে কীর্ত্তন গাহিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

স্বরলিপি।

বেহাগ—একতালা।

কথা—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর　　　　সুর—ঐ।

আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
　　বাতাসে
তাই আকাশ কুসুম করিগো চয়ন
　　হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী
কূল নাহি পায় আশার তরণী
মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
　　আকাশে।
কিছু বাঁধা পড়িলনা কেবলি বাসনা
　　বাঁধনে
কেহ ধরা নাহি দিল কেবলি স্বপন
　　সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনল শিখায় কি করিনু খেলা
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব
　　হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন
　　বাতাসে।

আ

॥৩॥ স১ স১ । র১ র২ । প১ মী১ । প২ মী১ । ধপমী১ প১ ম১ ।
আ মি　কে ব　লি স্ব　প —

ম১ গর১ গ১ । গম১ প১ ম১ । গ১ র১ । স১ ন্২ । স১ গ২ । সগ২ গ১ ।
ক রে —　ছি — ব　প —　ন —　বা তা　সে আ

গম১ প২ । —১ প২ । প১ প১ প১ । প১ ধ১ নো১ । ধ১ নো১ নোধ১ ।
মি — — তাই　আ কা শ　কু সু ম　ক রি গো

শেষ।

প১ ধ১ প১ । ম১ গর১ গ১ । ম২ ম১ । গম১ প২ । —১ মগ১ রস১ ॥ =৩ ।
চ য় ন　হ তা —　শে আ　মি — — — — —

(আ-প্র)

প১ প২ । ন২ ন১ । ন৩ । ন৩ । র্স১ র্স২ । র্স২ ন১ । র র্স৩ । র্স২ প১ । প২
ছা য়া র ম ত ন মি লা য় ধ র নী — ফু

মী১ । প২ মী১ । ধপমী১ প২ ।—২ ম১ । গর১ গ১ । গম১ প১ ম১ । গ২
ল না হি পা — য় আ শা -- য় — ত র

র১ । স৩ । স১ স১ গ১ । গ১ গ১ ম১ । প১ প১ ন১ । ন১ ন২ । র্স১ র্স১
— নী মা ন স প্র তি মা ভা সি য়া বে ড়ায় আ কা

র্সর্রর্গ১ । র্র১ র্স১ র্স১ । নধ১ ন১ পমী১ । প১ ম১ গ১ ‖—১ প১ প১ । প১
— শে — আ কা — শে — আ মি — কি ছু বা

(আ-প্র)

প২ । ন২ ন১ । র্স২ ন১ । র র্স২ প১ । প২ প১ । নো২ ধ১ । স নো২ ধ১ ।
ধা প ড়ি ল — না — কে ব লি বা স —

প২ ধপ১ । মগ১ রগ১ গ১ । ম১ গ১ ম১ । প১ প২ । প২ প১ । প৩ ।
না — বা — ধ নে কে হ ধ রা না হিং দি

প৩ । প২ র্স১ । নো২ ধ১ । স নো২ ধ১ । প২ ধপ১ । মপ১ ধ১ প১ । ম
ল কে ব লি সু দূ — র — সা — নে

গ১ ম১ । প১ প২ । ন২ ন১ । ন৩ । ন৩ । র্স১ র্স১ । র্স১ ন১ । র র্স৩ ।
— — আ প না র ম নে ব সি য়া এ কে

র্স২ প১ । প১ প১ মী১ । প১ মী১ । ধপমী১ প১ । — ১ ম১ । ম১ গর১ গ১ । গম১
লা — অ ন — ল শি খ — য় কি ক — রি

প১ ম১ । গ১ র১ । স৩ । স১ স১ গ১ । গ১ গ১ ম১ । পগ১ র্স১ র্স১ । ন১
— সু খে — লা দি ন শে সে সে খি ছা ই হ ল

ন২ । র্স১ র্স১ র্সর্রর্গ১ । র্র১ র্স১ র্স১ । নধ১ ন১ পমী১ । প১ ম১ গ১ ‖
সব হু তা — শে — ষ তা — শে — আমি

(আ-প্র)

গার্সী উৎসব।

আজ ৩০শে আশ্বিন, রাত্রি-প্রভাতে গার্সী-উৎসব হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র দুর্গাপুরে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। তাহার বাড়ীতে সন্ধ্যা সমাগত হইবার পূর্ব্বেই আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। রাখালেরা সকালেই মাঠ হইতে গোরু লইয়া আসিতেছে ; গোরু সংখ্যায় ২৭ টি ; লাল, কাল, শিজেল, ন্যাড়া সব রকমেরই গোরু আছে। রাখালেরা গোরু গুলি একে একে গোঁড়াতে বাঁধিল। গোঁড়া বাঁশের বাতা দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। মাটি তুলিয়া সে স্থানটি কিছু উঁচু করা। গোঁড়ার চারিদিকে সারি সারি খুঁটি আছে। রাখালেরা গোরু গুলি একে একে সেই খুঁটিতে বাঁধিল। গোঁড়ায় যতটি খুঁটি ততটি চাড়ি আছে। গোরু মাঠ হইতে আসিবার পূর্ব্বেই বাড়ীর চাকরাণীরা চাড়ির বাসি খাদ্য পরিস্কার করিয়া ফেলিয়া টাট্‌কা জল রাখিয়া দেয়। রাখালেরা গোরু বাঁধিয়া কলাই-ভুঁসি আনিয়া সেইজলে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেয়। গোঁড়ার আঙ্গিনার মধ্যেই গোশালা ; সেখানি একখানা উত্তর দক্ষিণে লম্বা দোচালা বাঙ্গালা ঘর। তাহারই সঙ্গে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা গোঁড়ার সহিত সমান্তর ভাবে স্থিত কলাই-ভুঁসির ঘর। মাটি হইতে ১৷৷০ দেড় হাত পরিমিত উচ্চ করিয়া তাহার ভিতর মাচা প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই মাচার উপর ভুঁসি থাকে। সম্মুখেই দরজা—বাঁশের হুড়কা সংলগ্ন দরজা খানি। গোরুগুলি খাইতে আসিল, রাখালেরা গার্সী আয়োজনে আসিয়া যোগ দিল।

কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পুত্র—হরচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ হরচন্দ্রের স্ত্রী বাড়ীর ভিতর উঠানে আসিয়া আয়োজন করিতেছে। সম্মুখে একখানি চালুনি, তাহাতে আলিপন ছিটা ও সিন্দুরের তিনটি দাগ দেওয়া। বাড়ীর ছেলে ও রাখালেরা তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় বৌ একজন ছেলেকে কলার মাঝ পাতা ও আর একজনকে হলুদের ফুল আনিতে বলিল। তদনন্তর রাখালদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল “বাঁশ্‌নি বাঁশের পাতা, আম ঘোড়স্ (গুলঞ্চ) অম্ কুম্‌ড়ো, ডুমুর পাতা, নিমের ছোটা ও লতাপাতা সব তোমরা কাটিয়া রাখগে যাও, গার্সীর আগুনে জাগাইয়া কাল সর্ব্ব প্রথম উহাই গোরুকে খাইতে দিও।” আদেশ মাত্র হর্ষদোদুল আজ্ঞাবাহকগণ স্ব স্ব কার্য্যসাধনে ছুটিল। হেঁসে, কাস্তে প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া এক একদিকে একজন যাই বাহির হইবে এমন সময় কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট গৌরচন্দ্র শিবচন্দ্রের স্ত্রীকে বাপের বাড়ী হইতে লইয়া আসিল। শিবচন্দ্রের সবে এই শ্রাবণ মাসে বিবাহ হইয়াছে ; অষ্টমঙ্গল কাটাইয়াই বৌ বাপের বাড়ী গিয়াছিল, ভাদ্র মাসে নূতন বৌএর পা দেখিতে নাই, তাই ভাদ্রমাসে আর আসা হয় নাই, পূজার পরেই একেবারে আসিল। ছেলেরা ও রাখালেরা বৌ দেখিবার জন্য ফিরিয়া আসিল। বৌএর সোয়ারী খানি দেউড়ী ঘরের সম্মুখে নামান হইল। কৃষ্ণচন্দ্রের ও হরচন্দ্রের স্ত্রী একটী পঞ্চপত্রবিশিষ্ট আম্রশাখা জলপূর্ণ নূতন একটী ঘটের ভিতর রাখিয়া দ্বারে

সংস্থাপিত করিল ও সোয়ারী হইতে বৌকে কোলে করিয়া নামাইয়া আনিয়া ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল "সুখে থাক, চির জীবি হও! হাতের খাড়ু, সিঁথির সিন্দুর বজায় থাকুক্, কোল ভরা ছেলে হক্," হরচন্দ্রের স্ত্রীও আশীর্ব্বাদবাণীর পুনরুল্লেখ করিয়া নূতন বৌকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। ছেলেরা ও রাখালেরা স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিল।

কৃষাণেরা চারিজনে চারিখানি লাঙ্গল ঘাড়েকরিয়া বাড়ী আসিতেছে। প্রত্যেকের কাঁধেই লাঠি লাঙ্গলভারে বক্রাকার ধারণ করিয়াছে। মাথাতে মাথাল, লাঙ্গলোপরিন্যস্ত বামহস্তে ঘটি, ধূলিধূসরিত আজানুবস্ত্র পরিহিত কৃষাণেরা বাড়ী প্রবেশ করিল। গোয়াল ঘর খানির পশ্চিম পার্শ্বে গোল করিয়া একাদিক্রমে ৭টি গোলাঘর। লাঙ্গল গুলি গোলাঘরের সঙ্গে ঠেশা দিয়া রাখিয়া দিয়া তাহাদের ঘরের দাবায় তাহারা বসিল। একজন তামাক সাজিয়া আনিল ও সকলেই বাবুরী ভাঁজিয়া ও তাগা ঘুরাইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল।

নূতন বৌকে আজ দেখিতে আসিবার পাড়া পড়শীদের তত অবসর নাই, সকলেই গার্সী আয়োজনে কিছু ব্যস্ত। সুতরাং ২।৪ জন ব্যতীত আজ বৌকে দেখিতে বড় বেশী কেহ আসিল না। পুরাণ বৌ নূতন বৌকে পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া চালুনী সাজাইতেছে। একটী হরিতকী, মুষ্টিমেয় শুক্‌তো পাতা, একখানা আদা, একখানা কাঁচা তেঁতুল, নারিকেল কাঁপ, তালের শাঁস, একটী ডালিম, বুটও বোরো ভিজান, চারিটি তিসি, যব, খানিক নারিকেল, একখানি কজ্জলাধার প্রভৃতি, চালুনিতে কলার পাতা পাড়িয়া তদুপরি সাজাইয়া রাখিল। হলদির ফুল দুইটি এক পার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল। রাখালেরা আদিষ্ট লতা পাতা, বিচুলী পালা হইতে বিচুলী ও পাটখড়ি উঠানের একপাশে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিল। গৃহস্থের ঘরে অনেক সময় লবণ, আমসত্ব প্রভৃতি রৌদ্রে দিতে হয়, উঠানে দিলে গোরু আসিয়া সময়ে সময়ে খাইয়া ফেলে তজ্জন্য প্রাঙ্গনের একধারে উচ্চ করিয়া মাচা করা আছে। সেই মাচার উপর সজ্জিত চালুনী খানি রাখা হইল। হেমন্তের শিশিরে ভিজিয়া আগামী উৎসব কালে তাজা থাকিবে। তৎপরে সকলে কুলা-সংগ্রহে ব্যস্ত হইল। কারণ কুলাই ছেলেদের গার্সীর আমোদ; প্রতিবেশী সহচরদিগের সহিত বাক্ যুদ্ধের ইহাই তাহাদের সমর ঘোষণাকারী তূরী, ভেরী। গোবর মাখান এক এক খানি কুলা ও স্থূলতর পাটখড়ি প্রত্যেকেই সংগ্রহ করিয়া শয্যাশিরে রাখিয়া দিল। বড় বৌ ব্যূহ-রচনা-প্রণালী ও উত্তেজক বাক্য শিখাইয়া দিল।

গোরু গুলির খাওয়া হইয়া গিয়াছে; রাখালদের কেহ কেহ গোরু গোয়ালঘরে তুলিতে আরম্ভ করিল। গোঁড়ার সম্মুখেই উত্তর দক্ষিণ লম্বা একখানি, গোশালা। একে একে গোরু গুলি ঘরে উঠান হইল। সেই ঘরে উত্তর কোণে কঞ্চির বেড়া দিয়া ৪ হাত পরিমিত স্থান ঘেরা, তাহাতে বাছুর তুলিয়া রাখা হয়; পর দিন বেলা প্রায় ৮ টার সময় গোরু দোহাইয়া বাসিভাত খাইয়া রাখাল ও কৃষাণেরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে প্রস্থান করে।

কএকজন রাখাল গোরু বাঁধিতে লাগিল, আর কএকজন গোয়ালঘরের বেড়া হইতে

শুষ্ক গোবর-চাপড়া খুলিয়া আনিয়া মুগুর দিয়া গুঁড়া করিতে লাগিল ও আগুনের এলে বা পাত্রে সাজাইয়া রাখিল, রাত্রে উহাতে আগুণ তুলিয়া রাখিয়া দিবে। যে গোবর-চাপ্ড়ার কথা বলিলাম তাহা পল্লীগ্রাম বাসীদিগের একটি নিত্য প্রয়োজনীয় অপ্রত্যাশী সুহৃদ। পাড়াগাঁয়ে সর্ব্বদা সহরের ন্যায় বাজারে-খড়ি পাওয়া যায় না ও বৃষ্টি বাদ্লার দিনে ভিজা খড়িও জ্বলে না তজ্জন্যই তাহারা বাড়ীর গোরুর অযত্ন সুলভ গোবর গুলি ঘর নিকাইয়া অবশিষ্টাংশ ঘরের বেড়ার স্থানেং লাগাইয়া রাখে। সেই শুষ্ক গোবরখণ্ডগুলি প্রজ্বলিত কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

ঘরে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল; সারাদিন দিনমণি গগনে গগনে শুভ্রভাতি বিতরণ করিয়া, দিঙ্মণ্ডলে কার্য্যজীবন সঞ্চারিত করিয়া, নর নারীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অপসারিত হইতেছে; উপবনের শিরে শিরে কিরণ প্রতিভাসিত হইতেছে; পশ্চিম গগন মৃদুরেখা কণকপ্রভা স্ব-শিরে গ্রহণ করিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইতেছে; সেই শিরিষকোমল বিচিত্র গগণের খণ্ডং মেঘস্তর ধরিয়া ক্লান্ত সূর্য্যদেব বিশ্রামভবনে গমন করিতেছেন; বারিদান্তর হইতে সহস্রকর বিস্তার করিয়া বিপুল বিশ্বের নিকট বিদায় চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে বিরামদায়িনী সন্ধ্যা আসিয়া ঘরে ঘরে দিবাকরের নির্ব্বিঘ্ন-গমন বিজ্ঞাপিত করিতেছে; ঘরে ঘরে দিনমণির গৌরবালোক স্মরণীয় করিবার জন্য কুললনাগণ প্রদীপ জ্বালিতেছে। কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ীতেও ঘরে ঘরে সান্ধ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্রের অনতিবিখ্যাত প্রতিপত্তি ছিল। কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত প্রতিবেশীগণ তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া পরিচিত লোকদিগের ও নিজের কার্য্যাদির আলোচনা আরম্ভ করিল। ক্রমে রজনী ঘনীভূত হইতেই সকলেই আপন আপন বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল। তখন কৃষ্ণচন্দ্র চাকরদিগকে ডাকিয়া সারাদিনের কার্য্য নির্ব্বাহবৃত্তান্ত অবগত হইলেন ও আগামীদিনের কার্য্যাদির সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আহারে গমন করিলেন। ক্রমে সকলের আহারাদি শেষ হইলে নিদ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিল।

প্রত্যূষে গার্সী। ছেলেরা প্রভাতের অপেক্ষায় একবার বিছানায় উঠিতেছে ও আরবার বসিতেছে, কিছুতেই প্রভাত আসেনা; অন্তরে কল্পিত বিষয়াদির গুরু আলোচনা ভারে নিদ্রাও হইতেছেনা। অতিকষ্টে সামান্য নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত হইল। সকলে মিলিয়া বড় বৌকে ডাকিয়া আনিয়া গার্সী করিতে বসিল ও সন্তর্পণে পার্শ্বস্থিত বাড়ীর উদ্দেশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে উহাদের আগেই আমরা গার্সী করিব। পাটখড়িতে আগুণ লাগাইয়া সংগৃহীত দ্রব্যাদি "জাগ, জাগ, জাগ, যে কাজে লাগাই সেই কাজেই লাগ" বলিয়া বারবার উত্তপ্ত করিল। যে ছেলেরা তামাক স্পর্শ করিতেও তিরস্কৃত হইয়াছে; আজ তাহারাই পাটখড়িতে অগ্নিসংযোগে তিরস্কারক দিগের সম্মুখে নাচিয়া ২ ধূমপান করিতে লাগিল। আজি যে রূপ স্ত্রী পুত্রের স্বাধীনতা, বাঙ্গালী বিশেষতঃ হিন্দু-জীবনে বোধ হয় এত নাই।

আশ্রিত-বৎসলা বড় বৌ তখন সেই আগুণে উত্তপ্ত করিয়া কজ্জলাধার হইতে কজ্জল লইয়া উপযাচকদিগের চক্ষে লেপিয়া দিলেন। ছেলেদের দল কুলাতে পাটখড়িদ্বারা আঘাত করিয়া পাড়াতে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সারি সারি দাঁড়াইয়া দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিল ও সমস্বরে উত্তেজিত বাক্যে—এবাড়ীর মশা মাছি ঐ বাড়ী যা—এই বলিয়া তন্দ্রাভিভূত প্রভাত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

তখন অন্য বাড়ীর ছেলেরাও ঘরের কোণ, খাটের নীচে, ভস্মের ঢিপি, মাটির ঘর প্রভৃতি সচরাচর মানবের অগন্তব্য স্থান হইতে মাকড়শা, মশা, ছারপোকা ইত্যাদির নেপথ্যে তাড়না করিয়া বলিল—এ বাড়ীর মশা মাছি ঐ বাড়ী যা। যাহাদের দলপুষ্ট তাহারাই জিতিল।

তৎপরে প্রাতঃকালে সেই লতাগুল্মাদি সর্ব্বাগ্রে গোরুকে খাইতে দিল ও বাড়ীতে যত ফলোৎপাদক গাছ আছে তাহার গায়ে প্রচুর ফলশালী হইবার আশায় বিচুলী বাঁধিয়া দিল। দগ্ধ পাটখড়ি ভস্ম কাঁটাইয়া ফেলিবার সঙ্গে এ বছরের গাসী উৎসব অন্তর্হিত হইল।

বড় বৌ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ জয়রাম মজুমদারের সংসারটি নিতান্তই সাধারণ গোছের ছিল। ধর্ম্মালোচনা, সামাজিক বৈঠক, ধান চালের দর দস্তর এবং দৈনন্দিন নানারকম হুজুক লইয়া চাঁদপুরের আর সকল লোক কাজ করিবার তিল মাত্র অবসর পাইত না; কিন্তু জয়রাম মজুমদার কোন দিন সে সকল আন্দোলনে যোগ দিতেন না; নটে শাকের জমী হইতে ঘাস গুলি নিড়াইয়া ফেলা, বেগুনের চারা গুলির গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে জলসেক করা প্রভৃতি গার্হস্থ্য কার্য্যে তাঁহার সকাল বেলাটা অতিবাহিত হইত, মধ্যাহ্নে স্নান, আহ্নিক পূজা এবং তদনন্তর আহারান্তে কিঞ্চিৎ নিদ্রার আয়োজন হইত, তাহার পর অপরাহ্ণে বহুকালের পুরাতন ময়নাকাঠের তৈলপক্ক গাঁট বিশিষ্ট লাঠি খানি হাতে লইয়া গ্রাম প্রান্তবর্ত্তী বাগানে একবার বেড়াইতে যাইতেন, সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করানো, কাঁঠাল গাছে 'ওম' বাঁধিয়া দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ের তদারক শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ী আসিয়া হাঁকছাড়িতেন "পকা এক কল্‌কে তামাক দেরে"—তাহার অল্প পরেই তাঁহার ছোটছেলে পরেশনাথ সন্ধ্যা ভোজন শেষ করিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া বসিত, তিনি তাহাকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পোন, চানক্যের শ্লোক এবং তাঁহার উর্দ্ধতন সাত পুরুষের নাম মুখস্ত করাইতেন।

চাঁদপুরে একটা মাইনর স্কুল ছিল। পরেশ এই স্কুলে পড়িত, অতিঅল্পবয়সে মাতৃহীন হইয়া, এবং গৃহে স্ত্রীলোকের সংস্রব অধিক না থাকাতে সে রমণী হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহের আস্বাদন অনুভব করিবার কোন অবসর পায় নাই; গৃহে একদূর সম্পর্কীয়া পিসি ছিলেন, অতিবৃদ্ধা এবং অত্যন্ত খিটখিটে; বালক তাঁহার নিকট কোন দিনই স্নেহের আবদার করে নাই এবং করিলেও যে সেই বৃদ্ধার অবসন্ন শুষ্ক হৃদয় হইতে উপযুক্ত পরিমাণে স্নেহরস আকর্ষণ করা যাইত একথা সহসা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাহার পিতা তাহার এ অভাব মোচন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার পিতামাতা উভয়ই ছিলেন; কোন দিন তাহার পীড়া হইলে সেই বৃদ্ধ পিতা সমস্ত কাজ ফেলিয়া তাহার সেবা করিতেন, এবং তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিয়া তাহার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া নতনেত্রে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহিত করিতেন, রাত্রে গরমে ঘুমের ব্যাঘাত হইলে, যতক্ষণ তাহার ঘুম না আসিত, ততক্ষণ তাহাকে পাখা করিতেন, এবং পক্ষীমাতা যেমন তাহার সুকোমল, উচ্চ, নিবিড় স্নেহপূর্ণ পক্ষাবরণে তাহার ক্ষুদ্র ডিম্বটিকে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তোলে জয়রাম তেমনি তাহার বন্ধুবান্ধব বিরহিত, বান্ধব বর্জ্জিত একক জীবনের সমস্ত উত্তাপ দিয়া তাঁহার বিজন পরিবারের মধ্যে সেই মাতৃহীন শিশুকে অতি সাবধানে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসরের মধ্যে পরেশ চাঁদপুরের স্কুল হইতে 'মাইনর' পাশ করিল, পরেশের দাদা যোগেশ তাহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বহরমপুরে লইয়া চলিলেন।

যোগেশ বহরমপুরে এক জমীদারের নায়েবী করিতেন, এই উপলক্ষে তাঁহাকে বারোমাস এখানে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি এখানে সপরিবারেই বাস করিতেন, যোগেশ এপর্য্যন্ত অপুত্রক, পুত্রাদি হইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনাও ছিল না; বাসায় স্ত্রী ও একটি ঝি ভিন্ন অন্য পরিবার থাকিত না! তের বৎসর বয়সের সময় পরেশ যখন হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য যোগেশের বাসায় উপস্থিত হইল, তখন এই নাবালক দেবরটিকে দেখিয়া যোগেশের স্ত্রী শ্যামসুন্দরীর নিরপত্য মাতৃ হৃদয়ে অনন্যভূতপূর্ব্ব পুত্রস্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এই পরিবারে শান্তির কোন অভাব ছিল না, কিন্তু পুত্র কন্যার অভাব প্রায়ই অবসর কালে যোগেশের পত্নী শ্যামাসুন্দরীকে পীড়িত করিয়া তুলিত। শ্যামাসুন্দরী গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া দেখিতেন ছোট ছোট মেয়েরা জলপূর্ণ পিতলের ঠিলি কক্ষে লইয়া গঙ্গার ঘাট হইতে বাড়ী যাইতেছে, অপরাহ্নে গৃহকার্য্য সারিতে সারিতে দৈবাৎ কক্ষস্থ ক্ষুদ্র বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া রাজপথের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইতেন ছোট ছোট ছেলেরা জামাজুতায় সজ্জিত হইয়া মহা কলরবে বই হাতে বাড়ীরদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, মিসনরী সাহেবদের বড় বড় গাড়ীতে 'মেয়ে ইস্কুলের' মেয়েরা, মাথা নাড়িয়া, কেহ চঞ্চল হাত দুখানি ঘুরাইয়া, কেহ বা বেণী দুলাইয়া তাহাদের অত্যন্ত প্রীতিকর তুচ্ছ কথার আলোচনা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে, এমন কি দুই একজন ভিখারিণী ছিন্ন,

শতত়ালি বিশিষ্ট, ধুলি ধূসরিত বস্ত্র খণ্ডে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ পূর্ব্বক পরিপূর্ণ ক্ষুধার অনুপযুক্ত মুষ্টি পরিমিত চাউল অঞ্চলে সঞ্চয় করিয়া, আরো কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লাভের আশায় একটি ছেলেকে ক্রোড়ে লইয়াও একটি অপরিষ্কার নগ্ন বালকের হাত ধরিয়া একদ্বার হইতে দ্বারান্তরে উপস্থিত হইতেছে, দেখিয়া সেই প্রৌঢ়া গৃহিণীর হৃদয় পুত্র কন্যার অভাব অনুভব করিয়া বড় চঞ্চল হইয়া উঠিত।

কিন্তু পরেশকে নিকটে পাইয়া শ্যামাসুন্দরীর হৃদয় অনেকটা শান্ত হইয়াছিল; যোগেশ জমীদারী সেরেস্তার কাজ করিতেন, কাজেই কোন দিনই সকাল করিয়া তাঁহার আহারাদি করা ঘটিত না, শ্যামা সুন্দরী সকালে গঙ্গাস্নান সারিয়া আসিয়া পরেশের জন্য তাড়াতাড়ী সিদ্ধপক ভাত রাঁধিয়া দিতেন, সকল দিন মাছ জুটিয়া উঠিত না। তবে যেদিন সকালে জেলেনিরা ঝুড়িতে করিয়া পুটি ট্যাংরা বা চিংড়ি মাছ বিক্রয় করিতে আসিত সেইদিন এক পয়সার মাছ কিনিয়া তিনি পরেশকে ঝোল রাঁধিয়া দিতেন; আহারের পর পিরানটা গায়ে দিয়া, পাড়ওয়ালা চাদর খানি কাঁধে ফেলিয়া ছাতা জুতাও পুস্তকে সজ্জিত হইয়া পরেশ যখন স্কুলে যাইত, তখন শ্যামা সুন্দরী নিশ্চিন্ত মনে সংসারের অন্যান্য কাজে হাত দিতেন।

যোগেশের সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না, অধিক ব্যয়ে পরেশের জন্য জল খাবার বন্দোবস্ত করা সাধ্যাতীত বলিয়া শ্যামাসুন্দরী তাহার জন্য কয়েক খানি রুটি গড়িয়া রাখিতেন, চারিটার পর ইস্কুল হইতে ফিরিয়া পরেশ কোন দিন ডাল তরকারী দিয়া কোন দিন বা একটু দুধচিনি দিয়া সেই রুটিতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত, তাহার পর খেলা করিতে যাইত।

সন্ধ্যার পরই শ্যামাসুন্দরীর রন্ধন কার্য্য শেষ হইত, যোগেশ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জমীদারের কাছারীতে কাজ করিতেন। গৃহকার্য্য সমাধা হইলে শ্যামাসুন্দরী তাহার ক্ষুদ্র দেবরটির সম্মুখে বসিয়া তাহার পড়ামুখস্ত শুনিতেন, ম্লান মৃৎ প্রদীপের আলোকে রঞ্জিত বালকের কোমল সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া তাঁহার হৃদয় মাতৃভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, এবং তাহা প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যকতা না থাকিলেও শ্যামাসুন্দরীর স্নেহ প্রদীপ্ত চক্ষুদ্বয় সেই সুগভীর ভাব গোপন করিতে পারিত না।

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, পরেশনাথ ক্রমে বহরমপুর কালেজ হইতে এণ্ট্রেন্স ও এল্ এ পরীক্ষা পাশ করিল; তাহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া জয়রাম ও যোগেশ পিতাপুত্রে মিলিয়া তাহার জন্য একটি সুন্দরী কনের সন্ধানে মন দিলেন।

রাম নগরের বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলীর সঙ্গে জয়রামের বন্ধুত্ব ছিল, বৈকুণ্ঠের ভগিনী শ্যামা সুন্দরীর জ্ঞাতি সম্পর্কে মাসী হইতেন, মাঘমাসে চতুর্থীস্নান উপলক্ষে তিনি বহরমপুরে আসিয়া দেখিলেন পরেশ ছেলেটি বেশ, অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে, তাই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে পরেশের বিবাহ দিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, শ্যামাসুন্দরী বিবাহের প্রস্তাব

শুনিয়া বলিলেন "আমি কি বলবো, আমার শ্বশুর আছেন, তোমাদের জামাই আছেন তাঁদের কি মত হবে তাতো জানিনে, তাঁদের মত হলে আর আপত্তি কি? নেত্যকালী ত আর মেয়ে মন্দ নয়, আমাদের ঘরও কিছু পাঁচবৌ'র ঘর কন্না নয়, বিয়ে হ'লে কোনরকম খিচ্‌খিচি বাধবার ভয় নেই। ছেলের ত মা নেই, তবে আমাকে দিয়ে তার মার কাজ যতটা হয় তা কচ্চি। তা মাসীমা, বিয়ে হ'লে আমি কি নেত্যকে নিয়ে ঘর করতে পারবো!"—মাসীমা বলিলেন "তা আর পারবিনে? লোকে পর নিয়ে ঘর কন্না কচ্চে আর নেত্য তো ঘরের মেয়ে, তুই মা একবার যোগেশকে বলে বিয়ের ঠিকঠিকানাটা ক'রে দে, দাদার আমার মেয়ে নিয়ে বড় ভাবনা হয়েছে, এগার বছর উৎরে গেছে, এত বড় সেয়ানা মেয়ে নিয়ে কি আর মুখে ভাত রোচে?"

রাত্রে আহারাদির পর গৃহস্থালী সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া শ্যামাসুন্দরী স্বামীর নিকট মাসীর 'আরজ'টা পেস করিলেন, যোগেশ বলিলেন "অনেক যায়গা হতে বের কথা আস্‌ছে বটে কিন্তু এবিষয়ে আমি এখন ঠিক জবাব দিতে পারিনে, আমাদের এখন যে রকম সাংসারিক অবস্থা তা তুমি ত সব জান, যেখানে কিছু পাওয়া থোয়া যাবে সেখানেই কাজ করবার ইচ্ছে আছে, গাঙ্গুলী মশায় কি তেমন দিতে থুতে পারবেন? বিশেষ বাবার মতামত ভিন্ন কোন কাজই হবে না, আর মেয়েটিকেও ত দেখা দরকার, তুমি দেখেছ কি?"

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন "দেখেছি, তখন সে ছোট ছিল, রঙ্গটা কিছু ময়লা বটে কিন্তু মুখের গড়ন মন্দ নয়, বৌত আর হাটে বিক্রী কর্ত্তে হবে না, আমি যে এত কালো আমাকে ত তুমি ফেলে দেওনি। আমরা গেরস্ত মানুষ, বড় লোকের মেয়ে আনলেও কিছু সংসার চলবে না মাঝে হতে ছেলেটি পর হয়ে যাবে, আরো দেখ মেয়েটি কিছু আমাদের পর নয়, পরের চেয়ে সে আমাদের দুঃখ দরদ বেশী বুঝবে, আমাদের ত ছেলেপিলে কিছু হলো না, ঠাকুরপোই আমাদের সকল আশা ভরসা; কোন্ পরের মেয়ে আনতে যাব, বৌ যদি মন্দ হয় ত আমাদের পোড়ানীর শেষ থাকবে না।"

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন "বড্ড বক্তৃতা কচ্চ যে, বায়না কত পেলে!—আপনার লোক পর হলে কিন্তু বড়ই বিষম হয়, যাহোক গাঙ্গুলী মশায় গহনার কথাটা কি বলেন তা আগে জানা যাক্, তাছাড়া বাবার কি মত তা নাজেনে ত কোন কথাই হ'তে পারে না।"

অগত্যা সে দিনের মত মকর্দ্দমা মুলতুবী থাকিল, শ্যামাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে মাসীমাকে বলিলেন "মাসীমা, আজ কিছু হুকুম হলোনা, তবে মকর্দ্দমা জিতবো তাতে আর সন্দেহ নেই, গহনা পত্র ভাল দিতে পারবেত, যাও গহনা গড়াতে দেও গে।"

শ্যামাসুন্দরীর বিশ্বাস হইল তিনি মকর্দ্দমায় জিতিবেন, কিন্তু একদিন তিনি বুঝিতে পারিবেন, ওকালতনামা লওয়াই তাঁহার পক্ষে ভয়ানক ঠকা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উপরি উপরি দুইবার পূজার সময় যোগেশচন্দ্র বাড়ী যান নাই বলিয়া তাঁহার পিতা কিছু দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন "আমি যে আর বেশী দিন বাঁচিব সে আশা নাই, পূজার সময় বিদেশ হইতে সকলেই বাড়ী আসে, তুমি চিরদিন বিদেশে থাক আমার ইহা দেখিতে ভাল লাগেনা, এবার পূজার সময় বৌমাকে লইয়া অবশ্য অবশ্য বাড়ী আসিবে, পরেশের বিবাহ সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে অনেক মৌখিক পরামর্শ আছে।"

তদনুসারে যোগেশ স্ত্রী ও ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন, বৃদ্ধ অনেকদিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পূজা শেষ হইয়া গেলে একদিন রামনগরের বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলী চাঁদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়রাম মজুমদারের ইচ্ছা ছিল কিছু পাওয়া যাক না যাক মেয়েটি যাহাতে ফুটফুটে সুন্দরী হয় এমন দেখিয়া পরেশের বিবাহ দিবেন; এদিকে উঁচু ঘরে বিবাহ করিয়া কেবল খানিকটে কৌলিক সম্মান ছাড়া আর কিছু লাভ হয় নাই, তাই যোগেশের ইচ্ছা যেখানে কিছু পাওয়া যায় এমন ঘরে ভ্রাতার বিবাহ দিবেন।

যোগেশ বলিলেন "গাঙ্গুলী মহাশয়ের মেয়ে সুন্দরী নয়, আর শুনিয়াছি তিনি বিশেষ কিছু দিতে থুতে পারবেন না, আজ কাল বামন কায়েতের মধ্যে পাওনা গণ্ডাটা ভাল করে দেখে নিয়ে ছেলের বিবাহ দেওয়ার নিয়ম হয়েছে।"

জয়রাম উত্তর করিলেন "তা যাক্‌গে দেওয়া থোয়ার কথা বাপু ছেড়ে দাও, আমি ত ছেলে বেচতে বসিনি, আজ কাল ঐ রকম কসাইগিরি বামন কায়েতের ঘরে ঢুকেছে বটে, তা পরের দু তোলা নিয়ে কি কখন গা ঢাকা পড়ে। সৎবংশ আর মেয়েটি ভাল হলে আমি আর কিছু দেখা কর্ত্তব্য মনে করিনে। আসলে মেয়েটি সুন্দরী না হ'লে আমার মন সরে না, তুমি গাঙ্গুলী মশায়ের মেয়েটি দেখেছ কি?"

"না, শুনেছি রঙ্গটা তেমন ফরসা নয়, তবে গড়ন ভাল।"

জয়রাম বলিলেন "তাহলে এক কাজ কর্ত্তে হচ্ছে, গাঙ্গুলী মশায় যখন নিজে এসেছেন তখন তাঁকে শুধু ফিরান ভাল নয়, দেখেশুনে সকল কাজ করা ভাল, তুমি রামনগরে গিয়ে মেয়েটিকে একবার দেখে এসো।"

যোগেশ মেয়ে দেখিতে গেল। মেয়ে দেখিয়া যোগেশের তেমন পছন্দ হইল না, কিন্তু কেমন করিয়া কাজ আদায় করিতে হয় গাঙ্গুলী মহাশয়ের স্ত্রী তাহা জানিতেন; তিনি যোগেশকে সুমিষ্ট মিছরীর পানা ও ইক্ষুখণ্ডের সঙ্গে এতই অধিক পরিমাণে মিষ্ট কথায় ভিজাইয়া তুলিলেন যে যোগেশ এ বিবাহে অমত প্রকাশ করিতে পারিলেন না, সাধারণ রকমের গহনাপত্রের আশা পাইয়া যোগেশ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, পিতাকে সংক্ষেপে বলিলেন "মেয়েটি তেমন ভাল নয়, তবে গাঙ্গুলী মশায়রা লোক খুব ভাল, তাঁহাদের

ব্যবহারে আমি কিছুতে অমত প্রকাশ করে আস্‌তে পারি নি।" পিতা বলিলেন "তবে আর ওখানে কাজ নেই, আমার এ বুড়বয়সে একটি সুন্দরী ছেলেমানুষ পুত্রবধূ ঘরে আন্‌তেই আমারইচ্ছা, অন্যত্র, দেখ।"

এদিকে বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলী যথাকালে যখন শুনিতে পাইলেন যে বৃদ্ধ জয়রাম মজুমদার কিছুতেই তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে রাজী নহেন তখন তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন, মেয়ের বয়স ক্রমে বার পার হইয়া যায়, অথচ একটিও ভাল ছেলে হাতে নাই। নিরুপায় হইয়া শ্যামাসুন্দরীর মাসী শ্যামাসুন্দরীকে লিখিলেন "এ শঙ্কটে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, আমরা জানি এ বিবাহে যোগেশের কোন আপত্তি নাই, তোমার শ্বশুরের মত হইলেই হয়, যাহাতে তাঁহার মত হয় তোমাকে তাহা করিতে হইবে।"

শ্যামাসুন্দরী উত্তরে লিখিলেন "গুরুজনের কাছে আমার কোন কথা জিদ করিয়া বলা ভাল দেখায় না, আপনার দাদা যদি আমার শ্বশুর মহাশয়কে বিশেষ করিয়া ধরেন তাহা হইলে ফল হইতে পারে।"

তাহাই হইল। কন্যাদায়গ্রস্ত বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলী আবার চাঁদপুরে আসিয়া জয়রামকে ধরিয়া বসিলেন। জয়রাম বলিলেন "এখন আমি ছেলের বিবাহ দিব না, বিশেষতঃ আপনার কন্যাটি তেমন সুরূপা নহে।" তখন বৈকুণ্ঠ আপনার পৈতা দিয়া বৃদ্ধের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন "আমার এ কন্যাদায় আপনাকে উদ্ধার করিতেই হইবে, আমার আর উপায় নাই, আপনিই আমার পালটা ঘর, আপনি যদি মুখ তুলিয়া না চান, তাহা হইলে আমার জাতি রক্ষা হওয়া কঠিন।" জয়রাম বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলীর আগ্রহাতিশয্যে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, 'অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ দিব' কথা দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে আর শ্যামাসুন্দরীর বহরমপুর যাওয়া হইল না। তিনি চাঁদপুরে থাকিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বিবাহের পূর্ব্ব দিন রাত্রে বর ও বরযাত্রীদের লইয়া যোগেশ রামনগরে রওনা হইলেন, পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ছাঁলনা তলায় শ্যামাসুন্দরী বরবেশী দেবরকে বরণ করিলেন, তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল; তাঁহার মনে হইল, আজ তাঁহার শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিলে এই শুভদিনে তিনি কত আনন্দ করিতেন, ষোল বৎসর পূর্ব্বে যে দিন ক্ষুদ্র শিশুটিকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক পুণ্যবতী সাধ্বী স্বামীপুত্র সকলকে রাখিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া যান সেদিনের সকল কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র দেবরটিকে যে স্নেহ যত্নে তিনি এতবড় করিয়া তুলিয়াছেন এবং আজ তাহার বিবাহ দিয়া একটি নূতন সংসারে প্রতিষ্ঠা করিতে বসিয়াছেন ইহা মনে করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে একবার বিষাদ একবার আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তাহার পর যখন তিনি পরেশের মাতৃস্থানীয় হইয়া লোহিতচেলিপরিহিত, দর্পণহস্ত, তরুণ যুবকের মুখে স্ত্রী আচার অনুসারে স্তনদান করিলেন, তখন সেই সন্তানহীনা, স্তনদুগ্ধ

বিরহিতা রমণী তাঁহার গোপন হৃদয়ের অন্তঃস্তলে সুপ্ত মাতৃস্নেহের একটি উদ্বেলিত অকুণ্ঠিত অপার মহিমা সুস্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন; অনন্তর শ্যামাসুন্দরী সন্ধ্যার কম্পিত দীপালোক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া পরেশের লজ্জারক্তিম চন্দনচর্চ্চিত সুগৌর মুখখানির উপর দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া মৃদুহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর পো, কোথা যাচ্ছ?—ঠাকুর পো তখন ওষ্ঠ প্রান্তে কিঞ্চিৎ হাস্যরসের অবতারণাপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক প্রৌঢ়ারমণীর শিক্ষামত বলিলেন "তোমার জন্যে দাসী আন্‌তে যাচ্ছি, সেই স্থানে রহস্যনিপুণা 'পাড়ার বিধবা বামন ঠান্‌দি দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি বলিলেন "যা আর মিছে কথা বলিস্‌নে, বল তোমার মনিব আনতে যাচ্ছি, বৌ ঘরে এসে যখন দুদিন পরে নিজের কড়া গণ্ডা চুলচিরে বুঝে নেবে তখন কোথায় থাক্‌বে তোর দাদা, আর কোথায় বা থাকবে বড় বৌ, কলির মেয়েদের কি আর বিশ্বেস আছে?"—

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন "ওকথা বলো না ঠাকরুণ, পরেশ আমার তেমন দেওর নয় হাতে করে আমি ওকে মানুষ কল্লাম, আর দুদিন পরে ওর বৌ এসে আমাকে ঠেলে ফেলবে?—তা ফেলে ফেল্‌বে আমি কিছু পর হব না।"

হাস্যরসটা এই প্রকার করুণরসে পর্য্যবসিত হইলে শঙ্খনাদ ও হুলুধ্বনির মধ্যে বিবাহ যাত্রীগণ রওনা হইয়া গেল, এবং তিন দিন পরে পরেশ নববধূ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; শ্যামাসুন্দরী পূর্ণউৎসাহে শাশুড়ীপ্রদত্ত একজোড়া কঙ্কণ দিয়া নববধূর মুখ দেখিলেন, পল্লীবাসিনী কোন কোন হিতৈষিণী রমণী শ্যামাসুন্দরীর এই সংসারজ্ঞানবর্জ্জিত আচরণ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, কেহ সুদীর্ঘ নাসিকা প্রচুর পরিমাণে আকুঞ্চিত করিয়া, বিজ্ঞতার সহিত বলিল, "বউ ক'ল্লে কি?—তোমার পাঁচ খান নাই দশ খান নাই· শাশুড়ীর যে দু'তোলা ছিল তা' ছোট জাকেই দিয়ে ফেল্লে, এর পর সময় অসময় আছে ত? বুঝে সুজে কাজ না ক'ল্লে পরে পস্তাতে হয়, ঐ যে কথায় আছে—'গরীবের কথা বাসী হ'লে ফলে,—পরে বুঝতে পারবে, তোমার একটু যদি বুদ্ধি থাকে!" কোন বিষয়জ্ঞান-সম্পন্না প্রৌঢ়া গৃহিণী দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা চিবুক স্পর্শ পূর্ব্বক গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিলেন "বড় বৌর আর বুদ্ধি হয়েছে?"—সমবেত রমণীমণ্ডলীর এই সকল মন্তব্য শুনিয়া প্রসন্নমুখে বিশ্বস্তভাবে শ্যামাসুন্দরী উত্তর করিলেন "হাঁা দেখ রাঙ্গা দিদি, মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা'হ'লে একখান গহনা দিয়েত বৌর মুখ দেখ্‌তেন, তিনি আজ নেই, আজ তাঁর বৌকে নিয়ে কে সাধ আহ্লাদ করবে? মা এই কাঁকন দিয়ে বিয়ের সময় আমার মুখ দেখেছিলেন, আমারত ছেলে পিলে নাই, পরেশকেই আমি ছেলের মত মানুষ করেছি, বেটার বৌর বদলে না হয় পরেশের বৌর মুখই এই কাঁকন জোড়া দিয়ে দেখলাম; বৌ বুঝবে যে, আমি শাশুরীর একটা জিনিষও পেলেম। স্বর্গ হ'তে আজ যদি মা আমার এসব দেখ্‌তে পান তবে তাঁ'র আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হ'বে না, আর আমার ভাবনাই বা কি, রাঙ্গা দিদি, যে কটা দিন বাঁচব—এই রকমেই চল্‌বে।"

নববধূ যে কয় দিন শ্বশুর বাড়ী থাকিল শ্যামাসুন্দরী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন। সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নান করিতে যাওয়া গামছা দিয়া চুল গুলি মুছাইয়া দেওয়া, সকালে সকালে জল পানের আয়োজন করা, বৈকালে চুল বাঁধা,—কোন কার্য্যেই তাঁহার ক্রটী লক্ষিত হইল না। এমন কি নূতন বৌর বিছানাটি পর্য্যন্ত পাতিয়া দিয়া শ্যামাসুন্দরী দাসীর মত তাহার সেবা করিতে লাগিলেন; দেখিয়া একদিন পরেশ পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—"বড় বৌ, তুমি যে দেখ্‌ছি দাসীগিরির চেয়েও বেশী বাড়িয়ে তুলেছ, আমি আন্‌লাম তোমার দাসী, তুমি কিনা নিজেই তা'র দাসীপনাতে বাহাল হলে।"

শ্যামাসুন্দরী উদার হাস্যে উত্তর করিলেন "পরের মেয়ে ঘরে এনেছ ওর মনের ভাব কি তা' তোমারা বুঝ্‌বে না, কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারব, দশ বছর বয়সের সময় আমি প্রথম তোমাদের সংসারে আসি, সে সময় সঙ্গের এক মাগী দাসী ছাড়া আর যদি একখানাও চেনা মুখ নজরে পড়ত! কিন্তু আমার শাশুরী কত স্নেহ মমতা ঢেলে দু' দিনের মধ্যে আমাকে আপনার করে তুলেছিলেন তা' আমিই জানি, তাঁর বাঁপায়ের কড়ে আঙ্গুলেরও যোগ্য হ'তে পারিনি; ভাল না বাস্‌লে যত্ন না কর্‌লে কি কখন পরের মেয়েকে আপন করা যায়? তোমরা পুরুষ, তোমাদের কি?—ওকে নিয়ে আমাকেই চিরদিন ঘরকন্না কর্‌তে হবে।"

পরেশ কৌতুককটাক্ষপাত পূর্ব্বক বলিলেন—"ওঃ বুঝেছি, ঘুষ দিয়ে বৌকে হাত কর্ত্তে চাচ্ছ, শেষ রক্ষা হ'লে ভাল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পৌষমাস লক্ষ্মী মাস। পৌষমাসে বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে নাই, তাই শ্যামাসুন্দরী পৌষমাসটা চাঁদপুরে কাটাইয়া মাঘ মাসে বহরমপুরে স্বামীর কাছে যাত্রা করিলেন, পরেশ বহরমপুর কালেজে বি এ পড়িতে লাগিলেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম বেশ চলিতেছিল এমন সময় এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনাতে সমস্ত গোলমাল হইয়া গেল।

জয়রাম মজুমদারের অনেক বয়স হইয়াছিল, চৈত্রমাসে হঠাৎ জ্বরবিকারে তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনিই গৃহস্থালীর একমাত্র রক্ষক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সংসার আঁধার হইয়া গেল। যতদিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাঁহার গৃহে কোথাও তিলমাত্র বিশৃঙ্খলা ছিল না, বিষয় আসয় যে কিছু ছিল তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। গৃহ প্রাঙ্গন ঘাসে ভরিয়া গেল, বেগুণের ক্ষেত কাঁটাগাছে পূর্ণ হইয়া উঠিল, বাগানের মালীরা বাগানের কাঁটালের ইচড় গুলি পাড়িয়া তরকারী খাইতে লাগিল, কতক বা পাঁচজনে চুরী করিল এবং জোতে জমা গুলি আত্মীয়েরা দখল করিয়া ভোগ করিতে লাগিল।

বাড়ীঘর নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া যোগেশের আর বিদেশে থাকা পোষাইল না, বিশেষতঃ

জমীদারের সঙ্গে এদিকে কিছু দিন হইতে তাঁহার মনান্তর চলিতেছিল, তিনি দেখিলেন প্রাণপণ করিয়া খাটিয়াও তিনি প্রভুর মন পান না, আর্থিক অবস্থাও খুব সচ্ছল নহে, দেশে যে জোত জমা পড়িয়া আছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া চাষ বাস করাইতে পারিলে স্বাধীন ভাবে শাকান্ন খাইয়াও জীবন কাটাইতে পারা যায়, কাজেই তিনি কর্ম্মে জবাব দিয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন, পরেশ বহরমপুরে এক ভদ্র লোকের বাড়ী প্রাইভেট টিউটারী করিয়া বি এ পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু দুইবার উপর্য্যুপরি বি এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া শেষকালে কমিটী পরীক্ষা দিলেন, এবং তাহাতে পাশ করিয়া উকীল হইয়া গ্রামে আসিলেন। চাঁদপুরে এক মুনসেফীর চৌকী ছিল, সেখানেই তিনি ওকালতি আরম্ভ করিলেন।

চাঁদপুরের মুনসেফী আদালতে সে সময় একজনও ভাল উকীল ছিল না। সকলেই প্রায় সেকেলে ধরণের এবং সকলেরই বক্তৃতাশক্তি ও যুক্তি তর্কের দৌড় এক রকমের ছিল, তাঁহারা পার্শি বয়েৎ আওড়াইয়া মক্কেলদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, কিন্তু প্রকৃত আইনের কোন ধার ধারিতেন না। কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলেই তাঁহারা সামলা মাথায় দিয়া এজলাসে দাঁড়াইয়া বলিতেন "হুজুর অতি বিচক্ষণ বিচারক, বাদী প্রবল পক্ষ, অন্যায় পূর্ব্বক আমার মক্কেল কে হয়রাণ করিবার জন্য যে তিনি মিথ্যা মকদ্দমা রুজু করিয়াছেন তাহা প্রতিবাদীর বর্ণনাপত্র পাঠ করিলেই হুজুরের বিশ্বাস হইবে, উচিত বিচারে খরচ সমেত মকদ্দমা ডিস্‌মিস করিতে আজ্ঞা হয়।"—একবার জেলা আদালত হইতে একজন বড় উকীল চাঁদপুরে একটা মকর্দ্দমা তদারক করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া এইরূপ একজন সেকেলে নবীন উকিল বলিয়াছিলেন "হুজুর, বাদীর মকদ্দমা যে মিথ্যা তাহা বাদীর ব্যবহারেই প্রকাশ পাইতেছে, তাই তিনি বড় উকিল আনিয়া হুজুরের চোখে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মিথ্যা দ্বারা সত্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমার মক্কেলের ব্যবহারে কোন রকম প্রবঞ্চকতা নাই,—তিনি এ বুড়ো উকিলের হাতেই কার্য্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। আমি আজ ত্রিশ বৎসর ওকালতি করিতেছি, হুজুরের ন্যায় আইনজ্ঞও প্রশংশিত বিচারক এ চৌকীতে আর একজনও আসেন নাই, বাদীর মৎলব হুজুরের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না, হুজুর "ধর্ম্মাবতার"...ইত্যাদি।

যে আদালতে উকীলের বিদ্যাবুদ্ধি ও আইনজ্ঞান এপ্রকার সেখানে পরেশের ন্যায় বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল আইনজ্ঞ উকীল যে শীঘ্রই পশার করিয়া ফেলিবেন তাহা বলা বাহুল্য। অল্পদিনের মধ্যেই পরেশের পশার হইয়া উঠিল, মক্কেলের দল দিবারাত্রি মধুমক্ষিকার ন্যায় মজুমদার বাড়ীতে গুঞ্জন করিত। এক খানি নূতন টমটমে চড়িয়া চোগা চাপকানে সজ্জিত হইয়া যখন পরেশ কাছারী যাইতেন, তখন দুই পাশের সাধারণ লোক অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত; আদালতে সমস্ত দিন খাটিয়া সন্ধ্যাবেলা পরেশ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে শ্যামাসুন্দরী তাঁহার বাল্যকালের দুগ্ধখাওয়ার পরিচিত বাটিতে এক বাটি দুধ, খানিক মোহন ভোগ, গোটাদুই রসগোল্লা এবং একটি তকতকে কাঁশার গ্লাসে এক গ্লাস জল

আনিয়া পরিশ্রান্ত পরেশের অভ্যর্থনা করিতেন, এবং পরেশের স্ত্রী নৃত্যকালী অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া মেঝেতে বসিয়া পান সাজিতে বসিলে শ্যামাসুন্দরী তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "হ্যাঁ, ছোট বৌ, এতক্ষণে তোমার পান সাজবার সময় হ'লো, ঠাকুরপো জল খেয়ে কতক্ষণ পানের জন্যে বসে থাকবে? সন্ধ্যা হয়েছে প্রদীপটাই বা কখন জ্বাল্‌বে, সন্ধ্যে বাউড়ে গিয়ে প্রদীপ জ্বাললে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে?"—যতক্ষণ পরেশের জল খাওয়া শেষ না হইত শ্যামাসুন্দরী ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেবরের কাছে দাঁড়াইয়া সংসারের কথা, গয়লানী মাগীর দুধে অতিরিক্ত জল দেওয়ার কথা, ছোট বৌর সুবুদ্ধি, প্রভৃতি বিষয়ে নানা প্রকার গল্প বলিতেন। বাল্যকালের দুধখাওয়ার সেই চির পরিচিত বাটিটি ও শ্যামাসুন্দরীর স্নেহসিক্ত উদার মুখ খানি দেখিয়া পরেশের শৈশবজীবনের কথা গুলি সুস্পষ্ট মনে পড়িয়া যাইত, মাতৃহীন শিশুর সেই অসহায় ভাব, শ্যামাসুন্দরীর নিঃস্বার্থ মাতৃ-ব্যবহার, যোগেশের করুণ স্নেহ, অতীত স্মৃতির সহস্র মধুর হিল্লোল, শান্তিময়, আলোকান্ধকারাচ্ছন্ন ধূসর সন্ধ্যায় তাঁহার কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের অবসন্নতা বিদূরিত করিত।

এইরূপে মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, ওকালতি, রিপোর্ট, বন্ধুবান্ধবদের সহিত গল্প ও সঙ্গীতচর্চ্চা এবং রাত্রে স্ত্রীর নিকট বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইল পাঠে ও তাহার সমালোচনায় পরেশের সময় নিরুদ্বেগে কাটিয়া যাইত। সংসারের কোন বিষয় দেখা শুনা করিবার তাহার অবসর ছিল না, সেরূপ কোন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন না; নিজে যে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে সমস্তই দাদার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার উপরই সংসারের সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। যোগেশ সংসারের সকল ভার স্কন্ধে লইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতেন, বড় বৌ শ্যামাসুন্দরী অন্তঃপুরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। প্রতিদিন সকালে স্নান করিয়া আসিয়া, দীর্ঘ কেশপাশ সিক্ত অবস্থাতেই মস্তকের সম্মুখে চূড়াকারে বাঁধিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেন এবং সেখানে কুটনো কোটা বাটনা বাটা হইতে আরম্ভ করিয়া রান্নার সকল কাজ প্রসন্ন মুখে সম্পন্ন করিতেন; নৃত্যকালীকে অনেক সময়ই শ্যামাসুন্দরীর সাহায্যার্থ রান্নাঘরে উপস্থিত হইতে দেখা যাইত, কিন্তু কোন দিন উননের কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় তাঁহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া উঠিত, কোন দিন সখ করিয়া মাগুর মাছ কুটিতে গিয়া নরম হাত খানিতে মাছের কাঁটা বিধাইয়া ছট ফট্ করিত আর শ্যামাসুন্দরী তাহার পরিচর্য্যার জন্য ছুটিয়া আসিতেন। যেদিন পরেশ বলিত "বড় বৌ আজ মাছের ঝোলটা চমৎকার রেঁধেছ"—সে দিন শ্যামাসুন্দরীর মনে আনন্দ ধরিত না, দেবরের উৎসাহ বাক্যে তিনি এতটা আনন্দিত হইতেন যে হেঁসেলের সমস্ত মাছ আনিয়া দেবরের পাতে নিক্ষেপ করিতেন; পরেশ হাসিয়া বলিতেন "দাদাকে দেখছি আজ শুধু ভাত খাওয়াবে, যাহোক তুমিত ভালই রাঁধ, কিন্তু তোমাদের ছোট বৌটিকে একটু আধটুক রান্না শিখিয়ো, যদি কোন কারণে তুমি দুদিন হেঁসেলে যেতে না পার তবে কি আমরা গুষ্টী শুদ্ধ উপোস করে মরবো।—শ্যামাসুন্দরী উত্তর করিতেন "আহা ছেলে মানুষ, এতবড় গেরস্তের হাঁড়ি

ঠেলা কি ওর সাধ্য, তা ওত আর বসে থাকে না, দুধ জ্ব'ল দেওয়া, রুটি তৈরি করা, খোলা জ্বালা এসকল কাজ ঐত করে, বয়েস হ'লে ক্রমে রাঁধতে শিখবে।" পরেশ আহারান্তে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "আর পারবে, অতিরিক্ত আদর দিয়ে তুমিই ওর মাথাটা খেলে।" ছোট বৌ তখন একবাটি মুড়ীর শ্রাদ্ধ করিয়া একমুখ পান চিবাইতে চিবাইতে নেপথ্য হইতে বলিয়া উঠিল "মরণ আর কি? আমি যেন একবারেই রাঁধতে জানিনে, কাল হ'তে তুমি বসে থেক, দিদি, আমি রেঁধে দেবো।" – দিদি বলিলেন, "আচ্ছা যখন আমি ব্যারাম হ'য়ে পড়ে থাকবো, তখন তুই রাঁধিস – যা এখন ঠাকুরপোকে পান দেগে।"

এইরূপ আনন্দ কলহে, স্নেহ সখ্যতায় দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। মজুমদার পরিবারের মত সুখী পরিবার তখন চাঁদপুরে আর একটিও ছিল না; কথা প্রসঙ্গে অনেকেই বলিত "বুড়ো" জয়রাম মজুমদার বড় পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, তাই এমন দুটি রত্ন রেখে যেতে পেরেছেন।" কেহ বলিত "আহা, বুড়ো যদি আর পাঁচটা বছর বাঁচত, ত ছেলের রোজগার খেয়ে যেতে পারতো।" যোগেশ ও পরেশ উভয়ের "তুলনা করিতে হইলে লোকে বলিত "কলিতে এমন ভাই হয় না, যেন রাম লক্ষ্মণ!" "বড় বৌ টির মত এমন সুবুদ্ধি বৌ একালে দেখা যায় না, ছোট জায়ের উপর কত মায়া, ঠিক যেন মায়ের পেটের বোন।"

এই প্রকারে গ্রামের সমস্ত স্ত্রী পুরুষ যখন মজুমদার পরিবারের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছিল এবং যোগেশ ও পরেশ আপনাদিগের ক্ষুদ্র পবিবারটিকে সুখ ও শান্তির আগার মনে করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন, তখন যিনি দিবানিশি অতন্দ্র থাকিয়া সংসারের সকল সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রিত করেন তিনি কোন্ গুপ্ত উদ্দেশ্যে কোন্ ভাঙ্গাগড়া কার্য্যে আপনার অপ্রত্যক্ষ হস্ত নিয়োজিত করিতেছিলেন তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পরেশের স্ত্রী নৃত্যকালী আসন্নপ্রসবা, ঘরে মানুষ নাই; বিধবা পিসি একান্ত স্থবিরা, ফোঁটাতিলক কাটিতে ও হরিনাম করিতেই তাঁহার দিবসের বেশী সময় কাটিয়া যায়, যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, দন্তহীন মাড়ীতে ডাঁটা ও সজনে খাড়া চর্ব্বণেই তাহার সদ্ব্যবহার করেন, সুতরাং পরেশকে দুটি ভাত দিয়া ও গৃহস্থালীর কাজ করিয়া শ্যামাসুন্দরীর এতখানি সময় বাঁচে না যাহাতে তিনি প্রসবান্তে নৃত্যকালীর সেবা শুশ্রূষার অবসর পান। তাই শ্যামাসুন্দরী স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে ছোট বৌর পিসি রাইমণি ঠাকুরাণীকে আনাইয়া এ বাড়ীতে কিছু দিন রাখা হউক। পিসিমাকে আনান হইবে শুনিয়া নৃত্যকালীর মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল; নিতান্ত অসহায়

অবস্থায় মানুষের যদি কোন স্নেহময়ী আত্মীয়রা নিকটে থাকে তাহাহইলে অনেক পরিমাণে কষ্টের লাঘব হয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই পিসিমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথা সময়ে নৃত্যকালী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন ; অনাচারে পিসিমার বড় ভয়, তিনি কোন দিন আঁতুড় ঘরের কাছ দিয়াও ঘেঁসিতেন না, কি করিতে হইবে তাহা দূর হইতেই বড় বৌকে ফরমাইস করিতেন, এবং তাঁহার কোন কার্য্যে কিছু মাত্র ক্রটী দেখিলে বকিয়া বাড়ী মাথায় করিতেন, এমন দেখাইতেন যেন তিনি না আসিলে নৃত্যকালী অযত্নে মারা পড়িত ; ইহাতে লাভ হইল এই যে নৃত্যকালীর পরিচর্য্যা হইতে সংসারের সমস্ত কাজ শ্যামাসুন্দরীকেই করিতে হইত, অথচ তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, শ্যামাসুন্দরী বুঝিলেন পিসিমা না আসিলে ইহা অপেক্ষা সহজে এবং নির্ব্বিবাদে সকল কাজ সম্পন্ন হইত। যাহারা ভালবাসা বা যত্ন প্রকাশ করিতে গিয়া শুধু হৈচৈ করিয়া পাড়া গরম করিয়া তুলে তাহাদের দ্বারা স্নেহ বা যত্ন কতটা প্রকাশ হয় ঠিক বলা যায় না, কিন্তু সকলে-মনে করে ভারি স্নেহ যত্ন দেখান হইতেছে, এমন কি স্নেহের পাত্র পাত্রীর মনেও সেই ধারণা জন্মে ; দেখিয়া শুনিয়া নৃত্যকালী ভাবিল, ভাগ্যে পিসিমাকে আনান হইয়াছিল!— পাছে নৃত্যকালীর মনে আঘাত লাগে এই ভয়ে শ্যামাসুন্দরী প্রাণপণে পিসিমার আদেশ পালন করিতেন।

দেখিতে দেখিতে একমাস অতীত হইল, কাজকর্ম্ম সমস্ত মিটিয়া গেল, কিন্তু পিসিমা আর জামাতৃগৃহ পরিত্যাগের নামও করেন না। তাঁহাকে সে কথা মনে করাইয়া দেওয়াও অনেকে অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়াছিল ; পিসিমা যে কেন বাড়ী যাইতে অনিচ্ছুক তাহা আমরা নিঃসম্পর্কীয় লোক কেমন করিয়া বলিব ?—কিন্তু কাহারো কাছে শুনিতে পাওয়া যাইত যে ভ্রাতৃগৃহে অশনবসনের যেরূপ ব্যবস্থা তাহাতে সেখানে প্রত্যাগমনের প্রলোভন কিছু ছিল না, পক্ষান্তরে জামাই বাড়ীতে প্রত্যহ রাজভোগ। গৃহে ঝালের ঝোলে সম্বরা দিতে কোন দিন কণা প্রমাণ তেল মিলিত, কোন দিন তাহারও অভাব হইত, কারণ তাঁহার ভ্রাতৃবধূটির বাজে খরচে বড় আপত্তি—বিধবা ননদের জন্য খরচ বাজে খরচ ভিন্ন আর কি ? কিন্তু এখানে আসিয়া আধপোয়া ঘৃতের কম পিসিমার তরকারী পাক হইত না, জলযোগের জন্য দুধ সন্দেশ, নানরকম ফলফুলারীর আয়োজন হইত ; সেখানে থাকিতে দশমীর রাত্রে পোড়ামুড়ি ও শুষ্ক লঙ্কা ছাড়া আর কিছু জুটিত না, জামাই বাড়ী আসিয়া পিসিমা দশমীর রাত্রে একাদশীর পারণটা পূর্ব্বাহ্নেই যে ভাবে সারিতেন, তাহা শুনিয়া পাড়ার উচিত বক্তা হরিঘোষ একাদশীর দিন দত্ত বাড়ীর 'হরিবাসরে' সুবল অধিকারীকে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিল "ওরকম আয়োজন হলে, আমি ত্রিশদিন ছুলঙ্ক্ষে বেঁধে একাদশী কর্ত্তে পারি।

অতএব চাঁদপুরেই পিসিমা স্থায়ীভাবে আড্ডা বাঁধিলেন। বড় সুখে দিন কাটিতে

লাগিল, কিন্তু কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক প্রভৃতি পরমেশ্বরের কতক গুলি অবিবেচনার কাজ আছে; এসংসারেও পিসিমা অনেক খানি অবিবেচনার প্রাচুর্ভাব দেখিতে পাইলেন, সে অবিবেচনা পরেশের, তাহা তাঁহার হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। তিনি জানেন পরেশই এসংসারের ষোল আনার মালিক, যাকিছু উপার্জ্জন তা পরেশরই অথচ যোগেশ বাড়ীর কর্ত্তা! শ্যামাসুন্দরী পরেশের সংসারের ষোল আনা গৃহিণী এদৃশ্যটা তাঁহার চক্ষে ভারি বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইত। এতবড় মেয়ে হইল, নৃত্যকালীর যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি [illegible] তাই তিনি নৃত্যকালীর ঘটে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি সঞ্চয়ের মহাব্রত গ্রহণ করিলেন। পরের যখন আমি ব্যারাম হ'য়ে পড়ে থ। [illegible] পিসিমা জ্ঞাত ছিলেন।

দেগে।"

[illegible]পদেশ দিতে লাগিলেন; একদিন

এইরূপ আনন্দ কলহে, স্নেহ সখ্যতায় দিনের [illegible] [illegible] ওপর বসিয়া পিসিমার চুলে বিলি দিতে দিতে এক পরিবারের মত সুখী পরিবার তখন [illegible] কথা প্রসঙ্গে পিসিমা বলিলেন "হাঁলো নেকি, বালা দুগাছের অনেকেই বলিত "বাড়া" [illegible]

রত্ন রেখে যে[illegible]য়ে পড়েছে, পরেশকে একজোড়া চুড়ী গড়ানোর কথা বলেছিলি?"—নৃত্যকালী বাঁচত [illegible] "না, আমি বল্‌তে পারিনে, কি জানি কেমন ভয় করে, আর চুড়ী গড়ালেত আর জোড়ে হবে না।"—পিসিমা অসহিষ্ণু ভাবে উত্তর করিলেন "আবার কার জন্যে গড়াতে হবে?—তোর বড় জা বুড়ো মাগী আবার চুড়ি হাতে পরবে, লজ্জা করবে না?—সব তাতেই ভাগাভাগি, কেন যোগেশ কি দুপাঁচশো টাকা উপার্জ্জন করে আনচে নাকি?—তুই যদি একটু জোর জবরদস্তি করে দু'পাঁচ খান গহনা গড়িয়ে না নিস ত তোর অদেষ্টে ছাই পড়বে। দেখচিস্ নে তোর বড় জা গিন্নেমো করে কত টাকা হাতে করেছে, সুদেত গগন খেয়ে উঠ্‌চে। তোর ভাসুর মিনসেকেও চিন্‌তে পাল্লিনে, আদর ক'রে আবার ভাই ভাই করা হয়!—তাই ও মনে করে এমন গুণের দাদা আর হয় না হবার নয়, ওদিকে যে টাকার পুঁটলী হাতে বাঁধবেন তার কিছু ঠিক আছে? এই ক' মাসে আমি সব আচরণ টের পেয়েছি।"—ক্রমে একটু করিয়া নৃত্যকালীর হৃদয়ে বেশী মাত্রায় বিষ প্রবেশ করিতে লাগিল।

পিসিমা যখন দেখিলেন ঔষধ বেশ ধরিয়াছে তখন তিনি একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি রসান দিতে কসুর করিতেন না, একদিন হরিনামের মালা জপিতে জপিতে পিসিমা নৃত্যকালীকে বলিলেন "নেত্যো, আমিত এমন ক'রে মা আর পারিনে, তোর দুঃখ দেখ্‌তে পারিনে তাই তোর কাছে এসেছি, আমার দাদার ঘরে ভাতের দুঃখ কি? কাল একাদশী করে আছি দশমীর দিন মনে কল্লাম, দু'টো চা'ল ভাজি, তা তোর বড় জায়ের যদি ভাঁড়ারের চাবিটা দিবার অবকাশ হ'লো! যেন তাঁর বাপের বাড়ী হতে জিনিষ পাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন! মাগো মা, এমন গিন্নেমো আর দেখিনি।"

নৃত্যকালী সেইদিন শ্যামাসুন্দরীর নিকট হইতে ভাঁড়াড়ের চাবি লইয়া পিসিমার জিম্মা করিয়া দিলেন, শ্যামাসুন্দরী ইহাতে কোন কথা বলিলেন না বটে কিন্তু একটা রুদ্ধ যাতনায়

তাঁহার অন্তরটা টন টন করিয়া উঠিল, কর্ত্তৃত্বের অনেকটা অংশ হাত হইতে খসিয়া পড়িল বলিয়া যে তাঁহার এই কষ্ট তাহা নহে, মানুষ সকল সহিতে পারে কিন্তু স্নেহে অবিশ্বাস কিছুতেই সহ্য করিতে পারেনা, যাহাকে তিনি প্রাণ অপেক্ষা অধিক স্নেহে যত্নে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিলেন, তাহার নিকট হইতে এতখানি অবহেলা! শ্যামাসুন্দরী পরম সহিষ্ণু ভাবে পূর্ব্ববৎ সংসারের কাজ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ হইতে অসন্তোষের অতি ক্ষীণ ধ্বনিও কেহ শুনিতে পাইল না।

ক্রমে পিসিমাই সংসারের কর্ত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন, শ্যামাসুন্দরী এখন সংসারের কেহই নহেন, যতদিন তিনি কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন ততদিন পর্য্যন্ত রাখাল কৃষান হইতে চাকর বাকর পর্য্যন্ত কেহ কোন দিন অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই, এখন পিসিমার ব্যবহারে অনেকেই ক্ষুব্ধ, কিন্তু পাছে নৃত্যকালী মনে কোন ব্যথা পায়, পাছে পরেশের ক্রোধজন্মে এই ভয়ে সকলেই মনের ভাব গোপন করিয়া চলিত, সংসারের যাহাতে অশান্তি না বাড়ে এই অভিপ্রায়ে শ্যামাসুন্দরী অম্লান ভাবে সকল অসুবিধা সহ্য করিতেন, কিন্তু স্বার্থ বড় ভয়ানক জিনিষ, কলাটা বেগুণটা আবশ্যক হইলে যে সকল প্রতিবেশিনী মধ্যাহ্নে মজুমদার বাড়ী আসিয়া নৃত্যকালীর সুবুদ্ধিও পিসিমার অসাধারণ গিন্নিপনার সুখ্যাতি করিত, এবং পিসিমার মত গিন্নি বান্নি মানুষের উপর বড় বৌর হাত খেলান উচিত নয় বলিয়া নানাপ্রকার বাক্যজাল বিস্তারে পিসিমার কর্ণবিবরে বাক্যসুধা সঞ্চার পূর্ব্বক কার্য্যোদ্ধার করিয়া যাইত, অবসর পাইলেই তাহারা আবার শ্যামাসুন্দরীকে সহানুভূতিভরে জিজ্ঞাসা করিত "হ্যাঁগো বড়বৌ, তুমি কেন ঐটুকু মেয়ের চোখরাঙ্গাণীতে ভয় পাও, ও আর তো আগে আসেনি, আর ঐপিসিটে কোথাহতে এসে জুড়ে ব'সেছে, এখান হতে যাবে না নাকি, ওকে তুমি আমোল দেও কি জন্যে বলত বাছা?" শ্যামাসুন্দরী বলিতেন "আমার ছেলেপিলে নেই, ঘর সংসার যা কিছু তা ওদেরই তবে মাঝে হতে আমি কেন মন ভাঙ্গাভাঙ্গি করি?—যেমন করেই হোক দিন কেটে যাবে, গিন্নিমো করে সুখী হয় হোক, আমি কি শেষকালে একটা তুচ্ছু কথা নিয়ে লোক হাসাব?—পাঁচটা লোককে আমি হাতে করে দিতাম নাহয় আর একজন দেবে, খরচ পাতিত সংসারেরই।"—কাজেই ঝগড়ার উপযুক্ত ইন্ধন সংগ্রহ হইল না ভাবিয়া সকলে বিমর্ষভাবে সরিয়া পড়িত; পাড়ার কয়েকজন রমণী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্যামাসুন্দরীর তরফ হইতে নৃত্যকালীর বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা রচনা করিয়া লইল, এবং নৃত্যকালীর আত্মীয়তালাভের অভিপ্রায়ে স্নানকরিবার সময় ঘাটে গিয়া নানা প্রকার মুখ ভঙ্গিতে সেই গল্পগুলি নৃত্যকালীর শ্রবণ গোচর করাইতে লাগিল। নৃত্যকালীর মনে হইল ইহারা মিছামিছি এত কথা বলিবে কেন? আমার উপর নিশ্চয়ই দিদির রাগ প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিতেছে, উঠুক আমিত ভাসিয়া আসিনি, অয়ে ছাড়িব? পোড়ামুখো মিন্‌সের যে কিছুতে চৈতন্য হয় না, নিজের বিষয় কে খায় ঠিক নাই, পরের বিষয় রক্ষার জন্যে মকর্দ্দমা করেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্নান করিতে গিয়া ঘাটে পাঁচ জনের পাঁচ কথা শুনিয়া নৃত্যকালী মুখ অন্ধকার করিয়া বাড়ী ফিরিত, সে মুখ দেখিয়া দাসদাসীরা বলাবলি করিত "মাগো, এ তো মুখ নয়, যেন কুলো পানা চক্কোর!" বেলা দশটা বাজে, অথচ রান্নার নাম গন্ধ নাম নাই. শ্যামাসুন্দরী অগত্যা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া দেবরের কাছারীর ভাত দিবার জন্ম রান্নার আয়োজন করিয়া লইতেন,—এ দিকে নৃত্যকালী দরজা বন্ধ করিয়া জলযোগ সারিয়া ছেলেটিকে কোলের কাছে লইয়া একটি সুদীর্ঘ নিদ্রা দিতেন! এমনি করিয়া সংসার চলিতে লাগিল।

পিসিমার কায়দা কিন্তু স্বতন্ত্র। 'পূজো আচ্ছা' করিতেই তাঁহার বেলা একটা পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত, তাহার পর তিনি তাঁহার 'নিরামিষ হেঁসলে' প্রবেশ করিতেন। মজুমদার বাড়ীর কাছে বিধু নাপ্‌তিনির ঘর, বিধু বিধবা, প্রৌঢ়াবয়স্কা, গৌরাঙ্গদেবের প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি, সুতরাং হরিপাদপদ্মনিরতা, পিসিমার সঙ্গে অচিরেই তাহার গাঢ় প্রণয় স্থাপিত হইল, এবং পিসিমা তাহাকে "গঙ্গাজল" পদে অভিষিক্ত করিলেন। বিধু নাপতিনি সন্ধ্যাকালে হরিনামের মালা সমেত ঝোলাটি হাতে লইয়া পিসিমার কাছে বসিয়া গৌরাঙ্গলীলামৃতকাহিনী শুনিত বটে, কিন্তু বাড়ী যাইবার সময়ে ভাঁড়ারের ধান চাউল হইতে তেল নুন পর্য্যন্ত লইয়া যাইত, পিসিমা যে নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে তাহা তাহাকে দান করিতেন. কেহ এরূপ মনে করিবেন না; গঙ্গাজল সে গুলি গ্রাম্য মুদী দোকানে দিয়া আসিয়া তাহার মূল্য পিসিমাকে আনিয়া দিত; গঙ্গাজল এইরূপে গোপনে তাঁহার গঙ্গাস্নান, তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতির জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পারত্রিকের পথ খোলসা করিতে লাগিল; পিসিমাও নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নহেন, বাড়ীর বাগানের শাক পাতাড় ফলমূল হইতে তাঁহার "নিরামিশ হেঁসেলের" ভাত, ডাল, তরকারী প্রভৃতি কোন সামগ্রী হইতে তাঁহার গঙ্গাজলকে বঞ্চিত করিতেন না।

শ্যামাসুন্দরী সকলই জানিতে পারিতেন, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন তিনি বলিলেন" গৃহস্থালীতে এত জিনিষ আসে তবু নেই নেই যায় না, আজ যা আনা হলো কাল যদি তার খোঁজ পাওয়া নাযায়ত সংসারে লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকবে কি করে?" পিসিমা তখন ঝোলাটী হাতে লইয়া জপে বসিয়াছেন মাত্র, শ্যামাসুন্দরীর কথা শুনিয়া একেবারে 'তেলেবেগুনে' জলিয়া উঠিলেন, সপ্তমে গলা চড়াইয়া বলিলেন "হ্যাঁলো বড়কি (বড় বৌ) বলি আমি তোর খাই না পরি, আমি কি সংসারের জিনিস কিছু সঙ্গে বেঁধে বাপের বাড়ী যাচ্ছি না চুরী কচ্ছি তাই এত কথা বল্‌চিস্!"—মিন্‌সের যদি রোজগারের ক্ষমতা থাক্‌তো তা হলে না জানি আরও কি কত্তিস্!"

পরেশ আফিস হইতে আসিলে নৃত্যকালী সমস্ত কথাটা সালঙ্কারে স্বামীর কর্ণে ঝঙ্কারিত করিল, বলিল "দিদি নিত্তি নিত্তি পিসিমাকে খিঁচিয়ে এত কথা বলে কেন, আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছি। পিসিমা আমাকে ফেলে থাকতে পারে না, তাই বড় মুখ

ছোট ক'রে এত কথা শুনেও এখানে প'ড়ে রয়েছে, আর কোন মেয়ে হলে এতদিন চলে যেত, আমি যদি তোমার এত ভার হয়ে থাকি, তো আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও, আমি আর এত গঞ্জনা সহ্য কর্ত্তে পারি নে।"

কাছারীতে সমস্ত দিন বকাবকি করিয়া বিশেষতঃ একটা ভারি জেদের মকদ্দমা হারিয়া পরেশের মেজাজটা ভাল ছিল না, চাপকান ছাড়িতে ছাড়িতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন "রোজইত ঐ এক কথা বল, তা বাপের বাড়ী যাবে যাও না, আমি কি আট্‌কে রেখেছি! বড় বৌকে যদি তুমি চিনতে পারবে, তা হ'লে তোমার এত মতিচ্ছন্ন ঘট্‌বে কেন? সে তোমাকে হাতে ধরে মানুষ কল্লে আর এখন কি না তুমি তারই নিন্দেকে জপমালা করে তুলেছ, এইটে কলির ধর্ম্ম নাকি?"...মর্ম্মাহত নৃত্যকালী সে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহান্তরে গিয়া ভূমিশয্যা আশ্রয় করিল।

রাত্রে রীতিমত তরকারী রাঁধিয়া শ্যামাসুন্দরী পরেশকে খাবার দিয়া আসিলেন। পরেশের গম্ভীর মুখ এবং চিন্তাকুল ভাব দেখিয়া তিনি কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, আরো দেখিলেন সে ঘরে নৃত্যকালী নাই; পরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর পো, ছোট বৌ কোথা?"—পরেশ সংক্ষেপে উত্তর করিলেন "জানিনে।"—"সেদিনের মত তাকে গালা-গালি করেছ বুঝি?"—শ্যামাসুন্দরীর এই দ্বিতীয় প্রশ্নে তিনি নিরুত্তর রহিলেন। শ্যামা-সুন্দরী বুঝিলেন ব্যাপার কিছু বেশীদূর পর্য্যন্তই গড়াইয়াছে; স্নেহোচ্ছলিত স্বরে বলিলেন "ঠাকুর পো ছোট বৌ বড় অবুঝ, তাকে ও রকম ক'রে গালমন্দ দিয়োনা, তাতে নিজেও সুখী হতে পারবেনা, ওকেও সুখী করতে পারবে না; আমাকে নেত্তো সময়ে সময়ে দুই একটা চড়া কথা ব'লে বটে কিন্তু তাই বলে কি আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করবো, শত্তুর হেসে মরবে যে, সেদিন ওর বে দিয়ে আন্‌লাম, ঘর করতে শিখুলাম, সে সব কথা কি আমি ভুলে যাব?—মেয়েতেও ত মায়ের উপর কত সময় কত অত্যাচার করে, তাকি মায়ে সহ্য করেনা? তোমার কি মনে নেই, সেই তাড়াতাড়ি স্কুলে যেতে, বৈকালে স্কুল হ'তে এসে যখন বই গুলো ফেলে 'বড় বৌ বড় খিদে পেয়েছে' ব'লে আমার কোলের কাছে দাঁড়াতে দেখতাম তোমার কচি মুখখানা রৌদ্রে ঘেমে উঠেছে, আমি আঁচল দিয়ে সেই ঘাম মুছিয়ে তোমাকে জল খাবার দিতাম, সে আজ বিশ বছরের কথা বৈত নয়, সে সময় ত আমি ছাড়া তোমার আর কেউ ছিল না এখনত আমি তাই আছি, ছোট বৌর কড়া কথাতে কি সেই পুরোণো কথা আজ ভুলে যাব?—তোমার দাদার যে চাকরী নেই, সেজন্যেত আমার একটু দুঃখ হয় না, তুমি চিরজীবী হয়ে বেঁচে সুখে ঘর কন্না কর, যেকদিন বাঁচি তোমাদের নিয়েই যেন আনন্দ ক'রে যেতে পারি।"

পরেশনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল;—সেই সকলইত আছে, বরং সাংসারিক অবস্থা আরো উন্নত হইয়াছে—কিন্তু সে প্রীতি, সে শান্তি, সে পারিবারিক সুখ কোথায় গেল? সব গিয়া যদি সেই পুরাতন

সুখের দিন ফিরিয়া আসিত। হায়, ঘটনা স্রোতে ভাসমান তৃণের মতই মানুষের জীবন ;— অনেকক্ষণ চিন্তার পর হৃদয়ভার কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া পরেশ আহার করিতে বসিলেন।

কিন্তু বিপদ একাকী আসেনা। শ্যামাসুন্দরী ভাতের থালা লইয়া আসিয়া যখন পরেশের সঙ্গে কথা বলিতে ছিলেন, সেই সময় পিসিমা ও নৃত্যকালী জানালার পাশে দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছিলেন, পরেশের আহার হইয়া গেলে, শ্যামাসুন্দরীর হৃদয়োচ্ছ্বাসের সমালোচনা পূর্ব্বক নৃত্যকালী আর একদম্ পরেশের উপর ঝাল ঝাড়িয়া লইল, তাহার পর মেজেতে একখানা মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিল, কিন্তু তাহার অভিমানপ্রস্ত নাসিকার প্রবল ঝঙ্কারে ও মানসিক অশান্তিপ্রকাশক অব্যয়ের আতিশয্যে সে রাত্রে পরেশের নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

এইত একদিনের ঘটনা। প্রতিদিন এই রকম এক একটা তুচ্ছ ঘটনা ঘটিয়া চাঁদপুরের মজুমদার বাড়ীতে এক একটা প্রলয় ব্যাপার ঘটাইবার আয়োজন করিয়া তুলিতে লাগিল। এদিকে পিসিমার গঞ্জনাতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিয়া, এবং কর্ম্মহীন, অকর্ম্মণ্য জীবন নিতান্ত দুরূহ বিবেচনা করিয়া যোগেশ কাজ কর্ম্মের সন্ধানে কলিকাতা যাত্রা করিলেন, পরেশ বলিল "দাদা, আপনি আর কি দুঃখে চাকরী করিবেন ? আপনার বয়স হইয়াছে, আপনি সংসারের সমস্ত দেখা শুনা করুন, আপনি বাল্যকালে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন এখন আমার কর্ত্তব্য আপনাকে প্রতিপালন করা, এই জীর্ণ দেহে আপনি চাকরী করিতে গেলে আমি ভদ্রসমাজে কি করিয়া মুখ দেখাইব ?"—যোগেশ বলিলেন "আমার এখনও চাকরী করিবার সামর্থ্য আছে, মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে কাজের বাহির হইয়া যায়, তুমি কিছু মনে করিওনা।"—যোগেশ বিদেশে যাত্রা করিলেন বটে কিন্তু ঘরের অশান্তি কমিল না। কথা চাপা থাকে না, লোকে—যে শুনিত সেই বলিত "আহা, ওদের বড় সুখের সংসার ছিল, এতদিনে সংসারটা মাটি হ'ল।" চক্রবর্ত্তী বাড়ীতে মধ্যাহ্ন আহারের পর গ্রামের পককেশ বৃদ্ধদিগের পাশার আড্ডা বসিত ; কোন কোন অতি বিজ্ঞ বৃদ্ধ প্রশস্ত হস্তে পাশার দান ফেলিয়া বলিতেন 'তখনিই বলেছিলাম জয়রাম দাদা হুসিয়ার হ'য়ে কাজ করা ভাল, রামনগরে ছেলের বিয়ে দিচ্ছ, কাজটা ভাল কচ্ছনা ;'—দাদা বল্লেন 'তুমিও যেমন ভাই ছেলে ভাল হইলে আর ছেলের বৌতে কি করবে ?'—ছেলের জীবন কাটি মরণ কাটি যে ছেলের বৌর হাতে হবে তা দাদা ঠাহর কর্ত্তে পারেন নি, পরেশটা কি স্ত্রৈণ, স্ত্রীর তাড়নায় এমন প্রাচীন ভাইকে কিনা চাকরী কর্ত্তে পাঠালে! অমন পাষণ্ডের কি মুখ দর্শন কর্ত্তে আছে, ইংরেজী বিদ্যাটাকেই ধিক্।"

শ্যামাসুন্দরী অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সহিত নীরবে সকল সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘাটে পথে কৈফিয়তের জ্বালায় তাঁহাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইল ; ঘাটে স্নান করিতে গেলে শুভাকাঙ্ক্ষিণী রহস্য প্রিয়া বামনঠান্‌দি একদিন শ্যামাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বড় বৌ, পরের মেয়ে নাকি আপনার হয় ? কথাটা মনে আছে ত ?—সেই

পরেশের বিয়ের সময়কার কথা?"—শ্যামাসুন্দরী সসঙ্কোচে উত্তর করিলেন, "সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ, প্রথমে ত সবই গুণ দেখিয়াছিলাম, এ রকম ক'রে বিগ্‌ড়বে তা কি জান্‌তাম? যাক্‌গে, আমি যেন ওর সকল অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পারি। আমিত আর পর নই।" ঠান্‌দি বলিলেন—"ও ত তোমাকে পর ভিন্ন ভাবে না।" "তা ভাবে ভাবুক, আমার দেবর এখনও জানে আমি ছাড়া কোন কা'লে তা'র মা ছিল না।—সে কথা মনে করেই আমি সকল সহ্য করিব।"

কিন্তু মানুষ কত সহ্য করিতে পারে? সহ্য করিবারও একটা সীমা আছে। যাহারা যত সহ্য করে তাহারা ততবেশী অনুভব করে একথা অতি ঠিক। শ্যামাসুন্দরী যখন নৃত্যকালীর কাঁটার ন্যায় তীক্ষ্ণ নির্দ্দয় শ্লেষপূর্ণ কঠিন কথা গুলি শুনিয়া শান্তভাবে তাহা সহ্য করিতেন, তখন তাঁহার উদার মুখচ্ছবিতে মাতৃভাব যে পরিমাণেই পরিস্ফুট থাকুক তাহাতে গুরুতর অন্তর্যাতনা এবং কঠোর আঘাতের চিহ্ন পরিব্যক্ত হইয়া উঠিত। এইরূপ প্রতিদিনের সহস্র প্রকার অশান্তি, অনিয়ম, কঠোর সাংসারিক পরিশ্রম, এবং শরীরের উপর বিবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহাকে আর অধিক দিন জীবিত থাকিতে হইল না। সেই চির ধৈর্য্যময়ী, স্নেহার্দ্রহৃদয়া পুণ্যবতী নারী অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। যোগেশ তখনও বিদেশে!

আত্মীয় প্রতিবেশিণীগণের মধ্যে যাহারা তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিত, যাহারা কোঁ দুঃখে বা শোকে তাঁহার উদার সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল, তাহারা বলিল,—"আহা, কলিতে এমন বৌ আর হবে না, কথার জ্বালাতেই বৌটা মারা গেল।"

কথাটা শুনিয়া পিসিমা তাঁহার গঙ্গাজলকে জনান্তিকে বলিলেন—"আর কিছুদিন আগে গেলেই ভাল ছিল।—আবার আর একটা বিয়ে করে না বসে!"

পার্শ্ববর্ত্তিনী নৃত্যকালীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল—"কে বিয়ে কর্‌বে?"

——"কেন তোর ভাসুর।"——

"মরণ! দড়ি কলসী জুট্‌বেনা?"—বলিয়া সুস্পষ্ট ঘৃণার পরিচায়ক নাসিকার অর্দ্ধাংশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নৃত্যকালী কার্য্যান্তরে চলিল।

বর্ণ রহস্য।

প্রকৃতিতে আমরা বিবিধ বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে গোটা কতক স্থূল কথা বর্ত্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য।

প্রথমেই এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বর্ণ কয় প্রকার? সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে বর্ণ সাত প্রকার। এই উত্তরের একটা ভিত্তি আছে। ইন্দ্রধনুতে আমরা বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। সূর্য্যের আলো একটা কাচের কলমের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে রঙ দেখা যায়। শাদা আলোক ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে কিরূপে মৌলিক বর্ণ গুলি বাহির করিতে হয় তাহা নিউটন প্রথমে দেখাইয়াছিলেন। একটা খুব সরু লম্বা ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্য্যের শুভ্র আলোক লইয়া যাইতে হইবে। পরে সেই আলোক একখানা তিন কোণা কাচের কলমের ভিতর চালাইলে একটা পাঁচরঙা আলোর ফিতা দেওয়ালের গায়ে পড়িবে। কেহ কেহ এই খানে বলিবেন পাঁচরঙা না বলিয়া সাতরঙা বলাই উচিত। ঐ ফিতার ভিতরে রক্ত, নাগরঙ্গ, পীত, হরিৎ, নীল, শ্যাম, ও বেগুণী এই সাত রঙের বিকল দেখা যাইবে। ইংরাজি ইণ্ডিগো শব্দের পরিবর্ত্তে শ্যাম ও বায়লেট শব্দের পরিবর্ত্তে বেগুণী ব্যবহার করিলাম। কিন্তু এইরূপ বর্ণনার একটু দোষ আছে। সাত রঙ্ না বলিয়া পাঁচ রঙ্ কি তিন রঙ্ বলিলে কিছু মারাত্মক দোষ ঘটিবে না। আসল কথা, সেই আলোর মধ্যে আমরা বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখি। এক পাশে থাকে লাল, অন্য পাশে যাহাকে বায়লেট বা বেগুনী বলে। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝে নানাবিধ রঙ বর্ত্তমান থাকে। তাহার সংখ্যা নাই। ভাষাতে অতগুলা শব্দ নাই, ও নাম নাই, কাজেই আমরা পাঁচবর্ণ ছয়বর্ণ বা সাতবর্ণ নাম করিয়া ফেলি। বস্তুতঃ এক হরিৎ ও পীত এই দুইয়ের মাঝেই নানাবিধ বর্ণ থাকে। কোনটা পীতাভ হরিৎ কোনটা হরিদাভ পীত। তফাত আছে, অথচ সেই তফাত দেখাইবার জন্য ভাষায় নাম ও শব্দ নাই; কাজেই ভাষাতে কুলায় না।

প্রকৃত পক্ষে শাদা আলোর মধ্যে পাঁচরকম বা সাতরকম মাত্র রঙ আছে বলিলে ভুল হয়। এত রঙ আছে যে আমরা তাহাদের সকলের নাম দিতে পারি না। পীত বর্ণ আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিতে দাঁড়ায়, হরিৎ আস্তে আস্তে নীলে দাঁড়ায়। কিন্তু এই পীত ও হরিতের মাঝামাঝি কত রঙ আছে ও হরিৎ নীলের মাঝামাঝি আবার কত রঙ আছে তাহা বলাই যায় না। ভাষা এখানে পরাস্ত। আমরা এই সংখ্যাতীত বর্ণ গুলিকে সোজাসুজি সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করি। কতক গুলাকে বলি রক্ত, তাহারা রক্তশ্রেণীভুক্ত। কতক গুলা পীত বা পীতশ্রেণীভুক্ত ইত্যাদি।

তবেই দেখা গেল সূর্য্যের শুভ্র আলোক বিশ্লেষণ করিলে গণনার অতীত বিবিধ

বর্ণের আলোক পাওয়া যায়। এই বর্ণ গুলিকে আমরা বিশুদ্ধ বর্ণ বলিব। বিশুদ্ধ বর্ণের অর্থ, সূর্য্যের আলো নিউটনের প্রণালী মতে কাচের কলমের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে যে সকল বর্ণ দেখা যায় তাহাই।

রামধনুতে যে সকল বর্ণ দেখা যায়, তাহারা এই বিশুদ্ধ বর্ণের আলোক। কিন্তু প্রকৃতিতে আমরা সাধারণতঃ যে সকল বর্ণ দেখিয়া থাকি, তাহারা বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। এই সংখ্যাতীত বিশুদ্ধ বর্ণ পেওয়ায় আরও সংখ্যাতীত অবিশুদ্ধ বর্ণের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করি। প্রাকৃত দ্রব্যে যে পীত, যে হরিৎ যে নীল দেখা যায়, তাহারা কদাচিৎ বিশুদ্ধ পীত, বিশুদ্ধ হরিৎ, বিশুদ্ধ নীল। আবার তদ্ভিন্ন পাটল, ধূসর, পিঙ্গল প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ আমরা দেখিয়া থাকি, তাহারাও বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। তবে বিশুদ্ধ বর্ণের আলো বিবিধ রূপে মিশাইয়া এই সকল অবিশুদ্ধ প্রাকৃত মিশ্র বর্ণের উৎপাদন করিতে পারা যায়।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলে বর্ণতত্ত্বের শেষ কথা বলা হয় না। আরও ভিতরে চলিতে হইবে। আসল কথা বর্ণ, নীলই বল, আর পীতই বল, কেবল আমাদের একটা অনুভূতি বা উপলব্ধি বা জ্ঞানের প্রকারভেদ মাত্র। শব্দ যেমন একটা জ্ঞান, তাহার আবার সহস্র প্রকারভেদ আছে; ঘ্রাণ একটা জ্ঞান, তাহার সহস্র প্রকার ভেদ আছে, সেইরূপ বর্ণও একটা সহস্র প্রকারভেদযুক্ত এক রকম বিশেষরকমের জ্ঞান। বর্ণটা বাস্তবিক আমাদেরই চৈতন্যের একটা ধর্ম্ম, কোন বস্তু বিশেষের ধর্ম্ম নহে। কথাটা বলা যত সহজ, বোঝা ও বোঝান তত সহজ নহে। অনেকে গম্ভীরভাবে বলিয়া ফেলিবেন বর্ণ আমাদের অনুভূতিমাত্র, উহার সহিত বস্তুর কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই; কিন্তু এই বাক্যের পূর্ণ তাৎপর্য্য বক্তা হৃদগত করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কতকটা এইরূপে বোঝান যাইতে পারে। শরীরে ছুঁচ দিয়া বিঁধিলেই একটা যাতনা হয়। যাতনার সঙ্গে ছুঁচের একটা সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ কিরূপ। যাতনাটা আমার অংশ না ছুঁচের অংশ? আমার বিশেষণ না ছুঁচের বিশেষণ? এখানে সকলে অক্লেশে বলিবেন যাতনা আমার, ছুঁচের নহে। যাতনাকে যদি গুণ বা ধর্ম্ম বা এমনি একটা কিছু বলিতে হয়, তাহা আমারই অথবা আমার মনের বা চৈতন্যের বা আত্মার বা এমনি একটা কিছুর বলিতে হইবে। যাতনা ছুঁচের গুণ নহে বা ধর্ম্ম নহে। ছুঁচও যাতনা নহে, যাতনাও ছুঁচ নহে। এ বিষয়ে মতভেদ হইবে না। কিন্তু ছুঁচটা মরীচা ধরিয়া লাল রঙের দেখাইতেছে। এই লাল রঙটা ছুঁচের ধর্ম্ম না আমার ধর্ম্ম? এই খানেই হয়ত অনেকেই বলিয়া ফেলিবেন, রঙটা অবশ্যই ছুঁচের ধর্ম্ম। আমি কিন্তু এইস্থলে বলিতেছি যাতনার সহিত ছুঁচের যেমন সম্বন্ধ রঙের সহিতও ছুঁচের সেই সম্বন্ধ। ছুঁচের রঙটা যদি ছুঁচের বলা চলে, তবে যাতনাটাও ছুঁচের বলিতে কোন হানি নাই। যাতনাকে যদি আমার বলিতে হয় রংকেও ঠিক সেই কারণে আমার বলিতে হইবে, ইহাতে আপত্তি করিলে চলিবে না।

রঙ নীল পীত হরিৎ পিঙ্গল পাটল কপিল যত রকম রঙ্গের নাম করিতেছ সকলই আমার ভিন্ন ভিন্ন রকম চিত্তবিকার বা অনুভূতিভেদ মাত্র। বাহিরের অন্য পদার্থের সহিত তাহাদের সমবায় সম্বন্ধ বা অন্যরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা আমারই প্রাকৃতিক সম্পত্তি। বাহিরের বস্তুর নহে।

ঐ খানে সবুজ রঙের গাছটা রহিয়াছে এই খানে আমি রহিয়াছি। সবুজ রঙটা বস্তুতঃ গাছের নহে। আমার ঐ অনুভূতি মনের মধ্যে জন্মিয়া ঐ খানে. গাছের অস্তিত্ব আমাকে দেখাইয়া দিতেছে। আমার মনে ঐ অনুভূতিটা জন্মিতেছে তাহা দেখিয়া আমি অনুমান করিতেছি, যে আমার বাহিরে ঐ স্থানে ঐ গাছ পদার্থটা রহিয়াছে, যাহার অস্তিত্বের সহিত আমার এই অনুভূতির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। অর্থাৎ ঐ অনুভূতি উৎপন্ন হইয়া আমাকে গাছের অস্তিত্বের আবিষ্কারে সমর্থ করিতেছে।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান আরও একটু বেশী বলে। পদার্থবিদ্যা এক রকম প্রমাণ করিয়াছে যে ঐ গাছের ও আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা অত্যন্ত কঠিন অথচ চক্ষুর অগোচর পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে; সে পদার্থটা ঐরূপ ভাবে মাঝে না থাকিলে ওখানে গাছ থাকিলেও আমার ঐ সবুজ বর্ণের অনুভূতি জন্মিত না। সেই মধ্যবর্ত্তী পদার্থটার ইংরাজী নাম ইথার, বাঙ্গালায় আকাশ বলা যাইতে পারে। গাছের শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সেই আকাশে ছোট ছোট ধাক্কা দিতেছে, সেই ধাক্কা গুলি সেই কঠিন আকাশ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া ও চালিত হইয়া আমার দর্শনেন্দ্রিয়ে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে। এক এক ধাক্কাতে এক একটি ঢেউ জন্মিতেছে; বীণাযন্ত্রের তারে পুনঃ পুনঃ ঘা দিলে যেমন তারে ঢেউ জন্মে; জলের পৃষ্ঠে ঘা দিলে যেমন জলে ঢেউ জন্মে; শস্যক্ষেত্রে উর্দ্ধশীর্ষ গাছগুলির শীষে ও পাতায় বাতাসের ধাক্কা লাগিয়া যেমন ঢেউ জন্মে, কতকটা সেইরূপ। পদার্থবিজ্ঞান কেবল এই টুকু বলিয়াই নিরস্ত হয়েন না; সেই ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত; ধাক্কা মিনিটে কতবার পড়িতেছে, এবং কি বেগেই বা ধাক্কা গুলি গাছের নিকট হইতে সঞ্চারিত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহাও গণিয়া দিতে প্রস্তুত।

পদার্থবিজ্ঞান যে যুক্তির বলে এই আকাশের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছে এবং এই ঢেউগুলির সম্বন্ধে বিবিধ গণনা ও পরিমাপ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে, এ প্রস্তাবে তাহার অবতারণা চলিতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, যে তুমি মাপকাঠি দিয়া গাছটার দৈর্ঘ্য মাপিয়া আমাকে বলিলে সেই মাপে আমার যে পরিমাণ আস্থা থাকিবে আকাশের ঢেউ গুলির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ও তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ যে মাপ করিয়া দেন তাহাতে আমার আস্থা অনেক বেশী; এবং ঐ প্রত্যক্ষ গাছটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যে রকমের বিশ্বাস যতখানি আছে, আমার চক্ষুর অবিষয় আকাশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সেইরূপ বিশ্বাস তার চেয়েও বোধ হয় কোন কোন অংশে অধিক।

এখন পদার্থবিজ্ঞান শাদা আলো ও রঙ্গিল আলোর সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছে দেখা

যাউক। সূর্য্যের আলো শাদা দেখায়, কিন্তু সূর্য্যের আলো আকাশে একরকমের ঢেউ নহে। উহার ভিতরে নানাবিধ ঢেউ আছে। নানাবিধ কি অর্থে?—না—কোনটা বা একটু বড় কোনটা বা একটু ছোট। একই জলাশয়ের পৃষ্ঠে লম্বা লম্বা বড় বড় তরঙ্গ উঠিতে পারে, আবার খাট খাট ছোট ছোট উর্ম্মিও উঠিয়া থাকে; কতকটা সেইরূপ। এই ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ আসিয়া চক্ষুর ভিতরের একখানা স্নায়বীয় পরদায় ধাক্কা দেয়; ও সেই ধাক্কা ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের মধ্যে পৌছিয়া নানাবিধ অর্থাৎ নানাজাতীয় গোলমেলে—কেমন তাহা ঠিক্ এখনও বলা যায় না—আণবিক গতির উৎপাদন করে। এবং এই এক এক রকম আণবিক গতির সঙ্গে এক এক রকম বর্ণের অনুভূতি জন্মে। রঙটা হইল একটা মানসিক ব্যাপার; গাছ হইতে রঙ আসেনা, গাছ হইতে আসে ধাক্কা—বিশুদ্ধ বর্ণহীন ঘ্রাণহীন নীরব ধাক্কা—তোমার পৃষ্ঠে কিল দিলে যেমন বর্ণহীন ঘ্রাণহীন ধাক্কা উৎপন্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ধাক্কা।—এবং এই ধাক্কা শেষ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে পৌছায়—সেখানেও সেই ধাক্কাই থাকে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া মনের মধ্যে সেই বিকার—সেই অনুভূতি—রঙের অনুভূতি—আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠিক্ যেমন আমার হস্তপ্রযুক্ত কিলরূপী ধাক্কা তোমার পৃষ্ঠ হইতে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেদনারূপী মানসিক বিকার বা অনুভূতির উৎপত্তি হয় তেমনি। ফলে রঙটা আছে মনে; উহা গাছেও নাই, গাছ হইতে আগত ধাক্কা অথবা ঢেউগুলিতেও নাই। ঢেউগুলি নীরস ঢেউমাত্র। কোনটা বড় ঢেউ কোনটা ছোট ঢেউ; কোনটার পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত দ্রুত পড়িতেছে, কোনটায় পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত ধীরে পড়িতেছে মাত্র। এই সকল নানাজাতীয় অর্থাৎ ছোট বড় নানা আকারের ঢেউয়ের মধ্যে কোনটার সঙ্গে রক্তানুভূতি কোনটার সঙ্গে পীতানুভূতি কোনটার সঙ্গে নীলানুভূতির সংস্রব রহিয়াছে। একটা আসিয়া ধাক্কা দিলে রক্ত—অর্থাৎ কোন একটা বিশেষরূপ রক্ত—মনে রাখিও রক্তই এত নানাবিধ আছে যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিনা—একটা বিশেষ রক্ত বর্ণের জ্ঞান জন্মায়; আবার একটা বিশেষরূপ ঢেউ লাগিলে বিশেষরূপ পীত বা নীলের অনুভূতি জন্মায় ইত্যাদি।

দাঁড়াইল এই।—সূর্য্যের আলোর মধ্যে নানাবিধ নানা আকারের ঢেউ আছে; সবগুলি চলে একই বেগে;—সেকণ্ডে প্রায় লক্ষক্রোশ বেগে। কিন্তু কোনটা একটু দীর্ঘ কোনটা একটু হ্রস্ব। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিবার সময় গজ ফুট ইঞ্চির মাপকাঠি ব্যবহার চলেনা; তাহারা এত ক্ষুদ্র, যে ইঞ্চিকে দশলক্ষ ভাগ করিয়া তাহারই মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হয়। এরই মধ্যে আবার যে একটু লম্বা সে লাল জ্ঞান জন্মায়। যে একটু খাটো সে নীল জ্ঞান জন্মায়। এমন ঢেউয়ের সূর্য্যালোকে অভাব নাই যাহারা—এত বড় বা এত ছোট, যে হয়ত দর্শনেন্দ্রিয়রূপ যন্ত্রের উপযোগিতার ও বন্দোবস্তের অভাবে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌছিতই পারেনা; অথবা পৌছিলেও কোনরূপ বর্ণজ্ঞান জন্মায় না। সূর্য্যের আলোকে এমন ঢেউ আছে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আকাশে দু' দশ ইঞ্চি বা দুইদশ গজ লম্বা ঢেউ উপায়বিশেষ

অবলম্বনে উৎপাদন করিতে পারা যায় তাহা সম্প্রতি সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের লইয়া আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কেন না আলোকের রঙের জ্ঞান তাহাদের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখেনা।

উপরে বলিয়াছি বিশুদ্ধ বর্ণের সংখ্যা এত—একধারে রক্ত ও একধারে বায়লেট্ এই দুইয়ের মধ্যে এত বিবিধ বর্ণ বর্ত্তমান—যে তাহার গণনাও চলেনা—ভাষাতেও তাহাদের নাম দেওয়া চলে না। এখন দেখা যাইতেছে এই সংখ্যাতীত বর্ণের প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক জাতীয় আকাশবাহী ঢেউয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই আকাশের ঢেউ গুলির যত জাতি, বিশুদ্ধ বর্ণেরও তত জাতি; ঢেউয়ের জাতি—আকার আয়তন ও ধাক্কার সংখ্যা লইয়া, বর্ণের জাতি—অনুভূতির বিশেষত্ব লইয়া। আবার এক একটা বিশুদ্ধ একজাতীয় ঢেউয়ের বদলে যদি পাঁচরকমের পাঁচজাতীয় ঢেউ একসঙ্গে আসিয়া ধাক্কা দেয় ও মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ বর্ণের অনুভূতি জন্মায় না। তখন কপিশ পাটল পিঙ্গল প্রভৃতি মিশ্র অবিশুদ্ধ বর্ণের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

আর একবার আগাগোড়া ভাবিয়া দেখা যাউক। চৈতন্যগোচর অসংখ্য বর্ণের মধ্যে কতকগুলাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছি—যে গুলা সূর্য্যের আলোককে নিউটনের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া দ্বারা ভাঙ্গিলে বা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়; আর কতকগুলাকে অবিশুদ্ধ বা মিশ্র বলিয়াছি যাহারা ঐরূপে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যের আলোকে বিদ্যমান থাকে না—তবে বিবিধ প্রাকৃত বস্তুর সহিত সংযোগে বিবিধ অঙ্গে যাহাদিগকে জড়িত দেখা যায়। বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ উভয়েরই আবার জাতিভেদ এত যে গণিয়া বলা চলেনা—কার্য্যতঃ উভয়েই সংখ্যাতীত। বিশুদ্ধ বর্ণ গুলির এক একটির সহিত এক একটি নির্দ্দিষ্ট আকারযুক্ত ও নির্দ্দিষ্ট স্পন্দন-সংখ্যাবিশিষ্ট আকাশের ঢেউয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে—যখন সেই সেই ঢেউ একা আসিয়া ধাক্কা দেয় তখন সেই সেই বিশুদ্ধ বর্ণ অনুভূত হয়। আর অবিশুদ্ধ বর্ণগুলা, যখন পাঁচরকমের ঢেউ একযোগে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখনই জন্মে।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্থগিত রাখিলে সব কথা শেষ হইল না। আরও একটু জটিলতা আছে। অবিশুদ্ধ বর্ণের কথা এখন ছাড়িয়া দিয়া একটা বিশুদ্ধ বর্ণের কথাই ধর। মনে কর একটা বিশেষ রকমের নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধ পীতবর্ণ—বাতির পলিতায় নুন দিলে যে পীত বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নির্দ্দিষ্ট পীত বর্ণ। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে মনে হইবে একটা নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যযুক্ত ও নির্দ্দিষ্ট স্পন্দন সংখ্যা যুক্ত ঢেউ আসিয়া এস্থলে চোখে ধাক্কা দিতেছে; তাই ঐ নির্দ্দিষ্ট বর্ণের বিকাশ। একথা সত্য, কিন্তু আংশিকভাবে সত্য। কেন না ঐ কারণে ঐ পীতবর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্য কারণেও আবার ঠিক্ সেই পীতবর্ণই জন্মিতে পারে। ফল কথা মস্তিষ্কের ভিতর একটা বিশেষ রকমের নাড়া দিলে বা আন্দোলন ঘটিলে সেই পীতবর্ণ অনুভূত হয়;—কিন্তু মস্তিষ্কের সেই আন্দোলন নানা উপায়ে ঘটিতে পারে। একটা নির্দ্দিষ্ট আকারের ঢেউয়ের ধাক্কাতে ত ঘটিয়াই থাকে, তা ভিন্ন অন্য

রকমের ঢেউয়ের ধাক্কাতেই যে না হয় এমন নহে। কথাটা ক্রমে জটিল হইয়া পড়িতেছে। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত।

মনে কর একটা বিশেষ লোহিত, একটা বিশেষ পীত ও একটা বিশেষ হরিৎ। এবং তাহাদের সকলেই বিশুদ্ধ। সূর্য্য হইতে আগত যে ঢেউ সেই লোহিত রঙ দেয়, তাহাকে লোহিতজনক ঢেউ বা ক বলিব; যে ঢেউ সেই পীত দেয় তাহাকে পীতজনক ঢেউ বা খ বলিব; যে ঢেউ সেই হরিৎ দেয় তাহাকে হরিজ্জনক ঢেউ বা গ বলিব। এখন খ ঢেউ আসিলে পীত অনুভূত হইবেই; কিন্তু এমনও সচরাচর দেখা যায় যে ক ঢেউ ও গ ঢেউ যদি একত্রে আসে—উভয়ের ভাগের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসে—তাহা হইলেও সেই পীতবর্ণ,—সেই খাস বিশুদ্ধ নির্দ্দিষ্ট পীতবর্ণ—অনুভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ পীতবর্ণটা কেবল খ ঢেউয়েরই একচেটিয়া নহে। অন্য জাতীয় ঢেউ—দুই জাতীয়, তিন জাতীয় বা বহু জাতীয় ঢেউ মিলিয়া সেই খাঁটি পীতেরই সৃষ্টি করিতে পারে। ভিন্ন কারণে একই কার্য্যের উৎপত্তি ঘটে। কেমন কেমন শুনায়—কিন্তু কথা ঠিক—সহস্র প্রত্যক্ষ প্রমাণে ইহার সত্যতা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সেই বিশুদ্ধ পীত বর্ণের আলো আমি দেখিতেছি। আপাততঃ মনে হইতে পারে ইহার আলোটায় কেবল সেই খ জাতীয় ঢেউ আছে। কিন্তু এই মীমাংসা সত্য হইতেও পারে; না হইতেও পারে। সেই আলোককে সেই নিউটনের উদ্ভাবিত প্রণালীক্রমে বিশ্লেষণ করিলে হয়ত দেখা যাইবে—যে সেই আলোক খ ঢেউ আদৌ নাই—তৎ পরিবর্ত্তে ক ঢেউ অর্থাৎ লোহিতজনক ঢেউ ও গ ঢেউ বা হরিজ্জনক ঢেউ আছে। ক ঢেউ একা থাকিলে লোহিত বোধ হইত, গ একা থাকিলে হরিৎ বোধ হইত; কিন্তু উভয়ে থাকায় না লোহিত না হরিৎ—একটা পীতের বোধ হইতেছে; সেই পীত, বিশুদ্ধ খ ঢেউ হইতেও যাহার সচরাচর উৎপত্তি হয়। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে বিশুদ্ধ পীতবর্ণ—রক্তবর্ণের সহিত হরিৎবর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। এক কথায় যে পীতবর্ণকে আমরা এতক্ষণ বিশুদ্ধ বর্ণ বলিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে দুইটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণেও উৎপন্ন হইতে পারে উহাকে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থে বিশুদ্ধ বর্ণ বল ক্ষতি নাই; কিন্তু ইহাকে মূলবর্ণ বলা চলিবে না।

বস্তুতই বিবিধ রকমে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে সূর্য্যালোক হইতে যে সকল অসংখ্য বিশুদ্ধ বর্ণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে প্রায় কেহই মৌলিক বর্ণ নহে। তাহাদের মধ্যে যে কোন বিশুদ্ধবর্ণকে অন্যান্য বর্ণ সমবায়ে তৈয়ার করিতে পারা যায়। কিরূপে তাহাদিগকে মিলাইতে মিশাইতে হইবে তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সূর্য্যালোকে বিদ্যমান যে অসংখ্য বিশুদ্ধ বর্ণের উল্লেখ। করা গিয়াছে, তাহাদের সকলেরই তিনটা মাত্র মৌলিক বর্ণকে বিবিধ ভাগে মিশাইয়া উৎপাদন চলে।

এই তিনটা মৌলিক বর্ণ নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির রক্ত, হরিৎ ও নীল। এই তিন মূল বর্ণ দেওয়া থাকিলে তাহাদিগকে নানারকম ভাগে মিশাইয়া অন্যান্য সমুদয় বর্ণ তৈয়ার করা চলে।

দুই ভাগ রক্তের সহিত পাঁচভাগ হরিৎ মিশাইলে একটা বর্ণ হয়, সাতভাগ নীল মিশাইলে আর একটা বর্ণ হয়। আবার রক্ত হরিৎ ওনীল নির্দ্দিষ্ট ভাগে মিশাইলে শাদা হয়। মৌলিক বর্ণ অসংখ্য নহে। তিনটা মাত্র মৌলিক বর্ণের বিবিধ বিধানে মিশ্রণে ও সমবায়ে সূর্য্যের আলোকে বর্ত্তমান সমুদয় বিশুদ্ধ বর্ণ তৈয়ার করিতে পারা যায়; এবং এই সকল শেষোক্ত বিশুদ্ধ বর্ণ বিবিধ বিধানে মিশাইয়া অন্যান্য যাবতীয় পাটল কপিশাদি বর্ণের উৎপাদন চলে।

একটা বিশেষ প্রকার ঢেউ অর্থাৎ যে ঢেউ আসিয়া চোখে ধাক্কা দিলে একটা বিশেষ রকম বর্ণ অর্থাৎ পীতবর্ণই অনুভূত হইবে, সে ঢেউ দ্বারা অন্য বর্ণের অনুভূতি হইবে না ইহা ঠিক্। কিন্তু সেই পীত বর্ণের অনুভূতি হইলেই যেন মনে করিওনা যে সেই ঢেউ আসিয়াই ধাক্কা দিতেছে। অন্য পাঁচ রকমের ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিয়াও সেই একই অনুভূতি জন্মাইতে পারে। এইরূপে সাবধান হইয়া বিচার পূর্ব্বক চলিতে হয়।

দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠনে এমন কি বৈচিত্র্য আছে যাহাতে এই অপরূপ ব্যাপার ঘটে; নানাবিধ ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দেয়, অথচ তিন রকম মাত্র মৌলিক বর্ণের অনুভূতি জন্মে; ও সেই তিন অনুভূতি বিবিধ বিধানে মিলিয়া সংখ্যাতীত মৌলিক বর্ণের অনুভূতি উৎপাদন করে, তাহা শরীরবিদ্যার বিষয়। এ স্থলে তাহার অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে প্রকৃতির সাম্রাজ্য মধ্যে আমরা যে সকল বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই তৎসম্বন্ধে কতক কতক আলোচনা করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইবে। তৎপূর্ব্বে একটা কথা গোছাইয়া বলা আবশ্যক।

সূর্য্যের আলোক শাদা। ইহাতে নানাবিধ আকারের ঢেউ আছে, ইহার মধ্যে কোন ঢেউ মৌলিক লোহিতের, কেহ মৌলিক হরিতের, কেহ মৌলিক নীলের অনুভূতি জন্মায়। কেহ বা লোহিত ও হরিৎ উভয় উৎপাদন করিয়া উভয় মিশাইয়া পীত বা নাগরঙ্গ জন্মায় ইত্যাদি। এবং সকলে আসিয়া একত্রে চোখে ধাক্কা দিয়া লোহিত হরিৎ ও নীল তিন মিশাইয়া শাদার উৎপাদন করে। এই তিন মূল বর্ণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট ভাগ অনুসারে একত্র না থাকিলে শাদা হয় না। একটার ভাগ কিছু কম হইলেই আলো রঙ্গিল হইয়া যায়। কাজেই শাদা আলোতে যে সকল ঢেউ বর্ত্তমান, সেই ঢেউগুলার মধ্যে কোন কোনটাকে বাছিয়া লইলেই রঙ্গিল আলো হয় বা কোন কোনটা কোনরূপে সরাইয়া ফেলিলেও রঙ্গিল আলো পাওয়া যায়। কাজেই রঙ্গিল আলো তৈয়ার করিতে হইলে সূর্য্যালোকের অন্তর্গত বিবিধ ঢেউয়ের মধ্যে একটা বা কতকগুলিকে বাছিয়া লও; অথবা একটাকে বা কতকগুলিকে কোনরূপে সরাইয়া ফেল। তখনি আলোর শুভ্রত্ব বজায় রাখিবার জন্য যে তিনটা মূল বর্ণের যে যে ভাগ প্রয়োজন, তাহার কোন একটা ভাগ কম পড়িয়া যাইবে। আলোকও রঙ্গিল হইয়া পড়িবে।

এই বাছিয়া লওয়া বা নির্ব্বাচন কার্য্য ও সরাইয়া ফেলা বা অপসারণ কার্য্য কয়েকটি মূল উপায়ে সম্পাদিত হয়। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম উপায়। সূর্য্যের আলো বায়ুর মধ্য হইতে জল বা তেল বা কাচের মত কোন ঘন সংহত স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর গেলে তাহার রাস্তা বাঁকিয়া যায়। কেন যায় সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সকল ঢেউ আবার সমান বাঁকিয়া যায় না। লোহিতজনক ঢেউ যত বাঁকে, পীতজনক তার চেয়ে বেশী বাঁকে, হরিজ্জনক তার চেয়ে বেশী, নীলজনক আরও বেশী; এইরূপ।

কাজেই শাদা আলোর অন্তর্গত ঢেউ গুলি এইরূপ ঘন স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিয়াই পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করে, এবং আবার যখন সেই স্বচ্ছ পদার্থ হইতে বাহির হইয়া বায়ু মধ্যে আসে তখন হয়ত আর মিশিবার অবকাশ না পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতে থাকে। এক এক রকমের ঢেউ এক এক রাস্তায় চলিতে থাকে; পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়—তখন তাহাদের মধ্যে কোন একটাকে বা কতকগুলাকে বাছিয়া লওয়ার সুবিধা হয়। কতকগুলা চোখে প্রবেশ করিয়া ধাক্কা দিলেই রঙ্গিল আলো পাওয়া যায়। এই রূপে ঢেউ গুলিকে পরস্পর হইতে তফাত করিয়া তাহাদিগকে বাছিয়া ফেলাকে আলোক বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। বর্ণ উৎপাদনের এই একটা প্রাকৃত উপায়। বলা বাহুল্য নিউটন এই উপায়েই সূর্য্যালোকের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উপায়। ঢেউগুলা যতক্ষণ আকাশ পথে চলে ততক্ষণ কেহ তাহাদের গতিরোধ করে না। কিন্তু চলিতে চলিতে সাধারণ জড় পদার্থের বাধা পাইলেই তাহাদের গতিবিধির ব্যতিক্রম ঘটে। সেই জড় পদার্থের পিঠে প্রতিহত হইয়া কতকগুলা ঢেউ হয় ফিরিয়া আসে, কতকগুলা হয়ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এই রূপে ভেদ করিয়া যাইবার সময় তাহার পথ বাঁকিয়া যাইতে পারে তাহা উপরে বলিয়াছি। আবার কতকগুলা ঢেউ হয়ত প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে না, রাস্তা কাটিয়া চলিয়া যাইতেও পারে না; তাহারা সেই জড় দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলির মধ্যে আটকা পড়িয়া পথি মধ্যেই নষ্ট হয়। যে সকল ঢেউ ফিরিয়া যায় বা প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায় তাহাদের সহিত জড় পদার্থের অণুগুলির বড় গোলযোগ ঘটে না:—অণুরাও তাহাদের বাধা দেয় না, তাহারাও অণুগুলিকে কোন রূপ বিচলিত করে না। কিন্তু আবার কতকগুলি ঢেউ অণুগুলিরই গায়ে ধাক্কা দিয়া অণুগুলিকেই বিচলিত ও আন্দোলিত করিয়া যায়। অণুগুলি ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া চঞ্চল হয় ও কাঁপিতে থাকে, কিন্তু আকাশের ঢেউ সেই খানে থামিয়া যায় ও নষ্ট হয়। অণুগুলি ঐরূপ কাঁপিতে থাকিলে আমরা বলি তাপের উৎপত্তি হইল, জিনিষটা গরম হইল; আলোক এই স্থানে নষ্ট হইয়া তাপের উৎপাদনে প্রযুক্ত হইল। এই ঢেউগুলার অদৃষ্ট খারাপ; ইহারা অণুর সহিত লড়াই করিতে গিয়া নিজেরাই নষ্ট হয়, ও প্রকৃতই পথে মারা যায়।

জড় দ্রব্যের অণুগুলি যে এইরূপে আকাশের ঢেউ গুলিকে নষ্ট করিয়া নিজে কাঁপিতে

থাকে, ঢেউগুলিকে আহার করে ও নিজে পুষ্ট হয়, এই ব্যাপারকে আমরা আলোকের শোষণ বলিব। আর ঢেউগুলির জড় পদার্থের গায়ে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্তন ব্যাপারকে প্রতিফলন বলিব।

এখন এই খানে একটু রহস্য আছে। কোন কোন দ্রব্য সূর্য্যালোকের অন্তর্গত সকল ঢেউকেই ফিরাইয়া দেয় বা প্রতিফলিত করে; যেমন পালিশ করা রূপা, অথবা পারদের দর্পণ। এইরূপ শাদা কাগজ, শাদা কাপড়, শাদা খড়ী, শাদা দুধ প্রভৃতি সমস্ত শাদা পদার্থই বাছ বিচার না করিয়া সকল ঢেউকেই ফিরাইয়া দেয়; এবং সকলকেই এইরূপে ফিরায় বলিয়া তাহারা শাদা। আবার কাল কালী, কাল কাপড়, কাল কাগজ, কাল কয়লা প্রভৃতি দ্রব্য প্রায় সকল ঢেউকেই বাছাই না করিয়া অপক্ষপাতে শোষণ করিয়া লয়; এবং এইরূপে শুষিয়া লয় বলিয়াই তাহারা কাল। আবার জল বায়ু কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থ কাহাকে বড় ফিরায়ও না, শোষণেও বড় পক্ষপাত দেখায় না, প্রায় সকলকেই রাস্তা ছাড়িয়া দেয়; তাহারা এই জন্যই স্বচ্ছ। কিন্তু এতদ্ব্যতীত রঙিল জল, রঙিল কাচ, রঙিল কাগজ, রঙিল কাপড় ইহাদের বর্ণ রঙিল এই জন্য যে ইহারা পক্ষপাত পরায়ণ; সকল ঢেউয়ের উপর ইহাদের সমান বিচার নাই, ফিরাইবার সময় কোন কোন ঢেউকে বাছাই করিয়া ফিরাইয়া দেয়; শোষণের সময় কোন কোন ঢেউকে বাছিয়া শুষিয়া থাকে; সকলের প্রতি সমান বিচার হয় না। ফলে কোন কোন ঢেউ আটক পড়িয়া শোষিত হয়; আবার কেহ ফিরিয়া আসে বা রাস্তা ভেদ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়। এই নির্ব্বাচনের ফলে আর শুভ্র আলো আমরা পাই না। যে আলো ফিরিয়া আসে বা ভেদ করিয়া চলিতে পায়, সে আলো রঙিল দেখায়। এই নির্ব্বাচন প্রাকৃতিক বর্ণ বিকাশের একটা প্রধান কারণ।

তৃতীয় উপায়। এই তৃতীয় উপায় বুঝিবার পূর্ব্বে ঢেউতত্ত্ব আর একটু আলোচনা আবশ্যক। ঢেউ, ঊর্ম্মি, তরঙ্গ, হিল্লোল, যাহাই বল, এই সকলের একটু অপরূপত্ব আছে। জলের ঢেউ মনে কর। তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলে দেখা যায়; কোন দ্রব্য যদি সে সময় জলে ভাসে, সে সেই তরঙ্গের লীলাতে একবার উঠে একবার নামে। এই উঠানামা তরঙ্গ মাত্রেরই একটা প্রধান বিশেষ ধর্ম্ম। তরঙ্গের পর তরঙ্গ যখন চলিয়া যায়, তখন দেখা যাইবে জল একবার উঠিতেছে, একবার নামিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের সারির বা শ্রেণীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, উচু, খাল, উচু, খাল, উচু, খাল এইরূপ ক্রমান্বয়ে পর পর চলিয়াছে। একটা গোটা ঊর্ম্মির অর্দ্ধেক ভাগ উচু—সেই ভাগকে আমরা মাথা বলিব; আর এক ভাগ নীচু—সেই ভাগকে পেট বলিব। মাথা, আর পেট—শব্দ দুইটা সভ্যসমাজের অনুমোদিত হইবে না; কিন্তু এক্ষণে পরিভাষা সঙ্কলন পরিশ্রমের অবকাশ নাই। আমাদের পক্ষে ঐ ভাল। তরঙ্গের এক ভাগ মাথা, এক ভাগ পেট। এখন কখন কখন দুইটা স্থান হইতে তরঙ্গ শ্রেণী জন্মিয়া আসে। পুকুরের জলে একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে সেখান হইতে এক সারি তরঙ্গ জন্মিয়া চারি-

দিকে ছড়াইয়া পড়ে, আবার আর এক জায়গায় নিক্ষেপ করিলে সেখান হইতেও আর এক সারি তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এইরূপ দুইটা স্থান হইতে সারি সারি ঢেউ আসিতে হইলে এমন হয় এ সারির ঢেউএর উপর ও সারি আসিয়া পড়ে। ইহার মাথার উপর উহার মাথা পড়ে, ইহার পেটের উপর উহার পেট পড়ে, অথবা এক সারির মাথার উপর আর এক সারির পেট পড়ে। এরূপ ঘটনা সচরাচরই একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই জলাশয়ের পৃষ্ঠে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এখন একটার মাথার উপর আর একটার পেট পড়িলে উভয়ে কাটাকাটি হইয়া সেখানে মাথাও থাকে না, পেটও থাকে না। জল উঁচুও হয় না, নীচুও হয় না; ঠিক্ সমতল থাকিয়া যায়; ঢেউএর উপর ঢেউ পড়িয়া পরস্পরকে নষ্ট করিয়া ফেলে। জলের ঢেউর মধ্যে যেমন কাটাকাটি হয়; তেমনি আকাশের ঢেউর মধ্যেও কাটাকাটি হয়। পেটের উপর মাথা ও মাথার উপর পেট কোনক্রমে পড়িলেই কাটাকাটি হইয়া ঢেউ নষ্ট হইবে। ফলে আমরা যাহাকে ছায়া বলি ও অন্ধকার বলি, তাহা এইরূপ কাটাকাটিরই ফল। আঁধারের মধ্যে আকাশের ঢেউ একবারে নাই এরূপ মনে করিও না; সেখানে এত ঢেউ এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে যে পরস্পর কাটাকাটিতে সকলেই লুপ্ত হইয়াছে। আলোতে আলোতে মিলিয়া একবারে আঁধার হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্—এই ন্যায়ে।

গল্প আছে দুইটা সাপে পরস্পরকে ভোজন উদ্দেশ্যে পরস্পরের লেজে আরম্ভ করিয়া গিলিতে লাগিল। পরিশেষে উভয়েরই বিলোপ—কতকটা সেইরূপ।

এইরূপে আলোর উপর আলো চড়িয়া আঁধার হইয়া যাইতে পারে। আবার সূর্য্যের আলোকের মধ্যে লাল আলো লাল আলোর সঙ্গে মিলিয়া লালকেই বিলুপ্ত করে, নীল নীলের সঙ্গে মিলিয়া নীলই বিলুপ্ত হয় ইত্যাদি। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা রঙিল আলো। শাদা হইতে তাহার একটা অংশ নষ্ট করিলে বা অপরসারিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা রঙ্গিল।

এইরূপে বর্ণোৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিস্তর পাওয়া যায়। জলে এক ফোঁটা তেল ফেলিলেই সেই ক্ষুদ্র তেল ফোঁটা অনেকটা প্রশস্ত জায়গায় তখনি ছড়াইয়া পড়ে। তখন তাহাতে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। জলের উপর তেলের একখানি সূক্ষ্ম পরদা বা আস্তরণ বা চাদর পড়িয়া যায়। তাহার স্থূলতা মাপিয়া উঠিতে হইলে আর ইঞ্চির কাঠিতে চলে না; ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগ কি দশ লক্ষ ভাগ করিতে হয়। আকাশবাহী আলোকোৎপাদক ঢেউগুলি যে কাঠিতে মাপা যায়, এই পরদার স্থূলতাও সেই কাঠিতে মাপিতে হইবে। এখন মনে কর ঐ তেলের সূক্ষ্ম পরদার পিঠে লাল আলোর ঢেউ পড়িল। কতক গুলা ঢেউ সেই পিঠে লাগিয়াই প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। কতকগুলা তেলের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়া শেষে নিম্নস্থ জলের পিঠে ঠেকিয়া প্রতিফলিত হয়, ও ফিরিয়া চলিয়া আসে। তেলের পিঠ হইতে যাহারা ফিরে কাজেই তারা একটু আগিয়া থাকে; যাহারা জলের পিঠ

হইতে ফিরে তারা একটু পিছাইয়া পড়ে; ঐ যে একটু প্রবেশ লাভ করিয়া ছিলেন, তাহাতে এই লাভটুকু হয়। একটু পিছাইয়া পড়ায় হয়ত এমন ঘটে, যে ইহাদের মাথার উপর উহাদের ঠিক্ পেট আসিয়া পড়ে; ফলে উভয়েরই সর্ব্বনাশ ও লোপাপত্তি; কেহই আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারেন না, রাস্তাতেই তাহাদের শেষ হয়। এইরূপে লাল আলোর লোপাপত্তি সাধন ঘটে। নীল আলো পড়িলে তাহার ভাগ্যে হয়ত ততটা ঘটে না; কেননা লালআলোর ঢেউগুলা একটু লম্বা লম্বা, নীল আলো তাহার চেয়ে একটু খাট খাটো। নীলের মধ্যেও যাঁহারা প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া আসেন তাঁহারা পিছু পড়েন, এমন কি, তাঁহারা খাটো বলিয়া একটু অধিকই পিছাইয়া পড়েন। কিন্তু তাহাতেই তাঁহারা আবার বাঁচিয়া যান। কেননা পেটের পর মাথা আর মাথার পর পেট। তাঁহাদের পক্ষে মাথায় পেটে ঠোকাঠুকি না হইয়া মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ত ঘটিয়া যায়। ফলে তাহারা বাঁচিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রেএকটা রঙের লোপ হইলে অন্যান্য রঙ অনেকটা নিষ্কৃতি পায়। শাদা আলো পড়িলে তাহার মধ্যে একটা রঙ, লাল বা নীল বা পীত, এমনি একটা কিছু লোপ পায়; বাকীগুলা জয়ধ্বনি দিয়া রঙদার হইয়া ফিরিয়া আসে। দল বাঁধিয়া অনেকেই যান—তখন আলো থাকে শাদা—সঙ্গীহারা হইয়া ফিরিয়া আসেন—তখন আলো হয় রঙিল।

আর এক রকমে এইরূপে বর্ণ বিশেষের লোপাপত্তি ঘটে। দুই তিনটা বা অনেকগুলা সরু সরু ছিদ্র বা আলোকের পথ বা আলোকের জন্মস্থান সারি সারি কাছাকাছি থাকিলে সকল স্থান হইতেই ঢেউ আসে। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট স্থলে সকলে এক সঙ্গে পৌঁছিতে পারে না; কেহবা একটু আগে পৌঁছায়, কেহ একটু পরে পৌঁছায়; কাজেই পেটে মাথায় ও মাথায় পেটে হইয়া আলোর লোপ ঘটিয়া আঁধার ঘটে বা বর্ণ বিশেষের লোপ ঘটিয়া শাদা আলো রঙিল আলোতে পরিণত হয়। হাতের দুই আঙ্গুল সংলগ্ন করিলে তাহার মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ দীর্ঘাকার আলোর পথ থাকে, অথবা কাগজে ছুঁচ দিয়া ফুটা করিলে আলোর যে ছোট পথ হয়, সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র রাস্তায় চোখ রাখিলে দেখা যায়, পথ দিয়া আলো আসিতেছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে কালো কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। একখানা পালিশ করা ধাতুপাত্রের গায়ে বা একখানা কাচের গায়ে খুব কাছাকাছি করিয়া, মনে কর একইঞ্চি স্থানের ভিতর দু দশ হাজার করিয়া, সমান্তরাল রেখা টানিলে দুই দুই রেখার মধ্যস্থ স্থান হইতে আলো আসে, এবং সেই বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত আলো পরস্পর কাটাকাটি করিয়া রঙিল আলোর সৃষ্টি করিয়া থাকে। মশা মাছি ফড়িঙ প্রভৃতি যখন রৌদ্রে উড়ে, তখন তাহাদের পাখায় নানাবিধ রঙের আবির্ভাব দেখা যায়। সেও অনেক সময় এই কারণে। তাহাদের পাখায় গায়ে লম্বা লম্বা সরু সরু অনেক দাগ আছে। তাহারই সহিত এই রঙের সম্বন্ধ।

প্রাকৃতিক পদার্থে বর্ণের বিকাশের এই ত্রিবিধ প্রধান কারণের উল্লেখ করিলাম। এখন গোটা কতক উদাহরণ দেখাইলেই পাঠক পরিত্রাণ পান।

শাদা আলো ভাঙ্গিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া অনেক স্থানে রঙ জন্মে। এস্থানে সংহত দ্রব্যের ভিতর আলো ঢুকিয়া ঢেউগুলির রাস্তা ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। রামধনুর রঙ্ এই কারণে জন্মে। এ যেন নিউটনেরই সেই প্রাচীন পরীক্ষা প্রকৃতি ঠাকুরাণী স্বহস্তে সম্পাদন করিতেছেন। সূর্য্য মণ্ডল ও চন্দ্র মণ্ডল ঘেরিয়া সময়ে সময়ে যে রঞ্জিত চক্রাকার মণ্ডল দেখা যায় সেই এইরূপ। মেঘের জলকণা বা তুষার কণা শুভ্র আলোককে ভাঙ্গিয়া বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ছড়াইয়া দেয়। ঝাড়ের কলমের রঙ, দূর্ব্বাদলে শিশির বিন্দুর রঙ, হীরকখণ্ডে প্রতিফলিত রঙ এ সকলের একই রকম মূল। একই কারণ—বিশ্লেষণ।

রঙিল কাচের রঙ, রঙিল জলের রঙ অন্য কারণে, অর্থাৎ দ্বিতীয় কারণে। শাদা আলো প্রবেশ করিল; কোন কোন রঙ আটকাইয়া শোষিত হইয়া গেল; বাকীগুলা ফিরিয়া আসিল। অনেক বায়বীয় পদার্থ রঙিল দেখা যায়—ব্রোমিন, ক্লোরিন, আয়োডীন প্রভৃতি বায়বীয় অবস্থায়—নাইট্রিক এসিড্ হইতে যে বাষ্প উঠে সেই বাষ্প রঙিল; শাদার মধ্যে কোন একটা রঙ আটকান যায়; বাকী চলিয়া আসে। রঙিল কাগজে, রঙিল কাপড়ে, পুস্তকের রঙিল মলাটে, যে সকল রঙ দেখা যায়, কাঠের গায়ে, দেওয়ালের গায়ে যে সব রঙ মাখান দেখা যায়, ছবি আঁকিতে চিত্রবিদ্যা যে শত সহস্র রঙ ব্যবহার করে, সোণা তামা পিত্তল প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের রঙ—এ সমস্তই এইরূপে বুঝিতে হইবে। শাদা আলো গিয়া গায়ে পড়িল। কোন কোন রঙের আলো একটু প্রবেশ করিয়া আটক পড়িল। কোন কোন রঙের আলো ফিরিয়া প্রতিফলিত হইয়া আসিল। মূল কারণ—বাছিয়া শোষণ।

সাগরের জলের বর্ণ গাঢ় নীল; শুভ্র সূর্য্যালোকের সহস্র ঢেউ সমুদ্র বক্ষে পড়ে; সকলে ফিরিয়া আসে না; গভীর জলরাশি বাছিয়া বাছিয়া টানিয়া লয় ও শোষণ করে।

আকাশের বর্ণ নীল, কেন কিছু দিন পূর্ব্বে লোক বুঝিত না। বায়ুমধ্যে অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা সর্ব্বদা ভাসে। এত সূক্ষ্ম যে সহজে চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে আজিকাল তাহাদের সংখ্যা গণিবার উপায় স্থির হইয়াছে। একটা ছোট কুঠরির মধ্যে বায়ুতে কতকোটি ধূলি কণা আছে গণিতে অধিক আয়াস হয় না; এই ধূলিকণা আকাশের নীলত্বের কারণ। আকাশ বাহিয়া ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ চলে। ধূলিকণা গুলি এত ছোট, যে লাল আলোর ঢেউ বা পীত আলোর ঢেউ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। নীল আলোর ঢেউ আরও ছোট, তাই তাহারা ধূলিকণাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। যেমন প্রস্তর খণ্ড বা উপলখণ্ড বড় বড় জলের ঢেউ প্রতিহত করে না; তবে ছোট ছোট মৃদু হিল্লোলকে ফিরাইয়া দেয়; কতকটা সেইরূপ। সূর্য্যের শুভ্র আলোক বায়ুরাশিতে প্রবেশ করে। রক্ত আলোক পীত আলোক অবাধে চলিয়া যায়। নীল আলো ফিরিয়া আসিয়া চোখে লাগে।

অস্তের সময় ও উদয়ের সময় দিগ্বলয় অরুণ রাগে রঞ্জিত হয়। সূর্য্যের আলোক তখন গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে। ধূলিকণায় ঠেকিয়া নীল আলোর ভাগ প্রতিহত হয়

ও সূর্য্যের অভিমুখেই চলিয়া যায়। লালের ভাগ ও অরুণের ভাগ অধিক মাত্রায় বায়ুভেদ করিয়া আসে। সেই অরুণ রাগরঞ্জিত আলো আবার মেঘের গায়ে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র রক্ত ও বর্ণের বিকাশ করে।

শোণিতের বর্ণ লাল; তরল শোণিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভাসে; তাহারা নীলের ভাগ হরণ করিয়া ও শোষণ করিয়া লয়। বৃক্ষ লতা তৃণ, সাধারণতঃ উদ্ভিদের বর্ণ, হরিৎ; তাহাদের পাতার গায়ে একপ্রকার পদার্থ থাকে, তাহারা লোহিতের ভাগ হরণ করে ও শোষণ করে। যে সকল ঢেউ প্রতিফলিত করে, তাহারা মিলিয়া হরিতের আবির্ভাব করে।

হরিতালের পীত, সিন্দূরের লোহিত, তুঁতের নীল, হীরাকশের সবুজ, একই কারণে। শাদা আলোর মধ্যে কেহ কোনটা বাছিয়া গ্রহণ করে, কেহ কোনটা বাছিয়া গ্রহণ করে; যে সকল ঢেউ ফিরিয়া আসে তাহারা একত্র মিশিয়া পীত বা লোহিত বা সবুজের অনুভূতি জন্মায়। অমুক দ্রব্যের রঙ পীত বলিয়া যেন মনে করিও না, যে উহা বিশুদ্ধ পীত অর্থাৎ সূর্য্যালোকের সেই ঢেউ গুলি প্রতিফলিত হইয়া আসিতেছে যাহারা পীতবর্ণের অনুভূতি জন্মায়। খুব সম্ভব পীতজনক ঢেউ একবারেই আসিতেছে না;—রক্তজনক ও নীলজনক ঢেউ বা অন্য কোন পাঁচরকমের একত্র আসিয়া পীতের অনুভূতি জন্মাইতেছে।

পদার্থ মাত্রই পরমাণুর বিবিধ বিধানে সমাবেশে গঠিত। অণু ও পরমাণুর গঠনের সহিত ও তাহাদের সমাবেশের সহিত বর্ণোৎপাদনের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা এখনও ঠিক্ করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে একটা সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। কতকগুলি ধাতু পদার্থ আছে, যথা তাম্র, লৌহ, ক্রোম, মঙ্গন, নিকেল, কোবাল্ট; এই সকল ধাতু যে সকল পদার্থে বর্ত্তমান তাহারাই সাধারণতঃ বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বিকাশ করে। অন্যান্য ধাতু যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাদের সেরূপ বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ বিকাশের শক্তি নাই। কাচের রঙ ও বিবিধ মণিরত্নাদির রঙ এই সকল ধাতুদ্রব্যের অস্তিত্বসূত্রে জন্মে; আবার কয়লা ও উদজান ও অম্লজানের পরমাণু নির্দ্দিষ্ট বিধানে সঙ্গত ও সমাবিষ্ট হইয়া এক শ্রেণীর পদার্থের সৃষ্টি করে, তাহারা বিচিত্র বর্ণের উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। নীলের গাছে ও হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতির গাছে এই জাতীয় পদার্থের স্বভাবতঃ উৎপত্তি হয়। আজ কাল আলকাতরা হইতে তাহার উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। এই শ্রেণীর পদার্থ বিচিত্র বর্ণ বিকাশের জন্য প্রসিদ্ধ। আজ কাল বিবিধ বর্ণের সামগ্রী এই পদার্থ হইতে প্রস্তুত হইতেছে। পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট বিধানে সমাবেশের সহিত এই বর্ণ বিকাশের কোন না কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে।

জলে তেলের ফোঁটা ফেলিলে তাহা বিস্তার লাভ করিয়া সূক্ষ্ম পরদার মত হইয়া যায় ও বর্ণের বিকাশ করে। কিরূপে করে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাটাকাটি হইয়া যায়। এইরূপে বর্ণের বিকাশের বিস্তর উদাহরণ আছে। সাবানের ফেণার গায়ে রঙ বুদ্বুদের গায়ে রঙ, চিক্কণ মসৃণ ধাতু পৃষ্ঠে ঈষৎ ময়লা জমিলে বা মরীচার সূক্ষ্ম আস্তরণ জমিলে তাহার রঙ, ঝিনুকের গায়ের রঙ, সামুদ্রিক শঙ্খ, শম্বুক, কড়ি প্রভৃতির পৃষ্ঠের

বিচিত্র বর্ণ অনেক সময় এই কারণেই উৎপন্ন হয়। মাছির পাখায়, ফড়িঙের পাখায়, অনেক পাখীর পালকে অনেক প্রজাপতির গায়ের রঙ এই কারণেই উৎপন্ন হয়।

বৃক্ষ লতা তৃণাদি উদ্ভিদের একটা সাধারণ বর্ণ আছে, হরিৎ; কিন্তু উদ্ভিদের অবয়বের মধ্যে ফুলের ও জীবশরীরের কোন সাধারণ বর্ণ নির্দ্দিষ্ট নাই। এক এক জীবের ও এক এক ফুলের শরীরে এক এক রঙ, অথবা একই জীবের শরীরে ও একই ফুলের গায়ে সহস্র রঙ দেখা যায়। এই বিচিত্র বর্ণের বিকাশ নানা কারণে ঘটে। কখনও বা এমন কোন পদার্থ গায়ে প্রলিপ্ত বা সংলগ্ন থাকে, যাহাতে পাঁচ রকমের ঢেউ বাছিয়া শুষিয়া লয়, অন্য পাঁচ রকমের ঢেউ ফিরাইয়া দেয়। কোথাও বা গায়ের উপর একটা কিছু সূক্ষ্ম পরদা থাকায় বিশেষ একটা ঢেউ কাটাকাটি হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। পাখীর ও প্রজাপতির ও শঙ্খ শম্বুকাদির বর্ণ অনেক স্থলে এই প্রকারে ঘটে। আবার কখনও বা গায়ের উপর সরু সরু ঘনসন্নিবিষ্ট রেখা কাটা থাকে; তজ্জন্যও ঢেউ আসিয়া ঢেউকে কাটে। এরূপেও অনেক স্থলে বর্ণের বিকাশ ঘটে। জীব শরীরে ও পুষ্প শরীরে এই বর্ণ বিকাশের ইতিহাস জানিতে হইলে ডারুইনের নিকট যাইতে হইবে। এস্থলে আমরা সেই ইতিহাস অবতারণ করিব না।

উপসংহারে একটা তত্ত্ব কথা আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ এই বিচিত্র বর্ণবিকাশে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি আছে কিনা? ইহাতে কোন মঙ্গলের বা অমঙ্গলের সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা? যাঁহারা প্রত্যেক জাগতিক ও প্রাকৃতিক ব্যাপারে একটা গূঢ় মঙ্গলাত্মক উদ্দেশ্য আবিষ্কার না করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না, তাঁহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই তত্ত্ব কথাটার অবতারণা আবশ্যক।

প্রথম কথা বিবিধ বিচিত্র বর্ণ বিকাশে আমাদের একটা স্থূল উপকার চোখের উপরেই দেখা যাইতেছে। এক, নানাবিধ দ্রব্য নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখাতে আমাদের জগতের সঙ্গে কারবারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। বর্ণের বিভেদ দেখিয়া আমরা বিবিধ দ্রব্যের সহিত প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইতে পারি; তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া চিনিয়া লইবার সুবিধা হয়, তাহাদিগকে সহজে পৃথক্ করিয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারি। সুতরাং প্রকৃতিতে বিবিধ বর্ণের বিকাশ আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল। আবার জীবনযাত্রার যেমন সুবিধা হইয়াছে, তেমনি জগতে কতকটা আরাম ও কতকটা আনন্দ পাইবারও বেশ সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। সবই এক রঙ হইলে, কেবল শাদা ও কালো ও ধূসর মাত্র হইলে জগৎ নিতান্ত একঘেয়ে ও কদাকার হইয়া পড়িত। অন্ততঃ বর্ত্তমান রঞ্জিত বিচিত্র জগতে যিনি কিছুদিন বাস করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই একরঙা জগতে ছাড়িয়া দাও, তিনি হয়ত জীবন অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ স্থির করিবেন।

কিন্তু এই স্থূল কথায় আবদ্ধ থাকিলে চলিতেছে না। বর্ণবৈচিত্র্যে জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষায় বন্দোবস্তের সুবিধা হয়, তাহা ব্যতীত খানিকটা আনন্দ ও আরামও লাভ করা যায়। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলে তৃপ্তি হইবে না। সাধারণ ছাড়িয়া বিশেষে আসিতে হইবে।

আকাশের নীলবর্ণের বিশেষ উপযোগিতা কি? নীল হওয়াতে কিছু লাভ হইয়াছে কি? নীলাকাশ দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হয় জানি, কিন্তু নীল না হইয়া লাল হইলে তেমন প্রফুল্লতা জন্মিত কি না সহজে বলিতে পারি না। সিন্দূরের রক্তরাগে, হরিতালের পীতরাগে এমন বিশেষ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য কিছু আছে কি? সুন্দরীর ললাট রঞ্জনের জন্য সিন্দূর সৃষ্ট হইয়া সিন্দূরস্রষ্টার মঙ্গলোদ্দেশ্য পূর্ণ করিতেছে বলিতে পার; কিন্তু যখন সুন্দরীর ক্রোড়স্থ শিশু সুন্দরীর অজ্ঞাতসারে হরিতালের রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে গলাধঃকরণ করে, তখন সেই মঙ্গলোদ্দেশ্য কোথায় থাকে? নীলাম্বুধির নীলিমা তৃপ্তি সাধন করে সত্য; কিন্তু প্রাকৃত নীলাম্বুধি পৌরাণিক ক্ষীরাম্বুধিতে পরিণত হইলে কি আরও উপাদেয় হইত না? তমাল তালীবনরাজিনীলা সাগরবেলা নয়নরঞ্জিনী সন্দেহ নাই, কিন্তু নীলার বদলে পীতা বিশেষণ বসাইবার অবকাশ দিলে নয়ন কি একেবারেই ঝলসিয়া যাইত?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তত্ত্বান্বেষী পরমার্থবেত্তাদের জন্য এই সকলের মীমাংসার ভার রাখিয়া দিয়া আমরা প্রকৃতির বর্ত্তমান বর্ণ বৈচিত্র্যে যে আনন্দটুকু পাইয়া থাকি তাহাই উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইব। আকাশ নীল না হইয়া পীত হইলে কি দোষ হইত তত্ত্বান্বেষীরা স্থির করিয়া আমাদিকে বলিয়া দিবেন। আমরা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেই নীলসৌন্দর্য্যে বিশ্বসৌন্দর্য্যের অংশ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দামৃত পান করিতে থাকিব। এই আমাদিগের পরম লাভ।

একটা পুরাতন ভয় ও তাহার অমূলকতা।

সিকি শতাব্দীরও পূর্ব্বে প্রথম আফগাণযুদ্ধ হইতে বর্ত্তমানের টৌচীঅভিজান পর্য্যন্ত সমস্ত যুদ্ধেই যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ক্ষণে ক্ষণে এক একটি ভিমরুলের চাকে আঘাত করিয়া আসিয়াছেন তাহাদের সকলের মূলেই রুসভীতি বিদ্যমান। রুসিয়ার ভারত আক্রমণের কাল্পনিক বিভীষিকা চিরকাল ভারত গবর্ণমেণ্টকে পরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; এবং এজন্য তাঁহাদের কি পরিমাণ অর্থ অজস্র জলের মত ব্যয় করিতে হইতেছে এবং আত্মসম্মান ও 'প্রেষ্টিজ' রক্ষার অভিপ্রায়ে তাঁহারা কিরূপে আত্মসম্মান বিড়ম্বিত করিয়া তুলিতেছেন তাহা সাময়িক পত্রিকায় পাঠকগণের নিকট পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

আফগাণিস্থানের আমীরের দুর্ল্লভ বন্ধুত্ব ক্রয় করিবার জন্য প্রতি বর্ষে যে অষ্টাদশ লক্ষ মুদ্রা অপব্যয় করা হয়, বাহ্যদৃষ্টে এই ব্যয়বাহুল্যের মধ্যে বন্ধুত্বের তুলনায় অর্থের প্রতি যে পরিমাণ ঔদাসীন্যই প্রকাশিত হউক এবং ইহাতে বন্ধুত্বের বাঁধ যতই দৃঢ় হউক একথা অবিসম্বাদিত রূপে সত্য যে এই লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর ভারত ধনভাণ্ডার হইতে এরূপে ব্যয়িত না হইলে ইহাদ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইত। ইহা বোধহয় কেহই

অস্বীকার করিবেন না যে রুসিয়ার ভারত-প্রবেশ-দ্বার রোধ করিবার জন্যই এই বন্ধুতা ক্রয়ের আয়োজন, কিন্তু ইহাতে বৃটীশ সিংহের হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য কতটা প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাহা আলোচনা করিবার অবসর বৃটীশরাজতরণীর কর্ণধারগণের যে একেবারেই নাই, ইহা অতীব বিস্ময়ের কথা।

তাহার পর গবর্ণমেণ্টের 'ফরওয়ার্ড' পলিসী, এই পলিসীর অনুরোধেও গবর্ণমেণ্টকে অনর্থক অগণ্য অর্থব্যয় করিতে হইতেছে। এই উপলক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের কত বিশ্বস্ত, বীর সেনা ও সেনাপতি অকারণ আহবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলে এই সমস্ত অনাবশ্যক অভিযানে লাভ অপেক্ষা লোকসান যে কত অধিক তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতের রাজকোষ হইতে এই সকল অনাবশ্যক সমরব্যয় নির্ব্বাহিত না হইয়া যদি ইংলণ্ডকে এই ব্যয়ভার বহন করিতে হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষ অনেক শোণিত-স্রাব হইতে রক্ষা পাইত।

কিন্তু রুসিয়ার যে আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের এই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, তাহা কিরূপ দুষ্কর বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা তাহারই আলোচনা করিব; স্বাধীন এবং নির্ভীক বৃটীশ নন্দনের মনে রুষাতঙ্কের প্রাবল্যের কারণ আমরা ধারণা করিতে পারিনা, কিন্তু এক কথা অস্বীকার করা যায় না যে 'নবভ্রেমি' 'নভস্তি' কি অন্য কোন রুসিয় পত্রিকায় ভারতের প্রতি সামান্য কটাক্ষ থাকিলেই ইংরাজ রাজনৈতিকদিগের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই ক্ষুদ্র এবং নগণ্য সংবাদকে আন্দোলিত আলোড়িত ও বহু বিস্তৃত করিয়া ফেলেন, অবশেষে টীকা এবং ভাষ্য সমেত সেই তুচ্ছ সংবাদ এরূপ বর্দ্ধিত আকার ধারণ করে যে তাহার অন্ত পাওয়াই কঠিন হইয়া উঠে। কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদ আসিল রুসিয়ানরা দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গরাজির উপর দিয়া অতি চমৎকার পথ প্রস্তুত করিতেছে, আর চতুর্দ্দিকে একটা বিভীষিকার নিবিড় ধূম্রালোক সৃষ্ট হইল, অবশেষে সত্যের জলন্ত বহ্নি বিদ্যমানে সেই ধূম্র অপসারিত না হইতেই গত ৮ই অক্টোবর বিলাতের টাইমস্ পত্রিকার ভিয়েনাস্থ সংবাদদাতা রুষের আক্রমণসম্ভাবনা সম্বন্ধে এক গল্প প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, গল্পটির সারমর্ম্ম এই :—"কয়েকদিন হইল আমার কোন প্রবাসী বন্ধুর নিকট হইতে এই গল্পটি জানিতে পারিয়াছি, তাঁহার কথা বিশ্বাস যোগ্য; তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে প্রিন্স লোবানফ (ভূতপূর্ব্ব রুসিয় সেনাপতি) কতকগুলি কাগজপত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি পৃথিবীতে রুসিয়ার স্বকার্য্য সাধন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত পরিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, অন্যান্য কথার মধ্যে উক্ত প্রিন্স একথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে ইংলণ্ড আর জার্ম্মেণী হইতেই রুসিয়ার যাহা কিছু আশঙ্কা; যাহা হউক তাঁহার ভরসা চারিবৎসরের মধ্যেই এসিয়াতে রুসিয়ার রেল পথ নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে, তখন ভারতবর্ষের মাথায় লাঠি মারিতে আর বিলম্ব হইবে না তাহার পর যদি

আদত দেশটা হইতে ইংলণ্ডীয় উপনিবেশগুলিকে তফাৎ করা যায় তাহা হইলে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটান শক্ত হইবে না।"— বিদ্যুৎ-গতিতে এই সংবাদ সমস্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং রুষাতঙ্কগ্রস্ত ইংরেজের মনে অধিকতর বিভীষিকার সঞ্চার করিল। এই সকল আতঙ্কগ্রস্ত প্রাণীর মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা উচ্চ রাজনীতিবিদ্ বলিয়া সাধারণের নিকট সুপরিচিত, কিন্তু সম্প্রদায়গত খেয়ালের খাতিরে তাঁহারা এই ভীতির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কিছু মাত্র বিবেচনা করিবার অবসর পান না।

এই সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেরই বিশ্বাস গ্রেটবৃটেনের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইবার জন্য রুসিয়ানগণ মধ্য এসিয়ার বিস্তৃত আয়োজনে ব্যস্ত আছে; একথা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না যে রুসিয়াতেও এমন একদল সংগ্রামপ্রিয় দর্পান্ধ লোক আছে যাহারা শ্যেনদৃষ্টিতে ভারতের ধনধান্যপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের দিকে চাহিয়া কিছুতেই লোভ সম্বরণে সক্ষম হইতেছে না, কিন্তু রুসিয়ার সুগুরুশাসনভার যাঁহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত আছে, রুসিয় রাজতরণীর সেই সকল কর্ণধারগণ এই দুষ্কর অভিযানের পক্ষপাতী এরূপ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র পাওয়া যায় নাই, ইহার স্বপক্ষে তাঁহারা যে অনুকূল মত প্রকাশ করেন নাই, তাহার প্রচুর কারণ বর্ত্তমান দেখা যায়, এই দুরূহ কর্ম্ম যে তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত তাহা তাঁহারা অবগত আছেন; সত্য বটে যে সেনাপতি স্কবেলেক মধ্যএসিয়ার দুরধিগম্যতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়া বহুপূর্ব্বে এইরূপ আস্ফালন করিয়াছিলেন যে আসিয়িক অশ্বারোহী সৈন্যসামন্তবর্গকে শোণিতময় পতাকামূলে সম্মিলিত করিয়া ভারতবর্ষ লুণ্ঠন পূর্ব্বক তৈমূরলঙ্গের কথা স্মরণ করান যাইতে পারে; কিন্তু মৌখিক আস্ফালনে কথাটা যতই সহজ বলিয়া মনে হউক, প্রকৃতকার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্কবেলেক বুঝিতে পারিলেন কথা আর কাজ এক রকম জিনিষ নহে, কারণ যে তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যের উপর তাঁহার ভরসা, তাহা নিতান্তই মুষ্টিমেয়; তথাপি স্কবেলেকের এই বীরদর্পে বহুলোকের হৃদয়াভ্যন্তরে একটি উৎসাহহিল্লোল অনুভূত হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্কবেলেক যখন মধ্যএসিয়ার সহিত সমধিক পরিচিত হইলেন তখন তিনি তাঁহার ভ্রান্তি সম্যক-রূপে বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন একথাও স্বীকার করিলেন যে ইংরেজরা রুসিয়ার আক্রমণের সম্ভাবনার কথা লইয়া কেন আন্দোলন করে তাহা তাঁহার বুদ্ধির অতীত (He did not understand what our (English) military men meant by talking of a Russian invasion of India). তাহার পর তিনি বলিয়াছেন "এরূপ অভিযানের অধিনায়ক হইবার লোভ আমার কিছুমাত্র নাই। যদি স্কবেলেকের মত সেনাপতির এই অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে রুসিয়ার এমন বীর কেহ নাই যিনি এই দুষ্কর ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক রুসিয়বাহিনীকে ভারত অভিমুখে পরিচালিত করিতে সাহসী হইবেন।" অন্যতম রুসীয় সেনাপতি গ্রডেকফের অসাধারণ প্রতাপ, বিপুল ধৈর্য্য, এবং তাঁহার প্রতি সৈন্যমণ্ডলীর অবিচলিত ভক্তি শ্রদ্ধা

ও বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি আখেলটেক নামক অভিযানের জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত আক্রমণ বিষয়ে সেনাপতি স্কবেলেকের সহিত তাঁহার মতভেদ দৃষ্ট হয় না। তিনি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে কার্য্যোপযোগী সুদক্ষ সৈন্যদল প্রেরণ করা অসম্ভব। তাঁহার নিকট রুসিয়ার ভারত আক্রমণ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে।

যদি তর্কের অনুরোধেও একথা স্বীকার করা যায় যে এই সকল সেনাপতি যে প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের জন্য আন্তরিকতাশূন্য মৌখিক কপটতা মাত্র, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অন্তরের বাহিরে যে কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী প্রদান করিতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই সত্য কথা জ্ঞাত হইবার একমাত্র উপায়। বলা বাহুল্য যে নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সকল দৃশ্য কাহারো নয়ন পথ হইতে সংগুপ্ত থাকিবার নহে, তদ্ভিন্ন এ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের—কি পর্ব্বতবাসী, পরিশ্রমী, কষ্টসহ অশ্বারোহিসৈন্য; কি সমতল ক্ষেত্রের আরামপ্রিয়, নিরীহ অধিবাসী কাহারো বিভিন্ন মত পরিব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তথাপি ভারতের ভূতপূর্ব্ব অদ্বিতীয় সেনাপতি লর্ড রবার্টসন্ 'ফরওয়ার্ড পলিসী' নামক কূটনীতির অনুমোদন এবং তাহার সংরক্ষণে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া এই সহজ এবং অবিসম্বাদিত মতটিকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বীর পুরুষের দুর্জ্জয় বাহুবল এবং দর্পোদ্ধত বিক্রমের অন্ধ আত্মম্ভরিতা এত সহজেই তাঁহাকে স্বকীয় অভিপ্রায় সিদ্ধির অনুকূল স্রোতে টানিয়া লইয়া যায়, এবং অনাবশ্যক বিবাদের পথ এইরূপে প্রশস্ত হইয়া উঠে!

রুসিয়ার পক্ষে ভারত আক্রমণ যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা প্রাকৃতিক বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, রুসিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে তাহা ইংলণ্ড অথবা ভারতবর্ষের জমীর ন্যায় সমতল কিম্বা সহজে অতিক্রম যোগ্য নহে, বৃক্ষহীন বালুকাময় সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং সমুন্নতশৃঙ্গসঙ্কুল সুবিশাল শৈলমালা এই উভয় দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র মনুষ্যের গমনাগমনের পথ রোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এই মরুভূমি ও পর্ব্বতশ্রেণীর পর আবর্ত্তময়ী খরস্রোতা প্রশস্তকায়া তরঙ্গিনী উভয় দেশের মধ্যে গভীরতর ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। কর্ণেল হানা এই সমস্ত অসুবিধাকে চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত পূর্ব্বক এই অভিযানের গুরুত্ব সুপ্রকাশিত করিয়াছেন। রুসীয় সৈন্যমণ্ডলী যদি টিফ্লিস্ হইতে অভিযান আরম্ভ করে তাহাহইলে তাহাদিগকে সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত আসিতে দুই সহস্র মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্ব প্রথমেই রসদের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, কারণ আহারাভাবে সৈন্যগণের এক পদ অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, ভারতবর্ষের নিকটে আসিয়া পড়িলে হয়ত তাহাদের খাদ্যাভাব না ঘটিতে পারে, কিন্তু যে জনবিরল, অনুর্ব্বর এবং অসমতল কর্কশ প্রদেশের অভ্যন্তর দিয়া তাহাদিগকে আসিতে

হইবে তাহাতে খাদ্য সামগ্রীর একান্ত অভাব, সাম্রাজ্যের দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে রসদ সংগ্রহ করিয়া আনিতে নাপারিলে উপায়ান্তর নাই, অতএব সেই লক্ষ লক্ষ সৈন্ত, অশ্ব, এবং অনুচর বর্গের খাদ্য সংগ্রহের জন্য কি বিশাল আয়োজন আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার পর কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশই যাহা কিছু সুগম, বাকুতে এক আড্ডা পড়িতে পারে, টিফলিস্ হইতে বাকু ৩৪১ মাইল; ইহার উপর রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা সমর সরঞ্জাম বহনের উপযুক্ত দৃঢ় নহে, সাঁকোগুলি এতই জীর্ণ যে যে কোন মুহূর্ত্তে প্রবল বন্যায় তাহা ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যাইতে পারে, তাহাদের উপর অধিক ভার পড়ে নাই বলিয়াই এখনো সেগুলি টিকিয়া আছে। বাকু আড্ডা ফেলিবার মত স্থান হইলেও তাহা মরুভূমির উপর, ভল্গানদী হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক তৃষ্ণা নিবারণ করিলেই যদি দিনপাত করা যাইত তাহা হইলে পৃথিবীতে জীবনধারণ অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইয়া উঠিত। তাহার পর গুরুতর কথা কাস্পিয়ান সাগর পার হওয়া, ত্রিশ চল্লিশ ঘণ্টার কম এই কার্য্য সম্ভবপর নহে, হ্রদ পার হইয়া তীরে উঠা অতি কঠিন ব্যাপার, কারণ এই তীর অত্যন্ত অপ্রশস্ত এবং অসমান। বিপুল বাহিনীর পক্ষে ইহা সহজ নহে; কিন্তু সৈন্যগণ এ পথের পরিবর্ত্তে যদি কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব্বতীরের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে পানীয় জলের অভাবে পিপাসায় সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অথচ এ অঞ্চল হইতে ভারবাহী ভৃত্য পাঠাইয়া পানীয় জলের আয়োজন করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাহউক সমস্ত অসুবিধা এবং কষ্ট সহ্য করিয়া কাস্পিয়ান সাগরের পরবর্ত্তী প্রদেশে সৈন্যমণ্ডলী আনিয়া ফেলিয়াও নিস্তার নাই,—এখান হইতে রেলপথে কিছু দূর আসা যাইতে পারে বটে কিন্তু 'উসান আদা' বা 'ক্রীয়োভদক'—সৈন্যগণ যেখানেই রেলে আরোহণ করুক তাহারা নিরাপদে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারিবে এ সম্ভাবনা অতি অল্প; কারণ পূর্ব্বোল্লেখিত রেল পথ অপেক্ষাও এ পথ নিকৃষ্ট এবং ইহা বিন্দুমাত্র কম দূর নহে। সমরকন্দের ভিতর দিয়া পদব্রজে চলিবার একটা পথ আছে, এ পথে চলিলে সৈন্যগণের আহারাদির তেমন অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু কর্ষিত বা অকর্ষিত প্রান্তরের উপর দিয়া ১৪৪ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে! অক্লান্তভাবে বৈচিত্র্যশূন্য ১৪৪ মাইল পথ হাঁটিয়া পার হওয়া সহজ নহে, বিশেষতঃ তাহার পরই ২৪০ মাইল বিস্তীর্ণ মরুভূমি, বালুকা রাশি ধূধূ করিতেছে, এই মরুভূমির মধ্যে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্রে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া যেমন কঠিন, রাত্রে অনাবৃত আকাশের নীচে কালক্ষেপ করাও তেমনি কঠিন, এবং আহার্য্য ও পানীয় সংগ্রহ হওয়া অধিকতর কঠিন, কারণ ইহার মধ্যে কিজিল, আভাত, আখেলটেপ, আটক প্রভৃতি যে সকল তৃণ গুল্ম সমাবৃত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর পূর্ণ ওয়েশিস আছে তাহাদের জল এবং উৎপন্ন আহার সামগ্রী এতই অল্প যে তাহা সেই সকল স্থানের অধিবাসীগণের পক্ষেই যথেষ্ট নহে, ক্ষুৎকাতর, পিপাসাতুর উন্মত্ত রুষ সৈন্য দেশবাসীদিগকে বিতাড়িত বা বধ করিয়া তাহাদের শান্তি পূর্ণ ক্ষুদ্র কুটীর এবং

সুস্নিগ্ধ বৃক্ষাছায়া দখল করিয়া বসিতে পারে বটে কিন্তু সেই অসভ্য জাতির মুখের পরিমিত আহারে পথশ্রান্ত সৈন্য বাহিনীর ক্ষুধানল বৰ্দ্ধিত হওয়া ভিন্ন হ্রাস হইবে না। আরও এক-শত মাইল সমভূমি অতিক্রম করিলে তবে মার্ভে উপস্থিত হওয়া যাইবে, এই একশতধু মাইল অতিক্রম করা আরও দুরূহ। অনন্তর সমস্ত রুসীয় সৈন্য যদি আফগানজাতির প্রিয়তম নগর হিরাটে আসিয়া অড্ডা লয়, তাহা হইলে এখানেও অনাহারে তাহাদের প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা, কারণ ক্ষুদ্র আফগানিস্থানের সাধ্য নাই যে অগণ্য পঙ্গপালকে উপ-যুক্ত আহারদানে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, বিশেষতঃ হিরাটের রাশিকৃত মৃৎকুটীরশ্রেণী (mass of mud hovels) স্বাধীন প্রকৃতি সুস্থদেহ সবল আফগানের সুস্নিগ্ধ গৃহ বলিয়া যতই প্রীতিকর হউক—রুষ সৈন্য এখানে কিছুতেই শিবির স্থাপন পূর্ব্বক বাস করিতে সক্ষম হইবে না; আফগানজাতির নিকট যে খাদ্য প্রচুর ইহাদের নিকট তাহার যে শু অভাব হইবে বলিয়া আমরা একথা বলিতেছি তাহা নহে, আফগানজাতি সহজে ইহাদিগের হস্তে আহার সামগ্রী দান করিবে না তাহা নিশ্চয়; তদ্ভিন্ন স্ত্রীপুত্র এবং পিতামাতা লইয়া তাহারা যে স্থানে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করে, সেখানে আততায়ী বৈদেশিক সৈন্যের অশিষ্ট অনধিকার প্রবেশ কখনই তাহারা উপেক্ষা করিবে না, সুতরাং তাহাদের গোপন আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া রুসিয় বাহিনীকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমাতে গিরি সঙ্কটের সমীপবর্ত্তী হইতে হইবে। কিন্তু এখানেই অভিযানের শেষ নহে।

চিত্রল হইতে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলে এই গিরিমালা প্রায় সাত শত মাইল বিস্তৃত, ইহার মধ্যে বহু সংখ্যক গিরিসঙ্কট বর্ত্তমান আছে, তাহাদের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব। ভারতবর্ষে প্রবেশের তিনটি মাত্র দ্বার বর্ত্তমান; খাইবার পাশ, খুরাম পাশ, বোলান পাশ। সীমান্তনীতির সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া যদি এই কয়টি গিরিপথ মাত্র সুরক্ষিত রাখা যায় তাহা হইলে ভারতের বহিঃশত্রু এই সকল দুর্গম পার্ব্বত্য দুর্গের বহির্দ্দেশে পড়িয়া থাকে, তাহাদের ভারত প্রবেশ একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে যখন এই গিরিপথ কয়টি সুরক্ষিত রহিয়াছে, তখন বরোহিল কিম্বা চিত্রল লইয়া গবর্ণমেণ্টের এত অনর্থক রক্তপাত ও সৈন্যক্ষয় করিবার কি আবশ্যক ছিল? রুসিয় সৈন্য কেন, পৃথিবীতে এমন সৈন্য কোথাও নাই যাহারা এই সকল গিরিপথে ইংরে-জের অব্যর্থ কামান এবং তীক্ষ্ণধার তরবারি ও সঙ্গীনের কটক ভেদ করিয়া ভারতের অভ্যন্তর প্রদেশে অগ্রসর হইতে পারে। ইংরেজ সৈন্য নিতান্ত নিদ্রাতুর, আলস্যপরায়ণ যুদ্ধ বিমুখ না হইলে কোন বৈদেশিক সৈন্যই স্রোত-দুর্দ্দম আবর্ত্ত-সঙ্কুল সিন্ধুনদের বিশাল বক্ষে সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কিম্বা অন্য কোন প্রকারে তাহা অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু ইংরেজ সেনা, প্রবল পরাক্রান্ত শিখ অশ্বারোহী অপরাম্মুখ গুর্খা সৈন্য শত২যুদ্ধ ক্ষেত্রে বৃটীশ সৈন্যের গৌরব অক্ষত রাখিয়াছে, বর্ত্তমান টিরা অভিযানে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আরোহণ পূর্ব্বক, অক্লান্তভাবে গভীর কষ্ট সহ্য করিয়া দুর্দ্দান্ত আফ্রিদি জাতির আবাস আক্রমণ ও তাহাদিগকে সমর বিমুখ করিয়াছে; প্রবল শীতে উন্মুক্ত পর্ব্বতের উপর অপ্রচুর আহার ও পানীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রাণ পাত করিয়া তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, বর্ষায় প্রবল বর্ষণের ন্যায় বিপক্ষের অব্যর্থ গোলা গুলি বর্ষণে উপত্যকার উপর কিম্বা অধিত্যকার নিম্নে তাহারা চিরজীবনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে কিন্তু জীবিতাবশিষ্ট বীরগণ নতমস্তকে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই, তাঁহাদের মহিমান্বিত রাজ জাতির গৌরব রক্ষার জন্য, বৃটীশ সিংহের সুনাম অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত, যে সাম্রাজ্ঞী, রাজ রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে তাহারা কোনদিন চক্ষে দেখে নাই কিম্বা জীবনে কখন দেখি-

যেনা তাঁহারা সাম্রাজ্য ভিত্তি অক্ষত রাখিবার অভিপ্রায়ে সেই নির্ভীক, পরাক্রান্ত বীরমণ্ডলী শত্রুর শোণিতলোলুপ অব্যর্থ গোলাগুলির সম্মুখে বক্ষ প্রসরণ পূর্ব্বক পূর্ণ দর্পে অগ্রসর হইয়া সেই সঙ্কট শঙ্কুল শৈল শেখর হইতে তাহাদিগের বিজয় বৈজয়ন্তী নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছে। যাহারা এই প্রকার শত বাধা বিড়ম্বিত বহু দূরবর্ত্তী প্রদেশে সর্ব্ব প্রকার অসুবিধার মধ্যে বৃটীশ সিংহের জন্য অম্লানভাবে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারে, বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহারা যে ভারতবর্ষকে প্রাণপণে রক্ষা করিবে না একথা মনে করা কিছুমাত্র সঙ্গত নহে।

রুসিয় সৈন্য যদি কখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে কিরূপ দুর্লঙ্ঘ্য পথ অতিক্রম করিতে হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইল। এখন এই কার্য্যে কি পরিমাণে সৈন্যের আবশ্যক এবং তত সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক এই সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানের উদ্দেশে অভিযান সম্ভবপর কিনা আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

. সেনাপতি স্কোবেলেক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে ন্যূনকল্পে দেড় লক্ষ সৈন্যের আবশ্যক, তন্মধ্যে ৬০.০০০ সৈন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবে, অবশিষ্ট ৯০.০০০ হাজার অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিবে। সেনাপতি গ্রডেকফ্ বলিয়াছিলেন যে তিন লক্ষ সৈন্যের কমে এই কার্য্য আরম্ভ করা যায় না। গ্রডেকফের তিন লক্ষের কথা ছাড়িয়া আমরা দেড় লক্ষের কথাই প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখি; ককেশশ সৈন্য সংখ্যা দুই লক্ষের অধিক নহে, তাহাদের অধীনে ৩৮৮টি কামান আছে। এই সকল সৈন্যের মধ্যে ৭০ হাজার রেগুলার আরমি, ৫০ হাজার রিজার্ভড সৈন্য, ৩০ হাজার বেবন্দোবস্তি জর্জ্জিয়ান এবং ইয়ারিসিয়ান সেনা, অবশিষ্ট পঞ্চাশ হাজার কসাক সৈন্য। রেগুলার সৈন্য শ্রেণী হইতে একটি লোক অন্যত্র প্রেরণ করা সম্ভব পর নহে কারণ ট্রান্সকাস্পিয়া প্রদেশ এবং তুর্কী ও পারস্য সীমান্তস্থিত দুর্গ বেষ্টিত নগরাদি সংরক্ষণ কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত আছে, যে সকল সৈন্য রিজার্ভে আছে তাহারা অনেকটা মিলিসিয়ার মত, তাহারা কষ্টসাধ্য বৈদেশিক অভিযানের উপযুক্ত নহে; তাহার উপর রুসিয়ার আর্থিক অবস্থা যেরূপ বিপন্ন তাহাতে তাহারা যে অর্থব্যয় করিয়া ভারত আক্রমণের জন্য অধিক সৈন্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইবে তাহার সম্ভাবনা একবারেই নাই।

যদি তর্কের অনুরোধেও অন্তত স্বীকার করা যায় যে রুসিয়া উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইতে পারে তাহা হইলে ও জীর্ণ একহারা রেলোয়ে লাইনের (Single line Rail way) উপর দিয়া তাহাদিগকে কিরূপে ভারত অভিমুখে প্রেরণ করা যাইবে তাহা যুদ্ধ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের এক পরম দুশ্চিন্তার বিষয়। গমনাগমনের অসুবিধা কিম্বা দৈব দুর্ঘটনার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই কার্য্যে যে অর্থব্যয় হইবে তাহা রুসীয় রাজভাণ্ডারের তুলনায় বড় অল্প নহে, কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা জেক্সিলটেপ নামক স্থানে তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে এক অভিযান করেন, তাহাতে রুসীয় গবর্ণমেণ্টকে খরচের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, বর্ত্তমানের সীমান্তনীতির খাতিরে আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রতিদিন কিরূপ অর্থব্যয় করিতে হইতেছে তাহা কাহারো অজ্ঞাত নহে, অতএব সম্রাট্ এবং তাঁহার মন্ত্রীবর্গ এই অনর্থক অর্থব্যয়ে সম্মত হইবেন কি না বলা যায় না, তাহার পর শুধু অর্থব্যয় করিয়াই নিষ্কৃতি নাই, উদ্যোগ পর্ব্বে 'লটবহরা' বহনের জন্য যে প্রকার আয়োজনের আবশ্যক তাহার কথা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। আখাল জয়ের জন্য রুসিয়া পঞ্চ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ২০ হাজার উঠ পাঠাইতে হইয়াছিল;

যদি পাঁচ হাজার সৈন্যের জন্য বিশ হাজার উঠের দরকার হয় তাহা হইলে দেড় লক্ষ সৈন্যের জন্য ছয় লক্ষ উঠ আবশ্যক হইবে, তাই স্কবেলেক্ হতাশ ভাবে বলিয়াছেন "এত ভারবাহী জন্তু আমরা কোথায় পাইব?" আখেল অভিযানে যে বিশ হাজার উঠ সংগ্রহ করিয়া পাঠান হয় শেষ পর্য্যন্ত তাহার একটীও জীবিত ছিল না, আখেল অপেক্ষা ভারতবর্ষ রুসিয়ার অনেক অধিক দূরবর্ত্তী দেশ, এদেশে আসিতে কতগুলি উঠ জীবিত থাকা সম্ভব (যদি ছয় লক্ষ উঠও সংগৃহীত হয়) তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে।

ভারত আক্রমণে রুসিয়ার পক্ষে যে সকল অসুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভবপর আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিলাম, এতদ্ভিন্ন যে সকল বিপদ প্রতিপদে তাহাদিগের জীবন বিপন্ন করিতে পারে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব, কিন্তু দুই একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কর্ণেল হানা উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের উপর অভিযানের শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করে, মধ্য ভারতে যে রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে আমাদের দেশের রেলপথের ন্যায় তাহা সুদৃঢ় ভূখণ্ডের উপর সংস্থাপিত নহে, এই লৌহপথ বালুকাময় ভূমির উপর প্রোথিত এবং তাহার অধিকাংশই মরুভূমির উপর প্রসারিত, কোথাও ঝটিকার ঘূর্ণাবর্ত্ত, কোথাও প্রখর বরফ পড়ে, কোথাও বা বিপুল জলোচ্ছাসে বহু শত মাইল ধরিয়া এই পথ বিধ্বস্ত হইতে পারে। চারিদিকে শত্রুর অভাব নাই, পার্শ্বদেশ হইতে পারস্যের আক্রমণ, বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তুর্কী জাতির অস্ত্রাঘাত সহ্য করা নিতান্ত সহজ কিম্বা তুচ্ছ কথা নহে। সৈন্যগণ অশ্বসমূহ এবং ভারবাহী পশুগুলি যখন জলহীন রৌদ্রোত্তপ্ত বিশুষ্ক দীর্ঘ মরুভূমির মধ্যে পিপাসায় আর্ত্তনাদ করিবে তখন তাহাদের প্রাণ রক্ষার উপায় কি?—এ সকল বিঘ্ন অবশ্যই স্থায়ী বিঘ্ন নহে, কিন্তু যখন সুবিধার কথা চিন্তা করিতে হইবে তখন সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাগুলির কথা চিন্তা না করিলে কিরূপে চলিবে? বহুদর্শিতার তাহা লক্ষণ নহে, অতএব ভারত আক্রমণের সঙ্কল্পকারীগণ যে এ সকল নৈমিত্তিক বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা চিন্তা করিবেন না, ইহা অসম্ভব, এ সকল কথা তাঁহারা যতই বেশী চিন্তা করিবেন, তাহাদের দুর্জ্জয় লোভ ততই খর্ব্ব হইয়া আসিবে ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে রুসিয়ার আক্রমণ যে কিরূপ অসম্ভব সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অনেক রাজনৈতিক পণ্ডিত অনেক কথায় আলোচনা করিয়াছেন, আমরা দুই চারিটি মতামত উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন সে দিন বলিয়াছেন, "রুসিয়া সৈন্য যে পথেই ভারত অভিমুখে অগ্রসর হউক, তাহারা যদি সংখ্যায় এত অধিক হয় যে ভারতের বিপদ সংঘটিত করিতে পারে, তাহাহইলে অভিযানের সময়ই প্রতিদিন পথে তাহাদিগকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, কারণ মরুময় দীর্ঘপথে সৈন্যদিগের খাদ্য দ্রব্য বহন করিবার উপযোগী ভারবাহী পশু উপযুক্ত সংখ্যায় সমস্ত রুসিয়াতেও সংগৃহীত হইবে না।" বহুদিন পূর্ব্বে বহুদর্শী অদ্বিতীয় বাগ্মী মহাত্মা ব্রাইট বলিয়াছিলেন "আমি অন্তত একথা বিশ্বাস করি যে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক রুসিয়ার প্রাচ্য অধিকার সমূহ আক্রমণ করিবার কল্পনা আমাদের যেমন অমূলক, ভারত সীমান্ত অতিক্রম পূর্ব্বক ভারত সাম্রাজ্য আক্রমণের কল্পনাও রুসিয়ার পক্ষে সেইরূপ অমূলক।" শুধু তাহাই নহে, কূটনীতিজ্ঞ লর্ড সলিসবারি পর্য্যন্ত রুষভীতির প্রতি উপহাস প্রকাশ পূর্ব্বক উপেক্ষাভরে বলিয়াছেন" I would advise the victims of a baseless scares to buy large-sized maps, and learn how insuperable are the obstacles which nature has placed between the land of the Czar and the domi-

nions of the Empress." তাহার পর শনৈঃ পাদক্ষেপে রুসিয়া যখন মধ্য এসিয়ায় অগ্রসর হইতে লাগিল, ইংলণ্ডের ছোট বড় অনেক রাজনৈতিক যখন ভারতের প্রতি রুসিয়ার দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং রুসিয়ার এই ত্বরিত গতি প্রশমনের জন্য তাহারা ভারতের ধনভাণ্ডার ও দুর্গ শূন্য করিবার পরামর্শ দিল, তখন মহামন্ত্রী বিকন্সফীল্ড জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন "Some gentlemen thinks that this advance of Russia ought to be ripped in the bud. But ripping it in the bud means that the English power should have proceeded beyond our Indian boundary, and should have entered on a most hazardous and, I should say, most unwise struggle. I am not of that sort which views the advance of Russia in Asia with deep misgivings"—একথা আজ বিশবৎসরের কথা। মহামন্ত্রী বিকন্সফীল্ড 'ফরওয়ার্ড' পলিসীর কিরূপ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, লর্ড সলিসবারী রুসিয়ার আক্রমণ সম্বন্ধে কিরূপ নিশ্চিন্ত তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা তাঁহাদের ভাষা উদ্ধৃত করিলাম। আমরা দেখাইলাম রুসিয়া সহিত ভারতের কোনই আশঙ্কা নাই কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ভারত-রাজ-তরণীর কর্ণধার এবং ভারত ভাগ্যের নিয়ন্তা তাঁহাদের অধিকাংশই রুষভীতিগ্রস্ত, কিন্তু তাঁহাদের এই অমূলক আশঙ্কায় প্রতি বৎসর ভারতের কি পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হইতেছে, তাহার আভ্যন্তরিক বল কতখানি ক্ষয় হইয়া যাইতেছে এই সকল রাজনৈতিকের তাহা চিন্তা করিবার অবসর নাই।

যদি কখন ভারতবর্ষে রুসিয়ার আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয় তাহাহইলে কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে একথা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এজন্য যে বিশেষ কোন আয়োজনের আবশ্যক তাহা বোধ হয় না, মধ্য এসিয়ার ঘূর্ণাবর্ত্তময় বালুকা প্রবাহ এবং তুর্কী ও আফগাণের শাণিত অস্ত্র হইতে যে মুষ্টিমেয় রুসীয় সৈন্য পরিত্রাণ লাভ করিবে তাহাদিগের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য সীমান্ত গিরিপথের দুর্জ্জেয় সৈন্যগণ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পরাক্রান্ত সৈন্যমণ্ডলী কি নিতান্তই অনুপযুক্ত?—এই কার্য্যের জন্য বহু পূর্ব্বে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক কঠিন পর্ব্বত বিদারণে আপনার তীক্ষ্ণ দন্ত নির্ম্মূল করা কখনই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে।

আর ভারতবাসীগণ, তাহারা কি এত সহজেই ইংরেজের উপকার বিস্মৃত হইবে? ইংরেজের সংস্পর্শে তাঁহাদের অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, উদ্দেশ্যহীন, উপেক্ষিত এবং অপমান লাঞ্ছিত, মৃতপ্রায় জীবন উৎসাহে, উদ্দীপনায়, আলোকে, উত্তাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা সম্মুখে একটি কর্ত্তব্যের, একটি গৌরবের, একটি জাতীয় জীবনের অতি উন্নত, মহৎ, আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ প্রত্যক্ষ করিতেছে—এই আদর্শ বিদূরীত করিয়া, আরম্ভমাত্র জীবনের কর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহারা অৰ্দ্ধসভ্য, দর্পান্ধ উদ্ধত রুসিয়াকে হিতৈষী মিত্র বলিয়া অভ্যর্থনা করিবে এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং মানবহৃদয়জ্ঞতার অধিক প্রশংসা করা যায় না, কিন্তু এংলো ইণ্ডিয়ানদলের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত বিরল নহে; তাঁহারা ভারতের সুবৃহৎ জাতীয় জীবনের স্বচ্ছ মুকুরে আপনাদিগের কুৎসিৎ, বিদ্বেষ কষায়িত, বিকৃত বদনের প্রতিকৃতি প্রতিফলিত দেখিয়া যতই আতঙ্কিত হউন, ভারতবাসীর যাহা চিরাকাঙ্ক্ষিত আশা তাহা শিক্ষিত ভারতবাসী উদার হৃদয়, মহৎ প্রকৃতি ইংরেজের নিকট গোপন রাখেন নাই, জাতীয় মহাসমিতি প্রতি বর্ষে সেই কথাই ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, এবং ভারত হিতৈষী প্রত্যেক ইংরেজ একথা

অবগত আছেন যে—"The close connection of England with India, with the attitude of the foster-mother country under the proposed colonial relations, and of the free cities, which must always be English in tone and spirit, will not only tend to prevent a short-sighted jealousy, but will materially strengthen the United States of India in presenting an unbroken front of opposition to a common foe." (*)

Cotton's New India P. 130.

কৃষি-কার্য্য ।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি ।"

অর্থাৎ কৃষিকার্য্য অপেক্ষা বাণিজ্য অর্থোপার্জ্জনের উত্তম উপায়। যদিও এই প্রবাদানুযায়ী বাণিজ্যই প্রধান উপায় কিন্তু কৃষিকার্য্য না হইলে বাণিজ্য হইতে পারে না; তজ্জন্য প্রকৃতপক্ষে কৃষিকার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আদিম অবস্থায় যে সময়ে কোনরূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল না, তখন কৃষিকার্য্যের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইত সকলেই তাহা হইতে স্ব স্ব প্রয়োজন মত দ্রব্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় অন্যান্য দ্রব্যার্থে বিনিময় করিতেন। এইরূপ বিনিময় হইতেই বাণিজ্যের উৎপত্তি। এরূপ বাণিজ্যে কিন্তু বিশেষ অসুবিধা ছিল। এক্ষণে বিবিধ প্রকার মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। বাণিজ্য করিতে হইলে অধিক মূলধনের আবশ্যক কিন্তু কৃষিকার্য্য অল্প মূলধনেই চালাইতে পারা যায়।

নিম্ন লিখিত প্রবাদ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষিকার্য্য অনেক শ্রেষ্ঠ।

"ক্ষেতের কোণা।
বাণিজ্যের সোনা ॥"

অর্থাৎ অল্প চাষে বাণিজ্যের অপেক্ষা অধিক লাভ পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা হইতে ফসল উৎপাদনের নাম কৃষিকার্য্য। ভারতবর্ষে অল্প ব্যয়ে চাষ করিবার যেমন সুবিধা, অন্য কোথাও তদ্রূপ আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কৃষকের অবস্থা অতি হীন। এ দেশের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যকে নিকৃষ্ট কার্য্য বিবেচনা করেন। এমন কি যাঁহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন যাপন করেন তাঁহাদিগকে 'চাষা' বলিয়া ঘৃণা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। আমাদের দেশে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারাই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে! ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নতিশীল কয়েকটি দেশে শিক্ষিত ভদ্রলোকেই কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে চাকুরির দুষ্প্রাপ্যতাবশতঃ ও দেশীয় কৃষিবিভাগের চেষ্টায় শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্তঃকরণে কৃষির উন্নতিচেষ্টার উদ্রেক হইয়াছে।

সুচারু রূপে কৃষি কার্য্য করিতে হইলে (১) উর্ব্বরা জমি, (২) উত্তম কৃষিযন্ত্র, (৩) সার, (৪) সুবীজ, (৫) শস্য পর্য্যায়, (৬) কৃষি কার্য্যোপযোগী পশু, (৭) জল, (৮) শস্যের রোগ ও পোকা ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

সকল দেশেই কৃষি কার্য্য সম্বন্ধীয় বহুবিধ প্রবাদ আছে। কৃষকগণ প্রায়ই ঐ সমুদয় প্রবাদানুযায়ী চাষই করিয়া থাকে। কোন কোন কৃষিপ্রবাদ বিশেষ উপদেশমূলক। অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের মধ্যে অনেকেই হয়ত কৃষিপ্রবাদ কাহাকে বলে জানে না, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত দুই একটি কৃষি প্রবাদের উল্লেখ করা হইল।*

কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ যে নিজেই করা উচিত তৎসম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ঘরে, 'হা ভাত'॥

অর্থাৎ কৃষিকার্য্যে যে ব্যক্তি নিজে মজুরদিগের সহিত খাটে তাহার সম্পূর্ণ লাভ হয়; আর যে ব্যক্তি নিজে খাটিতে অক্ষম হইয়া মজুরদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া খাটায় তাহার অর্দ্ধেক লাভ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে খাটিতে কিম্বা খাটাইতে পারে না, কেবল ঘরে বসিয়া মজুরদিগের প্রতি হুকুম করে, তাহার লাভ হওয়া দূরে থাক্ অন্নেরও সংস্থান হয় না।

(১) জমি।

জল, বায়ু ও উত্তাপের দ্বারা পর্ব্বত হইতে বালি, কর্দ্দম, চূণ ও মৃত জীব জন্তু ও উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ সমুদয় একত্রে মিশ্রিত হইয়া সাধারণতঃ মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়! জলীয় বাষ্প, বৃষ্টির জল, স্রোতের জল, বরফ, হিম ও শিলা, এই গুলি বিবিধ কারণে প্রস্তরকে মৃত্তিকায় পরিণত করে। কিন্তু স্রোত-জলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে। বায়ুতে যে অম্লজান ও যবক্ষারজান দুইটি পদার্থ আছে তাহা অবস্থাবিশেষে প্রস্তরস্থ কোন কোন পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া সহজেই ইহাকে দ্রব করিয়া ফেলে। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সকল প্রস্তরেরই হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই হ্রাস বৃদ্ধির সময়ে পাহাড় ফাটিয়া যায় ও তাহার মধ্যে বৃষ্টির জল জমিয়া প্রস্তরকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। সকল উদ্ভিদের আহার আহরণ শক্তি সমান নহে। এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যাহারা প্রস্তর হইতে আপনাদের আহার সংগ্রহ করে। পর্ব্বতের গাত্রেই এই সকল উদ্ভিদ জন্মায় ও তাহাদের মূল ঐ সকল ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে। ঐ মূল সকল যতই স্থূল হইতে থাকে ততই প্রস্তর সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়।

মৃত্তিকা দুই ভাগে বিভক্ত। (১) আসল মৃত্তিকা, (২) স্থানান্তরিত মৃত্তিকা। আসল মৃত্তিকা সকল যে স্থানে উৎপন্ন হয় সেই স্থানেই থাকে। পাহাড়েজমিতে এইরূপ মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানান্তরিত মৃত্তিকা সকল প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে ও স্রোতের জলে দূরে নীত হয়। বঙ্গদেশের অধিকাংশ মৃত্তিকাই এইরূপ। এই মৃত্তিকা আবার নানা ভাগে বিভক্ত যথা বালি মাটী, দোঁয়াস মাটী, এঁটেল মাটী, বোদ মাটী, চূণে মাটী, পলি মাটী ও কাঁস মাটী ইত্যাদি। বালি মাটীতে অর্দ্ধেকের উপর বালির অংশ থাকে ও চাষ ভাল হয় না। ইহার সহিত কর্দ্দম কিম্বা গোবর মিশাইয়া লওয়া উচিত। এঁটেল মাটী মিশাইলেও বেলে জমি উর্ব্বরা হয়। দোঁয়াস মাটীতে বালির অংশ অর্দ্ধেক থাকে, ও এই মাটীই চাষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এঁটেল মাটীতে বালির অংশ অর্দ্ধেকের কম

* যাঁহার কৃষিপ্রবাদ সম্বন্ধে কৌতুহল জন্মিবে, তিনি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের রাজেন্দ্র লাল বন্দোপাধ্যায় কৃত "কৃষিপ্রবাদ সংগ্রহ" পাঠ করিলে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কৃষিপ্রবাদগুলি উত্তমরূপে জানিতে পারিবেন।

থাকে ও ইহার সহিত ছাই কিম্বা পাতাপচামাটী মিশাইলে উত্তম মাটী প্রস্তুত হয়। এঁটেল জমিতে ফসল দিবার পূর্ব্বে সবজিসার দিলে ভাল হয়। উদ্ভিদ পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া দোঁদ মাটী প্রস্তুত হয়। মাটীতে চূর্ণের অংশ অধিক থাকিলে তাহাকে 'চূণে মাটী' কহে। বন্যার জলে চতুর্দ্দিকের জমি ধুইয়া কোন নিম্ন স্থানে আসিয়া পড়িলে সেই স্থানে পলি জমিয়া যায়। ঐ পলি সংযুক্ত জমিকেই "পলি মাটী" কহে। জন্তুদিগের মল মূত্র পচিয়া 'ফাঁস মাটী' প্রস্তুত হয়।

চাষ করিবার পূর্ব্বে, মাটীর অবস্থা ও তাহাতে কি প্রকার ফসল উৎপন্ন হইতে পারে ঠিক করা উচিত। উর্ব্বরা জমিতে সচরাচর সোরা, হাড়, ক্ষার, লৌহ, ও গন্ধক এই পাঁচটি পদার্থ থাকে। এই পাঁচটির মধ্যে সোরাজান, হাড়জান ও ক্ষারজান এই তিনটি পদার্থই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই তিনটীর অভাব হইলেই জমি অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। এই তিনটি পদার্থ সকল জমিতে সমভাবে থাকে না। সকল ফসলের আহার সমান নহে; এই জন্য যে জমিতে যে ফসলের আহারীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে থাকে, তাহাতে সেই ফসলের আবাদ করা উচিত।

ক্রমান্বয়ে এক জমিতে শস্য আবাদ করিলে, জমিতে রৌদ্র ও বাতাস পাইবার একেবারে ব্যাঘাত হইলে ও যে মাটীর যে শস্য উপযোগী তাহাতে সেই শস্য আবাদ না করিলে ক্রমশঃ জমি অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। কিন্তু বড় বড় জঙ্গলে আগাছা কুগাছা অনেক বৎসর ধরিয়া হইলেও সে জমির উর্ব্বরতা কিছুতেই কমিয়া যায় না। তাহার কারণ, বন জঙ্গলের গাছ পালা সকল শুষ্ক হইয়া সেই জমিতেই পতিত হয়, এবং জমি হইতে তাহারা যে সকল [পদা]র্থ টানিয়া লয় সেই সমুদয়ই পুনরায় জমিতে মিশ্রিত হয়। এই জন্যই জঙ্গলের জমি [কি]ছুতেই অনুর্ব্বরা হয় না।

মধ্যে মধ্যে জমিতে সার দিলে, কিছু দিনের জন্য জমি পতিত রাখিলে, ও জমির আগাছা কুগাছা পচাইয়া লাঙ্গল দিয়া মাটীর সহিত মিশাইলে, জমি উর্ব্বরা হয়।

চাষের জমি কৃষকের বাসস্থানের নিকট করাই উচিত; তাহা হইলে স্বয়ং সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে পারা যায়। এই জন্য কথায় বলে,

"দূরের সোণা।
নিকটের লোনা।"

অর্থাৎ নিকটের খারাপ জমিও দূরের উর্ব্বরা জমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(২) কৃষিযন্ত্র।

চাষ করিবার পূর্ব্বে জমিতে লাঙ্গল দিতে হয়। মাটী যতই আল্‌গা হয় ফসলের শিকড় ততই সহজে মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। শিকড়ের দ্বারাই উদ্ভিদ আহার করে। শিকড় মাটীর মধ্যে যত অধিক প্রবেশ করে, ততই অধিক পরিমাণে আহার প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য লাঙ্গল দিয়া উত্তম রূপে মাটী আলগা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। জমিতে লাঙ্গল দিবার আরও একটি বিশেষ উপকার যে জমি-চূর্ণ হইলে তাহার জল ও বায়ু ধারণা শক্তি বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশী লাঙ্গলে মাটী প্রায় উল্টান হয় না। কেবল মাত্র একটি দাগ পড়ে। ফাল যত চওড়া ও যত জোরের সহিত চাপিয়া ধরা যায়, সেই অনুসারে দাগটি চওড়া ও চাষ গভীর হয়। এই লাঙ্গলের দ্বারা যে মাটী উঠে তাহার কতক পরের দাগে ও কতক সমতল বা অচষা জমির উপর পড়ে। তজ্জন্য একবার চাষে দুইটা দাগের মধ্যস্থলের জমি একেবারে পতিত থাকে। দেশী লাঙ্গলে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ আড়া আড়ী ভাবে কতকবার চাষ না দিলে, জমির সকল অংশে চাষ পড়ে না।

কিন্তু বিলাতী লাঙ্গলে এরূপ হয় না ; তাহাতে চাষ গভীর হয়, এবং একবার লাঙ্গলেই সমুদয় জমিতে চাষ পড়ে। দেশী লাঙ্গল চারিবার দিলে যেরূপ গভীর চাষ হয় বিলাতী লাঙ্গল একবার দিলেই সেইরূপ হয়। বিলাতী লাঙ্গলের ফালের পার্শ্বে এক খানি করিয়া পাখা থাকে। ফালের দ্বারা যে মাটী খনন হয় তাহা ঐ পাখার দ্বারা উল্টাইয়া পড়ে।

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ হইতে এক প্রকার লাঙ্গল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে শিবপুর লাঙ্গল কহে। ইহাতেও উত্তম রূপ চাষ হয়। বিলাতী লাঙ্গলের ন্যায় ইহাকেও পাখা আছে। ইহার ফাল যেমন জমি খনন করিয়া যায়, অমনি পার্শ্বস্থ পাখা ঐ জমি উল্টাইয়া যাইতে থাকে। দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা ইহাতে অধিক পরিমাণে গভীর খনন হয়। যদিও দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা ইহা কিছু অধিক ভারী কিন্তু এক জোড়া বলিষ্ঠ বলদের দ্বারা অনায়াসেই ইহা চালান যায়। 'বলদেও লাঙ্গলে' ও 'হিন্দুস্থান লাঙ্গল' নামে আরও দুই প্রকার লাঙ্গলের দ্বারা ও উত্তমরূপ গভীর খনন হয়।

সকল জমিতেই আবার গভীর চাষে উপকার হয় না। কারণ কোন কোন জমির নিম্নে তেজস্কর মাটী থাকে, ও কোন কোন জমির নিম্নে কম তেজস্কর মাটী থাকে ; তজ্জন্য জমিবিশেষে গভীর খনন আবশ্যক। যদি নিম্নের জমি তেজস্কর হয়, তাহা হইলে গভীর চাষে আরও একটি বিশেষ উপকার এই হয়, যে অনাবৃষ্টি হইলে ও সে জমির ফসল শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং জলসেচনেরও তত আবশ্যক হয় না।

কোদাল, নিড়ান, বিদা, কাস্তে প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্রও কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ফসল জন্মাইবার পর যখন লাঙ্গল দিবার অসুবিধা হয়, কোদালের দ্বারা তখন ফসলের গোড়ায় মাটী আলগা করিয়া দেওয়া হয় ; এবং কপি, বেগুন, আলু প্রভৃতি ফসলের ভাঁটি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ক্ষেত্রের আগাছা কুগাছা সকল নিড়ানের দ্বারাই তুলিয়া ফেলা হয়। ধান, পাট, গম প্রভৃতি শস্য ঘন হইলেও তাহাদের মধ্যে আগাছা কুগাছা জন্মিলে, বিদার দ্বারা ঐ শস্য সকলকে পাতলা করিয়া দেওয়া হয়, ও আগাছা কুগাছা উপড়াইয়া ফেলা হয়। ধান, যব, গম প্রভৃতি শস্য কাস্তের দ্বারা কাটা হয়।

ক্রমশঃ—

বৈষ্ণব-দর্শন।

ইতিহাসহীন ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ;—ধরাপৃষ্ঠে প্রোথিত জীবাস্থি বা উদ্ভিদকঙ্কাল পরীক্ষা করিয়া, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যে প্রকার পৃথিবীর পূর্ব্বতন অবস্থার একটা ধারাবাহিক বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করেন, আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অবস্থাও কতকটাও তদ্রূপ। কীটদষ্ট জীর্ণ হস্তলিপির দুই এক পৃষ্ঠার পাঠোদ্ধার করিয়া, তাঁহারা বৃহদায়তন ইতিহাস লিখিতেছেন,—অনেকে আবার একখণ্ড ভগ্ন ও লুপ্তাক্ষর প্রস্তরলিপি সংগ্রহ করিয়া, তৎসাহায্যে কোন এক অতি প্রাচীন রাজবংশের আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছেন ; এতদ্ব্যতীত পুরাবৃত্তহীন ভারতের নষ্টইতিহাস উদ্ধারের বাস্তবিকই আর উপায়ান্তর নাই।আজকাল দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অক্ষরাঙ্কিত জীর্ণ প্রস্তরফলকের উপর বৃহৎ বৃহৎ সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া, অসামান্য পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় প্রদান করিতেছেন এবং অনেক সিদ্ধান্ত আজও উক্ত ক্ষীণ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অজস্র আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যদর্শনাদির কথা এবং সামাজিক ও রাজকীয় অবস্থার বিবরণ উক্ত উপায়ে আজকাল অনেক জানা যাইতেছে। কিন্তু আজকাল এই আবিষ্কার প্রায়ই দেশের উচ্চতম স্তরস্থ জনসমাজের নানা কথায় পূর্ণ থাকে,—সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের সুশিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ ও ধার্ম্মিক সন্তানগণকি প্রকারে চলাফেরা করিতেন, ইহাতে তাহারই আভাষ দেখা যায়।

আমাদের সমাজে উচ্চ ও নিম্নস্তরস্থ ব্যক্তিগণের ব্যবহার ও বিশ্বাসাদি বিষয়ে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয় ;—শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষিত হিন্দু সন্তান ষড়দর্শনাদির মীমাংসা সংগ্রহ করিয়া, আত্মা ও দেহ প্রভৃতি জটিল বিষয়ে যে মত পোষণ করিয়া থাকেন, অল্পশিক্ষিত নিম্নস্তরস্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে মোটেই তাহা গ্রাহ্য হয় না। দর্শনের তত্ত্ব গ্রহণ না করিয়াই, অনেক সময় তাহারা পুরাণ বা পরম্পরাগত প্রবাদবাক্যের সাহায্যে আত্মাদি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে ; প্রায়ই এই লৌকিক সিদ্ধান্ত কিয়ৎ পরিমাণে প্রাচীন দর্শনকারগণের মতবাদের উপর স্থাপিত দেখা যায়,—কিন্তু কালসহকারে সেগুলি অশিক্ষিত সমাজে ঘুরিয়া এতই বিকৃত হইয়া যায় যে, শেষে দার্শনিকতত্ত্ব ও লোক-প্রসিদ্ধ-বিশ্বাস এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দর্শন দুরূহ হইয়া পড়ে। জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের ইতিহাস লিখিতে হইলে, তাহার উচ্চস্তরস্থ কয়েকটী লোকের আচার ব্যবহার ও বিশ্বাসাদির কথা পরিজ্ঞাত হইলেই যথেষ্ট হয় না,—জাতির দেহস্বরূপ নিম্নস্তরস্থ অসংখ্য নরনারীর ব্যবহারপদ্ধতি সম্বন্ধেও বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক ; নচেৎ ইতিহাস অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সাহিত্য ভাণ্ডারাদি অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন সামাজিক অবস্থার যে স্থূল বিবরণ প্রচার করিতেছেন,—তাহা কেবল মাত্র সমাজের উচ্চস্তরস্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে

আবদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না ;—কাজেই প্রাচীন অধস্তন সমাজপদ্ধতি অন্ধতমসাচ্ছন্নই থাকিয়া যাইতেছে। লৌকিক পদ্ধতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল, আবার অনেক সময়েই ইহা পরম্পরাগত অমূলক জনপ্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, বোধ হয় এই কারণে তৎকালিক গ্রন্থকারগণ ইহার অকিঞ্চিৎকর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন ; আবার যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ কেবল লিপিচাতুর্য্য, স্বভাববর্ণন বা উৎকৃষ্ট নায়ক নায়িকাদির চরিত্রাঙ্কন জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া কোনক্রমে ধ্বংসপথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও উক্ত লৌকিক পদ্ধতির বিশেষ বিবরণ পাঠের আশা করা যায় না। প্রাচীন লৌকিক ইতিহাস আবিষ্কার পথে এই গুলিই প্রধান অন্তরায়।

অতি প্রাচীন ভারতের সামাজিক অবস্থার বিষয় ত্যাগ করিয়া ইংরাজাধিকারের দুই শতাব্দী পূর্ব্বেকার সামাজিক অবস্থার চিত্র অঙ্কন করিতে হইলেও, ঠিক পূর্ব্ব বর্ণিত অন্তরায় গুলি আসিয়া সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করে। মুসলমান রাজত্বের শেষকালে উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতির কঠোরতায় উত্যক্ত প্রজাবৃন্দের গার্হস্থ্য অবস্থা কি প্রকার ছিল এবং নবদ্বীপে মহাত্মা চৈতন্য দেবের অভ্যুদয় কালীন বঙ্গবাসীগণের ধর্ম্ম বিশ্বাস কি প্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহাও অন্ধতমসাচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি "সাহিত্যপরিষদের" উদ্যোগে "দেহকড়চ" * নামক নরোত্তম ঠাকুর রচিত একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নরোত্তম ঠাকুর প্রায় চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি; বাসস্থান রাজসাহীতে। চৈতন্যদেবের অদ্ভুত ভগবদ্ভক্তির কথা শুনিয়া তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন ; তথায় গৌরাঙ্গ-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত এবং পরে বৈষ্ণব-দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ভক্তিতত্ত্ব প্রচার মানসে নরোত্তম অতি অল্পকাল মধ্যেই "প্রার্থনা" "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" ও পূর্ব্বোক্ত "দেহ-কড়চ"প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। যে সকল গ্রন্থ লোকসাধারণের অতি প্রিয়, তাহা নানা অশিক্ষিত সমাজে পরিভ্রমণ করিয়া, প্রায়ই ব্যাকরণদুষ্ট ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইতে দেখা যায়,—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতের নানা মূর্ত্তি, ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "দেহ-কড়চের" যে কয়েকখানি হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রতি ছত্রে ও প্রতি বাক্যে ব্যাকরণাশুদ্ধি ও অযথা বর্ণপ্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং এ গ্রন্থখানি যে এককালে বৈষ্ণবসমাজের নিম্নস্তরে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা অবিসম্বাদে স্বীকার করা যাইতে পারে। "দেহকড়চ" বহু অনুসন্ধানে মুরসিদাবাদ ও রাজসাহী হইতে পাওয়া গিয়াছে, দূরব্যবহিত এই দুই স্থান হইতে বিভিন্নাকারে একই গ্রন্থের উদ্ধার দেখিলে, এখানি যে সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সাদরে পঠিত হইত এবং পরে কোন কারণে গ্রন্থখানি অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল,—এ সিদ্ধান্ত বোধ হয় যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। "দেহকড়চের" অপ্রচলনের নানা কারণ থাকিতে পারে ; আমার বোধ হয় নরোত্তম ঠাকুরের গ্রন্থের সারমর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া

* ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যক "সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা"দেখুন।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক গোস্বামীগণ স্বনামাঙ্কিত অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন,—অল্পশিক্ষিত বৈষ্ণবগণ নরোত্তম প্রচারিত বৈষ্ণব-দর্শনের স্থূল ব্যাপার এই সকল আধুনিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিয়া, "দেহকড়চ" পাঠ অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন,—এতদ্দ্বারা গ্রন্থখানি লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। অল্পদিন হইল নবদ্বীপে জনৈক শিক্ষিত বাবাজীর সহিত বৈষ্ণব-দর্শনের বিষয় আলোচনা কালীন, তিনি "দেহকড়চের" মর্ম্মে, আত্মা ও দেহাদি বিষয়ক প্রশ্নের অনেক উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে "দেহকড়চস্থ" প্রায় অবিকল পদগুলিও আবৃত্তি করিয়াছিলেন ;—বলা বাহুল্য আমি তৎকালে "দেহকড়চের" অস্তিত্বের কথা পর্য্যন্ত জানিতাম না এবং বাবাজীও তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। এই ঘটনা দ্বারা "দেহ কড়চ" অপ্রচলনের পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তটী সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় ; এবং তাহার স্থূল মর্ম্মই যে বৈষ্ণবসাধারণ, দেহাত্মাবাদের মীমাংসা স্বরূপ গ্রহণ করিত, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়,—হিন্দুদর্শনকারগণ আত্মা দেহ ও মনাদি সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণবসাধারণ তাহা অবিকল গ্রহণ করিতেন না। লৌকিক বৈষ্ণব-দর্শনের মতে, আত্মা স্থূলতঃ চারি প্রকার—পঞ্চাত্মা, জীবাত্মা, পরমাত্মা ও পরমেষ্ঠী আত্মা। জীবদেহের উপাদান ক্ষিতিঅপ্‌তেজাদি পঞ্চভূতই এই মতে পঞ্চাত্মা, এবং প্রাণীমস্তকস্থ যে পদার্থ শোণিত আশ্রয় করিয়া স্বীয় অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করে, তাহাই জীবাত্মা। অবশিষ্ট পরম ও পরমেষ্ঠী আত্মাদ্বয়, মানবদেহ আশ্রয় করিয়া থাকে না, উভয়েই মুক্তাবস্থায় শূন্যে বিচরণ করে,—পরমাত্মা শুক্রাকারে জীবাত্মাকে হরণ করিয়া প্রাণীদিগকে পরমানন্দ প্রদান করেন এবং ইহা হইতেই জীব স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়। স্বরূ। ও প্রকৃতিতে জড়িত সদানন্দময় পরমেষ্ঠী আত্মা, মহাশূন্যে সহস্রদল পদ্মে বাস করেন. —তিনিই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য ও নিত্য-চৈতন্যময় সর্ব্বারাধ্য শ্রীগুরু। এই পরমেষ্ঠীকে জানিবার জন্য জীবগণের চেষ্টা বৃথা, তিনি আপনিই স্বীয় সত্তা জীব সাধারণে প্রচার করেন। পূর্ব্বোক্ত আত্মা চতুষ্টয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও ছয়রিপুর যোগে জীবদেহের উৎপত্তি। রিপুগণ ও মন ইন্দ্রিয়গুলির উপর কর্তৃত্ব করিয়া, তাহাদিগকে সজীব রাখে; ইন্দ্রিয় দ্বারা আবার পঞ্চাত্মা চালিত হইয়া জীবের চেতন্ব সম্পাদন করে।

এই ত গেল প্রাচীন বৈষ্ণব সাধারণের দেহাত্মাবাদ ;—ইহাঁদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদেও অনেক নূতনত্ব দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাকে ক্ষীর-সমুদ্রশায়ীরূপে বর্ণন করিয়া সাধারণ হিন্দুদিগের ন্যায় বৈষ্ণবগণও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করিয়াছেন এবং কৈলাসবাসী মহেশ্বরকে সংসারের কর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবদর্শনে, সহস্রপদ ও সহস্র হস্তযুক্ত অপর এক তৃতীয় পুরুষের কল্পনা দৃষ্ট হয়। তিনি বৈকুণ্ঠের নিম্নে এবং ভূভবাদি চতুর্দ্দশ ভুবনের অধোদেশে বাস করেন, তাঁহার বাসস্থানে কোন সৃষ্ট পদার্থ নাই,—তথায় সকলই জ্রণাকারে অবস্থিত। এই স্থানের পাঁচিশ যোজন নিম্নে, পঞ্চাশ ক্রোশ-যোজন স্থান অধিকার করিয়া ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে। বৈষ্ণবগণ বলেন পূর্ব্বোক্ত

তৃতীয় পুরুষের নাসাগ্রে বিশ্বের সৃষ্টিপ্রলয় সংঘটিত হইয়া থাকে। এই পুরুষের উৎপত্তির আবার ইতিহাস আছে ;—গোলকনাথের অংশভূত সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হইতে তাঁহার উৎপত্তি।

প্রকৃত বৈষ্ণব-দর্শনের অধিকাংশ ভাবই, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও মাধবাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদি হইতে গৃহীত, ইহাতে ঈশ্বর ও জীব মধ্যে উপাস্য ও উপাসক সম্বন্ধ লিপিবদ্ধ আছে, এবং জীবাত্মার মুক্তিক্ষণে ঈশ্বরের সান্নিকর্ষ ও তন্ময় ভাব প্রাপ্ত হইলেই, ইহজীবনের চরমোৎকর্ষতা লাভ করে বলিয়া, প্রসিদ্ধ গোস্বামীগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই চরমোৎকর্ষতা লাভার্থ সাধারণতঃ সামর্থ্যানুসারে ঈশ্বরকে যথাক্রমে, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবে চিন্তা করিবার ব্যবস্থা আছে ; এই শেষোক্ত মধুর ভাব, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত ভক্তের পতি পত্নী সম্বন্ধ জ্ঞান হইলেই, বৈষ্ণবগণের জীবন সার্থক হয়। বৈষ্ণব-উপাসকসম্প্রদায়ের এই মূলমন্ত্র, আধুনিক বৈষ্ণবমণ্ডলীর বিশেষ পরিচিত ;—নরোত্তমঠাকুরের আবির্ভাবকালে, এই তত্ত্ব বৈষ্ণবসাধারণের সুপরিচিত ছিল কি না, কিছুই স্থির বলা যায় না।

লৌকিক বৈষ্ণব-দর্শনের অনেক স্থলে বৃন্দাবননাথের শিখিপুচ্ছবিভূষিত মূর্ত্তি চিন্তার উপদেশ আছে। বৈকুণ্ঠধাম চির মহোৎসব ও নিত্যরাসক্রীড়ার পুণ্যক্ষেত্র ; রত্নমন্দিরের দিব্যচ্ছটায় গোলকধাম সর্ব্বদাই আলোকিত, তথায় চন্দ্র সূর্য্যের গতি নাই,—শোক বিচ্ছেদ জরামৃত্যু, ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতি পার্থিব ব্যসন সেই পুণ্যভূমি স্পর্শ করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠধামে প্রেমময় নায়ক, রতিস্বরূপা নায়িকা কিশোরীর সহিত চতুর্ব্বেদের উপরিস্থিত-মণিময় সিংহাসনে আসীন থাকেন। উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ক্রমে মানব সার্দ্ধচতুর্বিংশতি ছন্দে কামগায়ত্রী ও কামবীজ অঙ্গে ধারণ করিলে, উক্ত নায়কের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া, পরে তাঁহাকে জানিতে পারে। চক্ষু কর্ণ কণ্ঠাদি দ্বাদশ অঙ্গে, বিবিধ মঞ্জরী অর্থাৎ তিলক ধারণ করিলে, সাধক নায়িকারও স্বরূপ অবগত হইতে পারেন।

নরোত্তম ঠাকুরের জীবিতকালে * এবং তাঁহার পরবর্ত্তী অল্পশিক্ষিত সাধারণ বৈষ্ণবগণ, পূর্ব্বোক্ত মূলবিশ্বাস অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরোপসনা করিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, নরোত্তম ঠাকুর অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী ছিলেন এবং যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বদেশে বিস্তার লাভ করে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। এই সদুদ্দেশ্য সাধনার্থে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালীন, অনেক মহাপুরুষ রচিত ভক্তিগ্রন্থও সংগ্রহ করিয়া তিনি স্বদেশে আনিতেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অমূল্য ভাণ্ডার পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়ায়, বঙ্গদেশে সে গুলির আর প্রচার হইল না। বোধ হয় নরোত্তম ঠাকুর উক্ত সংকল্প সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া, পূর্ব্বলিখিত লৌকিক বৈষ্ণবদর্শন এবং "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" "হাটপত্তন" প্রভৃতি মনোরম গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য, বৈষ্ণব দর্শনের এই লৌকিক আকার প্রদান করিয়া, দর্শনোক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পথ হইতে নরোত্তম ঠাকুর কতদূর স্খলিত হইয়াছেন, তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য।

* "সাহিত্য পরিষদের" মতে নরোত্তম ঠাকুর ১৪৩১ কি১৪৪৪ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন।

এক বৎসরেরও অধিক হোল আমার প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলা হয়নি। ১৩০৩ সালের শ্রাবণ মাসের ভারতীতে আমার শেষ প্রত্যাবর্ত্তন ছাপা হয়; তার পরে এত দিন লিখি লিখি কোরে লেখা হয়নি। এ সংসারে অনেকেরই এমন হোয়ে থাকে; আজ করি কাল করি বোলে কত কাজ যে অকৃত রোয়ে গিয়েছে তার সংখ্যা কোরে উঠা কঠিন। আমাদের দেশে একটা কথা আছে রাবণ রাজা নাকি স্বর্গ পর্য্যন্ত সিঁড়ি তৈরি কোরে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যখন ইচ্ছা হোয়েছিল বেচারী যদি তখনই কাজটা সুরু কোরে ফেলত, তা হোলে আর এই দেশময় স্বর্গ গমনের উমেদার লোকগুলোকে এত হয়রাণ পরেশান হোতে হোতনা; এত জপ তপ এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত ধর্ম্মালোচনা কিছুই কোর্‌তে হোতনা; চারটী চা'ল চিঁড়ে চাদরে বেঁধে একদিন প্রত্যুষে বেরিয়ে পোড়লেই ধীরে সুস্থে স্বর্গে পৌছান যেত; তা হোলে পাহাড়ের বড় বড় চড়াই উঠতে অভ্যস্ত আমার এই পদযুগল অনেক ধর্ম্মপরায়ণ পবিত্রচেতা সাধুর আজন্ম সাধনা অপেক্ষা বেশী কাজে লাগ্‌তো। সুধু আজ কর্চ্ছি কাল কর্চ্ছি বোলে রাবণ বেচারী এমন একটা মহৎ কাজে মোটেই হাত দিতে পারেন নাই। আমার এই প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী যদিও তেমন একটা মহৎ কাজ নয়, এ পোড়ে যে কেউ স্বর্গের সিঁড়ি হাতে পাবেন তাও কোন দিন মনে করিনি, তবুও এতটা রাস্তা ফিরে এসে শেষে মাঝখান থেকে একেবারে ডুব মেরে যাওয়াটা তেমন শোভন হো'ত না; সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে আলস্য জড়তা ত্যাগ কো'রে লিখ্‌তে বস্‌তুম; সে লেখাগুলি অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় কোথায় অন্তর্দ্ধান হোয়ে যেত। এমনি কোরে অনেকবার সুরু করা গিয়েছে, শেষ আর হয়নি। আজ যে লিখ্‌তে বোসেছি এইটীই যে শেষ হবে তারও তেমন একটা ঠিক্ নাই। কিন্তু সে কথা থাক্।

বিগত বৎসরের শ্রাবণ মাসে যখন সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করি তখন আমরা আমাদের ভ্রমণপথের মধ্যে লালসাঙ্গার এ পাশে নারায়ণ চটীথেকে বাহির হোয়ে লালসাঙ্গায় পেঁীছেছিলাম এবং সেখানে দুই ভৈরবীকে এক ভৈরবের উপরে স্বত্ব সাব্যস্ত করবার বীভৎস দৃশ্য দেখেছিলাম। যাবার সময়ে লালসাঙ্গায় এক বিনামা চোর সাধুর কীর্ত্তি কাহিনী শুনে গিয়েছিলাম, এখন ফিরবার সময়ে দুইটী বাঙ্গালী ভৈরবীর পাশব দৃশ্য দেখা গেল। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল যে আজকার দিনটা লালসাঙ্গায় থাকা যাক্, বৈদান্তিক ভায়ারও তাতে বড় একটা আপত্তি ছিল না; কিন্তু নাহ'ক বোসে থাকা আমার ভাল লাগ্‌লো না; কাজেই আমরা সেই অপরাহ্লেই বেরিয়ে পড়্‌লুম! শীঘ্র শীঘ্র নন্দপ্রয়াগে আস্‌বার আমার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল; আমাদের সঙ্গে একজন অজ্ঞাতকুলশীল বালক সন্ন্যাসী জুটেছিল, তার শরীরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়।

আজ অনেক কষ্টে তাকে লালসাঙ্গা অবধি নিয়ে এসেছি আজ রাতটা যদি এখানে বাস করি তা হোলে এমনটী হওয়াও অসম্ভব নয় যে সে একেবারে অবসন্ন হোয়ে পোড়বে, তার শরীর এমন ভেঙ্গে পোড়বে যে আর তার আর চলবার শক্তি থাক্‌বে না। যদিও লাল-সাঙ্গাতেও চিকিৎসালয় আছে, কিন্তু যাকে আজ ক'দিন থেকে সঙ্গে কোরে ফিরছি তাকে এই অপরিচিত স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ফেলে যাব, একথাটা যেন মনে কেমন ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। তাকে হয়ত দুদিন পরে ডাক্তারখানা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, অথবা সচরাচর দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীদের প্রতি যে প্রকার যত্ন লওয়া হয় তাতে এই দুর্ব্বল রুগ্ন অসহায় বালকটী দুদিন আগেই জীবনলীলা শেষ কোরে বস্‌বে। কোন রকমে তাকে নন্দপ্রয়াগে নিয়ে যেতে পার্‌লে আমার আর সে ভয় থাক্‌বে না। যখন নারায়ণ দর্শনে যাই সেই সময়ে নন্দপ্রয়াগ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হোয়েছিল। তাঁকে একজন দয়ালু ভাল লোক বলে আমার বেশ বিশ্বাস হোয়েছিল; এই রোগীটীকে তাঁর হাতে দিয়ে যেতে পার্‌লে তার যে অযত্ন হবে না এবং সেই ডাক্তারের যতটুকু বিদ্যা তাতে যদি বালকের রোগমুক্তির সম্ভাবনা থাকে তা হোলে চাই কি সে আবার সুস্থ হোয়ে নিজ গন্তব্য স্থানে চোলে যেতে পারবে। এই জন্যই সেই অপরাহ্ণে তাড়াতাড়ি নন্দপ্রয়াগে আসবার জন্য বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল।

প্রাতে ছয় মাইল রাস্তা গেলেই বালকটী কাতর হোয়ে পড়েছিল, এবেলা আমাদের বার হবার আয়োজন দেখে সে যে অতি অনিচ্ছায় তার ঝুলিটী কাঁধে ফেলে বার হোল তা তার আকার প্রকারেই বেশ বুঝতে পারা গিয়েছিল; কি করা যায়। তার মঙ্গলের জন্যই তাকে আজ এই অপরাহ্ণে আবার ছয় মাইল পথ যেতে হ'লো। অপরাহ্ণ বোলে আজ আর আমরা কেহই একাকী চললাম না; আমরা চারিজন মানুষ এক সঙ্গে চলতে লাগলাম; বালকটীকে ধীরে ধীরে চলাবার জন্য স্বামীজি তার সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প জুড়ে দিলেন। সে এমনই ধীর অথবা তার স্বাভাবিকতা গোপন ক'রবার তার এতটাই দরকার যে সে হুঁ, না, বা সেই প্রকার দুই একটী কথা ছাড়া বেশী বাক্যব্যয় মোটেই কোরলে না; তার এই প্রকার সঙ্কোচের ভাব দেখে সে যে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী এ বিশ্বাস আমার ক্রমেই দৃঢ় হোচ্ছিল। সে যদি বালক না হোতো তা হোলে তার পরিচয়ের জন্য এত আগ্রহ হতো না; কারণ বাঙ্গালীই হো'ক আর হিন্দুস্থানীই হো'ক সন্ন্যাসী দলের মধ্যে এ প্রকার লোকের সংখ্যা খুব বেশী যাদের পূর্ব্বজীবন না জানাই ভাল;—আইনের হাত থেকে পালিয়ে জটাধারী হোয়ে ভস্ম মেখে কতজন তাদের দুর্ব্বহ জীবন যাপন কোরছে তার ঠিকানা কি? কি কষ্টেরই জীবন তাদের! হৃদয়ের মধ্যে সন্ন্যাসের সামান্য একটু ভাবও নাই, অথচ সন্ন্যাসীর আসবাব সন্ন্যাসীর বোঝা প্রকৃত সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাদেরই বেশী কোরে বইতে হোচ্ছে; তাদের ভান বেশী কারণ তাদের আত্মগোপন বেশী দরকার। বালকটী অবশ্যই এমন কোন অপরাধ করেনি বা তার পক্ষে এমন কোন

কাজ করা সম্ভবপর নয় যার জন্যে সে এই নবীন বয়সে সব ছেড়ে বনে বনে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পারিবারিক কোন প্রকার অশান্তি, মনের কষ্টেই সে ঘর ছেড়ে ফকীর হোয়েছে ; নতুবা ছেলে মানুষ, ইংরেজী Entrance অবধি পোড়েছে, বয়সও অল্প এবং জাতিতে সম্ভবতঃ বাঙ্গালী, সে যে ধর্ম্মের জন্য সব ছেড়েছে একথা এই কলিযুগের শেষভাগে পুনরায় প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তের আগমন সম্বন্ধে বিশ্বাসবান ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ সহজে কি মোটেই বিশ্বাস কোরতে চাইবে না।

রাস্তায় এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয়নি, যার কথা বলা যেতে পারে, তবে রাস্তার বর্ণনা একটা দেওয়া অনায়াসেই যেতে পারে ; কিন্তু তার ভিতরে ত আর নূতন কথা কিছু নাই ; সেই চড়াই আর উতরাই, সেই বন আর নির্ঝর, সেই হিমালয়, সেই পাখীর কল-তান, আর সেই জনশূন্য পথে আমাদের মধুর গমন। রাস্তার ধারে তেমনি অতুল শোভা বিকাশ কোরে ফুল ফুটে রয়েছে ; অলকনন্দা তেমনি কুল কুল স্বরে নীচের দিকে ঝরে যাচ্ছে ; বনের মধ্যে পাখী সকল তেমনি গান কোরছে। এ সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা একেবারে অভ্যস্ত হোয়ে পড়েছি। লালসাঙ্গরা থেকে নন্দপ্রয়াগ ছয় মাইল। আমাদের নন্দপ্রয়াগে পৌছাতে রাত হোয়ে গেল ; তাতে আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধার ভয় ছিল না। এখন প্রত্যাবর্ত্তনের পথ, কোথায় কে আছে সব আমরা জানি ; যে দিন যেখানে গিয়ে সুবিধা মত থাকতে পারা যায় তারও বন্দোবস্ত আমরা পূর্ব্বে হতেই করা'তে পারি। নন্দ-প্রয়াগে উপস্থিত হোয়ে আমাদের সেই পূর্ব্ব বাসেই অবস্থিতি হোল। রাত্রি কালে আর বালকটীকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হল না। যতক্ষণ তাকে আমাদের কাছে রাখতে পারি সেই ভাল। আমাদের পৌছান সংবাদ পেয়েই থানার দারোগা মহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে এলেন। নারায়ণে যাবার সময়ে এখানেই পুলিসের ইনেস্পেক্‌টর বাবুর সঙ্গে পরিচয় হোয়েছিল, সেই সূত্রে নন্দপ্রয়াগ থানার দারোগা বাবুও আমাকে একটা বড় লোক ঠাউরে রেখেছিলেন ; রাস্তায় কোন প্রকার অসুবিধা হোয়েছে কি না, পুলিসের কোন কর্ম্মচারী কোন যাত্রীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার কোরেছে কি না, ইনস্পেক্‌টর সাহেবকে আমি কোন পত্র লিখেছি কি না এই সব কথা সে একটী একটী কোরে জিজ্ঞাসা কোরতে লাগলো। তার কথাগুলির জবাব দিয়ে আমি সঙ্গী বালকের কথা পাড়লাম ; তাকে যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে রেখে যাব সে কথা জানিয়ে দিলাম, এবং তাঁদের ভরসায় যে আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে বালকটীকে ফেলে যাচ্ছি সে কথা বোলতেও ত্রুটি করা গেল না। দারোগা সাহেব প্রাণপণে এ কাজ কোরবেন বোলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোলেন। একে সে রোগী, তার তত্ত্বাবধান করা ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তার পর আমি যখন এত কোরে অনুরোধ কর্চ্ছি এবং ছেলেটীর সম্পূর্ণ ভার তার উপরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোচ্ছি তখন, সে যে প্রকারে হউক তাকে আরাম কোরে দেবে। সেই রাত্রেই বালকটীকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু রাত্রিটা আমরা এক সঙ্গে বাস কোর্‌বো

এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায় অতি 'সবেরে' এসে একত্রে ডাক্তারখানায় যাওয়া যাবে এই বন্দোবস্ত স্থির কোরে 'বন্দেগি' জানিয়ে নন্দপ্রয়াগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মহাশয় প্রস্থান কোরলেন। তিনি চোলে গেলেন বটে কিন্তু তাঁর অনুচরগণ সে রাত্রি আমাদের ছেড়ে সহজেই যায়নি। আমার কথাত বোলেই রেখেচি কোন রকমে একবার কম্বল খানি গায়ে জড়িয়ে পোড়তে পেলেই হয় তা হোলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণও পেরে উঠেন কি না সন্দেহ। পর দিন ভোরে উঠে শুনলাম সমস্ত রাত্রিই কনেষ্টবলগণ বাজারে পাহারা দিয়েছে এবং তাদের চীৎকারে মরামানুষেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়; বৈদান্তিক ভায়া নাকি রাত্রে দুই তিন বার তাদের উপর চটে উঠেছিলেন, কিন্তু আজ তারা মনিবের হুকুম পেয়েছে, আজ বেশ ভাল কোরে পাহারা দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন আমাদের মত অজ্ঞাত কুলশীল মুসাফের লোক আজ বাজারে বাসা নিয়েছে, রাত্রে হয়ত কিছু চুরি কোরে নিয়ে আমরা পালিয়ে যেতে পারি সেই জন্যই এত কড়াক্কড় পাহারা। ব্যাপার এই, আমরা নীচে নেমে যাচ্ছি, খুব সম্ভবতঃ নীচে কোন যায়গায় ইনেস্পকৃটর বাবুর সঙ্গে দেখা হোলে নন্দপ্রয়াগের পুলিস বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরলে আমি খারাপ কিছু বল্‌তে পারি, যাতে তা না বলি তারই জন্য আজ এ প্রকার পাহারা। নতুবা দোকানদারের কাছে শুনলাম অন্য কোন দিনও রাত্রে পাহারাওয়ালাদের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না.

পরদিন প্রাতঃকালে (৫ই জুন শুক্রবার) আমরা প্রস্তুত হবার পূর্ব্বেই দারোগা সাহেব ও দুইজন বরকন্দাজ ধড়া চূড়া পোরে এসে হাজির। স্বামীজি, বৈদান্তিক ও আমি তিনজনেই বালকের সঙ্গে সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয় গেলাম। ডাক্তার বাবু খুব খাতির যত্ন কোরলেন। পথে কোন প্রকার অসুখ হোয়েছিল কিনা তার তত্ত্ব নিলেন; স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় কোরে দিলাম। ডাক্তার অতি ভক্তিভরে তাঁর চরণবন্দনা কোরলেন। শেষে বালকটীর কথা বলায় অতি আগ্রহে তাকে হাসপাতালের একটা ছোট ঘরে একাকী থাকবার বন্দোবস্ত করবার আদেশ দিলেন। বালকটীকে বিশেষ রকমে তত্ত্ব লওয়ার জন্য তাকে ভাল কোরে শুশ্রূষা কোরতে যদি কিছু ব্যয়ও হয় আমি তা দিয়ে যেতে প্রস্তুত হওয়ায় ডাক্তার বড়ই দুঃখিত হোলেন। চিকিৎসালয়ের নিয়ম অনুসারে সরকার থেকেই সব দেওয়া হোয়ে থাকে, তা ছাড়াও যদি বিশেষ কিছু দরকার হয় তা হোলে সেটা দেবার ক্ষমতা ভগবান ডাক্তারকে দিয়েছেন একথা তিনি অতি বিনীতভাবে বোল্‌লেন।—আমি একটু অপ্রস্তুত হোয়ে গেলাম।

বালকটীর জন্য বিছানা প্রস্তুত হোলে তাকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। এখন বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হোল। আজ তিন দিন যদিও বালকটীকে পেয়েছি, তবুও তাকে আমাদের একজন নিতান্ত আপনার জন বোলে মনে হোতে লাগ্‌লো। এই অসহায় রুগ্ন অবস্থায় তাকে এই পর্ব্বতের মধ্যে ফেলে যাচ্ছি; এজীবনে হয়ত আর তার সঙ্গে দেখা হবে না, এই দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে সে যে

আর বাহির হোতে পারবে তারই বা নিশ্চয়তা কি, এই সব কথা ভেবে প্রাণের মধ্যে কেমন কোরতে লাগ্‌লো। তার পর যখনই তার সেই রোগক্লিষ্ট মলিন মুখের দিকে দৃষ্টি পোড়তে লাগ্‌লো তখনই একটা অব্যক্ত শোকের ছায়া এসে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন কোরতে লাগ্‌লো। তবুও আমি ধীর নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম; বৈদান্তিক ভায়ার দুটী চক্ষু বিস্ফারিত দেখে বেশ বুঝতে পারলুম মায়াবাদী অনেক কষ্টে মনের কোমল ভাব গোপন কোর'ছেন। স্বামীজি কিন্তু কেঁদে ফেললেন। তিনি আর আত্মসম্বরণ কোরতে পারলেন না; বালকটীর হাত ধোরে তিনি কান্নাজুড়ে দিলেন। হায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তুমিই ধন্য, নিজের সব ত্যাগ কোরে এসে এখন পথে ঘাটে যাকে কাতর দেখ, যাকে দুঃখী দেখ তারই জন্য কেঁদে আকুল। আমরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এই অশ্রুজল দেখ্‌তে লাগলুম। পরের জন্য যে এমন কোরে চোখের জল ফেল্‌তে পারে সে দেবতা নয়ত কি?

বেলা হোয়ে যায় দেখে আমরা অতি কষ্টে বালকের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ কোরলুম। ডাক্তার বাবু ও দারোগা মহাশয়কে আবার বিশেষ কোরে অনুরোধ করা গেল। শেষে তাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ কোরে চোলে এলুম। আর হয়ত এ জীবনে নন্দপ্রয়াগ দেখা হবে না। যে সব স্থান ছেড়ে যাচ্ছি কত দিনের সাধন ফলে তবে এমন সব পবিত্র স্থান দেখা হোয়েছিল; আবার কি এ পুণ্যভূমিতে আসা হবে? কে জানে ভবিষ্যতের গতি কি আছে? কে জানে অদৃষ্টদেবী অন্তরালে থেকে আমাদিগকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তায় যেতে যেতে সুধু বালকটীর কথাই মনে হোতে লাগলো। সে যদি আপনার পরিচয় দিতো তা হোলে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কোরতে পারতুম; সে ত নিজের পরিচয় দিলে না, কি এক মনের আবেগে কি এক হৃদয়ভেদী কষ্টে যন্ত্রনায় সে লোকালয় ছেড়ে এই ভয়ানক পর্ব্বত প্রদেশে মাথা দিয়াছে তা না জান্‌তে পেরে তার উপরে আমাদের স্নেহ আরও বৃদ্ধি হোয়েছিল। এমনি কোরে কত পথিকের সঙ্গে কত দিন কত পথে দেখা হোয়েছিল, আজ হয় ত তাদের চেহারা পর্য্যন্তও মনে নাই।

কৃষি কার্য্য।

গমের চাষ।

গমের আদিম জন্মস্থান মেসোপটামিয়া। ইহার বোটানিক্যাল নাম ট্রিটিকম সাটিভম (Triticum sativum)। ইহা সাধারণতঃ তিন জাতীয়:—

(১) গঙ্গাজলি—দানা গুলি বড় ও সাদা।

(২) জামালি—দানা গুলি বড় ও রাঙ্গা।

(৩) ক্ষেরি—দানা গুলি ছোট ও রাঙ্গা।

গত বৎসর বাঙ্গালায় মোট ১৪৩৩৩০০ একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল (এক 'একর' তিন বিঘার কিছু অধিক)।

নিম্নলিখিত রূপে গমের চাষ করিলে অধিক লাভ পাওয়া যায়।

শস্য পর্য্যায়। বিলাতে গমই সমস্ত শস্য অপেক্ষা দামী ও অত্যন্ত আবশ্যকীয়, ইহা সেখানে মূলা ও সিম প্রভৃতি ফসলের পর সেই জমিতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আউস, ভাদুই, ভুট্টা প্রভৃতির আবাদের পর সেই জমিতে গমের আবাদ করা হয়। পতিত জমিতেও ইহা বুনা যাইতে পারে। যে জমিতে গম চাষ করা যায় তাহাতে দুই কিম্বা তিন বৎসর অন্তর একবার করিয়া মটর কলাই বুনা ভাল।

জমি। কর্দ্দম সংযুক্ত জমিতে গম উত্তম রূপ জন্মায়।

জমি প্রস্তুত। বর্ষার সময় অবধি যদি জমি পতিত থাকে তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে কিম্বা আষাঢ় মাসের প্রথমে জমিতে প্রথম হাল দিতে হয়। যদি আশুধান্য বা কোন ভাদুই ফসলের পর গম বুনা যায়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ দিন অন্তর কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত হাল দিতে হয় এবং ইহার মধ্যে জমির সমুদয় ঢেলা গুঁড়াইয়া বীজ বুনিবার উপযোগী করিতে হয়। 'শিবপুর' লাঙ্গলের দ্বারা এইরূপ হাল দেওয়া ভাল কারণ ইহাতে উচ্চ জমি উত্তম রূপে হাল দেওয়া যায় এবং ইহাতে ৬ ইঞ্চিগর্ত্ত করিয়া এরূপ ভাবে মাটী উল্টাইয়া দেয় যে তাহাতে সূর্য্যের উত্তাপ ও বাতাস পায়। বীজ বুনিবার ২ কিম্বা ৩ দিন পূর্ব্বে শেষ হাল দিবার সময় দেশী লাঙ্গল ব্যবহার করা যাইতে পারে; এবং সেই সময়ে জমি উত্তম রূপে ধূলি করিবার জন্য 'মই' দিতে হয়।

সার। দেশীয় গম অপেক্ষা 'বক্সার গম' উত্তম তজ্জন্য বক্সারের গমের চাষ করাই উচিত। ইহা ভালরূপ করিয়া চাষ করিতে হইলে বাঙ্গালায় যত প্রকার দেশীয় গম জন্মায় তাহাতে যত পরিমাণে সার আবশ্যক তাহা অপেক্ষা ইহাতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। অধিক সার দিতে হইলে যদিও চাষের খরচ অধিক হয়, কিন্তু ইহাতে এত অধিক গম উৎপন্ন হয় যে তাহাতে সার কিনিবারও খরচ উঠিয়া যায়। নিম্ন লিখিত মিশ্রিত সারের দ্বারা এই ফসল অধিক পরিমাণে হয়। প্রতি বিঘায় (৮০ হস্ত দীর্ঘ ও ৮০ প্রস্থ বিঘার মাপ)।

(১) হাড়ের গুঁড়া—	১ মণ।	ও সোরা—৫ সের।
কিম্বা (২) গোবর—	৫০ মণ।	ও সোরা—৫ সের।

জমিতে হাল দিবার সময় হাড়ের গুঁড়া ও গোবর দিতে হয়, এবং গাছ যখন দশ ইঞ্চি উচ্চ হয় তখন সোরা ক্ষেতে ছিটাইয়া দিতে হয়। যেখানে সোরা না পাওয়া যায়, সেখানে ইহার পরিবর্ত্তে সাধারণ লবণ দেওয়া যাইতে পারে।

বপন প্রণালী। উপরি উক্ত রূপে যখন জমির ঢেলা সকল ভাঙ্গিয়া চৌরষ হইবে তখন প্রতি বিঘায় ১৫ সের করিয়া বীজ বুনিতে হয়। আমেরিকায় বীজ বুনিবার এক

প্রকার কল আছে তাহা বীজ বুনিবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। যেখানে এ কল পাওয়া যায় না সেখানে বুননকারীকে হালের পিছনে হালের ফাল দ্বারা কৃত গর্ত্ত মধ্যে বীজ ছড়াইয়া যাইতে হয়। বীজ বুনিবার পর তাহাদিগকে ঢাকা দিবার জন্য একবার মই দিতে হয়। দুইটি সারির মধ্যে ৮ ইঞ্চি ব্যবধান রাখা ভাল।

জমির পাট। বুননের পর কোদলান, ঘাস উপড়ান এবং জলসেচন এই কয়েকটি করিতে হয়। অন্যান্য দেশী গম অপেক্ষা বক্সার গমে অধিক জল সেচন করিতে হয়। তিনবার সেচই যথেষ্ট কিন্তু ইহা জলবায়ু, বৃষ্টিপাত এবং জমির উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করে।

কাটিয়া লওয়া। বাঙ্গালায় এই ফসল সম্পূর্ণ রূপে পক্ক হইলেই কাটিয়া থাকে। কতকগুলি ইংরাজ চাষীর মতে অপক্ক অবস্থায় কাটাই উচিত। কিন্তু কাটিবার সময় দেখিতে হইবে যে বীজের মধ্যস্থিত দুগ্ধবৎ রস শুখাইয়া সম্পূর্ণ শক্ত হইয়াছে। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসই ইহা কাটিবার প্রশস্ত সময়। জমীর কিছু উপর কাস্তের দ্বারা গম কাটিয়া ঝাড়িবার স্থানে লইয়া যাইতে হয়, এবং সেখানে দুই চারিদিন রৌদ্রে শুকাইতে হয়। তাহার পর ইহা বলদের দ্বারা মাড়াইয়া শস্য পৃথক করিতে হয়, পরে কুলাদ্বারা ঝাড়িয়া বাছিয়া লইতে হয়।

যই চাষ।

যইয়ের আদিম জন্মস্থান যে কোথায় তাহার কিছুই ঠিক নাই তবে অনেকে অনুমান করেন যে ইউরোপের উত্তরাংশই ইহার আদিম জন্মস্থান। ইহার বোটানিক্যাল নাম এভিনা সাটিভা (Avena Sativa) গত বৎসর বাঙ্গালায় মোট ১০২৮১০০ একর জমিতে ইহার চাষ হইয়াছিল। (এক 'একর' তিন বিঘার কিছু অধিক)।

নিম্ন লিখিত নিয়মে ইহার চাষ করিলে উত্তমরূপ ফসল পাওয়া যায়।

শস্য পর্য্যায়। যই ও আশুধান্য প্রভৃতি ফসলের পর উচ্চ জমিতে জন্মিতে পারে; কিম্বা নীচু ধান জমি যাহা বৃষ্টির পরেই শুকাইয়া যায় এরূপ জমিতেও হইতে পারে। এই উভয় অবস্থায় ইহা ধান কাটিয়া লইবার পরেই সেই জমিতে হয়, তজ্জন্য ইহাকে রবি ফসল বলে।

জমি। ইহার চাষে শুষ্ক জমিই প্রশস্ত। কিন্তু ইহা আঁটাল কাদাতেও হয়। যে জমিতে নানা প্রকার শাক-শবজী পড়িয়া সার হইয়াছে তাহাতে ভাল ফসল হয়।

জমি প্রস্তুত। আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে যখন বর্ষাশেষ হয় তখন দশ বার দিন অন্তর জমিতে অনেক বার হাল দিতে হয় ও মইয়ের দ্বারা চৌরস করিতে হয়। এই রূপ হাল দিবার জন্য 'শিবপুর' লাঙ্গলই অধিক উপযোগী কারণ ইহাতে দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা উচ্চ জমিতে অতি উত্তম চাষ হয়, কিন্তু বীজ বুনিবার দুই বা তিন দিন পূর্ব্বে দেশীয় লাঙ্গলের দ্বারা হাল দেওয়া যাইতে পারে।

সার। উর্ব্বরা জমীতে অধিক সার দিবার আবশ্যক করে না, কিন্তু অনুর্ব্বরা জমীতে

সার দেওয়া আবশ্যক। এক বিঘা জমিতে ৫০ মণ গোবর সার দিলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু প্রথম লাঙ্গল দিবার সময় এই সার অত্যন্ত পচাইয়া দিতে হয়। গাছ বাহির হইবার পর ৫ সের সোরা দিতে হয়।

বপন প্রণালী। আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যখন জমি প্রস্তুত হয় তখন প্রত্যেক বিঘায় ২০ সের করিয়া বীজ বুনিতে হয়। কোন কোন স্থানে প্রত্যেক বিঘায় ১০ সের করিয়া বীজ বুনিয়া থাকে। সাধারণতঃ যই, গম অপেক্ষা ঘন বুনন করা আবশ্যক, কিন্তু গম প্রত্যেক বিঘায় ১৫ সের করিয়া বুনিতে হয়। বীজ বুনিবার পর তাহাদিগকে মাটী ঢাকা দিবার জন্য একবার লাঙ্গল বা মই দিতে হয়।

জমির পাট। যই বুনিবার পর আর কিছুই করিতে হয় না কেবল জমি শুষ্ক হইলে সেচ দিতে হয় ও ঘাস জন্মাইলে মধ্যে মধ্যে তুলিয়া দিতে হয়।

কাটিয়া লওয়া। যই উত্তম রূপে পক্ক হইবার পূর্ব্বেই কাটা উচিত কারণ যদি সম্পূর্ণ পক্ক হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করা যায় তাহা হইলে জোর বাতাসের সময় ঝরিয়া যাইতে পারে। গমের মতন ইহাকেও কাস্তে দিয়া কাটিতে হয়। ইহাকেও অন্যান্য কলাই প্রভৃতির ন্যায় পাছড়াইতে হয়।

স্কটলণ্ডে যইয়ের দ্বারা রুটি প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের কিম্বা ঘোড়ার খাদ্যের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ফসল সম্বন্ধে উত্তর পশ্চিমের—মেসার্স ডুথি এণ্ড ফুলার্ এইরূপ বলিয়াছেন—"অধিক পরিমাণে জল সেচন করিলে দেখা যায় যে এই ফসল কাঁচা অবস্থায় শীতকালে পশুদিগের উপাদেয় খাদ্য হয়; কারণ তিনবার উপর্য্যুপরি কাটিয়া লইলেও ইহাতে পুনরায় শস্য জন্মায়।" হিসারের সরকারী পশুশালায় প্রত্যেক বৎসর এইরূপে যই চাষ করা হয়।

জর্ম্মণ শিল্প শিক্ষা।

কথাটা যা বলিব নিতান্ত সামান্য, খালি গুটিকত Facts&Figures তোমাদের সম্মুখে ধরিব। যদি অবসরকালে তোমাদের শূন্য মন দৈবাৎ ইহাতে আকৃষ্ট হয়, দৈবাৎ ইহার অনুধাবনায় নিযুক্ত হয়, দৈবাৎ মাতিয়া উঠে, দৈবাৎ কার্য্যে ব্রতী হয়।

শিল্প শিক্ষায় সকল দেশ অপেক্ষা জর্ম্মণী অধিক উন্নতি করিয়াছে। জর্ম্মন্ শিল্পী, জর্ম্মণ্ নাবিক, জর্ম্মণ ব্যবসায়ী ইংলণ্ডে ও ইংলণ্ডের তাবৎ উপনিবেশ ও অধিকারভুক্ত প্রদেশে ছাইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রতিযোগিতার দ্বারা ইংলণ্ডবাসী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ফ্রান্স্ ও ফরাশিস্ উপনিবেশগুলিতেও জর্ম্মণ্ প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া যাইতেছে। জর্ম্মণীর বর্ত্তমান সম্রাট্ও জগৎব্যাপী একটা বাণিজ্য সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী। বৃত্তি শিক্ষার জন্য

(Technical Education) জর্ম্মণীতে কিরূপ সুবিধা আছে, ভারতীয় পাঠকদিগকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিবার জন্য সাক্‌সাণী প্রদেশে বৃত্তিশিক্ষা দিবার কি কি উপায় আছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

সাক্‌সাণীর সরকারী বেসরকারী সকল বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয় গুলিই গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা ভুক্ত। ইহার মধ্যে ৮টী বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে স্থাপিত ও চালিত। এই আটটী ব্যতীত খনিবিষয়ক, জাহাজনির্ম্মাণবিষয়ক, চিকিৎসাশাস্ত্র-বিষয়ক এবং সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য অনেক গুলি বিদ্যালয় আছে। জর্ম্মণীর অধিকাংশ বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়ই বে-সরকারী, এক সাক্‌সাণীতেই ন্যূনাধিক ৩০০ টী বেসরকারী বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে ৯ টী বিদ্যালয়ে নাপিতের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়, দুইটী বিদ্যালয়ে টিনের কার্য্য, ২ টী বিদ্যালয়ে পুস্তক ছাপাই কার্য্য, ২ টীতে পুস্তক বাঁধাই কার্য্য, ২ টীতে কম্পাউণ্ডারী বা ঔষধ প্রস্তুত কার্য্য, ৮ টীতে ছুতারের কার্য্য, ১ টীতে চর্ম্ম প্রস্তুতের কার্য্য, একটীতে মিঠাই প্রস্তুতের কার্য্য, চারিটীতে রং ও এনামেলের কার্য্য, ৩টিতে বাদ্য যন্ত্র প্রস্তুত কার্য্য, ১৬ টীতে গীত বাদ্য, ১০ টীতে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য, একটীতে ময়দা প্রভৃতি শস্য চূর্ণ (ছাতু,) প্রস্তুত কার্য্য ৪ টীতে কারচুপি, ১৩টীতে দরজীর কার্য্য, ৪ টীতে লোহার কার্য্য, ২ টীতে জুতা সেলাইয়ের কার্য্য, ২টীতে খেলেনা প্রস্তুত, একটীতে গৃহে কাগজ মোড়াই কার্য্য, একটীতে ঘড়ী প্রস্তুত ২৩ টীতে বস্ত্র বয়ন, ১৪ টীতে ব্যবসা সম্বন্ধীয় চিত্রাঙ্কন, ১০টীতে কৃষিকার্য্য, এবং ৪৩ টীতে বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত ৪৯টী বিদ্যালয়ে কেবল স্ত্রীলোক বা বালক বালিকাদের শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, অবশিষ্টগুলিতে এককালীন অনেকগুলি বৃত্তি বা ব্যবসায় শিখিবার ব্যবস্থা আছে।

সাক্‌সাণীর গবর্ণমেণ্ট শিল্প শিক্ষার জন্য বৎসর বৎসর কত খরচ করেন তাহা নিম্নের তালিকা দেখিলে ধারণা হইবে।

	১৮৭৪ সালের খরচ	১৮৮৪ সালের খরচ	১৮৯৪ সালের খরচ
১। কেমনিজ্ শিল্প-বিদ্যালয়	৬৩৩০ পাউণ্ড	৯,১৫৩ পাউণ্ড	১২,৫৯৬ পাউণ্ড
২। ড্রেস্‌ডেন্ শিল্প-বিদ্যালয়	৯৩২ "	৭,৪৬৭ "	৮,৩৩৬ "
৩। লাইপ্‌জিগ শিল্প-বিদ্যালয়	১,২০৩ "	২,১৯১ "	৪,৫৬৯ "
৪। প্লাওয়েন শিল্প বিদ্যালয়	—	—	৩,৬৯৮ "
৫-৮। ড্রেস্‌ডেন্, লাইপজিগ প্লাওয়েন্ ও জিটাউ, গৃহনির্ম্মাণ শিক্ষা-বিদ্যালয় চতুষ্টয়	২,৯৭৪ "	৪,৩২৫ "	৫,৫৮৪ "

১৮৭৩ সালে স্যাক্‌সান গবর্ণমেণ্ট ৪৬ টী বে-সরকারী বিদ্যালয়ে ৩,০৯০ পাউণ্ড, ১৮৮৩ সালে ৬২ টী শিল্প বিদ্যালয়ে ৪,৭৮৫ পাউণ্ড, এবং ১৮০৪ সালে ১২৫ টী শিল্প বিদ্যালয়ে

৮,৫৭২ পাউণ্ড সাহায্য করেন। এদেশী হিসাবে শিল্প শিক্ষার জন্য স্যাক্সাণীতে বৎসরে ৭ লক্ষ টাকা সরকারী টাকা হইতে খরচ হইয়া থাকে।

লাইপ্‌জিগ নগরের একটী যাদুঘরে স্যাক্সাণীর প্রধান প্রধান শিল্প বিদ্যালয়ে প্রস্তুত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দ্রব্য প্রদর্শিত আছে। শিল্প বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র আকর্ষণ করিবার জন্য এই যাদুঘর একটী প্রধান উপায়।

এই সকল বিদ্যালয়ে কত অল্প বেতনে ছাত্র অধ্যয়ণ করিতে পারে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। গ্রস্ শোনাউরের বে-সরকারী বস্ত্রবয়ণ বিদ্যালয়ে স্যাকসাণী নিবাসী ছাত্রদের কেবল বৎসরে ৩ পাউণ্ড করিয়া বেতন দিতে হয়, অন্যান্য জর্ম্মণ ছাত্রদের বৎসর ৭॥ পাউণ্ড বেতন লাগে। অন্য কোন দেশীয় ছাত্র যদি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা করে তবে তাহাকে বৎসরে ১৫ পাউণ্ড বেতন দিতে হয়। বিদ্যালয়টীতে প্রত্যহ ৯ঘণ্টা শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং এক বৎসরের মধ্যেই শিক্ষা কার্য্য শেষ হয়। ফ্রান্সেরও অনেক শিল্প-বিদ্যালয়ে অন্য দেশীয় ছাত্রের প্রবেশাধিকার আছে, লায়ন্সের বাণিজ্য-বিদ্যালয় ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। জাপানের বর্ত্তমান শিল্পোন্নতির প্রধান কারণ জাপানী ছাত্রগণের জর্ম্মণী ও ফ্রান্সের শিল্প বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করিয়া কল বল সহ জাপানে আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করা। হে স্বদেশি, হে ভ্রাতা "Go thou and do likewise."

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর — স্বর—ঐ

যোগিয়াবিভাস—একতালা

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়।
ওই সেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়।
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহেনা আবাসে মন হায়;
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়!
আজি কে যেনগো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!
তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়
"একহে, একহে, নয় গো!"
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।

আজি কোন্ উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!
আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুল ডালা
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

॥৩॥ [—১ স১ স১ । র১ ম১ ম১ । প১ পধো১ পধোনো১ । নোধো১
আ জি শ র ত ত প নে প্র

ধোপ১ পম১ । মগ১ গ১ গমপ১ । গমপ১ মপম১ গ১ । গরস১ সর১ গম১ ।
ভা ত স্ব প নে কি জা নি প রা ণ

গমগ১ গর১ র্স১ ।]—১ প২ । প১ ধ১ ধর্স১ ।—১ র্সর্র১ র্সর্গ১ । র্সর্গ১ র্গর্র১
কি যে চায়]— ওই সে ফা লি র শা খে কি ব
শেষ।

র্রর্স১ । র্সন১ নধ১ নোধপ১ । সপ১ প১ প১ । প১ প১ ধো১ । প১ ধো১
লি মা ডা কে বি হ গ বি হ গী কি যে

পধো১ । নোধো১ ধোনোধো১ প১ । পধোপ১ মগ১ গ১ । গরস১ সর১ গম১ ।
গা য় গো — কি জা নি প রা ণ

গমগ১ গর১ স১ ।—১ প১ প১ । প১ ধ১ ধর্স১ । র্স১ র্স১ নর্সর্রর্গ১ ।
কি যে চায় আ জি ম ধু র বা তা সে
কো ন্ স্ব প নে র দে শে।
আ মি আ মা র এ প্রা ণ

র্রর্গ১ র্রর্স১ র্স১ । র্স১ র্স১ র্স১ । র্সর্স১ নর্সর১ র্র১ । র্রর্র১—১র্সর্রর্গ১ । র্রর্গ১ র্রর্স১
হৃ দ য় উ দা সে রহে — না আবা— — সে —
আ ছে এ লো কে শে— কো ন্ ছায়া ময়ী — — — —
য দি ক রি দা ন দিব্ — প্রাণ তবে — — — —

র্সর১ । র্সর্রর্সনধ১ নধ১ পধ১ । ধ১ ধর্র১ র্স১ ।—১ র্স১ র্স১ । র্স১ নর্সর্র১
মন হা য় কোন্ কু সু মে র আ শে কো ন্
অম রা য় আজি কো ন্ উ প ব নে আ মা
কার পা য় সদা ভ য় হ য় ম নে পা ছে

র্র্স১। র্সন১ নধ১ নোধপ১। সপ১ প১ প১। প১ প১ ধো১। প১
ফু ল বা সে সু নী ল আ কা শে ম
রি কা র ণে বি র হ বে দ নে কেঁ
অ য ত নে ম নে ম নে কে হ ব্য

ধো১ পধো১। নোধো১ ধোনোধো১ প১। পধোপ১ মগ১ গ১। গরস১
ন ধা য় গো — কি জা নি প
দে যা য় গো — কি জা নি প
থা পা য় গো — কি জা নি প

সর১ গম১। গমগ১ গর১ স১।—১ স১ স১। রম১ ম১ প১। পধো১ পধো১
রা ণ কি যে চায় — আ জি কে যে ন গো না
রা ণ কি যে চায় — আ মি য দি গাঁ থি গা
রা ণ কি যে চায় —

নোধপ১। পধোনো১ ধোপ১ মগ১। গ১ গমপ১ —১। গমপ১ মগ১ গ১।
ই এ প্র ভা তে তা ই জী ব ন
ন অ থি র প রা ণ সে গা ন

গরস১ সর১ গম১। গমগ১ গর১ স১।—১ প১ প১। প১ ধ১ ধর্স১। র্স১ র্স১
বি ফ ল হ য় গো — তা ই চা রি দি কে চা
শু না —ব কা রে আর — আ মি য দি গাঁ থি মা

র্সর্র১। র্র্স১ র্সন১ নধ১। ধ১ নোধ১ প১। সপ১ প১ প১। প১ প১ ধো১। প১
ই ম ন কেঁ দে গা য় এ ন হে এ ন হে ন
লা ল য়ে ফু ল ডা লা কা হা রে প রা ব ফু

ধো১ পধো১। নোধো১ নোধোপ১ ম১। মপম১ গ১ গ১। গরস১ সর১ গম১।
য় গো — তা ই জী ব ন বি ফ —ল
ল হা র গো — কা হা রে প রা —ব

গ১ রগর১ স১ ॥
হ য় গো
ফু ল হার্

বৈজ্ঞানিক-সংগ্রহ।

উদ্ভিজ্জ কেশ।

অনন্ত বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কার্য্যের খুঁটিনাটি আবিষ্কার অতি দুরূহ ব্যাপার। বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ জীবরাজ্যে ও উদ্ভিদজগতে বহু গবেষণা ও পরীক্ষাদি করিয়াও, অনেক পদার্থের অস্তিত্বের কারণ ও উপযোগিতাদি সম্বন্ধে, আজও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক; প্রকৃতির কতকগুলি স্থূল কার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া, সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করেন, অনেক সময় আবার তাহাও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ প্রতিপন্ন হইয়া, পরিত্যক্ত হয়। এই প্রকারে অনেক প্রাকৃতিক রহস্য, জড়তত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে।

পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, বৃক্ষপত্রের উপরিভাবে প্রায়ই এক প্রকার সূক্ষ্ম কেশাবরণ থাকে,—কখন কখন পুষ্প শাখাপ্রশাখা ও মূলদেশেও উহা দেখা যায়। বৃক্ষ অঙ্গে সৌষ্ঠবসাধক কেশের অস্তিত্ব দেখিয়া, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্গণ বহুকাল হইতে ইহার কার্য্য অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। শীতাতপ নিবারণ জন্য জীব শরীর যে প্রকার কেশাবৃত হয়, তৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ উদ্ভিদ দেহেও কেশযুক্ত হয় বলিয়া, অনেকেই নানা পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। নানা প্রতিকূল অবস্থায়, প্রাণীগণ স্ব স্ব অস্তিত্ব অক্ষত রাখিবার জন্য এবং শত্রুর গ্রাস হইতে আত্মরক্ষার্থে স্বভাবতঃই নানা উপায় প্রাপ্ত হইয়াছে,—তাহারা সেই সকল শক্তির সুব্যবহার করিয়া স্বীয় বংশের অভিব্যক্তি সাধন করে,—উদ্ভিদ্‌রাজ্যেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সুদৃশ্য বৃক্ষাদির কণ্টক, "বিচুটী" প্রভৃতি কয়েক জাতীয় গুল্মের বিষাক্ত পত্র,—এ সকলই উক্ত উদ্ভিদগুলিকে শত্রু হস্ত হইতে অব্যাহত রাখিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকার নানা দৃষ্টান্ত দেখিয়া, উদ্ভিজ্জ-কেশ সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল; আবার চিরতুষারময় আল্‌পস্ পর্ব্বত শিখরে, সুদীর্ঘ ও ঘন কেশাচ্ছন্ন এক জাতীয় বৃক্ষ আবিষ্কৃত হওয়ায়, শীতবাত্যা হইতে বৃক্ষগুলিকে নিরাপদে রাখিবার জন্যই যে উদ্ভিদগাত্রে কেশোদ্গম হয়, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। সম্প্রতি উইলিয়ম্ বেলী (W. W. Bailey) নামক জনৈক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্, উদ্ভিজ্জ কেশের এক অদ্ভুত কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

বেলি সাহেব বলেন,—উদ্ভিজ্জ কেশের কার্য্য সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক নয়,—এগুলির সাহায্যে বাস্তবিকই শীত রৌদ্রের কঠোরতা অনেক প্রসমিত হয় এবং সময় সময় পুষ্পোদ্গমের বিশেষ হানিকর অনেক কীটও কেশগুলিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু এতদ্ব্যতীত এগুলির দ্বারা উদ্ভিদের শুভকর আর একটী সুমহৎ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, উদ্ভিদ-মাত্রেরই শাখাপত্রাদিতে বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে,—পাদপ সকল তদ্দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য করিয়া থাকে; উক্ত ছিদ্রগুলি এত সূক্ষ্মভাবে গঠিত যে তন্মধ্যে অল্প জল প্রবেশ

করিলে বা বায়ুর আঘাত লাগিলে সেগুলি এককালীন বিকল হইয়া যায়—এবং এই প্রকারে বহুসংখ্যক ছিদ্র বিকৃত হইলে শীঘ্রই বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া পড়ে। বেলী সাহেব বলেন, বৃক্ষাদির শ্বাস যন্ত্র স্বরূপ উক্ত ছিদ্রগুলি, উদ্ভিজ্জকেশ দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ থাকে, বহিস্থ কোন পদার্থই, কেশগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কি পরিমাণ বল প্রয়োগে কেশসকল ছিদ্রচ্যুত হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, অনেক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ নানা কৌশলে বলপ্রয়োগ করিয়াও, একটী কেশও স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই,—শেষে বায়ুনিষ্কাষণ যন্ত্র (Air pump) দ্বারা ছিদ্রের উপরিভাগ বায়ুশূন্য করিয়া ছিদ্রস্থ বায়ুর প্রসারণ বলে, কেশগুলি ঈষৎ স্থানচ্যুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বংশ ও কয়েক জাতীয় তৃণপত্রের উপরিভাগ মসৃণ এবং অধোভাগ কেশাবৃত দৃষ্ট হয়,—অধোভাগে বায়ুপূর্ণ পূর্ব্বোক্ত ছিদ্রগুলি কেশদ্বারা এ প্রকার দৃঢ় আবদ্ধ থাকে যে, পত্রগুলি বহুক্ষণ জলমধ্যে রাখিয়া ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিলেও, ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করিতে পারে না।

বৃক্ষমূলে যে সকল কেশদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারাও উদ্ভিদের অনেক শুভকর কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে;—এগুলি সরস মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া, বৃক্ষের পোষণ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে। অনেক বৃক্ষের বীজ, সূত্রাকার কেশ দ্বারা আবৃত দেখিতে পাওয়া যায়,—উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্গণ এই কেশের উপযোগিতা আবিষ্কারের জন্য অনেকদিন অবধি বহু পরীক্ষাদি করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কার্পাস ও শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষের কেশাবৃত বীজ সহজেই বায়ুদ্বারা নানাস্থানে চালিত হইতে দেখিয়া, বেলী সাহেব অনুমান করেন, উদ্ভিদের বীজসংলগ্ন কেশদ্বারা, ইহাদের বংশ প্রসারণের সাহায্য হয়। কিন্তু আমাদের দেশের তাল ও আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের বীজসংলগ্ন কেশদ্বারা, উক্ত কার্য্য কি প্রকারে সাধিত হয় উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্গণ তৎসম্বন্ধে কোনই মীমাংসা করেন নাই;—এই শেষোক্ত মতবাদের সমীচীনতা পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

ফোটোগ্রাফি।

জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আজ কাল অনেক শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ যন্ত্র গঠিত হইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের নানা অঙ্গের অসাধারণ পুষ্টি সাধন হইতেছে। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে বোধ হয় ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র, এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই,—শারীর-তত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কলাবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ন্যায় অতি দুরূহ শাস্ত্রের আলোচনাতেও ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অবস্থা অতি হীন ছিল,—জ্যোতির্বিদগণ নগ্নচক্ষু-দৃষ্ট কয়েকটী গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি আলোচনা করিয়া তৎকালে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। তাহার পর দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারে, পরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্ক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতিদূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যাপার, তদ্দ্বারা বিশেষ কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই,—আজ কাল কেবল ফোটোগ্রাফ যন্ত্র দ্বারা অনন্ত আকাশপ্রান্তে বিচরণশীল

এবং দুরবীক্ষণেরও অগোচর অনেক নক্ষত্র পুঞ্জ ও নীহারিকারাশির নিখুঁৎ প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক গূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় পীড়া জীবাণুর (Bacteria) কথা শুনিয়া থাকিবেন,—আধুনিক শারীরতত্ত্ব বিদগণের মতে, এই জীবাণু প্রাণীশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় অনুকূল অবস্থায় তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেই, প্রাণী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে,—এই জীবাণু গুলি এত ক্ষুদ্রায়তন যে, কেবল অতি বৃহৎ অনুবীক্ষণ দ্বারা ইহাদিগকে দেখা যায়। আজ কাল অনুবীক্ষণ ও ফোটোগ্রাফ যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যেক পীড়ার জীবাণুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইতেছে,—এবং কোন জাতীয় আহার্য্যে বহু সংখ্যক জীবণু অবস্থান করে এবং পানীয় জল কি প্রথায় বিশুদ্ধ করিলে ব্যাধিবীজ-বর্জ্জিত হইতে পারে, শারীরতত্ত্ববিদগণ তৎসম্বন্ধে অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় কেবল ফোটোগ্রাফি সাহায্যে আবিষ্কার করিয়া, জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত রাজকীয় ব্যাপারেও আজ কাল ফোটোগ্রাফির নানা ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে রাজকীয় অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের প্রতিকৃতি রাখার কথা পাঠক পাঠিকাগণ অবশ্যই অবগত আছেন,—নৃশংস হত্যাকারীগণকে ধৃত করিবার জন্যও, এখন ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। কয়েক বৎসর হইল ইংলণ্ডের কোন সহরে (In westphalia), এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, পুলিশ কর্ম্মচারীগণ অপরাধী সন্দেহ করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণাভাবে, তাহাদিগকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতে পারে নাই। শবপরীক্ষাকালীন হত ব্যক্তির বস্ত্রাভ্যন্তরে কয়েক গুচ্ছ শুভ্রকেশ পাওয়া গিয়াছিল,—হত্যাকারী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিগণ মধ্যেও জনৈক পলিতকেশ বৃদ্ধ ছিল। উক্ত বৃদ্ধের কেশের অনুরূপ শুভ্রকেশগুচ্ছ মৃতদেহ সংলগ্ন দেখিয়া ঐব্যক্তি যে প্রকৃত হত্যাকারী, তৎ সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। বৃদ্ধ হত্যাপরাধের বিচারালয়ে নীত হইলে, কেবল স্থূল দৃষ্টি সাহায্যে উভয় কেশের সাদৃশ্য নিরূপণ দুরূহ বিবেচনা করিয়া, বিচারক উভয়বিধ কেশই ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত আলোক চিত্রকর অধ্যাপক জেসেরিচের (Dr. jeserich) নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরণ করেন। আনুবীক্ষণিক ফোটোগ্রাফ যন্ত্র দ্বারা উভয় কেশের বহ্বায়তন চিত্র অঙ্কন করিলে, তাহাদের পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল,—বিচারক তৎদৃষ্টে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর, পূর্ব্বোক্ত মৃতদেহ সংলগ্ন কেশগুচ্ছ বাস্তবিকই মনুষ্যজাত, কি অপর কোনও গৃহপালিত জীবজ তাহা স্থির করিবার জন্য জেসেরিচ অনেক পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন,—শেষে সে গুলি নিশ্চয়ই কোন একটী পীতবর্ণ খর্ব্বকেশ বৃদ্ধ কুকুরের লোম বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। অধ্যাপকের এই পরীক্ষার ফল প্রচারিত হইলে, প্রকৃত হত্যাকারী ধরিবার জন্য পুলিশ কর্ম্মচারীগণ আবার সচেষ্ট হইয়াছিলেন, এবং কয়েকদিন মধ্যে, হত্যাস্থানের নিকটবর্ত্তী কোন বাটীতে ঠিক পূর্ব্ববর্ণিত রূপ একটী কুকুর দেখিয়া, তাহার স্বামীই প্রকৃত

হত্যাকারী বলিয়া পুলিশের সন্দেহ হয়। এই প্রমাণ সাহায্যে কুকুর-স্বামী অভিযুক্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত অপরাধী বলিয়া বিচারালয়ে প্রমাণিত হইয়াছিল।

উদ্ভিদ-নিদ্রা।

জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে,—শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষয় বৃদ্ধি ও জরা মৃত্যুর কার্য্যে উভয়ের নানা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বহুক্ষণ জীবনের কার্য্য চলিয়া আসিলে শারীরিক সকল অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এগুলিকে পুনঃ কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে, কতক যন্ত্রের আংশিক বিশ্রাম অত্যাবশ্যক,—এইজন্য কার্য্যক্ষম জীবন অব্যাহত রাখিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে নিদ্রা, প্রাণীদিগের পক্ষে অপরিহার্য্য। নিদ্রাকালে প্রাণীগণের ইন্দ্রিয় ও দৈহিক যন্ত্র সকল কিয়ৎকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া, নিদ্রাবসানে সবল ও কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। উদ্ভিদগণও এই নিদ্রাসুখ হইতে এককালীন বর্জ্জিত নয়,—কিন্তু জীবগণের ন্যায় ইহারা প্রতিদিনই যথাসময়ে নিদ্রিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। বৎসরান্তে এক এক নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে প্রত্যেক উদ্ভিদেরই সুদীর্ঘ নিদ্রাকাল স্থিরীকৃত আছে। এই সময়ে বৃক্ষ সকল নিদ্রিত হইলে, ইহাদের শরীরের ক্ষয়বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক ক্রিয়া স্থগিত থাকে এবং যন্ত্রাদিও অলসাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে, পরে নিদ্রাশেষে নবাঙ্কুর উদ্গত হইয়া উদ্ভিদ সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কয়েক বৎসর হইতে, নরওয়ে দ্বীপবাসী জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ উদ্ভিদনিদ্রা সম্বন্ধীয় অনেক পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদি করিতেছেন। দুই তিন মাসব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রাকালে বৃক্ষগুলি বৃদ্ধিহীন ও অসাড় অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকা, উক্ত উদ্ভিদবিদের নিকট, কাষ্ঠব্যবসায়ী ও বৃক্ষস্বামীগণের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং কোন কৃত্রিম উপায়ে অল্পকাল মধ্যে উদ্ভিদের নিদ্রাসুখ পরিতৃপ্ত করিয়া, ইহাদের অবাধ বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত রাখা সম্ভবপর কিনা, এই বিষয় লইয়াই তিনি প্রথমতঃ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা পরীক্ষা করিয়াও, বহুকাল বিষয়টীর মীমাংসা হয় নাই;—সম্প্রতি মেডিকাল্ প্রেস্ নামক প্রসিদ্ধ ভিষজ্ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, উক্ত সাহেব কয়েকটী বৃক্ষের নবোদ্গত অঙ্কুর ও মূল প্রদেশে, ক্লোরোফরম্ নামক পদার্থের বাষ্প প্রয়োগ করিয়া, বৃক্ষগুলিকে অকালে গভীর নিদ্রামগ্ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই বাষ্পপ্রয়োগে বৃক্ষের কোন হানি হয় না, বরং কয়েকদিন পরে উক্ত বাষ্প অপসৃত করিবামাত্র, বৃক্ষগুলি জাগরিত হইয়া শীঘ্রই ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া পড়ে;—আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা, স্বাভাবিক নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট কালে বৃক্ষ সকলে নিদ্রা বা অসাড়তার অণুমাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। জীবগণের কৃত্রিম নিদ্রা আবশ্যক হইলে, উক্ত ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি বাষ্প প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তজ্জাত নিদ্রাদ্বারা, জীবগণের অবসাদ বা ক্লান্তি নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য সাধিত হয় না, বরং তদ্দ্বারা শরীর আরো ক্লান্তিযুক্ত হইয়া পড়ে;—উদ্ভিদের পক্ষে উক্ত স্বল্পকাল-ব্যাপী কৃত্রিম নিদ্রায়—সুদীর্ঘ স্বাভাবিক নিদ্রার ফল, বড়ই বিস্ময়কর।

নিশি।

রামকান্ত বাবুকে বড়ই নির্লিপ্ত স্বভাবের লোক বোধ হইত। জগৎ সংসারের সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যথাসময়ে পোষাকটী পরিয়া ছাতিটী মাথায় দিয়া আফিসে যাওয়া ও আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসা এই দুইটী কেবল তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য। লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে প্রায় তাঁহাকে দেখা যাইত না, তবে প্রয়োজন বশতঃ মাঝে মাঝে কাহারও সহিত দুই চারিটী কথা বলিতেন এই মাত্র। পাড়ার একজন হঠাৎ কবি রামকান্ত সম্বন্ধে বলিতেন "রামকান্তের মন সর্ব্বদাই তাঁহার গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে।" কিন্তু যথার্থ কথা, রামকান্তের গৃহপিঞ্জরে তাঁহার গুড়গুড়িটী ভিন্ন আর বিশেষ কেহ সঙ্গী ছিল না।

রামকান্ত বাবুর সংসারটী ক্ষুদ্র। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী এই ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। স্বামী স্ত্রীতে কেমন প্রণয় অথবা অপ্রণয় তাহা আমরা জানি না, তবে কলহ যে কচিৎ হইত একথাটী নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। রামকান্ত নিজের গুড়গুড়ি তাকিয়া ও দুই একখানি পুস্তক লইয়া সময় কাটাইতেন, রাজলক্ষ্মী গৃহের পারিপাট্য করিতে সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে তাঁহার সমস্ত সময় ব্যয় করিতেন। অভ্যাগতের গতিবিধি নাই, বালক বালিকার কোলাহল নাই এজন্য রামকান্ত অত্যন্ত শান্তিতে থাকিতেন।

বিধাতার কেমন খেলা, সহসা একদিন এই আঁধার ঘরে একটী আলো জলিয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যাকালে সহসা আনন্দহীন শান্তিভঙ্গ করিয়া এই নিস্তব্ধ গৃহে অশান্ত আনন্দ কোলাহল উঠিল। যেন দেবতা পূজার একটী নির্ম্মাল্য দেবপাদচ্যুত হইয়া রাজলক্ষ্মীর শূন্য অঙ্কে খসিয়া পড়িল। প্রতিবেশীনীগণের এ গৃহে বড় একটা গতিবিধি ছিল না, কিন্তু আজ সে নিয়ম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। এত দিনের পর রামকান্তের একটী মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া সকলেই দেখিতে আসিলেন। মেয়েব মুখের দিকে চাহিয়া রাজলক্ষ্মীর বহুদিনের শুষ্ক মাতৃস্নেহ-সাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল। এমন কি, নির্ব্বিকারচিত্ত রামকান্তও সকলের অনুরোধে একবার সূতিকাগৃহের দ্বারে আসিয়া কন্যাটীকে দেখিলেন। চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছিল কি না অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

এতদিন রামকান্তের সংসার ছিল, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন না। বন্ধনরজ্জু তাঁহাকে বাঁধিতে পারে নাই। আজ তিনি নিজে আসিয়া ধরা দিলেন। মেয়েটী যেন একটা আকস্মিক উৎপাতের মত, তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। একি শক্তি; মাতৃঅঙ্কশায়ী ওই ক্ষুদ্র বালিকাটীর এত ক্ষমতা! আফিস হইতে আসিয়া যথারীতি জলযোগ করিয়া যেমন নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন এখন ঠিক আর সেরূপ হয় না। ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মী পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে রামকান্তের

শান্তিসুখ একেবারে গিয়াছে। গৃহ অভিভাবক শূন্য, পীড়িতার যথারীতি শুশ্রূষা হইতেছে না, কন্যাটীরও যত্ন হয় না। রামকান্তের এই বিপদের সময় যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে আসিতেন না, তাঁহাদের অনেকে, প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী এখন তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। রামকান্তকে আবার জগতের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইল।

এরূপ বিপদ বিশৃঙ্খলায় দুই মাস অতিবাহিত হইল। তৃতীয় মাসে রামকান্তের গৃহলক্ষ্মী কন্যারত্নটী স্বামীকে দান করিয়া স্বর্গগামিনী হইলেন।

[২]

পত্নীর আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রামকান্ত যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন এক-জন প্রবীণা প্রতিবেশিনী কন্যাটীকে আনিয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার দুইচক্ষে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল; পত্নী বিয়োগের পর এই তাঁহার প্রথম অশ্রুপাত! পত্নী জীবিত থাকিতে রামকান্ত তাঁহাকে ভাল বাসিতেন কি না তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেন না, আজ বুঝিলেন। বালিকার মুখখান দেখিতে দেখিতে তাহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে রামকান্তের হৃদয় উজ্জলিত হইয়া উঠিল। এক দিনও তিনি রাজলক্ষ্মীকে আদর করেন নাই, একটী ভালবাসার কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই। রাজলক্ষ্মীর অভিমানশূন্য সদা-প্রফুল্ল মুখখানি তিনি একদিন ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। পীড়িতার সেই শীর্ণ দেহলতা অন্তিম বাক্য সমস্তই আজ মনে পড়িল। "খুকিকে একবার কোলে নাও।" এই রাজলক্ষ্মীর শেষ কথা। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রাম-কান্তের সে কথা মনে পড়িল। বোধ হইল যেন রাজলক্ষ্মী সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "ছি! চোখ মুছে ফেল। আমার স্মৃতিচিহ্ন তোমায় দিয়া আসিয়াছি। একবার আমার খুকিকে কোলে নাও।" রামকান্ত প্রগাঢ় স্নেহে কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন।

বন্ধুরা বলিলেন—"এমন করে আর কতদিন থাকিবে, মেয়েটীকে তো বাঁচাতে হবে। আবার বিবাহ কর।" প্রবীণগণ বলিলেন "এত অল্প বয়সে কি গৃহশূন্য শোভা পায়? বয়স্কা পাত্রী দেখিয়া আবার বিবাহ কর।" রামকান্ত নীরব হইয়া থাকিতেন।

মেয়ের মুখের দিকে চাহেন আর চোখে জল আসে। আ মরি কি সুন্দর মুখশ্রী। একি বাঁচিবে? ভগবান কি দয়া করিয়া হতভাগ্যের তাপিত হৃদয় শীতল করিতে মেয়েটি দান করিবেন।

মেয়েটি বাঁচিল। এত অযত্নেও মেয়ে বলিয়াই বুঝি বাঁচিল। রামকান্ত মেয়ের নাম রাখিল "নিশি"।

[৪]

রামকান্তের আয় অল্প সংসারটীও ক্ষুদ্র। একটি পিতা একটি কন্যা, কিম্বা একটি মা আর একটি ছেলে। বেশীর ভাগ একটি ঝি। নিশি এখন কেবল ছয় বছরে পা দিয়াছে, কিন্তু সে এখনই বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে সেই এ সংসারের গৃহিণী। ঘরের জিনিস পত্র সে

ইহারই মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে শিখিয়াছে। বাবা আফিস থেকে আসিবার পূর্ব্বে জলের ঘটীটি, গামছা খানি, কাপড় খানি এসকল সে কখনই ঝিকে রাখিতে দেয়না। রামকান্তের উপর তাহার অতি কড়া শাসন। যদি কোন দিন তিনি ভুলক্রমে ছাতিটি বাড়ী ফেলিয়া যান, তাহা হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে নিশি "এত রোদ্ লাগিয়েছ, দেখো অসুখ করবে" এই সমস্ত বলিয়া যথেষ্ট শাসন করে। রামকান্ত কাছারী যাইবার সময় "বাবা তোমার পানের ডিবে নিলেনা ? পাগড়ীটে বাঁকা করে পরেছ কেন ? লাঠি নিতে ভুলে গিয়েছ বুঝি" এই রকম নিশি দশ বারটা ভুল সংশোধন করিয়া দেয়। রামকান্ত সর্ব্ববিষয়ে নিশির কথানুযায়ী চলেন, তিল মাত্র অবাধ্যতা করিতে সাহস করেন না।

বর্ষার সন্ধ্যায় ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি, আকাশ মেঘপূর্ণ, নিশি রামকান্তের নিকট বসিয়া "গল্প বল ও বাবা একটা গল্প বল" বলিয়া আবদার করে। রামকান্ত কি করেন গুড়গুড়ি ছাড়িয়া নিশির মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। আবার কোন দিন যদি আফিস থেকে এসে "আমার বড় অসুখ করেছে বুড়ি" বলিয়া শয়ন করেন সেদিন নিশির খেলাধূলা একেবারে বন্ধ হয়। "বাবা তোমার মাথা কামড়াচ্ছে ? তোমার পা টিপে দেব ? একটু জল খাবে ?" ইত্যাদি প্রশ্ন মিনিটে দশবার করিয়াও তাহার বিশ্বাস হয়না। মনের ভাবটা যে হয়ত বাবা বলিতেছেন না বাবার বুঝি কিছু করিতে হইবে।

রামকান্ত সকালে দুটি ভাত রাঁধিয়া নিশিকে খাওয়াইয়া ও আপনি খাইয়া আফিসে যাইতেন, নিশির ক্রমে সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। "বাবা তুমি রোজ রোজ রাঁধ কেন, আমি বেশ রাঁধতে শিখেছি। তুমি দেখইনা কেন ! তুমি তাড়াতাড়ি পার না আমি বেশ ভাল করে রাঁধব।" ইত্যাদি নানা প্রকার আবেদন আরম্ভ হইল। কোন দিন রামকান্ত স্বীকৃত হইতেন। সেদিন রান্নার ধুম দেখেকে ? ডালনা, চচ্চড়ি, ভাজা কিছুই বাকী থাকিত না, তাহার পর দিন নিশির হাতে ফোস্কা দেখিয়া যখন রামকান্ত কিছুতেই রাঁধিতে দিতে চাহিতেন না, তখন নিশি বলিত, তবে আজ আমরা দুই জনেই রাঁধিব।

সন্ধ্যাবেলা গলির শেষের বাড়ীটার জানেলার দিকে চেয়ে দেখ একটি ছোট মেয়ে কেবল একদৃষ্টে গলির মোড়ের দিকে চাহিয়া আছে। অবাধ্য কালো কালো চুলের থোপা গুলি চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে, দুখানি ছোট ছোট হাত সরাইতেছে। যাই ছাতি হাতে রামকান্ত গলির মোড়ে দর্শন দিতেন অমনি চারিটি চোখে চোখোচোখি হইত।

[৫]

দিনে দিনে নিশি বাড়িয়া উঠিতেছে নয় বৎসরের মেয়ে আর কতদিন রাখা যায় ! রামকান্ত বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সৎপাত্রে দিবেন একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু টাকা কই, সঞ্চিত অর্থ যাহা আছে তাহাতে এখনকার দিনে অসৎ পাত্রই জুটিয়া উঠেনা। রামকান্ত বড়ই বিব্রত হইলেন।

পাড়ায় মেয়েরা বলাবলি করেন "আহা মেয়েটার মা নেই, কেই বা বিয়ের কথা বলে।

হাজার হোক এখন বড়টি হয়েছে বিয়েতে কি আর সাধ হয়না ? বিয়ের ভাবনায় রাতদিন মুখখানি মলিন করে থাকে।" আহা, সত্যই আজকাল নিশির মুখখানি বড় ম্লান। রাঙা রাঙা ঠোঁট ছুখানি সর্ব্বদা হাসি মাখা থাকিত আজকাল কেন জানিনা সে ওষ্ঠে আর হাসি নাই। রামকান্ত আজকাল এত অন্যমনস্ক, যে একবার নিশির মুখখানি চাহিয়াও দেখেন না। নিশি পা ধোয়ার জল নিয়া গেলে আর "আমার মা লক্ষ্মী" বলে আদর করেন না। অভিমানী মেয়ের এত অনাদর সহ্য হয় না। নিশির যে চোখে জল আসে তা তো রামকান্ত দেখিতেও পান না।

বঙ্গদেশে মেয়ে কেন জন্মগ্রহণ করে! বোধ হয় পিতামাতার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে। রামকান্তের জগৎ সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিলনা, এখন তাহার প্রতিশোধ পাইতেছেন। কন্যার বিবাহের যে কি উপায় করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেনা, পরিচিত অপরিচিত সকলেরই অনুগ্রহের ভিখারী হইয়াছেন, কিন্তু সে অনুগ্রহ অতি দুর্ল্লভ!

একদিন রাত্র অধিক হইল, তবু রামকান্তের দেখা নাই। নিশি একবার দরজার কাছে উঁকি দিয়া দেখিতেছে, একবার জানেলায় আসিতেছে, কত ঠাকুর দেবতাকে মানিতেছে তবু রামকান্তের দেখা নাই; প্রতি মুহূর্ত্তেই নিশি চমকিয়া উঠিতেছে; ওই বুঝি রামকান্ত আসিতেছেন, ওই বুঝি গলির মোড়ে ছাতা দেখা যায়, কই কিছুই না! অবশেষে যখন রামকান্ত সত্যই আসিলেন, তখন নিশির প্রাণ আসিল। রামকান্ত দুয়ারে পা দিবা মাত্র নিশি তাহার হাত ধরিয়া বলিল "বাবা, এত দেরী কেন?" রামকান্ত কেবল বলিলেন "একটু কাজে" আর কিছু বলিলেন না, বিমর্ষ ভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। একটী ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, নিশির মুখখানি তেমনি আঁধার হইয়া গেল।

[৬]

এইবার বুঝি নিশির বিয়ের ফুল ফুটিল। আজ ছয়মাস রামকান্ত কত বন্ধুর বাড়ী ঘুরিয়া কত সুপুত্রের পিতার পায়ে ধরিয়া কত খুঁজিয়া যাহা মিলাইতে পারেন নাই, এবার বুঝি বিধি তাহা মিলাইয়া দিলেন। এত দিনে একটী ছেলে ঠিক হইল। ছেলেটী সৎস্বভাব, বাপ মা কেহই নাই, আসামের পোষ্টাপিসে কাজ করেন। বিবাহ করিয়া নিশিকে সেখানে লইয়া যাইবেন।

রামকান্ত বৈকালে বাটী ফিরিবার সময় ভাবী জামাতা সুরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। নিশি একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল, নীচে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুরেশচন্দ্র একবার ঈষৎ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন, নিশি চলিয়া গেল।

আজ ছয়মাসের পর রামকান্তের বুকের উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। এতদিন নিশির কোথায় বিবাহ দিবেন, কিরূপ পাত্র হইবে, শ্বশুর বাড়ী সকলে ভাল বাসিবে কি না এই চিন্তায় কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না। আজ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত

হইয়াছেন। ভাবী জামাতার মধুর চরিত্র ব্যবহার যত স্মরণ করিতেছেন ততই হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। নিশি সৎপাত্রে পড়িবে, নিশি সুখী হইবে এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, সেখানে আজ অন্য চিন্তার স্থান নাই। সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে নিশির ঘরে গিয়া দেখিলেন যে নিশি জানেলায় বসিয়া আছে। নিশিকে দেখিয়া রামকান্তের চোখে এক বিন্দু জল আসিল, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নিশির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ নিশির মুখখানি দেখিয়া মনে হইল যেন অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। বলিলেন "মা লক্ষ্মী এত কাহিল হয়ে গিয়েছ কেন?" নিশি উত্তর না দিয়া মুখ অবনত করিল, অনেক দিনের পর আদর পাইয়া অভিমানে তাহার দীর্ঘ নেত্রপল্লব অশ্রুবিন্দুতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। পিতা আদর করিয়া মুখ মুছাইয়া বলিলেন "ছিমা, কান্না কেন?" নিশি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল "বাবা কালকি রাঁধব, বলনা?" পিতা বলিলেন "তোমার যা সাধ হয় তাই রেঁধো। এতদিন খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলেম, এখন ছেলেটীকে কার হাতে দিয়ে যাবে? মা হয়ে আর কে রেঁধে দেবে"; নিশি বিস্মিত হইয়া বলিল "সে কি, বাবা, আমি কোথা যাব?" রামকান্ত বলিলেন "চিরকালই কি মা, তুমি আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে থাকিবে?" বলিতে বলিতে তাঁহারও নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল, নিশির মাথায় হাত দিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন "মা লক্ষ্মী স্বামীর ঘরে গিয়ে এমনি লক্ষ্মী হয়ো।"

রাত্রি অধিক হইল। উভয়ে আহার করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। পিতা কন্যাকে কোলে বসাইলেন। কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন "মা আমার আনন্দময়ী, কেমন ক'রে তোকে পরের হাতে দিব। দেবতা করুন, চির জীবন সুখী হয়ো।" আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশি অস্ফুটস্বরে বলিল "বাবা, আমি কোথাও যাবনা।" আর কোন কথা হইল না।

৭

সম্মুখে বৈশাখ মাস, তাহার পরে অকাল অতএব এই মাসেই বিবাহ দিবার জন্য রামকান্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। ভাল ছেলেটী পাছে আবার হাতছাড়া হয়, এখন চারি হাত এক করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। রামকান্ত বিবাহের আয়োজন এবং জিনিস পত্র ক্রয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সময় অভাবে নিশির উদ্দেশ লইতেও পারিতেন না। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল বটে, কেবল বিবাহ সম্পন্ন হইল না। নিশি অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িল।

সমস্ত বৈশাখ গেল, নিশির পীড়া আরোগ্য হইল না। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্রের ছুটী ফুরাইয়া গেল, তিনি কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। যাইবার সময় নিশিকে একবার দেখিয়া গেলেন, আর ভাবী শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন "সম্মুখে অকাল, আর আমারও শীঘ্র ছুটী পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, পীড়ার অবস্থা আমাকে সর্ব্বদা লিখিবেন।" রামকান্ত বাবু শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নিশির পীড়া-আরোগ্যের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে না। দিন দিনই অধর পল্লব দুখানি রক্তশূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন হইতেছে। পীড়া উত্তরোত্তর কেবল বাড়িতেছে। রামকান্তের আহার নিদ্রা নাই, দিবা রাত্র কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। নিশি কখনো রামকান্তের গায়ে হেলান দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে "বাবা, আমার অসুখ ভাল হলে কিকি খাব সেই গল্প করি এস।" রামকান্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন, নিশিরও ঘুম নাই, "ওবাবা শোও না।" রামকান্ত বলেন "লক্ষ্মী মা, একটু চুপ করে ঘুমাও।" নিশি বলে "আর তুমি জেগে বাতাস করবে? তুমি না ঘুমালে আমি ঘুমাব না।

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যায় পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে, ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া নিশির বিছানায় নিশির শীর্ণ মুখখানিতে পড়িয়াছে। নিশি ঘুমাইতেছে, রামকান্ত এক পার্শ্বে, ডাক্তার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রামকান্ত কেবল আকুল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন ডাক্তার মুহুর্মুহু নাড়ি দেখিতেছেন। অবশেষে ডাক্তার বাবু নিশির হাত ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ আনিবার জন্য উঠিলেন, রামকান্ত ডাকিলেন "নিশি, মা আমার!" নিশি জাগিয়া উঠিল। "বাবা" বলিয়া হাত দুখানি রামকান্তের কোলের উপর তুলিয়াদিল, সেই মুহূর্ত্তেই রামকান্তের গৃহের আলো জন্মের মত নিভিয়া গেল।

ইহার ৪ দিন পরে একদিন রামকান্ত আফিস হইতে আসিয়া গৃহের বারাণ্ডায় বসিলেন, অমনি জানেলার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেখানে আজ আর কেহই নাই। খোলা জানেলায় উচ্ছৃঙ্খল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিয়া হু হু করিয়া উঠিতেছে। রামকান্তের দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন "মা আমার, তোমাকে নিয়া আমার বড় ভাবনা ছিল, আমি তোমাকে লইয়া অকূল পাথারে ভাসিতেছিলাম। তুমি আমার বড় আদরিণী, কার হাতে সঁপিয়া দিব, সে তোর আদর করিবে কিনা; এই ভাবনায় মন বড় ব্যাকুল হইত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। যাঁর ধন তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছি। হায় প্রভু, বন্ধন ভাল, না বন্ধনের মুক্তি ভাল এখনও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই।" নিশ্বাস ফেলিয়া রামকান্ত শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন।

হাসির গান।

বিলাতফের্ত্তা।

আমরা বিলাতফের্ত্তা কভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার, স্বদেশ আচার
করিয়াছি সব জবাই।
তাই বাংলা গিয়েছি ভুলি,
তাই শিখেছি বিলিতি বুলি,
তাই চাকরকে বলি বেয়ারা, আর
মুটেকে বলি কুলি।
রাম কালিপদ হরিচরণ,
এই নাম সব সেকেলে ধরণ,
তাই নিজেদের সব, ডে,রে ও মিটার,
করিয়াছি নামকরণ।
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিষ্টার নামে রটি,
যদি সাহেব না বোলে বাবু কেহ বলে
মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি চটীর আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট, কোট পরে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর।
আমরা বিলাতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতা মোজা, মা মাসীকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।
মোদের সাহেবিয়ানার বাধা,
—এই যে রং টা হয়না সাদা ;

তবু চেষ্টার ত্রুটী নেই, ভিনোলিয়া
মাখি রোজ গাদা গাদা।
আমরা বিলেতফের্ত্তা কটাই,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই;
মোদের সাহেব যদিও দেবতা, তবুও
সাহেবগুলই চটাই।
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি,
স্পীচ দেই ইংলিসে খাঁটি,
কিন্তু বিপদেতে দেই, বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটী।

বঙ্গবীর।

চন্দ্রকান্ত কর্ত্ত বড় বীরত্বেরই বড়াই,
—বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম,
দেখলে সেদিন আমার সঙ্গে কর্ত্তে এল লড়াই;
বেটার আস্পর্দ্ধা নয় কম!
আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা;
—পরে যখন ধরে আমায় করে দিলে জুতোপেটা;
দেখলাম বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার—
যোগাড় করে তুলেছিলাম দু এক ঘা দেবার।
বেটা সে খোঁজ রাখে না,
রাগ্‌লে আমার জ্ঞান থাকে না,
কিন্তু রাগটা সামলে গেলাম অনেক কষ্টে সেবার।
"বেশ করেছ বেশ করেছ নইলে অন্ততঃ
একটা খুন খারাপি হ'ত একটা খুন খারাপি হ'ত।"

কেদার বেটা, সাধু ব'লে সহরে ঢাক পেটায়
হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।
নিইছিলাম তার হাজার টাকা চাইতে এলো সেটায়—
বেটা বোধ হয় গুলিখোর।
আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা
কে কে কে তোর টাকা জানে—তো তো তো তোর সাক্ষী কেটা?
কর না গিয়া মকদ্দমা I don't care a feather;
মুখখানি চুণটী করে ফিরে গেল কেদার।

টাকা নিয়ে কর্ব্বে সে কি, টাকাগুলো সব শেষে কি,
গাঁজাগুলি খেয়ে বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার ?
"বেশ করেছো বেশ করেছো সে টাকা নিশ্চিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত বেটা সব উড়িয়ে দিত"।

নিত্যানন্দ, বিদ্বান বলে কর্ত্তে চায় প্রমাণ ;
সে নাকি আবার একটা লোক !
কর্ত্তে এল তর্ক সেদিন আমার সঙ্গে সমান,
বেটা নিরেট আহাম্মক।
আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি তবে রে বেটা,
আমি একটা philosopher ; গাধা শূয়র জানিস সেটা
বলে দুঘা পীঠে লাঠি বসিয়ে দিলেম সটাং ;
লাঠি খেয়ে পড়ে গেল বেটা চিৎপটাং।
আমার সঙ্গে সে পারে কি,
তর্কের বেটা ধার ধারে কি,
তখন তর্কে হার মেনে সে পালিয়ে গেল সটাং।
"বেশ করেছো বেশ করেছো তর্কেতে বস্তুতঃ
সেরা প্রমাণ লাঠির গুতো সেরা প্রমাণ লাঠির গুতো।

নতুন কিছু।

নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
দাড়ি কর খাটো, নাক গুলো কাটো,
পা গুলো সব উঁচু করে' মাথা দিয়ে হাঁটো।
বেলুনেতে চড়ো, আকাশেতে ওড়ো,
কিম্বা চিৎপাত হয়ে পাগুল ছোঁড়ো।
ঘোড়া গাড়ি ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়।
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতি চাদর নিবারিণী সভা,
প্যাণ্ট পরো কোট পরো নইলে নিভে গেলে,
ধুতি চাদর হয়েছে নিতান্ত যে সেকেলে।
কাঁচকলা ছাড় আর রোষ্ট বীফ ধর,
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।

কিম্বা সবাই ওঠ, টাউন হলে জোটো,
হিঁদুয়ানী প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো,
আমরা যেন, নেহাইৎ খাটো হয়ে যাইনে দেখো।
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো।
Bain Mill ছাড় এবং ভাগবত পড়।
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
হয়েছি অধীর যত বঙ্গ বীর,
সবাই এখন কাটো তবে নিজের নিজের শির,
পাহাড় থেকে পড়, কিম্বা সমুদ্রে দাও ডুব,
মরো না হয় মর্ব্বে—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো কিম্বা নতুন রকম ম'র।
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
আর কিছু না পার স্ত্রীদের ধরে মার,
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচ; ভাল আরো।
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক,
B A., M A., ঘোড়সোয়ার বা একটা কিছু হোক।
যা হয় তা হয় একটা কিছু কর নতুনতর।
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।

দেশ-হিতৈষী।

তোমরা
দেশোদ্ধারটা কর্ত্তে চাও, করে মুখে বড়াই,
—তা সে হবে কেন?
হইয়া।
মুক্তি ও.
শূন্য
তোমরা
বাক্যবাণে শুধু, ফত্তে কর্ত্তে চাও লড়াই,
—তা সে হবে কেন?
তোমরা
ইংরাজের উপর চটা বলে' চাও যে—সে;
তোমাদের ঐ করপদ্মে দেশটা সঁপে শেষে;
তল্পিতল্পা বেঁধে নিজের চলে যায় দেশে,
—তা সে হবে কেন?
তোমরা
ধর্ম্ম শুধু "প্রচার" করে, হত্তে চাও ধন্য,
—তাই বা হবে কেন?

তোমরা

মূর্খ হ'তে চাও বিশ্বে অগ্রগণ্য ;
—তাই বা হবে কেন ?

তোমরা

বোঝাতে চাও হিন্দুধর্ম্মের অতি সূক্ষ্মমর্ম্ম
ভীরুতাটা আধ্যাত্মিক, আর কুঁড়েমিটা ধর্ম্ম।

(আর) অমনি তাই বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম্ম,
—তাই বা হবে কেন ?
সাবেক ভাবে সমাজটাকে রাখতে চাও খাড়া
—তা সে হবে কেন ?

তোমরা

স্রোতটাকে ফিরাতে চাও দিয়ে দুই তাড়া ;
—তা সে হবে কেন ?

তোমরা

বিপ্র হয়ে ভৃত্যকাজ কর' বাড়ি ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে রেখে শুধু আককলা শিরে ;
দলাদলি করে শুধু রাখবে সমাজটিরে,
—তা সে হবে কেন ?

তোমাদের

মনে মনে সাহেবিটা ইচ্ছা ষোল আনা,
—তা না হবে কেন ?
তোমাদের সুযোগ পেলেই রোচে মুখে তামসিক খানা,
—তা না হবে কেন ?
তোমাদের মাতৃভাষা কেঁদে পালায় ইংরাজির চোটে,
"হাটুটারি" হ'লেই "বাবু" খেতাব গায়ে জোটে,
শুধু তর্কের সময় হিঁদুয়ানী জেগে ওঠে,
—তা না হবে কেন ?

তোমরা

চিরকালটা নারীগণে রাখতে পাঁচিল ঘিরে,
—ও তা হবে না কেন ?

তোমরা

গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখতে রমণীরে,
—ও তা হবে কেন ?

তোমরা

চাও বসে থাকুক এখন যেমন আছে,
রান্না ঘরের ধোঁয়ায় এবং আস্তাকুড়ের কাছে,
আর তোমরা নিজে যাবে থিয়েটার নাচে !
—তাই বা হবে কেন ?

পোষলা।

পোষলা পৌষমাসে পল্লী অঞ্চলের বালক যুবক এবং বৃদ্ধগণের অতিমধুর আরণ্য সম্মিলন। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে পৌষের আনন্দপূর্ণ গ্রাম্যস্মৃতির সহিত ইহা বিজড়িত ; নূতন আমন ধান উঠিলে অগ্রহায়ণে নবান্ন শেষ হইয়া যায়, পৌষে পল্লী গৃহস্থগণের সকলের গৃহেই নূতন ধান চাউল, নূতন মুগ কলাই এবং আক ও খেজুরের নূতন গুড় প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য রাজি করুণাময়ী মূর্ত্তিমতী লক্ষীর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া তাহাদের শূন্যভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে সম্বৎসরব্যাপী দুশ্চিন্তা এবং দীর্ঘকালের পরিশ্রমের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করায় সহৃদয়তা, পরস্পরের সহিত আত্মীয়তা, একটি আনন্দ পূর্ণ শুভ সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য উচ্ছ্বসিত আবেগ তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে এমন একটি প্রীতি সুকোমল হিল্লোল প্রবাহিত করে যে তাহারা শীতের প্রবল আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া আপনাদিগের স্নেহ-পরিপুত স্নিগ্ধ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত শীত সুলভ সুপরিষ্কৃত অরণ্যের অন্তরালে বা বিমুক্ত প্রান্তরে প্রীতিভোজনের আয়োজন করে। পৌষমাসে এমন দিন অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় যেদিন কোন একদল পল্লীবাসী বালক যুবক কিম্বা বৃদ্ধ বনভোজনে না গিয়াছে। বালকেরা চাউল, ডাউল, বেগুণ আলু প্রভৃতি তরকারী এবং লবণ বাড়ী হইতে বনভোজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়, কেবল তৈল, হাঁড়ি, কাঠ মাছ ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিবার জন্য সকলে যথাযোগ্য চাঁদা প্রদান করে, যুবক ও বৃদ্ধেরা চাঁদা তুলিয়াই সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, স্ব স্ব গৃহ হইতে চাউল, ডাউল বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে অধিক দেখা যায় না।

গেঁচুড়ীই বনভোজনের সাধারণ আয়োজন। নানাকারণে খেচুঁড়ী বনভোজনে অপরিহার্য্য আহার্য্য। যাহারা নগদ পয়সার পরিবর্ত্তে ঘর হইতে চাউল, ডাউল প্রভৃতি লইয়া যায় তাহাদের সংগৃহীত দ্রব্য প্রায়ই অভিন্ন আকারের হয় না, কেহ মুগ, কেহ কলাই কেহ মসুর ডাল লইয়া আসিয়াছে, কেহ আমনের, কেহ আউসের, কেহ নূতন, কেহ পুরাতন, সরু বা খোটা চাউল আনিয়াছে এই সকল একত্র করিয়া রাঁধিতে হইলে একমাত্র খেঁচুড়ীতেই তাহা থাকিতে পারে, সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতে খেঁচুড়ীই পোষলার সনাতন উপকরণ ; তবে একালে তৎপরিবর্ত্তে অনেকে ভাতের আয়োজন করে, কদাচিৎ কোন দল ভাত ও গেঁচুরী উভয়বিধ খাদ্যেরই আয়োজন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকে।

বিদেশে কর্ম্মশ্রান্ত প্রবাস জীবনের অবসর-সুখ অনুভব করিবার জন্য বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে কয়েকদিনের নিমিত্ত গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম পৌষের

মধুর উৎসবে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ কোন পূজার আনুষ্ঠানিক উৎসব নহে, ইহা প্রকৃতিমাতা প্রদত্ত অকৃত্রিম উপহারের প্রাপ্তি-স্বীকার-সূচক আনন্দোৎসব।

ষ্টীমারঘাট হইতে নামিয়া যখন দেখিলাম আমার পরিচিত এবং বিশ্বস্ত গাড়োয়ান তাহার 'পাচন' (একাধিক দীর্ঘ চর্ম্মখণ্ড বিলম্বিত হ্রস্ব বংশ যষ্টি) হাতে করিয়া সরল প্রসন্ন হাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, 'পেন্নাম দাদাবাবু, ভাল আছেন তো ?. গাড়ী কি ঐখানেই আন্তি হ'বে ?" তখন আমি আমার এই ক্ষুদ্র কর্ম্ম-জীবনের মরুময়ভাব, আমার প্রভুর প্রত্যেক দিনের সামান্ত খুটি নাটি, অসন্তোষ, আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর উদ্ধত ভ্রুকুটী এবং নিদারুণ উপেক্ষার কথা ভুলিয়া গেলাম। প্রফুল্লচিত্তে গাড়ীর ভিতর বসিয়া তখনি গাড়োয়ানকে বলদ যুড়িতে আদেশ দিলাম।

গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি গাড়ীর মধ্যে বসিয়া মেঠো পথ বহিয়া চলিতে চলিতে দুই পাশের মাঠ দেখিতে লাগিলাম। কি সুন্দর শস্তক্ষেত্র, ধরণীর বিবিধ কারু কার্য্য খচিত দিগন্তবিস্তৃত রমণীয় বসনাঞ্চলের স্তায় তাহা দূর দূরান্তরে প্রসারিত রহিয়াছে। কোথাও নীলবর্ণের মসিনা ফুল, কোথাও পীতবর্ণ সর্ষপের ফুল প্রান্তর আলোকিত করিয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে নাতি-পীত তারামণির ফুল! এই ফুলগুলি দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলায় ঠাকুরমার সেই রান্নার কথা মনে পড়িয়া গেল, শিম বেগুণ ও বড়ি দিয়া তারামণি ফুলের চচ্চড়ির কি অমৃতের মত আস্বাদন হইত, কোন্ পল্লীবাসী এই সুলভ তরকারীর কথা না জানে? সেকালের সেই কাঁচা তেতুল ও মুলো বেগুণের অম্বলেরই বা কি স্বাদ ছিল! একালে অধিক বয়সে অনেক খাদ্যাখাদ্যে রসনেন্দ্রিয় অনেকবার পরিতৃপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু শৈশবের সেই কবিত্ব-বর্জ্জিত, নৈপুণ্য-বিহীন, চচ্চড়ি ও অম্বলের কথা স্মরণ করিয়া সেই সুখময় বাল্য জীবনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে কতবার ইচ্ছা হয়, সেই শীতকালে কুলতলায় ভ্রাতা ভগিনীতে দাড়াইয়া—

'বুলবুলি মোর কাকা
কুল ফেলে দে পাকা,'

বলিয়া সুর করিয়া পক্ষীর স্তব, এবং একটা টোপাকুল বৃক্ষমূলে পতিত হইলে তাহারই উপর আমাদের সকলের যুগপৎ আক্রমণ,—এখন সে কথা স্বপ্নের মত মনে হয়। কেজানে সে জিনিষগুলা প্রকৃতই মুখপ্রিয় ছিল কিনা, কিন্তু শৈশব জীবনের যাহাদিগকে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছি, জীবনে যাহাদিগকে আর অধিকবার দেখিবার আশা করিতে পারি না, এবং নূতন নূতন লোক যাহাদের শূন্যস্থান দখল করিয়াছে তাহাদের সেই অপরিহার্য্য নিরুদ্বেগ সুখ-স্মৃতিই শৈশবের প্রিয়তম বস্তুগুলিতে অম্লান মধুরতা দান করিয়াছে।

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিল, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, ধূলিপূর্ণ পথে আমার গাড়ী চলিতেছে, তল বিহীন শকট চক্র হইতে 'ক্যা "কোঁ' শব্দ উত্থিত হইতেছে, শুভ্র পথখানি নীলাম্বরে সুপ্ত নিশ্চল ছায়াপথের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, দুইধারে জ্যোৎস্নালোকিত ধূসর বৃক্ষগুলি

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে খর্জ্জুর কুঞ্জ, প্রত্যেক বৃক্ষের বিদীর্ণ স্কন্ধে কলসী সংযুক্ত, রসলুব্ধ পথিকের আক্রমণ হইতে রস রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তিন চারিজন 'গাছি' কোন বৃহৎ বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখানিম্নে বসিয়া আগুণ পোহাইতে পোহাইতে গল্প করিতেছে। দুই একজন কৃষক বহু দূরস্থিত গ্রাম প্রান্তবর্ত্তী বুট বা গোধুম ক্ষেত্র হইতে প্লুত স্বরে নিশাচর ষণ্ড বিতাড়িত করিতেছে।

ঝুন ঝুন শব্দে ডাক-রনার লাঠির আগায় ঘুঙ্গুর বাজাইয়া আমার গাড়ীর পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং গাড়োয়ানের নিকট হইতে কলিকা চাহিয়া লইয়া তামাকে একটা দম কসিয়া আবার ছুটিতে লাগিল। পথের ধারে একটা বড় অশ্বথ বৃক্ষমূলে কতকগুলি মুগ ও কলাই বোঝাই গাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে, বলদ গুলিকে শীত হইতে বাঁচাইবার জন্য গাড়োয়ানেরা তাহাদের শরীর মোটা মোটা চটে আবৃত করিয়া দিয়াছে, তাহারা বৃহৎ টোকরাতে মুখ ডুবাইয়া জাবনা খাইতেছে। গাড়োয়ানেরা কেহ অদূরবর্ত্তী নদী হইতে জল আনিয়া বলদের জন্য ভুষি ভিজাইতেছে, কেহ তিউড়ীতে ভাত চড়াইয়া দিয়াছে, টগ্ বগ্ করিয়া ভাত ফুটিবার শব্দ উঠিতেছে, তিন চারি জন গাড়োয়ান কম্বলে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া তিউড়ীর পাশে বসিয়া নিজ নিজ সুখদুখের কাহিনী বলিতেছে, তিউড়িস্থিত আগুনের আলো তাহাদের মুখে প্রতিফলিত হইতেছে। শীতবস্ত্র বিক্রেতা উত্তর পশ্চিম দেশবাসী সদাগরেরা তেঁতুল তলায় সতরঞ্চি বিছাইয়া কাপড়ের বড় বড় মোটগুলি পাশে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত মনে সাধারণের দুর্ব্বোধ ভাষায় বাহার দরবেশের গল্পে এই হিমযামিনীর কঠোরশৈত্য বিতাড়িত করিতেছে। অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র দোকানে বৃদ্ধমুদী ম্লান প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া সুর করিয়া কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেছে, নির্ব্বাক শ্রোতাগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বস্ত্রাবৃত দেহে বসিয়া এই পুণ্যগাথা শ্রবণ করিতেছে, এই পুরাতন কাহিনী কতবার তাহারা এমনি করিয়া শ্রবণ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাদের অম্লান ভক্তি এবং অপ্রতিহত কৌতূহল কোনদিন খর্ব্বতা লাভ করে নাই। প্রায় দুই ঘণ্টাপরে আবার আমার গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমার জাগরণ ক্লান্ত অলস চক্ষুর সম্মুখে নিদ্রার মোহ, নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে মেঘের ছায়ার ন্যায় ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল, আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক ক্ষণ পরে জাগিয়া দেখিলাম পূর্ব্বের চন্দ্র পশ্চিম গগণ প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার পাণ্ডুর ছবি, অনন্ত আকাশে জ্যোতিহীন বিরল নক্ষত্রের নিষ্প্রভ দৃষ্টি এবং পূর্ব্বাকাশে অন্ধকারের ঊর্দ্ধে আসন্ন সম্ভাবিত ঊষার অস্ফুট তাম্ররাগ দেখিয়া বুঝিলাম প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, দুই পাশের বট পাকুড়ের সারির ভিতর দিয়া, নব নির্ম্মিত প্রশস্ত এবং উচ্চ 'সরান' বহিয়া অতি মন্থর গতিতে গাড়ী অগ্রসর হইতেছে, পুরু কাঁথায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া দুই পাশে পা ঝুলাইয়া সম্মুখে তৈজস পত্রের 'সাঁধালীর' উপর নত মস্তক ন্যস্ত করিয়া আমার গাড়োয়ান তখন তন্দ্রামগ্ন।

আমি উঠিয়া বসিলাম, গাড়োয়ানের শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া আমার হাসি পাইল সঙ্গে

সঙ্গে মনে দুঃখেরও সঞ্চার হইল। দেড় টাকা ভাড়ার জন্য এই গাড়োয়ানেরা কি কঠোর কষ্টই না সহ্য করে? এই পৌষ মাসের শীতে অনাবৃত মাঠে, মুক্ত প্রান্তর পথে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সে গাড়ী চালাইতেছে; ভাড়া খাটিবার জন্য এমনি করিয়া তাহাকে মাসের মধ্যে কত নিদ্রাহীন রাত্রি বসিয়া কাটাইতে হয়, সম্বৎসরের মধ্যে কতদিন নিদারুণ বৈশাখী ঝঞ্ঝা, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রবিকর, বর্ষার অবিরল বর্ষণ, হৈমন্তিক নিশার অজস্র শিশির প্লাবন এবং পৌষ ও মাঘের বিকট শৈত্যের দুঃসহ আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া পরম সহিষ্ণু চিত্তে তাহাকে পথ অতিক্রম করিতে হয়। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে বিষণ্ন, কাতর কিম্বা উদ্বিগ্ন দেখা যায় না, কোন্ সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে তাহারা এই প্রকার অদ্ভূত পরিশ্রমে সক্ষম তাহা ভাবিলেও বিস্ময় জন্মে; কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় তাহাদের এই ধূলি ধূসরিত কন্থা, জীর্ণ বস্ত্র এবং মলিন গৌরব হীন দেহ যষ্টির অভ্যন্তরে একটি অতি সুস্থ, বলিষ্ঠ, স্নেহপ্রবণ হৃদয় আছে, তাহা আমাদের প্রভু পদানত, কলঙ্ক-লাঞ্ছিত, হীন কেরাণী-হৃদয় অপেক্ষা অল্প মনুষ্যত্ব মণ্ডিত নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমরা আফিসে কারণে বা অকারণে যত খানি অপমান ও গঞ্জনা সহ্য করি, এবং তাহাতে আমাদের নিস্তেজ, কাতর হৃদয় যে পরিমাণে অবসন্ন হয়, কঠোর দৈহিক কষ্ট সহ্য করিয়া এই স্বাধীনচেতা গাড়োয়ান কিম্বা শ্রমজীবী শ্রেণী আপনাদিগের জীবন ততখানি বিড়ম্বিত বলিয়া বোধ করেনা, কারণ একটিতে উপেক্ষাপূর্ণ কর্কশ ব্যবহারে আমাদের সমস্ত হৃদয় আহত ও শোণিতাপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যটিতে দেহের স্বাধীনতা কিছুকালের জন্য ব্যাহত হইলেও তদ্বারা মানসিক স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে না, তাহার পর সমস্ত দিনের শ্রমবাসানে দু ঘটি জল মাথায় দিয়া যখন ইহারা বহু আয়াস লব্ধ শাকান্ন লইয়া আহার করিতে বসে তখন ইহাদিগের চারিদিকে শিশু পুত্রকন্যাগণ সমবেত হইয়া কি মধুর তৃপ্তির সহিত সেই পরিমিত অন্নে ক্ষুধা শান্তি করে; সর্ব্বপ্রকার গৃহ কর্ম্ম শেষ করিয়া ইহাদিগের স্ত্রী ও ভগিনীগণ যখন স্বস্ব নবজাত সন্তানগুলিকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের নিদ্রালস নেত্রের দিকে স্নেহ ভারাবনত চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া সংসারের সকল অভাব এবং দুঃখের কথা ভুলিয়া যায় তখন তাহাদের সেই চক্ষে করুণ মাতৃহৃদয় সঞ্জাত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের কি অপার্থিব সুধাসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠে!—আমার মনে পড়িয়া গেল সেদিন আমাদের আফিসের কোন একজন পদস্থ কর্ম্মচারী একটা অতি তুচ্ছ ক্রটীর জন্য সাহেবের নিকট কিরূপ কঠোর ভাবে ভৎর্সিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অপরাধ কত টুকু? তাঁহার প্রাণপ্রতিম সহোদর ভ্রাতা সেদিন গৃহে একাকী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছিলেন, তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি গৃহে ছিলনা অথচ ছুটিও দুষ্প্রাপ্য, তাই তিনি নিতান্ত ব্যাকুল ও ম্রিয়মাণ চিত্তে অপরাহ্নের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং এই জন্যই তাঁহার আফিসের কর্ত্তব্য কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছিল, ও এই ক্রটির জন্য কাহারো কোন অপকার হয় নাই; কিন্তু আমাদের প্রভু তথাপি তাঁহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে ক্রটী করিলেন না;

আমাদের সেই শ্বেতাঙ্গ প্রভুটি যদি কঠোর কর্ত্তব্যের প্রতি অন্ধ অনুরাগের বশবর্ত্তী না হইয়া প্রেমের স্নিগ্ধ আলোক পাতে তাঁহার অধীনস্থ কেরাণীর হৃদয়ের এই উদ্বেগান্ধকার দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপে বিড়ম্বিত করা মনুষ্যত্ব নহে বলিয়াই বুঝিতে পারিতেন,—কিন্তু কথা এই, একালের সাহেব মনিবগণ তাঁহাদের নেটিভ ভৃত্যগুলিকে এমন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধের মধ্যে কিছুমাত্র আত্মীয়তা বন্ধন অনুভব করা যায় না, আর সেই জন্যই দাসত্বটা একালে এত বেশী আত্ম-সম্মানের হানিকর। গাড়োয়ানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক এরকম না হইলেও তাহার অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতিতে আমার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, আমার ও তাহার মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে তাহা ভুলিয়া গেলাম; আজ সমস্ত রাত্রি সে হিমে এবং অনাহারে কত কষ্ট পাইতেছে ভাবিয়া না জানি তাহার সাধ্বী স্ত্রী কতবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, স্বামীর উপবাসের কথা মনে করিয়া সে হয়ত মুখে অন্ন তুলিতে পারে নাই। তাহার ছোট ছেলেটি হয়ত তাহার কোলের কাছে শুইয়া থাকিতেই ভালবাসে, রাত্রে কতবার সে পিতার অভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছে!

এইরূপ তত্ত্ব কথা ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল; বৃক্ষান্তরাল হইতে বিহঙ্গ কূজন আরম্ভ হইল; কোন ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে পূর্ব্বাকাশ হইতে যেন নিশীথিনীর তিমিরাবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়া উষার হৈমজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, এবং দূরবর্ত্তী শিশির সিক্ত শস্য ক্ষেত্রের উপর শ্বেতবর্ণের একটা অতি সরু পাড়ের মত কুয়াশার বিস্তার অনুভূত হইতে লাগিল।

একটু বেলা হইলে আমাদের গ্রামপ্রান্তে গাড়ী প্রবেশ করিল, গাঁয়ের পাড়া হইতে তখনো ঢেঁকিতে চিড়া কুটিবার শব্দ উঠিতেছে গৃহস্থ বাড়ীতে রমণীগণ প্রাঙ্গনে ছড়া জল দিতেছে, কেহ গোলাহাঁড়িতে গোবর জল লইয়া অতি সাবধানে ঘর নিকাইতেছে, গোয়ালারা গাভীর সম্মুখের পায়ে বাছুর বাঁধিয়া 'থাবরে' লইয়া গো দোহন করিতেছে, কোন রমণী কলসী কক্ষে পুকুরে জল আনিতে যাইতেছে।

শিবের মন্দির পশ্চাতে ফেলিয়া, গ্রাম্যবাজার অতিক্রম করিয়া, ডাকঘর ও ডাক্তার খানার পাশ দিয়া বাড়াতে পৌছিলাম, দেখিলাম বাড়ীতে সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে; ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত প্রাতঃ সূর্য্য কিরণে খেলা আরম্ভ করিয়াছে, আমাকে দেখিবা মাত্র তাহাদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দোচ্ছাস পড়িয়া গেল, আমার তিন বৎসরের মেয়েটি তাহার ক্ষুদ্র নিলাম্বরীর অঞ্চল মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে পড়িতে পড়িতে উঠিতে উঠিতে তাহার মাতাকে 'বাবার' আগমন সংবাদ জ্ঞাত করিতে গেল, যেন এমন সংবাদ তাহার জননী জীবনে আর কখন পায় নাই।

বন্ধুবর্গের সহিত মিলনানন্দে শীতের হ্রস্ব দিন অতি শীঘ্র অতিবাহিত হইল, সন্ধ্যাকালে গ্রাম্য জমীদার মল্লিক বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তাঁহাদের বৈঠকখানায় দশ বারো জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক বস্ত্রাবৃত দেহে আসর জমকাইয়া বসিয়া আছেন, ঊর্দ্ধে কেরোসিনের

আলো জলিতেছে, এক পাশে পাশা এবং তামাক চলিতেছে, এক ধারে একটি বাবু এবং গ্রাম্য স্কুলের জনৈক শিক্ষক দাবা টিপিতেছেন। তাসের কারবার এখানে বড় নাই, কারণ এই আসরের মেম্বরগণ তাস খেলাটাকে নিতান্ত রমণী-জনোচিত বলিয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এবং সুদীর্ঘ 'কচেবারো'—'কিস্তী' প্রভৃতি উচ্চ কণ্ঠনাদ ভিন্ন তাঁহাদের আসর জমাট বাঁধার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং অন্তঃপুরে বালিশের নীচে কিম্বা পুরাঙ্গনাবর্গের হাতবাক্সের মধ্যেই তাসের অবস্থান হইয়া থাকে; তবে কোন বন্ধু বান্ধব নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে জুনিয়ার বাবু অনেক অনুরোধ ও উপরোধে অন্দরের অভ্যন্তর হইতে যে মসৃণ, শোভন চিত্র সমলঙ্কৃত, স্বর্ণ রেখায় সুরঞ্জিত, সুদৃশ্য তাসের প্যাক বাহির করিয়া আনেন তাহা পল্লী গ্রামে কদাচ দেখা যায় না, এবং তাহা পুরুষের কিণাঙ্ক কঠিন, স্থূল হস্তে সঞ্চালিত হইবার জন্য ক্রীত নহে বলিয়াই অনুমান হয়।

সিনিয়ার মল্লিক তখন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বনভোজনের ফর্দ্দ ধরিতেছিলেন, আমাকে সহসা সেখানে উপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, স্থির হইয়াছিল রবিবারে তাঁহারা বনভোজনে যাইবেন, কিন্তু আমি শুক্রবারেই আমার কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইব বলিয়া বনভোজনের দিন বৃহস্পতিবারে পরিবর্ত্তিত হইল, আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিব, কিন্তু তিনি উঠিতে দিলেন না, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের স্নিগ্ধ মধুর পদাবলীর আলোচনায় অনেক রাত্রি অতিবাহিত হইল, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসকে অভিনব সাজে সজ্জিত করিয়া, তিনি বলরাম দাসকেও কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ কোটর হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশিত করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করিতেছেন।

বনভোজন সাধারণতঃ বেলা প্রায় চারিটার অগ্রে সম্পন্ন হইতে শুনা যায় না, এই প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটাইবার জন্য আমাদের জুনিয়ার মল্লিকের উপর সকল কার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইল, তাঁহার উৎসাহ সকল অপেক্ষা অধিক, বুধবারের রাত্রেই তিনি মাংস রাঁধিবার মসলা, পোলাওয়ের জল এবং রন্ধনের জন্য তৈজস পত্রের আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিলেন। স্থির হইল বৃহস্পতিবার বেলা ন'টার মধ্যে আমরা রওনা হইব।

পূর্ব্ব বৎসর আমাদের বনভোজনের স্থান আমাদের গ্রাম হইতে বারো মাইল তফাতে রতনপুর নামক স্থানে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, আমাদের বড় অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, বেলা পাঁচটার পূর্ব্বে আহার ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল, এবার যাহাতে সেরূপ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় এজন্য চারি মাইল দূরে আমাদের বন ভোজনের আয়োজন হইল।

বৃহস্পতিবার বেলা আটটার সময় শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে স্নান শেষ করিয়া আমরা কয়েক বন্ধুতে মল্লিক বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তখন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে লোক প্রেরিত হয় নাই, কিঞ্চিৎ উদ্যোগ এবং প্রচুর বাক্যব্যয়ের পর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাঠাইতে প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল।

বেলা দশটার সময় আমরা বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত একদল বালক বালিকা লইয়া আমাদের দলপতি শ্রদ্ধেয় মুন্সেফ বাবুর বাসায় আসিয়া পৌছিলাম, তিনি তখন স্নান ও জলযোগান্তে শয়ন করিয়াছিলেন, আমাদের চীৎকারে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমারা ছেলে পিলের দল আগে রওনা হইয়া যাও, বৃদ্ধের দল পরে আসিতেছি।" তথাস্তু বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া একটি সুবৃহৎ সেনা নায়ক রূপে গ্রাম্যবন পথ দিয়া 'চাল তলার' ঘাটে আসিয়া নৌকায় চড়িলাম।

তিনখানি নৌকার একখানি আগে চলিয়া গিয়াছে, বাকি দুখানি পানসী প্রস্তুত, কিন্তু আমরা যত গুলি যাত্রী উপস্থিত তাহাতে এই দুইখানিই যথেষ্ট নয় বৃদ্ধদিগের জন্য কি করা যাইবে তাহাই বিবেচনা করিতে আধ ঘণ্টা গেল, 'আত্মনাম সততং রক্ষেৎ' কথাটা পণ্ডিত মহাশয়ের চাণক্য নীতিতে অতি উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত থাকিলেও তিনি মুন্সেফ বাবুদের জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা না করিয়া পানসীতে উঠিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু 'রাজদ্বারে' ও 'শ্মশানের' মত নদীতীর পর্য্যন্ত যাহারা সঙ্গে থাকে তাহারাও বন্ধু হইবার অযোগ্য নহে, অগত্যা বন্ধু বিচ্ছেদের ভয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে নৌকায় উঠিলেন, আমরা যুবকের দল একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া বালক বালিকাদিগকে বৃহত্তর নৌকাখানিতে উঠাইয়া দিলাম, জুনিয়ার মল্লিক সর্দ্দাররূপে ছেলেদের নৌকায় চড়িয়া বসিলেন তাঁহার দাদা আমাদের নৌকা হইতে বলিয়া দিলেন "দেখো ছেলেরা যেন জলে না পড়ে।" আমরা আগে আগে চলিতে লাগিলাম।

ছেলেদের নৌকা ছাড়িবামাত্র তাহাদের মধ্যে ভারি কলরব পড়িয়া গেল; কেহ বলে, "দাদা ক্ষিদে পেয়েছে কিছু খাবার দেও" কেহ বলে "আমি বাহিরে বসবো" কেহ বলে "আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে," একটি ছোট মেয়ে সরোদনে বলিয়া উঠিল, "মামা, নৌকা চলে, আমার ভয় করে।"—সর্দ্দার মল্লিক তখন অতি সহজ মুষ্টিযোগে সকলের সকল অভিযোগ নিবৃত্ত করিবার জন্য কঠিন ভ্রুকুটী সহকারে বিকট হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল।

নিস্তরঙ্গ ক্ষুদ্র নদীবক্ষ দিয়া উত্তর মুখে নৌকা চলিতে লাগিল। অন্যান্যবার অপেক্ষা এবার নদীতে বেশী জল আছে, কিন্তু তাহাতে ডুবিবার আশঙ্কা নাই, অতি নির্ম্মল জল, নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। আরোহীগণের মধ্যে চারি জন তাস খেলা আরম্ভ করিলেন, পণ্ডিত মহাশয় ছৈ'এর বাহিরে বসিয়া বাহ্য শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বেলা এগারটার অধিক হয় নাই, চন্ চন্ করিয়া রৌদ্র পড়িতেছে, কিন্তু বাতাস অত্যন্ত প্রবল; আমাদের নৌকা 'বাদাম তলার' ঘাট ছড়াইয়া 'দরবেশের' ঘাটের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। 'বলরামী' নামক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আখড়ার পাদদেশে ইষ্টক নির্ম্মিত সোপান বদ্ধ ঘাটের নাম দরবেশের ঘাট, এই ভিক্ষোপজীবি সংসারবিরাগী ধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের উদ্যম অতি বিস্ময়কর। ইহারা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যাহা সঞ্চয় করে তাহাতে

সম্বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার আখড়াতে অতিবৃহৎ মহোৎসব হয়, তদ্ভিন্ন এই উপায়ে ইহারা বলরামের ক্ষুদ্র মৃণ্ময় কুটীর খানি সুন্দর ইষ্টকালয়ে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে এবং এই ঘাটটি পরিপাটী রূপে বাঁধাইয়া দিয়াছে। ইহাদিগের আশ্রমে যেসকল সেবক ও সেবিকাগণ বাস করে তাহারা প্রায় সকলেই পরিণত বয়স্ক, নিরহঙ্কার, জিতেন্দ্রিয় এবং সত্যপ্রিয়। ইহারা নিম্ন বংশোদ্ভব হইলেও ইন্দ্রিয় সংযমে ইহাদের আশ্চর্য্য অনুরাগ লক্ষিত হয়, এমন কি আশ্রমের অধ্যক্ষগণের মধ্যেও যদি কোন ব্যক্তি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহাকেও আশ্রম হইতে বিতাড়িত করা ইহারা অনাবশ্যক জ্ঞান করেনা; কিছুদিন পূর্ব্বে চরিত্র দোষ প্রকাশিত হওয়ায় একজন অধ্যক্ষ এইরূপে বিতাড়িত হইয়াছে, স্বসমাজে তাহার প্রভুত্ব এবং সম্মান নিতান্ত অল্প ছিল না। এই সকল বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য মূর্খ লোকের চরিত্রের পবিত্রতার প্রতি এই প্রকার অসাধারণ অনুরাগ আমাদের দেশের সভ্য সমাজেরও অনুকরণীয়, এবং যেখানে এরূপ এক দল লোক আছে সেখানকার সাধারণ ভদ্র সম্প্রদায় নির্ম্মল চরিত্রের লোক হইবে এরূপ আশা করা বোধ করি দুরাশা নহে।

দরবেশের ঘাটে অনেক পল্লীরমণী স্নান করিতেছিলেন, বাঁধানো ঘাট বলিয়া গ্রামের অধিকাংশ ভদ্র রমণী এখানে স্নান করিতে আসেন, আজকাল গ্রামের মধ্যে এইটাই প্রধান ঘাট; কিন্তু সময়ে সময়ে নির্লজ্জ পুরুষেরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করায় রমণীগণের স্নানের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে, বলা আবশ্যক তাহাদের অনেকেই ভদ্রলোক এবং "বাবু" নামে পরিচিত।

অনতিদূরবর্ত্তী থানারঘাটে আসিয়া আমরা নৌকা বাঁধিলাম, বাজার হইতে মাছ ও দধি দুগ্ধ লইয়া পরিচারকগণ এখানে আমাদের নৌকায় উঠিল, অবিলম্বে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই স্থানটি গ্রামের মধ্যে নদীতীরে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থান, উপরে থানা, এক পাশে গ্রামের অন্যতম জমীদার বাবুদের কামরা, পূর্ব্বকালে নদীতীর পর্য্যন্ত কামরার সীমা নির্ণায়ক মেহেদীর বেড়া ছিল, এই উপবনে বিবিধ পুষ্পতরু কুসুমরাশিতে বিভূষিত হইয়া স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য এবং মিশ্র সৌরভে নদীতীর প্রমোদিত করিয়া রাখিত; কিন্তু এখন আর নদীর সে শোভা নাই, জমীদারগণের সে পূর্ব্ব গৌরব নাই, কুসুম-কানন প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মেহেদীর বেড়াও অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল এখানকার পূর্ব্ব কাহিনীর স্মরণ চিহ্নস্বরূপ গোটাকতক পলাশ, কাঞ্চন ও বকুলের গাছ শ্রীভ্রষ্ট ভাবে ইতস্তত দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং প্রকাণ্ড দুইটী ঝাউগাছ নদীতীরে দীর্ঘ বাহু বিস্তার করিয়া পূর্ব্ব গৌরবের সুখস্মৃতি স্মরণ পূর্ব্বক শন্‌শন্ শব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে ও যে সুদৃশ্য সুসজ্জিত কামরায় পূর্ব্বকালে অখণ্ড প্রতাপশালী জমীদারবর্গ আপনাদিগের উৎকট ভোগসুখের বলবত্ত আদর্শে পল্লীবাসী সাধারণ ব্যক্তিগণের মনে বিলাসিতার মোহময় ভাব অঙ্কিত করিতেন সেই প্রমোদ গৃহ এখন নিতান্ত ভগ্নদশাপন্ন হইয়া একজন সরকারী কর্ম্মচারীর সামান্ত বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে।

পাশ দিয়া খেয়া নৌকা চলিতেছে। ভিতরে নানা শ্রেণীর লোক, মেছুনীরা মাছ বিক্রয় করিয়া পরপারে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে, দাড়িগোঁফকামানো মস্তকে চাদর জড়ানো গোপ-বৃদ্ধ বাঁকের উপর দুগ্ধ কলস লইয়া নৌকার মধ্যে বসিয়া আছে, অধিককাল দুগ্ধ অবিকৃত রাখিবার অভিপ্রায়ে দুগ্ধভাণ্ডে পত্রপুষ্প সমন্বিত শর্ষপগাছ কিম্বা বাঁশের পাতা গুঁজিয়া দিয়াছে; ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে মাছ, তরকারী, লবণ বাঁধিয়া বাজার প্রত্যাগত পল্লীবাসীগণ গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে—আর অটলমাঝি নৌকার অগ্রভাগে বসিয়া প্রকাণ্ড 'হাল' দিয়া বৃহৎ নৌকাখানা ঠেলিতেছে, এবং সতের রকম রঙ্গের বস্ত্রখণ্ডে নির্ম্মিত একটা আপাদকণ্ঠ লম্বা আলখেল্লায় দেহ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁতি পাড়ার গৌর বাউল ডুগীতে দ্রুত অঙ্গুলী প্রহার পূর্ব্বক অটল মাঝির দিকে মুখ ফিরাইয়া মস্তকের বিবিধ ভঙ্গী করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে;—

"গুলোয় পা দিয়ে তারা ডুবিয়ে ভরা
আমায় সারা করে গেল।"

অটল কিন্তু গানের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া বর্ত্তমান বর্ষে বসুধরার শস্য পূর্ণতা সত্ত্বেও চাউল ধানের মহার্ঘতা সম্বন্ধে একজন মুদীর নিকট অনর্গলভাষায় বক্তৃতা করিতেছে,—দেখা গেল তাহার হাত অপেক্ষা মুখ অনেক অধিক চলিতেছে এবং নৌকা কিছু মাত্রও চলিতেছে না, কিন্তু তাহাতে তাহার একটুও ভ্রূক্ষেপ নাই, অটলের এই অটল স্থৈর্য্যে অসহিষ্ণু বাজার প্রত্যাগত জনৈক আরোহিণী কাতর ভাবে বলিতেছে "ও ঠাকুরপো, শীগিগর পার ক'রে দেও, পরের কাছে ছেলে ফেলে এসেছি," কিন্তু খেয়া নৌকার মন্থর গতি এরূপ অনুরোধে বর্দ্ধিত হইবার নহে।

নদীর পরপারে অনেকগুলি পাটনীর বাস। গাঙ্গনী পার হইয়া অন্নপূর্ণা ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ী আসিবার সময় তিনি পাটনীকে বর প্রার্থনা করিতে বলায় ঈশ্বরী পাটনী করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিল "আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে," অন্নপূর্ণার বরে কি না ঠিক বলা যায় না, কিন্তু আমাদের দেশের পাটনীর অবস্থা মন্দ নয়। এই খেওয়া ঘাট এখানকার পাটনীদের জীবিকা নির্ব্বাহের অন্যতম উপায়। এই পারঘাটা এখন পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকারে রহিয়াছে, খালি এবং বোঝাই গাড়ী পার করিয়া প্রত্যহ ইহারা প্রচুর পয়সা উপার্জ্জন করে, ও তাহাতেই সংসার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু মানুষ পার করিয়া ইহার নগদ কিছু পায় না, গ্রামের ভদ্র লোকেরা সম্বৎসর পরে পূজার সময় অবস্থানুসারে কেহ তাহাদিগকে নারিকেল, কেহ কিছু পার্ব্বনী, কেহ বা ধুতি চাদর বকশিস দান করিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মীপূজা, সুবচনী, পৌষপার্ব্বন প্রভৃতি ব্রত পালন উপলক্ষেও অনেক গৃহস্থ গৃহে মুড়কী, সন্দেশ জলপান প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন পার করিবার সময় ইহারা জেলের কাছে মাছ, পুঁড়োর [তরকারী বিক্রেতা] কাছে তরকারী এবং তৈল বা গুড় বিক্রেতার কাছে কিছু কিছু পণ্যদ্রব্য আদায় করে; কিন্তু শুনিলাম কিছু দিন পরে আর ইহা-

দের এ সুবিধা থাকিবার সম্ভাবনা নাই, লোকালবোর্ডের সর্ব্বগ্রাসী লোলুপদৃষ্টি এই কয়েক ঘর পাটনীর আজন্মের সংস্থানের উপরও নিপতিত হইয়াছে, আমাদের লোকালবোর্ডের কোন হিতৈষী বন্ধু সে দিন বলিতেছিলেন আগামী বর্ষেই তাঁহারা এ ঘাটটিকে ডাকে তুলিবেন ! ইহাতে আর কোন সুবিধা হইবে কি না বলা কঠিন, তবে গরিব লোকের বিনা পয়সায় নদী পাওয়া দুর্ঘট হইবে ইহা নিশ্চয়, কিন্তু বোর্ডের হাতে আসিলে পারাপারের শৃঙ্খলা বৃদ্ধির যথেষ্ঠ আশা করা যায়, এখন প্রায়ই দেখা যায় রাত্রি দশটার সময় ঘাটে মাঝি নাই এবং কাণ্ডারী বিহীন নৌকা নদীর মধ্যস্থলে ভাসিতেছে।

ক্রমে আমরা তাঁতিপাড়া, বৈত পাড়ার ঘাট ছাড়াইয়া প্রায় দুই মাইল অগ্রসর হইলাম। নিকটে কোন গ্রাম নাই, সংকীর্ণ নদীর দুই ধারে কোথাও আম কাঁটালের ঘন বাগান, কোথায় প্রকাণ্ড বাঁশবন, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। রবিশস্যে প্রান্তর পরিপূর্ণ, ফুলে ফুলে মাঠ ভরিয়া গিয়াছে, অতি ঘোরাল পীতাভ "শুকর গুজা" ফুলের দিকে চাহিতে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, তাহার উপর মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যকর প্রসারিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তাহার তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার পাশেই মসিনার ক্ষেত্রে নয়ন অভিরাম সুনীল মসিনার ফুলে ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, অদূরে সর্ষপ ক্ষেত্রের উপর বহু সংখ্যক বিভিন্ন বর্ণের প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে, ঘুরিতেছে, বসিতেছে, পৌষের এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও পরিমল লুব্ধ প্রজাপতি পুঞ্জ নব পুষ্পিত সর্ষপ কুঞ্জে যৌবন বসন্তের প্রীতিকর স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোল অনুভব করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যময় পক্ষের নিম্নস্তরে বিলাস চঞ্চল বক্ষের পুলক স্পন্দন এবং প্রমোদ কল্লোল সংগুপ্ত রাখিতে সক্ষম হইতেছে না।

অদূরে ইক্ষুক্ষেত্র, মজুরেরা তীক্ষ্ণধার হাঁসুয়া দ্বারা সমূলে ইক্ষুদণ্ড কর্ত্তন করিতেছে এবং তাহার অগ্রভাগ একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া দীর্ঘ গাছগুলি অন্যধারে নিক্ষেপ করিতেছে, সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে চাষার ছোট ছোট ছেলেরা আসিয়া দুই একগাছা 'আখ' চাহিয়া লইয়া অতি তৃপ্তিভরে চর্ব্বণ পূর্ব্বক তাহার রসাস্বাদন করিতেছে, 'মাঘী আইরি'র (মাঘমাসে পরিপক্ক অরহরের) গাছ গুলি কাটিয়া স্থানে স্থানে পালা দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল স্তূপের অদূরে চোতে আইরির (চৈত্রমাসে যাহা পরিপক হইবে) বহুসংখ্যক গাছ পীতাভ পুষ্পে সজ্জিত হইয়া প্রান্তরের অনেক দূর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া আছে, নিকটে নদীর ধারে গরু ছাড়িয়া দিয়া রাখালেরা 'ডাণ্ডাগুলি' খেলিতেছে আর মনের আনন্দে "তাইরে নারে নাইরে না" নামক স্বরচিত রাগিণীতে শুষ্ক নদী সৈকত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। জেলেরা বাঁশ জালে মাছ ধরিবার জন্য নদীবক্ষ অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, গবাক্ষের মত অতি অপ্রশস্ত একটা খোলা যায়গা দিয়া আমাদের ডিঙ্গী দুখানা বাহির হইয়া গেল।

বেলাপ্রায় এগারটার সময় আমরা কামদেবপুরের খালের কাছে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণে চাহিয়া দেখিলাম বৃক্ষমূলে ডাক্তারের টমটম, তাঁহার ছেলেরা প্রান্তর পথে টমটম চড়িয়া আগেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।

নদী উত্তরদিকে থাকিল, আমরা পশ্চিমে খালের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম ভৃত্যগণ আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্যান্যবার খালে জল থাকে না, এবার অনেক জল আছে, আমরা খালের বাম পারে নামিলাম, বন্ধুবর্গের তাস খেলা আপাততঃ স্থগিত হইল।

শুনিয়াছিলাম এই খালের ধারে কাঁঠাল তলায় আমাদের বনভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—এখানে নামিয়া দেখিলাম স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে কিন্তু কাঁঠাল গাছ নাই, একটি বহু পুরাতন জীর্ণ এবং শাখাবিরল সহকার তরু দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেখানেই আমরা বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিলাম। মুক্ত প্রান্তর, নিকটে একখান লঙ্কামরিচের ক্ষেত ছোট ছোট গাছে বহু সংখ্যক মরিচ ঝুলিতেছে, কোন কোন গাছে দুই পাঁচটা পাকিয়াছে, কোনটা গাঢ় লাল, কোনটার বা কমলা লেবুর মত রঙ্গ, কতকগুলি অতি পুষ্ট সবুজ মরিচের উপর ঈষৎ লোহিতাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের সঙ্গী ছেলেরা কোঁচড়ে মুড়ি লইয়া লঙ্কা মরিচের ক্ষেতের দিকে ঝুঁকিল, এবং ছুটাছুটি করিয়া লঙ্কা তুলিয়া মুড়ির সঙ্গে তাহা চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ সুপক্ক লঙ্কায় পকেট পূর্ণ করিয়া ফেলিল; বর্গির হাঙ্গামার মত এই ক্ষুদ্র শিশু ফৌজের পদভরে ক্ষেত্রটি প্রকম্পিত, এমন সময় সেনাপতি জুনিয়র মল্লিকের ভৈরব গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া গেল, ছেলে মেয়েরা ভীত হইয়া লুণ্ঠন ত্যাগ করিল।

সহসা অদূরে 'কুমীর' শব্দে একটা হট্ট গোল উঠিল; আমরা অনেকে দ্রুতপদে খালের ধারে উপস্থিত হইয়া দেখি সত্য সত্যই দুইটি কুম্ভীর তীরে উঠিয়া প্রখর সূর্য্যালোকে দিবা নিদ্রা যাইতেছে, চীৎকার শব্দে ভীত হইয়া একটি জলের মধ্যে পলায়ন করিল, অপরটি খালের অন্য পারে ছিল, সে কিছুতে স্বস্থান পরিত্যাগ করিল না, অনেকে এপার হইতে ঢিল ছুড়িল কিন্তু একটাও তাহার গায়ে লাগিল না, তাহার সুখনিদ্রা কিছুতে ভঙ্গ না হওয়ায় আমরা মনে করিলাম এ হয়ত একটা ক্ষুদ্র বিশুষ্ক খর্জ্জুর বৃক্ষ, কিন্তু অপরাহ্ণে আর তাহাকে দেখিতে না পাওয়ায় আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। দেখিতে দেখিতে একটি অতি বৃহৎ কুম্ভীর খালের জলে ভাসিয়া উঠিল, সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অতি নিকটে জলের উপর দেহ ভাসাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল দেখিয়া আমাদের জুনিয়ার মল্লিক ভারি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল তিনি জীবনে যে সকল গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে আজ এই বনভোজনে আসিয়া বন্দুক না আনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কুমীরগুলি এমন নির্জ্জন স্থানে মনুষ্য সমাগম দেখিয়াও কেন পলায়ন করে না জিজ্ঞাসা করায় মল্লিক বাবুদের 'ঘরোয়া' ডাক্তার—আমাদের বনভোজনের ম্যানেজার পরমানন্দে উত্তর করিল যে কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল, একজন ভক্তকে জননী জাহ্নবী স্বপ্নাদেশ করেন যে তিনি আপাততঃ এই খালে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। পরদিন প্রাতে চারি দিকে মহাধুম পড়িয়া গেল, খালের ধারে হাট বসিল, অনেক দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে

বিশ্বাসী নরনারীর অবগাহনে, দুগ্ধে এবং উৎসর্গীকৃত পুষ্প পত্র ও ফলে খালের জল পঙ্কিল হইয়া উঠিল। এখানে মানস করিয়া কেহ কেহ রোগমুক্ত হইয়াছে এরূপও শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু এই খালের মধ্যে গঙ্গার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপক আধুনিক ভগীরথ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা শুনিতে না পাইয়া আমরা নব্যদল কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলাম, ভাগীরথি সহসা কেন কেন যে তিরোহিত হইলেন সে তত্ত্বও বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু 'সাধনায়' কলি যুগের ভগীরথের সেই গল্পটা মনে পড়িয়া গেল, জানি না আমাদের এই গ্রাম্য ভগীরথের এখানে গঙ্গা আনয়নের সেরকম কোন মহৎ অভিপ্রায় ছিল কি না। যাহাহউক এখান হইতে গঙ্গা মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হওয়ার পর স্থানটি "মরাগঙ্গে কুমীরে ভরা" এই প্রাচীন প্রবচনটির স্বার্থকতা সম্পন্ন করিতেছে।

বেলা দুটোর পর মুন্সেফবাবু তাঁহার দলবল লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, নৌকা অভাবে তাঁহারা কিরূপে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, এবং মস্তকের উপর ও উদরের মধ্যে উভয়বিধ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে ছৈবিহীন খালি নৌকায় কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল তাহারই বর্ণনায় তাঁহারা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখন আমরা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পল্লীগ্রামে নব পরিচিত 'ডেভিল' অর্থাৎ 'বিলাতি গোলাম চোর' খেলায় ব্যস্ত ছিলাম; আমাদের এই নির্জ্জীব দেশের 'গোলাম চোর' বেচারীর ব্যবহার নিতান্ত কঠিন কিম্বা দুঃসহ নহে, কিন্তু এই বিলাতি 'ডেভিলের' আচরণটা অতি উৎকট এবং বিলাতি গোরার অনুরূপ, আবার সে বাছিয়া বাছিয়া ভালমানুষ লোকটিকেই পাইয়া বসিয়াছিল। আমাদের নিরীহ পণ্ডিত মহাশয় তখন 'ভেভিল' রূপী গোলামটি হাতে করিয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেহ কথা কহে না, এবং কথা কহিতে গেলে অন্যে মুখ ফিরাইয়া লয়! পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ দেখিয়া আমাদের স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল যে এমন শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহাকে আর কখন পড়িতে হয় নাই।

বৃদ্ধের দলও সঙ্গে তাস লইয়া আসিয়াছিলেন। একটা গাছের তলায় সতরঞ্চি বিছাইয়া তাঁহারা 'ডনস ওয়াইজ' খেলিতে আরম্ভ করিলেন; অবশেষে যখন আমাদের গ্রামের অন্যতম জমীদার সুবিজ্ঞ বসু মহাশয় নৌকাযোগে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাঁহার ভাটুপাড়া নামক 'মাহাল' হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আনন্দে ও উৎসাহে তাসখেলা ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ব্ব দিন তাঁহাকে এখানে আসিয়া প্রীতি ভোজনে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এত দূর হইতে আজ ঠিক যে আহারের সময়টিতেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ইহা দেখিয়া মুন্সেফ বাবু তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু 'বৃহস্পতিবার বার বেলা' কাহার আক্রমণ যে কাহার ঘাড়ে গিয়া পড়ে কিছুই বলা যায় না, সমস্ত বিদ্রূপ অবশেষে তাঁহারই কোর্টের জনৈক স্থূলোদর উকীলের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, বসু মহাশয় সেই প্রাচীন উকীলটিকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন "দাদা, ঐ দেখ তোমার এক গাড়ী খাবার আসিতেছে।"—সুযোগ্য দাদা অন্যান্য সকলে মাঠের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন একখানি গাড়ী বোঝাই কলাইয়ের ভুসি আসিতেছে!—সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, উকীল বাবু লজ্জায় অধোবদন হইলেন, এবং যে সকল যুবক তাঁহার অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য এবং তদপেক্ষাও অতিরিক্ত উদরের স্ফীতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া এই হাস্যে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষাপা হইয়া উঠিলেন, কিন্তু নিরুপায়!

এইরূপ হাস্যামোদে যুবক ও বৃদ্ধগণ অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিলেন, মুন্সেফ বাবু খালের জলের গভীরতা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া একজন লোককে নৌকায় তুলিয়া খালের ঠিক মধ্যস্থলে পাঠাইয়া দিলেন, একটা লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রে দড়ি বাঁধিয়া সে দড়ি গাছটি জলের মধ্যে নামাইয়াছিল, দেখা গেল সেখানে জল প্রায় পনেরো ষোল হাত গভীর। খালপারে বসু মহাশয়ের নারিকেল বাগান, সকলের লুব্ধদৃষ্টি সহসা সেই দিকে পতিত হইল, আর কি রক্ষা আছে?—কতকগুলি ডাব ও নারিকেল আনীত হইল, অনেকেই জলে ক্ষুধা নল প্রশমিত করিলেন। অবশেষে বেলা প্রায় চারিটার সময় আমাদের আহারের ডাক পড়িল।

ছেলেদের কোনদল দূরে ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছিল, কোন দল হাডু ডুডু খেলায় মন সংলগ্ন করিয়াছিল, আমি পণ্ডিত মহাশয়কে লইয়া এক খর্জ্জুর বৃক্ষমূলে বসিয়া সাহিত্য আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম, আহারের ডাক পড়িবামাত্র সকলে একত্র সম্মিলিত হইলাম। যথাকালে আহার করিতে বসা গেল, ভাত, ঘেঁচুড়ী, পোলাও তাহার উপযুক্ত তরকারী, মাছ, মাংস, অম্বল পায়েস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় নানারকম উপকরণ রাঁধিতে বেলা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কাহারো ক্ষুধার আর তেমন প্রাখর্য্য ছিল না, সুতরাং সামান্য আহারেই সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিলেন। বনভোজনের কথা শুনিয়া আমাদের গ্রামের এবং সন্নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন পল্লীর বহু সংখ্যক লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, আমরা পূর্ব্ব হইতেই এজন্য প্রস্তুত ছিলাম, এই আনন্দ পূর্ণ ভোজনের সুখ হইতে সেই সকল আশ্বাসিত দীনহীন বুভুক্ষু ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা কাহারো অভিপ্রায় ছিল না, আহারান্তে তাহাদিগকে উত্তমরূপ আহার দানের ব্যবস্থা করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আমরা নৌকায় উঠিলাম, তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বনভোজনের অবসানে বনে অগ্নি দানের একটা নিয়ম আছে, একজন বন্ধু এই সনাতন নিয়ম রক্ষার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এবারের মত তাহা অসম্পন্ন থাকিয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে, অদূরবর্ত্তী গ্রামস্থ বাড়ীতে দীপালোক ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উজ্জ্বল নক্ষত্রের প্রশান্ত দৃষ্টি নির্ম্মল নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। অতি তীব্র শীত, ঝুপ ঝুপ শব্দে দাঁড় পড়িতেছে, নদীতীরে ঝিঁঝির অশ্রান্ত শব্দ, তরুগুল্মে জোনাকীর মৃদু আলোক স্পন্দন। ক্রমে উভয় তীরের শস্যক্ষেত্র ও প্রান্তর ত্যাগ করিয়া

যতই আমরা গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই গৃহপালিত পশুর চিৎকারশব্দ, মনুষ্যের মিশ্র কণ্ঠস্বর, নিশ্চিন্ত কৃষাণের মেঠোগানের উচ্চ রাগিণী আমাদের কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। রাত্রি আটটার সময় ঘাটে নৌকা লাগিলে বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইয়া স্তব্ধ বনপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

আমার ছুটীর বাকি একদিন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসিল সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ শেষ করিয়া শুক্রবারের রাত্রে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার শিশুকন্যা অন্য দিন এতক্ষণ নিদ্রিত হইয়া পড়ে; কিন্তু কেন জানি না, আজ তাহার চক্ষে ঘুম নাই, তাহার জননী বিমর্ষভাবে আমার যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি বারোটা বাজিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র পূর্ব্বাকাশের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে, গ্রাম নিস্তব্ধ, সুদূর পল্লীতে চৌকিদার হাঁকিতেছে [illegible] দৈবাৎ একটা কুকুর সেই শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, ম্লান জ্যোৎস্না[illegible] না। অ[illegible] শিশিরাপ্লুত দেহে নিদ্রামগ্ন, আমার তখনও বিদায় গ্রহণ শেষ হয়, হার আত্মা[illegible]য়োন নিতাই ঘোষ হাঁকিল, "বাবু গাড়ী তৈয়ারী, আসুন।"

দ্বার মুক্ত করিয়া বস্ত্রাবৃত দেহে শীত কম্পিত বক্ষে নীচে নামিয়া আসিলাম, আমার সহধর্ম্মিণী মৌন ছায়ার মত আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমি বিদায় চাহিলাম, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে একটা কথাও শুনিতে পাইলাম না, আমার জাগরণক্লান্ত শিশুকন্যার চক্ষে মায়াবিনী নিদ্রা অতি ধীরে তাহার মোহময় সুদীর্ঘ তুলিকা বুলাইয়া গেল, সে তাহার জননীর স্কন্ধে ঢুলিয়া পড়িল, আমি গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

আলোকমগ্ন নিদ্রাচ্ছন্ন গ্রাম্য পথ দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে পথের দুইপাশে চাহিতে চাহিতে চলিলাম, শেষে শুইয়া পড়িলাম, একটু ঘুম আসিয়াছিল, গাড়ীর মধ্যে সুনিদ্রা হওয়া অসম্ভব, সহসা জাগিয়া দেখি গ্রাম ছাড়াইয়া গাড়ী মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে, গাড়োয়ান মস্তকে মোটা কাপড় জড়াইয়া কম্বলে শরীর আবৃত করিয়া গাড়ীর সম্মুখে জড় সড় হইয়া বসিয়া মেঠো সুরে গাহিতেছে :—

"বলি বলি মনে করি বলাত হ'লো না,
মরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।"

বড় দুঃখের উপর হাসি আসিল; কিন্তু গাড়োয়ান কি আমাদের প্রেমাভিনয়ের শেষ দৃশ্য দেখিয়াছে? না তাহার ক্ষুদ্র গৃহ প্রান্তে নবযৌবনস্ফুরিতা, আসন্নবিরহসম্ভাবিতা অভিমানিনী গোপবধূর অশ্রু বিধৌত নির্ব্বাক্ অভিমান. তাহার হৃদয়ে বিরহের একটি বেদনা এবং বাসনা বিতাড়িত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া এই স্তব্ধ রাত্রে বিজন প্রান্তর পথে সেই মানসী প্রতিমাকে এই সঙ্গীতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে?

মীর কাসিম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মীর কাসিমের রাজ্যাভিষেক।

It would appear, however, that this prince's dispositiou and capacity has been imperfectly understood by his contemporaries.—Francklin's Shah Aúlum.

ইংরাজ ইতিহাসলেখক ফ্রাঙ্কলিনের মত এইরূপ যে সমসাময়িক লোকে শাহজাদা শাহ আলমের মতি গতি এবং শক্তি সামর্থ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অন্যের কথা যাহাই হউক, মীর কাসিমের সম্বন্ধে এই উক্তি প্রক্ষেপ্ত করা যাইতে পারে না।

মীর কাসিম যেরূপ সুচতুর মানব চরিত্রজ্ঞ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে বুঝিতে বিলম্ব হইল না সে ইংরাজদিগের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করাই শাহজাদার এক-মাত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে মীর কাসিম সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন যে সামরিক স্বার্থ সাধনের জন্য শাহ আলম যাহার তাহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া বসিতেন; এইরূপে আহমদ্ শাহ আব্দালী, মহরাষ্ট্রা সেনাপতি, অথবা মুসলমান ওমরাহগণ শাহ আলমকে সূত্রানুচালিত পুত্তলবৎ পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। শাহ আলম ইংরাজ হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলে মীর কাসিমের পক্ষে স্বাধীনতা সংস্থাপন করা যে সহজ হইবে না, তাহা বুঝিতে পারিয়াই মীর কাসিম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এইরূপ বিচলিত হইবার কারণেরও অভাব ছিল না। শাহ আলম পাটনায় পদার্পণ করিয়াই ইংরাজদিগকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সংকল্প আর কিছু নহে,—ইংরাজদিগকে উৎকোচ স্বরূপ দেওয়ানী সনন্দ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেনাবল লইয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করা। ইংরাজেরা দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিতে ইতস্তত করায় তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই, কিন্তু একদিন যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সে দিন মীর কাসিমের স্বাধীন সিংহাসনের পরিণাম কি হইবে? সে দিন মীর কাসিমের মুসলমান শাসন সংস্থাপনের গুপ্ত সংকল্প কোথায় ভাসিয়া যাইবে? মীর কাসিম শিহরিয়া উঠিলেন!

শাহাজাদাকে তুচ্ছ করিয়া বাহুবলে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যায় মুসলমান শাসন সংস্থাপন করতঃ বিদেশীয় বণিকদলকে পদানত রাখিয়া আত্মাধিকার বিস্তৃত করিবেন বলিয়াই মীর কাসিম গোপনে গোপনে আয়োজন করিতেছিলেন। ঘটনাচক্র অন্য ভাবে আবর্ত্তিত হইয়া গেল;—ইংরাজদিগের সঙ্গে শাহাজাদার সখ্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া গেল। সুতরাং মীর কাসিমের পক্ষে শাহ আলমের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট সনন্দ গ্রহণ করা

ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। আত্মাভিমানী মীর কাসিমের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু তাঁহাকে নীরবে মাথা পাতিয়া এই সর্ব্বনাশ বহন করিতে হইল!

মীর কাসিম বর্দ্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে শান্তি সংস্থাপনের জন্য সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন; তথা হইতে তাঁহাকে পাটনাভিমুখে গমন করিতে হইল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে পাটনার নিকটবর্ত্তী বৈকুণ্ঠপুরে আসিয়া মীর কাসিম ছাউনী ফেলিলেন। ইংরেজ সেনাপতি মেজর কার্ণাকের সহিত মীর কাসিমের কলহ বিবাদের সূত্রপাত হইল।* নবাব প্রথমতঃ স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া আত্মাধিকার সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, শাহ আলমকে পাটনায় আনয়ন করা হইল কেন তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিলেন,—অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে শাহ আলমের নিকট খেলাত গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

এই কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হইল না। মীর কাসিম সাধ্যমত বাধা প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না, মেজর কার্ণাক তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে ১২ই মার্চ্চ পাটনার ইংরাজ কুঠিতে শাহজাদার সহিত মীর কাসিমের শুভসম্মিলন সম্পন্ন হইল।

মুসলমান ইতিহাসলেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন এই দরবারের সমুজ্জ্বল বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজদিগের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই,—তাঁহারা সিংহাসনের অভাবে দুই খানি "খানার টেবিল" পাতিয়া তাহার উপর লাল বনাত বিছাইয়া দিলেন, এবং গৃহতল গালিচায় মণ্ডিত করিয়া যথাসাধ্য সাজ সজ্জা সুসম্পন্ন করিলেন। বাহিরে ইংরাজসেনা সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইল, এবং শাহাজাদা তোরণদ্বারে উপনীত হইবামাত্র ইংরাজসেনানায়কগণ পদব্রজে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে কক্ষমধ্যে আনয়ন করতঃ সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। শাহাজাদা উপবেশন করিবামাত্র দরবার আরম্ভ হইল। ইংরাজ সেনাপতিগণ নজর প্রদান করিয়া ও যথারীতি কুর্ণীশ করিয়া দরবারের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। এক ঘণ্টা পরে মীর কাসিম উপনীত হইলেন। তাঁহাকেও যথারীতি নজর প্রদান করিতে হইল। শাহাজাদা তাঁহাকে সিংহাসনের এক পার্শ্বে আসন দান করিয়া যথাযোগ্য খেলাত সহ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদার পদে অভিষেক করিলেন। মীর কাসিম বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সুবাদারী গ্রহণ করিলেন। যথা সময়ে দরবার ভঙ্গ হইল।‡

এই দরবারে কাহারও আশাপূর্ণ হইল না। মীর কাসিমের মুখ অবনত হইল, শাহ আলমেরও মুখও অবনত হইল। মীর কাসিমকে অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু

* On arrival, he was visited by Major Carnac, and the long series of discussions and disputes which followed, appears to have commenced at the first interview.—Broome's Bengal Army, vol. I. P. 331.

‡ Seir Mutakherin vol. II. 170—172.

ইংরেজেরা তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিতে সম্মত না হওয়ায় শাহ আলমকে অল্পদিনের মধ্যেই পাটনা পরিত্যাগ করিতে হইল!

পাটনার দরবারের কথা এখন ইতিহাসের জীর্ণদপ্তরে নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই দরবারেই ইংরাজশক্তি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যখন এই সমাচার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন সকলেই চাহিয়া দেখিল যে ইংরাজ বণিকের ইচ্ছানুসারে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব কেন, ভারতবর্ষের অধীশ্বর "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা কেও" পরিচালিত হইতে হইতেছে।

ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিয়া মীর কাসিমকে প্রতারিত করিতে পারিতেন। তাঁহারা এইরূপ প্রতারণা করেন নাই বলিয়া ইতিহাসে তাঁহাদের প্রশংসাবাদ হওয়া দূরে থাকুক, বরং কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন,—"হাতের কাছে দেওয়ানী সনন্দ পাইয়া এমন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজ্য শাসন।

At the close of 1762 he had not only paid off all the debts of the State, but his revenue returns showed an excess of income over expenditure.—Col. Malleson.

মীর কাসিমের বিচিত্র ইতিহাস বহুবিধ যুদ্ধ কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; সেইজন্য কোন ইতিহাসেই মীর কাসিমের শাসন কাহিনী বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইতে পারে নাই। মীর কাসিম অল্পদিনের মধ্যে সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়া রাজকোষে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে প্রজাপীড়ন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। ইহা অলীক অনুমান মাত্র। ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিয়া আয়বৃদ্ধি করা কত সহজ মীর কাসিম ভিন্ন আর কেহ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎকালে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভারতবর্ষে নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোক উপনীত হইয়াছিল। বসুন্ধরা ধন ধান্য ভরা, বাঙ্গালী শিল্পকারগণ বহুবিধ শিল্প দ্রব্য প্রণয়নে সিদ্ধহস্ত, দেশ অরাজক; —এই সকল কারণে বাণিজ্যে অথবা সামরিক ব্যাপারে রাতারাতি বড় মানুষ হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ বাণিজ্য ব্যাপারে কেহ কেহ বা সামরিক ব্যাপারে অর্থোপার্জ্জনের অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীর ইউরোপীয়গণ মীর কাসিমের বেতন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অধীনে সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

এই রূপে যে সকল বিদেশীয় বীর পুরুষ মীর কাসিমের সেনাশিবিরে নিয়োগ প্রাপ্ত

হন, তন্মধ্যে কেহ কেহ এ দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সমরু, গর্গীন এবং মার্কারের নাম লোকে এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

মীর কাসিমের এই সকল কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া বর্ত্তমান শতাব্দীর লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইতিহাস লেখক ম্যালিসন লিখিয়া গিয়াছেনঃ—These preparations, his move to munger, his repairing and strengthening of the fortifications of that place, the reform of his revenue system, had been inspired by one motive—distrust of the English. *

ইংরাজদিগের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করিয়া ইংরাজদিগকে এতদূর অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? ইহা কি মীর কাসিমের পক্ষে নিতান্ত অব্যবস্থিত চিত্ততার লক্ষণ নহে? ইংরাজেরা বাহুবলে রাজ্য সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল নহেন, বরং শাহাজাদা বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং উপযাচক হইয়াও ইংরাজদিগকে তাহা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই! তবে আর ইংরাজদিগকে সন্দেহ করিবার কারণ কি?

মীর কাসিম এই সকল কথা অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছিলেন। ইংরাজেরা যে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে লালায়িত নহেন, তাহা মীর কাসিম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে ইংরাজ সওদাগরেরা এ দেশের ধন ধান্য প্রকারান্তরে কুক্ষিগত করিবার আশায় স্বাধীন বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে বাধা প্রদান না করিলে দেশ বাঁচিবে না, বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেও যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইবে। ইংরাজ সওদাগরদিগের স্বাধীন বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা না করিলে মীর কাসিমকে কোনরূপ সামরিয়ক আয়োজন করিতে হইত না। কিন্তু যিনি সবলের উৎপীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া জমীদারদিগকে দণ্ড দান করিতেন, তাঁহার পক্ষে স্বদেশের বাণিজ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী হাহাকারে উপেক্ষা প্রদর্শণ করা অসম্ভব। সেই জন্য মীর কাসিমকে জানিয়া শুনিয়াই অনলে হস্ত প্রসারণ করিতে হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল কারণ, ইহাই আবার এ দেশে বৃটীশ রাজশক্তি সুসংস্থাপিত হইবার ঐতিহাসিক সূত্র। মীর কাসিম ইংরাজের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত না হইলে, এ দেশের মোগল শাসন উৎখাত হইত না; বরং ইংরাজ বণিক এবং মোগল নবাবের যুগপৎ উৎপীড়নে এ দেশের নানারূপ অকল্যাণ হইত।

লোকে লাভের লোভে সহজেই অন্ধ হইয়া পড়ে। সে কালের ইংরাজ সওদাগরেরাও অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ দেশ যে তাঁহাদের শাসনাধীন নহে সে কথা তাঁহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া প্রজাবৃন্দ অরণ্যে রোদন করিতে বাধ্য হইত। মুসলমান বা হিন্দু ফৌজদারগণ তাহার কোনও প্রতিকার করিতে

* Malleson's Decisive battles, p. 144

পারিতেন না। মীর কাসিম প্রতিদিন এই হাহাকার শ্রবণ করিয়া উন্মত্তবৎ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। লাভের লোভে ইংরাজ অন্ধ হইয়াছিলেন, রাজধর্ম্ম পালনের অক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া আত্মগ্লানিতে মীর কাসিমও অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মুসলমান ইতিহাস লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন মীর কাসিমের প্রশংসাবাদের জন্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকেও সত্যানুরোধে লিখিতে হইয়াছে:—"যাঁহারা মানব কার্য্যের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবেন তাঁহাদিগকে সত্য কথা বলিতে হইবে। আমি মীর কাসিমের অনেক অপকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি; সুতরাং তাঁহার সৎকীর্ত্তিগুলিরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। মীর কাসিম বঙ্গীয় সেনানায়ক ও সিপাহীদলের প্রভুভক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া অনেক সময়ে সামান্য কারণে অনেকের প্রাণদণ্ড করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই; কিন্তু দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচারকার্য্যে অথবা সেনাদল ও নবাব দরবারের শাসন কার্য্যে, অথবা পণ্ডিত সমাজের মর্য্যাদারক্ষা কার্য্যে তিনি যেরূপ ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি সপ্তাহে দুই দিবস যথারীতি বিচারাসনে উপবেশন করিতেন। নিম্নপদস্থ বিচারকগণের বিচারকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন এবং স্বয়ং অর্থী প্রত্যর্থী ও তাহাদের সাক্ষীগণের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবেন;—তাঁহার আমলে কোন রাজকর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া 'হাঁ'কে 'না' করিয়া দিতে পারিতেন না। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে দুর্ব্বল প্রজাগণকে রক্ষা করা তাঁহার বিশেষ প্রিয় কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলা বহু ব্যয়ের যে ইমামবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।" *

মীর কাসিম সংকল্প সাধনের জন্য নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই অর্থে আত্ম ভোগ বিলাসের পথ উন্মুক্ত না করিয়া, আত্ম শক্তি সংস্থাপনের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। মুঙ্গেরের পুরাতন কেল্লা সুসংস্কৃত করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিলেন। কর্ম্মকুশল দেশীয় শিল্পকার নিয়োগ করিয়া গুলি গোলা বারুদ কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ইউরোপীয় প্রণালীতে সেনা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের সুব্যবস্থা করিলেন।

সে কালের বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব ছিলনা; কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সমর কৌশলের অভাব ছিল। মীরজাফর সিংহাসনারোহণ করিবার অল্পদিন পরে সেনাপতি ক্লাইব একদিন তাঁহাকে সদল বলে নিমন্ত্রণ করিয়া ইউরোপীয় সমর কৌশল প্রদর্শণ করেন। তাহাদের ত্বরিত গতি, তাহাদের অপূর্ব্ব অস্ত্র চালনা কৌশল, তাহাদের অদ্ভুত রণশিল্প দেখিয়া মীরজাফর বিস্মিত নয়নে পার্শ্বস্থ মীর কাসিমকে বলিয়াছিলেন "ইউরোপীয় সমর কৌশল প্রণালী সর্ব্বথা অনুকরণ যোগ্য; দূর হইতে ইহাদিগকে আক্রমণ করা অসম্ভব;

* Scot, vol. II. 411

নিকটে পাইলে একবার দেখা যাইতে পারে! ” কথা গুলি মীর কাসিমের হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল; তিনি এখন সময় পাইয়া বাহুবলের সঙ্গে সমর কৌশল মিলিত করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ফল হইল না, কলিকাতায় ইংরাজ দরবারে সকরুণ আবেদন করিয়া কোন ফল হইল না, —হেষ্টিংস এবং গভর্ণর ভান্সিটার্ট ভিন্ন ইংরাজ মাত্রেই যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য ব্যাকুল। সুতরাং বাহুবলে বাণিজ্য রক্ষা করিবেন বলিয়াই মীর কাসিম এই সকল সামরিক অনুসন্ধানে লিপ্ত হইতে লাগিলেন।

রমণী দস্যু।

(ফরাশী গল্প)

এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিস নগরে ডাক্তারি করিতেছিলাম। অনেক সংবাদ পত্রে আমার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। সহরের যে অংশে আমি বাসা করিয়াছিলাম সেদিকে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। ব্যবসা করিয়া আমি বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলাম। অনেক বড়লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহারাও আমাকে খুঁব অনুগ্রহ করিতেন। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রায়ই আমার অবসর থাকিত না। আমি বিবাহ করি নাই সুতরাং যে তিনটি ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম তাহাতেই আম্যর সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিবার সুবিধা ছিল। একটি ঘরে আমি বসিতাম আর একটি ঘরে আহার করিতাম ও তৃতীয়টি আমার শয়নকক্ষ রূপে ব্যবহৃত হইত। আমার একটি মাত্র ভৃত্য ছিল। হোতেল দেসঁদ্রের (Hotel des lowdres) সহিত বন্দোবস্ত ছিল, সেখান হইতে খাবার আসিত এবং তাহাতেই আমাদের দুজনের চলিয়া যাইত।

একদিন, রোগী দেখিয়া আসিতে কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রি হইল। বাড়ী আসিয়া কিছুই আহার করিলাম না। ডিক্ (আমার ভৃত্যের নাম) বসিবার ঘরে ঘুমাইয়া ছিল। তাহাকে না জাগাইয়া আমি নৈশ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ঘুমাইতে যাইতেছি। এমন সময় বহির্দ্বারের ঘণ্টা নড়িয়া উঠিল। ডিক্ জাগিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং আমার শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিল। কে আসিয়াছে জানিবার জন্য আমি উদ্গ্রীব হইয়াছিলাম। দ্বার খুলিয়া দিতেই ডিক বলিল “একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা অপেক্ষা করিতেছেন, নাম বলিলেন না, কার্ডও দিলেন না; শুধু আপনাকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন।” ডিক্ চলিয়া গেল। আমি সেই পরিচ্ছদেই আমার বসিবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কৃষ্ণবর্ণ গাউন ও জ্যাকেট পরিহিতা একটি স্ত্রীলোক চেয়ারে উপবিষ্টা। স্তিমিত আলোক প্রভাবে তাঁহার মুখখানা ভাল দেখিতে পাইলাম না। আমি গৃহে প্রবেশ করি-

তেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়া এত রাত্রে আমার নিকট আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঈষৎ কম্পিতস্বরে রমণী বলিলেন "আপনাকে একটু কষ্ট করিতে হইবে। আমাদের বাড়ী একজন অত্যন্ত পীড়িত।"

তখন আমি নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলাম না। একটু মাথা হেঁট করিয়া চিন্তা করিয়া বলিলাম "তবে আপনি একটু বসুন আমি কাপড় পরিয়া আসি।"

আমি বাহির হইয়া আসিতেছিলাম রমণী একটু ব্যস্ত ভাবে বলিলেন "আপনার অস্ত্রের ব্যাগ্‌টাও আনিবেন।"

"আচ্ছা" বলিয়া আমি চলিয়া গেলাম।

(২)

শীঘ্রই কোট ও আলষ্টার পরিয়া কাল হ্যাট ও ব্যাগ হস্তে পুনরায় বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

রমণী বলিলেন "চলুন।"

আমি বলিলাম "চলুন।"

বাহিরে আসিয়া রমণী একবার শিষ দিলেন, রাস্তার অপর পার হইতে একটি ভদ্র লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রমণী বলিলেন "গাড়ী।"

ভদ্রলোক ডাকিলেন "জোন্স্।"

জোন্স্ একখানি গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। নিঃশব্দে তিনজনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। রমণী বলিলেন "পুরাতন আদালত"! গাড়ী "পুরাতন আদালতের" দিকে চলিল।

তাড়াতাড়ি করিয়া আসিবার সময় কোথায় যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন সে বিষয়টা মনে পড়িয়া গেল। রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় যাইতে হইবে?"

ধীরস্বরে সহগামী ভদ্র লোকটি বলিলেন "নিউবণ্ড লেন।" রমণী কোন উত্তর করিলেন না।

নিউবণ্ড লেন আমি চিনিতাম। উহা পুরাতন আদালতের দিকেই বটে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে গাড়ী নিউবণ্ড লেনের মোড়ে উপস্থিত হইল। কিন্তু সে রাস্তায় প্রবেশ করিল না, সোজাই চলিল।

একটু আশ্চর্য্য হইয়া আমি সহগামী ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "নিউবণ্ড লেন ত ফেলিয়া আসিলাম?"

পূর্ব্ববৎ ধীর গম্ভীর স্বরে ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন "নিউবণ্ড লেনে যাওয়া হইবে না। প্যালেস কর্ণারে যাইতে হইবে।"

আর একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "সেকি ? আপনি যে বলিলেন নিউবগু যাইতে হইবে?"

আরও একটু গম্ভীর স্বরে ভদ্রলোকটি বলিলেন "হাঁ বলিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে যাইব না।"

(৩)

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময় চকিত নেত্রে একবার রমণীর মুখের দিকে তাকাইলাম। সে মুখ পূর্ব্ববৎই গম্ভীর ও প্রশান্ত। আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি শুনিয়াছি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার, অনেক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া আপনাকে আজ ডাকিতে আসিয়াছি। অবশ্য বিপদে না পড়িলে আসি নাই। আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে কোন ক্রমে ত্রুটি করিব না। তবে এক কথা আপনি মনে রাখিবেন, আমাদের আচরণের কখনও কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না।" রমণী চুপ করিলেন।

এবার বিস্ময়ের সহিত ভয় আসিয়া যোগ দিল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথকালে তাড়িতালোক শোভিত রাস্তায় গাড়ী করিয়া অদ্ভুত একটি স্ত্রীলোক ও পুরুষের সহিত রোগী দেখিতে যাইতে যাইতে আপনার অবস্থার কথা একবার স্মরণ হইল। অমনি আমার সেই তিনটি প্রিয় ঘরের কথা মনে হইল। ক্রমে ক্রমে রমণীর শেষ কথাগুলা পর্য্যন্ত মনে করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হিমে শরীর আড়ষ্ট হইয়া আসিল। আমি ভয়ে মনে করিলাম যেন সহগামী ভদ্রলোকটি আমাকে একহাতে চাপিয়া ধরিয়া অপর হাতে একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আমার হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। হঠাৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া একটু চমকিয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছেন। বোধ হয় তিনি আমার মনের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশে মনে মনে শেষ নমস্কার করিয়া লইলাম। রমণী বিপদে পড়িয়া আমাকে ডাকিতে আসিয়াছেন কি আমাকেই বিপদে ফেলিতে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। অলক্ষ্যে হৃদয়ের নিকট বামহস্ত খানা উঠিয়া গেল। দেখিলাম হৃদয় বেগে স্পন্দিত হইতেছে। এই স্ত্রীলোকটি ও এই পুরুষটি কে ? ইহাদের বাড়ী কোথায় ? সেখানে কাহার কি অসুখ এই সব ভাবিতে লাগিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সবটা যেন একটা প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইল। সেই অবস্থায় বসিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলাম বলিতে পারি না। কিন্তু জাগিয়াও দেখি গাড়ী চলিতেছে, আমরা এক গ্রামের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। এবার গাড়ীতে আর একটি পুরুষ দেখিলাম। আমরা চারিজন যাত্রী হইয়াছি!

এই সব দেখিয়া উহারা যে দস্যু তাহাতে আমার আর কোন সংশয়ই রহিল না।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনের অবস্থা তত ভাল ছিল না। দস্যুহস্তে পতিত হইয়াছি ভাবিয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াইতে গেলাম; গাড়ীর ছাতে মস্তক বাধিয়া একটু বেদনা পাইলাম। রাগ বাড়িয়া গেল। বল পূর্ব্বক গাড়ীর দরজা খুলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু হঠাৎ কে যেন বজ্র মুষ্টিতে আমার হস্ত চাপিয়া ধরিল। তাহার ফলে আমাকে পুনরায় স্বস্থানে বসিয়া পড়িতে হইল। একজন সহগামীর দিকে চাহিয়া দেখি তাহার হস্তে একটি পিস্তল আমার দিকে উত্তোলিত রহিয়াছে। আর একজন সহগামী আমার হস্ত ধরিয়া আছেন। ভয়ে আমি চক্ষু মুদিত করিয়া বসিলাম।

কিয়ৎকাল পরে রমণী বলিলেন, "আপনি বল প্রকাশ করিবেন না ও আমাদের আচরণের সম্বন্ধে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। করিলে, এই পিস্তলের গুলি আপনার মস্তক বিদ্ধ করিবে। কোন কথা না বলিয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিলে উপযুক্ত পুরস্কার পাইবেন ও আপনাকে স্বস্থানে রাখিয়া আসিব।"

ভয়ে আমি কাঁপিতেছিলাম। চক্ষু মেলিতে পর্য্যন্ত সাহস হইল না।

অনেকক্ষণ গাড়ী চলিল। তাহার পর সহগামী পুরুষটী বলিলেন, "এইস্থান হইতে আপনার চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া যাইব। কোনরূপ দোষ গ্রহণ করিবেন না।"

দোষ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে কি করিতাম বলিতে পারি না। এবার কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। একখানি সুগন্ধি রুমালের দ্বারা আমার চক্ষু বদ্ধ হইল।

আরও কতদূর এইরূপ চক্ষু বদ্ধাবস্থায় চলিয়া গেলাম। অবশেষে গাড়ী একটা বাড়ীর প্রান্তে আসিল। আমরা সকলে নামিলাম। আমাকে অন্ধের মত হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। প্রথমে আমার বোধ হইল একটা বারাণ্ডায় উঠিলাম। শেষে একটি ঘরের ভিতর দিয়া সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার পরিচালক বলিল "সিঁড়ি।"

আস্তে আস্তে উপরে উঠিলাম। এবার কার্পেট মণ্ডিত দুইটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম।

এই ঘরে আমার চক্ষু খুলিয়া দিল। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিয়া দেখিলাম—কি সর্ব্বনাশ—আমার চারিদিকে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, প্রত্যেক বন্দুকের লক্ষ্য আমার দিকে!!!

ভয়ে বিস্ময়ে আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াগেল। আমি প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিতা স্ত্রীলোকটি আমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন, ধীর পদবিক্ষেপে তিনি আমার নিকটে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "আপনি আমাদের আচরণের কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না। যে কার্য্য সমাধা করিতে আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবেন না, আমার কথা না শুনিলে ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের হাতের বন্দুকের গুলি আপনার মস্তক উড়াইয়া দিবে।"

ভয়ে আমার জিহ্বা শুকাইয়া গিয়াছিল। তবুও অতিকষ্টে বলিলাম "আমাকে কি করিতে হইবে?"

স্ত্রীলোকটি আমাকে সেই প্রকোষ্ঠের এক কোণে লইয়া গেলেন। সেখানে কি দেখিলাম?—যাহা দেখিলাম তাহা আর ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। সেই বাসন্তী হরিৎ বৃক্ষপত্রাগ্রভাগে বালসূর্য্য কিরণবৎ মধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি ইহ জীবনে আর ভুলিব না! এই ঘটনার পরে আজ কতদিন চলিয়া গিয়াছে তবুও সে মুখখানি মনে পড়িলে কণ্টকিত শরীর কি যেন এক অজানা শ্রান্তিভরে শিথিল হইয়া আসে। কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ ভরে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, চক্ষু মুদিত হইয়া যায়।

স্ত্রীলোকটি দেখাইলেন, প্রকোষ্ঠের সেই কোণে একখানি সোফার উপর শায়িতা অসামান্য রূপবতী একটি বালিকা। তাহার গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ কেশ ললাটের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে। অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু একটু চঞ্চল। মুখে ঈষৎ হাসি লাগিয়া রহিয়াছে। বালিকা একবার আমার দিকে তাকাইল।

স্ত্রীলোকটি ধীরে অথচ ভাঙ্গভাঙ্গা সুরে বলিলেন "ইহাকেই দেখিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি দেখিব?"

আস্তে আস্তে তিনি বালিকার বক্ষের বস্ত্র অপসারিত করিলেন। উঃ কি ভীষণ! সে সুকোমল বক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হইয়াছে। ক্ষত মুখ দিয়া এখনও একটু একটু রক্ত পড়িতেছে। দেখিয়া বাস্তবিকই হৃদয়ে একটু বেদনা অনুভব করিলাম।

স্ত্রীলোকটি বলিলেন "আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। ঐ স্বর্ণমুদ্রার থলি আপনার, অস্বীকার করিলে ঐ বন্দুকের গুলি সমূহ আপনার জন্য।"

আমি যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়া ব্যাগ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম "বালিকার হাত দুইখানা ধরিবেন, গুলি তুলিবার সময় যেন কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে।"

স্ত্রীলোকটি বলিলেন "ধরিবার আবশ্যক নাই। আপনি যাহা ইচ্ছা করুন।"

আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া 'ফরসেপ' দিয়া গুলি বাহির করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। ধন্য সহিষ্ণুতা! বালিকা একটি বারও বেদনায় কাতর ভাব দেখায় নাই। তাহার মুখে পূর্ব্বেকার মত হাসিটুকু তেমনই লাগিয়াছিল। এমন সুন্দরী ও সহিষ্ণু বালিকা আমি আর ইহ জীবনে দেখিনাই।

বালিকাকে দেখিয়া আমি একটা টেবিলের কাছে গিয়া বসিলাম। এবার চাহিয়া দেখি বন্দুকধারিণী স্ত্রীলোকদিগের লক্ষ্য আমার মস্তকের দিকে নয়। আমার ভয় কমিয়া গেল।

ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। স্ত্রীলোকটি সেই স্বর্ণ মুদ্রার থলি আমার হাতে দিতে আসিলেন। আমি একটু পিছনে সরিয়া গেলাম।

স্ত্রীলোকটি বলিলেন "আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি। দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।

আজ আমার যে উপকার করিলেন ইহ জীবনে তাহা ভুলিব না। এই লউন আপনার পুরস্কার। আর যদি কিছু আকাঙ্খা থাকে বলুন, পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিবনা"

লজ্জাবনত মস্তকে আমি ধীরে ধীরে বলিলাম "ভগবানের কৃপায় আমি টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারি। ক্ষমা করিবেন, আমি টাকা লইবনা। তবে একটি প্রার্থনা আছে। যদি অনুমতি করেন তবে বলি।"

স্ত্রীলোকটি বলিলেন "বলুন।"

আমি বলিলাম "ভগবানের কৃপায় আজ যে বালিকাকে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছি দয়া করিয়া তাহার অধরে একবার চুম্বন করিতে অনুমতি করুন। ইহ জীবনে আপনার নিকট আমার বোধ হয় এই শেষ প্রার্থনা।"

স্ত্রীলোকটির গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম।

পরিশেষে তিনি ধীর স্বরে বলিলেন, "আমার আপত্তি নাই, তবে অন্যে জানিতে না পারে।"

আমি উদ্বেলিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে বালিকার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যেন তাহার ক্ষত পরীক্ষা করিতেছি এই ভাবে তাহার সুকোমল অধরে একবার চুম্বন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে মুখে তেমনই হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে চঞ্চল আঁখিতে এবার দুই ফোঁটা অশ্রুজল কেন? কে বলিবে কেন!

আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছিল।

পূর্ব্ববৎ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আমার চক্ষু বাঁধিয়া দস্যুরা শেষে বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

(৪)

ইহার তিন বৎসর পরে একদিন আমি "নূতন আদালতের" নিকট দিয়া একটি রোগী দেখিয়া আসিতেছিলাম। বড় ভিড় দেখিয়া আদালতে প্রবেশ করিলাম। যে আসে, যে যায়, সেই বলে "রমণী দস্যুর মোকদ্দমা।"

রমণী দস্যুর মোকদ্দমা দেখিতে অসংখ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিল। আমিও গেলাম।

কি আশ্চর্য্য, কালো পোষাক পরিহিতা সেই রমণীই একমাত্র আসামী! আমি দেখিয়াই চিনিলাম তিন বৎসর পূর্ব্বে এই রমণীর গৃহেই বালিকার চিকিৎসার্থ গমন করিয়াছিলাম।

রমণী ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে আমাকে চিনিতে পারিয়া একটু মস্তক নাড়িলেন; আমিও মস্তক নাড়িলাম। আর কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। আমি চলিয়া আসিলাম।

আজিও বিবাহ করিনাই। আমার পিতা মাতা কেহই নাই। একটি মাত্র ভগিনী আছে। সে আমাকে প্রায়ই বলে "দাদা এত টাকা কড়ি করিলে, এখন বিবাহ কর।" বিবাহের নাম শুনিলেই আমার একটি বালিকার কথা মনে পড়ে। হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। নৈরাশ্যের অন্ধকারে সমস্ত জীবন সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। বাহিরে ভগিনীকে বলি "আরও দু'দিন থাকনা।"

শ্রীপঞ্চমী।

বাঙ্গালা দেশের পল্লী অঞ্চলে সাধারণ ভদ্রলোকের মধ্যে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে যেরূপ উৎসাহ দেখা যায়, সেরূপ বোধ হয় আর কোন উৎসবেই দৃষ্ট হয় না। শীতের প্রারম্ভ হইতেই আমাদের গোবিন্দপুরে বড়বাজারের পাণ্ডারা সরস্বতী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গত বৎসর বড়বাজারে তেমন ধূমধামে সরস্বতী পূজা হয় নাই বলিয়া বৌবাজারের দল জন্মাষ্টমীর প্রতিমা বাহির করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় ছোট বড় নানা রকম নিশান উড়াইয়া পাখাওয়ালা বড় বড় ঢাক বাজাইয়া, এবং ময়ূর পঙ্ক্ষীতে চড়িয়া দলে দলে সারি গান গাহিয়া বড়বাজারের পাণ্ডাদিগকে যেরূপ ধিক্কার দিয়াছিল, ও বিদ্রূপপূর্ণ ছড়া কাটিয়া তাহাদের অক্ষমতার প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি বর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে বড়বাজারের পাণ্ডারা লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল; ইহার অনতিবিলম্বেই তাহারা রামচরণ দফাদারের দোকানে এক বৈঠক বসাইয়া ঠিক করিয়াছিল যে যদি এবার সরস্বতী পূজায় অসাধারণ ধূমধাম করিতে না পারে ত তাহারা আর কখন বারোয়ারী করিবে না, দড়ী কলসীর আশ্রয় লইতে হয় সেও বরং ভাল। উৎসাহে কয় রাত্রি তাহাদের নিদ্রা হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে কৈলাস পরামাণিকের হস্তেই বড়বাজারের দোকানদারবর্গের নেতৃত্ব ভার ন্যস্ত ছিল, কৈলাশ বড়বাজারের বিখ্যাত আড়তদার নীলমণি নন্দীর গদিয়ান বা প্রধান কার্য্যকারক। নীলমণির বাড়ী ফরাসডাঙ্গা, তাহার পিতার আমল হইতেই গোবিন্দপুরে তাহাদের কারবার চলিতেছে, দেশী ও বিলাতি কাপড় ভিন্ন তাহাদের আড়তে ধান, চাউল, তুলা, লবণ, সুতা ও লোহা প্রভৃতি নানা রকম জিনিষ বিক্রয় হয়, এবং এক সময়ে এই দোকানই গোবিন্দপুরের মধ্যে 'সেরা' দোকান ছিল, কিন্তু গোবিন্দপুরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাজারে দোকান পাটের বৃদ্ধি হওয়াতে কিছু দিন হইতে নীলমণির দোকানের কাজ কর্ম্ম কিছু 'মন্দা' চলিতেছে, এমন কি চাকর বাকরদের বেতন দিয়া ও দোকানের খরচ পত্র সরবরাহ করিয়া বেশী কিছু লাভ থাকে না, তাই নীলমণি একবার 'মোকামে' আসিয়া ব্যবসায়ের অবস্থা দেখিয়া বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছিল, এবং দোকান উঠাইয়া দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু ব্যবসায় করিতে বসিয়া এখানে তাহার যে বিশ হাজার টাকা 'বিলাত' পড়িয়াছে, তাহার একটা 'কিনারা' না করিয়া কিছুতেই ব্যবসায় বন্ধ করা যায় না, তাই অগত্যা তাহারা কারবার চালাইতে বাধ্য হইয়াছে।

কৈলাশ প্রমুখ কর্ম্মচারীবর্গ দেখিল বিষম বিপদ, 'বিলাত' বাকীগুলি আদায় হইলেই তাহাদের চাকরী যায়, তাই তাহারা 'বিলাত' আদায়ের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইল না, এমন সুখের চাকরী কি সহজে ছাড়া যায়? কোন চেষ্টা নাই, পরিশ্রম নাই; বাজারের ঠিক

মধ্যস্থলেই দোকান, মাছ তরকারী প্রভৃতি যে কিছু ভাল খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় হইতে আসে, তাহা তাহারাই আগে কিনিয়া লয়, মধ্যাহ্নে দিব্য নিদ্রা দিবার আয়োজন আছে, বৈকালে উঠিয়া কেহ কাশীদাসের মহাভারত খানি হাতে লইয়া বসে, কেহ পাঁচু কুণ্ডুর দোকানে পাশার 'কচেবার' আরম্ভ করে, কেহ বা গণেশের ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়; প্রভুর অন্নে দেহ পুষ্ট হইতেছে, কাহারো ভুঁড়ির পরিসর বাড়িতেছে, সকলকেই 'হাম্‌সে দিগর নাস্তি' হইয়া ক্ষুদ্র বাজারের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে রাজত্ব করিতেছে কিন্তু মানসম্ভ্রম পসার প্রতিপত্তি কৈলাসের সমান কাহারো নহে। আদালতের পেয়াদা ও গ্রাম্য জমীদারের বরকন্দাজগুলাও কৈলাসকে মাথা নোয়াইয়া সেলাম করে! গ্রামস্থ থানার জমাদার জনাবলী মিঞা পর্য্যন্ত পোষাকে সজ্জিত হইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইবার সময় বিরল শ্মশ্রুজালে হস্তার্পণ পূর্ব্বক স্মিতমুখে বলে "কি কৈলাশ বাবু তবিয়ৎ আচ্ছা হায়?" শুনিয়া কৈলাশ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া উদরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক উত্তর করে "হুজুরের মর্জ্জি যেমন রেখেছেন তেমনি আছি।"—কৈলাসের এই অসাধারণ সম্মান দেখিয়া বাজারের লোকে সবিস্ময়ে ভাবে "বাপরে! সরকার বাহাদুরের কাছে পরামাণিকের পোর কি খাতির!"

সুতরাং বলা বাহুল্য গোবিন্দপুরের বাজারে কৈলাসের অসাধারণ প্রতিপত্তি। বাজারের মধ্যে কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে কৈলাসই তাহার বিচার করিত এবং সে যে দণ্ডবিধান করিত অপরাধীকে নত মস্তকে তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইত, এইরূপে কৈলাসের হাত দিয়া অনেক টাকা জরিমানা আদায় হইত, তাহার কিয়দংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ফরিয়াদি পাইত, অবশিষ্টাংশ বাজারের বারোয়ারী ফণ্ডে জমা হইত, কোন দোকানীর নিকট বাজারের কোন দোকানদারের দেনা থাকিলে সেজন্য আদালতে নালিশের প্রথা প্রায় ছিল না, কৈলাশ প্রবল যুক্তি তর্কের সাহায্যে সপ্রমাণ করিত যে, যে টাকাটা উকীল রসুমে, পেয়াদার রোজে, সাক্ষীর বার বরদারীতে, আরজির ষ্টাম্প ও আমলা বাবুদের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক টাকা বারোয়ারীতে দান করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ ফলই লাভ হইবে, বলা বাহুল্য কেহ কোন দিন কৈলাশের এ যুক্তি খণ্ডনের জন্য চেষ্টা কিম্বা সাহস করে নাই। গ্রামে কোন লোকের কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে কৈলাস বিবাহের সাতদিন পূর্ব্ব হইতে বিবাহ বাড়ীতে পাত পাড়িতে আরম্ভ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে বরকর্ত্তার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ চাঁদা প্রাপ্তির আশায় অতি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে, কিন্তু দৈবক্রমে যদি বড়বাজারের বারোয়ারীর পাণ্ডা নবীন হালদার কিছু চাঁদা আদায়ের আশায় সেদিকে অগ্রসর হয় তাহা হইলে কৈলাস সদলবলে তাহাকে এমন আক্রমণ করে যে সে বেচারীর আর পলায়ন করিবার পথ থাকেনা! সত্য সত্যই গোবিন্দপুরে বড়বাজারের এলাকা অনেকদূর লইয়া, এবং এইজন্যই বিবাহাদি শুভকার্য্যে বড়বাজারে বেশী টাকা চাঁদা আদায় হয়, বড়বাজারে দোকানদারদের ঘরে যে 'ঈশ্বর বৃত্তি' আদায় হয় তাহাও বৌবাজার অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু তথাপি বৌবাজারের কয়েক ঘর

দোকানদার যে জন্মাষ্টমীর সময় অত্যন্ত ধূমধামে বারোয়ারী করে, তাহা গোবিন্দপুরের অন্যতম জমীদার মজুমদার বাবুদের অনুগ্রহে।

এদিকে কয়েক বৎসর হইতে এই মজুমদার বাবুদের সঙ্গে চাটুয্যে জমীদারদের বাহাদুরী দেখানো লইয়া দলাদলী চলিতেছে, চাটুয্যেরা যখন দেখিলেন যে মজুমদারেরা বৌবাজারের দলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, তখন বড়বাজারের দলের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহাদের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, তাঁহারা বড়বাজারের বারোয়ারীর পৃষ্ঠপোষকতায় অবতরণ করিলেন।

এতদ্ভিন্ন বড়বাজারে দলের সহিত চাটুয্যে বাবুদের সহানুভূতির আরো একটু কারণ ছিল, একেত চাটুয্যেরা বড়বাজারের প্রতিবেশী, তাহার উপর স্বর্গীয় জমীদার দেবনাথবাবুর এক পুত্র গুরুনাথ কিছুদিন হইতেই বড়বাজারে মুদীখানায় এক দোকান খুলিয়াছে; তেল লবণ, তামাক ও ঘি ময়দা প্রভৃতি জিনিষ দোকানে বসিয়া বিক্রয় করিতে প্রথম প্রথম এই জমীদার পুত্রের বড়ই বাধবাধ ঠেকিত, এবং সকালে কি বৈকালে বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে দেখা হইলে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে বলিত "চুপকরে বসে থাকা আর পুষায় না, চাকর বাকরদের একটা দোকান করে দেওয়া গেছে, তারা কি রকম কাজ কর্ম্ম করে না করে তাই তাদারক কর্ত্তে একবার এদিকে আসা হয়েছে।"—যেন তাহাকে বাজারের মধ্যে দেখিয়া কেহ তাহাকে মহা অপরাধী বলিয়া মনে করিয়াছে!—প্রথম প্রথম দোকান করিতে সে এমনি সঙ্কোচ বোধ করিত, কিন্তু অবশেষে যখন দেখিল যে সামান্য পৈত্রিক আয়ে আর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এবং সখের খাতিরে দোকান করা চলে না, তখন সে আপনার জমীদার গর্ব্বটাকে দোকানদারীর হীনতার কাঁধে চাপাইয়া বাজারের মধ্যে একাধিপত্য লাভের আয়োজন করিয়া লইল, এই সময় হইতে বৃদ্ধ কৈলাসের প্রভুত্ব টুটিয়া গেল, কিন্তু গুরুনাথ কৈলাসের প্রতি কখন অসম্মান প্রকাশ করে নাই।

জমিদারের ছেলে দোকানদার হইয়াছে দেখিয়া বৌবাজারের পাণ্ডাদের পরিহাস স্পৃহা অসম্ভব রকমে বাড়িয়া উঠিল। জন্মাষ্টমীর সময় তাহারা এক সং বাহির করিল তাহাতে গুরুনাথের প্রতি আক্রমণ ছিল। বৌবাজারের দল জমীদাররূপী একটি পুত্তলিকার হস্তে তৌলদণ্ড দিয়া তাহাকে পথে বাহির করিয়াছিল, এই পুত্তলিকার পরিধানে মিহি-শান্তিপুরে কাপড়, গায়ে ইস্ত্রীকরা সার্ট, বুকে চেন, পায়ে ষ্টকীন ও জুতা, মাথায় টেরি কাটা কিন্তু বাম হস্তে দাঁড়ি বাটখারা—সং দেখিয়া সকলেই ব্যাপার কি তাহা বুঝিতে পারিল, তাহার উপর 'কি মজাহালের দোকানদারী'—এই গান; ক্রোধে ক্ষোভে যুবক গুরুনাথের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রথমে সে স্থির করিল একটা মানহানির মোকর্দ্দমা তুলিয়া বৌবাজারের বারোয়ারীর পাণ্ডাদের সকলকে সদলে জেলে পুরিবে, কিন্তু কোন প্রবীণ উকীল যখন পরামর্শ দিলেন যে 'বাপু ইহাতে তোমার মোকর্দ্দমা টিকিবে না, উপ-রন্তু অপমানের একশেষ হইবে, দোকান করিতে লজ্জা বোধ হয় তাহা ছাড়িয়া দেও,

ক্ষেপিলে লোকে আরও বেশী করিয়া ক্ষেপাইবে।'—তখন গুরুনাথ মানহানির মোকর্দ্দমা ছাড়িয়া সরস্বতী পূজায় অধিক সমারোহে সং বাহির করিতে ও ধূমধামে বারোয়ারী করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল, বাজারে রটাইয়া দিল "ধনপ্রাণ যায় যাক্ একবার উহাদের দেখিতে হইবে।" শুনিয়া বৌবাজারের দল হাসিয়া বলিল "এবার পিঁপড়ের গর্ত্ত খোঁজ করা দরকার।"—বৌবাজারের গানের ওস্তাদ নিমচাঁদ বিশ্বাস বলিল "আমরাও উতোর কাট্‌তে জানি।"

গুরুনাথের চেষ্টায় খুব ধূমধামে বড়বাজারের মধ্যে চাঁদার টাকা উঠিতে লাগিল, দোকানদারেরা লাভের উপর প্রতি টাকায় এক আনা করিয়া চাঁদা দিতে প্রস্তুত হইল, এবং কৃষ্ণনগরের কারিকর আসিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। অগ্রহায়ণ মাস পড়িতে না পড়িতে বাজারের মধ্যে সন্ধ্যাতেই বৈঠক বসিতে লাগিল, এবার কি কি রকমের সং করিতে হইবে, কাহার যাত্রারদল আনান যাইবে, এবং কয়দিন যাত্রা হইবে, খেমটা ও কবির দল বায়না করা সুবিধা হইবে কিনা, বৈঠকে তাহারই আলোচনা চলিত। উৎসাহ উদ্দীপনা, উত্তেজনার অন্ত নাই,—সকলে সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "ধন্য গুরুনাথ বাবু, না হবে কেন, জমীদারের ছেলে, দুদিনের মধ্যে বাজারটাকে সরগরম ক'রে তুলেছে।

সরস্বতী পূজার তিনদিন পূর্ব্ব হইতেই বাজারের শ্রী ফিরিয়া গেল। বাজারের প্রবেশ পথে এক প্রকাণ্ড গেট, গেটের উপর নহবৎখানা বসিয়াছে, তাহার উপরিভাগ লাল টুলের কাপড়ে ঢাকা, উপরে লাল নিশান উড়িতেছে, সকালে ও সন্ধ্যাকালে শ্যামনগরের রশুন চৌকীদল এই নহবৎখানায় বসিয়া আপনাদের গুণপনা দ্বারা পল্লীবালকদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। শানাই মিষ্ট নহে, এবং ঢোলকের স্বর ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বাজনা শুনিবার জন্য সমস্ত গ্রামের ছেলেরা বাজারে আসিয়া জুটিয়াছে, কারণ এমন উৎসব সচরাচর ঘটে না!—বাজারের মধ্যে চাটায়ের টাপোর তোলা হইয়াছে, তাহার নীচে সাদা চাঁদোয়া, লালঝালোর, মধ্যে একটা জায়গাতে লাল কাপড় দিয়া চাঁদোয়ার মালিকের নাম ও সন তারিখ লেখা, চাঁদোয়ার নীচে কতকগুলি বেল ও ঝাড় ঝুলিতেছে, চারিদিকে বাঁশের খুঁটি মৃত্তিকানুলিপ্ত দেহে স্তম্ভাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে লাল কাপড় ও সোনালি জগজগা জড়ানো, তাহার গায়ে একটা করিয়া দেয়ালগিরি আঁটা এবং প্রত্যেক দেলগিরির নীচে এক একখানা আর্ট ষ্টুডিও কিম্বা বিলাতি ছবি শোভা পাইতেছে, কিন্তু ছবি টাঙ্গানোর মধ্যে রুচিগত সামঞ্জস্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, একটা যায়গাতে মদনভস্মের ছবি, তাহার পরই হয়ত ইন্দ্রের নন্দন কাননের চিত্র—অত্যন্ত অশ্লীল; অনন্তর বিলাতি দম্পতীর মিলন দৃশ্য, চক্ষু ফিরাইলেই দেখা যায় তাহার পরের ছবিখানাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গোপীদের লাল নীল লাল বর্ণের বস্ত্রও ঘাগরা অপহরণ করিয়া যমুনাতীরে কদম্ব বৃক্ষে উঠিয়াছেন, গোপ কন্যাগণ যমুনাজলে আবক্ষ নিমজ্জন পূর্ব্বক যুক্ত করে উর্দ্ধদৃষ্টিতে তাহাদের হৃত বস্ত্র ফিরিয়া চাহিতেছে।—তাহার পরই একখানি বিলাতি শিকারীর ছবি

উপরে নীল আকাশ, দূরে ধূসর পাহাড়, দুইধারে শ্যাম স্নিগ্ধ বনানী, এক পাশে বঙ্কিম গিরি নদী, তীরে দুই একটা গাছ, ঘোড়ার উপর লোহিত পরিচ্ছদধারী শিকারী, তাহার হাতে বন্দুক সঙ্গে একদল কুকুর। দেখিলেই একটি উৎসাহশীল, শ্রম সহিষ্ণু স্বাধীনজাতির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের কথা মনে পড়িয়া যায় এবং তাহার পাশে ঐ ইন্দ্রের নন্দনবন, ও কৃষ্ণের বস্ত্র হরণ দৃশ্য তাহাদের রস মাধুর্য্য ও বঙ্গীয় চিত্রকর গণের সুকুমার কলা কৌশলের সহিত একেবারে মলিন হইয়া পড়ে।

আজ কাল বাজারে মনোহারী দোকানে থালি থাকের কলম ও কলমীর ছড় বিক্রয় হইতেছে, ক্রেতাগণ সকলেই দুই চারিটি করিয়া কিনিয়া লইয়া যাইতেছে, অনেকে শুধু এই কলম কিনিবার অভিপ্রায়েই দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়াছে, সরস্বতী পূজার ইহা একটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপকরণ।

সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব দিন স্কুল ও পাঠশালা দেড়টার সময় বন্ধ হইল, পূজার ফুল তুলিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে এই ছুটিটা দিয়া থাকেন, সরস্বতী পূজার ফুলের আয়োজন না করিলে কি তাহাদের বিদ্যা হইবে? তাই আজ তিনদিন হইতে ছেলেদের মধ্যে পরামর্শ হইয়াছে কোথায় কোন দল ফুল সংগ্রহ করিতে যাইবে এই দিন কোন কোন দল ফুলের সন্ধানে দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতেও সঙ্কুচিত হয় না। ছুটী হইবামাত্র ছেলেরা বাড়ী হইতে কেহ সাজী, কেহ ডালা কেহ বা একটা ধামা লইয়া পুষ্প সংগ্রহে বাহির হইল; অন্যান্য ফুলের মধ্যে পলাশ, কাঞ্চন ও গাঁদাফুল এ সময় খুব বেশী পাওয়া যায়, পল্লীগ্রামে প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই দুপাঁচটা গাঁদাফুল গাছে থাকে কিন্তু বাড়ীর ফুল তুলিবার জন্য কেহ ব্যস্ত হইল না, সেত ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যাইবে, তাই সকলে মল্লিদের চারা বাগানে পলাশ ও কাঞ্চন ফুলের আশায় ছুটিল, যাহারা গাছে উঠিতে জানে তাহারা কোমর বাঁধিয়া গাছে উঠিল, অনেকে নীচে হইতে কুড়াইতে লাগিল; ফুল পাড়া হইলে তাহা কয়েক ভাগে বিভক্ত হইল, যাহারা গাছে উঠিয়াছিল তাহারা অবশ্য কিছু বেশী পাইল।

ফুল পাড়া হইলে ছেলেরা বক্সিদের বাগানে ফুলের সন্ধানে চলিল, দেশী কুলের গাছ সকল বাড়ীতেই আছে, কিন্তু তাহার জন্য কাহারো বড় আগ্রহ নাই, কিছু নারিকেল কুলের জন্যই সকলের চেষ্টা। সরস্বতী পূজা হয় নাই বলিয়া অনেক নিষ্ঠাবান বালক এ পর্য্যন্ত কুল আস্বাদন করে নাই, কারণ অধিকাংশ পল্লী বালকই সরস্বতীকে ভোগ না দিয়া কুল ভক্ষণ দোষাবহ বলিয়া বিবেচনা করে, এবং সরস্বতী পূজার পূর্ব্বে কোন বালককে কুল খাইতে দেখিলে অনেক ঠাকুরমা তাঁহাদের নাতিদের 'বেসবৎ' বলিয়া তিরস্কার করিয়া করিয়া থাকেন। তবে যাহারা নিতান্ত লোভ পরবশ হইয়া উক্ত ফলের রসাস্বাদন করে তাহারা তাহা খাইবার পূর্ব্বে সরস্বতী দেবীকে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কুল দান করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়, কেহ পাঁচগণ্ডা কেহ দশগণ্ডা কেহ বা একপণ দিবে এরূপ প্রতিজ্ঞা

করে। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে একদল ছেলে একঝাঁক পঙ্গপালের মত বক্সিদের বাগানে গিয়া পড়িল, কেহ ঢিল ছুড়িয়া, কেহ জামালকোটা বা চিতের ডাল ছুড়িয়া এবং কেহ কুল গাছের নাতিস্থূল শাখাতে ঝাঁকড়া দিয়া কুল পাড়িতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেরা দেখিল দুই একটা গাছে বুলবুলের দল উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া বসিতেছে ও রসপূর্ণ সুপক্ক কুলে চঞ্চুর আঘাত করিতেছে, দেখিয়া তাহাদের রসনা সিক্ত হইয়া উঠিল, তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র শিশুহস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বলিতে লাগিল :—

"বুলবুলি মোর কাকা
কুল ফেলে দে পাকা।"

কিন্তু বুলবুলি তাহাদের এই সকল লুব্ধ শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের আগ্রহ পূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিবার পূর্ব্বেই তাহারা সভয়ে দেখিতে পাইল বাগানের মালী দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া শক্ত গালাগালি দিতে দিতে একহাতে একটা হুঁকা ও অন্য হাতে একগাছা মোটা লাঠি হইয়া তাহাদের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে, দেখিয়াই ছেলেরা 'বেড় বাতাড়' ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। একটি ছেলে সরস্বতীকে একপণ কুল দানের প্রতিজ্ঞা করিয়া ইতিপূর্ব্বে কুল খাইয়াছে, আজ সে বারো গণ্ডার বেশী সংগ্রহ করিতে পারে নাই, একদিকে মালীর লাঠির ভয়, অন্যদিকে মা সরস্বতীর অভিসম্পাতের আশঙ্কা, বালক কাঁদ কাঁদ হইয়া তাহার সঙ্গীগণের নিকট দুর্পাচটা করিয়া কুল ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না কারণ গোবিন্দপুর ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহে নারিকেলকুল বড়ই দুর্ল্লভ সামগ্রী। ভগ্নমনোরথ হওয়াতে বালকের চক্ষু প্রান্তে অশ্রু উছলিয়া উঠিল, তখন অপেক্ষাকৃত বয়সবৃদ্ধ কূট বুদ্ধি সম্পন্ন একটি বালক তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল "তুই কাঁদিস্ কেন, মা সরস্বতীকে একপণ কুল দিতে চেয়েছিস্, এক পোনই নারকেলকুল দিবি তাতো আর বলিস্নি, বারোগণ্ডা দেশী কুল দিয়ে একপণ পুজিয়ে দিস্।"—বিপন্ন বালক অকুল সাগরে কুল দেখিতে পাইল, সে চক্ষের জল মুছিয়া সঙ্গীগণের সঙ্গে বাড়ী ফিরিল।

আজ রাত্রেও তাহাদের নিদ্রা নাই। চতুর্থীর চন্দ্র দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকারে আবৃত করিয়া অস্ত গেল, ছেলেরা পাত্র সমেত ফুলগুলি কেহ ঘরের চালে, কেহ ছাদের উপর, কেহ বা সিমের টালের উপর নীহারে রাখিয়া নৈশ পুষ্পচয়নে বাহির হইল।

গ্রামের মধ্যে নিমাই বৈরাগী ও বলরাম সরকার গুরুমহাশয়ের উপরই ছেলেদের অধিক আক্রোশ। নিমায়ের অপরাধ তাহার আখড়ার যে সুপরিস্কৃত তকতকে আঙ্গিনা খানিতে তুলসী মন্দির আছে তাহারই চারিদিকে অনেকগুলি গাছে অপর্য্যাপ্ত 'কাশির গাঁদা' (চন্দ্রমল্লিকা) ফুটিয়া চারিদিক আলো করিয়া থাকিত, সকালে সন্ধ্যায় অনেক ছেলের দৃষ্টিই সেই ফুলগুলির উপর পড়িয়াছিল, কিন্তু নিমাইয়ের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহারা কোনদিন এই ফুল তুলিতে পারে নাই; নিমাই এই ফুলগাছগুলিকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক যত্ন

করিত, এবং বসন্ত কালের প্রফুল্ল সন্ধ্যায় এক একদিন দক্ষিণ দিক হইতে ঈষদ্দুষ্ট মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া যখন তুলসী মঞ্জরীর ও পাটল এবং পীত কোরক বিশিষ্ট এই সকল গাঁদার অতি মৃদু অথচ মনোহর সুগন্ধ আহরণ পূর্ব্বক তাহার সুপরিচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র আখড়াখানিকে একটী মিশ্র সৌরভ প্রবাহে আকুল করিয়া তুলিত তখন সেই কৌপিনবহির্ব্বাসধারী, মুণ্ডিত মস্তক, 'রাধাকৃষ্ণ চরণ্য ভরসা' ছাপচর্চ্চিত-দেহ নিমাই চাঁদ আপনার ক্ষুদ্র আখড়াখানিকে বৃন্দাবনস্থ কোন কুঞ্জ কাননের অনুরূপ বলিয়াই মনে করিত এবং অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র কায়া তরঙ্গিনী বৃন্দাবন-প্রান্তবাহিনী কল্লোলময়ী যমুনা বলিয়া তাহার ভ্রম হইত; সে ভক্তি গদ্গদ চিত্তে একটি ক্ষুদ্র মৃৎ প্রদীপ লইয়া তাহার উপাস্য দেবতা সেই তুলসীমঞ্চের পাদ দেশে স্থাপন পূর্ব্বক 'রাধারাণী কি জয়' বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ লুটাইয়া পরম ভক্তি ভরে প্রণিপাত করিত ও অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞানে সেই ধূলি—মস্তক, কণ্ঠ এবং ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত, গ্রামের ছেলেরা নিমাইয়ের এই ভক্তি বিহ্বলভাব তেমন অনুকুল চক্ষে দেখিত না, আজ সরস্বতী পূজার পূর্ব্বাহ্নে তাহারা তাহার সাধের পুষ্প কানন লুণ্ঠন করিতে কৃতসংকল্প হইল।

অধিক রাত্রে গ্রামস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে তাহার আকড়ার সমস্ত ফুল অপহরণ করিয়া একদল অপেক্ষাকৃত সাহসী, সবলকায় পল্লীবালক প্রাচীর লাফাইয়া বলরাম সরকারের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, বলরাম ও তাহার পরিবারবর্গ তখন নিদ্রামগ্ন, কিন্তু তাহার ঘরের বারান্দায় একটা কালো কুকুর শুইয়া সমস্ত রাত্রি তাহার বাড়ী পাহারা দিত। এই সঙ্কুচিত অনধিকার প্রবেশকারীগণকে দেখিয়া সে ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিল, সুতরাং বালকেরা সুস্থিরচিত্তে অধিকক্ষণ সেখানে পুষ্পচয়নে সাহস করিল না, তাহারা ত্রস্তহস্তে একে একে সমস্ত গাঁদা ফুলের গাছ উৎপাটন করিয়া লইয়া সেখান হইতে নিঃসারিত হইল, তাহার পর পথে আসিয়া গাছ হইতে সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া সরকারের গৃহপ্রান্তবর্ত্তী একটা পচা পুকুরে সে গুলি উল্টা করিয়া পুঁতিয়া চলিয়া গেল; পরদিন সকালে গুরু মহাশয় তাঁহার বাগানের দুরবস্থা দেখিয়া কিরূপ সন্তপ্ত হইবেন তাহাই কল্পনা করিয়া তাঁহার সুগুরু চপেটাঘাত পীড়িত পড়ুয়াগণের প্রতিহিংসাবৃত্তি কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল।

রাত্রি শেষ হইয়াছে, অল্প অল্প অন্ধকার আছে এমন সময় জেলেপাড়া ও গোয়ালাপাড়া হইতে সুপ্তোত্থিতা জেলেনী ও ঘোষানীগণের কলরব উঠিতে লাগিল। মেছুনীরা মাছের ঝুড়ি কাঁকে লইয়া এবং ঘোষানীরা দধির ভাঁড় লইয়া গ্রামের বড় লোক ও গৃহস্থ বাড়ীতে 'সাইত' করিতে বাহির হইল। 'সাইতের' কথাটা আমাদের নাগরিক পাঠকবর্গের নিকট একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। শ্রীপঞ্চমীর দিন অতি প্রত্যুষে আমাদের পল্লী অঞ্চলের মেছুনী ও ঘোষানীরা অনেক বাড়ীতেই মাছ এবং দধি উপহার দিয়া যায়, ইহাকেই তাহারা 'সাইত' করা বলে। সরস্বতী পূজার দিন ইলিস মাছ ভক্ষণ পল্লীগ্রামের অনেকেই একটা সুলক্ষণের কাজ বলিয়া মনে করে, সেইজন্য অনেক মেছুনী বহুদূরস্থ

পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান হইতে ইলিশ মাছ সংগ্রহ করিয়া তাহা 'সাইতে' লাগায়, এবং যাহারা 'ইলিশ' মাছে 'সাইত' করে তাহাদের লভ্যও কিছু বেশী হইয়া থাকে। বাজারে সেই ইলিসের দাম দশবারো পয়সার বেশী নয়, সেই মাছ দিয়া 'সাইত' করিলে ইহারা নগদ আট গণ্ডা পয়সা কি একখানা কাপড় পায়। পল্লীগ্রামের নিম্ন শ্রেণীর রমণীগণ শুভ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াও কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির প্রলোভনে যে উপহার দান করিয়া যায় তুচ্ছ হইলেও সেকালের মহোদয় বৃদ্ধগণ তাহা পরম পরিতোষ সহকারে গ্রহণ করিতেন, এবং পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন, সেকালে দেখা যাইত, শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালে কাহারো ঘরের চালে পাঁচটা মাছ গোঁজা রহিয়াছে, রান্নাঘরের কুলুঙ্গীতে কাতারে কাতারে দৈ, শেষরাত্রে আসিয়া গৃহস্থ কাহারো সাক্ষাৎ না পাইয়া মেছুনী ও ঘোষাণীরা এই সকল জিনিস 'সাইত' করিয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া সেই সকল জিনিষ দেখিয়া কর্ত্তা গিন্নির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, গিন্নি সেই ইলিশ মাছের কপালে 'তেল সিঁদুর' দিয়া, নূতন কস্তাপেড়ে কাপড় পরিয়া শুদ্ধাচারে রৌদ্রোত্তাপিত প্রাঙ্গণে বসিয়া তাহা কুটিতে আরম্ভ করিতেন, কারণ প্রথম দিন ইলিশ মাছের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইহাই লৌকিক নিয়ম। কর্ত্তা হাসিমুখে ছেলেদের আমোদ দেখিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে ইলিশমাছ দাত্রী মেছুনী আসিয়া কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া স্পর্দ্ধাভাবে বলিল "ইলিশমাছ দিয়ে আজ সাত করেছি, আজাই—একখান গরদ চাই।"—কর্ত্তামহাশয় সহাস্যে উত্তর করিলেন "পচামাছ দিয়ে তোর কাপড় চাইতে লজ্জা করে না।" আর কোথা যাবে!—মেছুনী মাথা নাড়িয়া বলিল "এত আর মুখের কথা নয় আজাই, সে কি এখেনে, পনেরো ক্রোশ জমী হেঁটে আমাদের বলাই মোষকুণ্ডি হ'তে কাল রেতের বেলা মোটে পাঁচটি মাছ এনেছে—এখনকি আর ইল্‌সে জালে পড়ছে? আগুনের মত দাম।"—কর্ত্তা বলিলেন "যা আর বক্তৃতে কর্ত্তে হবে না, ও বেলা আসিস, তোর কপালে যা আছে পাবি" বৈকালে তাহার একখানি লালপেড়ে নূতন সাড়ী লাভ হইল। এইরূপ দানে দাতার মনের প্রসন্নতা গৃহিতার আনন্দ অপেক্ষা অল্প হইত না। কিন্তু একালে এরূপ সাইতের প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে, আগে যে বাড়ীতে পাঁচ জন লোক 'সাইত' করিতে যাইত, এখন সেখানে এক জনও যায় কি না সন্দেহ। গ্রামস্থ ভদ্র সম্প্রদায় ও ইতর লোকের মধ্যে পূর্ব্বে যে অনেকখানি ঘনিষ্ঠতা এবং সখ্যভাব ছিল, পরস্পরের সুখ দুঃখে তাহারা যে পরিমাণে সহানুভূতি প্রকাশ করিত—তাহা একালে অত্যন্ত দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের গ্রামের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী বিজ্ঞবর বামাচরণ বাবু বলেন যে poverty এবং material resources এর অভাবই তাহার কারণ. কিন্তু সত্যরঞ্জন বাবু সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে morality সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত lofty idea আমাদের educated societyর মধ্যে Grow up, করাতেই ছোট লোকগুলার সঙ্গে ভদ্রলোকের প্রীতিবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। যেদিন এই বিষয়ের আলোচনা চলে, সেদিন সেখানে পাড়ার উচিত বক্তা সাধারণের সর্ব্ববাদী সম্মত ঠাকুর্দ্দা

গাঙ্গুলী মহাশয় দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি এই উভয় ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোরা ইংরেজী বিদ্যে শিখেছিস, সভা ক'রে দেশের দুঃখ দূর কর্ত্তে চাস, আর খবরের কাগজে সেই কথা ছাপিয়ে বাহাদুরী নিস্; আমাদের সেকালে সভাও ছিলনা, খবরের কাগজও ছিলনা, ইংরেজী বিদ্যেটাত দেশের বাহিরে পড়েছিল, কিন্তু গাঁয়ের দশজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ প্রণয় ছিল, বিপদে সম্পদে তারা বুক দিয়ে এসে পড়তো, আর তোরা এখন সাধারণ লোকের সঙ্গে আলাপ আপ্যাত রাখা মহাপাতক ব'লে মনে করিস। ঘরের পাশে ঘর রামচরণ মণ্ডলের, সে পাঁচ দিন না খেতে পেয়ে উপোস কল্লেও তাকে একটি কথা জিজ্ঞেসা করিসনে, কিন্তু বিলাতে দুর্ভিক্ষ হ'লে তোদের চোখ্ দিয়ে জল পড়ে—তোদের দশা হবে কি?"

* * * *

শ্রীপঞ্চমীর দিন অতি প্রত্যুষে বড়বাজারের নহবতের সানাই ধ্বনিতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বালকগণ শয্যা ত্যাগ করিয়াই পূজার আয়োজন আরম্ভ করিল; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তিগণ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছুরী দিয়া লম্বা লম্বা থাক ও কলমীর ছড় কাটিয়া কলম বাড়িতে লাগিল। আম্র মুকুল ও যবশীর্ষ সরস্বতী পূজার অত্যাবশ্যক উপকরণ, পুষ্পচয়নে ব্যস্ত থাকাতে পূর্ব্বদিন যাহারা উক্ত দুই দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই তাহারা আম্রকানন ও নদীতীরবর্ত্তী শস্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, কিন্তু যবশীর্ষ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, যবশীর্ষের পরিবর্ত্তে এক এক গোছা গোধূমশীর্ষ সঞ্চয় করিয়া আনিয়া মধুর অভাব গুড়ে মিটাইতে বাধ্য হইল।

পূর্ব্বকালে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই 'ঝিউনীর' কালীপূর্ণ দু পাঁচটা কালো মাটির দোয়াত থাকিত, সেগুলি দেখিতে প্রস্তর নির্ম্মিত দোয়াতের মত, তাহাদের গঠনও বিচিত্র, কোনটা চতুষ্কোণ, তাহার উপরে তিন চারিটা ঝুঁট, কোনটি গোলাকার, দুই একটা দোয়াতের সঙ্গে একটা ছোট কুঠুরী, তাহাতে বালি রাখিবার নিয়ম ছিল কারণ সেকালে একালের মত ব্লটিং কাগজের চলন হয় নাই। মাটির দোয়াত যাহাতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে না পারে এজন্য অনেকে দোয়াতের উপর পুরু করিয়া মাটির প্রলেপ দিত, এবং পূর্ব্বকালে দুইটা হইতে ছোট হইলে চারি পাঁচটা পর্য্যন্ত দোয়াত এক পয়সায় কিনিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু একালের কুম্ভকারেরা এই দোয়াত প্রস্তুত করা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে কাচের দোয়াত, শক্ত চীনামাটির দোয়াতগুলির যুগও অতীত হইয়াছে। সরস্বতী পূজারদিন সকালে উঠিয়া এই দোয়াত ধোয়া ছেলেদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

একটু বেলা হইলে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে স্নান করিয়া আসিল, মাঘের প্রবল শীত, তাহার উপর বাতাস বহিতেছে, কাহার সাধ্য বেশীক্ষণ জলে থাকে? এই প্রবল ঋতুতে ছেলেদের জলক্রীড়াটা অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

নয়টা বাজিতে পুরোহিত মহাশয় তাঁহার চিরাভ্যস্ত প্রণালীতে লাল বনাতের নীচে সাদা চাদর দ্বারা সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া গৃহস্থ বাড়ী প্রবেশ করিলেন, বড়বাজারের বারোয়ারী পূজাতে আজ তাঁহাকেই পৌরহিত্য করিতে হইবে, তাই তিনি সকল যজমান বাড়ীতেই কিছু বেশী রকম তাড়াতাড়ি করিতেছেন, বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার সিন্দুর ও চন্দনরাগচর্চ্চিত কাঁঠালের কাঠের কালো পুরাতন পৈত্রিক বাক্সটা জমা খরচের খাতা পত্র সমেৎ বাহির করিয়া দিলেন, একখানা পীড়ির উপর তাহাই সরস্বতী দেবীর স্থান অধিকার করিল, ছেলেরা দুদিন কাল লেখা পড়ার হাত হইতে অব্যহতি লাভের অভিপ্রায়ে তাহাদের শ্লেট, কথামালা, হস্তাক্ষরের খাতা এবং শিশুবোধক হইতে সীতার বনবাস, কবিকঙ্কনের চণ্ডী, কাশীদাসী মহাভারত, এমন কি ফার্ষ্ট বুক খানা পর্য্যন্ত সেই বাক্সর উপর চাপাইয়া দিল। বাক্সের সম্মুখে দোয়াতগুলি সাজানো, তাহার ভিতর দুধ গঙ্গাজল ঢালা, এবং খাকের কলম আমের মুকুল, যবের শীষ, ও গাঁদার ফুলে সেই সকল দোয়াতের মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ আর লেখা পড়ার কাজ নাই, দোয়াত কলমের ছুটি, পুরাতন কালি সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে; হটাৎ কাহারো কিছু লিখিবার আবশ্যক হইয়া পড়িলে একটা ঝিনুকে একটু আলতা গুলিয়া নূতন কঞ্চির কলমে কার্য্যোদ্ধার হইতেছে।

হাতে অনেক কাজ বলিয়া পুরোহিত মহাশয় 'নমো নমো' করিয়া সংক্ষেপে পূজা সারিলেন, তাহার পর 'অঞ্জলি' দিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন, এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু খাইতে না পাইয়া ছোট ছোট ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিতার তাড়নায় ও সরস্বতীকে অঞ্জলী না দিয়া খাইলে বিদ্যা হইবে না এই ভয়ে এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল; পুরোহিত মহাশয় অঞ্জলী দানের জন্য আহ্বান করিবামাত্র বিলম্ব না করিয়া কেহ ময়ূরকণ্ঠি, কেহ চেলী, কেহ ধুপছায়া বা গরদের ধুতি পরিয়া দোবজা গলায় ফেলিয়া সরস্বতীর সম্মুখে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল, এমনকি তিন চারি বৎসরের ছোট ছেলেগুলি পর্য্যন্ত তাহাদের দাদাদের দেখাদেখি অঞ্জলী দিতে আসিল, সকলে আসিয়া অঞ্জলী ভরিয়া ফুল লইয়া দাঁড়াইলে, পুরোহিতের শিক্ষামত সমবেত কণ্ঠে তাহারা বলিতে লাগিল :—

"সরস্বতৈঃ নমোনিত্যং ভদ্রকালী কপালিনী
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ
এষ পুষ্পাঞ্জলী সরস্বতৈঃ নমঃ।"

ভক্তবৃন্দ সেই বাক্স ও পুস্তক-বেশিনী সরস্বতীর উপর এক একবার করিয়া তিনবার অঞ্জলীপূর্ণ পুষ্প নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সকলে নত মস্তকে প্রণাম করিবার সময় পুরোহিতের কথার প্রতিধ্বনি পূর্ব্বক স্থর করিয়া বলিতে লাগিল;

বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।"

পুরোহিত চলিয়া গেলে ছেলেরা জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত হইল, সরস্বতীর খাতিরে

যাহারা এতদিন কুল খাইতে পায় নাই, তাহারা খুব ঘটা করিয়া কুল খাইতে লাগিল, অনেকে শুধু কুলে সন্তুষ্ট হইল না "কুল সব্‌রে" করিবার প্রলোভন তাহাদের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সেকালের অনেক জিনিসের মত "কুল সব্‌রে" জিনিসটাও একালে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু এক সময়ে ইহা পল্লী বালকদিগের বড়ই মুখরোচক জিনিস ছিল, তাহারা 'সব্‌রে', করিবার উদ্দেশ্যে পাড়া হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সব্‌রে পাতা (সলুপ) লইয়া আসে, এই ক্ষুদ্র গাছগুলি কোন বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দিগের জানা থাকিতে পারে, ইহা দেখিতে কিন্তু সূক্ষ্মপত্র বিশিষ্ট 'জোয়ানের' গাছের মত, এবং সেইরূপ ক্ষুদ্র, অনেক সময় এই উভয় গাছের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু পল্লীবালক ও পল্লীযুবতীগণ জোয়ান ও সব্‌রে গাছের প্রভেদ সহজেই ধরিতে পারে। কুল গুলি ছেঁচিয়া বা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রথমে পাথরের বাটিতে রাখা হয়, তাহার পর তাহাতে তেল, লবণ, মরিচ ও সব্‌রে পাতা মিশাইয়া গামছা বা বস্ত্রখণ্ডে ঐ পাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাহা ক্রমাগত ঝাঁকাইতে থাকে—এই সময়ে ছেলে মেয়েরা সমস্বরে একটি ছড়া বলিতে থাকে, এই ছড়াটির উদ্দেশ্য কি তাহা নির্দ্দেশ করা শক্ত, এবং তাহার মধ্যে এত খানি সুরুচির আভাস নাই যাহা আমি অসঙ্কোচে আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারি, কিন্তু আমার বর্ণনা পাছে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এই অশঙ্কায় আমি সে ছড়াটির এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি ;—

"কুল সবরে হ'লো
ধোপা মাগী ম'লো
ধোপা মাগীর কাঁধে ঘা
তেল নুন দিয়ে চেটে খা।"

ছেলেরা 'কুলসবরে' লইয়া ব্যস্ত কিন্তু তাহাদের মা দিদিমাদের আর বিশ্রাম নাই, একেত আজ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কিছু গুরুতর আছে—তাহার উপর কাল শীতল ষষ্ঠী অগ্নি স্পর্শ করিতে নাই, ভাত ব্যঞ্জন সমস্ত আজ রাঁধিয়া রাখিতে হইবে, বড় বড় গৃহস্থ বাড়ীতে তিন বেলার রান্না এক একটা যজ্ঞির ব্যাপার"—তাহা রাঁধিতেই তাঁহাদের রাত্রি দুপর অতীত হইয়া যায়।

বাজারের বারোয়ারী তলায় আজ আর উৎসাহের অন্ত নাই, গ্রামের যত ছেলে আহারাদির পর সেখানে জুটিয়া জটলা বাধাইয়াছে। এই বারোয়ারী পূজার ঘরখানি বৎসরের অন্যান্য সময় মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়াতে ঈশ্বর নন্দীকে দোকান করিতে দেওয়া হয়—আজ কয়দিন হইতে ঈশ্বরকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া সরস্বতী ঠাকুরাণী অম্লানভাবে সেই স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অর্চ্চনার জন্য তাঁহার এই পণ্যশালাবর্ত্তী সাধক গণের আজ সহসা যে পরিমাণেই নিষ্ঠা জন্মাক, প্রকৃত পক্ষে বাল্যকাল হইতেই তাহারা তাঁহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি আজ বাজারের এত আয়োজন দেখিয়া সেই সকল

বিত্তশালী জমীদারাদের কথা মনে পড়ে যাহারা আজীবন বিমাতাকে কষ্ট দিয়া তাহার মৃত্যুর পর অনেক ধুমধামে তাঁহার শ্রাদ্ধ করে, এই কৃত্রিম আড়ম্বরে স্বর্গগতা জননী প্রসন্না হন কি না জানিনা, কিন্তু লোকের মুখ হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলে। দেবীর লোহিত পদতলে এক বৃহৎ রক্তোৎপল, হস্তে মৃণ্ময় বীণা, সর্ব্বশরীর ডাকের সাজে সজ্জিত, গলদেশে কৃত্রিম মতির মালা, এবং মস্তকে বৃহৎ তারের মুকুট, দুই পাশে রক্তাধরা সখীযুগল, সম্মুখে কতকগুলি দোয়াত কলম খাতা পত্র ও একটি বৃহৎ মঙ্গলঘট সংস্থাপিত রহিয়াছে, তাহারই উপরে অঞ্জলী প্রদত্ত পুষ্পরাজি বিশৃঙ্খলভাবে বিরাজ করিতেছে।

পাশে আর একটা ঘরে কতকগুলি সং, সে ঘরের দ্বার আজ রুদ্ধ, পাওারা আজ রাত্রে নাচ গানের আয়োজন লইয়াই ব্যস্ত তাই আজ তাহারা সং দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু ঝাঁপের ফাঁক দিয়া বালক বালিকাগণের কৌতুহল পূর্ণ কৃষ্ণনেত্রতারা সেই সকল নয়নানন্দকর মৃণ্ময় মূর্ত্তি সন্দর্শনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিতেছে।

পল্লী অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমীর দিন 'কাচ কাক' দেখিবার জন্য মাঠে যাইবার একটা রীতি আছে, এটা রাজপুত জাতির আহোরিয়ার মত, আহোরিয়ার দিন বরাহ শিকার করিতে পারিলে রাজপুতেরা যেমন তাহাদের সমস্ত বৎসরের শুভ সূচনা করে, পল্লীবালকগণ এমন কি বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত এই দিন 'কাচ কাক' দেখিলে সম্বৎসর শুভদায়ক হইবে বলিয়া সেইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে।

তাই বেলা পড়িতে না পড়িতে বালকেরা, যুবকেরা, বৃদ্ধেরা দলেদলে স্ব স্ব শীতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মাঠের দিকে ধাবিত হইতেছে, প্রান্তরস্থ প্রত্যেক বৃক্ষে, দূর আকাশের দিকে সর্ব্বদা তাহাদের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ঘুরিতেছে, যদি দৈবাৎ একটা 'কাচকাক' তাহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। নববসন্ত সমাগত প্রায়, শীতের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত মৃদু, এবং জ্যোতিহীন সান্ধ্য তপনের পীত রৌদ্র বাসন্তী লক্ষ্মীর প্রসারিত অঞ্চলের ন্যায় শোভাময়, ফল পুষ্প সমন্বিত, বিপুল প্রান্তর বক্ষে হৈমরাগ বিস্তার করিতেছে, এমন সময় কোথাহইতে সহসা একবার ঈষদ্দুষ্ট বায়ু প্রবাহে নববসন্তের প্রণয় রাগানুস্ফুরিত আবেগ চঞ্চল নিশ্বাসের মত আম্র মুকুলের সৌরভ এবং তরুশাখাশীন বিহঙ্গমকুলের মধুর হর্ষকাকলী বহিয়া আনিয়া মুক ধরণীর সুপ্তবক্ষে নবাগত যৌবনের সুখস্বপ্ন ঘোষণা করিয়া গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শান্ত স্থির, ক্রমে সূর্য্যের কনককান্তি শূন্যে বিলুপ্ত হইল, আকাশের অতি উচ্চে দুই একটি পক্ষী তখন পর্য্যন্ত দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভাসমান রহিয়াছে, অদূরবর্ত্তী শাল্মলী শাখায় বিকশিত পুষ্পস্তবকের মধ্যে বসিয়া একটা কোকিল স্তব্ধ, উদার, ধূসর সন্ধ্যায় আপনার উন্মত্ত হৃদয়ের উচ্ছাস সমাকুল কুহুস্বরে চরাচর ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। ক্রমে শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকণা ঊর্দ্ধাকাশ হইতে অনতি উজ্জ্বল সৌম্য রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া ধরাতল ধৌত করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হইল দেখিয়া আবাল বৃদ্ধ সকলে প্রান্তর প্রান্ত হইতে গৃহমুখে

প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আজ রাত্রে বারোয়ারী তলায় মধু কানের গান হইবার কথা আছে, তাই বিভিন্ন গ্রাম হইতে অনেক লোক গোবিন্দপুরে যাত্রা করিয়াছে, সেই সকল যাত্রীর মধ্যে হইতে একজন মেঠোসুরে গাহিয়া উঠিল :—

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি,
ওহে ভক্তি-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা সতী
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী মন ধেনুরে বশ করি
তিষ্ঠ মম হৃদি গোষ্ঠে কৃষ্ণ মম এই মিনতি।
ধরহে ধর জনার্দ্দন মম পাতক গোবর্দ্ধন
কামাদি ছয় কংশচরে ধ্বংশ কর সম্প্রতি।
মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দা গোপ নারী
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী ;
আমার প্রেমরূপ যমুনা কুলে আশাবংশীবট মূলে
স্বদাস ভেবে সদয়ভাবে সদা করহে বসতি ;
যদি বল রাখালের প্রেমে বন্দী আছে ব্রজধামে
এই জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথী।"

ভক্ত গায়ক দাশরথীর এই সঙ্গীত পল্লীযুবকের তানলয়বিহীন, অমার্জ্জিত, অশিক্ষিত কণ্ঠ নিঃসৃত হইয়া ম্লান চন্দ্রিকা পরিব্যাপ্ত শ্যামল শস্য পরিপূরিত পাণ্ডুর প্রান্তর প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

অন্যদিকে দূরে রাজ নগরের কাঁচা শরাণের উপর দিয়া ধূলি উড়াইতে উড়াইতে একখান গরুর গাড়ী ভার ক্লিষ্ট চক্র শব্দে অপনার মন্থর গমনের কথা ঘোষণা পূর্ব্বক গোবিন্দপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাম্রকুট ধূম্র পিপাসু গাড়োয়ান চকমকীর পাথরে ঠুকনীর ঘা দিয়াই গান ধরিল,

"মনরে কৃষিকাজ জান না
এমন মানব জমীন রৈল পড়ে
আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোনা,
কালী নামের দেওরে বেড়া ফসলে তসরূপ হবে না
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া (মনরে)
তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা।"

সুন্দরী প্রকৃতির এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া বসন্তের স্নিগ্ধ সন্ধ্যায়, সত্যই মনে হয় :—

"নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনিরে শুনি মর্ম্মর পল্লব পুঞ্জে,

পিক কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদুবায়ু হিলোল বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে
শ্যামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সর সর মর মর
কতদিকে কত বাণী, নব নব কত গাথা
অবিরল রস ধারা।"

রাত্রি দশটার পর বাজারে মধু কানের গান আরম্ভ হইল। বাজারের মধ্যেই আসর, আসরের চারিদিকে স্থানের অপ্রতুল নাই, কিন্তু গীত পিপাসু পল্লীযুবকগণ এবং বালক বালিকাবর্গ আটটার মধ্যে নৈশ আহার শেষ করিয়া আসিয়া স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের হাসি, গল্প,কলরবের বিরাম নাই। ক্রমে শ্রোতাগণের ভীড় বাড়িতে লাগিল, যাত্রাওয়ালার একে একে আসরে আসিয়া বসিল, এবং যাত্রা আরম্ভ সূচক ঘন ঘন ডুগি ও মন্দিরা শব্দ উত্থিত হইল। গোবিন্দপুরের অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ রমণীগণ ময়লা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া প্রতিবেশিনী বর্গের সহিত সারি বাঁধিয়া আসিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে একবার সরস্বতী প্রতিমা দেখিয়া যাইতেছেন ও দৈবাৎ তাঁহাদের কৌতূহল দৃষ্টি উপবিষ্ট দর্শকগণের মস্তকের উপর দিয়া আসরের মধ্যে পড়িতেছে। এদিকে ঝুঁটা মতির মালা গলায় পরচুলা পরা, কপালে ও মুখে অলকা তিলকা কাটা যাত্রাদলের নকল কৃষ্ণ পায়েঘুঙুর বাঁধিয়া বাম হস্তে বংশী ধারণ পূর্ব্বক এক পা করিয়া চলিতেছে আর দক্ষিণ হস্ত ঘন ঘন আন্দোলন পূর্ব্বক বক্তৃতা দ্বারা কৃত্রিম নন্দ যশোদার পুত্র বিচ্ছেদ শঙ্কাকুল হৃদয়ে শোক শল্য বিদ্ধ করিতেছে, এবং তাহাদের সেই কৃত্রিম ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে বিস্ময়মগ্ন নিরীহ শ্রোতৃবর্গের চক্ষে অশ্রু সম্বরণ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ভাবাবেশে কোন কোন ভক্ত প্রবল বেগে 'হরি বোল' বলিয়া হুঙ্কার করিতেছে, আর শত কণ্ঠের যুগপৎ হরিধ্বনিতে বাদ্য যন্ত্রের ঐক্যতান ডুবিয়া যাইতেছে।

রাত্রি আরো গভীর হইয়াছে। সমস্ত গ্রাম সুপ্ত এবং অন্ধকারময়; শুধু বাজারের মধ্যে শত শত নিদ্রাবিজড়িত নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যাত্রা চলিতেছে, এবং একই রকম সুরে দৃশ্যের পর দৃশ্যের কাহিনী কীর্ত্তিত হইতেছে। অবশেষে উৎসব প্রাঙ্গণের আলোক রশ্মি ম্লান হইয়া আসিল, আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা বিরল হইয়া গেল, ও উষাগমের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশিত হইল, কিন্তু তখনো বিরাম নাই, তখনো সঙ্গীত সুধাশক্ত সহিষ্ণু শ্রোতাগণের মুগ্ধ চিত্ত মথিত করিয়া সদ্য মুণ্ডিত দাড়ি গোঁফ, তুলসীমাল্য বিভূষিত কণ্ঠ, পট্টাম্বর পরিহিত বৃন্দাদূতী রূপী যাত্রাদলের প্রবীণ অধিকারী পুষ্পমাল্য গ্রন্থনোন্মুখা, দীর্ঘজাগরণ ক্লিষ্টা, আসন্ন বিরহ সম্ভাবনায় ব্যথিতা, রোরুদ্যমানা বৃকভানু নন্দিনী, গরবিনী রাধিকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছিল :—

রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে
মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না জানি কার সনে'
কেন গাঁথ চিকণ মালা, ছেড়ে যাবে চিকণ কালা
শেষে কেবল ঐ মালা—জপ মালা হবে মনে ॥

* * * *

রথ লয়ে এসেছে মুনি, হ'রে নিতে মাথার মণি
স্বদন বলে বিনোদিনি ! বৃথা মালা গাঁথ কেনে !

স্বাগত ও বিদায়।

স্বাগত

আন—উষাসম হাসি, চম্পক করে
তিমিরাবরণ সরায়ে।
এস—বসন্তসম, বিশ্বময় সুগন্ধ
বর্ণ ছড়ায়ে।
আন—তৃষিত তপ্ত ভুবনে, অদূর
আষাঢ় জলদ-মন্দ্র মধুর ;
আন—নিশীথে বিপথে আশ্রম সম,
পোতনিমগ্ন তরণী।
এস,—উজ্জ্বল করি অম্বর, করি
সুন্দরতর ধরণী।
আন—শৈশব সম প্রমোদ হরষ,
যৌবন সম প্রেম-পরশ,
অন্তিমে রহ আশা সম বুকে
স্নেহে এ কণ্ঠ জড়ায়ে।

বিদায়

রেখেত যেতেছি না
তোমারে একাকী,
যা কিছু মধুর সবই
যেতেছিত রাখি।
রেখেত যেতেছি হাসি,
আশা ও আশীষ রাশি,
নিয়ে যাই দীর্ঘশ্বাস,
অশ্রুভরা আঁখি।
জীবনের প্রাণ যা, এ
রহিল পড়িয়া পায়ে ;
নিয়ে যাই শূন্য প্রাণ
—রহিল যা বাকী।

হিমালয়ে।

১

যখন ভাবিতাম যে ভারতের এত দেশ বেড়াইলাম—কোথায় কিষ্কিন্ধ্যা, কোথায় লঙ্কা—কিছুই ঠিক নাই—অথচ উত্তরপাড়ার দার্জ্জিলিংটা বাকি রহিয়া গেল—তখনই মনটা একটু খারাপ হইত। কলিকাতার "উঠান সমুদ্র" বাবু অনেক কষ্টে ৩।৪ দিনের ছুটি পাইয়া এক বার ছুটে দার্জ্জিলিং বেড়াইয়া আসেন, আর নাসিকা বিস্ফারিত করিয়া কত আষাঢ়ে গল্প, কত জোঁকের কাহিনী কত চেপ্টা নাকের কথা বলেন—শুনিয়া হাঁ করিয়া থাকিতে হয়।

দেখিলাম অগাধ জলে রোহিত মৎস্যের ন্যায় থাকিলে শফরির সহিত আঁটিতে পারা যায় না—দার্জ্জিলিং এর বরফে আমার উদয়পুর, কোটা, বুঁদি, উট্রাকামুণ্ড, কাটামুণ্ড, লাহোর, বোম্বাই এমন কি দুল্লঙ্ঘ্য সাগর পর্য্যন্ত, চাপা পড়িয়া যায়। "একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে" ইত্যাদি মনে করিয়া যদিও একটু শান্তি পাইতাম তথাপি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির সঙ্কল্প করিলাম যে হয় এবার দার্জ্জিলিং নয় "গলায় ফাঁস"। যাইবার এবং সেখানে থাকিবারও সুবিধা হইল—অতএব পাঁজি পুঁথি খুলিয়া একটা দিন দেখিয়া বিছানা-পত্র বাঁধিয়া একেবারে সিয়ালদহে উপস্থিত। কেমন করিয়া রেলে উঠিলাম—কেমন করিয়া রেল চলিল—পথে কি হইল, কি দেখিলাম, কি ভাবিলাম, ইত্যাদি বলিয়া বিংশ শতাব্দির ব্যস্ত পাঠককে আর কষ্ট দিতে চাহিনা। পদ্মার সহিত বহুকালের আলাপ ছিল (দোহাই পাঠক বাঙ্গাল ঠাওরাইবেন না !) সুতরাং তাঁহার করাল কান্তি দেখিয়া ভয়ের উদয় হইল না। জাহাজে গোয়ানিস্ খান্সামাদের হাতে উত্তম মধ্যম এক প্রকার হইল। পর দিবস প্রাতে সিলিগুড়িতে হুড়াহুড়ি—মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া বিছানাপত্র সমস্ত গার্ডের জিম্মা করিয়া দিতে হইল। এইবার খেলা ঘরের গাড়ি দেখিয়া হাসি পাইল। শত্রু মুখে ছাই দিয়া শরীর খানা একটু ভদ্রলোকের মত তাই দার্জ্জিলিং গাড়িতে উঠিবার সময় নিজেকে ঈষৎ একটু গুটাইয়া আনিতে হইয়াছিল। 'সুখনা পর্য্যন্ত গিয়া কোন সুখ পাইলাম না'—পাহাড়ের নাম পর্য্যন্ত নাই—কেবল সমতল। সুখনা পার হইয়াই "তরাই" আসিল—ক্রমে উচ্চারোহণে—অবশেষে "রংটং" দেখিয়া বোধ হইল যে হাঁ—পাহাড়েরই ঢং বটে। দুঃখের বিষয় পর্ব্বত দেখাছিল, কাজে কাজেই কোন রকম অযথা কবিতার উচ্ছ্বাস হইল না। আর সে সেঁত্সেতে বন জঙ্গল দেখিয়া বোধ হয় কাহারও কবিতা আ'সে না। অনেকে দার্জ্জিলিং যাইবার সময় রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত করসিয়ং গিয়া আট্কাইয়া থাকেন। করসিয়ংয়ের বাজার, রাশি রাশি দুষ্ট ছেলে ও কেমন একটা অলস ভাব দেখিয়া করসিয়ং যাত্রীদের সহিত মনে মনে খুব সহানুভূতি করিলাম। সন্ধ্যার সময়, অন্ধকার কন্কনে ঘুম—একদল শিশু ভিক্ষুক ও খ্যাতনামা "ঘুম ডাইনী" যাহার সৌন্দর্য্যে ফটোগ্রাফাররাও মোহিত—সবই দেখা হইল। এতদিন যে দার্জ্জিলিং আমার মত ভবঘুরেকে লজ্জা দিয়া রাখিয়াছিল ক্রমে তাহাও আসিল, অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল তজ্জন্য আর পদার্পণ করিবামাত্র কিছুই দেখা হইল না। দুর্ভাগ্যক্রমে আড্ডা লওয়া হইয়াছিল একটা দুরারোহ চূড়ার উপর। অনেক কষ্টে, অনেক হাঁপাইয়া, বাড়ি গিয়া সুস্থির হইয়া বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ আহার করিয়া—তাড়াতাড়ি একটা শয্যা রচনা করিয়া—সমস্ত রাত্রি বরফ ও লেপচা সুন্দরীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। অতি প্রাতে—এমন কি তখনও উষাদেবী "সিন্দুর বালার্ক ফোঁটা" কাটিয়া অভিসারে বাহির হন নাই, শ্রী "দ" মহাশয় পর্ব্বত দৃশ্যের বিরহে কাতর হইয়া কষ্টে লেপ কম্বলের কাছে বিদায় লইয়া আমার ঘরে আসিয়া ঘুম ভাঙ্গাইলেন—ও গবাক্ষের পরদা সরাইয়া সম্মুখে প্রশস্ত অনুরাগ

ও ভক্তির সহিত কি একটা অপরূপ সামগ্রী দেখিয়া আমাকে সোৎসাহে বিছানা হইতে টানিয়া বাহির করিলেন "দেখ জলাপাহাড় ব্যারাক্ কেমন দেখা যাইতেছে"। জলাপাহাড়ের কথা শ্রুত ছিলাম—অতএব আমিও দেখিলাম ব্যারাক বটে। কিছুক্ষণ পরেই নিম্নে বামাকণ্ঠ—অমনি তাড়াতাড়ি সজ্জাকরণ এবং অবতরণ। ভাবিলাম এত সকালে ব্যাপার কি—দার্জ্জিলিং এর এই ফ্যাশান নাকি?

দেখিলাম অনুমান ঠিক—ঘর বড় গরম বলিয়া একটু ঠাণ্ডা হাওয়া সেবন করিবার নিমিত্ত সকলে বাহির হইয়াছেন। বঙ্গকুলকামিনী স্বভাবতঃ কিছু বেশি লাজুক; ভয়ও বড় অধিক, কিন্তু পাহাড়ে শ্রীপাদ পড়িলে এক একটি যমুনা বাই ও ঝাঁন্সির রাণী হইয়া উঠেন। কলিকাতায় বা অন্য কোথাও ইহাঁদের এত নির্ভয়ে ও স্ফূর্ত্তিতে বেড়াইতে দেখা যায় না। দলে দলে বা একা কখন জলাপাহাড়, রঙ্গিত বা সেঞ্চল সর্ব্বত্রই ইহাঁদের গতি; অবশ্য অনেক সময়ে সঙ্গে দুই একটা সাক্ষীগোপাল পুরুষ থাকে বটে কিন্তু তাহারা প্রায় বিড়ম্বনা মাত্র, না থাকিলেও চলিত। পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন লেখক তাঁহাদের চিরকেলে শুভার্থী, তাঁহারা উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হন আমার ততই আনন্দ, তথাপি দার্জ্জিলিংয়ে স্বাধীনতার পোষাকটা যেন একটু বেশি জাঁকালো বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু এখন গাসওয়া হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া পাঠিকাদের কাছে বিদায় লইব। যেদিন আমরা Birch Hill হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা কুমার কুমারী প্রায় ৪০ জন পিক্‌নিক্ করিয়া ফিরিতেছিলাম সমস্ত রাস্তাটা যেন সরগরম ছিল। সে ছবি আমার অনেক দিন মনে থাকিবে। রেশমের খস্‌খস্, চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ বুটের মস্ মস্, "জনান্তিকের" ফুস্ ফুস্—অভিমানের অধর কুঞ্চন, হাসির রোল ও রাগের ভ্রূভঙ্গি—কে কত দেখিবে, রাস্তার লোক ভীত—এমন কি শুভ্রচর্ম্মধারীগণও ত্রস্ত। সে দিবস আর "ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই" ছিল না। "টেবিল উলটিয়াছিল"—জন বুল মহাশয়েরা রাস্তার এক পাশে অতি বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া আমাদের পথ ছাড়িয়া দিতেছিলেন।

কিন্তু বলিতে বলিতে কত কি কথা আসিয়া পড়িল। সেই প্রথম দিনের কথা বলি তবে। "সুপ্রভাত"—হস্ত মর্দ্দন ইত্যাদি হওয়ার পর তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ জলাপাহাড় ব্যারাক্ কি না। হাসির তুফান উঠিল 'দ' মহাশয় আমার অপেক্ষা অনেক হাল্‌কা কোন প্রকারে ভাসিয়া রহিলেন, কিন্তু আমি হাবু ডুবু খাইয়া অস্থির। ও মহলে আমার বড় প্রতিপত্তি কখনই নাই, সকলেই ঠাওরাইলেন "দ"র কোন দোষ নাই, ও কথাটায় যত পরিমাণ মূর্খতা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সমস্তই আমার। কিন্তু "প্রথম পাপী দ মহাশয়।" যাহা হউক যথাসময়ে আমরা অবগত হইলাম যে ওটা জলাপাহাড় ব্যারাক্ নহে উহার নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিবাস হিমাচল বক্ষে, পরিধান বরফ এবং সম্ভবতঃ উহারই উপর দিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব ভ্রাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী চক্ষুর সম্মুখে, জানিয়া আহ্লাদে চক্ষু ফিরাইলাম। দেখিলাম হাঁ দেবতার আবাস হইবার

উপযুক্ত বটে। একেত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নির্ম্মলতা পবিত্রতা মাখান, তায় আবার তখন প্রাতঃ সূর্য্য কিরণ পড়িয়া কি এক অতুলন সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা অজাত-যৌবনা তরুণীর ন্যায় হাসিতেছিল। আমার সাধ্য কি—ঐ দৃশ্য দেখিয়া প্রস্তর-রচিত-হৃদয়েও যে ভাবের উদয় হয় তাহা সম্যক রূপে বর্ণনা করিতে কয়জন সক্ষম ?

দার্জ্জিলিংএর সব ভাল কেবল গোটাকতক hydraulic lift থাকিলে বড় সুন্দর হইত। পাতাল হইতে এক দৌড়ে স্বর্গে উঠিবার ক্ষমতা কম লোকেরই আছে। "ভিক্টোরিয়া ফল" হইতে জলাপাহাড় যাইতে হইলে বাঙ্গালির চড়াই পাখির প্রাণ দন্ত ও ওষ্ঠের মধ্যে অবস্থান করে, বেহিসাবি কোথাও মুখ খুলিলেই খাঁচা ছাড়িয়া প্রাণ পাখি পলায়ন করে। সেই জন্য বলি lift আবশ্যক। আমি ভাবিয়াছিলাম কথাটা গম্ভীর ভাবে কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট প্রস্তাব করিব, কিন্তু বন্ধুবর্গ এত "ঠাণ্ডা জল" ঢালিলেন যে তাহাতে আর জীবনীশক্তি রহিল না। দুইমাস দার্জ্জিলিংএ থাকিয়া তথায় যাহা যাহা দেখিবার আছে সকলই দেখা হইল, কেবল অব্জার্ভেটরি হিলের উপর একটা গুহা আছে শুনিয়াছিলাম সেটা খুঁজিয়া পাইলাম না। লাউইস্ স্যানিটেরিয়ম হইয়া "গ্রীষ্ম পক্ষিদের" অনেক সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু টেব্‌ল্ ক্লথখানা একটু পরিষ্কার থাকিলেও পারে। আর বেচারাদেরই বা দোষ কি, যত গুলি বাবু প্রায় তত রকম রান্না রাঁধিতে হয়, কেহ খাইবেন কাঁচকলা ভাতে ভাত আবার কেহ মক্‌টরটল সূপ, ইহার মাঝে অবশ্য উভয়ের অনেক প্রকার ক্রম আছে, কাজে কাজেই সময়ে সময়ে সকল দিক পরিপাটী থাকে না।

এখানকার বটানিকাল গার্ডন বলিরাজার দেশ বলিয়া বোধ হয়, যতই নামি ততই শেষ পাওয়া যায় না। স্থানটি বড় রম্য বটে ও বনভোজন করিতে বেশ। কিন্তু বনভোজনের জন্য বার্চ্চহিল আরও সুন্দর স্থান ও অধিক নির্জ্জন। বড় বড় গাছের আড়ালে অভিভাবিকা মহাশয়াকে ঠকাইয়া প্রেমালাপ করিবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। গাছের গায় কত লোকের প্রেয়সীর নাম লিখা আছে তাহার ঠিকানা নাই, দুঃখের বিষয় কেবল প্রথমাক্ষর মাত্র, পুরানাম থাকিলে হয় ত অনেক ভাবুক উপন্যাসলেখক ঝুড়িঝুড়ি নভেল লিখিয়া ফেলিতেন। কথিত আছে একদিন এক প্রণয়ী যুগল একটা প্রকাণ্ড ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছের নিম্নে একেবারে বাহ্য জ্ঞানহারা হইয়া বসিয়াছিলেন—কেবল "আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন"—জগৎ সংসারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। বলা বাহুল্য এই গাছের কোলের ভিতর বসিয়া যুবক সাহস পাইয়াছিলেন ও সেই ক্ষণেই প্রথম তাঁহার ভালবাসার সামগ্রীকে বলিয়াছিলেন—যাক্ কি বলিয়াছিলেন সে কথায় কাজ নাই সকলেই তাহা বলিয়া থাকে কিন্তু ইনি একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন—"I would gladly lay down my life at your feet if—(বোধ হয় এ কথাটাও বলা প্রথা কিন্তু আমি অবগত নহি)—অম্‌নি চারিদিক্ হইতে গুড়ুম গুড়ুম। এমন সোঁ সোঁ করিয়া রাবণের চিতা জ্বলিতেছিল একেবারে সব হিম! যুবক ভাবিলেন বুঝি বন্দুক হস্তে Sordid papa! কিন্তু ভাবিবার বিশেষ সময় ছিল না। তখনই প্রস্তর

খণ্ড আসিয়া গায়ে পড়িতে লাগিল। যে প্রাণ একমুহূর্ত্ত আগে বিনা কারণে প্রণয়িনীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছিলেন দুঃখের বিষয় এখন তাহা তাঁহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দেওয়া দূরে থাকুক বাক্য ব্যয় না করিয়া তিনি সেই প্রাণ লইয়া দৌড় দিলেন। সরলা বালিকা কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রস্তর খণ্ডে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সস্নেহস্বরে পলাতককে ডাকিতে ডাকিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বালিকার ভয় বুঝি আমার তাঁর বড় আঘাত লাগিয়াছে, তাঁর কিন্তু আহ্লাদ যে প্রাণটা লইয়া কোন প্রকারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছি। উভয়ের কেহই "Beware of thc blasting" লেখা সাইন বোর্ড দেখেন নাই সৌভাগ্য ক্রমে এ প্রকার ঘটনা বিরল। কিন্তু "Frailty, thy name is woman" লেখা সত্বেও বোধ হয় অনেক সময় পুরুষ মহাশয়রাই গোড়ালি দেখান। সেই গাছটার নাম সেই পর্য্যন্ত Faithless Magnolia হইয়াছে। বেচারা গাছ এখন আর বোধ হয় দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পায় না।

দার্জ্জিলিং হইতে সেঞ্চল যাওয়া একটা ফেসন, কারণ তথা হইতে এভেরেষ্ট দেখা যায়। আমরাও জন কয়েক মিলিয়া গিয়াছিলাম—দুই খানা ডাণ্ডি ও বাকি ঘোড়া। পূর্ব্বে সে অঞ্চলে Cantonment ছিল, ভাঙ্গা ঘর পড়িয়াছে—এখন বাদুড়ের বাসা। একটা ক্ষুদ্র ডাক বাঙ্গালোও আছে, কিন্তু আহার অবশ্য লইয়া যাইতে হয় কারণ খানসামা মহাশয়ের তত দূর ক্ষমতা নাই। টাইগার হিল নামক চূড়ার উপর হইতে এভেরেষ্ট মহাশয়কে দেখিতে হয়। কিন্তু তিনি প্রায় সর্ব্বদাই মেঘের আড়ালে থাকেন, শরীরটা এত মোটা যে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে লজ্জা পান। আমাদের বড় সৌভাগ্য—মেঘ ছিল না—তীর্থ দর্শন হইল; কিন্তু এত আড়ম্বর করিয়া কেবল নাকের ডগাটি! Fashionable বন্ধুগণ শৈবাল জড় করিলেন—এটা দার্জ্জিলিংএর একটা সংক্রামক রোগ। বাড়ি ফিরিবার সময় একটা দুর্ঘটনা হইল। আমাদের সহিত সিদ্ধিদাতা গণেশের অবতার ছিলেন—দুর্ভাগ্যক্রমে অশ্বের উপর। বোধ হয় অশ্বের সহিত বড় আলাপ ছিল না। একটা ভূমিকম্প হইল—অবশেষে John Gilpin ধূলা কাদা মাখিয়া অনেক কষ্টে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন—ও বলিলেন লেডিদের একটু amuse করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া "পপাত" হইয়াছিলেন।—St. Jacob's oilএর সাহায্যে "মমার" হইতে রক্ষা পাইলেন।

দার্জ্জিলিং এর হাট্—প্রতি রবিবারে হয়, দেখিবার উপযুক্ত। বড় পরিষ্কার। গড়ায়িত দধি বা গড়ায়িত মাছের জল নাই। থট্‌থটে সুন্দর। রূপেরও অভাব নাই—সহরের মেম ও জেলার ভুটিয়ানি, লেপচানি ও পাহাড়িনি। চেপ্টা নাকে সৌন্দর্য্য আছে কি না পাঠিকারা বলিবেন—কিন্তু লম্বা নাসিকা কিছু অধিক দেখিয়াছিলাম বলিয়া নূতনত্বটা মন্দ লাগিল না। দর করিয়া ক্রয় করা একটা কৌতুক। "এ নানি অণ্ডা ছে"—নানি অমনি সসম্ভ্রমে দর বলিতে আরম্ভ করিলেন। এ রসিকতা দার্জ্জিলিং এ আসিয়া সকলেই করিয়া থাকেন। এক রূপসী ভুটিয়া রুটি বেচিতেছিল—এক পয়সার একখানা রুটিক্রয় করিতে চাহিলাম—কোন

রকমে বেচিল না। বলিল "তুমি রুটি লইয়া কি করিবে খাইবে নাত—কেন পয়সা নষ্ট কর।" ভাবিলাম বেশ দোকানদার বটে।

পূজার সময় দার্জ্জিলিং খুব সরগরম থাকে—অনেক সাহেব বাঙ্গালি পূজার ছুটি উপলক্ষে একবার দার্জ্জিলিং এ উঁকি মারিয়া যান—আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন Sanitarium তে লোকে পূর্ণ অবশ্যই ছিল—তা ছাড়া অনেক বাঙ্গালিসাহেব বাড়ি ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় ম্যালে যত না সাহেব তত বাঙ্গালি। যখনকার কথা বলিতেছি সেই বৎসর ছোটলাট বাহাদুর Shrub bery তে বাঙ্গালিদের একটা "আম" রকম পার্টি দিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ পাইতে কেহই বাকি ছিল না—সামান্য কেরাণী পর্য্যন্ত একখানা কার্ড পাইয়াছিল। আদর অভ্যর্থনাও যথেষ্ঠ হইয়াছিল। অবশ্য ছোটলাট বাহাদুর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেককেই চিনিতেন না, কাজে কাজেই শুনিলাম, "Who are you," "Where do you live," ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল। লোক বিশেষকে করমর্দ্দন বা মস্তকচালন করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সন্দেশ মণ্ডার তাঁবু দেখাইয়া দিয়া অতিথি সৎকার করা হইয়াছিল। এই পার্টি দিয়া লাট বাহাদুর যার পর নাই লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন—আর হইবারও কথা বটে। যে রাঙ্গামুখ-প্রীতি-কটাক্ষের জন্য আমরা লালায়িত সেই কটাক্ষ যদি সন্দেশ মণ্ডায় পরিণত হয় তাহা হইলে স্বর্গ "হামীনস্তো হামানস্তো, হামীনস্ত," হইয়া উঠে।

ভারতের প্রায় অনেক শৈলে চরণকমল পড়িয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আমার দার্জ্জিলিংই ভাল লাগে। সিম্‌লেটা প্রকাণ্ড বড়, হঠাৎ মনের ভিতর স্থায়ী রকম ছবি আঁকা যায় না, তা ছাড়া সিম্‌লায় লোকসমাগম বড় বেশি—শ্রান্তি দূর করিতে আসিয়া হাঁপাইতে হয়। নাইনিতলের যা কিছু হ্রদ—হ্রদ বাদ দিলে কৃতজ্ঞ হইবার জন্য বিশেষ কিছু থাকে না। উটাকামুণ্ডর প্রধান গুণ গাড়ি চলে, হাইড্রুলিক্ লিফেট্‌র জন্য মিউনিসিপালিটিকে খোসামোদ করিতে হয় না—বা হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া হৃৎকম্প হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয় না। আবুর যা কিছু দিল্‌ওয়ারা মন্দির নতুবা দেখিবার কিছুই নাই—কল্পনা শক্তি তত উদ্দীপনা হইবার সম্ভাবনা নাই কারণ বড় মলিন। দার্জ্জিলিং একাধারে জনপূর্ণ ও নির্জ্জন। ম্যেলে গেলেই সুহর বলিয়া মনে হয়—নতুবা ঝোরার ঝর ঝর, পাতার সর্ সর্ ও শৈলোপরি শৈলের অভ্রভেদী চূড়া সকলের নিস্পন্দ গম্ভীরতা দেখিয়া রাসভকণ্ঠেও কোকিলের আবির্ভাব হয়—আমাকেও মাঝে মাঝে ৮।৬ ৬।৮ গুনিতে হইয়াছিল। অবশ্য অন্য পাহাড়েও এই প্রকার ঝোরা ইত্যাদি সবই আছে কিন্তু সে হৃদয়হারী ভাবটি নাই। অথবা ইহাও হইতে পারে দার্জ্জিলিংয়ে এক দুর্ল্লভ পুষ্প-সৌরভ পাইয়াছিলাম বলিয়া এত ভাল লাগিল। সিম্‌লা বা উটাকামুণ্ডে বঙ্গনারী কুসুম ফুটেনা। দার্জ্জিলিং এর প্রথম দোষ বড় সেঁত সেঁতে—দ্বিতীয় দোষ, তজ্জন্য বড় জোঁক। জোঁকের ভয়ে ভলাণ্টিয়র পদাভিলাষী বীর বাঙ্গালি অস্থির। পথ চলিতে চলিতে গাছের উপর হইতে মাথায় পড়িয়াছে অমনি

মেদিনী কাঁপাইয়া চিৎকার—বন্ধু বান্ধব যে যেথায় ছিলেন লগুড় হস্তে ছুটিয়া আসিলেন, কি কি করিয়া মাথায় হাত দিতে দিতে জোঁক মহাশয় কামিজের কলার অবলম্বন করিয়া এক ডিগ্‌বাজিতে উচ্চতর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—আর রক্ষা নাই একটু রক্ত দিতেই হবে।

এখনও আসল কথা আরম্ভ করা হইল না—দার্জ্জিলিং হইতে ফেলুট যাওয়া। ফেলুট ৪৮ মাইল দূরে এবং আরও ৫০০০ ফিট উচ্চ। আপাদমস্তক এভারেষ্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে হইলে ফেলুট যাইতে হয়। সেঞ্চল দেখিয়া মন উঠে নাই—আর একটা বেড়াই-বার স্থান রঙ্গীত, কিন্তু বড় নীচে, বড় গরম। যাইতে ইচ্ছা হইল না। একদিন আহারান্তে স্থির হইল ফেলুট যাইতে হইবে। "দ" মহাশয় অনেক ভয় দেখাইলেন—বলিলেন বৈশাখ মাস ফেলুট যাইবার সময়, নভেম্বরশেষে যাইলে হাত পা খসিয়া যাইবে। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—আমরা "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্য" করিলাম না। কাজটা একটু গুরুতর হইল বটে, কারণ নজন যাত্রীর ভিতর ৬জন রমণী ও একটি বালক—মোটে দুইজন মাত্র পুরুষ, তার ভিতর আবার একজন একটু রুগ্ন। যাহা হউক তখন "পাসা" ফেলা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে বাঙ্গালার পাস ইত্যাদি সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইল। নিম্নে ফেলুটের পথের ডাক বাঙ্গা-লার তালিকা দেওয়া গেল—

স্থান—	দার্জ্জিলিং হইতে কত মাইল	উচ্চতা
দার্জ্জিলিং		৭২৫৭
জোঁড়পুখ্‌রি	১২	৭৪০০
টংলু	২১	১০০৭৪
সন্দকফু	৩৫	১১৯২৯
ফেলুট	৪৮	১১৮১১

বাঙ্গালার ভাড়া অন্য ডাক বাঙ্গালার মত প্রতিদিন, লোক পিছু একটাকা, কিন্তু অন্য ডাক বাঙ্গালায় যেমন হট্ করিয়া উপস্থিত হইলেই স্থান পাওয়া যায় এখানে সেরূপ নহে। বাঙ্গালা গুলি বড় ছোট, ৩ টার অধিক কামরা নাই, কাজে কজেই যদি আগে কেহ গিয়া থাকে কিম্বা পশ্চাতে যায় তাহা হইলে উভয়েরই অসুবিধা হইতে পারে। এই জন্য যাইবার আগে দার্জ্জিলিং এর ডেপুটি কমিসনরের কাছে টাকা জমা দিয়া পাস লইতে হয়। যিনি রেলের পথ ছাড়িয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন ডাক বাঙ্গালা কি সুখের সামগ্রী। ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট প্রজার হিতের জন্য যত কাজ করিয়াছেন আমি ডাক বাঙ্গা-লাকে তাহার সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করি। লোকালয়ের কথা দূরে থাকুক যে জঙ্গলে মনুষ্য সমাগম অতি বিরল সেখানেও স্থানে স্থানে পথিকের সুবিধার জন্য ডাক বাঙ্গালা নির্ম্মিত হইয়াছে। হয়ত কোথাও খানসামা বা চাকর নাই শুধু বাঙ্গলা পড়িয়া আছে তথাপি মাথা গুঁজিবার স্থান।

কুলি মজুর ঘোড়া ডাণ্ডি সব ঠিক হইল। একদিন সকাল ৮টার সময় আমরা দার্জ্জিলিং

হইতে রওনা হইলাম কুলি, ডাণ্ডিওয়ালা সইস ও আমাদের লইয়া প্রায় ৩০ জন লোক। রাস্তার লোক বোধ হয় ভাবিল ইহারা দিগ্বিজয় করিতে যাইতেছে—বাস্তবিক সকলেই উৎসাহ ও উদ্যমে পূর্ণ। সকলেই অশ্বে কেবল একজন ডাণ্ডিতে।

বাকি কথা এখন রহিল—আগামী বারে দেখা যাইবে—কিন্তু পাঠক এটা মনে রাখিবেন নভেম্বর মাসের শেষে বাঙ্গালি মেয়ের ফেলুট যাওয়া। অবশ্য Albert Medal deserve করে।

ভাষা-প্রসঙ্গ।

১। অধুনাতন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিতে গেলেই তাহাতে যাবনিক শব্দের সমাবেশ প্রায় অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, বহুকালাবধি আমরা যবন রাজার অধীন; সুতরাং আমাদিগের জাতীয় ভাষায় যাবনিক শব্দের সমাবেশ হওয়া বড় একটা বিচিত্র কথা নহে। যদিও আমরা ঐসকল অপরিচিত শব্দ সমূহের অর্থ একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি বটে, কিন্তু উহার উৎপত্তিস্থান এবং মৌলিক অর্থ নিরাকরণ করা আমাদের পক্ষে বড়ই সুকঠিন। কয়েক জন বিশিষ্ট লেখক পূর্ব্বে ভারতীতে এরূপ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এমন একটী প্রয়োজনীয় বিষয় যে ইহার বারম্বার আলোচনায় পাঠকবর্গের কিছুমাত্র অপ্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই; বিশেষতঃ তাঁহারা যে সকল বিষয় লইয়া একবার আলোচনা করিয়াছেন, আমি তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া কতকগুলি নূতন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

২। বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত যাবনিক শব্দগুলি বিভিন্ন ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে পার্সী, আরবী, তুর্কী এবং ইংরাজি এই কয়েকটীই প্রধান। ইংরাজি আমাদের আধুনিক রাজভাষা হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ইংরাজি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে আমরা সহজেই তাহার উৎপত্তিস্থান এবং মৌলিক অর্থ নিরাকরণ করিতে পারি; সুতরাং ইংরাজি শব্দসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দেখা যাউক পার্সী, আরবী ও তুর্কী এই কয়েকটী যাবনিক ভাষা হইতে শব্দ সমূহ কি প্রকারে এবং কোন সময়ে আমাদের জাতীয় ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।

৩। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতভূমি ক্রমান্বয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমান রাজার শাসনাধীন ছিল। পার্সীই আমদের তৎকালিক রাজভাষা ছিল। সুতরাং সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় পার্সী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। পার্সী আজিও একটী অসম্পূর্ণ ভাষা, ইহা আরবী এবং তুর্কীর সহযোগে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; সেইজন্য বাঙ্গালা ভাষায় আরবী এবং তুর্কী শব্দও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যের

সহিত ভাষা এক সূত্রে গ্রথিত; সুতরাং রাজ্য পরিবর্ত্তন হইলে ভাষারও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর যে প্রদেশে যখন রাজ্যবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার ভাষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা এবং প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা আলোচনা করিয়া দেখিলে একথা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

৪। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল যাবনিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দুই প্রকার। প্রথম মূল শব্দ, যাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। দ্বিতীয় অপভ্রংশ শব্দ, অর্থাৎ যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর ঘটিয়াছে। পাঠকবর্গের আলোচনার জন্য নিম্নে কতকগুলি যাবনিক শব্দ সন্নিবেশিত করা হইল।

মূল শব্দের উদাহরণ,—

পার্সী শব্দ। চাকর, হুসিয়ার, দরকার, চাদর, দরজী, আতস (উত্তাপ), দালান, ফেরেব, সুদ, রুমাল, ফৌজ, আয়না (দর্পন), চেরাগ, পশম, সাবাস, আয়েন্দা, আমদানি, জায়দাদ (সম্পত্তি), আন্দাজ, গোয়েন্দা, জবান, ওস্তাদ, রোজ, সরাই (পান্থশালা), খুব, খুসী, পরগণা, দাগ, আইন, ফেরেস্ত (তালিকা), কিনারা, জরদ, বাহার, খরিদ, কম।

আরবী শব্দ। দখল, ফুসরত, নজীর, ফকির, গোলাম, মবলগ (সমুদায়), লাখরাজ, তদারক, ফসল, খেয়াল, আসল, রেওয়াজ (প্রচলন), মেজাজ, জখম, লোকসান, ময়দান, ফয়সালা, তওকা (ভরসা), লেফাফা, তালিম, দালাল, মৎলব, তর্জ্জমা, তেজারৎ (ব্যবসায়), আজব, মজুর, নকল, তারিখ, মেহনৎ, বাতিল (মিথ্যা), তারিফ, জবাব, জিনিস, তুফান, জাহাজ।

তুর্কী শব্দ। তোমক, জাজিম, সওগাৎ (উপহার), লাস, বেগম, তলাস (অন্বেষণ), লাল, তোপ—ইত্যাদি।

অপভ্রংশ শব্দের উদাহরণ,*—

পার্সী ভাষা হইতে রূপান্তরিত শব্দ, যথা আহিস্তা হইতে আস্তে, শরেস হইতে শিরীশ, ফরমায়েস হইতে ফরমাচ, মজদুর হইতে মজুর, সাইস হইতে সহিস, খরিদার হইতে খোদ্দের।

আরবী ভাষা হইতে রূপান্তরিত শব্দ, যথা তকাজা হইতে তাগাদা, কমিস হইতে কামিজ, নাকিস হইতে নাকচ, মহসুল হইতে মাসুল, মরহম হইতে মলম, ফজিহৎ ফৈজৎ, তফাওৎ হইতে তফাৎ, তহবিল হইতে তপিল, আলাহিদা হইতে আলাদা—ইত্যাদি। "বুগচা" এই শব্দটী তুর্কী, ইহা হইতেই "বোচকা"—শব্দটী বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে।

৫। পার্সী শব্দের সহিত যখন আরবী অথবা তুর্কী শব্দ সংযোগ হয়, তখন সেই যৌগিক শব্দটীকেও পার্সী বলিতে হইবে, যথা নওবৎ (আরবী শব্দ) + খানা (পার্সী শব্দ) = নওবৎখানা; হুকুম (আরবী শব্দ) + নামা (পার্সী শব্দ) = হুকুমনামা, একরার (আরবী শব্দ) + নামা (পার্সী

* কোন কোন শব্দের মূল এবং এবং অপভ্রংশ দুইয়েরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দ)=একরারনামা, ইমান (আরবী শব্দ)+দার (পার্সী শব্দ) ইমানদার, তোপ (তুর্কী শব্দ) +খানা (পার্সী শব্দ)=তোপখানা—ইত্যাদি। অতএব নওবৎখানা, হুকুমনামা প্রভৃতি শব্দগুলি দুইটী বিভিন্ন শব্দ সংযোগে উৎপন্ন হইলেও এগুলি পার্সী।

৬। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি যাবনিক শব্দ আছে যাহা দেখিতে ঠিক সংস্কৃত মূলক শব্দের * অনুরূপ, যথা "দরদ," "বাসিন্দা"—ইত্যাদি। বস্তুতঃ সংস্কৃতের সহিত ইহার কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। পার্সী ভাষা হইতেই এই শব্দ দুইটীর উৎপত্তি ও বিকাশ; এবং ইহা হইতেই বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত। আমাদের জাতীয় ভাষার সহিত যে সকল যাবনিক ভাষার সংস্রব আছে উপরে তাহার সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে; এইবার আমরা উর্দ্দূ ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৭। পার্সী ভাষায় কতকগুলি সংস্কৃতমূলক শব্দ মিলিত হইয়া উর্দ্দূ ভাষার + উৎপত্তি হইয়াছে। পার্সীর সহিত আরবী এবং তুর্কী শব্দের সম্বন্ধ আছে বলিয়া উর্দ্দূ ভাষাতেও ঐ সকল শব্দের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উর্দ্দূর স্বতন্ত্র বর্ণমালা নাই। পার্সী বর্ণমালাই উর্দ্দূ ভাষায় প্রচলিত। তবে ইহাতে সংস্কৃত মূলক শব্দের উচ্চারণোপযোগী কতকগুলি অতিরিক্ত অক্ষর সংস্কৃত ভাষা হইতে দেওয়া হইয়াছে মাত্র, যথা "টে, ডাল, ড়ে" ‡ এই তিনটী অসংযুক্ত বর্ণ; এবং "বে+হে=ভ, পে+হে=ফ, তে+হে=থ, টে+হে=ঝ, চে+হে=ছ, দাল+হে=ধ, ডাল+হে=ঢ, ড়ে+হে=ঢ, কাফ+হে=খ, গাফ+হে=ঘ" এই এগারটী সংযুক্ত বর্ণ। এই অক্ষরগুলি পার্সীর সহিত একেবারেই সম্বন্ধ শূন্য; কারণ পার্সী ভাষায় এমন একটীও শব্দ নাই যাহা উচ্চারণ করিতে এগুলির সাহায্য প্রয়োজন হইবে।

৮। পার্সী ভাষায় সম্যক বুৎপত্তি লাভ করিতে পারিলে উর্দ্দূ ভাষায় অনেকটা অধিকার জন্মায়; এবং অনেকগুলি আরবী ও তুর্কী শব্দ আয়ত্ত করিতে পারা যায়। বঙ্গীয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই পার্সীতে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত পার্সী, আরবী অথবা তুর্কী শব্দ দেখিলে তাহাকে উর্দ্দূ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্যই উর্দ্দূ ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।

---

* যে সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে সংস্কৃতমূলক শব্দ বলে।

‡ "ট, ড, ড়" এই তিনটী সংস্কৃত অক্ষর হইতে "টে, ডাল, ড়ে" এই তিনটী অক্ষর উর্দ্দূ ভাষায় রূপান্তর হইয়াছে।

+ দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ এই দুইটী স্থান হইতেই উর্দ্দূ ভাষা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।—ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানকার অধিবাসীগণ আজিও উর্দ্দূ ভাষার সমধিক আলোচনা করিয়া থাকেন।

চন্দ্র।

চন্দ্রের মহিমা।—চাঁদ, সুধাকরের কি মধুমাখা নাম! এমন আদরের ধন, এমন—প্রীতির প্রতিমা, এমন আনন্দের উৎস ত্রিজগতে আর নাই। পবনসনাথা চন্দ্রিকার কেলি-কৌতুক, কুমুদ কল্হার বিভূষিত সরোবর বদনে স্ফুরদধরগত হাস্যরূপে প্রতিভাত দেখিয়া কে না বিমোহিত হয়? কি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বাস্তব জগৎ, কি কবিকল্পিত বাঙ্ময় জগৎ, কি চিত্রকরের বর্ণ ও ভাবময় জগৎ, চন্দ্র বিরহে সকলই রসহীন—সকলই শ্রীহীন। কি বনস্পতি কি ওষধি, কি কানন কি কুঞ্জ, কি গিরিশিখর কি নদীপুলিন, বিষয় বিশেষে কলানিধির অন্ততঃ এক কলা না পাইলে কেহই শোভা পায় না। নিরবচ্ছিন্ন অমানিশায় শ্মশান পর্য্যন্তেরও যেন প্রেতভূমিত্বের ব্যত্যয় ঘটে। বোধ হয় তজ্জন্যই সার জন মুরের সমাধি নিশায় (শুক্ল প্রতিপদে) চন্দ্র উদিত না থাকিলেও, কবি গাইলেন,

"By the struggling moon beam's misty light"

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ভোগৈশ্বর্য্য বিরহিত বিভূতিভূষণ শ্মশানবাসী দিগম্বরের জটাতেও চন্দ্রকলা বিলাস করে। কি সুখে কি দুঃখে, কি মিলনে কি বিরহে, সকল অবস্থায় সকলের চাঁদ পরম সুহৃৎ,—পরম সখা। যাদুর চাঁদা মামা টিক দেন, যুবক যুবতীর গাথা শ্রবণ করেন, এবং জন সাধারণে বৈষয়িক ব্যাপারে কৃতার্থ হইলে আকাশের চাঁদ হাতে পান।

মরীচিমালীর কণককিরণ সত্ত্বেও চন্দ্রের আলোক আদিম জ্যোতিষিক আলোক। এই আলোকেই ধরাতলে ভগবতী ভারতীর প্রথম আরতি হইয়াছিল। চন্দ্রালোকই জ্ঞানাকরের রত্নরাজি নেত্র গোচর হইবার আদ্য উপায়। সুবিমল শান্তিরূপিণী চন্দ্রিকার অব্যক্ত শক্তি প্রভাবে মানুষ পার্থিব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হিমদ্যুতিবিস্ফুরিত বিশ্ব অবলোকন করিলেন, এবং অচিরে তাঁহার "মোহন মুরতি" এবং মৃদুমন্দ গতি দেখিয়া তাঁহাকে চন্দ্রমা এই সার্থক নামে অভিহিত করিলেন। চন্দ্রের গতি দ্বারা তিথি, পক্ষ, মাসের পরিমাণ হইল, এবং তারাগণের অবস্থান জানা গেল। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অভাবে মাসের অভাব। তখন কে গণিবে সংক্রান্তি, কে বুঝিবে সংক্রান্তি। কৃষিকার্য্য বনিগ্ব্যাপার, সকলই চন্দ্র সাধ্য। এই চন্দ্রমা যদি অকস্মাৎ লোপ পান তবে নাবিক, ও সাগরোপকুলবাসী বণিক মণ্ডলের হাহাকার রবে এই দুর্ব্বিপাকের সংবাদ ক্ষণকাল মধ্যে দেশ ব্যাপিয়া পড়ে,—কি সর্ব্বনাশ জুয়ার ভাঁটা বন্ধ হইল! ডকের জাহাজ ডকে রহিল, সাগরের জাহাজ সাগরে রহিল! সামুদ্রিক বাণিজ্যের কি ভয়ানক বিশৃঙ্খল! কি বিষম বিভ্রাট!

কিন্তু বলিতে ভয় হয়,—বলিতে দুঃখ হয়, পরমার্থতঃ নিশানাথের রূপও নাই, লাবণ্যও নাই, গুণেরও ভাগ তত বেশি নহে। অপেরা গ্লাস দিয়া দেখিলে থিয়েটরে নট, পটের সৌন্দর্য্য অধিকই দেখায়; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জ্যোতিষীর যন্ত্র-নেত্রে চন্দ্র মণ্ডল দগ্ধীভূত

অসমতল মৃৎপিণ্ডবৎ প্রতিভাত হয়,—এক থান গোলাকার প্রকাণ্ড আবুড়া থাবুড়া ঝামা। সকলই ছায়াবাজি; মৃগও নাই আকাশবুড়ীও নাই।

চন্দ্রের প্রাকৃতিক অবস্থা অচিরে বর্ণনা করা হইবে।

চন্দ্র কতদূরে আছেন? জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে চন্দ্র যেমন পৃথিবীর নিকটস্থ এমন নিকটস্থ আর কেহই নহে। ইহাকে পৃথিবীর সখা,—পৃথিবীর অনুচর বলা যাইতে পারে। গ্রহ নক্ষত্র গণের দূরত্বের তুলনায় চন্দ্র আমাদের এত সন্নিকট যে "বাঁমন হ'য়ে চাঁদে হাত" কথাটী নিতান্ত উপহাসের বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীর মত বড় ত্রিশটি গোল যদি গায়ে গায়ে এক লাইনে বসান যায় তবে শেষের গোলাটি চাঁদে গিয়া ঠেকিবে। এ দূরত্ব জ্যোতিষীর চক্ষে দূরত্ব বলিয়াই বোধ হয় না। এত পথ কত পরিব্রাজক ভ্রমণ করিয়াছেন,—কত ডাক হরকরা ছুটিয়াছে। চন্দ্র লোকের সহিত যদি আমাদের খবরা-খবর চলিত তবে তাহা টেলিগ্রাফ বা আলোক দ্বারা কতিপয় সেকেণ্ড মধ্যে সম্পন্ন হইত। এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে আছেন তাহার ৪০০ ভাগের এক ভাগ দূরে চন্দ্র আছেন।

"লক্ষান্তরে ভানু জলেষু পদ্মাঃ,
ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধু।" তা নহে।

যদি সৌর জগৎ পর্য্যটন অভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়া এক রাত্রি চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করা যায়, তবে এতাবৎ দূরমিত এক এক আডডায় থাকিতে হইলে, ১০ কোটি আড্ডা পার হইলে, পৃথিবীর অত্যন্ত সন্নিকট যে তারা তাহাতে পৌছান যায়।

যখন বেলুনের সৃষ্টি হইল, তখন শূন্য সাগরে সচ্ছন্দে বিচরণ পূর্ব্বক অনেকে বিস্ময় ও আনন্দোন্মত্ত হইয়া মনে করিয়াছিলেন, যে কালক্রমে বেলুনে করিয়া চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত পৌছান যাইবে। মানুষের কল কৌশল দেখিয়া মনে হয়, যে এমন দিনও আসিবে যখন চন্দ্র মণ্ডলে যাইবার উপায় বিশেষের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু সে উপায় ব্যোমযান নহে, কারণ চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত ভূবায়ু নাই। যদিও চন্দ্র আমাদের খুব কাছে বটে, কিন্তু তা বলিয়া হাত বাড়াইলে ছোঁয়া যায় না। পৃথিবী হইতে চন্দ্র ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল অন্তরে আছেন।

চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল অন্তরে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? কেমন করিয়া বুঝিব যে গণকের ভুল হয় নাই? কে বলিতে পারে যে জ্যোতিষী নিজে প্রতারিত হইয়া লোকসাধারণকে প্রতারিত করিতেছেন না? এ আপত্ত্য সুসঙ্গত। অন্যের বিশ্বাসে বিশ্বাস না করিয়া অকপটে তথ্যজিজ্ঞাসু হইয়া সন্দেহ প্রকাশ করা শ্রেয়স্কর।

"মূঢ় পরপ্রত্যয়নেয়-বুদ্ধি;

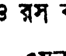
সন্দেহ মানুষের মনের একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম। বিদিৎসার সহিত সন্দেহের সংযোগ না হইলে নরলোকের এতাবতী উন্নতি হইত না। জ্যোতিষ প্রমুখ অভ্রান্ত গণিত শাস্ত্র এবম্বিধ সন্দেহের প্রতি বিরাগ প্রকাশ না করিয়া বরং আদর পূর্ব্বক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে

প্রবৃত্ত হন। পৃথিবীর গতি, গ্রহগণের আকার, পরিমাণ ও দূরত্ব সমস্ত বিষয় সুপপন্ন, কোনটিতেই সন্দেহের লেশমাত্র নাই। তবে যাহারা নিতান্ত কুঁড়ে, তাঁহারাই আসল কথা জানিতে চান না, সন্দেহ দোলায় দুলিয়া সুখানুভব করেন,—দোলন-সুখানুভব করুণ, পৃথিবী ঘুরিতে ছাড়িবেন না।

জ্যোতিষ্কের মাপ করিতে হইলে গজ, ফিতে ইত্যাদি ব্যবহার করা চলে না। কোণ বা চাপ অর্থাৎ বৃত্তাংশ ব্যবহার করিতে হয়। কথা এই যে পদার্থের দৃশ্যমান পরিমাণ পদার্থের বাস্তব পরিমাণ ও বাস্তব দূরত্বের উপর নির্ভর করে। যেমন একটি চিম্‌নী ৬০ হাত তফাৎ হইতে দেখিলে যত বড় দেখাইবে, ১২০ হাত তফাৎ হইতে দেখিলে তাহার অপেক্ষা ছোট দেখাইবে। লোকে বলে চাঁদ একখানি রূপার থাল। থাল বলাতে চাঁদ বস্তুতঃ কত বড় তাহা কি বুঝা গেল ? যদি জানি যে চাঁদ এত দূরে আছেন, তবে বুঝিতে পারিব থালের মত বলিলে চাঁদকে প্রকৃত পক্ষে কত বড় ধরিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিনিসটা কত দূরে আছে তাহা না জানি ততক্ষণ তাহার দৃশ্যমান পরিমাণ বলিতে হইলে মনে মনে দুইটী রেখা টানিতে হয় একটী দ্রষ্টার চক্ষু হইতে পদার্থের ঊর্দ্ধভাগে, অপরটী সেই চক্ষু হইতে ঐ পদার্থের অধোভাগে; এই দুইটী দৃক্‌সূত্রের অন্তর্গত যে কোণ তাহাই ঐ বস্তুর দৃশ্যমান দীর্ঘতা জ্ঞাপক, এবং ইহাকে সিদ্ধান্তীরা চাপাত্মক পরিমাণ এবং ইংরাজরা angular measure বলেন।

দূরত্বের এবং আকারের পরিমাণ উভয়ই এই কোণের পরিমাণাধীন। জিনিস্‌টা কত দূরে আছে জানিতে পারিলে উক্তরূপে কোণ মাপিয়া বলিয়া দিতে পারা যায় যে সেটা ঠিক কত বড়। এখন বেশ বুঝাযাইতেছে যে কোণের পরিমাণ স্থির করাই জ্যোতিষী জ্যামিতির আদ্য উপক্রম। কিন্তু কোণের পরিমাণ বুঝাও বড় সহজ নহে; কি করিব

"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

কোণের কথায় যদিও রস কশ নাই, তথাপি ইহা নিতান্ত বিরক্তিজনক বা অপ্রীতিকর দীর্ঘতর নহে। কোণ যে এমনই  (চিত্র দেখুন) তাহা সকলেই জানেন; এবং সকলেই জানেন যে কোণ পরিধির এক অংশ সুতরাং চাপ (ধনু)। একখান কাগজের উপর কম্পাস্‌ দিয়া এক বৃত্ত আঁক; বৃত্তের মাঝার দিয়া ডাঁইনে বাঁয়ে একটী সরল রেখা টান; আর ঐ মাঝারে মাটাম ধরে খাড়া ভাবে আর একটী লাইন টান; এখন বৃত্তটি সমান চারি ভাগ হইল, এই এক এক ভাগকে ৯০। অংশ অর্থাৎসমস্ত বৃত্তকে ৩৬০ অংশ ধরা যায়। ১ অংশে ৬০ কলা, ১ কলায় ৬০ বিকলা, অংশ = degree কলা = minute এবং বিকলা = Second. এ মিনিট, সেকণ্ড বা কলা, বিকলা ঘণ্টার মিনিট সেকণ্ড হইতে স্বতন্ত্র; °, ′, ″, এই তিনটি ক্রমান্বয়ে অংশ, কলা, বিকলা জ্ঞাপকচিহ্ন, এবং এই গুলিকে অংশাদি জ্ঞাপক অঙ্কের ঊর্দ্ধ ভাগে একটু ডাইনে বসাইতে হয়; যেমন ১° ২′ ৩″ এই রূপ লিখিলে এক অংশ, দুই কলা, তিন বিকলা পড়িতে হইবে।

মাপ জোক না বুঝিলে জ্যোতিষিক প্রবন্ধ বুঝা যায় না। মাপ জোক বুঝাও কিছু

শক্ত ব্যাপার নহে, তবে কিনা উপন্যাসাদি পড়িতে যেমন ভাবিতে চিন্তিতে হয় না, জ্যোতিষীর কথা বুঝিতে গেলে তেমন হয় না, একটু মনঃসংযোগ দরকার করে। জ্যোতিষ পড়িব, অথচ হিসাব পত্রের দিকে যাব না, তা হইতে পারে না। খগোলের তথ্য জানিবার বাসনা থাকিলে জ্যামিতি ঘটিত কতিপয় মূল সূত্র জানা আবশ্যক ; সূত্র গুলি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই চিত্ত বিনোদন।

যাহা হউক কোণ কি তাহা আমরা সহজেই বুঝিলাম, এখন যদি বলি যে চন্দ্রবিম্ব (= Disk) ৩১´ ৮´´ (একত্রিস মিনিট আট সেকণ্ড অর্দ্ধ অংশের কিঞ্চিৎ অধিক) তাহা হইলে কথাটা কি হইল বলিয়া আর ধোকা হবে না। এমন ৩৪৪ চাঁদকে গায়ে গায়ে লাগাইয়া যদি মালা গাঁথা যায় তবে সে চাঁদমালা আকাশের খিলানের অধোভাগে "অস্তম্ভতোরণ স্রজার" ন্যায় শোভা পাইবে অর্থাৎ পূর্ব্বক্ষিতিজ হইতে আকাশ দিয়া পশ্চিম ক্ষিতিজ স্পর্শ করিবে। (ক্ষিতিজ = Horizon.)

এখন পদার্থের দৃশ্যমান আর বাস্তব পরিমাণে কি সম্বন্ধ তাহা দেখ। পদার্থ যত দূরে থাকিবে তত ছোট দেখাইবে। যদি কোন গোল জিনিস্‌টী তাহার ৫৭ ব্যাস পরিমিত দূরে থাকে তবে সে ব্যাস বস্তুতঃ যতই হউক না কেন তাহা কোণ মানে এক অংশ হইবে। যেমন ১ফুট ব্যাসমিত এক খান বলয়াকার লোহা যদি ৫৭ ফুট অন্তরে রাখ তবে সে খানা আমাদের চক্ষে কোণ মানে ১° হইবে। চাঁদের ব্যাস আধ অংশের কিছু বেশী, তবেই উহা এখান হইতে ঐ ব্যাসের ২ × ৫৭ এর কিছু কম অর্থাৎ ১১০ ব্যাস অন্তরে আছে।

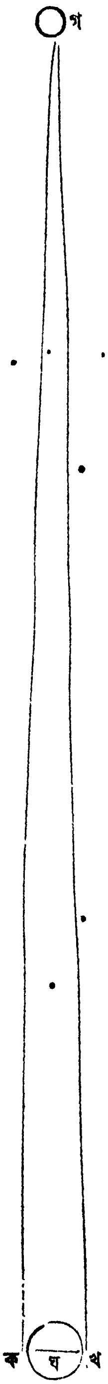
কিন্তু এখনও চন্দ্রের বাস্তব অন্তর বা আকারের বাস্তব পরিমাণ জানিবার কোন উপায় দেখিতেছি না।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের আচার্য্যেরা চন্দ্রের দূরত্ব ও পরিমাণ যাহা স্থির করিয়াছিলেন তাহা প্রায় সত্যাসন্ন। প্রায় ১৫০ বৎসর অতীত হইল ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চন্দ্রের বাস্তব দূরত্ব ও বাস্তব পরিমাণের গণিত এত সূক্ষ্ম করিয়াছেন, যে উহাতে এক বিন্দু ভুল নাই। জ্যামিতিতে এবং দৃগ যন্ত্র ব্যবহারে অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাঁহাদের গণিতের মধ্যে প্রবেশ করা ভার ; তথাপি সে গণিতের পদ্ধতি যে কি তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। অপর পৃষ্ঠায় রেখাময় চিত্রটি দেখ। উহাতে বড় বৃত্তটি পৃথিবী, ছোট বৃত্তটি চন্দ্র। কখ পৃথিবীর ব্যাস। কএ এক জ্যোতিষী এবং খএ এক জ্যোতিষী থাকিয়া যুগপৎ চন্দ্র মণ্ডল বেধ (= Observe) করিয়া যন্ত্র ও গণিত কৌশলে বলিয়া দিতে পারেন যে ক্ষুদ্র কোণ কগখএর পরিমাণ কত।

ভূগর্ভ (= Centre of Earth) এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে চন্দ্রমণ্ডল পর্য্যন্ত দুইটি রেখা কল্পনা করিলে ঐ রেখাদ্বয়ের অন্তর্গত যে কোণ তাহার নাম লম্বন = (Paralax) কগখ কোণ চন্দ্রের লম্বন ; ইহার পরিমাণ ৫৭ কলা।

এই সময় দূরত্বের সহিত কোণের সম্বন্ধ ব্যঞ্জক একটি ফর্দ্দ করিলে ভাল হয় ; কারণ

তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে নভোমণ্ডলস্থ পদার্থের মাপের পক্ষে অনেক উপকার দর্শিবে।



এক গাছি ছড়ীকে (উহার মাপ যা হউক) ঐ ছড়ীর

৫৭ ছড়ী তফাতে রাখিলে উহার কোণ মান ১ অংশ হইবে

১১৪	"	"	$\frac{1}{2}$ " বা ৩০ কলা	"
৫৭০	"	"	$\frac{1}{10}$ " " ৬ "	"
৩৪৩৮	"	"	১ মিনিট	"
৬৮৭৫	"	"	$\frac{1}{2}$ " বা ৩০ বিকলা	"
১০৩১৩	"	"	২০ "	"
২০৬২৬	"	"	১০ "	"
২০৬২৬৫	"	"	১ "	"

চন্দ্রের লম্বন কগঘ কোণ ৫৭ কলা, প্রায় ১ অংশ, এবং কঘ উক্ত ছড়ীর স্থলে ভূব্যাসার্দ্ধ, তবেই চন্দ্র ৫৭ ভূব্যাসের কিঞ্চিৎ অধিক ৬০$\frac{1}{4}$ (৬০.২৭) ভূব্যাসার্দ্ধ অন্তরে আছেন। মোটামোটী ৩০ ভূব্যাসান্তরে আছেন। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৩৯৬৩·৩৫ মাইল উহাকে ৬০·২৭ দিয়া গুণ করিলে ২,৩৮,৪৭১ মাইল হইল পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব।

চন্দ্রের পরম লম্বন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তীয় ক্ষিতিজলম্বন ৫৩′ ৪৮″ হইতে ৬১′ ৩২″ পর্য্যন্ত বাড়ে। পরম লম্বনের মধ্যম মান ৫৭′ ২″·৩ ধরা যাইতে পারে। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তীয় ব্যাসার্দ্ধ ৩৯৬২·৮২ মাইল। এখানে কঘ = ৩৯৬২·৮২ আর কগঘ কোণ = ৫৭′ ২″.৩। যাঁহারা গণিত জানেন তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে

$$\text{জ্যা ৫৭}'.\text{২}''\text{·৩} = \frac{\text{৩৯৬২·৮২}}{\text{গঘ}}$$

$$\therefore \text{গঘ} = \frac{\text{৩৯৬২·৮২}}{\text{জ্যা ৫৭}'\text{২}''\text{·৩}}$$

লগ গ ঘ = ৩.৫৯৮০০৪৪ − ৮.২১৯৮৭৩০.

= ৫·৩৭৮১৩১৪

∴ গ ঘ = ২,৩৮,৮৪১ মাইল চন্দ্রের দূরত্ব।

এ গণিতের শুদ্ধত্বে যে সন্দেহ করিতে পারে, সে নিজের অস্তিত্বেও সন্দেহ করিতে পারে। এ গণিত এত ঠিক যে পৃথিবীস্থ নগরদ্বয়ের ব্যবধান এত সূক্ষ্মরূপে ঠিক করা যায় না। বলিলে

অনেকে অত্যুক্তি মনে করিতে পারেন, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, যে কলিকাতা হইতে কোন্ দিন কোন্ ঘণ্টায় চাঁদ কত দূরে আছেন, তাহা যত ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারে, কলিকাতা হইতে কাশি কত দূর, তাহা তত ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারেনা। অতি সংশয়শীল বণিক্ অপেক্ষা জ্যোতিষী শত গুণ সতর্কতা সহকারে পুনঃ পুনঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করেন।

কথায় বলিলাম চন্দ্র এখান হইতে ২,৩৮,৮৪১ মাইল দূরে আছেন; কিন্তু ঐ দূরত্বের ভাব কি হৃদয়ঙ্গম হইল? না কথনই না। অতএব নানা রূপ উদাহরণ দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিলে যদি হয় তো দেখা যাউক। একটা কামানের গুলি যদি সমভাবে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৪০ ফুট বেগে অবিরত ৮ দিন ৫ ঘণ্টা চলে, তবে সে গুলি চন্দ্রলোকে লাগিতে পারে। বাতাস দিয়া শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৮৯ ফুট যায়। এখান হইতে চাঁদ পর্য্যন্ত যদি হাওয়া থাকিত, আর চন্দ্রমণ্ডলে পর্ব্বতের মুখ দিয়া আগুণ বাহির হইয়া এমন একটা মহা উপপ্লব ঘটিত, যে তাহার শব্দ এখান পর্য্যন্ত পৌছন সম্ভব, তবে সে শব্দ ঐ অগ্ন্যুৎপাতের ১৩ দিন ২০ ঘণ্টা পরে এখানে আসিতে পারিত। মনে কর ঐ অগ্ন্যুৎপাত পূর্ণিমার রাত্রিতে ঘটিল, আমরা দুরবীন দিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিলাম। কিন্তু সেই উপদ্রবের ভয়ানক শব্দ কবে শুনিব?—অমাবস্যার কাছাকাছি, প্রায় পক্ষান্তরে। আলোক, যাহার তুল্য দ্রুতগামী কিছুই নাই, তাহাও চন্দ্রলোক হইতে এখানে আসিতে ১¼ সেকেণ্ডের কমে পারে না।

চাঁদ কত বড়।—চাঁদ কত দূরে আছেন তাহা জানিলাম,—বুঝিলাম। এখন চাঁদ কত বড় তাহা দেখা যাউক। চাঁদের দৃশ্যমান ব্যাস এবং পৃথিবী হইতে বাস্তব দূরত্ব জানিতে পারিলে, চাঁদের বাস্তব ব্যাস কত তাহা হিসাব করিয়া বলিতে পারা যায়। চাঁদের দূরত্ব অনুসারে তদীয় দৃশ্যমান ব্যাসের ন্যূনাধিক্য ঘটে। চাঁদ যখন খুব নিকটে থাকেন তখন তাঁহার কোণমিত ব্যাস ৩৩′৩১″, আর যখন খুব দূরে থাকেন তখন উহা ২৯′ ২১″ হয়; এবং মধ্যম দূরত্বে দৃশ্যমান ব্যাস ৩১′ ৭″। রাজাচার্য্য এআরির মতে উক্ত রাশিত্রয় ক্রমান্বয়ে ৩৩′ ১৯″, ২৯′ ২৯″ এবং ৩১′ ৫″ হওয়া উচিত, কারণ দিপ্তিজন্য পরিদৃশ্যমান ব্যাস ২″ অধিক দেখায়।

চন্দ্রমণ্ডল হইতে দেখিলে পৃথিবীর দৃশ্যমান ব্যাসার্দ্ধ ৫৭′ ২·৩″ পাওয়া যায়; আর ভূমণ্ডল হইতে দেখিলে চন্দ্রবিম্বের দৃশ্যমান ব্যাসার্দ্ধ ১৫′ ৩২″·৫ দেখায়, অতএব ভূমণ্ডলের ও চন্দ্রমণ্ডলের ব্যাস উক্ত রাশিদ্বয়ের অনুপাতি অর্থাৎ ৩৪২২·৩ : ৯৩২·৫ অথবা ১০০০ : ২৭৩ :: ভূব্যাস : ৭৯২৬·৭ মাইল, চন্দ্রব্যাস;

অতএব ১০০০ : ২৭৩ :: ৭৯২৬·৭ : চন্দ্রব্যাস

$$\therefore \text{চন্দ্রব্যাস} = \frac{২৭৩ \times ৭৯২৬·৭}{১০০০}$$

=২১৬৩.৯ মাইল।

ত্রিকোণ মিতি রীত্যনুসারে গণিত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় ;

$$\text{জ্যা } ১৫' ৩২''.৫ = \frac{\text{চন্দ্রবিম্বের বাস্তব ব্যাসার্দ্ধ}}{\text{পৃথিবী হইতে চন্দ্রের বাস্তব দূরত্ব}}$$

অতএব বাস্তব ব্যাস্যার্দ্ধ =জ্যা ১৫' ৩২''.৫ বাস্তব দূরত্ব,

=২,৩৮,৮৪১ মাইল × জ্যা ১৫' ৩২''.৫

লগ ব্যাসার্দ্ধ =৫.৩৭৮১০৮৯+৭. ৬৫৪৭৫৬২

=৩.০৩২৮৬৫১

∴ ব্যাসার্দ্ধ =১০৭৮.৪ মাইল

ব্যাস =২১৫৬.৮ মাইল

চন্দ্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত মত।—সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রের পরম লম্বন ৫৩' ২০'' এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৮০০ যোজন, অতএব

$$\text{চন্দ্রের দূরত্ব} = \frac{৮০০}{\text{জ্যা } ৫৩' ২০''}$$

=৫১,৫৬৮.৩ যোজন।

অর্থাৎ ভূব্যাসার্দ্ধের ৬৪.৪৬ গুণ।

উক্ত মতে চন্দ্রের কলাত্মক অর্থাৎ দৃশ্যমান ব্যাস ৩২'। অতএব চান্দ্রবিম্বের ব্যাসার্দ্ধ ৫১৫৬৮.৩ × জ্যা ১৬' যোজন

=২৩৯.৯৪ যোজন ;

∴ বিম্বের ব্যাস =৪৮০ যোজন।*

শ্রীমান্ ভাস্কর বলেন ভূপরিধি ৪৯৬৭ যোজন, এবং ব্যাস ১৫৮১$\frac{1}{২৪}$ যোজন। যোজন যে কত হাত বা কত ফুট তাহা এক্ষণে স্থির করা সুসাধ্য নহে। সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে ভূব্যাস ১৬০০ যোজন, ভূপরিধি ৫০৫৯.৫৫৬ যোজন। জ্যোতিষী যোজন স্বতন্ত্র। সূর্য্য সিদ্ধান্তের ভূব্যাস ঠিক রাখিতে হইলে যোজন প্রতি ৪.৯৪ মাইল ধরিতে হয়, আবার পরিধি ঠিক রাখিতে হইলে যোজন ৪.৯১ মাইল হইয়া পড়ে। ভাস্করের যোজন ৩২,০০০ হাত। আর্য্যভটের ভূব্যাস ১০৫০ যোজন। কাহারও যোজনের সহিত কাহারও যোজন মিলেনা।

চন্দ্রমণ্ডলের পরিমাণ। ব্যাস জানিলেই সকল রকম পরিমাণ জানা হইল ; কারণ ব্যাস হইল ২১৫৬৮ মাইল,

অতএব পরিধি অর্থাৎ বেড় হইল ৩.১৪১৫৯ × ২১৫৬.৮ = ৬৭৭৬ মাইল ;

* বিষ্কম্ভো মণ্ডলস্তেন্দো : সহাশীত্যা চতুঃশতং॥ ৪। ১। সূ. সি.।

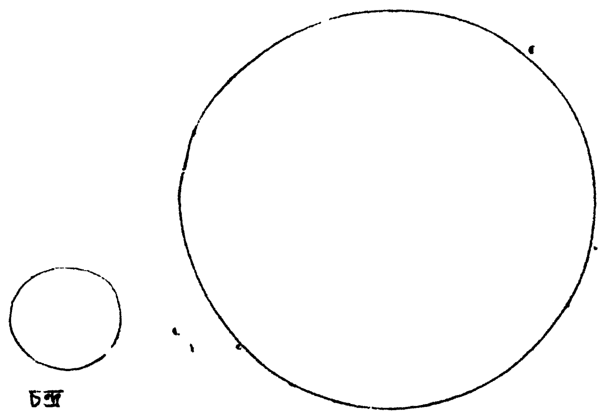
বর্গ মাইল, উপরের কালি ৩·১৪১৫৯ × (২১৫৬·৮২ = ১,৪৪,১৪,০০০ বর্গ মাইল।

ঘন ফল, পিণ্ড পরিমাণ ৩·১৪১৫৯ × $\frac{৪}{৩}$ × (২১৫৬·৮)^{৩} = ৫২৫,৩৫,০০,০০০ ঘন মাইল।

লম্বা ১ মাইল, ও চওঁড়া ১ মাইল যে স্থান তাহার পরিমাণকে এক বর্গ মাইল বলে এমন এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থান চন্দ্রমণ্ডলে আছে; তবেই জানা যাইতেছে যে উহা এসিয়া অপেক্ষা ছোট। এত ছোট হইলেও রঘুরাজের বা নেপোলিয়নের জিগীষার তৃপ্তি সাধনে সমর্থ বটে, বোধ হয় সেকন্দর বাদসাহের দিগ্‌বিজয়ে অভূমি নহে। কিন্তু জ্যোতিষীর চক্ষে চন্দ্র একটি ক্রীড়নক,—একটি মারবেল।

১ মাইল লম্বা, ১ মাইল চওড়া, ১ মাইল গভীর এমন এক একটি পিণ্ডকে ১ ঘণ মাইল পরিমিত বলা যায়। চন্দ্র মণ্ডলের পরিমাণ ৫২৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ঘন মাইল। এমন ৪৯ চন্দ্র হইলে পৃথিবীর সমান হয়, ওজনে নহে কেবল পিণ্ডে।

এবং ৬ কোটি ২০ লক্ষ চন্দ্র এক পিণ্ডে পরিণত করিয়া গোল করিলে সূর্য্যের সমান হইতে পারে।



পৃথিবী ও চন্দ্রের আকারের সাপেক্ষিক পরিমাণ।

চন্দ্র মণ্ডলের সান্দ্রত্ব।—এখনই বলিলাম যে ৪৯ চন্দ্র পৃথিবীর সমান ওজনে নহে, পিণ্ডে; ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে দুইটি অসম্ জাতীয় পদার্থ আকারের পরিমাণে সমান হইলেও ওজনে সমান হয় না। যেমন এক ফেরা বালি ও এক ফেরা চুণ; আকার পরিমাণে অর্থাৎ স্তূপ হিসাবে উভয়ে সমান হইলেও বালিফেরা চুণফেরা অপেক্ষা অনেক ভারি। কারণ একফেরা বালিতে যত পরমাণু আছে তত পরমাণু এক ফেরা চুণে নাই। বালির পরমাণু সমষ্টির পরস্পরের মধ্যে যত ব্যবধান চুণের পরমাণু সমষ্টির পরস্পরের মধ্যে

তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যবধান! অর্থাৎ একের পরমাণুরাশি অপরের পরমাণুরাশি অপেক্ষা অধিক ঘন বা গাঢ়। সান্দ্রত্ব এই ঘন বা গাঢ়র ধর্ম্মব্যঞ্জক। সান্দ্রত্ব স্থলে ঘনত্ব বলিলে কোন ক্ষতি ছিল না। সান্দ্রত্ব শব্দের প্রয়োগ বিরল বলিয়া উহা একটু পারিভাষিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় পদার্থবিদেরা যাহাকে Density বলেন তাহাইসান্দ্রত্ব। চন্দ্রমণ্ডলের সান্দ্রত্ব ভূমণ্ডলের সান্দ্রত্বের $\frac{৩}{৫}$ এর কাছাকাছি। অথবা স্যার জে হরসেলের মতে উহার পরিমাণ ·৫৫৬৫৪।

অতএব চন্দ্রের ঘনফল যদি ১ ধর, পৃথিবীর ঘনফল হইবে ৪৯ এবং চন্দ্রের অসান্দ্রত্ব যদি ·৫৫৬ ধর পৃথিবীর সান্দ্রত্ব হইবে ১ অতএব পৃথিবীর পরমাণু সমষ্টি যদি ১ ধরি তবে চন্দ্রের সমষ্টি হইবে $\frac{·৫৫৬}{৪৯}$ প্রায় ৮৮ ভাগের এক ভাগ। এই পরমাণু সমষ্টির নাম সামগ্রী ; ইহাকেই ইংরাজিতে Mass বলে। ফল কথা এই হইল যে পাল্লার একদিকে পৃথিবী অপর দিকে ৮৮ চাঁদ দিলে সমান হয়। অর্থাৎ পৃথিবী চাঁদ অপেক্ষা ৮৮ গুণে ভারি। তাই বলিয়াছিলাম যে ৪৯ চন্দ্র পৃথিবীর সমান ওজনে নহে,—পিণ্ডে। পৃথিবী কেহ ওজন করে নাই, এবং করিতেও পারিবে না, চাঁদ কেহ ওজন করে নাই, এবং করিতেও পারিবে না, তবে এরূপ প্রলাপ বাক্যের কারণ কি ?

এখন যেমন দূরত্বের এবং ব্যাসের পরিমাণ সুসাধ্য বুঝিলে, আবার যখন ওজনের কথা শুনিবে, তখন তাহা আর প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে না।

লক্ষণ। এই স্থলে চান্দ্র জ্যোতিষের প্রস্তাবান্তর লিখিবার পূর্ব্বে দুই একটি দৃগ্ বিষয়ের লক্ষণ করা আবশ্যক। যখন কোন জ্যোতিষ্কের ও রবির ভোগ সমান হয়, অর্থাৎ রবি যে রাশি নক্ষত্রাদিতে আছেন, সেই রাশি নক্ষত্রাদিতে যদি কোন গ্রহ উপগ্রহাদি থাকে তবে রবির সহিত এই জ্যোতিষ্কের সমাগম হইল বলা যায়। চন্দ্রের সমাগমের বিশেষ নাম অমাবস্যা। আর যখন কোন জ্যোতিষ্ক রবি হইতে ষড়ভান্তরে থাকে অর্থাৎ রবি হইতে জ্যোতিষ্কের অন্তর ৬ রাশি (১৮০°) হয়, তখন উক্ত জ্যোতিষ্কের রবি সম্বন্ধে সেই অবস্থানকে বিপর্য্যাস বলে। চন্দ্রের বিপর্য্যাসের নাম পূর্ণিমা। গ্রহ যদি রবি হইতে ৯০° বা ২৭০° অন্তরে থাকেন তবে গ্রহকে পদান্তরস্থ বলে, বৃত্তের পাদচতুষ্টয়ের মধ্যস্থলকে পাদার্দ্ধ বলে।

অমাবস্যাকে ইংরাজিতে রবির সহিত চন্দ্রের Conjunction বলে,
পূর্ণিমাকে ;; ,, Opposition ,, এবং
পাদন্তরস্থকে ,, ,, Quadrature বলে।

ক্রান্তি বৃত্তের ক্ষেত্রে, ক্রান্তি বৃত্তদ্বারা চন্দ্রকক্ষার, বা গ্রহ কক্ষার যে দুই স্থানের ছেদ হয়, সেই স্থানদ্বয়কে পাত বলে। যে পাত হইতে জ্যোতিষ্ক উত্তরে গমন করে, সেই পাতকে আরোহণ পাত (Ascending nobe), আর যে পাত হইতে দক্ষিণে আসে, সেই পাতকে অবরোহণ পাত (Descending node) বলে চন্দ্রের আরোহণ পাতের নাম রাহু,আর অবরোহণ পাতের নাম কেতু। আরোহণ পাতকে সিদ্ধান্তে পাতমাত্র বলে এবং অপর পাতকে ষড়্ভ পাত বলে।

চন্দ্রের ভগণ। যে সময়ের মধ্যে কোন গ্রহ বা উপগ্রহ দ্বাদশ রাশি অর্থাৎ সমস্ত নভোমণ্ডল একবার পরিভ্রমণ করে সেই সময়কে সিদ্ধান্তীরা ভগণ বলেন। ইউরোপীয়েরা ইহাকেই গ্রহ বা উপগ্রহের Period বলেন। শুক্লা রজনীতে কিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে অচিরে উপলব্ধি হয়, যে সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্র পূর্ব্বাভিমুখে অর্থাৎ আহ্নিক গতির বিপরীত দিকে তারাগণ মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন। চন্দ্র এক দিনে সূর্য্য অপেক্ষা বহুগুণে অধিক দূর যান! চন্দ্রের গতি সব দিন সমান নহে;—গতির বিরাম বা বক্রতা নাই, অর্থাৎ বুধ আদি তারাগ্রহগণে যেমন যাইতে যাইতে দুই এক দিন যেন থামিয়া গেলেন অথবা যেন পিছাইয়া পড়িলে নবলিয়া বোধ হয়, চন্দ্র তেমন নহেন ইনি প্রতি-নিয়ত পূর্ব্ব দিকে চলিতেছেন। যদিও তারানাথের অশ্বিন্যাদি সাতাইশ মহিষী আছেন তথাপি তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত দেখা করিয়া মাত্র চলিয়া যান, কাহারও বাসগৃহে অবস্থিতি করেন না, তাঁহার কেউ সুয়া কেউ দুয়া নাই। এই রূপে তিনি কিঞ্চিদধিক ২৭ দিনে রাশি চক্র পরিভ্রমণ করেন। এতদ্দ্বারা বোধ হয় ভূপরিতঃ চন্দ্র পরিভ্রমণ করি-তেছেন বা চন্দ্র পরিতঃ পৃথ্বী পরিভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু শাস্ত্র সঙ্গত কথা এই যে উভ-য়ের যে ভারমধ্য সেই বিন্দুর চারিদিকে উভয়েই ঘুরিতেছে। উভয়ের ভার মধ্য কোন খানে?

ভূচন্দ্রের ভারমধ্য।—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে স্বীকার করা গিয়াছে যে চন্দ্র অপেক্ষা পৃথিবী ৮৮ গুণে ভারি; আর চন্দ্র মণ্ডলের মধ্য হইতে ভূমণ্ডলের মধ্য ২,৩৮, ৪৭১ মাইল; অতএব উভয় মণ্ডলের ভারমধ্য ভূগর্ভ হইতে ২৬৮৩ মাইল চাঁদের দিকে বা ভূপৃষ্ঠ হইতে ১২৮০ মাইল ভূগর্ভের দিকে। এই বিন্দু পরিতঃ পৃথ্বী এবং চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছেন। এই ভারমধ্য নিরূপণ করা কিছু শক্ত কথা নহে। একটা ৮৯ ইঞ্চ লোহার শলা লও। উহার এক দিকে চন্দ্রের স্থানে ১ সেরা একটা বাটখারা ঝুলাও, এবং অপরদিকে পৃথিবীর পরিবর্ত্তে ২টা মোণ ১টা পসরি ১টা ২৷৷০ এবং একটা ৷৷০ সিরে দাও অর্থাৎ ৮৮ সের দাও। এখন যদি শলাটার ওজন হিসাবের মধ্যে না ধর তবে দেখিবে যে ৮৮ সের, যে দিকে আছে সেই দিক হইতে ১ইঞ্চ তফাতে শলা ধরিয়া তুলিলে কোন দিক ঝুকিবেনা, ওজন সই সই হইবে অর্থাৎ পৃথিবী : চন্দ্র :: ৮৮ : ১ :: পৃথিবীর মধ্য হইতে ভার মধ্য : চন্দ্রের মধ্য হইতে ভারমধ্য। সমস্ত অন্তরকে ৮৯ দিয়া ভাগ করিলে ফল ২৬৮৩ মইল।

নাক্ষত্র ও সৌর ভগণ।—চন্দ্রের একবার রাশি চক্র ভ্রমণ করিতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ চন্দ্রের এক তারা হইতে প্রস্থান করিয়া পুনঃ সেই তারায় উপনীত হইতে যে সময় লাগে তাহাকে চন্দ্রের নাক্ষত্র ভগণ বলে। ইহার পরিমাণ ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১.৫ সেকেণ্ড অথবা ২৭.৩২১৫৮২ দিন।

চন্দ্রের এক ভভ্রমে অর্থাৎ ৩৬০° যাইতে ২৭.৩২১৫৮২ দিন লাগে, অতএব চন্দ্রের দৈনিক মধ্যম গতি ৩৬০° ÷ ২৭.৩২১৫৮২ = ১৩°১০′৩৫″০৪

দুই সমাগমের বা দুই বিপর্য্যাসের ব্যবহিত যে সময় তাহাকে সৌর ভগণ বলে। চন্দ্রের সৌর ভগণের নাম চান্দ্র মাস। অমাবস্যার অন্ত হইতে অমাবস্যার অন্ত পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম মুখ্য চান্দ্র মাস। আর পূর্ণিমার অন্ত হইতে পূর্ণিমার অন্ত পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম গৌণ চান্দ্র মাস।

চন্দ্রের নাক্ষত্র ভগণ অপেক্ষা চান্দ্র মাস ২ দিন ৫ ঘণ্টা ০মিনিট ৫১·৩ সে অধিক, কারণ গত অমাবস্যার পর গম্য অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে কাল সেই কালে রবি যতটুকু অগ্রসর হন, সেই বৃত্তাংশাদি দিন গতি ১৩° ১০′ ৩৫″·৩০ এর হিসাবে যাইতে চন্দ্রের দি ২। ৫। ০। ৫১·৩ সেকেণ্ড লাগে সুতরাং মধ্যম চান্দ্র মাস ২৯ দি ১২ ঘ ৪৪ মি ২·৮ সে এ হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে চন্দ্রের এক নাক্ষত্র ভগণ কাল ২৭ দিন ১৯ দ ১৮ প ০·১৬ বিপ অর্থাৎ ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মি ১২·০৬ সে এবং চান্দ্র মাস ২৯ দি ৩১ দ ৫০ প ০·৭০ বিপ অর্থাৎ ২৯ দি ১২ ঘ ৪৪ মি ০·২৮ সে

যুগে·ইন্দো রসাগিত্রিত্রীষুসপ্তভূধরমার্গনাঃ। ১ ৩০। সূ. সি.। অর্থাৎ ৪৩,২০,০০০বৎসরে ৫,৭৭,৫৩,৩৩৬ ভগণ হয়।

ভবন্তি শশিনো মাসাঃ সূর্য্যেন্দুভগনান্তরং। ১। ১৫। সূ. সি.। অর্থাৎ ৪৩,২০,০০০ ৎসরে (৫,৭৭,৫৩,৩৩৬) − (৪৩,২০,০০০) = ৫৩৪৩৩৩৩৬ মাস হয়।

চন্দ্র মাস নিরূপণ।—চন্দ্র গ্রহণ দেখিয়া মধ্যম চান্দ্র মাসের পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম রূপে অবধারিত করা যাইতে পারে। গ্রহণ মধ্য প্রায় ঠিক পূর্ণিমান্তে ঘটে। অতএব গ্রহণ দেখিয়া অনায়াসে পূর্ণিমান্তে ঠিক করা যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কালাবধি গ্রহণ দেখিয়া আসা হইতেছে। ঋগ্বেদে একটি গ্রহণের উল্লেখ আছে। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের গ্রহণের বিষয় লেখা আছে খৃ অব্দের ৭২০ বৎসর পূর্ব্বের একটি গ্রহণের কথা কেলডিয়ার খালিদীয়া জ্যোতির্বিদেরা লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রহণের কাল আর আধুনিক গ্রহণের কাল এই উভয়ের ব্যবধান দ্বারা মধ্যম চান্দ্র মাস সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নিরূপিত হইয়াছে। চন্দ্রের ভগণ কিরূপে নিরূপণ করিতে হয় তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

খৃ.অ.১৭১৮, ৯ সেপটেম্বর ৮ ঘণ্টা ৪ মিনিটের (পারি সময়) সময় চন্দ্রের গ্রহণ মধ্য ঘটিয়াছিল, তখন সায়ন স্ফুট রবি ৫ রাশি ১৬° ৪০″। আবার ১৭১৯, ২৯ আগষ্ট তারিখে আর এক চন্দ্র গ্রহণ হয় ; উহার মধ্য ৮ ঘ ৩২ মি এর সময় ঘটিয়াছিল, এ সময়ে স্ফুট সায়ন রবি ৫ রাশি ৫° ৪৭′। গ্রহণ দ্বয়ের ব্যবধান এই ৩৫৪ দিন ২৮ মিনিটের মধ্যে চন্দ্রের সমস্ত আকাশ পূর্ণ ১২ বার ঘুরা হইয়া ৩৪৯° ৭′ বেশী যাওয়া হইয়াছে। অতএব ৩৫৪ দিন ২৮ মিনিটকে ১২ ভগণ, ৩৪৯°৭′ দিয়া ভাগ দিলে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৬ মিণিট এক ভগণের কাল হইল। গ্রহণ দ্বয়ের ব্যবধানের স্বল্পতা প্রযুক্ত ভগণ কাল কিছু স্থূল হইল। যাহা হউক এতদ্দারা দীর্ঘতর ব্যবধান বিশিষ্ট দুই গ্রহণের তুলনা বেশ চলিবে।

১৭১৭ খ. অব্দে ২৬ মার্চ তারিখে পারি নগরে রাত্রি ৩ ঘ ১৬ মি এর সময় চন্দ্র গ্রহণের

মধ্য দেখা গিয়াছিল; তৎকালে সায়ন স্ফুট রবি ০রা. ৬°. ২১'। ১৬৯৯, ১৫ মার্চ রাত্রি ৭ ঘ ২৩ মি এর সময় উক্ত নগরে আর এক চন্দ্র গ্রহণ দেখা গিয়াছিল; তৎকালে সায়ন স্ফুট রবি ১১.রা. ২৫°. ৩০'। ব্যবধান হইল ১৮ ব ১১ দি ৭ ঘ ৫৩ মি, ইহার মধ্যে ৪ টি লিপ্‌ইয়ার অর্থাৎ ৩৬৬ দিনের বৎসর এই কাল মধ্যে চন্দ্রের কতিপয় ভভ্রম+১০°৫১' ভ্রমণ করা হইয়াছিল। এই দিনরাশি ৬৫৮৫ দি ৭ ঘ ৫৩ মি কে ২৭ দি ৭ ঘ ৬ মি দিয়া ভাগ দিলে ২৪১ পূর্ণ ভভ্রম হয়, আর প্রায় ১/৮। তবেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে ২৪১ ভভ্রম অবশ্য হইয়া থাকিবে। এখন যদি ৬৫৮৫ দি ৭ ঘ ৫৩ মি কে ২৪১ ভভ্রম + ১০°. ৫১' দিয়া ভাগ দাও, তবে ২৭ দি ৭ ঘ ৪৩. মি ৬ সে পাইবে। এই হইল পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভগণ কাল। এতদ্দ্বরা সুদূরবর্ত্তী গ্রহণদ্বয় বিচার করিয়া চন্দ্রের ভগণ কাল যথোচিত সূক্ষ্মরূপে বাহির করা যাইতে পারে।

১৭১৭,২০ সেপ্টেম্বর ৬ঘ ২ মি এর সময় পারি সহরে গ্রহণ মধ্য দেখা গিয়াছিল। পুলমী লিখিয়াছেন যে ৭২০ খৃ অব্দের পূর্ব্ব ১৯ মার্চ্চ তারিখে বাবিলন নগরে ৯ঘ ৩০ মিনিটের সময় চন্দ্র গ্রহণের মধ্য দেখা গিয়াছিল; তখন পারি নগরের সময় ৬ঘ ৪৮ মি। উক্ত গ্রহণ দ্বয়ের ব্যবধান ২৪৩৭ বৎসর ১৭৩ দিন ১৪ মি, ইহার মধ্যে ৬০৯ লিপ্‌ইয়ার। এই কালকে ২৭ দি, ৭ঘ, ৬সে, দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল কিঞ্চিদধিক ৩২৫৮৫১/২ ভভ্রম হয়। উক্ত গ্রহণদ্বয়ের সময়ে রবির ভোগের অন্তর ৬রা ৬° ১২' অতএব ২৪৩৭ বৎসর ১৭৩ দিন ১৪ মি এ চন্দ্রের ৩২৫৮৫ ভভ্রম+৬রা. ৬°. ১২'' গতি হইয়াছিল; তবেই এক ভভ্রম প্রতি ২৭ দি. ৭ঘ. ৪৩মি. ৫সে. পড়িল। এ পরিণাম অতি সূক্ষ্ম, কারণ উভয় গ্রহণ কালে নীচোচ্চ রেখা হইতে চন্দ্রের অবস্থান প্রায় সামান্তরে ছিল! এতদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হইল যে চন্দ্রের দৈনিক গতি ১৩°. ১০' ৩৫", এবং মধ্যম হোরেগ্রী গতি ৩'২. ৫৬''৪৬। ভভ্রমের পরিমাণ ২৭। ৭।৪৩। ৫! দিনাদি বলা হইল, ইহা সায়ণ হিসাবে জানিবেন। নিরয়ণ হিসাবে উহা (পূর্ব্বেই বলিয়াছি) ২৭। ৭। ৪৩। ১১·৫ দিনাদি হইবে। কারণ অয়নাংশ বর্ষে ৫০·২৫ অর্থাৎ মাসে ৪''; তবেই এই ৪'' যাইতে চন্দ্রের প্রায় ৭'' লাগে, সুতরাং নিরয়ণ হিসাবে ভভ্রমের পরিমাণ ৭'' অধিক ধরিতে হয়। জ্যোতির্বিদেরা অনেক হিসাব পত্র দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে নিরয়ণ ভভ্রম কাল ২৭ দিন. ৭ঘ. ৪৩ মি. ১১·৫২৫৯ সে হওয়া উচিত।

চন্দ্রের পথ। যথোচিত যন্ত্র সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে অবগতি হইবে যে চন্দ্রের বিষুবাংশ কত হইল অর্থাৎ চন্দ্র ক্রান্তিপাত হইতে বিষুবন্মণ্ডলের হিসাবে কতদূর পূর্ব্বে আসিয়াছেন এবং বিষুবন্মণ্ডল হইতে কতদূর উত্তরে বা দক্ষিণে আছেন। নাক্ষত্র ঘটিকা দ্বারা বিষুবাংশ পাওয়া যায়; আর ভিত্তচক্র দ্বারা ক্রান্তি পাওয়া যায়। বিষুবাংশ আরক্রান্তি পাইলেই ভোগ আর বিক্ষেপ হিসাব করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কতিপয় দিন উপর্য্যুপরি পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, যে চন্দ্রের পথ ক্রান্তিবৃত্ত নহে, অর্থাৎ যে পথে সূর্য্য চলেন সে পথে চন্দ্র চলেন না; চন্দ্রের পথ স্বতন্ত্র। চন্দ্রের পথ সূর্য্যের পথকে এড়োভাবে

দুইটি বিপরীত বিন্দুতে কাটিয়া যায়। উভয় পথের অন্তর্গত যে কোণ তাহার মধ্যম পরিমাণ ৫°. ৮′. ৪৮″; অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তে চন্দ্রকক্ষার অবনতি ৫°. ৮′. ৪৮″।

গ্রহ কক্ষাদ্বয়ের যে দুই বিন্দুতে কাটাকাটি হয় সেই বিন্দু দুইটির নাম পাত। ক্রান্তিবৃত্তে চান্দ্রকক্ষার যে পাতদ্বয় তাহার একটির নাম রাহু অপরটির নাম কেতু। চন্দ্র যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে যান, সেই বিন্দু হইল রাহু, আর যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে যান, সেই বিন্দু হইল কেতু। চন্দ্র যখন পাতে আসেন, তখন যদি তাঁহার ভোগ ৯০° বা ২৭০° হয়, তবে বিক্ষেপ ৫° এবং অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে চন্দ্র পাতস্থ হইলে বিক্ষেপের পরম পরিমাণ ৫° ১৮′ হয়। মধ্যম অবনতির সূক্ষ্ম পরিমাণ ৫° ৮′ ৩৯″. ৯৬। সূর্য্যে সিদ্ধান্ত মতে অবনতির পরম পরিমাণ ৪° ৩৩′।

ভচক্রলিপ্তাশীত্যংশপরমং দক্ষিণোত্তরম্।
বিক্ষিপ্যতে স্বপাতেন স্বক্রান্ত্যন্তাদনুষ্ণগুঃ। ১। ৬৮।
দক্ষিণোত্তরতোহপ্যেবং পাতোরাহুঃ স্বরংহসা
বিক্ষিপত্যেষ বিক্ষেপ চন্দ্রাদীনামপক্রমাৎ। ২। ৬।
উত্তরাভি মুখং পাতো বিক্ষিপত্যপরার্দ্ধগঃ।
গ্রহং প্রাগ্ভগণার্দ্ধস্থো যাম্যাযামপকর্ষতিঃ।

মীর কাসিম।

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্ধু বিচ্ছেদ।

Mir Kasim was a man of a stamp different to that of his father-in-law. The pliant disposition which had caused the latter to bent on every decisive occation to the will of his European masters' did not belong to his nature.—col. Malleson.

ইংরাজেরা মীর জাফরকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিতেন, কিন্তু মীর কাসিমকে ইচ্ছামত পরিচালনা করার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না;—তাঁহার চরিত্র স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। এই জন্য শীঘ্রই বন্ধু বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল!

দোষ কাহার? তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা করিতে হইবে। সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইংরাজদিগের সহিত শত্রুতা সাধন করিতে গিয়াই মীর কাসিম সিংহাসনচ্যুত হন, কিন্তু ঐ সকল ইতিহাসে শত্রুতা সাধনের মূল কারণগুলি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না।

বাণিজ্যলব্ধ অর্থলাভের জন্যই ইংরাজেরা এ দেশে প্রথম পদার্পণ করেন। এ দেশ তখন

মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল। সুতরাং তাঁহারা ইংরাজ বাণিজ্যে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেই ইংরাজদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। মীর কাসিমের সময়েও তাহাই হইল।

সেকালের কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ রাতারাতি বড়মানুষ হইবার জন্য বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কোম্পানীর অধীনে যৎসামান্য বেতনে চাকরী করিয়া কাহারই তৃপ্তি হইত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভিন্ন আর কাহারও বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিলনা। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত "দস্তক" নামক পরোয়ানা দেখাইয়া জলে স্থলে যথেচ্ছভাবে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই বন্ধু বিচ্ছেদের মূল।

একমাত্র গভর্ণর ভান্সিটার্ট এবং স্বনামখ্যাত ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভিন্ন কলিকাতার ইংরাজ-দরবারের সমস্ত সদস্য স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন; ইঁহাদের সকলেরই তাহাতে বিলক্ষণ লাভের সংশ্রব ছিল। লাভের লোভে অন্ধ হইয়া এই সকল ইংরাজ পুরুষেরা কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; কেহ বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে চাহিতেন না, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয় ডিরেকটারগণ নিষেধ করিলেও নিষেধ মানিতেন না! ইঁহারা স্বাধীন বাণিজ্যের দোহাই দিয়া দেশের লোকের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ করিতেছেন দেখিয়া মীর কাসিম স্থির থাকিতে পারিলেন না। মীর কাসিমকে প্রতিবাদ করিতে দেখিয়া কলি-কাতার ইংরাজগণ বদ্ধপরিকর হইয়া কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভান্সিটার্ট এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কৃপায় এই কলহের কাহিনী জনসমাজে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

ইংরাজ বণিকের উৎপীড়ন নিবারণ করিবার জন্য মীর কাসিম সরল ভাবে গভর্ণরের শরণাপন্ন হন। অভিযোগের মূলানুসন্ধানের জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উপর ভারার্পণ করিয়া ভান্সিটার্ট নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংশ মূলানুসন্ধান করিতে বসিয়া যাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে:—

"Mr. Hastings states that time the Governor has desired him to lay before us a letter he received in the month of June from one serjeant brejo, whom he sent up to Backergung at the Nabob's request for the protection of that place, and requests it may be entered, as it may serve to show what occasion for complaint has been given by our gomastas at those factories. He further adds that Mr. Vansittart has received private intelligence that a party of Sepoys were sent to Sylhet by the gentlemen at Dacca, on account of some Private dispute, who fired upon and killed one of the principal people of the place, and afterwards made the zamindar prisoner and forcibly carried him away." *

* Proceedings of council, october 14, 1792.

সমুদায় ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, কলিকাতার ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের উৎপীড়নে বাঙ্গালা দেশ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল; নবাবের কর্ম্মচারিগণ তাহার গতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, জমিদারবর্গ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন!

কালক্রমে এই সকল অত্যাচার কাহিনী বিলাতের ডিরেক্টারদিগেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

"We positively direct, as you value our service, that you do immediately acquaint the Nobab, in the company's name, that we disapprove of every measure which has been taken in real prejudice to his authority and Government, particularly with respect to the wronging him in his revenues by a shameful abuse of *dusticks*. *

বিলাতের ডিরেক্টারদিগের সাধু সংকল্পেও কোন ফল হইল না; ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার অক্ষুণ্ণ প্রতাপে প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে লাগিল। লোভান্ধ ইংরাজগণ নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে নানা রূপ অলীক অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া আত্মাপরাধ ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাসিম আলি প্রজারক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া ইংরাজদিগকে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাবের আদেশে ফৌজদারগণ কোন কোন ইংরাজ বণিকের মুচলিকা লইবার চেষ্টা করায় হিতে বিপরীত হইল। অবশেষে গভর্ণর ভান্সিটার্ট প্রকৃত অবস্থার সন্ধান লইবার জন্য এক পরোয়ানা দিয়া গঙ্গারাম মিত্রকে মফস্বলে পাঠাইয়া দিলেন। ভান্সিটার্টের পরোয়ানা খানি এইরূপ :—

I am acquainted that Mr. Chevalier, Mr. Texeira, and sundry English gomastas, without either *dustuct* or order form the Huzoor, do in the pergunnah of Ragshahy and other district in the zemindary of Ranee Bhobany, oppressly stop and embargs goods, and force people to buy, by which the inhabitants are obliged to fly the country and the king's revenues are greatly prejudiced. I therefore send you with some Burkendages. You must, on your arrival at the said pergaunah, prevent those people who have raised such disturbances, who, if they mind you it will be well if not, whatever oppressins they have deen guilty of you must make yourself fully acquainted with, and send to me an authentic account of the

* Court's letter, December 30, 1762, para 81.

same and agreeably there to I shall take account of their oppressive proceedings and punish them. ‡

ইহাতেও আশানুরূপ ফল হইল না ;—দেশীয় বণিকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে লাগিলেন, দেশীয় বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, রাজকোষের ক্ষতি হইতে লাগিল এবং দেশের লোক কাঙ্গাল হইয়া পড়িল !*

কাসিম আলি পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিয়াও অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপনার্থ গভর্ণর ভান্সিটার্ট স্বয়ং মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

ভান্সিটার্ট এবং কাসিম আলি অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন ; অবশেষে স্থির হইল যে ইংরাজদিগকে শতকরা নয় টাকা হিসাবে ও দেশীয় বণিকগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। বলা বাহুল্য কাসিম আলি ইহাতে সহজে সম্মত হইলেন না ; কেবল আশু শান্তি সংস্থাপনের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে সম্মতিজ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে ইহাতেও যদি ইংরাজদিগের চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা না হয়, তবে তিনি দেশের লোকের বাণিজ্য রক্ষার জন্য শুল্ক উঠাইয়া দিয়া শ্বেত কৃষ্ণকে সমান অধিকার প্রদান করিবেন !

গভর্ণর ভান্সিটার্ট কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে না করিতে তাঁহার উপর ইংরাজ মাত্রেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন ; তাঁহারা কেহই শতকরা ৯৲ টাকা হিসাবে শুল্ক দানে সম্মত হইলেন না। কেবল লবণের ব্যবসায়ে শতকরা ২।।০ টাকা ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ে শুল্ক দান করা কাহারও মত হইল না।

এই সকল বাদানুবাদের সময়ে গভর্ণর ভান্সিটার্ট যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার সারাংশ এইরূপ :—

For my own part, I think that the honour and dignity of our nation would be better maintained by a scrupulous and careful restraint of the *dustuck*, than by extending it beyond its usual bounds, and by putting our gomastas under some checks, than by suffering them to exercise our authority in the country, everyone according to the means put into his hands, and thereby bringing an odium upon the name of the English by repeated violence done to the inhabitants.

‡ proceedings. January 17, 1763.

* The results of this shameful of oppressive system were that the respectable class of native merchants were ruined, whole districts became impoverised, the entire native trade became disorganized.—Malleson's decisive battles of India, 145.

ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রাণপণে গভর্ণরের পক্ষ সমর্থণ করিয়া হৃদয় বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

Such a system of Government can not fail to create in the minds of the wretched inhabitants an abhorrence of the English name, and authority, and how will it be possible for the Nobab, whilst he heard the cries of his people which he can not redress, not to wish to free himself from an alliance which subjects him to such indignities? *

ওয়ারেণ হেষ্টিংস মীর কাসিমের অবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কাসিমআলি যখন শুনিলেন যে কলিকাতায় ইংরাজগণ ভান্সিটার্টের কথা ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন, শতকরা নয় টাকা হিসাবেও শুল্ক দিতে অসম্মত, তখন তিনি রোষে ক্ষোভে ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন এবং দেশীয় বাণিজ্যের জীবনরক্ষার্থে শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ দূর করিয়া সর্ব্ব প্রকার বাণিজ্য শুল্ক রহিত করিবার জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

এই বিখ্যাত ঘোষণাপত্র ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ (১৯ সাবান তারিখে) রাজা নহবৎ রামের বরাবর লিখিত হইয়াছিল। ইহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ এইরূপ :—

Having been certainly informed that the greater part of merchants of my country have suffered considerable losses, and have laid aside all traffic, sitting idle and unemployed in their houses.

Therefore with view to the welfare and quiet of this kind of people, I have caused all duties of customs, Chowkeedarry Managah, collections upon newbuilt boats and other lesser taxes by land and water, for two years to come, to be removed, and my sunnud is accordingly sent to enforce it.

দেশের মধ্যে কাসিম আলির রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইতে না হইতে ইংরাজ মণ্ডলীতে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহাদের ইচ্ছা যে কেবল তাহারাই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, নবাব সকল শ্রেণীর প্রজার জন্য বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দান করায় তাঁহাদের স্বার্থনষ্ট হইল। ইংরাজেরা বলিয়া উঠিলেন, কাসিম আলির আদৌ এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচার করিবার অধিকার নাই।

† Hasting's Minute, proceedings March 2. 1763.

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। সুর—ঐ

মিশ্রকানাড়া—একতালা।

আমি সকলি দিনু তোমারে, মম নাথহে, প্রাণনাথ হে!
তাহে সিঞ্চিয়া তব পুণ্য-বারি রাখিয়ো তব সাথ হে।
যাহা বিফল হল এ জনমে, তাহা সফল করিয়ো কালে,
যাহা পঙ্কিল তাহা নাশিও মম জটিল জীবনজালে।
লহ লজ্জা, নাথ হে, ওহে লজ্জা-নিবারণ!
মম সুখ-আশা-স্মৃতি লহ হে, ওহে সকল সুখের কারণ!
মম দুঃখ-সিন্ধু মথিয়া, লহ অমৃতে উদ্ধারি,
মম বাসনা সব লীন হোক ইচ্ছায় তোমারি।

আ

॥৩॥ [স১ স১ । র১ ম১ র১ । ম১ প১ ধ১ । ধনো১ ধ১ নোর্স১ । নো১
আ মি স ক লি দি নু তো মা — রে —

ধ১ পধ১ । মপ১ মপধ১ প১ । ম১ গোর১ স১ । রম১ রম১ ম১ । প১]
ম ম না — থ হে প্রা ণ না — থ হে]

শেষ।

প১ পধ১ । ম১ প১ প১ । প১ প১ ধপ১ । ম১ প১ প১ । র্সন১ র্স১ র্স১ ।
তা হে সি — ঞ্চি য়া ত ব পু — ণ্য বা — রি

নোধ১ নো১ ধ১ । প১ প১ পধপ১ । ম১ প১ প১ । র্সন১ র্স১ র্স১ । নো১
সি — ঞ্চি য়া ত ব পু — ণ্য বা — রি রা

ধ১ নোধ১ । প১ প১ পধপ১ । মপ১ মপধ১ প১ । ম১ গোর১ স১ ॥ প১
— খি য়ো ত ব সা — থ হে আ মি যা

(আ—প্র)

পধপ১ । [ম১ প১ প১ । পন১ ন১ ন১ । ন১ র্স১ র্স১ । নর্স১ র্স১ র্স১ ।
হা [বি ফ ল হ ল এ জ ন মে — তা হা

র্সন১ র্স১ র্র১ । র্রম১ র্র১ র্স১ । নর্স১ নর্সর্র১ র্স১ । নো১ ধ১ পধ১ ।] ম১
স ফ ল ক রি ও কা — লে — যা হা] প

প১ প১ । প১ প১ পধপ১ । ম১ প১ ন১ । র্সর্র১ র্স১ র্স১ । নোধ১ নো১ ধ১ ।
— ঙ্কি ল তা হা না — শি ও যা হা প — ঙ্কি

প১ প১ ধপ১ । ম১ প১ ন১ । র্স১ র্স১ র্সনো১ । নো১ ধনো১ পধ১ । মপ১
ল তা হা না — শি ও ম ম জ টি ল জী

মপধ১ প১ । মগো১ রগোম১ র১ । স১ স১ স১ ॥ [স১ সরস১ । সন্২ স১ । —১
ব ন·· জা — লে — আ মি [ল হ ল জ্জা —

র১ গ১ । ম১ প১ ধপ১ । ম১ গ১ মগ১ । র১ প১ পম১ । ধ১ প১ মপ১ ।
না থ হে — — — ও হে ল — জ্জা — নি —

মর১ ম১ র১ । স১] প১ পধপ১ । [ম১ প১ প১ । ন১ র্স১ র্সর্রর্স১ । নো১ ধ১
বা — র ণ] ম ম [সু খ আ শা স্মৃ তি ল হ

(আ—প্র)

র্স নো১ { —১ ধ১ পধ১ । }] —১ ধ১ পধ১ । ম১ মনো১ নোধ১ । প১ ম১
হে { — ম ম }] — ও হে স ক ল সু খে

প১ । মর১ ম১ র১ । স১ প১ পধপ১ । [ম১ প১ প১ । পন২ ন১ । ন১ র্স১
র কা — র ণ ম ম [দুঃ — খ সি ন্ধু ম থি

র্স১ । নর্স১ র্স১ র্স১ । র্সন১ র্স১ র্র১ । র্ম১ র্র১ র্স১ । ন১ র্সর্র১ র্স১ । নো১
য়া — ল হ অ মৃ তে — উ — দ্ধা — রি —

ধ১ পধপ১ ।] ম১ প১ প১ । প১ প১ প১ । ম১ প১ প১ । র্সন১ র্স১ র্স১ ।
ম ম] বা — স না স ব লী — ন হো — ক

নোধ১ নো১ ধ১ । প১ প১ পধপ১ । ম১ প১ প১ । র্সন১ র্স১ র্স১ । নো১ ধ১
বা — স না স ব লী — ন হো — ক ই —

ধনো১ । প১ প১ পধ১ । মপ১ মপধ১ পম১ । গো১ র১ স১ ॥
চ্ছা — য় তো মা — রি — আ মি

(আ—প্র)

পাণ্ডারপুর।

পাণ্ডারপুর বোম্বাই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। বিঠোবাদেব এই পুণ্য স্থানের অধিষ্ঠাতৃ দেব। ইনি কৃষ্ণেরই অবতার বিশেষ বলিয়া কথিত। নামটি বিষ্ণুনামের অপভ্রংশ বলিয়াই আমার মনে হয়। কালোরূপে আমাদের দেশের কৃষ্ণ মূর্ত্তিকেও ইনি হার মানাইয়াছেন। বিঠোবাদেব দর্শনে পাণ্ডারপুরে আষাঢ়ি এবং ফাল্গুনি মেলায় দিগ্বিদিক হইতে এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। আমরা যদিও অসময়ে গিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে দেবদর্শনের কোন ব্যাঘাৎ ঘটে নাই ভরসা করি অনুমিত পুণ্য লাভেরও কোন ব্যতিক্রম ঘটিবেনা। হরিশ্চন্দ্রের অবস্থাটা লোভনীয় নহে, নহিলে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিতাম এমনতর নির্ব্বিকার নিষ্কাম তীর্থ যাত্রায় যদি চরম ও পরম পুণ্য না মেলে তাহা হইলে শাস্ত্রই মিথ্যা। কেননা সামান্ত বা অসামান্ত গুপ্ত বা প্রকাশ্য কোনরূপ কামনা পরবশ হইয়া আমরা পাণ্ডারপুর যাত্রা করি নাই আমাদের সেখানে গমন কেবল মকদ্দমা সূত্রে।

পাণ্ডারপুর সোলাপুরের বিচার বিভাগের অন্তর্গত। সেখানকার দেবপুরোহিতগণ দেবতাকে লইয়া আপনাদিগের মধ্যে মহা বিবাদ বাধাইয়াছে, তাহার নিষ্পত্তির জন্য ভ্রাতা

মহাশয়ের এখানে আগমন; আমরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী।—দেবতার অদৃষ্ট ফলাফল এবার মনুষ্যের হাতে—ইনি এখন দেবতারো দেবতা।—

এ দেশে 'লোকপ্রিয়' এই বিশেষণটি জজ সাহেবের নামের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বন্ধ। লোকপ্রিয় ঠাকুর সাহেবের অভ্যর্থনায় পাণ্ডার পুরে মহোৎসব চলিতেছে। ভীমা নদী-তীরে ক্রম রথবেষ্টী, হস্তী অশ্ব জন সঙ্কুল, বাদ্য বাদন ঘোষী স্বাগত ও বিদায় উৎসব এবং পাণ্ডার পুর অবস্থিতি কালীন দৈনন্দিন অভ্যর্থনা অভিনন্দনের বিরাট সভা, অগ্নিবাজি মন্দির দর্শন, স্কুল পারিতোষিক প্রদান, গৃহে গৃহে পানসুপারির নিমন্ত্রণ প্রভৃতি তাঁহার সম্মানার্থে প্রতিদিন বার ঘণ্টায় তের পার্ব্বনের অনুষ্ঠান,—সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ভাগ্যিস বিঠোবাদেব ইহুদিদিগের ঈর্ষাপরায়ণ দেব নহেন।

পুরোহিতগণ এখানে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বড়্‌বে ও সেবাধারী। আমার মনে হয় বড়্‌বে ও বড়ুয়া একই শব্দ, দেশভেদে উচ্চারণে ঈষৎ প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। বড়ুয়াগণই প্রধান পাণ্ডা—সেবাধারাগণ পূজারী মাত্র। বড়ুয়াগণ বলে তাহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ সেবাধারীদিগকে বেতন দিয়া পূজারি নিযুক্ত করেন। ইহারা উহাঁদিগের বংশানুক্রমিক দাসমাত্র। সেবাধারীগণ আপনাদিগের নিজস্ব অধিকার সপ্রমাণ করিতে চায়। ইহা লইয়া অনেকদিন হইতে উক্ত দুইদলের বিবাদ চলিতেছিল—হাইকোর্ট হইতে উহাদের পারস্পরিক অধিকার অনধিকার মীমাংসাও হইয়া গিয়াছে। দেব আয়ের কত অংশ কাহার প্রাপ্য দেব পূজার কোন্ কার্য্য কাহার, আরতিতে অধিকার কাহার, গহনা পরাইবার অধিকারী কাহারা, পাদ্য অর্ঘ্য দিবে কাহারা এ সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছে তথাপি কার্য্য স্থলে সে হুকুম নির্ব্বিবাদে পালিত হয় না, পূজার সময় এই সব খুঁটিনাটি লইয়া উভয় পক্ষে মহাদ্বন্দ্ব এমন কি মারামারি পর্য্যন্ত বাধে। সময় সময় পুলিসও তাহা-দিগকে নিবারণ করিতে পারে না। এই কারণে কিছু দিন হইতে দেবপূজাই বন্ধ। ইহাতে উভয় পক্ষেরি বিশেষতঃ বড়ুয়াদিগের বিস্তর ক্ষতি, কেননা দেবদক্ষিণার অধিকাংশ বড়ুয়াদিগেরই প্রাপ্য। কিন্তু সেবাধারীরা জবরদস্ত শত্রু বড়ুয়াদিগের অধিকার তাহারা সর্ব্বাংশে অবাধে স্বীকার করিতে চাহে না, প্রতিপদে বল পূর্ব্বক নিজ পক্ষের অধিকার গ্রহণ করিতে হইলে বড়ুয়াদিগকে দাঙ্গা করিতে হয়, ফৌজদারী মকদ্দামা বাধে—তাই সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল এই বাক্যের অনুসরণে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াও এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ইহারা দেব পূজা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে।

সেবাধারীরা আপাততঃ বড়ুয়াদিগের নামে এই বলিয়া মকদ্দামা আনিয়াছে যে দেবতা দিগের অলঙ্কার যাহা দেব সম্পত্তি তাহা বড়ুয়ারা আত্মসাৎ করিয়াছে আর দেবতার আয় যে পরিমাণে দেবকার্য্যে ব্যয় হওয়া উচিত তাহা না হইয়া অধিকাংশই বড়ুয়াদিগের ভোগে ব্যয়িত হয়। ইহার বিচার করিতে লোকপ্রিয় ঠাকুর সাহেবের এখানে আগমন,—এবং কোন না কোন পক্ষে অপ্রিয় ভাজন হইবারই তাঁহার সমূহ সম্ভাবনা।—

দেব পূজার সময় উভয় পক্ষে কিরূপ তুমুল দ্বন্দ্ব বাধে তাহা না দেখিলে বলিয়া বুঝাইবার নহে। উভয় পক্ষের মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীও যেন সে সময় প্রাণবন্ত বীর্য্যবন্ত হইয়া হুহুঙ্কারে সংগ্রাম রত হয়।—একজন বড়ুয়া পাণ্ডা প্রতিদিন ডাক বাঙ্গলায় আমাদের তত্ত্বাবধানে আসেন। আমাকে আক্কা দেবী নামে সম্বোধন করেন। দাক্ষী ভাষায় ভগিনীকে আক্কা বলে; ইঁহারা দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। ইহার শুষ্ক যষ্টিবৎ জীর্ণ দেহ ও নিরীহ ভক্তিময় শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ইহার প্রতি আমার নিতান্ত একটি সকরুণ বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে দাদা কোর্টে যাইবার পর আমি লিখিবার সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া

বারান্দায় আসিয়া বসি ; পাণ্ডামহাশয় সহসা আসিয়া নিঃশব্দে অভিবাদন পূর্ব্বক নীচে মাজুরে আসন গ্রহণ করেন।—আমি কলম রাখিয়া আতিথ্যধর্ম্ম স্মরণে অতিথির প্রীতি সম্পাদন অভিপ্রায়ে সহাস্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া—নানারূপ প্রশ্নের অবতারণা করি। কিন্তু বিনিময়ে প্রতিবার অতি বিনীত সংক্ষিপ্তসার উত্তর মাত্র পাইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের ভাণ্ডার আপনা হইতে ফুরাইয়া আসে, কথাবার্ত্তা নীরবতার পরিণত হয়—আমি তখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে কলম টানিয়া লইয়া মৌনে পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করি, তিনি একটি প্রাণহীন গৃহসরঞ্জামের মত নিঃশব্দে নিস্তব্ধে ভক্তিমান চিত্তে আমার কলমাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনা করিয়া বসিয়া থাকেন।—

লেখার মাঝে মাঝে আনমনে কখনো তাঁহার সহিত দুই একটি কথা কহি ; এবং প্রায়ই তাঁহার একশব্দে নিঃশেষ উত্তর ফুরাইবার পর সেই স্পন্দহীন মুখের দিকে চাহিয়া বাহিরের শীতরৌদ্রতপ্ত নিস্তব্ধ নিঃঝুম প্রান্তরে দণ্ডায়মান পত্রবিরল শীর্ণ তরুর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য অনুমান করিতে করিতে, দেশের কবিরাজী ঘৃতের স্থূলকারিতা শক্তির পরীক্ষা বাসনাকরি। একদিন দেখিলাম মিথ্যা অনুমান করি নাই। শুষ্ক তরু কঙ্কাল কয়লাতে নিহিত আগুনের ন্যায় ইহাঁর শুষ্ক দেহ যষ্টিতেও অসম তেজ লুক্কায়িত। কার্য্য স্থলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।—

বিঠোবা দেবের সালঙ্কৃত মূর্ত্তি দর্শন মহা পুণ্য বলিয়া কথিত। এই মহারূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহাদের ভাগ্যের জোর অর্থাৎ পয়সার জোর আছে তাঁহারাই পাণ্ডাদের নিকট হইতে এই এই পুণ্য ক্রয় করিতে সমর্থ। আমাদের ভাগ্য জোর আরো অধিক, বিনালাভে দেব পুরোহিতগণ আমাদিগকে দেবের সালঙ্কৃত মূর্ত্তি দেখাইয়া নিজেরাই সম্মানিত বিবেচনা করে। অসময়ে অলঙ্কার পূজা হইবে, এ সংবাদে মন্দির সম্মুখস্থ জনপদ জনাকীর্ণ। জন তরঙ্গ ভেদ করিয়া আমাদের গাড়ী যথাস্থানে আসিলে বড়ুয়াগণ দুই পার্শ্বে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া প্রহরী রূপে আমাদিগকে বহুকষ্টে ভিড়ের মধ্যে দিয়া হাঁটাইয়া মন্দিরের সদর দ্বারে আনয়ন করিল। দ্বারপথে আসিবা মাত্র প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লোক পঙ্গপালের মত মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহে।

পুরোহিতগণ আমাদিগের বডিগার্ড। প্রহরীদের দুই কার্য্য, প্রথম আমাদিগকে বিনা-কষ্টে মন্দিরে আনয়ন দ্বিতীয় যথাসাধ্য লোক প্রবেশ নিবারণ। সে সময় কি ভয়ানক কাণ্ড! ঠেলাঠেলি মারামারি বড়ুয়ার স্থলে সেবাধাবা সেবাধারীর স্থলে বড়ুয়া আক্রান্ত আহত। কেহ অনধিকারে প্রবেশকারী কেহ অধিকারে পলাতক ;—যাহারা এই যুদ্ধে অটলভাবে আমা-দের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিল—তাহারাই কৃতকৃতার্থ। যাহা হউক এই যুদ্ধের মধ্যে আমরা পুরোহিত বডিগার্ডের দ্বারা বেষ্টিত ব্যূহবদ্ধ হইয়া অক্ষত ভাবে মন্দির প্রবেশ করি-লাম—অমনি প্রকাণ্ড দ্বার বন্ধ হইল। ভাবিলাম এইবার বাঁচোয়া, কিন্তু দেখিলাম বাঁচিতে এখনো বিলম্ব আছে, ইহা যুদ্ধের আরম্ভ মাত্র—মন্দির গৃহে এখনোপ্রবেশ করা হয় নাই ; এ কেবল মন্দির দালানে ঢুকিলাম।—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করিতে সকলেই সচেষ্ট হইয়া আছে।—আবার একটা যুদ্ধায়োজন চলিতেছে। প্রাঙ্গন পার হইয়া আবার কয়েকটি সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া তবে মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। সোপানে উঠিবার সময় এমন তুমুল বিবাদ বাধিল যে তাহার মধ্য দিয়া সহজে মন্দিরে ঢোকা একরূপ অসাধ্য সাধন। প্রতি সোপানে ছোটখাট যুদ্ধ করিতে করিতে বডিগার্ডগণ আমাদের রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বীরত্বে কোন রকমে আমরা সোপানাবলির ভবনদী পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। রৌপ্য দ্বার তখন বন্ধ হইল। এই সমস্ত সময় আমার

সেই ক্ষীণকায় ভ্রাতাটি আমাদের পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই—যুদ্ধ করিতে করিতে বীর এবং ধীর ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। এক সময় একজন তাহার হাত এমন সজোরে টানিতেছিল—দেখিয়া মনে হইল এখনি তাহা ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কিন্তু কৌশলে তিনি আত্মরক্ষা করিয়া আমাদের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মনে হইল যথার্থই সেস্থলে প্রাণ দিতে হইলে তিনি কাতর হইতেন না।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঠাকুরের তখনো গহনাপরা শেষ হয় নাই। একজন বড়ুয়া তখনো তাঁহাকে অলঙ্কারে ভূষিত করিতেছে। মাথায় হীরক মুকুট ঝক্‌ঝক্ করিতেছে কণ্ঠে বড় বড় হীরা মুক্তার সহস্রলহর, হাতে হীরা মুক্তার নানারূপ অলঙ্কার। মারহাট্টা বস্ত্র পরিহিত বিঠোবা দেবের কৃষ্ণদেহ এই অলঙ্কার মালায় ভূষিত হইয়া মনোহর হইয়াছিল কিনা জানিনা আমরা মুগ্ধ হই নাই, কিন্তু চারি পাশে দর্শকেরা ভক্তিমান ভাবে আহা আহা করিতেছিল, আমরা ভাবিতেছিলাম অলঙ্কারগুলি দ্রষ্টব্য বটে। অলঙ্কার সজ্জা শেষ হইলে আরতি পূজা আরম্ভ হইবে, কিন্তু গোল উঠিল আরতির পূর্ব্বে যে অর্ঘ্য দিতে হয় তাহা কে দিবে? সেবাধারী না বড়ুয়া? বড়ুয়ারা আমাদের নিষেধ করিল আপনারা সেবাধারীর হাত হইতে অর্ঘ্য লইবেন না, তাহা আমাদের দেয়। এদিকে সেবাধারীরা আমাদিগকে ফুল চন্দন দিতে অগ্রসর—বড়ুয়ারা বাধা দিতে উদ্যত। ডেপুটিসাহেব স্বয়ং পুলিস লইয়া হাজির—কিন্তু তখন তাঁহাকে কে মানে? তাঁহার উপদেশ কে শোনে? পুলিসও জোর করিয়া দেবগৃহে প্রভুত্ব করিতে কুণ্ঠিত তাহারা ন যযৌ ন তস্থৌ। চারিদিকে মহা বিশৃঙ্খল পড়িয়া গেল আরতি হইবার আর সম্ভাবনাই রহিলনা আমরা তখন পূজা না দেখিয়াই মন্দির হইতে বিদায় লওয়া যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলাম। এমন কি এইরূপ দ্বন্দযুদ্ধে সেদিন ভাল করিয়া মন্দিরই দেখা হইল না। আর একদিন গোপনে বড়ুয়ারা আমাদের মন্দিরে লইয়া গেল।—বিঠোবার মন্দির এদেশের মন্দিরের মত নহে। তাহা চূড়াবিহীন দুই তিন প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সংযুক্ত বৃহৎ অট্টালিকা।—গলির উপরেই অট্টালিকার প্রশস্ত সোপানাবলী উঠিয়াছে। উপরের শেষ সোপানের দক্ষিণ দিকে কবি নামদেবের স্বর্ণমূর্ত্তি। দর্শকগণ মন্দির প্রবেশের সময় প্রথমে নাম দেবকে প্রণাম করিয়া তবে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। প্রাঙ্গনের পাশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির গৃহ। ইহাতে দেবপরিবারগণ অর্থাৎ রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে গরুড় গৃহ। গরুড় পক্ষীরূপী নহেন ইনি একটি মহারাষ্ট্রী বামন। স্থূল খর্ব্বকায়া চাপকানে আবরিত, মস্তকে বিশাল উষ্ণীষ, একটি চক্ষু রৌপ্য মণ্ডিত, সমস্ত লইয়া মূর্ত্তিটি কিম্ভূতকিমাকার।

দালানে বাজার বসিয়াছে ফুলই অধিক বিক্রয় হইতেছে। দালান পার হইয়া সিঁড়ির সাহায্যে বিঠোবার মহলে উপস্থিত হইতে হয়। বিঠোবার প্রকাশ্য অধিষ্ঠানস্থলের বাম পার্শ্বে আর একটি ক্ষুদ্রকক্ষ,—ইহা তাঁহার শয়ন মন্দির রূপে রক্ষিত। এগৃহে গৃহজোড়া রৌপ্য পালঙ্ক; পালঙ্কের নীচে পানের বাটা, ভোগের বাসন, অঙ্গ রাগাদির পাত্র সজ্জিত,—দেবতা প্রতি রাত্রে তাঁহার বৈঠকখানা হইতে এইখানে শয়নে আসেন এইরূপ জন প্রবাদ।—সন্ধ্যা আরতির পর বৈঠকখানা হইতে শয়ন কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত মহামূল্য মসলন্দ শয্যা বিছাইয়া দেওয়া হয়।—

পাণ্ডারপুরের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারি কোণে চারিটি ইষ্টক গৃহ; গৃহ মধ্যে বিঠোবাদেবের পদ চিহ্ন। মেলার সময় বিঠোবার শিবিকা পাণ্ডারপুর প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এইখানে আনীত হয়।

একটি মন্দির ভীমানদীর জলের মধ্যে উঠিয়াছে, বর্ষাকালে নৌকা করিয়া এই মন্দিরে

যাইতে হয়। এখন নদী শুষ্ক ইহার ত্রিসীমায় জল নাই। আমরা পাথরের উপর দিয়া এই মন্দিরে যাইবার সময় পাণ্ডারা পাষাণের উপর স্থানে স্থানে কৃষ্ণের পদাঙ্কণ দেখাইল—তিনি রাখাল লইয়া এইখানে গোচারণ করিতেন।

এইপদচিহ্ন দেখিতে পাইলে মাঘমেলায় দর্শকগণ কৃতার্থ বিবেচনা করে।—

মন্দিরে দেব দর্শন করাইয়া বড়ুয়ারা আমাদিগকে একটি গুপ্তকক্ষে আনয়ন করিল। সেখানে অতি সন্তর্পনে আর একটি বিঠোবা মূর্ত্তি ঘেটাটোব উন্মোচিত করিয়া আমাদিগকে দেখাইল।— শুনিলাম যখন আরঙ্জীব বিঠোবা মন্দির ধংশ করিতে আসেন তখন প্রকৃত দেবকে লুকাইয়া তাহারা এই মূর্ত্তি সেখানে রক্ষা করে। আরঙ্জীব ছলিত হইয়া চলিয়া যান। সেই হইতে জয় কীর্ত্তি রূপে এ মূর্ত্তি যত্নে রক্ষিত—কখনো কখনো আমাদের মত লোকদিগের নিকট ইনি প্রকাশিত মাত্র।

হাসির গান।

কালোরূপ।

কালোরূপে মজেছে মন
সে যে মিশমিশে কালো
ওগো সে যে ঘোরতর কালো,
অতি নিরুপম॥
কাক, কালো, ভোমরা কালো,
আমরা কালো, তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রী ডোমরা কালো,
কিন্তু জাননাকি কালো
আমার সে কালো বরণ॥
কালী কালো, মিশি কালো,
অমাবস্যার নিশি কালো,
গদাধরের পিশি কালো,
কিন্তু তা'র চেয়েও কালো
আমার সে কালো রতন॥

স্ত্রীর উমেদার।

জানতে চান আমি ঠিক কিরকম স্ত্রী চাই!
ফর্সা কি কালো কি মাজারী রং,
লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা কি পীনা,
দেখতে ঠিক পরী বা দেখতে ঠিক সং।
তাতে আমার আসে যায় না বেশী,
রাঁধতে যদি জানে ব্যন্নন সব দেশী;
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে
বলে', ও পোড়ার মুখো হতভাগা,

তা হ'লে সেত সোণায় সোহাগা ॥
কপাল একরত্তি বা কপাল গড়ের মাঠ ;
সুবঙ্কিম ভ্রূ কি ভ্রূ যষ্টিবৎ,
নীলাঞ্জনেত্রা কি একাক্ষহীনা,
তা খুব যায় আসেনা আমার এ মত।
জিনিষ পত্তর ভাঁড়ারে গুছিয়ে রাখে,
আর দ্রৌপদীর মত সুচারু পাকে,
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে
বলে' ; ও পোড়ার মুখো হতভাগা,
তা হ'লে সেত সোণায় সোহাগা ॥
বিম্বাধরা সে কি সুকৃষ্ণ ওষ্ঠা
সুদীর্ঘকেশী কি মাথায় টাক ;
নাসাটী বংশী কি নাসাটী খাঁদা,
দন্ত সে থাক বা নাই বা থাক,
শুধু স্বামীরে সে কয়না খুব কটু ;
আর সে সকল প্রকার রন্ধনে পটু ;
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে
বলে', ও পোড়ার মুখো হতভাগা,
তা হ'লে সেত সোণায় সোহাগা ॥
গজেন্দ্রগামিনী কি ভেকপ্রলম্ফী,
তার কিছুই আপত্তি নাই ;
লেখা পড়া বেশী জানুক না জানুক,
ধোপার হিসাব রাখতে জানাটী চাই ;
রাখেনা খোঁজ স্বামী খায় ভাঙ কি চরস,
অল্প তেল দিয়ে রাঁধে খুব সরস ;
তার ওপর ডাকে আমায় সোহাগে
বলে', ও পোড়ার মুখো হতভাগা,
তা হ'লে সেত সোনায় সোহাগা ॥
বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে ;
কদাচিৎ দুই একখান গয়না সে চায়,
পুত্র কন্যা কমই সংসারে আনে,
অল্পই ঘুময় ও অল্পই খায়,
করে কম ঝগড়া তর্ক ও কান্না,
আর তার অত্যুত্তম হওয়া চাই রান্না ;
তার ওপর ডাকে যদি আমায় সোহাগে
বলে', ও পোড়ার মুখো হতভাগা,
তা হ'লে সেত সোণায় সোহাগা ॥

ভারতী।

বসন্ত বন্দনা।

নিখিল জগত সুন্দর সব
পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে, তব
কোমল কর পরশে।
শূন্য ভুবন পুণ্য ভরিত,
দশদিক কলরব মুখরিত,
ব্যোম মুগ্ধ; চন্দ্র, সূর্য্য
শতধা মধু বরষে।
চাহ—অমনি নব বিকশিত
—পুষ্পিত বন, পলকে
হাস—অমনি পূর্ণ সহসা সব
কনক কিরণ ঝলকে
কহ স্নিগ্ধ জলদ ভার,
ক্ষরিত শত সহস্র ধার,
শুষ্ক শীর্ণ সরিত ভরিত
নব যৌবন হরষে।
কেশে তব নৈশ নীল,
অরুণভাতি বরণে।
অঙ্গে ঘিরি মলয় পবন,
শত দল ফুটি চরণে।
পুষ্পহার জড়িত পাণি,
অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামল,
নব বসন্ত সরসে।

প্রফুল্লমুখী।

যখন ১২৯১ সালে দেবী চৌধুরাণী প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন নিষ্কাম ধর্ম্মের কিছুই বুঝিতাম না। এখনও যে বড় বুঝিয়াছি, তাহা নহে; তবে বয়োবৃদ্ধি, আলোচনা ও শাস্ত্র পাঠের ফলে, এখন এ সম্বন্ধে কতকটা অর্দ্ধ স্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে। দেবী চৌধুরাণী যখন প্রথম পড়ি, তখন উপন্যাসের গল্পাংশ ও প্রফুল্লমুখীর মধুময় চরিত্র বড় মধুর বোধ হইয়াছিল; কিন্তু দেবী যে নিষ্কাম ধর্ম্মের আদর্শ, এ বিষয়ে মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে রঙ্গালয়ে দেবী চৌধুরাণীর অভিনয় দেখিয়া ও আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের অচির প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' তৃতীয় ভাগে দেবী চৌধুরাণীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা পড়িয়া সেই প্রাচীন খট্‌কাটা আবার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। সাধারণকে জানাইলে এই খট্‌কার একটা সুমীমাংসা হইবার সম্ভাবনা, এই আশায় এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

দেবী চৌধুরাণীর উপসংহারে গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন—এখন এসো প্রফুল্ল এক্‌-বার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি—আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌
>
> ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ইহা দ্বারা গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায় বুঝা যায় যে প্রফুল্লমুখীকে তিনি আদর্শ নিষ্কাম ধর্ম্মের সজীব মূর্ত্তিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন—যেন সে মহীয়ান্‌ চরিত্রের দৃষ্টান্তে এই অধঃ-পতিত হীন জাতির ধর্ম্মহীন জীবনে আবার নিষ্কাম ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। পাছে এ বিষয়ে পাঠকের কোন সন্দেহ থাকে এই জন্যই যেন গ্রন্থকার গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রফুল্লের আদর্শ নিষ্কামত্বের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। 'হরবল্লভ প্রফুল্লের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তার মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিণী। কেননা প্রফুল্ল নিষ্কাম'।

'এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ, বাঁচাইবার জন্য, এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?' নিশি মনে মনে দেবীকে ধন্য ধন্য বলিল। ভাবিল এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম্ম শিখিয়া-

ছিল।' 'এ সকল অন্তের পক্ষে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে কেন না প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। * * প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।' এই ধরণের কথা গ্রন্থের অন্যত্রও আছে। নিষ্প্রয়োজন বোধে আর উদ্ধৃত করিলাম না। এখন জিজ্ঞাস্য এই গ্রন্থকার যে ভাবে প্রফুল্লমুখীকে আঁকিয়াছেন সেই কি আদর্শ নিষ্কাম চরিত্র? আমার খট্‌কাও এই।

সীতারামের আলোচনায় বোধ হয় যে গ্রন্থকারের মতে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও গৃহিণী প্রফুল্লমুখী উভয়ে মিলিয়া আদর্শ নিষ্কাম ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা। জয়ন্তী আদর্শ সন্ন্যাসিনী, প্রফুল্ল আদর্শ গৃহিণী।

দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্লের গৃহিনীপনার আমরা যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দুই তিন পত্রে এই গৃহিণীপনার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র; ঘটনার অবতারণা করিয়া কার্য্যতঃ কিছুই দেখান নাই। আমরা গ্রন্থকারের মুখে শুনি যে প্রফুল্ল সংসারের সকলকে সুখী করিল। ব্রহ্ম ঠাকুরাণীও রান্নাঘরের কর্ত্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। শেষ নয়ানবৌও বশীভূত হইল। প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাহাই সোনা হইত। প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও সদ্‌বিবেচনার গুণে সংসারের বিষয়কর্ম্মও তাহার হাতে আসিল। প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া, দিন দিন লক্ষ্মীশ্রী বাড়িতে লাগিল। যথাকালে পুত্রে পৌত্রে সমাবৃত হইয়া, প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক সকলেই বলিল "আমরা মাতৃহীন হইলাম"। ইত্যাদি।

এই আদর্শ গৃহিণীর পরিচয়। বাস্তবিক গ্রন্থকার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আদর্শ গৃহিণীরই বটে; অপর কাহারও এ লক্ষণগুলি থাটে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের উদ্দেশ্য যদি আদর্শ গৃহিণী চরিত্র চিত্রণ, তবে বিচিত্র ঘটনার সাহায্যে সে চিত্রণকার্য্য সম্পাদন না করিয়া, উপন্যাস-তত্ত্বদর্শী মহা ঔপন্যাসিক গ্রন্থকার আপন মুখের দুই চারিটি মাত্র কথায় সে কাজটা সারিলেন কেন? ইহাও আমার এগ্রন্থ সম্বন্ধে একটা খটকা।

"কোন শক্তির বল বুঝিতে হইলে তাহার বিপরীত শক্তির সহিত সংঘর্ষ না দেখিলে সে বল বুঝা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত ধরুন পতিপ্রেম। কাহার পতিপ্রেম কত বড় বুঝিতে হইলে তাহার পতিপ্রেম বিরোধী অবস্থা কত বেশী, তাহা বুঝিতে হইবে। নগেন্দ্র নাথের সূর্য্যমুখীকে পরিত্যাগ, কুন্দকে গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেম বিরোধী। সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেম সে বিরোধে জয়লাভ করিল, তাই সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেমের একটা পরিমাণ আমরা বুঝিলাম।"* তাই যদি হয়, তবে প্রফুল্লমুখীর আদর্শ গৃহিণীত্ব দেখাইতে

* শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়ের বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় ভাগ।

গ্রন্থকার এ প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই কেন? কেন তিনি নিষ্কাম গৃহিণীপনার বিরোধী ঘটনার সমাবেশ করিয়া তাহার সহিত বিরোধে গৃহিনীপনাকে জয়শালিনী করিয়া তাহার বৃহৎ পরিমাণ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন নাই? আদর্শ সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী সম্বন্ধে তিনিত ঠিক এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন। গিরিজা বাবুর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতে পারি যে আমরা যেখানেই জয়ন্তীকে দেখিয়াছি আমাদিগের মনে হইয়াছে যেন জ্ঞান ও পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী হইয়া জয়ন্তীরূপে নরলোকে বিচরণ করিতেছে। এইরূপ বোধ হইবার কারণ গ্রন্থকার প্রদত্ত জয়ন্তীর পরিচয় মাত্র নহে; কিন্তু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে বিরোধী শক্তির সহিত জয়ন্তীর চরিত্র শক্তির সংঘর্ষ। অনেক কথা বলিবার আবশ্যক কি? সেই এক দিনের বেত্রাঘাত দণ্ডের চিত্রটা স্মরণ করুন। সেই একটা ঘটনায় আদর্শ সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর নিষ্কাম চরিত্র-চ্ছটা যেরূপ আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, সহস্র পরিচয়ে সেইরূপ হইতে পারে কি? সেই জন্য আমার খটকার কথা বলিতেছিলাম—আদর্শ গৃহিণী প্রফুল্লমুখী সম্বন্ধে গ্রন্থকার এ নিয়মের অনুসরণ করিলেন না কেন?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা খটকা মনে আসে। প্রফুল্লের নূতন বৌ হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকলের—প্রফুল্লের দেবীচৌধুরাণী হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজেশ্বরের ঘরণী গৃহিণী হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য কি? প্রফুল্লের আদর্শ গৃহিণীপনা দেখান কখনই নহে; কেন না প্রফুল্ল তখনও গৃহের বাহিরে দেবী চৌধুরাণী—ডাকাতের সর্দ্দারনী। গিরিজা বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পতিযুক্তার সন্ন্যাস নাই, এই তত্ত্ব বিবৃত করাই উক্ত গ্রন্থাংশের উদ্দেশ্য। আমি বলি যে উদ্দেশ্য যদিও ঐরূপ না হয়, তবে ফল যে ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। কারণ উক্ত অংশে আমরা ভবানী পাঠকের এত সযত্ন শিক্ষার নিস্ফলতা অনুভব করি এবং স্বয়ং প্রফুল্লের মুখে শুনি। প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে বলিতেছে—"তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।" গিরিজা বাবুও স্বীকার করিয়াছেন—"প্রফুল্ল বৈকুণ্ঠেশ্বরকে সমস্ত সমর্পণ করিতে অত শিক্ষা অমন চেষ্টা করিয়াও ব্রজেশ্বরকে ভুলিতে পারিল না। ভবানী পাঠকের নির্দ্দিষ্ট পথে চলা প্রফুল্লের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছিল—সংসারে প্রবেশ করিতে তাহার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে পথ রুদ্ধ দেখিয়া, মৃত্যু সম্ভাবনা জানিয়া শুনিয়াও প্রফুল্ল প্রথমে মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল না।"

তাহা যদি হয়, তবে কি প্রফুল্লজীবনের প্রকাণ্ড নিষ্ফলতা, বিশাল অকৃতকার্য্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই উক্ত গ্রন্থাংশের অবতারণা? কিন্তু গ্রন্থকার প্রফুল্লমুখীকে যে গৌরবের চক্ষে দেখেন, তাহাতে ইহা কখন সম্ভবপর নহে। অথচ তিনি নিশিকে দিয়া বলাইয়াছেন—'ও সকল ব্রত মেয়ে মানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে

হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।' দেবী স্বয়ংও বলিতেছেন—'এই ধর্ম্মই (গৃহস্থালীই) স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম'; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নহে। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়।' তাই যদি হয়, তবে প্রফুল্লের রাণীগিরি, সন্ন্যাস, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, দেবী চৌধুরাণী হওয়া সকলই নিষ্ফল হইতেছে না কি? দেবী জীবনের নিষ্ফলতা প্রতিপাদনই যদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হইত, তবে গ্রন্থের ছাঁচ আর একরূপ দেখিতাম। তাহা হইলে দেবীর রাণীগিরি অত উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখিতাম না। তাহা হইলে গ্রন্থকার সে জীবনের প্রতি আমাদের এমন সানুরাগ সস্নেহ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন না। সেই জন্যই গ্রন্থের এ অংশ সম্বন্ধে আমার এই খট্‌কা।

এক একবার মনে হয় যে প্রফুল্ল চরিত্রে ভবানী পাঠকের প্রযুক্ত আদর্শ শিক্ষা কিরূপ কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহাই দেখাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাংশের অবতারণা। এ মীমাংসায়ও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কারণ ঐ অংশে প্রদর্শিত প্রফুল্ল চরিত্র সর্ব্বত্র নিষ্কাম নহে। এ কথাটা ঠিক কি না একটু সবিস্তারে বিচার করা যাউক।

প্রফুল্ল যে ডাকাতি করিত সেটা কি একটা পাপের কার্য্য? না সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃত বিনাশ, প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্য-শাসন। ভবানী ঠাকুর যথার্থ বলিয়াছিলেন 'আমি ধনের জন্য ডাকাতি করি না। আমি রাজত্ব করি। এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ হইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে, তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।' প্রফুল্লেরও সেই ধারণাই হইয়াছিল। তাই সে দশ বৎসর ধরিয়া ডাকাতদিগের রাণী হইয়া সেই রাজধর্ম্ম পালন করিল। এ বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের কথা শুনুন। 'যে জুয়াচোর দাগাবাজ পরের-ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সা লই না; যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকিয়া দিই। দেশ অরাজক; দেশে রাজ-শাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায় কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রাণী করিয়া রাজশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি। একি অধর্ম্ম?' প্রফুল্লের নিজেরও শেষ অবধি এই ধারণাই বিদ্যমান দেখিতে পাই। যখন সেই বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে ব্রজেশ্বর বড় খেদ করিয়া দেবীকে বলিয়াছিল "আমার সেই প্রফুল্ল—মুখে আসে না সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি!' তখন প্রফুল্ল কি উত্তর করিয়াছিল? 'আমি ডাকাইত নহি। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি আমি ডাকাইত নহি। তবে জানি লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে তাও জানি। সেই কথা তোমাকে আমার কাছে শুনিতে হইবে। শোন আমি বলি।' তখন যে দিন প্রফুল্ল শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল সেই দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত আপনার কাহিনী

সকলই অকপটে বলিল। শুনিয়া ব্রজেশ্বর বিস্মিত লজ্জিত অতিশয় আহ্লাদিত আর মহামহিমাময়ী স্ত্রীর সমীপে কিছু ভীত হইলেন।'

এ হেন ধর্ম্মরাজত্ব ছাড়িয়া প্রফুল্ল সংসারে প্রবেশ করিল কেন? কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নহে, স্বধর্ম্মপালন জন্য নহে। সংসারে সকলেই জানিত, ব্রজেশ্বরও জানিত প্রফুল্ল মরিয়াছে। প্রফুল্লের বিরহ জনিত যে দুঃখ ক্লেশ তাহাও দশ বৎসরে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লহীন সংসারেও সুখী হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহা যদি হয় তবে আমরা কিরূপে বলিব যে প্রফুল্ল স্বধর্ম্ম পালন জন্য সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিল? কেন সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসার আশ্রয় করিল?

প্রফুল্ল যদি শ্রীর অবস্থায় পড়িত তবে বুঝিতাম প্রফুল্লের সংসার গ্রহণ স্বধর্ম্ম পালন মাত্র। শ্রীর সহিত জয়ন্তীর নিম্নলিখিত কথোপকথন পাঠকের স্মরণ আছে—

জয়ন্তী।—শ্রী আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

শ্রী। সেই জন্যই কি আসিয়াছি?

জয়ন্তী। যত প্রকার মনুষ্য আছে রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?

শ্রী। আমার কি সাধ্য?

জয়ন্তী। আমি বুঝি তোমা হইতেই এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাও শীঘ্র গিয়া রাজা সীতারামকে প্রণাম কর।

শ্রী। জয়ন্তী! সোলা জলে ভাসে বটে কিন্তু খাট দড়িতে পাথরে বাঁধিয়া দিলে সোলাও ডুবিয়া যায়। আবার কি ডুবিয়া মরিব?

ইহা দ্বারা বুঝা গেল শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সীতারামের মহিষী হওয়া। শ্রী ইহা বুঝিতে পারে নাই। তাই সে অনধিকার সত্বেও সন্ন্যাসিনী হইয়া সীতারামের পতন ও ধ্বংসের কারণ হইল। শ্রী এক দিন এ কথা বুঝিয়াছিল। এক-দিন সন্ন্যাসিনী সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল 'এই তোমার গায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নহি। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?'

শ্রীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল প্রফুল্ল সম্বন্ধে কি তাহা বলা যায়?

আর ইহাও বলা যায় না যে দেবীর ধর্ম্ম রাজত্বের প্রয়োজন শেষ হইয়াছিল, যে জন্য ডাকাইত দলের সৃষ্টি—দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, সে প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা দেখি যে আনন্দ মঠে সত্যানন্দের সংকল্প স্বদেশোদ্ধার সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সর্ব্বদর্শী গুরু তাঁহাকে কর্ম্মস্থল হইতে অপসৃত করিলেন। কিন্তু এরূপ করিবার কারণ আমরা তাঁহার মুখেই বিশদ ভাবে শুনিতে পাই। 'আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এ দেশে

বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই। আমরা লোক শিক্ষায় পটু নহি। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।' 'ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।' ফলেও আমরা দেখি তাহাই হইল। কিন্তু প্রফুল্লের কর্ম্মস্থল হইতে অকালে অপসৃত হওয়া সম্বন্ধে এরূপ কিছু কি বলা যায় ?

তবে প্রফুল্ল সন্ন্যাস ছাড়িয়া সংসার গ্রহণ করিল কেন? ইহার উত্তর আমরা তাহার নিজের মুখেই পাই। দেবী ভবানী পাঠককে বলিতেছে—'আমাকে অব্যাহতি দিন—আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই। আমি এ রাণীগিরি হইতে অবসর লইতে চাই। আমার এ আর ভাল লাগে না।' কেন চিত্ত নাই? কেন ভাল লাগে না? দেবী এ কথার উত্তরটা বোধ হয় নিজের কাছেও প্রকাশ করে নাই।' 'তাই লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানে। এ অখ্যাতি মরিলেও যাইবে না?' ভবানী পাঠক ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিলেন—'ধর্ম্মাচরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজি-বার দরকার কি? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না? আত্মবিসর্জ্জন হইল কৈ?" এ কথার উত্তর নাই। দেবী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। ভবানী ঠাকুরের সঙ্গে দেবীর শেষ কথাগুলি এই—'এবার চলিলাম।' কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কিনা সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।'" দশ বৎসর মন ছিল, আজ মন নাই কেন? এ বিষয়ে গিরিজাপ্রসন্ন বাবু এইরূপ লিখিয়াছেন। 'বহুদিন প্রফুল্ল স্বামী সন্দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। ধীরে অজ্ঞাতসারে কতক শিক্ষার, কতক কালের কতক কার্য্য বিশেষের প্রভাবে ব্রজেশ্বর চিন্তা তাহার মনে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রজেশ্বর যেমন মন হইতে সরিয়া যাইতেছিল—সংসারও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আজি ব্রজেশ্বর সম্মুখে উপস্থিত—সেই ব্রজেশ্বরকে দেখিয়া প্রফুল্লের নিদ্রিত স্মৃতিগুলি আস্তে আস্তে মাথা জাগাইল। সংসারও আসিয়া ব্রজেশ্বরের সঙ্গে মিশিয়া প্রফুল্লের চিত্ত কতক অধিকার করিল। তাই প্রফুল্ল বলিল—'সে পথ খোলা থাকিলে, আমি এ পথে আসিতাম না।' সে পথের প্রতি সতৃষ্ণ প্রিয় দৃষ্টি পড়িবা মাত্র অবলম্বিত পথের প্রতি বিরক্তি দৃষ্টি পড়িল। তাই প্রফুল্ল আজ ভবানী পাঠকের নিকটে আর সেরূপ কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ব্রজেশ্বরকে দেখিয়াই এতটা ঘটিয়া গেল।' গিরিজা বাবু তত্ত্বদর্শী লোক। তিনি ঠিকই ধরিয়াছেন। যখন এতটা ঘটিয়া গেল তখন অবশ্য প্রফুল্ল নিজেকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল 'এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, রাজত্ব স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নহে, কঠিন ধর্ম্মও এই সংসার ধর্ম্ম। ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নহে। এর চেয়ে কোন অভ্যাস কঠিন? কোন পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।' কিন্তু স্ত্রীলোক যে যথার্থ

সন্ন্যাসিনী হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা জয়ন্তী চরিত্রে পাইয়াছি। অবশ্য পতিযুক্তা ও পতিমুক্তার একটা কথা উঠিতে পারে। কিন্তু বাস্তব পক্ষে প্রফুল্ল তখন পতিযুক্তা নহে, পতিমুক্তাই বলিতে হয়।

ব্রজেশ্বরকে দেখিয়া দেবীর চিত্তে কতটা বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি—পাঠক তাহা হইতে দেবীর পতি সমাগম কামনা কত প্রবল বুঝিতে পারিবেন।

'প্রথম সাক্ষাতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে? দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় ফরসা নহে। * * দেবী পরদার আড়ালে—কেহ দেখিল না, এই কথা বলিবার সময়ে দেবী চোখ মুছিল। * * এই সময়ে দেবীর কাছে আর এক জন স্ত্রীলোক আসিয়া নিঃশব্দে বলিল—বলি গলাটা ধরে গেছে যে। দেবীর চক্ষের জল আর থামিল না। তার পর ব্রজেশ্বরের সহিত প্রফুল্লের সাক্ষাৎ হইল। দেবীর মুখে আজ দশ বৎসরের হারান প্রফুল্লের সাদৃশ্য দেখিয়া ব্রজেশ্বরের চক্ষে জল আসিল, পড়িল না। তাই দেবী সে জল দেখিতে পাইল না, দেখিতে পাইলে আজ একটা কাণ্ড কারখানা হইয়া যাইত। দুই খানা মেঘই বৈদ্যুতী ভরা।'

তার পর দেবী ব্রজেশ্বরকে মর্য্যাদা দিবার অছিলায় তাহার আঙ্গুলে ধীরে ধীরে আঙ্গুটি পরাইতে লাগিল। 'সেই সময়ে ফোঁটা দুই তপ্ত জল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।' তার পর যাহা হইল পাঠক অবগত আছেন। এ দিকে নিশি দেবীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশি তাহাকে উঠাইয়া বসাইল, চোখের জল মুছাইয়া দিল, সুস্থির করিল।'

দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের এই অংশ কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট। দেবী প্রফুল্লের মানবিকতা দেখিয়া দুর্ব্বল মানুষ বড় আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হয় যেন নির্বাত নিষ্কম্প মহাসাগরে প্রবল ঝড় উড়িয়াছে—যেন দেবীর নিষ্কাম হৃদয়ে কামনার কম্প দেখা দিয়াছে, দেবী যোগভ্রষ্ট হইয়াছে।

আর এক দিনের কথা মনে করুন। সেই বৈশাখী শুক্লা সপ্তমীর দিন, যে দিন প্রফুল্লের পুনর্ব্বার স্বামি-সন্দর্শন হয়। ইংরাজের সিপাহি তাহাকে ধরিতে আসিবে, দেবী নিশ্চয় ধরা পড়িবে, ধরা পড়িলে তাহার প্রাণদণ্ড নিশ্চিত—এ সকল জানিয়া শুনিয়া প্রফুল্ল স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার আশায়—স্বামীর শেষ দর্শন কামনায় ত্রিস্রোতার ঘাটে বজরায় বসিয়া আছে। নিশির সহিত দেবীর যে কথোপকথন হইতেছিল তাহার একাংশ এইরূপ। নিশি।—'ভগিনি! প্রাণে বাঁচিলে এক দিন না এক দিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আজ ডাঙ্গায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে চল।'

এখানে আসিলাম কেন? আসিলাম যদি, তবে লোক জন সকলকে বিদায় দিলাম কেন? * * যা আমি স্থির করিয়াছি, তা অবশ্য করিব। আজ স্বামী দর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। আমি একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব।"

দেবীর কেন ধরা দিতে এত ইচ্ছা? ফাঁসি যাইতে কেন এত উৎসাহ? আত্ম-হত্যার উদ্যোগ কি ধর্ম্মার্থে? নিষ্কাম ধর্ম্মপালন জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা দেবীর নিজের মুখেই শুনিতে পাইব।

ব্রজেশ্বরের সহিত প্রফুল্লের আবার সাক্ষাৎ হইল। ব্রজেশ্বর বলিল 'টাকা আনিতে পারি নাই। দুই চারি দিন পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে সেটা জানা চাই।' দেবী উত্তর করিল 'আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না।' বলিতে বলিতে দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল—দেবী একবার চোখ মুছিল। * * প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোকের জলের স্রোত ছুটিল। তেজস্বিনী দেবীরাণী ছেলে মানুষের মত বড় কান্নাটা কাঁদিল। পরে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দেবীর অনেক কথা হইল। তাহার একাংশ এইরূপ।

ব্রজ।—কেন এত সিপাহী এদিকে আসিতেছে? তোমাকে ধরিবার জন্য? তোমার কথায় বোধ হইতেছে তুমি এ সংবাদ পূর্ব্ব হইতে জানিতে। তবে জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন?

দেবী। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

ব্রজেশ্বরকে একবার দেখার জন্য দেবী আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত!

ব্রজ। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ?

প্রফুল্ল। আর বাঁচিয়া কি হইবে? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। এখন আর বাঁচিয়া কোন্ কাজ করিব বা কোন্ সাধ মিটাইব? আর বাঁচিব কেন?

ব্রজ। বাঁচিয়া আমার ঘরে গিয়া আমার ঘর করিবে।

প্রফুল্ল। সত্য বলিতেছ? হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন?

ব্রজ। কাল শুনিলে কি হইত?

প্রফুল্ল। তাহা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে?

পরে দেবী কি অপূর্ব্ব কৌশলে আপনাকে ও আপনার স্বামী ও শ্বশুরকে বাঁচাইয়াছিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন।

আবার বলি উপন্যাসের এ অংশ কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট। কিন্তু দেবী প্রফুল্লের এই মানবিকতা দেখিয়া, মনে দেবীর নিষ্কামতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহা বদ্ধ

মূল হয়। মনে হয় যেন মহামহীরুহ ভূকম্পনে ভূমিসাৎ হইয়াছে। দেবীর দশ বৎসরের সাধনার যোগ ভ্রংশ হইয়াছে। তখন গীতার সেই অমর কথাগুলি স্মৃতিপথে উদিত হয়—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ
সঙ্গস্তে ধূপ জায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ
কামাৎ ক্রোধোহভি জায়তে ইত্যাদি।

বিষয়ের ধ্যান করিলে মনে তাহার প্রতি আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) উৎপন্ন হয়; কামনার ব্যাঘাতে ক্রোধ জন্মে ইত্যাদি।

গ্রন্থকার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সীতারাম চরিত্রের মূল সূত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কামনার ব্যাঘাত হেতু সীতারামের দুর্জ্জয় ক্রোধ মোহ মতিভ্রংশ সর্ব্বনাশ পাঠকের অবিদিত নাই। প্রফুল্ল চরিত্রের মূল সূত্রও কি ঐ কথাগুলিতে পাওয়া যায় না? যদি প্রফুল্লের স্বামিমিলন না ঘটিত, তবে তাহারও একরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিত বই কি? আমরা ত সংসারের পথ রুদ্ধ ভাবিয়া তাহাকে আত্মহত্যায় প্রস্তুত দেখিয়াছি। প্রফুল্লের কামনা পূর্ণ হইল, সেই জন্য আর প্রফুল্ল চরিত্রে সীতারামের ন্যায় 'ট্রাজিডি' দেখিলাম না। কিন্তু কামনা ব্যাঘাতে ত দেবীরও ভীষণ পরিণাম দেখিতে হইত।

এখন বোধ হয় দেবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে আমার যে খট্‌কা তাহা একরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছি। এখন পাঠক ইহার মীমাংসা করুন।

খট্‌কা শব্দটা ব্যবহারের একটা সার্থকতা আছে। মহাকবির কাব্যে যে সকল অসঙ্গতি অসম্পূর্ণতা, অসামঞ্জস্য প্রথম দৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, তাহা অনেক স্থলে সমালোচকের বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে, কাব্যের ত্রুটিবশতঃ নহে। কে জানে প্রফুল্ল সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটে নাই? গ্রন্থকার মহাকবি, তাঁহার গ্রন্থ মহাকাব্য। ঘোলা জলে সূর্য্যের মলিন প্রতিবিম্ব হয়! সেটা কি সূর্য্যের দোষ, না জলের দোষ?

সুতরাং এ বিষয়ে হঠাৎ কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। কোলরিজ সেক্সপীয়রের ব্রুটাসচরিত্রের আলোচনায় যাহা বলিয়াছেন, পাঠককে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। পাঠক দেখিবেন আমাদের মহা কবির গ্রন্থের দুর্ব্বোধ্য অংশ সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। * 'ব্রুটসের এই উক্তি অসঙ্গত মনে হয়;—

* This speech (of Brutus) is singular—at least I do not at present see into Shakespeare's motive—his rationale. ... ... For surely nothing can be more discordant with our historical preconception of Brutus: &c &c. This I mean is what I say to myself with my present

অন্ততঃ এই উক্তি সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের উদ্দেশ্য—তাঁহার অভিসন্ধি আপাততঃ আমার বোধায়ত্ত হইতেছে না। কারণ ইতিহাস পাঠে ব্রুটস চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যে পূর্ব্ব ধারণা আছে—ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিসদৃশ। এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলি না। এই মাত্র বলি যে আমার বর্ত্তমান অপূর্ণ জ্ঞান মতে এইরূপ বোধ হইতেছে। কারণ ইহাও বক্তব্য যে অনেক স্থলে প্রথম দৃষ্টিতে আমার যাহা ভ্রম প্রমাদ বলিয়া ধারণা হইয়াছিল—তাহাই কালে জ্ঞানের পরিপাকবশতঃ কাব্য সৌন্দর্য্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।' তত্ত্বদর্শী সমালোচক মাত্রেই এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন।

দেশ বিদেশ।

রামটেক।

রামটেক একটি পবিত্র হিন্দু তীর্থ; জৈনদিগেরও এখানে কতকগুলি মন্দির আছে। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ইহার প্রাচীন মন্দির মালা, ইহার পর্ব্বত-শিখর-ব্যাপী অগণ্য সোপানাবলী নিশ্চয়ই দর্শনীয়। এখানে সিউনি হইতে গ্রেট ডেকান রোড দিয়া টঙ্গা করিয়া যাইতে হয়। সিউনি সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের একটী জিলা, জব্বলপুর হইতে ৮৫ মাইল দক্ষিণে স্থাপিত। বঙ্গদেশ হইতে আসিতে হইলে বেঙ্গল নাগপুর লাইন দিয়া রেলপথে নাগপুর অতিক্রম করিয়া আসিয়া কামটি ষ্টেশনে নামাই সুবিধা। সেখান হইতে উত্তরাভিমুখে গ্রেট ডেকান রোড দিয়া ২০ মাইল আসিলেই রামটেক; ১৫ মাইল পর্য্যন্ত গ্রেট ডেকান রোড, ১৫ মাইল পরে একটী গ্রাম পাওয়া যায় উহার নাম মনসর। মনসরে ইচ্ছা হইলে থাকিবার বেশ সুবিধা। এখানে একটী গবর্ণমেণ্টের ডাক বাঙ্গালা আছে। মনসর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে রামটেক রোড গিয়াছে। এই রাস্তায় প্রথমতঃ পূর্ব্বাভিমুখ ও পরে উত্তরাভিমুখে মোট ৫ মাইল চলিয়া রামটেকে উপস্থিত হওয়া যায়। এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই মহারাষ্ট্রীয়। ইহা একটী তহশীল, এবং ছোট খাট এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল সহর বলিতে হইবে। একটি অনুন্নত পাহাড় অশ্বক্ষুর আকৃতিতে সহরটীর উত্তর পশ্চিমাংশ বেষ্টন করিয়া আছে। এই পাহাড়ের শিরো-

quantum of insight, only modified by experience in how many instances I have ripened into a perception of beauties where I had descried faults)

দেশেই সৌধ-ধবলিত মন্দিরমালা বহুদূর হইতে দর্শকবৃন্দের নয়ন আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে।

সহর পার হইয়াই একটি বিস্তৃত আম্র কাননে আসিয়া পড়িলাম। এ স্থানটী অতি মনোরম। ইহার পর প্রায় ২ মাইল রাস্তাটী ঘুরিয়া একটি সুপ্রশস্ত পরিষ্কার সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, এখানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। অল্প দূর আসিয়াই সম্মুখে একটি সুনির্ম্মিত সুগঠিত প্রস্তরময় সিংহদ্বার এবং উহার পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। বেগলার সাহেব যিনি মহাত্মা কনিংহাম সাহেবের তত্ত্বাধীনে মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন ইমারত সমূহের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুরাতত্ত্ব লিখিয়া গিয়াছেন তিনি এই সিংহদ্বারকে দেখিয়া ইহা দিল্লির পুরাতন কেল্লার ফটকের গঠন প্রণালীতে গঠিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ফটক পার হইয়া ভিতরে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম উহা অতীব রমণীয়। একটি সুবিস্তীর্ণ পুষ্করিণী, উহার তিন তীর শ্যামল গুল্মলতাচ্ছাদিত পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত, পূর্ব্ব ভাগ প্রস্তরময় সোপানাবলীতে বাঁধান এবং বহু সংখ্যক সুনির্ম্মিত সৌধধবলিত মন্দির মালায় পরিশোভিত। রাস্তার উপর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে কয়েক ঘর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। আমরা যখন এখানে আসিয়া পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় ৮টা, শীতকাল। এখন এখানে কোথাও অনবগুণ্ঠিতা পরিচ্ছন্নবসনা ব্রাহ্মণকন্যারা পুষ্করিণীতে স্বচ্ছন্দ মনে স্নান করিতেছে, কোথাও বা তীর্থ দর্শনাকাঙ্ক্ষী দূর দেশাগত যাত্রীরা স্নান করিতেছে অথবা পিণ্ডদান করিতেছে, ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছে। স্থানটী দেখিলে প্রাচীন কাব্য লিখিত হিন্দু রাজত্ব কালের কোন ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। এই পুষ্করিণীর নাম আম্বারী, ইহার নামকরণ সম্বন্ধে এখানে এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাইলাম। পুরাকালে উজ্জয়িনী নগরে অমরসিংহ নামে একজন রাজা ছিলেন, ইনি কুষ্ঠরোগগ্রস্থ হইয়াছিলেন। একদা মৃগয়ার্থে এ প্রদেশে আসিয়া মৃগয়ার পরিশ্রমে নিতান্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন এবং কোন পরিষ্কার জলাশয় না পাইয়া এখানকার একটী সামান্য নালা হইতে কর্দ্দমাক্ত জলপান করিলেন। কিন্তু উক্ত জলের এমনি গুণ যে তৎক্ষণাৎ রোগ মুক্ত হইলেন। তদবধি কৃতজ্ঞহৃদয়ে এই সুবিস্তীর্ণ পুষ্করিণী খনন করাইয়া এবং এই সুগঠিত সিংহ দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার নাম ও এই ঘটনাটীকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। উহাঁর নামানুসারে পুষ্করিণীকে আম্বারা তলাও বলিয়া থাকে। আমরা এখানে একজন পাণ্ডার (মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের) গৃহে আশ্রয় লইলাম, ইহাঁর নাম গণেশ ভটজী মটক। ইহারই গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল এবং ইহারই অনতিদূরে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজার একটী অট্টালিকা রহিয়াছে। শুনিলাম তিনি যখন এখানে আসেন তখন এখানেই বাস করেন, তাঁহার পরিচিত কেহ অনুমতি লইয়া আসিলেও এখানে থাকিতে পারে। স্নান আহার করিয়াবেলা ৪ টার সময় পাহাড়ে উঠিয়া দেবালয়গুলি দেখিতে গেলাম।

পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে অতি অল্প দূর গিয়াই পর্ব্বত শিখর ব্যাপী সোপানাবলী পাইলাম। কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়াই দুই পার্শ্বে একটী প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এবং সাধারণ রকমের একটী ফটক দেখিতে পাইলাম। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে স্থানটী প্রাচীন একটী দুর্গ ছিল। প্রথমে যে সিংহদ্বার ও প্রাচারের কথা বলিয়াছি ইহা দুর্গের বহির্দ্বার এবং এখন যাহা দেখিলাম তাহা দ্বিতীয় দ্বার। কিছুদূর উপরে উঠিয়াই একটি বাউলি এবং একটী মহম্মদীয় পিরের দরোগা দেখা গেল। একজন মুসলমান আমাদের ডাকিয়া বলিল "এ রহিম পিরের দরোগা এখানে সিন্নি চড়াও।" "আমি হাসিয়া বলিলাম এ হিন্দু-তীর্থ এখানে তুমি রহিম পির কোথায় পাইলে," লোকটী বলিল "রাম ও রহিম দুই ভাই উভয়ে মিলিয়া লঙ্কার রাবণ বধ করিতে গিয়াছিল"। আমরা ফকির সাহেবের মুখে এই অপূর্ব্ব রামায়ণের কথা শুনিয়া ও এখানে কিছু দিয়া উপরে উঠিলাম। সম্মুখেই আর একটী সুন্দর সুগঠিত প্রস্তর দ্বার, ভিতরে যাইয়াই দুটী প্রাচীনা "হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে" দেখিতে পাইলাম, ইহারা আমাদিগকে দেখিয়াই কহিল চল বরাহ মূর্ত্তি দেখিবে চল। তদনুসারে পূর্ব্ব দিকে একটি প্রশস্ত পরিষ্কৃত স্থানে গিয়া দেখিলাম সিন্দুর মাখান প্রস্তরগঠিত এক সুবিশাল বরাহ মূর্ত্তি। আমরা ইহা একটী অনাবৃত স্থানে পাইলাম কোন মন্দির মধ্যে দেখিলাম না। বেগলার সাহেবের বর্ণনা পড়িয়া বোধ হয় তিনি যখন দেখিয়াছিলেন (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) তখন এ মূর্ত্তিটী একটী ঘরের ভিতর স্থাপিত ছিল, ঘরের উপর ছাদ ছিল। রামটেকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এ মূর্ত্তিটী একটি বিশেষ প্রমাণ। বরাহ মূর্ত্তির পূজা আধুনিক কালে কোথাও প্রচলিত নাই। প্রাচীনকালে বোধ করি ছিল। পান্নার সমীপে অজয় গড়ে এখন একটি সুন্দর বরাহ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এ মূর্ত্তিটীর রীতিমত পূজার ব্যবস্থা কিছুই নাই। বেগলার সাহেব বড় দুঃখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে ইহার চারিদিকে কোথাও কোন প্রস্তর লিপি পাওয়া যায় নাই। যাইলে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইত।

ইহার পর আরও ২।১টী ভগ্ন মন্দির। মন্দিরগুলির দ্বাররুদ্ধ এবং ভগ্ন সুতরাং আমরাও ইহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বেগলার সাহেব এইখানে একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন; এবং একখানি প্রস্তর ফলকে "শ্রী বিষ্ণু শাস্ত্রী" খোদিত পাইয়াছিলেন। ইহার পর এবার একটি সুন্দর সিংহদ্বার, দ্বার অতিক্রম করিয়া পাথর বাঁধান একটি প্রশস্ত পথ পাইলাম, পথের দুই ধারে দুই একখানি সামান্য খোলার ঘর—বোধ করি পূজারিদিগের জন্য গঠিত। ইহার পর আবার একটি সিংহদ্বার, ইহা আধুনিক; ইহাতে সুগঠিতকাষ্ঠ নির্ম্মিত দুইটি দ্বারও সংলগ্ন আছে। দ্বারের নিকট একজন দ্বারী দাঁড়াইয়া সদম্ভে যাত্রিদিগের নাম ও জাতি জিজ্ঞাসা করিতেছে, এবং নীচ জাতি না হইলে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিতেছে। এই দ্বারের বাম পার্শ্বে আর একটি মন্দির। এখানে

একজন স্থূলোদর প্রৌঢ় মহারাষ্ট্রীয় পূজারি ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে। আমাদিগের দেখিয়াই বলিল "এদিকে এস, ইহা দশরথ রাজার মন্দির, রামচন্দ্রজীকে দেখিবার অগ্রে তাঁহার পিতার সম্মান করিয়া যাও।" মন্দিরটি রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, প্রত্যহ এখানে পূজা হইয়া থাকে দেখিয়া বোধ হইল। মহারাজ দশরথের মূর্ত্তি শ্বেতপ্রস্তরের, পার্শ্বে কৌশল্যা ও কৈকয়ীরও মূর্ত্তি রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলির গঠন প্রণালীতে বিশেষ শিল্প নৈপুণ্য কিছুই নাই। এই মন্দিরটি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া যেখানে পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বারী দণ্ডায়মান ছিল সেইখানে আসিলাম এবং উহার প্রশ্নানুসারে সকলে আপনাপন নাম ও জাতির পরিচয় দিয়া এবং আপনাপন জুতা খুলিয়া দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এখানকার নিয়ম এই যে বিধর্ম্মী এবং শূদ্রকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, উহাদিগকে এই স্থান হইতেই ফিরিয়া যাইতে হয়। বেগলার সাহেব বড় দুঃখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"But I was not allowed to approach it even, muchless to go inside. This is a great pity I can see no reason why I was not allowed to go into the courtyard of the temple. The brahmins were even inclined to turn me out of the second courtyard and entirely out of the citadel and brought forward a little board whereon was pasted a paper signed by the commissioner requesting on entering the temple a very reasonable request but sadly and I fear habitually misused by those to whom this all potent board is entrusted.

ভিতরে গিয়া আমরা প্রথমতঃ দুই পার্শ্বে হনুমানজী ও গণেশজীর মন্দির পাইলাম, তাহার পর সম্মুখে অতি পরিপাটি লক্ষ্মণজীর মন্দির এবং তদনন্তর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রজীর মন্দির। এইটির গঠন প্রণালী এবং সরঞ্জম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে একটি কাষ্ঠাসনে কতকগুলি বন্দুক ও তরবারি সাজান রহিয়াছে জন কয়েক পূজারী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী রহিয়াছে, শুনিলাম ইহারা সকলেই নাগপুর রাজার বেতনভোগী। মন্দির মধ্যস্থ প্রতিমূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিয়া মন্দিরের বাম পার্শ্বদিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলাম। যাইবার সময়ে বামদিকে একটি ছোট খাট চৌবাচ্ছার মত স্থান দেখাইয়া আমাদের পথ প্রদর্শক কহিল ইহা সীতাকুণ্ড। এ স্থানটি অতিক্রম করিয়া আমরা মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটি প্রাঙ্গণে আসিয়া পৌছিলাম, এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির ও ছোট ছোট দেবমূর্ত্তি পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া আছে। এ মন্দিরগুলিতে কোথাও লবকুশ কোথাও কৌশল্যা কোথাও লক্ষ্মীনারায়ণ কোথাও মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। একটি মন্দিরে একটি প্রস্তর গঠিত অস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখাইয়া পাণ্ডারা বলিল ইনি একাদশী দেবী। আমরা একাদশী দেবীর কথা এই প্রথম শুনিলাম।

লবকুশের মন্দির দ্বিতল। ইহার শিরোদেশে উঠিবার একটি সোপান আছে; তদব-

লম্বনে উপরে উঠিয়া চারিদিক অনাবৃত দ্বার একটি গৃহ পাইলাম, ইহার নাম রামঝোরকা ইহা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত, এখানে দাঁড়াইলে চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত পর্ব্বত সমস্ত সহর এমন কি আম্বাড়া পুষ্করিণী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল, পশ্চিম গগণে একখানি সোনার থালের মত সূর্য্যদেব বিরাজমান, যত দূর দৃষ্টি চলে কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতমালা ছোট ছোট বৃক্ষ ও গুল্মে বেষ্টিত হইয়া সন্ধ্যার সুবর্ণ রঙ্গে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। দূরে রামটেক সহরটি যেন বালক রচিত একটি খেলিবার ঘরের মত দেখাইতেছে। কতক্ষণ ধরিয়া এই সুরম্য দৃশ্যে নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিয়া নামিয়া আসিলাম। এস্থলে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বিশেষ বিচক্ষণতা ও সাবধানতা সত্বেও এতদ্দেশীয় দেবদেবী ও ইতিহাস সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যেরূপ অতি সহজ বোঝ এবং সাধারণ বিষয়ে ভ্রমে পড়িয়া থাকেন তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যিনি একবার মাত্র রামটেকে গিয়াছেন তিনিই জানেন রামঝোরকা জিনিস কি। বেগলার সাহেব যিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাচীন ইমারত পরিদর্শন করিয়া পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অতি বিচক্ষণতা ও বহুদর্শিতার সহিত রিপোর্ট লিখিয়া গিয়াছেন তিনি এই রামঝোরকাকে একটি দেবতা মনে করিয়া অন্যান্য দেবতার সহিত তাহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং বন্ধনী মধ্যে লিখিয়াছেন (who is he) ইনি কোন দেবতা ?

বেগলার সাহেব বলেন রামচন্দ্রজীর মন্দিরের ভিতর দিকের প্রাচীরের গায়ে তাঁহার হিন্দু কর্ম্মচারী একটি প্রস্তর ফলক পাইয়াছিল, এবং উহা নকল করিয়া আনিয়া সাহেবকে দেখাইয়াছিল। উক্ত ফলকে "রামচন্দ্র" "রামদেব" ও "রামচন্দ্রগিরি" এই শব্দগুলির উল্লেখ ছিল। কিন্তু কোন সম্বৎ অথবা রাজবংশের উল্লেখ না থাকায় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে এতদ্দ্বারা কোন সাহায্য পাওয়া যায় না।

পূর্ব্ববর্ণিত প্রাঙ্গনমধ্যস্থ সমস্ত মন্দিরগুলি দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া উক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া যেখানে দ্বারী দণ্ডায়মান ছিল বাহিরে আসিলাম এবং পূর্ব্বোল্লিখিত পথে আবার সোপানাবলী দিয়া নামিতে লাগিলাম। আসিবার সময় Sir Richard Temple সাহেব নির্ম্মিত ডাক বাঙ্গালার নিকটস্থ নৃসিংহ অবতারেরও একটি মূর্ত্তি পাইলাম। আসিতে আসিতে আমাদের পথপ্রদর্শক আর একটি পথ দেখাইয়া দিল। এ পথে সোপান নাই ইহা পর্ব্বতের গায়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে, ইহা দ্বারা একেবারে রামটেক সহরের ভিতর পৌঁছান যায়, আম্বাড়া পুষ্করিণী দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয় না। আমরা যে পথে আসিয়াছিলাম সেই পথে, সোপানযোগে নামিয়া গেলাম এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই বাসায় পৌঁছিয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

আম্বাড়া পুষ্করিণী হইতে ২.৩ মাইল উত্তর পূর্ব্বে আর একটি পর্ব্বত পাওয়া যায়,

ইহাতেও সোপানযোগে উপরে উঠিতে হয় কিন্তু এখানকার সোপনাবলী আরোহণ কষ্টসাধ্য। এখানে কতকগুলি মন্দির আছে ইহাকে নাগার্জ্জুনের মন্দির বলে। ইহার মধ্যে গৌরীশঙ্কর ও সরস্বতীর মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৌরীশঙ্করের গলদেশ সর্পমালায় ভূষিত। নিম্নে পর্ব্বত পার্শ্বে একটি গুহার মত স্থানে একটি মন্দির আছে তাহার ভিতরে দুইটি মূর্ত্তি একটি নাগ একটি অর্জ্জুন। ইহারি নামানুসারে স্থানটীর নাম নাগার্জ্জুনের মন্দির। পর্ব্বতের পদতলে উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আরও কতকগুলি আধুনিক মন্দির আছে। নাগার্জ্জুনের সোপানাবলী নিশ্চয়ই আধুনিক, এখনও ইহা অসম্পূর্ণ। এখানকার কাহারও কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে দেবতাতুষ্টি করিবার জন্য আপনাপন সামর্থ্যানুসারে সে সোপানের মানসিক করিয়া থাকে, আমরা যে ব্রাহ্মণ বাটিতে আশ্রয় লইয়াছিলাম শুনিলাম ইনি গত বৎসর সাতটী সোপান তৈয়ার করিয়া দিবার মানসিক করিয়াছিলেন। নাগার্জ্জুনের মন্দিরে তেমন বন্দোবস্ত নাই। ইহার তদারক বড় কেহ করে না। দেবতামূর্ত্তি মাকড়সার জালে আবৃত। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি হিন্দু মন্দির স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। জৈনদিগেরও এখানে কতকগুলি অতিসুন্দর মন্দির আছে, এসমস্ত আধুনিক এবং বিশেষ বর্ণনাযোগ্য নহে।

এখানকার পাণ্ডারা রামটেকের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে রামায়ণবর্ণিত শম্বুক কাহিনীর উল্লেখ করিয়া থাকে। উত্তরাকাণ্ডে লিখিত আছে একদা এক ব্রাহ্মণ আপনার পুত্রের অকাল মৃত্যুতে নিতান্ত শোকাকুল হইয়া রাজদ্বারে আপনার দুঃখের কথা জানাইল এবং উহার নিরাকরণ জন্য আবেদন করিল। রামচন্দ্র একপ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল শম্বুক নামে শূদ্র পৃথিবীতে সুকঠিন তপস্যা করিতেছে উহার শিরশ্ছেদ কর তাহা হইলে ব্রাহ্মণপুত্র জীবিত হইবে। মহারাজ রামচন্দ্র নানাদেশ অন্বেষণ করিয়া দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত জনস্থানে আসিয়া তপঃপরায়ণ শম্বুককে দেখিতে পাইলেন, এবং উহাকে নিধন করিলেন। শম্বুক রামচন্দ্রের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বর্গলাভ করিল, পাণ্ডারা বলিয়া থাকে এই সেই শম্বুকের তপস্যাস্থান। এসম্বন্ধে রমেটেক মাহাত্ম্য নামক একখানি পুস্তকও আছে। বলিতে পারি না ইহা কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পাণ্ডার স্বকপোলকল্পিত কি না। তীর্থ স্থান এখন পাণ্ডাদিগের একটী ব্যবসায়ের স্থান হইয়াছে প্রায় সকল তীর্থেরই মাহাত্ম্য লইয়া নানা উপকথা ও কিম্বদন্তীর বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণানুসারে শম্বুক দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত জনস্থানে তপস্যা করিতেছিল। রামচন্দ্র শম্বুককে নিধন করিয়া যখন অবগত হইলেন এই সেই দণ্ডকারণ্য তখন তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল। এস্থলে উত্তররামচরিত রচয়িতা মহাকবি ভবভূতি (বিদ্যাসাগর সংস্করণ ৬১ পৃষ্ঠা দেখ) রামচন্দ্রের মুখে দণ্ডকারণ্যের অতি সুন্দর বর্ণনা

করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় গোদাবরী নদী পঞ্চবটি ও অগস্ত্যাশ্রমের উল্লেখ আছে। গোদাবরী অবশ্য এখান হইতে অনেক দক্ষিণে। সখারাম দেউস্কর মহাশয় স্বরচিত "দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশ" নামক প্রবন্ধে মহারাষ্ট্র দেশই প্রাচীনকালে দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত ছিল এইরূপ অনুমান করেন। আধুনিক নাসিককেই পঞ্চবটি বলিয়া অনেকে মানিয়া থাকেন; দেউস্কর মহাশয় কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ করেন। Central province Gagattier রচয়িতা মহাত্মা Grant সাহেব ইহা রামায়ণ বর্ণিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। আমি রামটেক যাইবার পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম এখানে আসিয়া বোধ করি ঐ সম্বন্ধে কোন না কোন কিম্বদন্তী শুনিতে পাইব। কিন্তু পাণ্ডাদিগকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াও এ বিষয়ে কিছু শুনিতে পাইলাম না।

এ অঞ্চলের লোকে আর একটি কিম্বদন্তীর কথা বলিয়া থাকে। প্রাচীনকালে হেমাদপন্থ নামে একজন বৈশ্য ছিলেন তিনি এই মন্দির এবং এ অঞ্চলের অন্যান্য অনেক প্রাচীন ইমারতের নির্ম্মাণকর্ত্তা। হেমাদপন্থ কোন সময়ের লোক তাহা জানা যায় না তবে এ কথা সকলেই জানেন যে অনেক প্রাচীন ইমারত তাঁহা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে।

নাগপুরের Settlement report প্রণেতা অনুমান করেন (Settlement report ৩২৩ পৃষ্ঠা দেখ) বর্ত্তমান দুর্গ মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের নির্ম্মিত অথবা মহারাষ্ট্রীদিগের সময় হইতেই উহার সংস্করণ ও বর্ত্তমান আকারে গঠন হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় রাজত্বের প্রাক্কালেই দুটী অতিসুন্দর বাউলি মৃত্তিকার স্তর মধ্যে প্রোথিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল সম্ভবতঃ এ দুটী গোঁড় রাজাদিগের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ৩০০।৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ বাউলি দুটী ও দুর্গের এবং মন্দিরের কোন কোন অংশে বোধ করি সূর্য্যবংশীয় হৈহয় বংশীয় রাজাদিগের নির্ম্মিত। হৈহয় বংশীয়েরা গোঁড়দিগেরও পূর্ব্বে এ অঞ্চলে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিল।

শীতলা ষষ্ঠী।

একটা স্বপ্নের মত শীতের কুহেলীর ভিতর দিয়া শ্রীপঞ্চমীর রাত্রি অবসান হইল। কিন্তু উৎসবময় গ্রামের হর্ষোৎসাহের বিরাম নাই। গোবিন্দপুরের বারোয়ারী তলায় রাত্রির অধিকাংশ কাল নৃত্য গীতে ব্যাপ্ত থাকার পর নিশিশেষে আসর শূন্য হইয়া গেল,

বাতি নিবিল, ঢুলীবাজন্দারেরা যাত্রাভঙ্গের ভূমিকা সূচক একবার 'পাখাওয়ালা' বড় বড় ঢাকগুলাতে কাঠিদিয়া হিমযামিনীর সুপ্তিকুহক ভাঙ্গিয়া দিল, তাহার পর নহবতের উপর হইতে রসুনচৌকির দল মধুর ভৈঁরো রাগিণীতে সানাই বাজাইয়া উষাদেবীর আবাহন সঙ্গীতের সূচনা করিল।

আজ যেন সমস্ত গ্রামের ছুটী। উৎসবমুখর গ্রামে আজ কাহারো কোন কাজ নাই, স্কুল পাঠশালার ছুটী; স্ত্রীলোকের রন্ধনশালার কাজ বন্ধ, কৃষকেরা ক্ষেতে যায় নাই, বাজারে মাছ তরকারীর পর্য্যন্ত আমদানী নাই, অরন্ধনের দিনে কে মাছ তরকারী কিনিবে? ময়রা দোকানে কেবল যা কিছু মিষ্টান্ন বিক্রয় হইতেছে। বাজারের দোকানদার, ব্যবসায়ীগণ, পাঠশালার ছেলেরা, গৃহস্থ সকলে সকালে সকালে আহারাদি সারিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, কারণ বারোয়ারীর আসরে বেলা একপ্রহরের মধ্যে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর যাত্রা আরম্ভ হইবে। বৈকুণ্ঠ জাতিতে কৈবর্ত্ত, যাত্রাদলের অধিকারী গিরি করিয়া এ অঞ্চলে অধিকারী নামে পরিচিত। সমস্তরাত্রি মধুকানের পালা শুনিয়াও বায়োয়ারীর পাণ্ডাদের আশা মেটে নাই, আসর ফাঁক দেওয়া হইবে না বলিয়া তাহারা অতি কম টাকায় বৈকুণ্ঠের দলের বায়না করিয়াছে। বৈকুণ্ঠের বাড়ী গোবিন্দপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে; গান ও বক্তৃতায় এই কৈবর্ত্তপুত্র বাল্যকাল হইতেই এ অঞ্চলে কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সর্ব্বপ্রথমে সে কানাইখালীর মাধব গাঙ্গুলীর যাত্রার দলে প্রবেশ করে, কৃতকর্ম্মা হইয়া সে নিজেই এক দল খুলিয়া ফেলিয়াছে। সে সময়ে মতিরায়ের যাত্রার নামে পল্লী অঞ্চলে একটা ভারি কোলাহল পড়িয়া গিয়াছিল, মতিরায়ের পালা, মতিরায়ের সুর, মতিরায়ের বক্তৃতার মধ্যে এমন একটা মোহকর ভাব ছিল যাহা কি পুরুষ কি রমণী সকলের কর্ণেই মধুবর্ষণ করিত। অনেক টাকা বায়না দিয়া পল্লীগ্রামে কেহ মতিরায়ের দল আনাইতে পারিত না, কিন্তু তাহার গান এ অঞ্চলে অপরিচিত ছিল না, নদীর ধারে আম্রকাননের পাশে গরু ছাড়িয়া দিয়া রাখালের দল গাহিত :—

"বড় আশা ছিল মনে ওহে বংশীধারী
দাদারে করিয়া রাজা হব ছত্রধারী
তাতো হলো না হলো না,"

সন্ধ্যাকালে কর্ম্মশ্রান্ত শ্রমজীবী জনবিরল গ্রাম্যপথ ধ্বনিত করিয়া সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপাইয়া গাহিত—

"এ ত সুধা নয়, সুধা নয়,
কুরুকুলক্ষয়কারী গরল রাশি
খেলায় সাগরে সে রূপসী।"

শুনিয়াই পল্লী রমণীগণ বুঝিতে পারিত এ মতি রায়ের গান। মতি রায়ের দলের

কোন স্বনাম ধন্য জুড়ি এক দিন অত্যধিক পরিমাণে ধান্যসুরা পানে প্রমত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করায় দলের অধিকারী তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তাহার পৃষ্ঠে বেহালার ছড়ের আঘাত করেন, মনোকষ্টে জুড়িপ্রবর মতি রায়ের দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠের দলে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং আসিবার সময় সে অন্নদাতা মতি রায়ের 'ভীষ্মের শরশয্যা' নামক গীতাভিনয় গ্রন্থখানির একটী নকল চুরী করিয়া লইয়া আসে। বৈকুণ্ঠ দেখিল একটি ভাল দলের একজন জুড়ি ও সঙ্গে সঙ্গে একখানি ভাল পুস্তক লাভ হইতেছে, ইহাতে ব্যবসায়ের বেশ সুবিধা হইতে পারিবে, তাই সে মাসিক পনের টাকা বেতন ও খোরাক পোষাকের প্রলোভন দিয়া এই লোকটিকে দলভুক্ত করিয়া লইল এবং তাহাকে তিন মাসের বেতন আগাম দিল।

বৈকুণ্ঠ 'ভীষ্মের শরশয্যা'র নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই নবার্জ্জিত গ্রন্থখানির নাম রাখিল 'ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু', সে খুব ধূমধামে এই গ্রন্থের তালিম দিতে লাগিল, এবং নিজের বাহাদুরী প্রকাশের জন্য পুস্তকের মধ্যে দুই একটা দৃশ্যের সামান্য পরিবর্ত্তনও করিয়াছিল।

পূজার পর বৈকুণ্ঠের দল আর কোথাও গাহনা করিতে যায় নাই। গোবিন্দপুরের বারোয়ারা তলায় একপালা গাহিয়া তাহারা বিদেশে যাত্রা করিবে এই রকম কথা ছিল; এই প্রথম দিনের কৃতকার্য্যতার উপর বৈকুণ্ঠের সম্বৎসরের সাফল্য নির্ভর করিবে, তাই সে আপনার 'কেরদানী' পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করিবার জন্য তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাজ সরঞ্জাম লইয়া বারোয়ারী তলায় উপস্থিত হইয়াছে।

আসর হইতে ঢোলকের শব্দ উঠিবামাত্র গ্রামের মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে মধুচক্রের গুঞ্জন আরম্ভ হইল; গৃহস্থ পুরুষগণ কেহ তাড়াতাড়ী স্নান করিয়া আসিল, কাহারো বা তাহার অবসর হইল না, রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া অরন্ধনের পান্তভাত খাইতে আরম্ভ করিল; আজ খাদ্যের উপকরণও অদ্ভুত; পান্তভাতের সঙ্গে তৈল লবণ এবং কাঁচালঙ্কা বিরাজিত, আস্ত কলাই সিদ্ধ, লম্বা লম্বা আলতাপাতি শিম সিদ্ধ, বেগুণ সিদ্ধ, বেথোরপাতা এবং কুল সিদ্ধ, এই সকল দ্রব্যই শীতলা ষষ্ঠীর দিন পান্তভাতের উপযুক্ত ব্যঞ্জন। ইহা ভিন্ন পূর্ব্ব দিন কেহ কেহ ভাল মাছের অম্বলও রাঁধিয়া রাখে, কিন্তু সকলে নহে।

এদিকে গিন্নি ঠাকুরাণী মাঘ মাসের সেই প্রবল শীতে নদী হইতে স্নান করিয়া সরস্বতীরূপিণী বাক্স, ঘট, পুঁথির বোঝা এবং দোয়াত কলমগুলি সরাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার পর তুলসীতলায় পুরুত ঠাকুরের জন্য ষষ্ঠী পূজার আয়োজন করিয়া রাখিলেন।

পুরোহিতের পঞ্চাশঘর যজমান, তাহাই রক্ষা করেন না বাজারে বারোয়ারিতলায় যাত্রা শুনেন এই চিন্তাতেই তিনি অস্থির। যাত্রা শুনিতে গেলে যজমান বাড়ীতে ষষ্ঠী পূজা হয় না, ষষ্ঠী পূজা করিতে গেলে যাত্রা শ্রবণের দুরাশা পরিত্যাগ করিতে হয়, অগত্যা

তিনি ষষ্ঠী দেবীকে ফুলজল দিয়াই গৃহান্তরে প্রবেশ করিতেছেন। ষষ্ঠী-পূজা শেষ হইলে পুরুষেরা ও ছেলেরা পান্ত খাইয়া হৃষ্টচিত্তে বারোয়ারী তলায় যাত্রা শুনিতে গেল। গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা এখনো অনাহারে আছে, ষষ্ঠীর কথা না শুনিয়া কাহারো জল গ্রহণ করিবার সাহস বা ইচ্ছা নাই, ষষ্ঠী দেবীর শাপে পড়িয়া সেকালের মণ্ডল গিন্নির মত হইতে কতক্ষণ? বিশেষতঃ শীতলা ষষ্ঠীর মিষ্ট কথা ওপাড়ার অন্নপূর্ণা মাসীর মুখে এমন শুনায় যে তাহার প্রলোভন কিছুতে পরিত্যাগ করা যায় না। তাই সকলে অন্নপূর্ণা মাসীর শুভাগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিল। তাহাদের অনেকেরই অবস্থা জলবিন্দু পতনাভিলাষী চাতকের মত নিতান্তই উদ্বেগপূর্ণ, কিন্তু এত বেলা পর্য্যন্ত পুত্রবতীরা ছোট ছোট ছেলেপিলে কোলে লইয়া 'উপস' পাড়িতেছে দেখিয়া গিন্নিরা মাসীর উপর কিছু ক্ষাপা হইয়া উঠিতেছেন, বিশেষতঃ যে সকল গিন্নির নিকট অন্নপূর্ণা মাসী কিছু উপকৃত তাহাদের তর্জ্জন গর্জ্জনের আর সীমা নাই। ইতিমধ্যে মাসীমা হাস্যোজ্জ্বল মুখে সমাগতা—দেখিয়া গিন্নি মুখভারি করিয়া বলিলেন "হাঁগা অন্ন, একটু সকাল করে কি কথা শুনাতে আস্‌তে হয় না, কাঁচা পোয়াতি সব উপস পাড়ছে," অন্নপূর্ণা মাসী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ ভাবে সাময়িক একটা আপত্তি করিয়া রৌদ্রোত্তপ্ত সানের উপর উপবেশন পূর্ব্বক পরিবারস্থ সকলকে আহ্বান করিলেন, কর্ত্রী, প্রৌঢ়া রমণীগণ, বধূগণ এবং ছোট ছোট বালক বালিকা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলে এই ব্রাহ্মণ রমণী শীতলা ষষ্ঠীর দুর্লভ কথা তাঁহার মাতামহীর নিকট হইতে কিরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এবং এই পুণ্যকাহিনী অবগতির জন্য পাড়ায় তাঁহার কিরূপ সম্মান তাহার বিস্তীর্ণ ভূমিকা শেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"এক গাঁয়ে ছিল এক ঘর গেরস্ত। বুড়ো গেরস্তর বুড়ী ছাড়া আর কেউ ছিল না, বুড়োবুড়ী বড় লক্ষ্মীমন্ত ছিল, কিন্তু তা থাক্‌লে কি হবে, মা ষষ্ঠী তাদের ছেলেপিলের সুখ হতে 'বঞ্চিৎ' করেছিলেন, কত ষষ্ঠী কত সুরচনী পূজো, পীরের দরগায় কত ছিন্নি মানত, কিছুতেই তাদের ছেলে হলো না; বুড়ো নিঃশেস ফেলে বলতো "হায় হায় আমার এতটা বিষয় খাবে কে, বাপ বড় বাপের জল গণ্ডুষের পিত্যেশ রৈল না।" বুড়ী বলতো "এমনি কি ভগবানের বিচের, এয়োস্ত্রীরা আমাকে দেখে মুখ ঢেকে যায়, বলে আঁটকুড়ীর মুখ দেখলে অমঙ্গল হবে, ওমা আমি যাব কোথা?"

শেষে ষষ্ঠীর দয়ায় বুড়ী 'পোয়াতি' হ'লো, বুড়োবুড়ীর মনে কত আহ্লাদ! আহা যদি তাদের এই বুড়ো বয়সে একটি ছেলে হয় তো সোনার টাট বজায় রাখবে। একমাস দুমাস ক'রে দশ মাস গেল, এক দিন বুড়ো হাট কর্ত্তে গিয়েছে, এমন সময় বুড়ীর প্রসব বেদনা উঠলো, তাই শুনে পাড়ার মেয়ে ছেলেরা ঝেঁটিয়ে বুড়োর বাড়ী এসে জমলো বুড়ীর কি ছেলে হয় তাই দেখ্‌তে। এসে দেখে বুড়ো আঙ্গুলের মত বুড়ীর ষাটটি ছেলে হয়েছে, ছেলেগুলি পুট পুট করে তাকাচ্ছে, দেখে সবাই বুড়ীর কত নিন্দে করতে

লাগলো, বুড়ী তখন মনের ঘেন্নায় ছেলেগুলোকে কুলোর উপর সাজিয়ে বাড়ীর পাশে বাঁশতলায় ফেলে দিয়ে এলো।

হাট করে বুড়ো বাড়ী ফিরে এসে শুন্‌লে লোকের কথায় বুড়ী ছেলেগুলো ফেলে দিয়ে এসেছে, একটা ছেলের জন্যে বুড়ো এতকাল লালিয়ে মরেছে, আর ষাট ষাটটে ছেলে বুড়া কি না ফেলে দিয়ে এলো! শুনে বুড়ো তেলে বেগুণে জ্বলে উঠ্‌লো, সে দুঃখে গালে মুখে চড়াতে লাগলো, বুড়ীকে বল্লে ভাল চাস তো এখনি ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে আয় তুই কি রাক্ষসী যে এমন সোনারচাঁদ ছেলেদের ফেলে দিয়ে এসেছিস। কি করবে বুড়ী, সোয়ামীর কথায় ছেলেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে এলো।

কত যত্ন, কত তাগুতে ছেলেগুলি বড় হতে লাগলো, একা মানুষ বুড়ী এত ছেলে মানুষ করবে কেমন করে, তাই ছেলেদের জন্য ৬০ জন ঝি রাখলে। ছমাসের সময় বুড়ো ধুমধাম ক'রে তাদের মুখে ভাত দিলে, যারা আগে বুড়ীকে এতটুকু টুকু ছেলের জন্যে নিন্দে করেছিল তারাই আবার বুড়োবুড়ীকে ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর বলে সুখ্যাতি কর্ত্তে লাগলো।

ছেলেরা বড় হলে বুড়ো তার ষাট ছেলেকে ষাটখান ঘর করে দিলে, শেষে ষাট ছেলেকে সুন্দর টুকটুকে দেখে ষাটটি বৌ এনে দিলে। ষাট ছেলে আর ষাট বৌ নিয়ে বুড়োবুড়ী সুখে ঘরকন্না কর্ত্তে লাগলো।

শীতকালে এক দিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে, ছেলের বৌরা এক সঙ্গে বসে দুঃখু কর্ত্তে লাগলো—

"আজ যদি মাবাপের বাড়ী হ'তো,
চাল ভাজা ছোলা ভাজা হতো,
কৈ মাগুরের ঝোল হ'তো,
গরম গরম খেচুড়ী হ'তো,
তাহলে মনের খেদ যেতো।"

বেটার বৌদের এই রকম দুঃখ করতে শুনে বুড়ী বল্লে আমার বৌমাদের যা খেতে সাধ গিয়েছে তাই খাওয়াব, বাছারা লজ্জায় আমার কাছে কোন কথা বলতে পারে না।—বুড়ী তখন বুড়োকে ব'লে বৌদের জন্যে চাল ছোলা ভাজলে, কৈমাগুরের ঝোল কল্লে, গরম গরম খেঁচুড়ী রেঁধে থাসা করে ঘি ঢেলে তাদের খেতে দিলে। সে দিন শীতলা ষষ্ঠী তা বুড়ী ভুলে গিয়েছিল, বৌরা মনের সাধে আশ মিটিয়ে খেয়ে সন্ধের পর শুতে গেল।

পর দিন সকালবেলা চারদিক ফরসা হয়ে গেল, গেরস্তরা উঠে ছড়া ঝাঁট দিলে, তুলসী তলা নিকোলো, সূর্য্য উঠ্‌লো কিন্তু বুড়োর বেটা বেটার বৌরা কেউ জাগলো না, বুড়ী কত ডাকাডাকি করতে লাগলো, তা তারা বেঁচে থাকলে ত জাগবে, বুড়ী

দেখলে তার ষাট বেটা ষাটটি বেটার বৌ সকলে বিছানার উপর মরে রয়েছে, বুড়ী মাটীতে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো।

শেষ কালে বুড়ী বেটা বেটার বৌদের শোকে পাগলের মত হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল; বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে শেষে আর এক বুড়ীকে দেখতে পেলে, এই নতুন বুড়ী তাকে দেখে জিজ্ঞাসা কল্লে "কি দিদি কাঁদচো কেন?" বুড়ী বল্লে "কপালের দুঃখু আর বলবো কি, ষাটটি বেটা ষাটটি বেটার বৌকে জলে দিয়ে আমি পাগলের মত হয়েচি।"—নতুন বুড়ী বল্লে "এই পথ দিয়ে যাও, এক ষষ্ঠীতলায় (বটগাছ তলে) এক বুড়ীকে দেখতে পাবে তার সর্ব্বাঙ্গ কুড়ীকুষ্ঠতে খসে পড়ছে, তাকে ধরলে তোমার দুঃখু ঘুচবে, কিন্তু দেখো সে যা বলে তা করতে যেন ভুলোনা, আর তাকে দেখে 'হেনাস্থা' (উপেক্ষা) করো না।"—এই কথা শুনে বুড়ী ছুটে চললো।

অনেক দূর গিয়ে বুড়ী দেখতে পেলে যে ষষ্ঠীতলাতে সত্যি সত্যি এক বুড়ী বসে রয়েছে, থুড় থুড়ে বুড়ী, তার সর্ব্বাঙ্গে কুড়ীকুষ্ঠ, ঘা দিয়ে রসানি পড়ছে, গায়ে মাথায় ছোট ছোট পোকা কিলকিল করচে, দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যায় না।

বুড়ী তাকে দেখে তার পায়ের গোড়ায় একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লো, তার পা ধরে বল্লে "মা আমাকে দয়া কর, আমার বেটা বেটার বৌদের প্রাণ দেও, শোকে আমি জলে মলাম, অনেক ষষ্ঠী সুবচনী পুজো করে আমি ষাটটি রাজ পুত্তুরের মত ছেলে, ষাটটি রাজকন্যের মত ছেলের বৌ পেয়েছিলাম, আমার পাপে আমি তাদের সব কটিকে হারিয়েছি, আমার প্রাণ নিয়ে তাদের প্রাণ দেও মা।"

বুড়ীর কথা শুনে সেই কুড়ীকুষ্ঠওয়ালা বুড়ী পা টেনে নিয়ে বল্লে "তা আমি কি জানি, তোর বেটা বেটার বৌ ম'লো আর না ম'লো তাতে আমার কি গেল এল, যা তাদের চালভাজা ছোলাভাজা, মাগুরমাছের ঝোল, গরম গরম খেঁচুড়ী খেতে দিগে, ভাল হয়ে যাবে, পেটের জ্বালায় পুজো আশ্রা মানতে চাস্‌নে তোদের এতবড় আস্পদ্ধা, দেখ এখন কেমন মজা,—চলে যা এখান হতে, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না, আমি কি করবো?"

মণ্ডলগিন্নি কিন্তু কিছুতে সে বুড়ীর পা ছাড়লো না, কেঁদে বল্লে "হেঁই মা আমি তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমার বাছাদের বাঁচিয়ে দেও, গেরস্তর ঝি বৌ হয়ে বড় দায়ে পড়ে আমি ঘরের বার হয়েছি, এবার আমার লজ্জা নিবারণ কর।"—বুড়ীর তখন একটু দয়া হলো, বুড়ী মণ্ডলগিন্নিকে বল্লে "তবে যা একহাঁড়ি দই আর হলুদ নিয়ে আয়, যা কর্ত্তে হবে তা আমি কচ্চি।"—শুনে বুড়ী তখনি সেখান হতে উঠে গিয়ে নতুন হাঁড়িতে করে এক হাঁড়ি সাঁজ দৈ, আর গোবর লেপা শুদ্ধ কুলোতে এক কুলো হলুদ গুঁড়ো নিয়ে এল। বুড়ী বল্লে "দুয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে ঢাল আমার গায়ে।" বুড়ী তাই কল্লে, তার গায়ের উপর দিয়ে সেই হলুদ মিশোনো দইয়ের ছোরোত (স্রোত) বয়ে গেল,

তখন বুড়ীর কথামত মণ্ডলগিন্নি সেই ঘা ধোয়া দৈ আবার হাঁড়িতে করে, তুলে নিলে, বুড়ী বল্লে "যা এই দৈ তোর বেটা বেটার বৌদের গায়ে ছড়িয়ে দিগে, তাহলেই তারা বেঁচে উঠ্‌বে। আর দেখিস, কখন যেন শীতলা ষষ্ঠীর দিন গরম গরম ভাত তরকারী কিছু খাসনে কি কাউকে খেতে দিস্‌নে।"—মণ্ডলগিন্নি বুড়ীর পায়ে দণ্ডবাত ক'রে হাঁড়ি নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

পথে যেতে যেতে মণ্ডলগিন্নি ভাব্‌লে বুড়ী যে দই দিলে তাতে মরা প্রাণী জ্যান্তো হয় কি না তাত দেখতে হচ্ছে, এমন সময় সে দেখ্‌তে পেলে এক মেছুনী এক ঝুড়ী পচা মাছ নিয়ে সেই পথ দিয়ে বাজারে বিক্রী করতে যাচ্ছে, মণ্ডলগিন্নি মেছুনীকে দাঁড়াতে বল্লে, মেছুনী তার কথায় মাছের ঝুড়ী নামিয়েছে কি মণ্ডল গিন্নি তার ঝুড়ীতে একথাবা দই ঢেলে দিলে, আর কোথায় যাবে, পচা মাছগুলো জেন্ত হ'য়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌তে লাগলো।

বুড়ী তখন মনের সুখে বাড়ী ফিরে এসে মরা বেটা বেটার বৌদের গায়ে সেই হলুদ দৈ ছিটিয়ে দিতে লাগলো, তখন তারা "এত বেলা হয়েছে, কি ঘুমই চোখে এসে-ছিল" বলে গা মোড়ামুড়ী দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলো। এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমি-য়েছিলাম, নাজানি শাশুড়ী কি মনে করছে ভেবে বৌরা লজ্জায় আর শাশুড়ীর সামনে বেরতে পারে না, বেটারা আর লজ্জায় বাপের মুখের দিকে চাইতে পারে না। মণ্ডল গিন্নি তখন তাদের ডেকে সকল কথা বল্লে। শুনে সকলে ষষ্ঠীর উদ্দেশে প্রণাম কল্লে, বল্লে, "মা ষষ্ঠী তুমি বড় জাগ্রত দেবতা, তুমি আমাদের শুভো কর, আমরা ভাল করে তোমার পুজো দেব।"

মণ্ডলদের ছেলেরা তার পর হতে খুব ধুমধামে শীতলা ষষ্ঠীর পূজো করতে লাগলো; ষষ্ঠীর দয়ায় তাদের সংসার উথলে উঠ্‌লো, ধুলো মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হয়। মণ্ডলের যাট ছেলে, তাদের আবার কত নাতি পুতি হলো। শেষ কালে বেটা বেটার বৌ নাতি নাতনীদের সকলকে রেখে সোয়ামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মণ্ডলগিন্নি একদিন স্বর্গে গেল, তার পরনে কস্তাপেড়ে নূতন কাপড়, তার সিঁথিতে সিঁদুরেরই বা শোভা কত, সতীলক্ষীর সিঁথির সিঁদুর এমনি ডগডগ করে।"

রমণীগণ এমন কি বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত নিশ্বাস রোধ করিয়া এই কাহিনী শ্রবণ করিল, বারোয়ারি তলায় এত ধুমধামে নাচ, গান এ সকলের দিকে তাহাদের কিছু মাত্র মনোযোগ নাই, তাহারা এই সহজ, বৈচিত্র্যহীন অসম্ভব গল্পটিকে প্রাণের মধ্যে সত্যের আসনে স্থান দিয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের সন্তোষের কিছু মাত্র ব্যাঘাত ঘটি-তেছে না।

গৃহস্থ রমণীগণ এই কাহিনী লইয়া সানন্দ অন্তরে আপনাদের মধ্যে যে পরিমাণেই আন্দোলন করুক, বারোয়ারী তলার যাত্রার আসরে আজ কাতারে কাতারে দর্শক বসিয়া

গিয়াছে। ভীষ্মের শরশয্যার অভিনয় গোবিন্দপুরের দুই একজন মাত্র মতিরায়ের দলে দেখিয়াছিল, তাহারা এই গানের সমালোচনাতেই অধিক সময় ব্যয় করিতে লাগিল, এবং অনেকে গান ফেলিয়া তাহাদের বক্তৃতাতেই মনঃসংযোগ করিল। যাত্রার যখন বক্তৃতা চলিতেছিল সে সময় অনেকে একটু চুপ করিয়া হয়ত ইহাদের অনুপ্রাস ঝঙ্কারিত দীর্ঘ বাক্যচ্ছটা শ্রবণ করিতেছিল, কিন্তু ভাবগ্রাহী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ শ্রোতা ভিন্ন অন্য কেহ গানের মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। আসরের পাশে কাটরার চারিদিকে কতকগুলি বেঞ্চি, তাহাতে স্থানীয় উকিল মোক্তার, ডাক্তার, ইস্কুলের মাষ্টার এবং ভদ্রলোক ও ভদ্রলোকের ছেলেরা বসিয়া গান শুনিতেছেন, মুরুব্বিদলের মধ্যে ঘন ঘন তামাক চলিতেছে, আসরের মধ্যে গায়কগণেরা কেহ কেহ মাথা নীচু করিয়া জলহীন হুকাতে একটা দম দিয়া উঠিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক বিকট চীৎকারে রাগিণী ধরিতেছে এবং সরুমাল হস্তের বিবিধ ভঙ্গীপূর্ব্বক তাল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। অধিকারীর সম্মুখে একদিকে একখান বড় পিতলের রেকাব, অন্যদিকে একখানা হস্তলিখিত বিকট পুঁথি—এই পুস্তকখানিই "ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, গীতাভিনয়।" কাহারো বক্তৃতা মধ্যপথে থামিয়া গেলে, এক জন লোক নিম্নস্বরে মধ্যে মধ্যে তালিম দিয়া দিতেছে, ছয়জন জুড়ি শামলাবিহীন ছয়জন মোক্তারের মত চোগা চাপকানে মণ্ডিত হইয়া আপ্রাণ শব্দে চীৎকার করিতেছে, তাহাদের চীৎকারের নিবৃত্তি হইলেই আর একদল লোক আসরের মধ্যে বসিয়াই সমোচ্চস্বরে তাহাদের গানের অনুবৃত্তি করিতেছে, গান লাগিয়া উঠিলে শ্রোতাগণের মধ্যে হইতে সবেগে হরিধ্বনি উঠিতেছে, কখন বা কেহ রুমালে বাঁধিয়া একটা টাকা কিম্বা একটা আধুলী 'ফেরি' ছুড়িয়া দিতেছে। জুড়ীর গানের পর বক্তৃতা, তাহার পর প্রায় একই রকম সাজে সজ্জিত এক ডজন ছেলে গান মুখে করিয়া উঠিয়া দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল, তখন কিছুক্ষণের জন্য আবার তাহাদের গীতোচ্ছ্বাস চলিল।

হঠাৎ চাষার দলের সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের কি একটা কথা লইয়া বিবাদ বাধিল; এবং কলরব ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, ভীমসেন তখন সবে মাত্র উঠিয়া, দাঁড়াইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া হস্তস্থিত কৃত্রিম গদা স্কন্ধে তুলিয়া মস্তকস্থ দীর্ঘকেশ আন্দোলন পূর্ব্বক বিস্ফারিত নেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রস্থিত দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া বীরদর্পের সুরু করিয়াছিল, কিন্তু অনুপ্রাস ঝঙ্কারিত এই নকল বীরদর্প আসল বীরদর্পকে অতিক্রম করিতে পারিল না, কাজেই ভীমসেনকে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইতে হইল, ইতিমধ্যে আসরে এক কলিকা তামাকু আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে কালো গর্ণেটের পেণ্টেলুন পরা দুর্য্যোধন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কলিকাতে একটি দম্ দিয়া লইল।

কিন্তু গোলমাল ক্রমে বাড়িয়া উঠাতে উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠ তাহার বেহালাদারকে দুই একটা ভাল গদ্য বাজাইয়া গোলমাল থামাইবার জন্য ইসারা করিল।

বৈকুণ্ঠের দলের প্রধান বেহালাদার গণেশ নন্দীর বেহালা বাজানর সুখ্যাতি ছিল, দলপতির ইঙ্গিত মাত্রে সে উঠিয়া বুকের কাছে বেহালাখানি ধরিয়া গ্রীবার নানাপ্রকার ভঙ্গী করিয়া একটি মিষ্ট গত বাজাইতে আরম্ভ করিল, মিষ্ট সুরে অনেকে মুগ্ধ হইল বটে কিন্তু তখনো কলরবের নিবৃত্তি নাই, তখন দুটি ছেলে নাকে নলক মাথায় পরচুলা দিয়া, পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া পুরাতন ঘাঘরাতে সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন পূর্ব্বক এবং মাথায় এক একটা নকল ফুল লতাপাতা ও পাখীর পালক জড়ান টুপী পরিয়া আসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারকম অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর বেহালার সুরে সুর মিলাইয়া অপাঙ্গভঙ্গী করিয়া গাহিতে লাগিল :—

"বারণ কর লো সই
আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না,
আমরা গোপেরি বালা, না জানি বিরহজ্বালা
যমুনায় জল আন্‌তে যাওয়া সাজে না সাজে না।"

এই নৃত্য গীতে অল্পক্ষণের মধ্যেই হট্টগোল থামিয়া গেল। আবার পূর্ব্ববৎ বক্তৃতা ও গান চলিতে লাগিল।

এই দিন বৈকুণ্ঠের দলে যে যতই উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করুক এবং গানগুলি যতই মনোরম হউক, একটি বালকের করুণকণ্ঠ এই গীতাভিনযের উপসংহার ভাগে দর্শকগণের চক্ষে অশ্রুতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের ঘোরতর যুদ্ধের অবসানে—দশমদিনে ভীষ্ম শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন, শত্রু মিত্র সকলে কুরুকুল পাণ্ডবগণ দুই পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে পিতামহ ভীষ্মের এই সম্ভবাতিরিক্ত পরিণাম সন্দর্শন করিতেছেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার রাঙ্গতার রাজমুকুট ভূমে ফেলিয়া চোখে রুমাল দিয়া কাঁদিতেছেন, তাঁহার ললাটস্থিত রক্তচন্দনের ত্রিবলী রেখা এবং ঘর্ম্ম পরস্পর মিশ্রিত হইয়া ধারারূপে পতিত হইতেছে, ভীমের হাতের লৌহ গদারূপী কাঠের বাঁটবিশিষ্ট তুলার বালিশটা ভূপতিত, অর্জ্জুন বাখারি নির্ম্মিত গাণ্ডীবের উপর ভর-দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহার নকল সাচ্চার পোষাকের ভিতরদিয়া গল-দেশ বিজড়িত মোটা এক কণ্ঠিকাঠের মালা এবং ময়লা সার্টের কলরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, আর অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন একটা গাড়ু হস্তে পিতামহের পিপাসা নিবারণের জন্য অগ্রসর হইতেছেন।

যাত্রার এই দৃশ্য বিশেষ করুণোদ্দীপক হইলেও তাহা অধিক লোকের হৃদয়স্পর্শ করিতে পারে নাই, কিন্তু এই দৃশ্যের শেষভাগে একটি বালক যখন একখানি লোহিত পট্টবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া আলুলায়িত কুন্তলে ভীষ্মমাতাবেশে ক্ষিপ্রগতিতে রঙ্গভূমে প্রবেশ পূর্ব্বক পতিত বীরের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুকম্পিত করুণ কণ্ঠে একাকী গাহিতে লাগিল :—

মরিরে মরি প্রাণকুমার আমার
এ দশা তোর কে করিল,
এই বিশ্ব মাঝে কোন পাষণ্ড
আমার—ভীষ্মজননী নাম ঘুচাইল
জানিরে তোর ইচ্ছামরণ, এ দশা তোর কিসের কারণ
ওরে জীবন ধন,
অভাগীর অঞ্চলের নিধি
কোন দস্যুতে হরে নিল!

তখন শ্রোতাগণ সকলে আপনার কথা ভুলিয়া এই তুচ্ছ যাত্রা এবং হীন গায়কবর্গের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া সেই নরবন্দনীয়া দেবজননী ভগবতী জাহ্নবী এবং তাঁহার দেবব্রত মহাবীর পুত্রের এই অন্তিম মিলনের বিষাদ বেদনা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতে লাগিল, পুত্রের বিপদে মাতার এই কাতরতা, এই হৃদয়ভেদী মর্ম্মোচ্ছ্বাস কোন্ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বিচার করিবার কাহারো তখন অবসর ছিল না, শুধু বিষাদাপ্লুত সঙ্গীতের কোমল সুরে পুত্রশোকে মুহ্যমান মাতৃহৃদয়ের অব্যক্ত অগাধ বেদনা চরাচরের সুপ্ত পুত্রস্নেহকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছিল, এবং দর্শকগণের কঠোর সমালোচনা, বিরাগভরা ভ্রূকুটী ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ হাস্য, সমবেদনা সঞ্চারিত অশ্রুপ্লাবনে ধৌত করিয়া যাত্রা দলের অধিকারী শ্রোতাগণের হৃদয়ে পৌরাণিক যুগের এক সম্ভ্রমপূর্ণ আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক যাত্রার উপসংহার করিল।

যাত্রা শেষের সময় অধিকারী গোবিন্দপুরের বড়বাজারের পাণ্ডাদের স্তুতিসূচক দুই একটা 'বোটকেরী' গান গাহিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিল।

যাত্রা ভাঙ্গিবে এমন সময় সঙের ফরমাইস হইল। মজুমদারদের মেজবাবু গ্রামের অন্যতম জমীদার চাটুর্য্যেদের প্রতিদ্বন্দ্বী। চাটুর্য্যেরা খুব বড় কুলীন বলিয়া সমাজে পরিচিত, তাই তাঁহাদের প্রতি অভদ্র ইঙ্গিত করিবার অভিপ্রায়ে মেজ বাবুর পরামর্শে 'কুলীনের চক্ষুদান' নামক সঙের অবতারণা করাই স্থির হইল।

সঙ আসিতেছে শুনিয়া আবার সকলে সোৎসাহে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিল, সঙ আসিবার পূর্ব্বে আবার মহাধূমধামে বাজানা বাজিতে লাগিল, শেষে সঙ আসিয়া উপস্থিত।

যা সঙপনা হইল তাহার মধ্যে না আছে রসিকতা, না আছে হাস্যরসের উৎপাদক সুরুচিপূর্ণ বাক্যকৌশল। কিন্তু সেকালের গ্রাম্য লোকেরা তাহাই প্রচুর আমোদপ্রদ বলিয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া সমান উৎসাহে এই অশ্লীল রসিকতা উপভোগ করিত, এবং পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া একই দৃশ্য দেখিয়া দন্তোন্মীলন পূর্ব্বক হাস্য করিতে সঙ্কুচিত হইত না।

যাত্রা ভাঙ্গার 'পর আর বেশী বেলা ছিল না। তখন ঢোলক বাজাইয়া মাটীর সঙের নাচ দেখান আরম্ভ হইল; নানা রকমের সঙ গড়ানো হইয়াছে, একটা যায়গা উচু করিয়া ঘেরা; ঘেরের বাহিরে দর্শকগণ দলে দলে ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিত, ঘেরের মধ্যে অদৃশ্য হস্তপরিচালিত সঙের নাচ চলিতেছে; বকুলতলায় গুণসিন্ধু রাজার পুত্র সুন্দরের সঙ্গে হীরে মালিনীর আলাপ, সন্ন্যাসীবেশে সুন্দরের রাজসভায় আগমন ও মাথা নাড়িয়া সেখানে তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান, পাঞ্চালরাজ সভায় অর্জ্জুনের মৎস্যচক্রভেদ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর স্থলে ব্রাহ্মণগণ ও রাজগণের তুমুল বচসা, কীচকের সহিত ভীমের মল্লযুদ্ধ, উত্তর গোগৃহে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুনের যুদ্ধ যাত্রা এবং প্রাণভয়ে কম্পবান উত্তরের পলায়নাভিনয়, এই সকল দৃশ্য অতি দক্ষতার সহিত সাধারণের সম্মুখে প্রদর্শিত হইল। একটি সঙে বৌবাজারের দলের প্রতি কৌতুক কটাক্ষপাত ছিল, বৌবাজারের দলপতি হরিশ হালদার এবং তাহাদের গানের ওস্তাদ দুকড়ি বিশ্বাস রূপী দুই মৃণ্ময়মূর্ত্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছে, খেলোয়াবদ্বয়ের কাছা খুলিয়া গিয়াছে, একজনের হাতে একটা ডাবাহুকা—পাড়ার একটি দুষ্ট ছেলে অতি সন্তর্পণে আসিয়া সেই ক্রীড়ামগ্ন বৃদ্ধের হুকা হইতে কলিকা চুরী করিতেছে—কিন্তু খেলোয়াব মহাশয়ের সে দিক লক্ষ্য নাই, তিনি ললাটের চর্ম্ম কুঞ্চিত করিয়া বিকট মুখভঙ্গী সহকারে বড়ে টিপিতেছেন, তাঁহার সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীটিও এত মনোযোগের সহিত 'চা'ল' লক্ষ্য করিতেছেন যে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে একটি বালক তাঁহার অতি দীর্ঘ স্থূলাকার টিকিটি বামহস্তে আয়ত্ব করিয়া লইয়া একখানি তীক্ষ্ণধার 'কাঁচি' সহায়তায় তাহার মূলোচ্ছেদের সাধু সংকল্পসাধনে সচেষ্ট—তৎপ্রতি তাঁহার কিছুমাত্র খেয়াল নাই।

দীর্ঘরন্ধ্রবিশিষ্ট মোটা মোটা টিনের ল্যাম্প হইতে ধূম্র বহুল কেরোসিনের আলো ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কারণ তখন গোধূলীর আলো একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু বারোয়ারী তলায় তখনো জনসমাগমের বিরাম নাই; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া একই ভাবে ঢোলক বাজিতেছে, আর কারিগরেরা অক্লান্ত নৃত্যে তাহাদের করধৃত সঙ-গুলিকে অদৃশ্য সূত্রপরিচালনে সকৌশলে নাচাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে গান গাহিয়া সঙের ইতিহাস বর্ণনা করিতেছে। তাহাদের সেই গীতধ্বনি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মিশাইয়া যাইতেছে—উৎসবের চঞ্চল আলোকগুলি দূর হইতে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত মানব মণ্ডলীর আনন্দোচ্ছ্বাসের ন্যায় আন্দোলিত দেখা যাইতেছে, তাহারাও নাচের তালে তালে হেলিতেছে দুলিতেছে নাচিতেছে।

কিন্তু গ্রামের বাহিরের দৃশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাসন্তী ষষ্ঠীর ক্ষীণ চন্দ্রকলা ঊর্দ্ধাকাশ হইতে ম্লান রশ্মিজাল প্রেরণ করিতেছে, নৈশ কুয়াসার সূক্ষ্ম যবনিকা ভেদ করিয়া এই হিমযামিনীর কম্পমান হৃদয়ে তাহা উজ্জ্বলতা ফুটাইতে পারে নাই। চৈতালী ফসলের ছোট ছোট শ্যামল গাছগুলিতে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভরিয়া গিয়াছে এবং এই জ্যোৎস্নাময়ী

রাত্রে তাহা প্রকৃতির হরিৎ বস্ত্রাঞ্চলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আর গ্রামপ্রান্তস্থ মেঠোরাস্তার উপর খর্জ্জুর বৃক্ষের অন্তরাহিত উচ্চ স্কন্ধ হইতে বিন্দু বিন্দু রস ক্ষরিত হইয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন কলসীর মধ্যে সঞ্চিত হইতেছে। গোপপল্লীর গোয়াল ঘর হইতে 'সাঁজা-লের' প্রচুর ধূম উঠিতেছে, শ্রমজীবীগণ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে বসিয়া আগুণ পোহাইতেছে, আপনাদিগের সুখ দুঃখের গল্প বলিতেছে আর তামাক টানিতেছে। গোপ-বধূগণ কেহ সাঁজ দিয়া 'দৈ' পাতিবার উদ্যোগ করিতেছে, কেহ বা ময়লা ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে আপনার শিশু পুত্রকে শয়ন করাইয়া সুবুদ্ধি খোকার নিদ্রার সহিত দেশে 'বর্গীর' শুভাগমনের অপূর্ব্ব সম্ভাবনা এবং খাজনা প্রদানের অসম্ভাবনা সম্বন্ধীয় ছড়াটা অনুচ্চ স্বরে আবৃত্তি করিয়া তাহার নিদ্রা উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমাদের গোবিন্দপুরের বারোয়ারী তলায় এখনো উৎসবের অন্ত নাই।

কোকিল ও বিরহিনী

কোকিল।

আছে একটা ভারি কালো পাখী
ও তার আছে দুটো কালো পাখা।
কবিরা তারে কোকিল বলে
আর ফাগুন চৈতে তার বদঅভ্যেস ডাকা।
তার ডাকে, প্রাণ 'হা হুতাশ' করে
বিরহিনীরা সব আছড়ে পড়ে,
আর 'কান্ত' বিনে সে পাখীর স্বরে
তাদের জীবনটা ঠেকে ফাঁকা ফাঁকা।
ও সেই পাখী বড় সর্ব্বনেশে
সে গোল বাধায় ফাগুন চৈতে এসে
ভাগ্যিস নয় সে পাখী বারমেষে
তা'হলে মুস্কিল হ'ত বেঁচে থাকা।

বিরহিনী।

দেখ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি শিশির হইল অন্ত,
বুঝি বা এবার টেঁকা হবে ভার—সখিরে এল বসন্ত
বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি,
রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি
এ সময় তাই বিরহিনীগুলি—
কেমনে রবে জীবন্ত।
ঝর ঝর ঝর কুল কুল কুল বহে ঘাম সব গাত্রে—
ভন্‌ভনে মাছি দিনের বেলায় শন্‌শনে মশা রাত্রে—
ডাকেছে কোকিল কুহু কুহু কুহু
গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু,
বাঁচিনে বাঁচিনে উহু উহু উহু
হি হি হু হু হা হা হন্ত !
পতি কাছে নেই পতিবিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আম দুটো পেড়ে আন্ সখি গুড় দিয়ে রাঁধ অম্বল,
স্মরণে যে ধারা বহে—রসনায়,
কি করি কি করি বাঁচা হল দায়,
ভাঁড়ার ঘরটা আয় সখি আয়
করে আসি লো তদন্ত !
সখি দেখ্ বুঝি বাজারে এখন ঘি দুধ হইল সস্তা,
কিনে আন্ খেয়ে লঘু করি বিরহের ভারি বস্তা,
দেখি যে বিশ্ব শূন্যময়, নে
খেয়ে নিয়ে শুই বিরহে শয়নে
পড়িগে অর্দ্ধ মুদিত নয়নে
গোলেবকাওলী গ্রন্থ।
নিয়ে আয় সখি বরফ—নহিলে মরি এ সময় বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এল নাক পতি, আজ যে মাসের ২৭ শে

নিয়ে আয় পান তাস আন্ ছাই,
এত বিরহের জ্বালা—ঘরে যাই
দাঁড়াইয়া কেন হাসিস্ লো ভাই
বাহির করিয়া দন্ত!

দুইটি শব্দ।

(১)

বহু পুরাতন কথা!

তাহার পর কত দিন রাত্রি, কত মাস বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সে অতীত বাল্যস্মৃতি আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে! সুবিস্তীর্ণ সংসারসাগরের মধ্যভাগে আমার ক্ষুদ্র জীবনতরী কতবার জলমগ্ন হইবার উপক্রম করিয়াছিল, কত শত বাধাবিঘ্ন সম্মুখে আসিয়া গর্ব্বোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কিন্তু সেই পুরাতন ঘটনা কখনও স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই!

আজ আমি বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় দণ্ডায়মান! বহু বৎসরের সংসারের সুখ ও দুঃখ, ক্রন্দন ও কোলাহল উন্নতি ও অবনতির অবিশ্রান্ত বিচিত্র অভিনয় দর্শন করিয়া হৃদয়টা অনেকটা কোমলতা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে! অসীম আশা ও উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা সংসার সংগ্রামে অল্পদিন প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা যে সমস্ত বিষয়ে বিস্ময়প্রকাশ করে, এক্ষণে সে সমস্ত বিষয় আমার প্রস্তর কঠিন হৃদয়ের উপর কোনও প্রকার রেখাই অঙ্কিত করিতে পারে না!

কিন্তু সে সামান্য ঘটনা আজও আমার প্রাণকে উদাস করিয়া তুলে কেন? কৈশোর ও যৌবনের ঠিক সন্ধিকালে হৃদয়ে যে ক্ষুদ্র আঘাত লাগিয়াছিল, এতকাল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে চিহ্ন বিদূরিত করিতে পারিলাম না কেন?

এখনও আঘাতের সেই চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে!

(২)

পূর্ব্বে আমাদিগের অবস্থা ভাল ছিল। পিতামহের সময় প্রতিবৎসরেই দোল দুর্গোৎসব মহাসমারোহে সমাহিত হইত।

কিন্তু পিতামহের মৃত্যুর পর নানা প্রকার পারিবারিক কলহ হওয়াতে ক্রমে ক্রমে আমরা দরিদ্র হইয়া পড়িলাম। কাকাবাবুরা নগদ বিষয় সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন, পিতার অংশে পড়িল, সেই পুরাতন ও অর্দ্ধভগ্ন পৈতৃক ভিটা টুকু।

বাবা কলিকাতায় কোনও গর্ভমেণ্ট আফিসে চাকরি করিতেন, বেতন অধিক না হইলেও তিনি বর্ত্তমান দৈন্যাবস্থায় আদৌ অসন্তুষ্ট ছিলেন না।

কিন্তু এ সামান্য সুখও আমাদিগকে অধিক দিবস ভোগ করিতে হইল না। আমাদিগকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া, বাবা ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন!

তখন আমি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। সেই দুরূহ সময়ে সংসারের গুরুভার আমার মস্তকে পতিত হইল! সৌভাগ্যক্রমে সংসারে মা ও আমার জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগ্নী ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। দুঃখে ও কষ্টে একপ্রকারে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল।

আজকাল ছুটির জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদিগকে যে প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয় আমাদিগের সময় সে প্রকার কষ্ট ছিল না। প্রায় যখন ইচ্ছা তখনই বাড়ি আসিতাম।

চন্দননগর ষ্টেশন হইতে আমাদিগের গ্রাম প্রায় দুই ক্রোশ মাত্র; সুতরাং কলেজ হইতে বাড়ি আসিতে প্রায় ছয়ঘণ্টা লাগিত।

(৩)

একমাস পূজার ছুটি পাওয়া গেল। কলেজ বন্ধ হইবা মাত্র সেই দিবসেই বাড়ি আসিয়া উপস্থিত। দীর্ঘ অবসরটা বিশেষ আনন্দ সহকারে উপভোগ করিব বলিয়া মনে স্থির করিলাম।

প্রথম কয়েক দিবস আমার আহার ও শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে মাকে উত্তর প্রদান করিতে হইল; কলেজে আহারের বন্দোবস্ত যে উত্তমরূপ,—শত চেষ্টা করিয়াও ইহা আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। এবং কার্য্যতঃ না হইলেও, আমি আহার ও যত্নাভাবে যে দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছি—তদ্বিষয়ে তিনি দৃঢ়তাসহকারে মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, বাল্যকাল হইতেই কবিতা-দেবীর প্রতি একটি আন্তরিক সহানুভূতি থাকাপ্রযুক্ত আমি বাড়ি আসিয়া দোতালার দক্ষিণের জানালাটা খুলিয়া খুব প্রত্যুষে "সেলি"র ও অন্যান্য কতিপয় ইংরাজ কবির কবিতাবলী পাঠ করিতাম।

আমার জানালার ঠিক সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র বাগান; বৃক্ষের মধ্যে আম ও সুপারি বৃক্ষের সংখ্যাই অধিক।

প্রাতঃকালে সেই সমস্ত বৃক্ষ হইতে পাপিয়া ও দয়েল অবিশ্রান্ত চীৎকার করিয়া

সমস্ত স্থানটি কম্পিত করিয়া তুলিত! দূর হইতে দক্ষিণাবাতাস আমার অধোতন জানালার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইত, অর্দ্ধ মুকুলিত কেয়া ফুলের সুগন্ধে সমস্ত বাগানটিকে আমোদিত করিয়া রাখিত।

একখানি ভগ্ন চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া আমি সেই জানালার ধারে সেলির প্রাকৃতিক বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে বিভোর হইয়া যাইতাম!

হায়, সেই একদিন গিয়াছে যখন আমার যৌবনের অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত ভাবগুলি উদ্দামবেগে বহির্গত হইয়া জগতের সমস্ত কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য আয়ত্তগত করিবার চেষ্টা করিত!

সে নবীন উৎসাহ এই নির্জ্জীব নিরাশায় কত প্রভেদ!

সে অসীম অতৃপ্তির কথা এখন কেবল স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়!

(৪)

একদিন এই প্রকারে একমনে কবিতা পাঠ করিতেছি; তখনও সূর্য্য উঠে নাই। পূর্ব্বদিক কেবল রক্তিমাভ হইয়াছে মাত্র। ঘন আম্র পত্রের মধ্যে দয়েল সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, প্রাচীরের উপর একদল চড়াই পরস্পর কলহ করিয়া এক প্রকার বিজাতীয় শব্দ উৎপন্ন করিতেছিল।

পূর্ব্বে যে বাগানটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেটি গ্রামের সুবিখ্যাত জমিদার হরবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের। বাগানের সম্মুখেই তাঁহার প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা। বাড়িটি আমাদিগের বাটির অতি নিকটেই অবস্থিত, মধ্যে কেবল সেই বাগানটি ব্যবধান মাত্র। সুতরাং, আমাদিগের বাড়ি হইতে জমিদারদিগের বাটি স্পষ্ট দেখা যাইত।

সেই দিন সেলিখানা পড়িতেছিলাম। কবির সাংসারিক জীবনের বর্ণনাটি অতীব হৃদয়গ্রাহী; পাঠ করিতে করিতে বিমুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়! আমি তাহাই চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে বাগানের দিকে চাহিয়া রহিলাম। অকস্মাৎ জমিদারদিগের বাটির জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িল!

উষার স্তিমিত আলোকে দেখিলাম, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা জানালায় দাঁড়াইয়া আমাদিগের বাড়ির দিকে চাহিয়া আছে!

কি অসামান্য সৌন্দর্য্য, কি সকরুণ দৃষ্টি! বিস্মিতনেত্রে আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম!

কিয়ৎক্ষণ পরে আমাকে দেখিতে পাইয়াই যেন বালিকা সলজ্জভাবে সেখান হইতে অপসৃত হইয়া গেল!

তাহার পর প্রায়ই দেখিতাম বালিকা জানালার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং আমাকে দেখিতে পাইলেই চকিতে অদৃশ্য হইয়া যাইত!

এ কি বিপদ! এতকাল নির্ব্বিবাদে সেলি ও টেনিসনের শ্রাদ্ধ করিতেছিলাম, সে একপ্রকার ছিল ভাল! কিন্তু কোথা হইতে এই নূতন সেন্টিমেন্টলিটি আসিয়া আমার

হৃদয়কে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল? দরিদ্রের সন্তান কলেজে লৌহ পিটিয়া, এবং কলেজের পাঠসমাপনান্তর মাঠে মাঠে রৌদ্র ও বর্ষায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্নসংস্থান করিতে হইবে, এ প্রকার ব্যক্তির এ কুগ্রহ কেন?

মনকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যাহাদিগের সংসারে ভাবনা চিন্তা নাই, অন্ন-সংস্থানের নিমিত্ত যাহাদিগকে কখনও ব্যস্ত হইতে হইবে না, এ প্রকার লোকে এই প্রকার অসম্ভব কল্পনায় দিনাতিপাত করিলে কোনও ক্ষতি হইবে না, কিন্তু আমার ন্যায় দীনহীন ব্যক্তি উপন্যাসোক্ত এ প্রকার কল্পনায় লিপ্ত থাকিলে, লোকের উপহাসাস্পদ হইবারই সম্ভাবনা অধিক। দার্শনিক মীমাংসা দ্বারা এই বাতুলতা মন হইতে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম কৈ?

ভাবিলাম কি কুক্ষণেই কবিতাপাঠ আরম্ভ করিয়াছিলাম!

প্রকারান্তরে জানিতে পারিলাম যে বালিকাটি হরবল্লভ বাবুর একমাত্র কন্যা তখনও বিবাহ হয় নাই! আবার চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। জাতি ও গোত্রে জমিদারদিগের সহিত আমরা সমতুল্য।

কিন্তু পার্থক্য সম্পত্তিতে; আমরা দীন প্রজা—জমিদার হরবল্লভ অতুল বিষয়ের অধিকারী—তবে আমার এই বৃথা আশা কেন?

(৬)

দেখিতে দেখিতে ছুটি ফুরাইয়া গেল। মা ও দিদির নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলেজে চলিলাম।

বৈকাল ৫টা বাজিয়াছে; সুতরাং বেড়াইতে বেড়াইতে ষ্টেশনে যাওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলাম।

বালিকার সলজ্জ ও সচঞ্চল দৃষ্টি তাহার নবকিশলয়সদৃশী অপরূপ সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাইব না—দূর হউক্ আবার সেই ভাবনা। স্থির করিলাম কলেজে গিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইব—এবং নিকটেও শেষ পরীক্ষা, সুতরাং এ সমস্ত অলীক কল্পনাজাল হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা।

জমিদারদিগের বাটির সম্মুখ দিয়া ষ্টেশনে যাইবার সুবিস্তৃত পথ। নানা প্রকার কথা চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিয়াছি।

জমিদারদিগের বাটির সম্মুখে আসিয়া হঠাৎ মস্তক তুলিয়া চাহিয়া দেখি, সেই বালিকা। একটি পঞ্চমবর্ষীয় ক্ষুদ্র বালক হিন্দুস্থানীর ন্যায় কাপড় পরিয়া একহস্তে একটি ক্ষুদ্র ছড়ি লইয়া বৃদ্ধ দরওয়ানজির সহিত সগর্ব্বে লাঠি খেলিতেছিল—বালিকা তাহাই দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছিল।

এমন সময় অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া একেবারে বাড়ির মধ্যে অন্ত-

র্দ্ধান। কাহাকে দেখিয়া সে পলায়ন করিল? কৈ নিকটে ত কেহ নাই? তবে কি আমাকে দেখিয়া? আমি কে?

জানালার ধারে দেখা ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে তাহার সহিত পরিচিত নহি—তবে এই দশম বর্ষীয়া বালিকার এ লজ্জা কাহাকে দেখিয়া?

তাহার অকস্মাৎ পলায়নে ইতি মধ্যে রণক্রীড়া আপনা আপনি থামিয়া গিয়াছিল। দরওয়ানজি সন্দিগ্ধনেত্রে একবার দরজার দিকে আর একবার ব্যাগ হস্ত, ও ছিন্নপাদুকা পরিহিত আমার দিকে দেখিতেছিল।

খানিক দূর গিয়াছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম বালকটি একগাল হাসিয়া বিজ্ঞতা-সহকারে বলিয়া উঠিল "ওলে—এ দিদিল্ বল্।"

সর্ব্বনাশ আমার দিকেই যে যষ্টি নির্দ্দেশ করিতেছে! কিন্তু ভাবিয়া পাইলাম না বালক কোন্ বিশেষত্বটুকু দেখিয়া আমাকে অকস্মাৎ তাহার "দিদির বর" বলিয়া অনুমান করিল!

হইতে পারে বালকের ক্ষুদ্রজীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহাতে সে হয়ত অনুমান করিয়াছে যে, বিবাহিতা বালিকার "বর" দেখিয়াই অকস্মাৎ পলায়ন অবশ্যম্ভাবী!

(৭)

শেষ পরীক্ষার চারিমাস আর বাড়ী আসিতে পারি নাই। সকল চিন্তা পরিহার করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত নিতান্ত প্রাণপণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম।

যথা সময়ে পরীক্ষাফল প্রকাশিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে তদানীন্তন প্রিন্সিপালের সাহায্যে জাহানাবাদে রাস্তা নির্ম্মাণের নিমিত্ত গবর্ণ-মেণ্টের ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলাম – বেতন প্রথমেই তিন শত টাকা, ক্রমে উন্নতির সম্ভা-বনা আছে।

এই অসম্ভব পদপ্রাপ্তিতে মনে আশার সঞ্চার হইল—শীঘ্রই আমাদিগের দরিদ্র নাম ঘুচিতে পারে, সুতরাং আমার সেই কাল্পনিক ইচ্ছা সফল হইলেও হইতে পারে।

কিন্তু এই কার্য্যের একটা অসুবিধা ছিল, আমাকে জাহানাবাদে গিয়া দুই বৎসর থাকিতে হইবে—অবসর পাইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, এদিকে সাহেব অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করাতে আমাকে শীঘ্র একবার বাড়ীতে মা ও দিদির সহিত দেখা করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

রাত্রি যখন আটটা তখন চন্দননগরে আসিয়া পৌঁছিলাম। একখানা গাড়িভাড়া করিতে হইল।

বসন্তের রাত্রি! গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমার 'পুষ্পরথ' জ্যোৎস্নাপ্লাবিত

শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া মৃদুমন্দগতিতে চলিতে লাগিল! এই প্রাকৃতিক নগ্নসৌন্দর্য্যে আমার হৃদয় আবার উদাস হইয়া গেল!

চারিমাস পরে বাড়ি ফিরিতেছি—হয়ত ইতিমধ্যে কতবার বালিকা আমার অপেক্ষায় করুণনেত্রে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবসন্ন হইয়া চলিয়া যাইত! কেন আমি এখানে ছিলাম না? না থাকি ক্ষতি নাই। এক্ষণে আমার ভবিষ্যৎ পূর্ব্বের ন্যায় তাদৃশ অন্ধকারাবৃত নহে, আজ চেষ্টা করিয়া দেখিলে লোকে আমাকে আর বাতুল বলিয়া উপহাস করিবে না। এখন আমি বালিকাকে আমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইলেও হইতে পারি।

গাড়িখানি ঝনুঝনু শব্দ করিতে জমিদারদিগের বাটির সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম—বাড়িখানির শ্রী ফিরিয়াছে—অল্প দিন হইল সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল!

বাড়িতে পৌঁছিলাম প্রায় ১০ ঘটিকার সময়। আমার সফলতার বিষয় অবগত হইয়া মা বার বার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, এবং আমার একটি সুন্দরী বধূ দেখিলেই তিনি যে সুখে দেহ ত্যাগ করিতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষরূপে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

অবশেষে বলিলেন "বাবা নন্দ, আজ তুই পাশ হয়েছিস্, মোটা মাইনের চাকরি হয়েছে—কিন্তু বাবা আজ "তিনি" বেঁচে থেকে তোর বিয়ে ও রোজগার দেখে যেতে পেলেন না।"

তিন জনের চক্ষেই অশ্রু প্রবাহিত হইল, চিন্তা করিতে বুক ফাটিয়া গেল—ভাবিলাম আজ "বাবা, কোথায়?"

(৮)

সমস্ত রাত্রি নানা চিন্তায় কাটিয়া গেল। কখন ঘুমাইয়াছি মনে নাই; অকস্মাৎ কি একটা শব্দ কানে আসিয়া লাগিল।

তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া দেখি ভোর হইয়াছে! কিন্তু ও কিসের শব্দ?

মনোযোগ দিয়া শুনিলাম—ধীর গম্ভীর স্বরে সম্মুখে জমিদারদিগের বাটি হইতে সানাইয়ের করুণ প্রভাতী আলাপ স্তরে স্তরে বাতাসের সহিত ভাসিয়া আসিতেছে! কি এক বিপদ আশঙ্কা করিয়া আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল!

ব্যগ্র ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম সিঁড়ি দিয়া মা নীচে নামিতেছেন। আমাকে ত্রস্ত দেখিয়া মা বলিয়া উঠিলেন "কি নন্দ ভয় পেয়েছিস্।"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম "না মা। হাঁ গা ওদের বাড়ি কিসের বাজনা বাজ্‌ছে?"

মা হাসিয়া বলিলেন "ওমা তবু ভাল। তুই এখনও ছেলে মানুষ আছিস্; মনে পড়ে

ছেলে বেলায় চড়ক তলায় বাজনা শুন্‌তে যাবার জন্য কেঁদে সারা হতিস্‌ - এখনও তোর বাজনা শোনবার সখ যাইনি।"

মার কথা গুলি বড়ই স্নেহরসপূর্ণ! কিন্তু তাহার প্রতি তখন আমার দৃষ্টি ছিল না। কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলাম "না জিজ্ঞাসা কচ্ছি—"

মা বলিলেন "তা শুনিস্‌ নি? পরশুদিন খুব ধুম ক'রে জমিদারদের মেয়ের যে বে হ'য়ে গেল—' আমি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন্‌ মেয়ে?"

মা বলিলেন "সবে ত একটি মেয়ে—আহা রূপে গুণে যেন ঠিক লক্ষ্মীটি। আমার ইচ্ছা ছিল মেয়েটিকে বৌ করি। তা মেয়ের মা তোর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য ঝুলোঝুলি। কেবল আমরা গরীব বোলে জমীদার বাবু আপত্তি কোল্লে তা এখন ত—ওমা তোর অসুখ কোচ্চে না কি?"

এত কালের আশা ভরসা সব লুপ্ত হইল। সমস্তদিন রশুনচৌকির রাগিণী আলাপে আমার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

সে শব্দ সুমিষ্ট হইলেও কি কারুণ্যার্দ্র।

(৯)

নিতান্ত নিরাশহৃদয়ে উদ্দেশ্যবিহীন জীবন লইয়া একাকী কর্ম্মস্থানে চলিলাম।

কর্ম্মস্থানে বাসের কোনও স্থিরতা নাই বলিয়া মা ও দিদিকে লইয়াযাইতে পারি নাই। সেখানে গিয়া কাজকর্ম্মও ভাল লাগিত না—অনেক সময় কর্ম্মপরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু মা ও ভগিনীর জন্য তাহা পারিতাম না।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। শরীর নিতান্ত অসুস্থ হওয়াতে কিছু অধিককালের জন্য ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

আমার রুগ্নদেহ দেখিয়া মা কাঁদিয়াই আকুল।

বর্ষাকাল! ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। বারিপতনের সহিত অবিরাম ঝিঁঝিঁরব মিলিত হইয়া নিদাঘ নিশীথে এক অদ্ভুত শব্দ উৎপন্ন হইতেছিল! সে শব্দের সহিত যেন শত সহস্রলোকের দীর্ঘনিশ্বাস ও করুণ রোদন ধ্বনির কি একটা অব্যক্ত সৌসাদৃশ্য আছে।

ভগ্ন জানালার মধ্য দিয়া হুহু করিয়া জলার্দ্র বাতাস বহিয়া আসিতেছিল, বৃক্ষপত্রে পতিত বারিবিন্দুর শব্দ ও ঝিঁঝিঁর কলরব তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া আমার প্রাণকে কাঁদাইয়া তুলিল।

এই ত সেই জানালা, এই ত সেই আমি, কিন্তু ঐ দৈত্যের ন্যায় অন্ধকারাবৃত অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে যে মুখখানি দেখিতাম, সে আজ আমার নিকট হইতে কতদূরে?

উষ্ণ কপালে জলবিন্দু আসিয়া লাগিল। সম্মুখের ভয়োৎপাদক ভীষণ অন্ধকারের

দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুই দেখা যায় না—কেবল কর্ণে আসিয়া বৃষ্টির ঝমঝম ও ঝিঁঝিঁরব লাগিতেছে!

ও কি ?

ক্ষীণ—অতি ক্ষীণশব্দ, যেন কতদূর হইতে আসিতেছে!

মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলাম। বোধ হইল যেন কে বহুদূর হইতে রোদন করিতেছে!

এ গভীর রজনীতে কে এমন করুণকণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছে? তাহার এমনই কি অভাব যে সে অপরাপর ব্যক্তির শান্তিতে বাধা দিয়া গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বেদনাধ্বনি প্রেরণ করিতেছে?

বৃষ্টি অনেকটা থামিয়াছে।

এখনও সেই মর্ম্মভেদী করুণ রোদনধ্বনি!

কোথা হইতে আসিতেছে?

ঝিঁঝিঁরব থামে নাই বটে, কিন্তু বৃষ্টিরশব্দ থামিয়া গিয়াছে!

অকস্মাৎ বোধ হইল যেন সম্মুখস্থ জমিদারদিগের বাটি হইতেই এই শব্দ আসিতেছে!

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দরজা খুলিলাম। পার্শ্বের ঘরেই দিদি নিদ্রা যাইতে-ছিলেন—চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "দিদি! দিদি!!"

দিদি তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হোয়েছে?" ইতি মধ্যে মাও উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। আমি কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিদি, এত রাত্রে জমি-দারদের বাড়ি কে কাঁদে?"

দিদি ক্রন্দনস্বরে বলিলেন "আহা, সে কথা জিজ্ঞাসা কোরো না—আজ দেড়মাস হোল জমিদারদের মেয়ে বিধবা হোয়েছে!"

(১০)

তাহার পর যে কি হইল তাহা স্মরণ নাই। মধ্যে মধ্যে জ্ঞান হইলে দেখিতাম রুগ্ন-শয্যায় শয়ন করিয়া আছি,—মা ও দিদি সযত্নে সেবা করিতেছেন।

ঘোর বিকারের সময় বোধ হইত যেন সেই বালিকা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া বলয়শূন্য হস্তে সেই জানালায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, ভয়চকিত-নেত্রে আমি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতাম, দেখিতে দেখিতে যেন হতচেতন হইয়া পড়িতাম!

যখন অল্প ভাল হইলাম, তখনও বোধ হইত যেন দূর হইতে কে ভগ্ন কণ্ঠে রোদন করিতেছে—অবিশ্রান্ত সে ধ্বনি কর্ণে আসিয়া লাগিত, সে ভয়ানক শব্দ শুনিতে শুনিতে যেন আমি উন্মাদ হইয়া যাইতাম!

কখনও মনে হইত যেন কোনও সুনিপুণ বাদক সানাই বাঁশী দ্বারা সুমধুর ভৈরবী আলাপ করিতেছে—তাহা যেন কত উৎসাহ ও উন্মাদনা পূর্ণ! শ্রবণ করিতে করিতে

প্রাণ বিভোর হইয়া যাইত! কিন্তু পরক্ষণেই কোথা হইতে শোকব্যাকুল শব্দ আসিয়া সে সুমধুর আলাপ ডুবাইয়া দিত!

ক্রমে ক্রমে আরও যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন দিদিকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতাম,—তিনি বলিতেন, আমি যাহা শুনিতাম তাহা স্বপ্নে মাত্র। কিন্তু গ্রামে থাকিতে আর ইচ্ছা ছিল না। এই দুর্ঘটনার পর মারও এখানে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। জনৈক পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে আজীবন সেই ভগ্ন বাটিতে বাস করিতে বলিয়া, আমরা তিনজন নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে আগ্রা সহরে আমাদিগের দূরসম্পর্কীয় কোনও আত্মীয় ছিলেন, তাঁহাকে পত্র লেখাতে তিনি তথায় একটি ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন। আমি আবেদন করাতে তাহা গ্রাহ্য হয়—বেতন মাসিক দুই শত টাকা মাত্র। বলা বাহুল্য, আমি ইতি পূর্ব্বেই গভর্মেণ্টের চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

গ্রামের অল্প লোকেই জানিতে পারিল যে আমরা চিরকালের জন্য দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি। সন্ধ্যাবেলা গাড়ি করিয়া রওনা হইলাম। পৈতৃক নিবাস ছাড়িয়া যাইতে বাস্তবিকই দুঃখ হইতে লাগিল। জমিদারদিগের বাড়ির সম্মুখ দিয়া গাড়ি গেল। বাহিরে আর প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত নাই! কেবল দ্বিতল গৃহ হইতে কাহার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল! আমি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলাম "আবার!" দিদি বাতাস করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম "কি ভয়ানক শব্দ!" ঘোড়ার গাড়ি তখন চন্দননগর ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়াছে।

* * * *

(১১)

সময় কাহারও হাতধরা নহে! স্বেচ্ছায় আসিয়া স্বেচ্ছায় চলিয়া যায়। এতবড় কর্ম্মশীল জগতে প্রতি নিয়তই কত বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হইতেছে কিন্তু সময় কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া উদ্দাম ও অপ্রতিহতবেগে অনন্তের পানে অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে! পূর্ণস্বাধীনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহা অপেক্ষা বিরল!

আগ্রায় আমাদিগের দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতি মধ্যে গ্রামে কখনও যাই নাই, যাইবার ইচ্ছাও হইত না। স্থানীয় পূর্ত্তকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রাচীন ঘটনাগুলি বিস্মৃত হইবার জন্য চেষ্টা করিতাম—মধ্যে মধ্যে সমর্থও হইতাম কিন্তু পুনর্ব্বার সে সমস্ত কথা বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিত।

দশ বৎসর পরে একবার পৈতৃক নিবাসের অবস্থা দেখিবার জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইল। পূজার ছুটির সময় আগ্রা হইতে রওনা হইলাম।

যখন চন্দননগরে পৌঁছিলাম তখনও সূর্য্য উদিত হয় নাই, সুবিস্তৃত শ্যামল

ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আসিতে লাগিলাম—এই পথ এক দিন আমার কত পরিচিত ছিল, কত উৎসাহের সহিত একদিন এই পথ দিয়া বাড়িতে আসিয়াছি—কিন্তু আজ সে প্রফুল্লতা নাই। আজ যেন এগ্রামে আমি সম্পূর্ণ নূতন ব্যক্তি—হল-কর্ষণে নিযুক্ত কৃষকগণ বিস্মিতনেত্রে আমার বিষন্নমুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারা কি ভাবিতে ছিল কে জানে ?

ধীরে ধীরে যেস্থানে আমাদিগের চির-পরিচিত গৃহ ছিল সেইস্থানে গেলাম, কিন্তু আমাদিগের সে গৃহ কোথায় ? তাহার চিহ্ন স্বরূপ ইষ্টক স্তুপ ও একটি জীর্ণ অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীর লুপ্তগৌরবের সাক্ষীস্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান আছে।

এই স্থানে আমার গৃহছিল কিন্তু কোথায় বা সে অর্দ্ধভগ্ন জানালা, কোথায় সে ভগ্ন গৃহ ?

(১২)

ইষ্টকস্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম।

জমিদারদিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকার সে সৌন্দর্য্য আজ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে ? কার্ণিস, অলিন্দ জানালা সমুদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বথ ও বটবৃক্ষ প্রাচীর ও বাটির গাত্র আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিয়াছে। ভগ্ন আলিসার উপর একদল কাক উপবিষ্ট হইয়া কা কা করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

সে বাগান আছে কিন্তু বাগানের সে সৌন্দর্য্য নাই—বন ও লতাগুল্মে তাহা আচ্ছাদিত হইয়া শৃগাল ও সর্পের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। উষার আলোকের সহিত আর তেমন করিয়া আম্রবৃক্ষের মধ্য হইতে দয়েল ও পাপিয়া ডাকে না! এই বাড়ি ও এই বাগান একদিন কত আনন্দের রঙ্গভূমি ছিল—কত হাস্যলহরী, কত আনন্দধ্বনি একদিন ইহার প্রতি গৃহ কোন হইতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্রস্থানকে নবোৎসাহে উৎসাহিত করিয়া তুলিত! কোথায় আজ সে দিন—দশ বৎসরে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই সাধিত হইয়াছে!

নিকট দিয়া একটি প্রৌঢ়া রমণী যাইতেছিলেন আমি ভগ্ন কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "জমিদারদিগের বাড়ির খবর কি ?"

তিনিও দুঃখিতচিত্তে বলিলেন "আহা, সোনার সংসার ছারখার গেছে! যে বৎসর জমিদারের কন্যা বিধবা হয় সেই বৎসরই তাঁরা বাড়ি শুদ্ধ বৃন্দাবন না কাশী কোথায় চলে গেছেন—সেই অবধি বাড়িতে আর কেউ থাকে না!"

ওই সেই জানালা, আজ তাহা লতাগুল্মে আচ্ছাদিত, কিন্তু সেই পরিচিত মুখ আর ত কাহারও অপেক্ষায় আমাদিগের বাড়ি চাহিয়া থাকে না।

ধীরে ধীরে অনেকদিনের কথা মনে পড়িল—মনে পড়িল যখন ঠিক বার বৎসর পূর্ব্বে

এই রকম পূজার সময় হৃদয়ে অসীম আনন্দ ও ভবিষ্যতের অনন্ত আশা লইয়া বাড়ি আসিয়াছিলাম। সে দিন আর আজিকের মধ্যে কত বিভিন্নতা!

মনে পড়িল এই রকম একদিন উষালোকে জানালায় বসিয়া বালিকার বিবাহের আনন্দময় বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম। সানাইয়ের সে রাগিণী অপরের নিকট মঙ্গলময় হইলেও, আমার নিকট তাহা অতীব বিষাদপূর্ণ বোধ হইয়াছিল—সে শব্দ প্রত্যেক পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নিদ্রিত শোকভাবগুলিকে টানিয়া বাহির করিতেছিল!

আবার স্মরণ হইল ঘনবর্ষার গভীর নিশীথে সেই দূরাগত কোমল ও সকরুণ রোদন ধ্বনির কথা!

সে শব্দ কি ভয়ানক!

এখনও যেন বোধ হইতেছে কে যেন সেই ভগ্ন গৃহ-কোন্ হইতে অস্ফুট স্বরে রোদন করিতেছে!

মীর কাসিম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ ঘোষণা।

As a last resource it was agreed that deputation should be sent to the Nawab, who was then at Mongeer, to endeavour to arrange terms with him and to induce him to countermand his order for the abolition of all transit duties.—Captain Arthur Broome.

কলিকাতার ইংরাজ-দরবার ইংরাজদিগের স্বাধীন বাণিজ্যাধিকার রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহাদের বিচারে মীর কাসিমেরই সকল অপরাধ সাব্যস্থ হইয়া গেল; তিনি সহজে সম্মত না হইলে তাঁহাকে বাহুবলে সিংহাসনচ্যুত করাও স্থির হইয়া গেল। কিন্তু ইহাও স্থির হইল যে, বাহুবল প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে একবার বুঝাইয়া সুঝাইয়া সম্মত করার জন্য দূত প্রেরণ করা হউক। মিঃ আমিয়ট এবং মিঃ হে নামক দুই জন সদস্য দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কলিকাতা হইতে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। *

One and all had come to the conclusion that when an independent

এই দৌত্যকার্য্যেই মীরকাসিমের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। মীর কাসিম রাজাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না, ইংরাজেরাও আপন জিদ্ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না ;—নবাব-দরবারে তুমুল তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগের প্রতিভাশালী ইংরাজ লেখক কর্ণেল ম্যালিসন্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই সকল তর্ক বিতর্কের সময়ে মীর কাসিম যুদ্ধ কলহ পরিহার করিবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। † কিন্তু কতকগুলি কারণে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারিল না।

ইংরাজেরা দূত পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহারা পাটনার গোমস্তা ইলিশ সাহেবের পরামর্শানুসারে কয়েক নৌকা সিপাহী ও গুলিগোলা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে আসিবামাত্র মীর কাসিম তাহা আটক করিয়া ফেলিলেন এবং ইলিশ সাহেবের এই সকল শত্রুতা সাধনের আয়োজন দেখিয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন। আমিয়ট এবং হে সাহেবকে মুঙ্গেরে বসিয়া থাকিতে হইল।

মীর কাসিম একপ ক্ষেত্রে ইংরাজের নৌকা আটক করিয়া কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার ইংরাজ দরবার তাহাতে উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা আমিয়ট এবং হে সাহেবকে গোপনে মুঙ্গের ত্যাগের পরামর্শ দিয়া ইলিশ সাহেবকে লিখিলেন যে আমিয়ট এবং হে নিরাপদ স্থানে উপনীত হইবামাত্র বাহুবল প্রয়োগ করিতে হইবে।

মীর কাসিম কলিকাতার ইংরাজ দরবারের প্রত্যুত্তর না পাইয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাদিগের নিকট সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য আমিয়ট সাহেবকে কলিকাতায় গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমিয়ট কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, হে নবাব-দরবারে প্রতিভূ স্বরূপ রহিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সকলেই বুঝিলেন যে শীঘ্রই তুমুল যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইবে। ইংরাজেরাই তাহার প্রথম পরিচয় প্রদান করিলেন।

Nuawb of Bengal should dare to move in a direction contrary to that which had been urged upon him from Calcutta, there was but one remedy, and that remedy was force.—Malleson's Decisive Battles of India, 148.

† They found him, whilst firmly resolved to adhere to the policy which he declared with most perfect truth was the only policy capable of saving the industrial classes of his dominions from absolute ruin. Yet anxious, almost painfully anxious, to avoid hostilities.

ইলিশ সাহেব ২৫ জুন প্রাতঃকালে সহসা পাটনার দুর্গ অধিকার করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন। নবাবের কিল্লাদার মীর মেহেদী খাঁ এই সংবাদ লইয়া মুঙ্গেরাভিমুখে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে মীর কাসিমের মার্কার নামক আর্ম্মাণী সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পাটনার দুর্গ উদ্ধার করিলেন, ইলিশ এবং তাঁহার সেনাদল বন্দী হইলেন।

আমিয়ট সাহেব কলিকাতায় পৌঁছিতে পারিলেন না। মুরশিদাবাদের ফৌজদার যুদ্ধারম্ভের সংবাদ পাইয়া পথিমধ্যে আমিয়টকে আক্রমণ করায় আমিয়ট পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিল।

কাহার দোষে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিল তাহার মীমাংসা করিবার জন্য উত্তরকালে ইতিহাসলেখকগণ অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া সর্ব্বজন পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। মীর কাসিমের কথা সেরূপ ভাবে জন সাধারণের সম্মুখে উপনীত হইতে পারে নাই। আমরা তজ্জন্য তাঁহার লিখিত পত্রখানি এই স্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"In my heart I believed Mr. Ellis to be my inveterate enemy, but from his actions I now find he was inwardly my friend, as appears by this step which he has added to the others. Like a night robber he assaulted the killa of Patna, robbed and plundered the bazar and all the merchants and inhabitants of the city, ravaging and slaying from the morning till the 3rd prahar (after noon); then I requested of you 2 or 300 muskets laden on boats. You would not consent to it. This unhappy man in consequence of his inward friendship favoured me in this fray and slaughter with all the muskets and cannon of his army, and is himself relieved and eased from his burden since it never was my desire to injure the affairs of the company; whatever loss may have been occasioned by this unhappy man to myself in this tumult, I pass over, but you gentlemen must answer for any injury which the Company's affairs have suffered, and since you have injustly and cruelly ravaged the city, and destroyed the people and plundered effects to the value of Lacs of Rupees, it becomes the justice of the Company to make reparation to the poor, as formerly was done for Calcutta.

You gentlemen were wonderful friends! Having made a treaty to which you pledged the name of Jesus Christ, you took from me a country to pay the expenses of your army, with the condition that your troops should always attend me, and promote my affairs. In effect you kept up a force for my destruction, since from their hands such events have proceeded.

I am entirely of opinion that the Company favours me, in causing to be delivered to me the rents for three years, of my country. Besides this, for the violences and oppressions exercised by tho English gomastas for several years past in the territories of the Nizamut, and the large sums extorted, and thé losses occasioned by them, it is proper and just that the Company make restitution at this time. This is all the trouble you need to take. In the same manner as you took Bardwan and the other lands, you must favor me in resigning them" *

এই পত্র কলিকাতার ইংরাজ-দরবারের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই মিঃ আমিয়টের হত্যাকাণ্ডের জনরব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা ইহার উত্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করাই স্থির করিলেন।

ভান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস ভিন্ন ইংরাজ-দরবারের অন্যান্য সকল সদস্যই মীর কাসিমের সিংহাসনচ্যুতির আয়োজন করিতেছিলেন; হেষ্টিংস তাহাতে যোগদান না করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা হইবামাত্র পদত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। আমিয়টের হত্যাকাণ্ডে তাঁহারও মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হেষ্টিংসের যে পত্রে তাঁহার মতামত বিবৃত হইয়াছিল তাহা এই—

"It was my resolution as soon as war should be declared to resign the Company's service, being unwilling on the one hand to join in giving authority to past measures of which I disapproved, and to a new establishment which I judged detremental to the honor and interests of the Company and apprehensive on the other, that my continuance at the Board, might serve only to prejudice rather than advance the good of the service by keeping alive by my presence the disputes which have so long disturbed our councils, and retarding thé public business by continual dissents and protests. But since our late melancholy advices give us reason to apprehend a dangerous and troublesome war, and from the unparallelled acts of barbarity and treachery with which it has opened on the part of the Nobob it becomes the duty of every British subject to unite in the support of the common cause, it is my intention to join my endeavorers for the good of the service as long as the war shall last. †

হেষ্টিংসের ন্যায় ইংরাজ মাত্রেই আমিয়টের হত্যাকাণ্ডে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; সুতরাং ইলিশ সাহেব যে অন্যায় উৎপীড়নে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহারই প্রতিফল স্বরূপ

* Long's Selection, Vol 1. P. 325—326.

† Long's selections, Vol 1. 326.

কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাহা কেহই বিবেচনা করিবার সময় পাইলেন না; সকলেই প্রতিহিংসা সাধনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

আমিয়টের হত্যাকাণ্ড নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার। কিন্তু মীর কাসিমের আদেশে যে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং উত্তরকালে মীর কাসিমের যে সকল সামরিক লিপি ইংরাজ-দরবারে প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে মুরশিদাবাদের ফৌজদারের হটকারিতাই আমিয়টের হত্যাকাণ্ডের মূল। মূল যাহাই হউক, মীর কাসিমকেই তাহার ফলভোগ করিতে হইল।

ইংরাজগণ আত্মরক্ষার জন্য মীরজাফরের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া পুনঃ পুনঃ সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর নজর প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার নামে মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কলিকাতা হইতে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ইংরাজদিগের এইরূপ ব্যবহার ইতিহাসের চক্ষে হাস্যাস্পদ হইলেও ঘৃণার্হ নহে। কিন্তু মীরজাফর যে কোন্ মুখে আবার তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন, তাহা ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের নিকটেও ঘৃণার্হ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

মীরজাফর বৃদ্ধ, জরাপলিত দেহে কোনরূপে দিন যাপন করিতেছিলেন;—তাঁহার ভোগবাসনার দিন অতীত হইয়া গিয়াছিল; তথাপি তিনি কোন্ লজ্জায় আবার রাজমুকুট পরিধানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; জনৈক ইংরাজ ইতিহাস-লেখক বলেন যে তাঁহার সন্তান সন্ততির পদগৌরব রক্ষার জন্যই মীরজাফর পুনরায় মসনদে আরোহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

মীরজাফরের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এবারও তিনি আত্মগৌরব পদদলিত করিয়া স্বদেশদ্রোহীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইংরাজেরা যাহা চাহিলেন, এবারও তাহাতেই তথাস্তু বলিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। *

এই সন্ধিসূত্রে বাঙ্গালীর শিল্পবাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত হইবে কি না মীরজাফর

* That veteran intriguer was found to be ready once again to betray his country. The three years' miserable experience he had of office without authority had not sickened him. He had still children, and for them in his eyes, a degraded inheritance,—also probably to be purchased,—offered greater attractions than the repose of an everyday life.—Malleson's Decisive Battles of India, 153.

তাহা বিচার করিতে সম্মত হইলেন না; তিনি ইংরাজবাণিজ্যের শুল্ক গ্রহণ না করিয়া দেশীয় বণিকের উপর শুল্কভার নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবামাত্র, অন্যান্য কথাবার্ত্তা সহজেই স্থির হইয়া গেল।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই মীরজাফরের নামে ইংরাজ-দরবার মীর কাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া জমিদারদলকে মীরজাফরের পক্ষভুক্ত হইবার জন্য ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই দিবস হইতে সন্ধির আশা তিরোহিত হইয়া গেল, এই দিবস হইতে মীরকাসিমের ন্যায়ান্যায় বিচারক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল, এই দিবস হইতে তাঁহাকে এবং ইংরাজ বণিকদলকে প্রাণের মমতায় সকল কার্য্যেই অগ্রসর হইতে হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কাটোয়ার যুদ্ধ।

At one time it seemed as though the English were about to succumb, Col. Malleson.

ইংরাজ বণিকের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিবামাত্র মীর কাসিম আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেশের লোকেই দেশের শত্রু, তাহারাই স্বার্থ-সিদ্ধির আশায় সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল, এবং তাহারাই খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিবার জন্য ইংরাজদিগকে ডাকিয়া আনিয়া মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল,—মীর কাসিমের মনে মনে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যুদ্ধের উপক্রম বুঝিয়াই কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, জগৎশেট প্রভৃতি ইংরাজহিতৈষী পাত্র মিত্রগণকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট জগৎ শেটের কারারোধের সংবাদ পাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন; নবাবের কোপনস্বভাবের কথা কাহারও অগোচর ছিল না; সকলেই জগৎশেটের অমঙ্গলাশঙ্কায় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ভান্সিটার্ট তজ্জন্য নবাবকে নিম্নলিখিত রূপ পত্র প্রেরণ করিলেন:—

I am just informed by a letter from Mr. Amyatt that 'Mahamed Tuckee Khan having marched with his army from Beerbhoom to Herageel went on the 21st inst. at night to the house of Juggut Sett and Maharaja Siroop Chund; and carried them from their own house to Herageel, where he keeps them under a guard."

This affair surprises me greatly; when your Excellency took the govt, upon yourself, you and I and the Setts being assembled together, it was

agreed that as they are men of high rank in the country, you shall make use of their assistance in managing your affairs and never consent that they should be injured. ... . The taking men of their rank in such an injurious manner, out of their home is extremely improper and is disgracing them in the highest degree; it is moreover a violation of our agreement and therefore reflects dishonor upon you and me, and will be a means of acquiring us an ill name from everybody. The abovementioned gentlmen were never thus disgraced in the time of any former Nazims" *

বলা বাহুল্য যে ইংরাজ গবর্ণরের সুমিষ্ট ভৎসনাবাক্যে কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না। মীর কাসিম জনরবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরাজেরা মীর জাফরকে সিংহাসনে বসাইবার আশায় সসৈন্যে হিরাঝিল অধিকার করিতে আসিতেছেন, তিনি সেই জন্য পথিমধ্যে সেনা সংস্থাপন করা, হিরাঝিল অধিকার করিয়া রাখা এবং ইংরাজহিতৈষী পাত্র মিত্রগণকে কারারুদ্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তদনুসারে সমস্ত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইল!

পলাশির নিকট সেনাদল প্রেরিত হইল; গিরিয়ার নিকট শিবির সংস্থাপিত হইল; উধুয়ানালার পুরাতন কেল্লার নিকট বাদশাহী রাস্তা অবরোধ করিয়া নূতন দুর্গপ্রাকার নির্ম্মিত হইল; মুঙ্গের দুর্গ যুদ্ধসজ্জার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল।

মীর কাসিমের কিসের অভাব? তাঁহার আর ঋণ নাই; রাজকোষে যথেষ্ট অর্থ পুঞ্জীকৃত হইয়াছে; সেনাদল ইউরোপীয় প্রণালীতে রণশিক্ষা লাভ করিয়া ইউরোপীয়, আরমানী ও মুসলমান বীরপুরুষদিগের শাসনাধীন হইয়া বাহুবলে, সমরকৌশলে, অমিততেজের পরিচয় প্রদান করিতেছে; মুঙ্গের দুর্গে সুনিপুণ শিল্পকারগণ অস্ত্র শস্ত্র গঠন করিয়া পর্ব্বতাকারে স্তূপীকৃত করিয়াছে!

ইহার তুলনায় ইংরাজদিগের আর কি ছিল? তাঁহাদের সেনাবল যৎসামান্য; অর্থবল ততোধিক যৎসামান্য; পৃষ্ঠপোষক মীরজাফরও একরূপ দীনদরিদ্র;—তাঁহারা কোন্ সাহসে মীর কাসিমের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন?

ইংরাজেরা এ কথা একবারও বিচার করিলেন না; বিচার করিলে হয়ত আমিয়টের হত্যাকাণ্ডের জনরবে ইংরাজদিগকে এতদূর বিচলিত করিতে পারিত না। তাঁহাদের কয়েকজন বিখ্যাত সেনানায়ক ছিলেন, তাঁহাদের রণকৌশলের ভরসা মাত্র সম্বল করিয়াই যুদ্ধ ঘোষণায় সহসা হইলেন।

মীরকাসিমের কোন বিষয়েরই ত্রুটি ছিল না; কিন্তু তিনি সমস্ত আয়োজন শেষ

* Long's Selections, Vol. 1 p. 348--349.

করিয়াও একটি কার্য্য অসম্পন্ন রাখিলেন ;—স্বয়ং সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিলেন না! ইহাই তাঁহার পরাজয়ের প্রধান কারণ, এবং উত্তরকালে কেবল এই কথার উপর নির্ভর করিয়াই কেহ কেহ তাঁহাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া ধিক্কার দিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই!

ইহা মীর কাসিমের অলীক কলঙ্ক। তিনি রাজা বা রাজপুত্র ছিলেন না; আজীবন সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উত্তরকালে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। যিনি যৌবনে বহু যুদ্ধে সেনাচালনা করিয়া রণপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, যিনি শেষজীবনে সিংহাসনচ্যুত হইয়াও অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া অযোধ্যার নবাবকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি যে ইংরাজভয়ে উপস্থিত যুদ্ধে সেনাচালনা করিতে অগ্রসর হন নাই, সে কথা—আমরা কেন—অনেক ইংরাজ ইতিহাস-লেখকও বিশ্বাস করিতে চাহেন না! একজন স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে মীর কাসিমের এরূপ কার্য্যের কারণ ছিল। সে কারণ আর কিছুই নহে,—পাছে স্বার্থলুব্ধ সেনানায়কগণ বাঁধিয়া দিয়া ইংরাজের নিকট অর্থলাভ করে, এই আশঙ্কাতেই তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই! *

ইহাই যে মীর কাসিমের সর্ব্বনাশের সোপান, কাটোয়ার প্রথম যুদ্ধেই তাহার কিছু কিছু আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ইংরাজ সেনাপতি মেজর আদাম্‌স কলিকাতা হইতে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বেই বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের ইংরাজ সিপাহী সেনাকে পলাশিতে সমবেত হইতে আদেশ প্রদান করেন। তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য মীর কাসিমেরও আদেশ আসিয়াছিল। তদনুসারে বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকি খাঁ পলাশিতে আসিয়া ছাউনী ফেলিয়াছিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মেজর আদাম্‌স অগ্রদ্বীপে উপনীত হইলেন, মীরজাফরও তথায় আসিয়া যোগদান করিলেন। এই দিবস ইংরাজ সেনানায়ক লেপ্টেনাণ্ট গ্লেন অজয় নদীর তীরে সহসা মহম্মদ তকির সিপাহী কর্তৃক আক্রান্ত হন; তকি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন যে তাঁহার পল্টনভুক্ত ১৭০০ সিপাহী লেপ্টনাণ্ট গ্লেনকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হয়।

এই সংবাদে তকি খাঁ পলাশি হইতে অগ্রদ্বীপাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন

* Mir Kasim was inured to the hardships of the field, he united the gallantry of the soldier with the sagacity of the statesman; but he did not hazard his own person in any engagement where his officers might have made a merit of their treachery in betraying him.—Transactions in India from 1756 to 1783. ম্যালিসনও এই মত অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু নবাবের অন্যান্য সেনানায়কগণ ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার অনুগমন করিলেন না। * এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় ১৯ জুলাই প্রাতঃকালে কাটোয়ার নিকটে ইংরাজ সেনাপতি আসিয়া তকি খাঁকে আক্রমণ করিলেন!

কাটোয়ার যুদ্ধ-কাহিনী মুসলমান ইতিহাস-লেখকের বর্ণনা মাধুর্য্যে এরূপ সুন্দর ও সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে তাহা পড়িতে পড়িতে মহম্মদ তকির বীর কীর্ত্তির জন্য শত মুখে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াও মনে হয় বুঝি যথেষ্ট হইল না!

হলদীঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর প্রতাপ সপ্ত স্থানে আহত হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাচালনা করিয়াছিলেন; পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে সেরূপ অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্যের নিদর্শন আর নাই! কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রেও মহম্মদ তকি সেইরূপ বীরত্বের কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রোহিলা ও আফ্‌গান পল্টনের সিপাহীরা যেরূপ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তদপেক্ষা কোন দেশের কোন সেনাদলই অধিক সাহসের পরিচয় দিতে পারিত না! বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রণকোলাহল চলিতে লাগিল, কে হারিবে, কে জিতিবে,—কেহই তাহা অনুমান করিতে সক্ষম হইলেন না! তকি খাঁ আহত হইলেন, তাঁহার অশ্ব নিহত হইয়া গেল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, একটি অশ্ব নিহত হইবামাত্র অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া আহত মহম্মদ তকি সেনাতরঙ্গের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া মার মার রবে শত্রু দলনে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ পক্ষ সে তীব্রবেগ সহ্য করিতে পারিল না, তাহাদের সেনাশ্রেণী পশ্চাদ্‌পদ হইতে লাগিল। তকি খাঁর ক্ষতস্থান দিয়া তখন শোণিতস্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে; তিনি তাহা সযত্নে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া সহাস্যমুখে পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া সেনাচালনার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পার্শ্বচর বলিলেন,—"আর কেন, শোণিতস্রাব প্রবল হইতেছে, এখন যুদ্ধভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করুন!" তকি খাঁ ভ্রূকুটি করিয়া উঠিলেন। "ফিরিব? কিসের জন্য ফিরিব? অনুচরের দিকে চাহিয়া কহিলেন "ফিরিয়া গিয়া মীর কাসিমকে কোন্ মুখে এই কৃষ্ণশ্মশ্রু দেখাইব? চল অগ্রসর হও!" ইঙ্গিতে সেনাদল অগ্রসর হইল, ইংরাজেরা নদীর খাতের মধ্যে ঝোপের আড়ালে পলায়ন করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তকি খাঁ সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অমনি লুক্কায়িত শত্রুসেনা হইতে বন্দুকের শব্দ হইল, তাহার গুলি মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া তকি খাঁর বলিষ্ঠ বীর কলেবর ভূপতিত করিয়া ফেলিল; তাঁহার শবদেহ আবরণ করিয়া তাঁহার শত শত অনুচর সম্মুখ সমরে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। ইংরাজের জয় হইল; যাহারা যুদ্ধ জয় করিয়াছিল, তকি খাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাহারাই রণ পরাজিত হইল!! †

* Owing to some jealousy on the part of their commanders, the irregular troops, which had been so maltreated by Glenn on the 17th refused to join him.—Malleson's Decisive Battles of India, p. 158.

† এই যুদ্ধের বিবরণ গোলাম হোসেনের 'মুতক্ষরীণে, মুস্তাফা খাঁর টীকায়, স্কটের ও

ইতিহাসে ইহাই কাটোয়ার যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে ইংরাজেরা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না; সে হিসাবে কাটোয়ার যুদ্ধ ইংরাজদিগের অশেষ কল্যাণের আকর বলিয়া সম্মানার্হ। ম্যালিসন বলেন যে যাহারা মহম্মদ তকির অনুগমন করিতে অসম্মত হইয়াছিল, তাহারা যদি সম্মত হইত, তবে এ যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় হইত; কিন্তু এমন স্বদেশদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই নূতন নহে। ম্যালিসন বলেন;—

"The irregular horsemen, who had fought Glenn the day before, and who might have decided the victory, and with it the war, in favor of Mir Kasim, took no part in the action, and retired after it had been decided. The history of India abounds in instances of such unpatriotic conduct. Indeed, it may be affirmed that few things have more contributed to the success of the English than the action of jealousy of each other of the native princes and leaders of India."

ম্যালিসন বীর পুরুষ; স্বয়ং ভারতবর্ষে বহু বৎসর সেনাচালনা করিয়া বীরকীর্ত্তির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন; তাঁহার লেখনীপ্রসূত সামরিক ইতিহাসের সমালোচনা করা বাঙ্গালীর পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য্য। তথাপি মনে হয়, ম্যালিসনের সকল সিদ্ধান্ত ইতিহাসানুযায়ী ঘটনা পরম্পরা দ্বারা সমর্থন করা যায় না। যাহা ঐতিহাসিক ঘটনার বিপরীত সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত যাঁহারই হউক, তাহাকে অপসিদ্ধান্ত বলিতে ক্ষতি কি?

যুদ্ধে জয় আছে, পরাজয় আছে; জয় পরাজয়ের সহিত যেখানে দেশের সংস্রব সেখানে অন্য কথা; কিন্তু যেখানে জয় পরাজয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্রব সেখানে বীরত্ব কদাচ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মোগলের অধঃপতন সময়ে সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; দেশের যাহা হয় হউক, আমার উদর পূর্ত্তি হইলেই হইল,—ইহাই সেকালের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! তজ্জন্য লোকে স্বার্থসিদ্ধির প্রলোভনে কি করিত আর কি না করিত,—এদেশের লোকের কথা ছাড়িয়া দাও,—ইংরাজেরাও তাহার কত হাস্যোদ্দীপক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন! যে মীরজাফরকে একবার সিংহাসনচ্যুত করিলেন, তাঁহাকেই আবার নবাব সাজাইয়া সম্মানে সেলাম করিতে করিতে কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছিলেন কেন? যুদ্ধে জয় আছে, পরাজয় আছে, যদি পরাজয় হয় তবে মীরজাফরের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে, এ কথা কে না জানিত? সুতরাং অনিশ্চিত ক্ষেত্রে মীরজাফরের সম্মুখে

ম্যালিসনের ইতিহাসে এবং অন্যান্য সমসাময়িক লেখকদিগের গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে; বাহুল্যভয়ে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করা হইল না, উপক্রমণিকায় তাহার কিয়দংশ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

(মীর কাসিমের অসাক্ষাতে) নবাবের সেনানায়কেরা যে মীরজাফরের মনস্তুষ্টির জন্যই কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করে নাই, তাহার প্রমাণ কি? যাহাদের স্বদেশপ্রেম ছিল না, তাহাদের স্বদেশদ্রোহ কোথায়? স্বার্থের জন্যই তাহারা অস্ত্র ধারণ করিত, স্বার্থের জন্যই তাহারা অন্নদাতার কণ্ঠনালীতেও ছুরিকা বসাইয়া দিতে পারিত! দুই এক জন লোকে এই হীন আদর্শ অতিক্রম করিয়া প্রকৃত বীরত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার অগণ্য সেনানায়কের মধ্যে দুই এক জন ভিন্ন এমন লোক অধিক ছিল না; মীর কাসিমের কেবল একজন মাত্র এমন লোক ছিল—তাঁহার নাম মহম্মদ তকি। প্রথম যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হইল বলিয়া মীর কাসিমের অধঃপতনের আর গতিরোধ করা সম্ভব হইল না;—ইহাই বোধ হয় ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতে পারে।

ইতিহাসের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, মহম্মদ তকি যে যথার্থ বীরকীর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ বীরচরিত্রে কলঙ্কের কালিমা আরোপ করিলেও যাহাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না, তাঁহারা অবশ্যই রঙ্গমঞ্চে মহম্মদ তকি খাঁর অভিনয় দেখিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিবেন। কিন্তু ইতিহাসের এরূপ প্রকাশ্য অবমাননায় রঙ্গভূমি ও বাঙ্গালী-চরিত্র কলুষিত না করিলেই বোধ হয় তকি খাঁর প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করা হয়। তকি খাঁর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি বহুজন সমক্ষে বারবণিতার পদাঘাত—নব্য বঙ্গের দুরপনেয় কলঙ্ক!!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গিরিয়ার যুদ্ধ।

It was at this place that Mir Kasim had resolved to fight his decisive battle,—a battle which should drive the English into the sea, or be the certain precurser of his ruin – Malleson.

কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীর কাসিমের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরাজেরা সেই সুযোগে অগ্রসর হইয়া, ক্লাইব যে পথে পলাশি হইতে মুরশিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে মোগল রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

মতিঝিলে মীর কাসিম কয়েক পল্টন সেনা সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহারা ইংরাজের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে উদ্যমে আর কিছুই হইল না, কেবল উভয় পক্ষের কামান চালনায় মতিঝিলের রমণীয় প্রাসাদাবলী শ্রীহীন হইয়া পড়িল!

অবশেষে ইংরাজেরা বিজয়োৎফুল্ল হৃদয়ে মীরজাফরকে লইয়া সগৌরবে মস্‌নদে সংস্থাপন করিয়া দিলেন।

এই দিবস হইতে যুদ্ধের অবস্থা ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করিল। এতদিন মীর কাসিমই নামতঃ এবং কার্য্যতঃ নবাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন; সুতরাং অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস পাইতেছিল না। এখন মীরজাফর মস্‌নদে আরোহণ করায় লোকে তাঁহারই অনুগত হইয়া পড়িল, লোকলোচনে মীর কাসিমই রাজবিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন, সুতরাং ইংরাজের সেনাদল শীঘ্রই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল।

মীর কাসিম এসকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সমর-প্রণালী দেখিলে এই সিদ্ধান্তই সম্ভবপর সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তিনি রাজধানীর পাত্রমিত্রগণকে বন্দী করিয়াছিলেন, রাজধানীতে যৎসামান্য সেনা রাখিয়া মুরশিদাবাদের ৩৭ মাইল দূরে ভাগীরথীতীরে সূতী অথবা গিরিয়ার নিকট অধিকাংশ সেনা সমাবেশ করিয়াছিলেন, এবং আরও কিয়দ্দূর পশ্চিমে সরিয়া আসিয়া উধুয়ানালায় বাদশাহী রাজপথ অবরোধ করিয়া দুর্গরচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বোধ হয় যে, মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত শত্রুকবলে পতিত হইলেও হইতে পারে,—ইহা মীর কাসিম ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন।

গিরিয়ার প্রান্তরে মীর কাসিম যুদ্ধের যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় তিনি হয়ত এই ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রেই ভাগ্যপরীক্ষার সংকল্প করিয়াছিলেন। স্থানটি যুদ্ধোপযোগী, সহসা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প; তাহার উপর তাহাকে আরও দুরধিগম্য করিবার জন্য মীর কাসিম অনেক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এইখানে সমস্ত প্রধান প্রধান সেনানায়ক সসৈন্যে সমবেত হইয়াছিলেন। সুমরু এবং মার্কারের সুশিক্ষিত সেনাদলের সহিত মীর নাসির খাঁর সেনাদল মিলিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে কাটোয়ার পলায়িত পল্টন আসিয়া যোগদান করিয়াছিল। সর্ব্বসাকল্যে ২৮০০০ সিপাহী মীর কাসিমের রাজ্যরক্ষার্থে গিরিয়ায় সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ কতকগুলি ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি গোলন্দাজও প্রেরিত হইয়াছিল।

ম্যালিসন এই যুদ্ধের বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সকলই হইয়াছিল, কেবল মহম্মদ তকি খাঁ মৃত্যুশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া সেনাচালনা করিতে পারিলেই মীর কাসিমের রণজয় সুনিশ্চিত হইতে পারিত; অথবা তিনি নিজে উপস্থিত থাকিলেও সেনাদল উৎসাহলাভ করিতে পারিত। মহম্মদ তকি খাঁ তখন স্বর্গে, মীর কাসিম মুঙ্গেরে, সুতরাং মীর কাসিমের সেনানায়কদিগের উপরেই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করিতে লাগিল।

এক্ষেত্রেও মীর কাসিমের সেনাপতিদিগের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইল না

তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাপন সুবিধার কথা ভাবিতে গিয়া কেহই প্রভুর কার্য্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তকি খাঁর মত বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। ম্যালিসন, তাঁহাদের ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

Mir Kasim, who might have calmed the jealousies of rival commanders, and have directed a decisive movement on the field of battle, remained throughout this important part of the campaign at Munger. *

মীর কাসিম উপস্থিত ছিলেন না বলিয়াই হউক, আর তকি খাঁর ন্যায় প্রভুপরায়ণ সেনানায়ক বর্ত্তমান ছিলেন না বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃই হউক, মীর কাসিমের সেনানায়কগণ গিরিয়ার প্রান্তরে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন যে উধুয়ানালাতেই মহারণ সংঘটিত হইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বেই যদি এইরূপ সংকল্প হয় তাহা হইলে সে যুদ্ধে কেহ আশানুরূপ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পরে না। সিপাহীরা জানিত যে ইহাই শেষ যুদ্ধ নহে, এখানে জয় লাভ করিলেই বা ইংরাজেরা কি করিবেন—ইহার পরও ত উধুয়ানালা আছে! আর উধুয়ানালায় যে ইংরাজেরা সবংশে নিহত হইবেন তাহা ত নিশ্চয় কথা! এইরূপ অহংকারে, এইরূপ অব্যবস্থিত চিত্ততায় কেহই গিরিয়ায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে ব্যাকুল হইল না!

মীর কাসিমের সেনাদল যখন এইরূপ স্থির সংকল্প করিয়া বসিয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে (২রা আগষ্ট) এক সহস্র ইংরাজ ও চারি সহস্র কালাসিপাহী লইয়া মেজার আদাম্স উপনীত হইলেন।

নবাবসেনা যেরূপ ভাবে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাতে তাহাদের সেনানায়কদিগের রণকৌশলের পরিচয় পাওয়া গেল না। নিশ্চয়ই যুদ্ধ জয় করিব, এরূপ স্থিরতা থাকিলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তাহারা এমন অসতর্ক ভাবে অগ্রসর হইল যে, পরাজিত হইলে আর প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার উপায় রহিল না! তথাপি ইংরাজসেনাপতি তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তিনি মধ্যস্থলে “গোরালোগ” এবং উভয়-পার্শ্বে “কালা আদ্‌মী” দিগকে সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গোরা কালা সকল পল্টনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইংরাজ ব্যূহের বামবাহু ছিন্ন হইয়া গেল, মধ্যদেশও যায় যায় হইয়া উঠিল, যাহারা মৃত সৈনিকের স্থান পূরণ

* The position of the English was now extremely critical. Their left wing was virtually gone, their centre was in extreme danger, their reserves were exhausted. One vigorous attack on their right, and all was over with them.—Malleson' Decisive Battles of India, P. 163.

করিবে বলিয়া পশ্চাতে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের সংখ্যাও নিঃশেষ হইয়া গেল; কেবল দক্ষিণবাহু যুদ্ধ করিতেছিল, তাহা সমুচিতবেগে আক্রান্ত হইলেই মীর কাসিমের জয় হইত, ইংরাজ সেনাপতির শৌর্য্য-বীর্য্য কিছুতেই আর রক্ষা করিতে পারিত না। * কিন্তু মীর কাসিমের সেনানায়ক সের আলি খাঁ ইংরাজের দুর্দ্দশা দেখিয়াও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না, তিনি এত ধীরে ধীরে, এত সতর্ক পাদবিক্ষেপে, এত মৃদু মন্দ আক্রমণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন যে, মেজর আদাম্‌স হারিয়াও জয়লাভ করিলেন!

মীর কাসিমের সেনানায়কদিগের মধ্যে মুসলমান বীর পুরুষেরা শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে লড়িয়া দেখিয়াছিলেন; কিন্তু সুমরু এবং মার্কার পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিবামাত্র পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন বলিয়া মীর কাসিমের পরাজয় হইল। ইহাঁদের কথা ম্যালিসন এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"Samru and Marker, the leaders of the trained brigades, had fought fairly well so long as victory seemed inclined to shine upon them; but they were evidently deeply imbued with the princple that it was better to live to fight another day, than to sacrifice themselves and their men, for, as soon as the English centre had shewn a disposition to rally, they had begun to withdraw from the field."

ম্যালিসনের এই উক্তি সমসাময়িক ইতিহাস হইতেই সংকলিত হইয়াছে! সুমরু এবং মার্কার যে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সে সময়ে কেহই যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পারেন না;—তাহা বীরধর্ম্মের অনুমোদিত পন্থা নহে। সুতরাং এই দুইজন বিদেশীয় সেনানায়কের কর্ত্তব্যহানতাই যে গিরিয়াযুদ্ধে ইংরাজের জয়লাভ করিবার মূল কারণ তাহাই প্রতীয়মান হয়। মীর কাসিম স্বয়ং সেনাচালনা করিলে হয়ত এরূপ ব্যবহার করিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না!

এই যুদ্ধে মেজর আদাম্‌স যে বীরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। এমন যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার—তথাপি তাঁহার জয় হইয়াছিল বলিয়া ম্যালিসন সগৌরবে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"Certainly, never was a battle more fiercely contested; never at one period of its duration did defeat seem more assured; never were native cavalry better led, never did men show greater courage. The coolness of Adams and the steadfastness of the Europeans combined with the want of vigor of Shir Ali Khan and the selfish instincts of Samru and Marker to snatch victory out of the fire."

বিশ্বাসে সন্দেহে।

তোমারে যখন পাই হৃদয় বল্লভ,
সুতীব্র বেদনা ভরা বিরহ আকুল-

তৃষিত নয়নে যবে তুমি উঠ ফুটি,
পরিপূর্ণ বিশ্বাসের পুলক কম্পনে
নাচ উঠে হিয়া, দূরে পলায় মুহূর্ত্তে
'আঁধার সংশয় যত। 'কি মহা আনন্দে
প্রাণ উঠে উথলিয়া, কি মধুররূপে
ভায় এ প্রাণের প্রেম—শুভ্র সুবিমল।
তোমার আপন সবে এ বিশ্ব মাঝারে
আমারো আত্মীয় তাই পরাণের প্রিয়;
ইচ্ছা যায় সবে টানি হৃদয়ের কাছে
সোহাগে আপন বলি করি সম্ভাষণ।
দুখীর নয়ন মুছি করুণার ধারে
সুখীর আনন্দ সনে আনন্দ মিশাই।

২

তোমারে হারাই যদি ওহে প্রিয়তম,
মুহূর্ত্তের নিমেষের বিরহ বিচ্ছেদে
প্রলয় বিপ্লব কিবা বহে হৃদিতলে,
বিশাল সমগ্র বিশ্ব ষড়যন্ত্র করি
বিষম সংশয় অস্ত্র হানে অবিরাম;
ক্ষত মহাক্ষত তবু যুঝি প্রাণপণে
সহস্রের সনে একা নিঃসহায় জনা।
বন্ধু তারা প্রিয় তারা তব প্রেমে বলী
কেবল আমারি আর নহ তুমি কেহ
কেবল আমিই তব কেহ নহি আর,
কেহ যদি হই তবে শত্রু অতি পর।
সুন্দর মধুর প্রেম ঈর্ষার অনলে
সুতিক্ত সুতীব্র মদে উঠে গাঁজাইয়া,
সঁপিতে তোমারে বঁধু সঙ্কোচে শিহরি।
বক্ষে চাপি সঙ্গোপনে দারুণ গরল
তোমার আপনজনে শত অভিশাপি
পলেপলে মৃত্যু গণি তাহাদের সুখে।
ভুবন মোহিনী আমি মিলনে তোমার
কুরূপ কুৎসিৎ হীন বঁধুহে বিরহে।
হে সুন্দর প্রেমময় চিরপ্রেমদানে,
দূর করি হৃদি হতে এ ঘৃণ্য সংশয়
মোহন মধুররূপে চিরদিন স্বামি
তবনেত্রে এ মুরতি রাখ প্রকাশিত।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী।

দীপনির্ব্বাণ	উপন্যাস	...	১।০
ছিন্নমুকুল	উপন্যাস	...	১।০
হুগলির ইমামবাড়ী	উপন্যাস	...	১।০
স্নেহলতা (দুই খণ্ডে)	উপন্যাস	...	২৲
বিদ্রোহ	উপন্যাস	...	।০
মিবার-রাজ	উপন্যাস	...	॥০
ফুলের মালা	উপন্যাস	...	১।০
নবকাহিনী	ছোট ছোট গল্প	...	৸০
গাথা	কবিতাতে উপন্যাস	...	॥৵০
মালতী	ছোট উপন্যাস	...	।০
কবিতা ও গান	কাব্য ও গীতি পুস্তক	...	২৲
বসন্ত উৎসব	গীতি নাটিকা	...	।৵০
গল্পস্বল্প	শিশু-বিনোদন গল্প, কবিতাদি		।৵০
পৃথিবী	পৃথিবী-বিজ্ঞান	...	১৲
			১৪৵০

মূল্য প্রাপ্তি।

S. Biswas Esq.	কলিকাতা	৩৲
বাবু আশুতোষ বিশ্বাস	„	৩৲
শ্রীমতী বিপিনবালা সরকার	„	৩৲
Mrs U. Banerji		৩৲
শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী	„	২৲
বাবু সুকুমার হালদার	জাহানাবাদ	৩।৵০
বাবু শ্যামনীরদ গুপ্ত	„	৩৲
শ্রীমতী অমৃতবালা দে	কলিকাতা	১৷০
„ প্রমদা সেন	ফরিদপুর	৪৸৴০
Mrs Sinha	সুরুল	১০৵০
শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দেবী	মুঙ্গের	৬৸০
বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র	চুণার	৩৵০
„ বিপিনবিহারী বিশ্বাস	পাবনা	৩।৵০
বাবু চন্দ্রনাথ নন্দী	শিবালয়	৩৲
জমীদার শ্রীনারায়ণ তেওয়ারী	বর্দ্ধমান	১।৶০
শ্রীমতী হেমলতা রক্ষিত	ঢাকা	৩৵০
বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	বরিশাল	৩৲
J. N. Mukerji Esq.	Purniah	৪৸৴০
বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	হুগলী	১৸৵০
S. Mitter Esq.	Nepaul	৩।৵০
রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর	দিনাজপুর	৩।৵০
বাবু দ্বারকানাথ পাল	রাজসাহী	৩।৵০
„ অবনীকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী	কুষ্টিয়া	৩।৵০
S. Mitra Esq.	Hyderabad.	৬৸০
শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঘোষ	হোসেঙ্গাবাদ	১০৲
বাবু রামকালী চৌধুরী	বেনারস	৫৸৶০
বি, এন দাস এস্কয়ার	বাঁকীপুর	৬৸০
পি, সী বসু এস্কয়ার	পুরী	৬৸০
বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ	আসাম	৩।৵০

মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষ।

মুমূর্ষু ব্যক্তি রোগের বিষমাবস্থা উত্তীর্ণ হইলে জীবনাশায় আশান্বিত হইয়া যে প্রকার গভীর আশার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া হৃদয়ের রুদ্ধ নিরাশাকে অপনীত করে, আমরা এই ভারত ব্যাপী মহাদুর্ভিক্ষের অবসান জানিয়া সে প্রকার আশার সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছি। আমাদের জীবনাশার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে; এসময় দুর্ভিক্ষের বিগত জীবনের সমালোচনা করা কেবল মৃত অযাচিত অতিথির জন্য শোক করার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষ বিষয়ে এইরূপ সমালোচনাতে একটু বিশেষত্ব আছে,—তাহা এই যে বিগত দুর্ভিক্ষে যাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা অনাগত দুর্ভিক্ষে অনেক কার্য্যকারী হইবে। ইহা আশা করা ভারতবাসীর পক্ষে অসম্ভব যে বিগত দুর্ভিক্ষই এই বিস্তৃত ভারতভূমিতে শেষ নিশ্বাস ছাড়িয়া চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এমন অবস্থায় বিগত দুর্ভিক্ষের সমালোচনা দ্বারা অনেক শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এই মহাসত্যে উপনীত হওয়াতেই অতি বিজ্ঞতার সহিত বর্ত্তমান Famine Commission এর সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবাসী মাত্রেই উৎসুকনেত্রে এই কমিশনের ফল প্রতীক্ষা করিবে।

এই প্রসঙ্গে একটা সত্য অথচ অপ্রিয় কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে একদল "পেট্রিয়ট" আছেন যাঁহারা কেবল গবর্ণমেণ্টের দোষকীর্ত্তন করিতে পারিলেই তাঁহাদের স্বদেশ হিতৈষণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হইল মনে করেন। ইহাঁরা কোন বিষয়ের দুইটী দিক দেখিতে পান না। মানুষ যাহাতে বস্তু মাত্রেরই দুই দিক দেখিয়া প্রকৃত স্বরূপ ধারণা করিতে সক্ষম হয় এজন্য বিশ্ব বিধাতা মানুষকে দুইটী করিয়া চক্ষুদান করিয়াছেন। যদি তাহা না হইয়া মানুষের একটী মাত্র চক্ষু হইত তাহা হইলে জগতের যাবতীয় পদার্থকে এক ছাঁচে গড়া একখানি চিত্রপটের ন্যায় অনুভূত হইত; কোন জিনিসেরই আকার প্রকার ভেদ জ্ঞান আসিত না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বিশেষের হেতু নিরাকরণ করিতে যত্ন না করিয়া যখন আমরা কেবল তাহার দোষাংশ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই তখন আমরা ঠিক "একচক্ষু" ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকি। দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে তাহার একটী নমুনা দিব।

কতক দিন গত হইল বঙ্গদেশের জনৈক খ্যাতনামা স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের অবস্থা পরিদর্শনার্থ পল্লীগ্রামে গিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, কোনও সাময়িক পত্রে তাহার অংশবিশেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে "গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ আইনানুযায়ী যে সকল গরিবাবাস স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রোজ সাত পয়সার আহার্য্য ব্যবস্থা রহিয়াছে; কিন্তু ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষের দেশে একজন

সুস্থকায় ব্যক্তি রোজ নয় পয়সার কমে উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পারে না। গরীবাবাসে যাহারা আসে তাহারা অধিকাংশই গ্রাম্য কৃষিজীবি কাজেই উপরোক্ত প্রকার আহার বিধানে তাহাদের উদরপূর্ত্তি হয় না। এ কারণ গরীবাবাস গ্রাম্য লোকসমাজে অতিশয় অপ্রিয় হইয়াছে।" একজন গরীবাবাসের অধ্যক্ষকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি অতি সহজে এই উত্তর করিলেন যে "দুর্ভিক্ষ আইনে যাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য নাই।" দুর্ভিক্ষ আইনের বিধাতা স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট; অতএব উপরোক্ত অভিযোগের এক মাত্র লক্ষ্য ও উপযুক্ত পাত্র গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না।

উপরোক্ত অভিযোগের বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত বিধি প্রচলনের উদ্দেশ্য কি?—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে গবর্ণমেণ্ট অক্ষয় ভাণ্ডারের অধিকারী নহে। গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডারের যেমন একটা তলদেশ আছে তাহার অনুরূপ সাহায্য করিবার ক্ষমতার'ও একটা সীমা রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অপর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্য বন্ধ করিয়া কেবল দুর্ভিক্ষ নিপীড়নে অর্থব্যয় করেন নাই বলিয়া বোধ হয় কেহ অভিযোগ করিবেন না। (যাঁহারা নিজের যাবতীয় সম্পত্তি, বসত বাটী ও তৈজস পত্রাদি সর্ব্বস্ব বিলাইয়া কেবল দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য তাহাদিগের ন্যায় অনাহারে বা অল্পাহারে জীবন ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি—এই প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নহে!) একজন সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তি আপন আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দুর্ভিক্ষ পীড়িতকে দান করিয়া যাহা সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে অধিক করিয়াছেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় এবং বিজাতীয়! এইরূপ বিদেশীয় এবং বিজাতীয় গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় এবং বিজাতীয় কর্ম্মচারীগণ আপনাপন সুখ সম্পদ ও স্থল বিশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া যেরূপ ভাবে দরিদ্র অন্নক্লিষ্ট লোকদিগের কষ্ট অপনোদনার্থ কার্য্য করিয়াছেন, আমরা—যাঁহারা নাসিকা কুঞ্চন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহার অনুরূপ দূরে থাকুক, অন্ততঃ তাহার বিরূপাচরণে বিরত থাকিলেও লোকের অবস্থা এত বিসদৃশ হইত না। ইহার কতক আভাস পরে দেওয়া যাইবে।

এক্ষণে সেই গরীবাবাসের কথা,—(এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত গরীবাবাস ভিন্ন অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় পরদুঃখ কাতর মহাত্মাগণ গরীবাবাস স্থাপন করিয়া ভারত হিতৈষণার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমি যেস্থানে বসিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি এই স্থানের একদল খৃষ্টীয় প্রচারক সমাজ এই ব্রতে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন!!!) এই মাত্র বলা হইল যে গবর্ণমেণ্টের ভাণ্ডার একটী সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠ মাত্র। এমতাবস্থায় পরিমিত অর্থব্যয়ে যে পর্য্যন্ত সাহায্য কুলায় তাহা করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। প্রতিদিন নয় পয়সার জায়গায় সাত পয়সার আহার দিলে একটী লোকের আহারের প্রায় চতুর্থাংশ বাদ পড়িয়া যায়; কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে যেস্থলে

একটাকায় সাতটী লোকের একদিনকার আহার চলিত সেস্থলে ঐ টাকাতে নয়টী লোক এক দিনের জন্য খাইয়া বাঁচিতে পারে। এক্ষণে কথা এই যে সাতটী লোকের পূর্ণাহার বিধান ও নয়টী লোকের তিনপোয়া আহার প্রদান এই উভয়ের মধ্যে কোনটী অধিক কর্ত্তব্য। টাকাটীকে বাড়াইবার উপায় নাই; এদিগে বুভুক্ষিত লোকেরও অন্ত নাই। ইহাও জানা আছে যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক "সুস্থকায় শ্রমজীবী" না হইয়া "অন্নক্লিষ্ট মৃতপ্রায় জীব" মাত্র। শেষোক্ত লোকদিগের জন্যই গরীবাবাস স্থাপিত হয়। এমতাবস্থায় পূর্ণাহারের পরিবর্ত্তে তিন পোয়া আহার বিধান করিলে তাহাতে যে অন্নক্লিষ্ট লোকদিগের বিশেষ কষ্ট হইতে পারে তাহা মনে করা যায় না। বরং তাহাতে একটী লাভ এই আছে যে যাহারা অন্নক্লিষ্টতার ভাণ করে তাহারা আহারের অল্পতাহেতু গরীবাবাস ছাড়িয়া যেখানে সুস্থকায় শ্রমজীবীদিগের জন্য কার্য্যক্ষেত্র খোলা হইয়াছে তথায় চলিয়া যাইবে। পাঠকগণ ইহাও বিবেচনা করিবেন যে দ্বারস্থ ক্ষুধাতুর ভিখারীকে একমুষ্টির পরিবর্ত্তে তিনপোয়া মুষ্টি অন্ন বিতরণ করিলে তাহাতে সহৃদয়তার অভাব প্রতিপন্ন হয় কিনা। তিন পোয়া আহারে মানুষ অনশনে মারা যায় না অথচ উপরোক্ত বিধানে এক শতের জায়গায় শওয়া শত লোক আহার পাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। পাঠকগণ পরে দেখিতে পাইবেন যে গরীবাবাসের অপ্রিয়তার প্রধান কারণ কুসংস্কার এবং অপর এক কারণ জাতিভেদ!

গরীবাবাসে অল্পাহার বিধানই গরীবাবাসের অপ্রিয়তার কারণ ইহা যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই মাত্র উত্তর দিতে পারি যে উপরোক্ত কারণ বাঙ্গালাদেশের পক্ষে সত্য হইলে তদ্দারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে যে ভারতের অপরাপর স্থানে যেরূপ দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ অনুভূত হইয়াছে বঙ্গদেশে তাহার তিলার্দ্ধও হয় নাই এই প্রদেশে বুভুক্ষিত মৃতপ্রায় লোক অল্পাহার দূরে থাকুক কেবল মাত্র এক গণ্ডূষ জলের জন্যই দাতার চরণে পড়িয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে। এত কুসংস্কার ও জাতিভেদের ভিতরেও মধ্যভারতের লক্ষ লক্ষ লোক দুই হাত তুলিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোষণা করিতেছে যে একমাত্র ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই তাহাদিগকে আহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এখানকার দুর্ভিক্ষের কারণ অধিবাসীদিগের অবস্থার সহিত এত বিজড়িত যে দুর্ভিক্ষের কারণ ও অবস্থা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই অধিবাসীদিগের সাংসারিক অবস্থার আলোচনা করিতে হয়।

মধ্যভারতে ফসল উৎপন্নের দুইটী খন্দ আছে। প্রথম খন্দের বপন কার্য্য বর্ষার প্রারম্ভে ও দ্বিতীয় খন্দের বপন শরতের শেষ ভাগে হইয়া থাকে। এখানকার চলিত ভাষায় তাহাকে আষাঢ়ী খন্দ ও কার্ত্তিকী খন্দ বলা হয়। গম, ছোলা প্রভৃতি অতিশয় সারবান শস্য কার্ত্তিকী খন্দে এবং অপরং যাবতীয় শস্য আষাঢ়ী খন্দে বপন করা হইয়া থাকে। (এ দেশে আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাস বলিতে 'চান্দ্রমাস' বুঝিতে হইবে, কারণ এখানে চান্দ্রমাস দিয়াই সময় গণনা হয়।) আষাঢ়ী খন্দের উৎপন্ন শস্য কম সারবান হয়

বলিয়া কৃষিসমাজে তাহার আদর কম।" একারণ এ দেশীয় কৃষকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গম এবং ছোলার চাষ অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে। ধান এ দেশে আষাঢ়ী খন্দের অন্তর্গত, কারণ এখানকার কৃষকেরা ধানকে অতিশয় মূল্যবান শস্য মনে করে না। অধিকন্তু এ প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চল ভিন্ন (সম্বলপুর প্রভৃতি স্থান ভিন্ন) অপর সকল স্থানে ধানের চাষ অতি কম হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের উপযোগিতা হেতু এবং গম ও ছোলাতে অসারত্ব অতি অল্প বলিয়া এদেশীয় কৃষকগণ ঐ সকল শস্য উৎপাদন জন্য অতিশয় লালায়িত হয় এবং তাহাতে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আপনাদিগকে অধিক ভাগ্যবান মনে করিয়া থাকে। এখানকার লোকসমাজে শত করা ৯৯ জনের বেশী লোক কৃষিজীবী, বাকী একজন উত্তমর্ণ (বা ঋণ ব্যবসায়ী)। ইহার মধ্যে আবার শত করা প্রায় ৭৫ জন কৃষিজীবী প্রতি বৎসর বীজের শস্যের জন্য উত্তমর্ণ দ্বারস্থ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থার ফল এই হয় যে কোন বৎসর উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস হইলে প্রায় তিন চতুর্থাংশ লোককে হয়ত অন্নক্লিষ্ট অথবা ঋণগ্রস্থ হইতে হয়। গমের বীজ যে পরিমাণে বপন করা হয়, উৎপন্নের পরিমাণ তাহার সাত গুণের অধিক প্রায় কখনই হইতে দেখা যায় না; ৫ কিম্বা ৬ গুণই সাধারণতঃ অতিশয় লাভবান মনে করা হয়। ইহাতে কৃষিকার্য্যের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে প্রায় দুই গুণ ব্যয় হয়। (এদেশে অধিকাংশ আদান প্রদান শস্য দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে; অনেক স্থলে জমীদারের খাজানা শস্য পরিমাণে আদায় করা হয়।) তাহার পর রাজস্ব দিয়া বাকী যাহা থাকিবে তাহাই কৃষকের লাভ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গমের বপন কার্য্য কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ হয়। তখন বর্ষার সম্পূর্ণ অবসান ও ঘোরতর শরৎকাল। মধ্যভারতের আবার একটী বিশেষত্ব এই যে এ দেশে অপরাপর দেশ সমূহের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণে শুষ্ক এবং বালুকাবিহীন। ইহা দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে এখানে মাটীতে একেবারেই বালুকা নাই; স্থান বিশেষে অনেক বালুকাময় স্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে (ইংরাজিতে যাহাকে Sandy Soil বলে), কিন্তু বালুকাবিহীন ভূমির পরিমাণই অধিক; এবং ঐ সকল ভূমিতে গম ছোলা ভিন্ন অন্য ফসল ভাল উৎপন্ন হয় না। ইহাও অপর এক কারণ যে হেতু এ দেশে কৃষিসমাজে গম ও ছোলার আদর অধিক।

গম ও ছোলা বপনের অব্যবহিত পরেই কিঞ্চিৎ জলসেকের প্রয়োজন হয় এবং পুনরায় ফলোদ্গমের অব্যবহিত পুর্ব্বে বৃষ্টির আবশ্যক হয়। এই দুইটীর কোন একটী অথবা উভয়ের অভাব পড়িলেই সে বৎসরের ফসলের অবস্থা অতিশয় মন্দ হয় এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অন্নাভাব ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের নদীনালাপরিবৃত গ্রাম ও নগরে বাস করিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি না যে মধ্যভারতের অবস্থা কিরূপ! এখানে নদী থাকেত জল থাকে না, পুষ্করিণী খননের উপায় নাই কারণ ২০।২৫ হাত খনন করিলেও জলোদ্গম হইবে না। একমাত্র কূপজল সম্বল। কূপ সকল এত গভীর খনন করিতে

হয় যে তাহাও এক বিষম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। একারণ এমন অনেক গ্রাম দেখা যায় যেখানে একটী বই কূপ নাই; তাহারই দ্বারা সমস্ত গ্রামবাসীদিগের (গো মহিষাদি জীব জন্তু সম্বলিত) জল সংস্থান সংঘটিত হয়! এমতাবস্থায় সহজেই বোধগম্য হইবে যে ক্ষেত্রে জলসেক কেবলমাত্র পর্জ্জন্যদেবের অনুকম্পা ভিন্ন অপর কোন পার্থিব উপায়ে ঘটিতে পারে না। কিন্তু মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বিধাতার লীলা হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই সত্য বলিতে হইলে এ দেশে পর্জ্জন্যদেব অনুকম্পার বাক্সটী সময় সময় কৃপণতার সহিত উদ্ঘাটন করেন, এ কারণ মধ্যভারতে এক এক বৎসর কার্ত্তিকের পর আর বৃষ্টিপাত দূরে থাকুক স্থলবিশেষে মেঘের রেখা পর্য্যন্ত নেত্রগোচর হয় না। তাহার ফল পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের হ্রস্বতা। ঐ পরিমাণ সময় বিশেষে এত হ্রাস হয় যে উক্ত বীজের ২ কিম্বা ৩ গুণের অধিক ফসল পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উৎপন্নের ঐ অংশ কৃষিকার্য্যের ব্যয় এবং জমীদারের খাজনা দিতেই চলিয়া যায়, কাজেই কৃষককে শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিতে হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নানা কারণে গম ও ছোলা মধ্যপ্রদেশের কৃষকদের অতি আদরের বস্তু। এক্ষণে দেখান হইল যে তাহার উৎপন্ন বিষয়ে এ প্রদেশে কত প্রাকৃতিক অন্তরায় রহিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষ হওয়া তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে দুর্ভিক্ষ না হওয়া তাহা হইতে বহুগুণ আশ্চর্য্যের বিষয়। গত চারি বৎসর এইরূপ জলাভাব ঘটাতে তাহার ফল এই ঘটিয়াছে যে বৎসরের পর বৎসর লোকের অভাব ঘনীভূত হইয়া শেষ বৎসরে মহাদুর্ভিক্ষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের অবস্থা যত অবনত হইতে থাকে কুহকিনী আশা মানুষকে ততই উন্নতির মরীচিকাতে প্রলোভিত করিতে থাকে। এই আশার ছলনায় ভুলিয়া কৃষক, জমীদার, রাজা, প্রজা সকলেই বৎসরের পর বৎসর সুফসলের আশায় বুক বান্ধিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। যখন শেষ বৎসরে দেখা গেল যে আশা শূন্য উদর পূর্ণ করিতে পারে না তখন সকলেই প্রবুদ্ধ হইয়াছিল যে মধ্যভারতের উৎপন্নজাত দ্রব্য মধ্যভারতের আহার সঙ্কুলন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। এদিগে অন্নাভাবে লোক হাহাকার করিতেছে, জমীদার বাকী খাজনার দায়ে সর্ব্বস্ব নিলাম করিয়া লইতেছে, উত্তমর্ণগণ সুযোগ বুঝিয়া অল্প মূল্যে কৃষকদিগের পৈত্রিক ভূসম্পত্তি নিলাম করিয়া লইয়া যাইতেছে। দরিদ্র কৃষক ক্ষুধাতুর গৃহশূন্য এবং সমস্ত আশ্রয় অবলম্বনবিহীন হইয়া পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এ দেশে শতকরা ৭৫ জন কৃষক উত্তমর্ণের নিকট বীজের শস্যের জন্য ঋণী হইয়া থাকে। বহুস্থলে জমীদার স্বয়ংই উত্তমর্ণের ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। তাহার প্রথা এইরূপ,—কোন কৃষক একমণ শস্য বীজের জন্য ধার নিলে তাহাকে ফসলান্তে দেড়মণ অথবা একান্ত পক্ষে সওয়া মণ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। যদি আরও এক বৎসর

শোধ করিতে সক্ষম না হয় তবে তাহা দুই মণে দাঁড়াইবে। অনেক স্থলে উক্ত প্রকার ঋণের দায়ে ভূসম্পত্তি বন্ধক পড়ে। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে উত্তমর্ণগণ সুযোগ বুঝিয়া কৃষক-দিগের ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লইতেছে, অথবা জমাদার বাকীখাজনাতে জমী হাত করিয়া লইয়া পুনরায় অধিক খাজানাতে তাহা ঐ কৃষককে অথবা অন্য কৃষককে পত্তনী দিতেছে।

ইহা হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যে কেবল মাত্র অন্নকষ্টই মধ্যভারতের দুর্ভিক্ষের প্রধান অঙ্গ নহে; তাহার আনুষঙ্গিক অনেক গুলি আপদ ঘটিয়া থাকে যাহাতে দরিদ্র অন্নক্লিষ্ট কৃষককে হয়ত যাবজ্জীবনের জন্য পথের ভিখারী হইতে হইতেছে। তিন বৎসরের খাজানা বাকী না পড়িতেই উত্তমর্ণকে ঋণ আদায়ের জন্য নালিশ করিতে হইবে, নতুবা Limitation আইন কার্য্য করিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ চারি বৎসরের সমবেত অন্নকষ্টের সমষ্টি! অতএব পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিতেছেন যে চতুর্থ বৎসরে দরিদ্র অন্নক্লিষ্ট লোকের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়!!

এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সময় মধ্যভারত গবর্ণমেণ্ট মুমূর্ষু লোকদিগের জীবন ধারণের উপায় বিধান জন্য আপন কোষ উন্মুক্ত করিয়াছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন যে গবর্ণ-মেণ্টের জাগরিত হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল, আরও পূর্ব্বে জাগরিত হইলে দেশের অবস্থা এত শোচনীয় হইত না। আমি গবর্ণমেণ্টের ওকালতি গ্রহণ করি নাই, অতএব এ অভি-যোগের সদুত্তর দিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহা বলিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া পাপী হইয়া থাকেন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলিদান যথেষ্ট হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষ ব্যাপারে লোকের দুঃখ মোচনে ক্ষিপ্রহস্ত হইতে গিয়া গবর্ণমেণ্টের ইয়ুরোপীয় কর্ম্ম-চারীদিগের মধ্যে একজন কমিশনর (সস্ত্রীক) দুইজন ডিপুটী কমিশনর ও একজন Executive Engineer করালীর করাল বাসনানলে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছেন! অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে একদিকে যেমন ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ নিজের প্রাণ দিয়া অপরের প্রাণ বাঁচাইতে প্রাণপণ করিয়া কার্য্য করিয়াছেন তেমন অপরদিগে কয়েকজন ভারত বাসী কর্ম্মচারী দরিদ্র ক্ষুৎপিপাসাতুর মৃতপ্রায় লোকদের মুখের মুষ্টি প্রমাণ ভিক্ষালব্ধ অন্ন কাড়িয়া লইয়া আপন কবলে গ্রাস করিয়াছেন। গত বৎসরের প্রাদেশিক Criminal report এ এইরূপ তিনটী উদাহরণ পাওয়া যাইবে! প্রকাশ্যে যখন এতদূর ঘটিয়াছে গোপনে আরও কত হইয়াছে কে বলিতে পারে? গবর্ণমেণ্টের এইরূপ সদাশয়তা ও স্বদে-শীয় লোকদিগের এবম্বিধ রক্তশোষণ বৃত্তি দেখিয়া কাহার মনে এই ধারণা না জন্মাইবে এবং এ দেশীয় দরিদ্র লোকদিগের সহিত সমস্বরে বলিতে না ইচ্ছা হইবে যে "এবার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই গরীবের মা বাপ হইয়া তাহাদিগকে অন্ন দিয়া বাঁচাইয়াছে?" ইংরাজ ধর্ম্ম প্রচারকগণ দরিদ্র অন্নক্লিষ্ট লোকদিগের জন্য যত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন স্বদেশীয় লোক-গণ আপন আপন স্বজাতীয়ের জন্য তাহার কিয়দংশ করিলেও দেশের অবস্থা এত শোচনীয় হইত না। এমন কি যে সকল লোক মৃতপ্রায় অন্নক্লিষ্ট লোকদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া

নিয়াছে, তাহারা তাহা হইতে বিরত থাকিলেও আমাদিগকে এই শোক পত্র লিখিতে গিয়া নিরাশার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে হইত না।

আমি " পেট্রিয়ট " নহি ; গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় এবং বিজাতীয় ! এইরূপ গবর্ণমেণ্টের নিকট যতটুকু সহানুভূতি প্রত্যাশা করা যায় তাহাই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে আমাদের দুঃখ দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের গৃহ ভিত্তি পর্য্যন্ত আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছে, আর আমার ঘরের ভিতরে আমার ভ্রাতা আমার শোকাশ্রুসিক্ত নেত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমার ভিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয় অন্নের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইতেছে, তখন সত্য সত্যই মনে হয় আমরা অশিক্ষিত তস্কর !

গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায়ে অন্নক্লিষ্ট লোকের সাহায্য বিধান করিয়াছে তাহা বিবৃত হইতেছে :—

প্রথমতঃ, যে সকল লোক কার্য্য করিতে সক্ষম অথচ কার্য্য যুটাইতে পারিতেছে না বলিয়া অন্নাভাবে মারা যাইতেছে, তাহাদের জন্য Relief works স্থাপন। মধ্য ভারতে প্রধানতঃ রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ করাই একমাত্র কার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা ধারণা হইবে যে রাস্তা নির্ম্মাণ হইতে জলাহরণ সংস্থানই অধিক উপযোগী ; কিন্তু এ দেশে খাল কাটিয়া জল আনিবার ব্যবস্থা করা অতিশয় ব্যয়সাধ্য, এবং সর্ব্বত্র তাহা ঘটাইবার কোন সুবিধা হইতে পারে না। কূপ খননই একমাত্র ব্যবস্থা ; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তদপেক্ষা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্যের সহায়তাতে অধিক মনোযোগী হইয়াছে এবং তাহাকে অধিক উপাদেয় ব্যবস্থা মনে করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ গ্রামে গ্রামে কর্ম্মাক্ষম অশক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিনকার আহার নির্ব্বাহার্থে অর্থ বিতরণ। ইহা দ্বারা কত লোক জীবনধারণ করিয়া অহর্নিশি গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে তাহা পল্লীগ্রামে না গেলে বুঝিবার উপায় নাই। উপরোক্ত Relief works এতে কার্য্য করিতে গিয়া যাহারা অশক্ত কিম্বা পীড়িত হইয়া পড়িতেছে তাহাদিগকে আপন আপন গ্রামে পাঠাইয়া দিয়া তাহাদের উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সাধারণতঃ কম পয়সা দেওয়া হইয়াছে কারণ এই উপায় বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য অশক্ত, পীড়িত ও শিশুদিগের অন্নক্লেশ বিদূরণ।

তৃতীয়তঃ, গরীবাবাস স্থাপন। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই কতক বলা হইয়াছে। গ্রামে যাহারা পীড়িত হইয়া কিম্বা এতদূর অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের তত্ত্বাবধান চলা দুষ্কর হইয়াছে তাহাদিগকে এইরূপ গরীবাবাসে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এ দেশীয় লোক কতক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রিয় ; তাহারা নিয়মের বাঁধাবাঁধি ভালবাসে না। গ্রামে নিজের বাড়ীতে আসিয়া অর্দ্ধাহার পাইলেও তাহারা পূর্ণাহারের জন্য অন্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। এতদ্ভিন্ন কুসংস্কার এ দেশে এত প্রবল যে পীড়িত লোকদিগের

বিশ্বাস তাহারা ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে গেলে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। যদি কেহ বলে যে গরীবাবাসে গেলে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে তখন কুসংস্কার আরও একমাত্রা চড়িয়া বলিয়া দেয় ইংরাজরাজত্ব ধ্বংশ প্রায়, তাহার পুনঃস্থাপন করিতে হইবে, অথবা মহারাণী পীড়িত, তাঁহার চিকিৎসা করিতে হইবে, এসব কারণে মানুষের তৈল প্রয়োজন, তাই গরীবাবাসে লোক নিয়া তাহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট করা হইতেছে, অবশেষে তাহাদিগের দেহ হইতে তৈল বাহির করা হইবে !!! এই সকল কারণে গরীবাবাস গ্রাম্য লোকদিগের নিকট প্রিয় হইতে পারে নাই।

চতুর্থতঃ, মহুয়ালুণ্ঠন।—পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন যে মধ্যভারত ভয়ঙ্কর জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশ। ঐ সকল জঙ্গলে"মাহুয়াজাতীয় এক প্রকার ফল উৎপন্ন হয় তাহা এত পর্য্যাপ্ত যে গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা কৃষিবাণিজ্য হইতে বহু পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এ দেশে রাজস্ব বিভাগের অন্তর্গত যত ক্ষুদ্র বিভাগ আছে তন্মধ্যে জঙ্গল বিভাগ অধিক পরিমাণে উপাদেয়। এ বৎসর মহুয়ার ফসল অতিশয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সমস্ত মহুয়া দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে লুটিয়া খাইতে অনুমতি দিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে জঙ্গলবিভাগ দ্বারা মহুয়া বিক্রয় হইত ; এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট মহুয়ালব্ধ সমস্ত প্রত্যাশিত রাজস্ব গরিবদিগের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের জঙ্গল ভিন্ন, মধ্যভারতের অনেক গ্রামেই মহুয়ার জঙ্গল আছে ; তাহা গ্রাম্য জমিদারদিগের সম্পত্তি। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে অনেক জমিদার আপন আপন মহুয়া জঙ্গলে উৎপন্ন ফল বিক্রয় করিয়া যে কেবল অর্থলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা নহে, কোন কোন স্থলে দরিদ্র বুভুক্ষিত লোক মহুয়া আহরণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রহার এবং তৎপরে লুণ্ঠনকারী বলিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই !

চতুর্থতঃ, গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র কৃষকদিগের ভাবী জীবিকা সংরক্ষণার্থ আরও এক উপায় করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের দিনে আইন আদালত বন্ধ হয় না কাজেই দরিদ্র অধমর্ণের উপর উত্তমর্ণের প্রভাব খর্ব্ব করিবার উপায় নাই। এদিকে অর্থাভাবে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিবার সংস্থান অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই ছিল। একারণ ভূসম্পত্তি বিক্রয়ে উচিত মূল্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঋণের দায়ে ভূমি নীলাম করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে লোকের কত উপকার হইয়াছে তাহা একমাত্র কৃষিজীবী ভিন্ন অন্য লোকের ধারণায় আসিবে না।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মধ্যভারত সর্ব্বতোভাবে কৃষিপ্রবল দেশ। আবার এ দেশে কৃষিকার্য্যের যত অন্তরায় তত আর কুত্রাপি আছে বলিয়া অনুমান হয় না। কৃষি করিতে হইবে অথচ করা বহু কষ্টসাধ্য বলিয়াই অন্তরায়ের মাত্রা এত অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যাইবে যে এ দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়া যত স্বাভাবিক না হওয়া তত

স্বাভাবিক নহে। এমতাবস্থায় এ দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণের একমাত্র উপায় কৃষিবিষয়ক উন্নতি বিধান এবং সর্ব্বোপরি ভূমিতে জলসেকের ব্যবস্থা সংস্থাপন। পর্জ্জন্যদেব দয়া না করিলে বর্ত্তমান অবস্থায় অপর কোন উপায় আছে বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু উক্ত দেবতা নবসমাজের বশ্যতা স্বীকারে সম্পূর্ণ অসম্মত। এমতাবস্থায় কূপখনন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এ দেশে আবার জলাভাব ও ভূমির শুষ্কতা এত অধিক যে ১০০ হইতে ২০০ ফিট্ পর্য্যন্ত খনন না করিলে জলের উদ্রেক হয় না। কাজেই কূপখনন এক মহাব্যয়সাধ্য ব্যাপার; দরিদ্র কৃষকগণ তাহার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। আবার জমীদারগণ প্রজার দুঃখে কত উদাসীন তাহা উপরোক্ত মহুয়া লুণ্ঠন বিবরণ হইতে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

এখানকার জলাভাব কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমি বিগত গ্রীষ্মে কোন কার্য্য উপলক্ষে একটা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় তিনটী কূপ আছে; সাধারণতঃ লোকের জলাভাব হইবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ঐ গ্রামের ভিতর দিয়া একটী সরকারী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তাহার সংস্কার কার্য্য Releif works এর অন্তর্গত ৮০০০ কুলী কার্য্য করিতেছিল। ঐ গ্রাম হইতে তিন মাইল এদিক ওদিকে কুত্রাপি আর জল নাই। কাজেই দারুণ গ্রীষ্মে গ্রাম বাসীদিগের উপর অধিকন্তু ৮০০০ লোকের জলসংস্থান এবং রাস্তার কার্য্যে জল ব্যবহার করিতে গিয়া উক্ত কূপত্রয় কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছিল। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল মহামারী রোগের সঞ্চার! ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে মধ্যভারতে অন্নাভাবে যত লোক মরিয়াছে তাহার অনেক গুণ অধিক লোক জলাভাবে রোগগ্রস্ত হইয়া মরিয়াছে! এবং এইরূপ স্থলে লোকের অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়া মহামারী সংক্রমণ দ্বারা পূর্ব্বে কথিত ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন!!

তৃপ্তি।

এস, আঁখি ভরে আজ দেখি হে তোমার
　হাসি ভরা মুখখানি,
এস, শ্রবণ ভরিয়ে শুনি ও মধুর
　অধরে মধুর বাণী,
এস, হৃদয় ভরিয়ে করি নাথ তব
　পরশন সুধা পান,
আজি প্রাণ ভরে ভাল বাসি গো, আমার
　জুড়াই তাপিত প্রাণ।
বঁধু, জানো কি কত যে ছিনু আশা কোরে

এতদিন পথ চেয়ে,
সেই পুণ্যফলে কি, আজি এ স্বর্গ
পাইনু, তোমারে পেয়ে!
আজি তোমারি বিমল কিরণে পূর্ণ
শান্ত নিখিল ধরা,
আজি ব্যাপ্ত তোমারি মধুর কণ্ঠে
গগন গীত ভরা,
আজি তোমারি অঙ্গপরশে, রঙ্গে
অধীর পবন চলে,
আজি ফোটে সুগন্ধ ফুল রাশি রাশি
তোমার চরণ তলে।
জানো, কত দিন আমি গোপন হৃদয়ে
বরেছি তোমারে প্রভু।
কত ভেবেছি, অভাগী আমি এ জনমে
পাব কি তোমারে কভু,
কত প্রভাত শিশিরে, সন্ধ্যা সমীরে,
নিশার তিমিরে জাগি,
আমি রহিলাম উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে
তোমার দরশ লাগি।
শুনি স্তনিত জলদমন্দ্র, চমকি
চাহিতাম তুলি মুখ,
দেখি অরুণহাস্য দুরু দুরু করি
কাঁপিয়া উঠিত বুক।
কত নব বসন্তে শিহরিতাম গো
তব আগমন গণি,
কত চাহিতাম শুনি কিশলয় দলে
মলয়ের পদধ্বনি।
আজি সে তুমি আমার, মিটেছে গো সব
প্রাণের বাসনাগুলি,
আজি জীবন ধন্য পুণ্য ভরিত
পেয়ে তব পদধূলি।
না, না, মিটেনি মিটেনি বাসনা, শুধুই

ভেঙ্গে গেছে তার বাঁধ ;
শুধু ফুটিয়া উঠেছে মুকুলিত মম
প্রাণের সকল সাধ।
শুধু সুধা পেয়ে যেন বাড়িয়াছে ক্ষুধা
ধন পেয়ে ধন আশা,
তব পরশে হরষে জেগেছে শুধুই
ঘুমন্ত ভালবাসা।
যদি পেয়েছি তোমারে প্রাণ ভরে আজ
ডাকিব আমার বলে,
আজি এ কোমল ভুজবন্ধন দিব
পরায়ে তোমার গলে।
আজি শুনাব নিভৃতে হৃদয়ে রচিয়া
রেখেছি যে সব গান,
আজি তোমারে ছাইয়ে দিব নাথ, দিয়ে
প্রণয়ের অভিধান।

প্রত্যাবর্ত্তন।

আজ (৫ই জুন শুক্রবার) নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ করে আমরা তিনটী মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হোতে লাগলুম ; কারো মনে প্রসন্নতা নেই। কেমন একটা গভীর বিষাদ বুকে নিয়ে আমরা নিঃশব্দে পথ বেয়ে চল্লুম ; পা দু খানি যেন কলে চোল্‌ছে। কারো মুখে কথা নেই। এমন অবসাদ নিয়ে কি বেশী পথ চলা যায়. কাজেই বেলা যখন দুশটা তখন আমরা সবে চার মাইল রাস্তা এসে কালকা চটীতে বাসা নিলুম। এখন পথ-ঘাট সব চেনা ; যে চটীতে যাবার সময় বাস কোরে গিয়েছি সে চটীওয়ালাকে পর্য্যন্ত বেশ ভাল কোরে মনে কোরে রেখেছি। বিদ্যাবুদ্ধি মোটেই নেই, টাকা কড়ি দিয়ে যে লোককে বশ করবো তাও তেমন ছিল না। তবে একটী জিনিস সম্বল কোরে এ পথে বেরিয়েছিলুম, সেটী 'শীতল বুলি'। একটা দোহা আমি সর্ব্বদাই আবৃত্তি কত্তুম এবং জীবনে সেটীকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্য অনেক চেষ্টাও কোরেছি ; সে চেষ্টা যে নিতান্তই বৃথা করিনি তার প্রমাণ এই নারায়ণের পথে পেয়েছি। দোঁহাটী ঠিক হবে কিনা বলতে পারি না, তবে আমি তাকে এই আকারেই পেয়েছি ;—

ইয়ে রসনা বশ করো, ধরো গরিবি বেশ ;
শীতল বুলি লেকে চলো সবহি তুমহারা দেশ।

এই 'শীতল বুলি' এই মিষ্ট কথাতেই সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চ'লে এসেছি। আমার ত এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে পথে ঘাটে চোল্‌তে হোলে টাকায় কুলায় না, মান মর্য্যাদা, গর্ব্ব অহঙ্কার পদে পদে বিড়ম্বিত হয়, তারা কোন দিনই পথের সঙ্গী নয়, তা এই পাহাড়ের মধ্যেই হোক, আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেলের গাড়ীতেই হোক। নিজের ধন, মান, মর্য্যাদা, বংশ গৌরব নিজের গ্রামে বা আশ্রিত মণ্ডলীতেই বেশ গুছিয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার কোরতে পারে; পথে ঘাটে তা বিশেষ অসুবিধাই ঘটিয়ে দেয়। এই মিষ্ট বাক্যে সকল চটীওয়ালাকেই বাধ্য কোরে আমরা পথ চোলেছি।

কালকা চটীতে আমরা পৌছলে চটীওয়ালা আমাদের দেখে বড়ই আনন্দিত হো'ল; কতদিন সে কত জনের কাছে আমাদের কথা বোলেছে; প্রতিদিনই আমাদের প্রত্যাগমনের দিকে সে চেয়ে থাক্‌ত। তার কথাগুলি শুনে আমাদের মনে বড়ই আনন্দ হলো। আমরা কোথাকার কে, কবে এক রাত্রির জন্য তার দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলুম, আর সে আমাদের কথা মনে রেখেছে, একথা শুনে মনে বড়ই আনন্দ হলো।

আমরা চটীতে বিশ্রাম কচ্ছি; দোকানদার আমাদের আহারাদির আয়োজন কচ্চে; সে দিন আমরা ব্যতীত সে চটিতে আর কোন যাত্রী বাসা নেয় নি; তাই দোকানদার তার যা কিছু মনোযোগ সমস্তই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছে। বেলা যখন প্রায় ১১ টা সেই সময়ে নীচের দিক থেকে একজন বৈষ্ণব সাধু এসে ঐ চটীতে উপস্থিত হোলেন, তাঁর ভাব দেখে বোধ হোলো তিনি আজ অনেক পথ হেঁটেছেন, তাঁর সঙ্গে আর দ্বিতীয় লোকটী নেই; আমাদের দেশের বৈষ্ণবের মত বেশ; স্কন্ধে একটী ছোটরকমের ঝুলি আছে। তিনি দোকানে প্রবেশ কোরেই নিজের ঝুলিটী নামিয়ে রেখে একেবারে মাটীর উপর শুয়ে পড়লেন, এবং কতকক্ষণ চোক বুঁজে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে বোধ হোল এমনি কোরে শুয়ে তিনি বেশ আরাম বোধ কোচ্ছেন। তাঁর সে আরামে বাধা দিয়ে কথাবার্ত্তা বলা সঙ্গত নয় মনে কোরে আমরাও চুপ্‌কোরে বসে রইলুম। একটু পরেই তিনি গাঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন এবং স্বামীজির দিকে চেয়ে বল্লেন "পথশ্রমে বড়ই কাতর হোয়ে পড়েছিলাম তাই আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে পারিনি কিছু মনে কোরবেন না।" স্বামীজি অবাক্ হোয়ে গেলেন; তাঁর সেই আজানুলম্বিত দাড়ি এবং গৈরিক বস্ত্রের প্রকাণ্ড উষ্ণীষ সত্ত্বেও কি কোরে বৈষ্ণব তাঁকে বাঙ্গালী ঠাউরে নিয়ে বেশ দিব্যি বাঙ্গলায় কথা বোল্লেন, এই স্বামীজির বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু বৈষ্ণব মহাশয় তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন; কারণ পরক্ষণেই তিনি বোল্লেন "আপনি সন্ন্যাসীর বেশেই থাকুন আর যাই করুন আপনার দাড়ি আমরা কোন দিন ভুলব না; আপনার হয়ত মনে নাই, কিন্তু আপনারা যখন মুঙ্গেরে ছিলেন আমি তখন জামালপুরে থাকতুম"। স্বামীজি তাঁকে তবুও চিনতে পারলেন না। বৈষ্ণব শেষে আত্মপরিচয় দিলেন। তিনি জামালপুরে কোন আফিসে চাকরী কোরতেন। যখন মুঙ্গেরে কেশব বাবু স্বদলবলে

অবস্থান কোরছিলেন সে সময়ে ঐ অঞ্চলে খুব একটা ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হোয়েছিল, অনেক শিক্ষিত যুবক তখন ব্রাহ্মসভা, নীতিসভা, সুসংশোধনী সভা প্রভৃতি স্থাপন কোরে খুব একটা সোর গোল উপস্থিত কোরেছিলেন ; তার পর কেশব বাবুরা চোলে এলেন ; কিন্তু ধর্ম্মের আন্দোলন সহজে মুঙ্গের জামালপুর ত্যাগ কোরলে না ; কতকগুলি যুবক যথারীতি, ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন কো'রলেন, কেউ শাক্ত হইলেন, কেউ শৈব হোলেন, কেউ বৈষ্ণব হোলেন। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন যিনি পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম ধারণ কোরেছেন তিনি সেই মুঙ্গের যুবক দলের একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন। কতকগুলি যুবক ধর্ম্মের জন্য চাকুরী আদি ত্যাগ কোরলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ; হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক হোয়ে দেশে দেশে ফিরতে লাগলেন, তাঁর বক্তৃতা শুনে চারিদিকে হৈ চৈ পোড়ে গেল। আমাদের সঙ্গে যে বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হোল ইনিও কিছু দিন সেই দলেই ছিলেন কিন্তু শেষে নিজের রুচি অনুসারে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ কোরে, যথা রীতি ভেক নিয়ে এখন বৃন্দাবনে বাস কোরছেন। নারায়ণ দর্শন উদ্দেশ্যে তিনি এদিকে আসেন নাই তাঁর একজন বাঙ্গালী বন্ধু কানপুরে থাকেন, সেই বন্ধুটীর একমাত্র পুত্র কোথায় চোলে গিয়েছে ; তারা কেমন কোরে সন্ধান পেয়েছেন যে সে ছেলেটী বদরিকাশ্রমের দিকে এসেছে ; তাই এই বৈষ্ণব সেই ছেলের অনুসন্ধানে এসেছেন ; বৃন্দাবনে বোসেও প্রভুর নাম কোচ্ছিলেন, পথেও তাঁরই নাম করবেন ; বন্ধুর ছেলেটি যদি পাওয়া যায় তা হোলে বন্ধুর যথেষ্ট উপকার করা হবে, বন্ধুপত্নীও প্রাণ পাবেন। পরের উপকারে জন্যই সাধু বৈষ্ণব এই ভয়ানক পথে এসেছেন।

আমরা ত তাঁকে একেবারে নিরাশ কোরে দিলাম ; তিনি যে লোকের উদ্দেশে যাচ্ছেন তার চেহারা যে ভাবে বোললেন তাতে তেমন চেহারার লোকত আমাদের নজরে পড়ে নাই। একটা ছেলেকে আমরা সেদিন ডাক্তারখানায় রেখে এসেছি, তাকে দেখে আমাদের বাঙ্গালী বোলে বিশ্বাস হোয়েছে ; সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিলাম। তিনিও সেই দিনই যে কোরে হোক্ সেই ডাক্তার খানা অবধি যাবেন। যখন অতদূর এসেছেন তখন আর নারায়ণ দর্শন না কোরে শ্রীধামে ফিরবেন না। লোকটী বড়ই সুন্দর প্রকৃতির। চৈতন্য দেব উপদেশ দিয়েছিলেন

তৃণাদপি সুনীচেণ তরোরিব সহিষ্ণুণা,
অমানিণা মানদেন কীর্ত্তণীয়া সদা হরি।

সে উপদেশ আধুনিক বৈষ্ণব মহাশয়েরা কতদূর পালন কোরে থাকেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতেত বোলতে পারি বৈষ্ণব মহাশয়েরা উপদেশের শেষাংশ পালন কোরে থাকেন, সর্ব্বদা হরি নাম কীর্ত্তন তাঁরা কোরে থাকেন ; তবে তার কতখানি হরির জন্য, আর কতখানি ভিক্ষার জন্য পদ প্রসারের জন্য তা তাঁরা এবং তাঁদের হরিই বোলতে পারেন। বৈষ্ণবের নাম শুনলেই তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক

গুলি কথা, অনেকগুলি ভাব, আমাদের মনে এসে পড়ে সেগুলি ঐ নামের সঙ্গে এমন দৃঢ়রূপে জড়িয়ে গিয়েছে যে তাদের স্থানচ্যুত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হোয়ে পোড়েছে। ভাল বৈষ্ণব বড় একটা নজরে পড়ে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে যে বৈষ্ণব দেখ্‌তে পাই তারা শুধু ভিক্ষা পাবার জন্যই তিলক মালা ধারণ কোরেছে বোলে মনে হয়। বৈষ্ণবের কথা ব'লতে ব'লতে একটা অনেক দিনের কথা আমার মনে পোড়ে গেল। যিনি সে কথাটী বোলেছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে; এখন তাঁর কথা আর প্রতিদিন মনে হয় না; ইনি আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী; তিনি যদিও হিন্দু পরিবারের মধ্যে বর্দ্ধিত হোয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ধর্ম্মভাব সর্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত ছিল; তিনি কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই গোঁড়ামী দেখ্‌তে পারতেন না। তিনি একদিন এই বৈষ্ণবদের সমালোনা কোরতে গিয়ে বোলেছিলেন যে আমরা সংসারের মধ্যে থেকে হরিনাম অনেক সময়ে ভুলে যাই সুতরাং আমরা পাপী তার আর সন্দেহ নেই; কিন্তু এই বৈষ্ণবগুলো সংসারটাকে এতই ভালবাসে যে তাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া কোর্‌তে পারে না; তাই তারা তাদের সংসারের উনকুটি চৌষট্টি ঝুলির ভিতর পুরে দিনরাত কাঁধে কোরে, পিটে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এরা এই ঝোলাই বইবে না হরিনাম কোরবে। কথা কয়টী বড় ঠিক। বৈষ্ণব সাধু সন্ন্যাসী আমি জীবনে অনেক দেখেছি কিন্তু তাঁদের অধিকাংশেরই প্রাণের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সংসার, তারা যে কেমন কোরে সমস্ত সংসার বাসনা ঝুলিতে বোঝাই কোরে নিয়ে বেড়ায় তা ভেবেই উঠা যায় না

সে কথা থাক্। আজ এই চটীতে যে বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা গেল তাঁর উপরে কোন কথাই খাটেনা। তাঁকে দেখে সেই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম তাতে বোল্‌তে পারি লোকটী বেশ ধার্ম্মিক; আর তিনি সত্য সত্যই ধর্ম্মের জন্যই এই আশ্রমে প্রবেশ কোরেছেন। তিনি এত বেলায় রান্না কোরতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমরা আর তাঁকে সে কষ্ট পেতে দিলাম না। আমাদের জন্য যে খাবার তৈরি হোয়েছিল তাই তাঁর সঙ্গে ভাগকোরে গ্রহণ করা গেল।

আহারান্তে তিনি আর একদণ্ড ও বিশ্রাম কোরলেন না; আমরা যে দেশ ছেড়ে এসেছি তিনি সেই দেশের দিকে চোলে গেলেন; আমার প্রাণের মধ্যে আবার বাসনা জেগে উঠ্‌লো মনে হোতে লাগ্‌লো, নেমে কোথায় যাব; আমার আবার প্রত্যাবর্ত্তন কেন। বেশত গিয়েছিলাম, নেমে আস্‌বার কি এমন একটা দরকার হোয়েছিল তাত আজ বুঝতে পাচ্ছিনা। কি মনে কোরে যে এতটা রাস্তা নেমে এসেছি তা আজ মোটেই মনে আন্‌তে পাল্লুমনা। বড়ই ইচ্ছা গেলো বৈষ্ণবের সঙ্গে আবার নারায়ণের পথে চোলে যাই; সেখানে গিয়ে শেষে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যে কথা সেই কাজ; আমি তথনই কম্বল কাঁধে কোরে বার হবার উদ্যোগ কচ্ছি দেখে স্বামীজি নিষেধ কল্লেন, এত রৌদ্রে বাহির হোয়ে কাজ নাই। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলুম যে আমি আবার নারায়ণের পথে

যাচ্ছি ; নীচে ফিরে যাওয়ার মত পরিবর্ত্তন হোয়েছে। স্বামীজি শুনে একেবারে অবাক্। সত্য সত্যই তিনি হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ; দেখে যেন বোধ হোল হয় তিনি আমার কথা মোটেই বুঝতে পারেন নি আর না হয় তিনি আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা ভাবছেন। আমি তাঁকে এই অবস্থায় দেখে নিজেই নীরবতা ভঙ্গ কোরে দিলুম। 'তা হোলে আসি', এই বোলে আমি যখন পা বাড়িয়েছি, তখন সেই সন্ন্যাসী, সেই সংসারত্যাগী সর্ব্বত্যাগী সাধু এসে একেবারে দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধোরলেন; সেই শীর্ণ দুর্ব্বল দুই খানি হাতের বাঁধন দিয়ে আমাকে আট্‌কিয়ে রাখ্‌বেন বোলে মনে কোর'লেন। শুধু তাই নয়, নির্ব্বাক সন্ন্যাসী দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল ফেল্‌লেন। হায় কপট সন্ন্যাসী, হায় ভণ্ড সাধু, আজ তুমি এই বাহুবন্ধনে ও চক্ষের জলে ধরা পোড়েছ; তোমার ঐ গৈরিক বসন, দণ্ডকমণ্ডলু ও তোমার এই কষ্ট স্বীকার এত সাধন ভজন সব মিথ্যা, সব মিথ্যা ; তুমি ঘোর সংসারী। তুমি এক সংসার ছেড়ে এসে আর এক সংসারে পোড়েছ। তুমি ভগবানের দ্বারে পৌঁছিতে পারছ না, এত যার স্নেহ মমতা, এত যার মানুষের উপর টান সে ভগবানকে ডাকে কি কোরে। আমি সন্ন্যাসীর সে বাহুবন্ধনে মহা বিপন্ন হোয়ে পোড়'লুম ; তাঁর চখের জল দেখে আমার সব ঘুরে গেল। আমি আর কথাবার্ত্তা না বোলে সেখানে বোসে পোড়লুম। স্বামীজিও আমার কাছে বোসে সস্নেহে আমার দীর্ঘকেশ রুক্ষ মস্তকে হাত বুলাতে লাগলেন। আমার আর নারায়ণের পথে যাওয়া হল না ; কিন্তু তখনই সকলে মিলে সে চটীথেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে কর্ণপ্রয়াগে এসে নীরবে নিঃশব্দে একটা দোকান ঘরে রাত্রিবাস করা গেল। কর্ণপ্রয়াগে পেড়া কিনতে যাওয়া যায় ; সেই পেড়া খেয়েই সে রাত্রি কাটিয়ে দেওয়া গেল। ৬ই জুন—প্রাতে উঠে দেখি আকাশ একেবারে মেঘে ছেয়ে ফেলেছে, আর ধীরে ধীরে বেশ বৃষ্টি হোচ্ছে ; পাহাড় অঞ্চলে এরকম বৃষ্টি দেখ্‌লেই বুঝতে হবে যে সেদিন বৃষ্টি বড় শীঘ্র থামবেন না। আমার আর এ বৃষ্টির মধ্যে বার হওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিলনা, আবার বেশ গুছিয়ে কম্বল খানি মুড়ি দিয়ে শয়ন কোর্‌তে যাচ্ছি, এমন সময়ে বৈদান্তিক ভায়া বাধা দিলেন ; তিনি বল্লেন এরকম বাজারে জায়গায় আর এক বেলা থেকে দরকার নেই ; যদি এক আধ বেলা বিশ্রাম করা নিতান্তই দরকার হয়ত পাহাড়ের মধ্যে কোন একটা নির্জ্জন চটীতে দুই এক দিন কাটিয়ে দেওয়া ভাল। বৈদান্তিক ভায়ার যে কখন্ কি মত হয় তা দেবতারাও ঠিক্ কোরে বোল্‌তে পারেন না। যেখানে বেশ জিনিস পত্রপাওয়া যায় সেখানে থাক্‌তে ইতিপূর্ব্বে কোনদিনও তাঁর কোন প্রকার আপত্তি হয় নি; কিন্তু আজ তিনি জঙ্গলের মধ্যে জনহীন পর্ব্বতগহ্বর কি সামান্য চটীতে বিশ্রাম ভাল বোলে মত প্রকাশ কোরলেন। হয় তিনি আমাকে বার হোতে অনিচ্ছুক দেখেই বার হবার জন্য প্রস্তুত হোলেন, না হয় আজ এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পোড়ে রাস্তায় কিঞ্চিৎ কষ্ট ভোগ আমাদের অদৃষ্টলিপি ছিল, তাই বৈদান্তিক আজ

সকলের আগে কম্বল কাঁধে কোরে বেরিয়ে পোড়লেন। আমি বাক্য ব্যয় না কোরে তাঁর অনুবর্ত্তী হোলেম।

খানিকটে দূর এগিয়ে এসে এমন ঝড়ে আটকিয়ে যাওয়া গেল যে আর এক পা অগ্রসর হবার শক্তি রইল না। মড় মড় কোরে বড় বড় গাছ সব ভেঙ্গে পোড়তে লাগলো, প্রতি মুহূর্ত্তে বোধ হোল যেন এইবারেই হয় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে বা উপর থেকে হয় গাছ ভেঙ্গে পোড়ে, না হয় পাহাড়ের ধস্ নেমে আমাদের সন্ন্যাসীগিরি জন্মের মত ঘুচিয়ে দিবে। আমরা তিনজন তখন এক জায়গাতেও নেই, যে একত্রে জড়িয়ে পোড়ে থাকব; কে যে কোথায় তা আর সে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। আমি একে নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত তার মধ্যে আবার স্বামীজির কথা মনে হোতে লাগলো। একটা গাছের শিকড় প্রাণপণে দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধোরে আমি শুয়ে পোড়ে আছি। মাথার উপর দিয়ে কত কি বোয়ে যাচ্ছে, একবার একটা হয়ত প্রকাণ্ড ডালই হবে আমার মাথার কাছ দিয়ে চোলে গেল; কম্বল খানির দুই তিন জায়গা ছিঁড়ে গেল; গানের বই খানি কিন্তু বুকের মধ্যে আছেই। ঝড় আর থামেনা, তবে একটু নরম হোল; বৃষ্টি খুব কম হোয়ে গেল। বৃষ্টি কম হওয়ায় কিছু এল গেলনা; তার চাইতে যদি বাতাসটা কমে গিয়ে বৃষ্টি সমভাবেই থাক্‌তো তাতে আমার কোনই ক্ষতি ছিল না; কাপড় ও কম্বল যতটা ভিজে গিয়েছিল তার চাইতে বেশী ভিজিবার যো আর বড় ছিল না। বাতাসের ভয়ে আমি আর সে ছেড়ে পড়ি নাই। এ ভাবে আমাকে অধিকক্ষণ থাক্‌তে হয়নি। অচ্যুত বাবাজী আমার সম্মুখে কোথায় ছিলেন, তিনি বিপুল বিক্রমে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ কোরতে কোরতে আমার কাছে এসে উপস্থিত হোলেন এবং তাঁর সেই বিশালদেহ দিয়ে আমাকে আবৃত করে ব'সলেন। আমার মনে পড়ে যখনই ঝড় বৃষ্টি হোয়েছে তখনই বৈদান্তিকের নির্ম্মম কঠোর বক্ষতলে আমি আশ্রয় পেয়েছি। পক্ষীমাতা যেমন নিরাশ্রয় শাবককে বিপদ কালে নিজের পাখা দুইখানির নীচে লুকিয়ে রাখে বৈদান্তিকের সেই বিপুল বক্ষ তেমনি আমাকে অনেক বিপদসময়ে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কোরেছে। আমি বিপন্ন হোলে আর কোন দিনই সে মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ কোরে আমাকে উড়িয়ে দিতে পারে নি। এ মানুষটী এতদিন আমাদের সঙ্গে রইল, তবু এর ভাবগতিক আমিত মোটেই বুঝতে পারলুম না। তার মতামতেরও একটা সামঞ্জস্য কখনও দেখা গেল না। কি একটা এলেমেলো হৃদয় নিয়ে সে যে দেশত্যাগ করেছে তা আর বল্‌তে পারিনে; সে বোধ হয় এত দিনেও তার সব প্রাণের বিক্ষিপ্ত জিনিষগুলিকে একত্র সংগ্রহ কোরে একটা বুদ্ধি স্থির করতে পারে নি।

আর একটু পরেই ঝড় থেমে গেল। স্বামীজি আমাদের পশ্চাতে আছেন তাঁর উদ্দেশ করা দরকার হোয়ে পড়্‌ল, কারণ এখনও তাঁর কোন খোঁজ খবরই নেই। আমরা দুইজনে তাঁর বিলম্ব দেখে বড়ই ব্যস্ত হোয়ে যে পথে এসেছিলাম সেই পথে ফিরে যেতে লাগলুম, বেশী-দূর যেতে হোল না; একটু পথ যেতে না যেতেই দেখি তিনি ভারি ব্যস্ত হোয়ে ছুটে আস-

ছেন। আমাদের দুইজনকে দেখে একেবারে বোসে পোলেন; তাঁর এই প্রকার হঠাৎ বোসে পড়া দেখে আমরা বেশ বুঝতে পারলুম তিনি অনেক দূর থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের যে কি দশা হোল তাই জানবার জন্য বিশেষ আকুল হোয়ে আস্‌ছিলেন, সম্মুখে আমাদের দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে চুপ কোরে বোসে রইলুম। তিনি যখন একটু কথা কইবার মত হোলেন তখন আমরা কি কোরে কোথায় আশ্রয় পেয়েছিলুম তাই জানবার জন্য উৎসুক হোলেন এবং আমাদের ভিজে কাপড় ও কম্বল দেখে দুঃখ কোরতে লাগলেন। তাঁর নিজের শরীরে মোটেই জল লাগেনি; তিনি ভগবানের কৃপায় একটী প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি মোটেই ঢুক্‌তে পায় নি। আমাদের অবস্থা শুনে তিনি ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালেন; আজ যে ঝড় জল তাতে ভগবানের কৃপা না হোলে আমরা আর বাঁচতুম না। স্বামীজি এতই ভগবদ্‌প্রেমে বিগলিত হোয়ে পোড়লেন যে সেখান থেকে যে তিনি শীঘ্র গাঝাড়া দিয়ে উঠেন তেমন রকমটা মোটেই বোধ হোল না। প্রথমে তিনি চক্ষু মুদ্রিত কোরে ব'সলেন, আমরা দুইটী হতভাগ্য পাষাণ হৃদয় জীব হাঁ কোরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। একটু পরেই তিনি গান আরম্ভ কোরে দিলেন।—আমার উপর তাঁর একটা আদেশ ছিল যে যখনই যেখানে তিনি যে অবস্থায় গান ধোর্‌বেন আমাকে তাতে যোগ দিতেই হবে; আমার ভাগ্যক্রমে তিনি কখনও এমন কোন গান করেন নি যা আমি জানিনে; গাইতে যদিও ভাল জানি-না—ভাল কেন, নিজের তৃপ্তি ব্যতীত আমার শুনে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির তৃপ্তি জন্মাবার দুরাশা আমিত কোন দিনও মনে স্থান দিইনি, কিন্তু তা বোলে আমার গানের তহবিল শূন্য নয়; গাইতে পারি আর না পারি গান আমার অনেক সংগ্রহ আছে; আর তা-না হোলে যদিও কম্বল ও যষ্টি সম্বল কোরে পথে বেরিয়েছিলুম কিন্তু গানের বইখানি কোনদিনও ছাড়িনি, সেখানিকে বৈষ্ণবের জপমালার মত বুকে কোরে নিয়ে বেড়িয়েছি।

স্বামীজি গান ধোরলেন, তার সবটা মনে নেই; তবে তার মুখখানি মনে আছে, পাঠক গণের মধ্যে যাঁদের জানা আছে তাঁরা সবটা গেয়ে নেবেন, গানটী এই।ঃ—

"হরি সে লাগি রহোরে ভাই"

এই গানটী মিরা বাইয়ের রচিত। স্বামীজি যখন তখনই এ গানটী গাইতেন। তিনি যেভাবে উল্‌টে পাল্‌টে গানটী গাইতে লাগলেন তাতে কতক্ষণে যে তিনি গান ছেড়ে দেবেন তা মোটেই বুঝ্‌তে পারা গেল না, এদিকে বেলাও হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। অগত্যা আমি গান ছেড়ে দিলাম; তাঁর স্বরও ধীরে ধীরে নামতে লাগলো, শেষে একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তখনও তিনি উঠ্‌লেন না। গান শেষ হোয়েছে দেখে আমরা দুইজনে উঠে এদিক ওদিক্ কোরতে লাগলুম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আপন মনেই চোল্‌তে লাগ-লেন; আমরা দুইজন ধীরে ধীরে তাঁর পশ্চাতে যেতে লাগলুম।

আজ দুই প্রহরে যে চটীতে আশ্রয় নিয়েছিলুম তার নামটী আমার খাতায় লেখা নেই

সে জায়গাটা ফাঁক রোয়েছে ; বোধ হয় সেই দুই প্রহরে কোন নূতন চটীতে ছিলাম, তার নামটী শুনে নিতে মনে ছিল না, বিশেষ এই প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আমার ডাইরিটা তেমন নিয়ম মত লেখাই হোত না ; তার কারণ হোচ্ছে এই নারায়ণে যাবার সময়ে যেমন একটা স্ফূর্ত্তি নিয়ে বেরিয়েছিলুম, আসবার সময় তার সম্পূর্ণ অভাব। এখন কলের পুতুলের মত যাচ্ছি। লোকালয়ে ফিরে যাচ্ছি, এ কথাটা মনে হোলে আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা ঘোর অবসাদের ভাব এসে উপস্থিত হোত ; আমার উদাস প্রাণকে আরও উদাস কোরে ফেল্‌ত আমি মোটেই মনটাকে স্থির কোরে নিতে পারতুম না ; কাজেই সে সময়ে কোন কাজই ভাল লাগত না, আর সেইজন্যই প্রত্যাবর্ত্তনের ডাইরি শুধু যে ভাল কোরে রাখা হয় নি তা নয়, অসম্পূর্ণ পোড়ে রোয়েছে। যতই নীচে নেমেছি ততই জড়তা, বিষাদ, দুঃখ কষ্টের ছবি সব আমার প্রাণের ভিতর বেশী কোরে ফুটে উঠেছে; আর ততই আমি অন্যমনস্ক হোয়েছি।

সেই অজ্ঞাতনামা চটীতে দুই প্রহরে বিশ্রাম কোরে অপরাহ্নে আবার পথে। আজ সন্ধ্যায় আমরা শিবানন্দী চটীতে এসে রইলুম। এই চটীতে আমাদের একজন সঙ্গীর বড় জ্বর হয়, আর আমাদের একাকী ফেলে অচ্যুত বাবাজী চোলে যান। আমরা শিবানন্দীর সেই ঠাকুর বাড়ীতে পূর্ব্ব বারের মত বাসা কোরে রইলুম। রাত্রিটা বেশ কেটে গেল।

৭ই জুন—শিবানন্দী হতে রুদ্র প্রয়াগ পর্য্যন্ত পথ অতি কদর্য্য, এমন ভয়ানক রাস্তা যে কিছুতেই পাকে ঠিক্‌ রাখা যায় না। আর এই পথের মধ্যে পাহাড় গুলো আবার এমন নরম যে একটু জল হোলেই অনেক ধস্‌ নামে। গবর্ণমেণ্ট এই রাস্তাটাকে ঠিক রাখতে না পেরে শিবানন্দীর ৪ মাইল উপরে পিপল চটীতে একটা লোহার সেতু নির্ম্মাণ কোরে রাস্তাটাকে নদীর অপর পার দিয়ে চালিয়েছেন এবং সেই রাস্তা রুদ্রপ্রয়াগে এসে আবার আর একটা লৌহ সেতুর সাহায্যে পূর্ব্ব রাস্তায় এসে মিশেছে। আমরা এ সংবাদ জানতুম কিন্তু আমাদের এও জানাছিল এই নূতন রাস্তায় আশ্রয়স্থান নেই। তাই আমরা নারায়ণে যাবার সময়েও সে রাস্তায় যাই নি ; এখন ফিরবার সময়েও সে রাস্তায় গেলাম-না। পিপলচটীতে না অপেক্ষা কোরে আমরা একেবারে শিবানন্দীতে এসে উঠেলুছিম। আজ শিবানন্দী থেকে বাহির হোয়ে একটু, বোধ হয় মাইল দেড় কি দুই হবে, অগ্রসর হোয়েই দেখি রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। গতকল্য যে ঝড় জল হোয়ে ছিল তাতে রাস্তা একেবারে ধুয়ে নেমে গিয়েছে। এখন কি করা যায় ; স্বামীজি বোল্লেন, আর কি করা ; ফিরে পিপল চটীতে আজ রাত্রিবাস কোরে, কা'ল খুব ভোরে উঠে নদী পার হোয়ে নূতন রাস্তা ধোরে যেমন কোর হো'ক না খেয়ে দেয়ে নাগাদ সন্ধ্যা কি চারছয় দণ্ড রাত্রের মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগে পৌছতে হবে ; তা ছাড়া আর উপায় নেই। ফিরে যেতেও আমাদের আপত্তি ছিল না ; তার পরের দিন অনাহারে সারাদিন চোলতেও যে বড় একটা ভারি কষ্ট হবে তাও মনে হয় নি ; কিন্তু আজকের সারাদিন রাত্রি পিপলচটীতে বাস অপেক্ষা গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া

ভাল অচ্যুত ভায়ার এই মত। যে পিপলচটীর লক্ষ লক্ষ মাছির দৌরাত্ম্যের কথা আজও আমার মনে আছে, সেখানে কিছুতেই রাত্রিবাস করা হবে না। অচ্যুত ভায়া বোল্লেন "আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি একটু উপরে উঠে গাছ ধোরে ধোরে এগিয়ে দেখি এই সুমুখের পাহাড়ের ও পাশে রাস্তা আছে কি না। যে কথা সেই কাজ; তিনি তাঁর বেদান্তদর্শনের বোঝা ও কম্বলখানি নামিয়ে রেখে বিপুল বিক্রমে গাছ পালা মাড়িয়ে উপরে উঠতে লাগ্‌লেন এবং কখন গাছের পাতা সরিয়ে, কখন শিকড় ধোরে বেশ যেতে লা'গলেন; এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের দিকে সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই চীৎকার কোরে বোল্‌লেন "ভয় নেই এ দিকের রাস্তা তেমন ভাঙ্গে নি" তার পর আবার যেমন কোরে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি কোরে ফিরে এলেন।

আমি তাঁর গমনাগমন দেখে বেশ যেতে পারবো বোলে মনে ভরসা বাঁধলুম, কিন্তু স্বামীজি তেমন সাহস পান না। অবশেষে কি করেন, আর ত কোন উপায় নাই; কাজেই তাঁর দণ্ড কমণ্ডলু অচ্যুত ভায়ার জিম্মা কোরে দিয়ে তিনিই আগে রওনা হোলেন; বৈদান্তিক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগ'লেন; সে সময়ে বৈদান্তিকের দৃষ্টি এমন সতর্ক যে তা লিখে বোঝাতে পাচ্ছি না; তিনি শুধু স্বামীজির গতিবিধির উপর নজর রেখে অগ্রসর হোচ্ছেন, আর মধ্যে মধ্যে খবরদারী কোর্‌চেন। বোধ হয় আমি তাঁর প্রদর্শিত পথে অনায়াসে যেতে পারবো ভেবে তিনি আর আমার দিকে লক্ষ্য রাখলেন না শুধু সাবধান কোরে দিতে লাগ্‌লেন। আমরা তিনটী মানুষ অতি সাবধানে পাহাড়ের গা দিয়ে যেতে লাগলুম; কখন গাছের ডাল ধোরে, কখন বা শিকড় ধোরে কখনও লাফিয়ে অগ্রসর হোতে লাগলুম। শেষে অনেক কষ্টে নিরাপদে একটা রাস্তায় উঠা গেল। এই আমাদের কষ্টের শেষ নয়। রাস্তায় ৫।৭ জায়গায় ভেঙ্গে গিয়েছে; তবে এই প্রথম ভাঙ্গনটা যেমন অনেকটা স্থান জুড়ে, অন্য গুলি তেমন নয়। সে গুলি পার হোতেও লাফালাফি কোরতে হোয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তেমন বেশী কষ্ট হয় নি। যাই হোক দুই ঘণ্টার পথ ৫ ঘণ্টায় চলে বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা রুদ্র প্রয়াগে এসে উপস্থিত। নারায়ণে যাবার সময়ে আমরা রুদ্রপ্রয়াগের গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মশালায় ছিলাম এবং সেখানে পীড়িত হোয়ে আমার তিন দিন থাক্‌তে হয়; এবারে সেইজন্য আর ধর্ম্মশালায় গেলাম না; বাজারে একটা দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

আমরা আহারাদি শেষ কোরে বিশ্রামের আয়োজন কোচ্ছি; বেলা তখন দুইটা বেজে গিয়েছে বোলে বোধ হোল। সেই সময়ে দেখি একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বাঙ্গালা ভাষায় যাচ্ছেতাই বোলে দোকানদারগণকে গালাগালি দিতে দিতে আমাদের দোকানের সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা যে দোকানখানিতে ছিলুম সেখানি বাজারের এক প্রান্তে অবস্থিত। লোকটীর গৈরিক বসন দেখে তাকে সন্ন্যাসী বোলেছি। তার পায়ে বেশ একজোড়া জুতা, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, গায়ে গৈরিক পীরান, একখানি কম্বল, তাকেও

রং কোরে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে; হাতে একটা সেতার; তারও পরিত্রাণ নাই, তাকেও গৈরিক খোলে মোড়া হোয়েচে। লোকটাকে বড়ই রাগান্বিত দেখে আমি তাঁকে ডাক্‌তে লাগলুম; বাঙ্গলা ভাষায় তাকে ডাক্‌ছি তবুও সে রাগের ভরে চোলে যায় দেখে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পথ রোধ কোরে দাঁড়ালুম এবং কেন সে এত চটে গিয়েছে জিজ্ঞাসা করায় সে দোকানদারদের পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ কোরে গা'ল দিতে লাগ্‌লো এবং রাগে গর গর কোরে কতকগুলি কথা বোলে ফেল্‌লে। তার সার এই যে আজ ভোরে রওনা হোয়ে ৭। ৮ ক্রোশ রাস্তা সে হেঁটে এসেছে, সঙ্গে একটী পয়সা নেই; এখানে এসে যে দোকানে যায় সেই দোকানদারই, বিনা-পয়সায় তার আহার যোগাতে অসম্মত হয়; বেলা আড়াই প্রহরের সময় বেচারীর উপর এ প্রকার অত্যাচার করায় সে কি কোরে তার মেজাজ ঠিক রাখ্‌তে পারে, আপনারাই তার বিচার করুন। অনেক বুঝিয়ে তাকে এনে আমাদের দোকানে বসালুম এবং দোকানদারের ঘরে জল খাবার যা ছিল তা দিয়ে তার উদরদেবকে শান্ত করা গেল। সে যখন প্রকৃতিস্থ হোল তখন তাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে সে যেপ্রকার চটা মেজাজের লোক তাতে বিনাসম্বলে সে এপথে চোল্‌তে পারবে না; তার চাইতে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া ভাল, এবং সে যদি সম্মত হয় তা হোলে তাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী আছি। তাতে সম্মত হোল না, যে কোরেই হোক সে নারায়ণ দর্শন কোরতে যাবেই। তার সদুদ্দেশ্যে বাধা দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করে আমি যথাসাধ্য তাকে সাহায্য কোরলুম; শেষে এক সঙ্গেই সকলে বাহির হওয়া গেল। দুর্ব্বাসার ছোট সংস্করণ সাধু নারায়ণের পথে গেলেন আমরাও শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হোলুম। এই স্থানে একটী কথা না বলা ভাল হয় না। নারায়ণে যাবার সময়ে এই ক্ষুদ্র প্রয়াগে একজন পরমাসুন্দরী জুতাওয়ালার মেয়েকে দেখেছিলাম, তার কথা আমার মনেই ছিল এবং এখানে এসেই তার দোকানের দিকে গেলাম কিন্তু গতকল্য যে ঝড় বৃষ্টি হোয়েছিল তাতে তাদের সে ক্ষুদ্র দোকানঘর খানি নদীতে নেমে গিয়েছে, তারা কোথায় গিয়েছে কে তার উদ্দেশ বোলে দেবে; আর কাকেই বা সে কথা জিজ্ঞাসা করব।

আজ অপরাহ্লে আমরা ভজণী চটীতে রাত্রি বাস করি। এ চটীর কথা আমার খাতায় বেশী কিছুই লেখা নাই।

৮ই জুন—আজ আমরা এই দীর্ঘ প্রবাসের সঙ্গী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীকে হারিয়েছি। তিনি পথে আস্‌তে কয়েক জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হোয়ে তাদের দলে মিশে ফিরে গিয়েছেন। আমি আগে এসেছিলাম, স্বামীজী পরে, সর্ব্ব শেষে বৈদান্তিক। আমরা দুইজনে এসে একটা চটীতে বোসে বৈদান্তিকের জন্য অপেক্ষা কোরেছি; তিনি আর এসে পৌছন না। কতকক্ষণ পরে সেই পথে একজন সন্ন্যাসী এলেন, তিনি এসে আমাদের সংবাদ দিলেন যে আমাদের সঙ্গী তাঁর মুখে বোলে পাঠিয়েছেন যে তিনি একদল সাধুর সঙ্গে মানস সরোবরের দিকে গিয়েছেন। আমাদের মনে বড়ই কষ্ট হো'ল; লোকটা এত

দিন সঙ্গে ছিল ; যাবার সময়ে একটী কথাও বোলে গেল না, বা বিদায় নিয়ে গেল না। হঠাৎ রাস্তার ভিতর থেকে ফিরে চোলে গেল। তার কি একবারও মনে হোল না যে আমরা দুইটী মানুষ তার জন্য পথ চেয়ে বসে থাক্‌ব ; এবং শেষে যখন শুন্‌বো যে সে আমাদের ছেড়ে চোলে গেছে তখন আমাদের মনে যে একটা ভয়ানক কষ্ট হবে সে ভাবনাটাও কি মায়াবাদী বৈদান্তিকের মনে ক্ষণ কালের জন্যও উঠে নি। আর যাকে সে সংবাদ দিতে বোলেছিল সে যদি সংবাদ না দিত, তার যদি সেকথাটা মনে না থাক্‌তো, তা হোলে ত আমরা দুইটী মানুষ সে দিন কেন দুই তিন দিন ধোরে তাকে সেই বনপ্রদেশে পর্ব্বত গাত্রে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হোয়ে যেতাম। এ সব কথা তার মনে হোলে সে অমন কোরে নিতান্ত অপরিচিতের মত আমাদের পরিত্যাগ কোরে যেতে পারত না। কে জানে ভগবান তাকে কোথায় নিয়ে গেলেন ; এ জীবনে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে বোলে মনে হোল না। এতদিন একসঙ্গে ছিলাম, পথশ্রমে কাতর হোয়ে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে বেশ্ সময় কাটান গিয়েছিল ; বিপদ আপদে সে তার বিশাল বক্ষঃস্থল পেতে দিয়ে কতদিন আমাকে রক্ষা কোরেছে ;—এই গতকল্যই তার আমার প্রতি কত স্নেহ প্রকাশ করেছে ; আজ কিনা সে অনায়াসে চলে গেল ; পথে যেতে কি তার প্রাণে একটী কথাও ওঠে নি ; দুইজন স্বদেশবাসী সঙ্গীকে সে অনায়াসে ফেলে চোলে গেল। স্বামীজি বড়ই দুঃখ কোরতে লাগলেন এবং বোল্লেন যে তার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। তাঁর সে কথা সত্য সত্যই ফোলে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে বোধ হয় ৪।৫ মাস হবে, একদিন রুগ্ন-জীর্ণ শীর্ণ দেহে অচ্যুতানন্দ স্বামী আমার দেরাদুনের বাসায় এসে পৌছেছিলেন ; এবং তাঁর সেই পঞ্চমাসব্যাপী কষ্ট যন্ত্রনার কাহিনী যা আমাকে বোলেছিলেন তা শুন্‌লে পাষাণও বিগলিত হয়। তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। আমি তাঁকে কয়েক দিন বাসায় রাখি, তার পর তিনি আলমোড়ায় যাবেন বোলে আমার নিকট হোতে বিদায় নিয়ে যান ; সেই হ'তে আর তাঁর কোন সংবাদ পাই না ; কিন্তু এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে। এখনও আমার এই দরিদ্র গৃহস্থালীর মধ্যে অচ্যুতানন্দকে পেলে আমি কত সুখী হই এবং তাঁর সঙ্গে সেই হিমালয়ের প্রবাস কাহিনী বো'লে অতুল আনন্দ পেতে পারি।

এই দিন থেকে আমি আর ডাইরি রাখিনি। কোন দিন আমার এই ভ্রমণ কাহিনী মানুষের নিকট বোল্‌তে হবে, এমন কোরে ভারতীর পাতায় লিখে রাখ্‌তে হবে সেকথা ত তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। আর যে দেশে ফিরে আস্‌ব সে চিন্তা এক দিনের জন্যও আমার মনে হয় নি ; ডাইরি লেখ্‌বার অভিপ্রায়ও আমার ছিলনা। আমার সঙ্গে একখানি গানের বই ছিল, সেই বই খানি যখন ভাগ কোরে বাঁধান হয় সেই সময়ে তাতে কতকগুলি সাদা কাগজ জুড়ে রাখি ; উদ্দেশ্য নূতন নূতন গান পেলে সেখানে রাখ্‌ব। যখন নারায়ণের পথে যাই সে সময়ে সেই খাতায় সাদা কাগজ দেখে স্বামীজি আমাকে কিছু কিছু লিখে রাখ্‌তে বলেন এবং তাঁরই আদেশে আমি যে দিন যেখানে যা

দেখেছিলাম তা লিখে রাখি। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীনগর অবধি এসে আর আমার লেখ্‌বার তেমন ইচ্ছা হোল না। আসল কথা এই যে যতই আমি লোকালয়ের দিবে নেমে আসছিলুম, ততই যেন কেমন কোরে আমার সব গোল মনে হোয়ে যাচ্ছিল; আমার মনের অবস্থা ততই কেমন খারাপ হোচ্ছিল; এ অবস্থায় কি আর রোজনামচা লিখে রাখবার ইচ্ছা হয়। বিশেষ যে পথে গিয়েছিলাম, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন; নূতন ব্যাপার নূতন দৃশ্য কিছুই আমার সম্মুখে পড়ে নি; ডাইরি না লিখ্‌বার ইহাও একটী কারণ।

শ্রীনগর হিমালয়ের মধ্যে হোলেও সেটা লোকালয়। আমি লোকালয়ে পৌছিয়েছি। শ্রীনগরে আমার অনেক বন্ধু, অনেক ছাত্র আছেন, তাঁদের সঙ্গে—কয়েক দিন কাটিয়ে আমি ফিরে আসি।

এখন আমার বিদায় গ্রহণের সময়। হিমালয়ের পরম পবিত্র মহিমা আমি কীর্ত্তন করিতে পারি নাই; যেটী যেমন কোরে বোল্‌লে ভাল হো'ত; যেটী যে ভাবে বর্ণনা কোরলে ঠিক কথাটী বলা হোত আমার দুর্ব্বল লেখনী তাহা বো'ঝাতে পারে নাই। যে দৃশ্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান মনেরশিল্পী নিজের দুর্ব্বল হস্তের অযোগ্যতায় কাতর হোয়ে তুলিকা দূরে নিক্ষেপ কোরে সেই মহান দৃশ্যের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই কৃতার্থ হ'ন আমি সেই হিমালয়ের কথা বোল্‌তে গিয়েছিলাম; আমার স্পর্দ্ধা কম নয়। আর যে রকম কোরে দেখ্‌লে ঠিক দেখা হোত, আমার তা মোটেই হয় নি। আমি শ্মশানের জলন্ত অগ্নিশিখা বুকে নিয়ে হিমালয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পোড়েছিলাম, আমি শুধু দুই হাতে হিমালয়ের শীতল বাতাস, হিমালয়ের তুষার বরফ বুকে চেপে ধরেছি; চারি দিকে যে স্বর্গের দৃশ্য জগৎপাতার অনন্ত মহিমা অনুক্ষণ কীর্ত্তণ করত আমার কি সব দেখ্‌বার শুন্‌বার সময় ছিল, না তেমন আমার মন ছিল। আমি তখন মাথা উঁচু কোরে কি আকাশের দিকে স্বর্গের দিকে চাইতে পারতুম। দেখতেই তখন আমার ছিলনা। আর হৃদয়ের মধ্যে যে কবিত্ব থাক্‌লে মানুষ গাছের ফল, নদীর জল, ফুলের সৌন্দর্য্য, নির্ঝরিনীর কলতান, বিহঙ্গের হৃদয়মনমোহকারী কূজন বর্ণনা কোরতে পারে আমার সে কবিত্ব কোন দিনই ছিলনা; আমার কবিত্ব সেবার অবকাশ বা সুবিধা কোন দিনই হয় নাই; সুতরাং কিছুই বলা হয় নাই। আমার এই অতি সামান্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত পোড়ে যদি কারো প্রাণে হিমালয় দর্শন ইচ্ছা প্রবল হয় তাহা হোলেই আমার এ সব লেখা সার্থক হবে, এবং সেই হিমালয়ের দেবতা ভগবানের চরণে যদি কেহ অগ্রসর হোতে পারেন তা হোলে আমার জীবন সার্থক হবে।

স্বরলিপি।

কথা—শ্রীমতী সরলা দেবী।　　সুর—মহীসূরী

খাম্বাজ-কাওয়ালী।*

হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও
আজি মধুর অতীত কাল!
অতীত-উৎসব, আন এ ভারতে,
আনহে, আনহে
মধুমাসে আজি মধুর ইন্দ্রজাল!
কোকিলকূজন-মুখরিত উপবন
মাঝে, আনহে,
মঞ্জুল চরণ-বিতাড়ণ, মঞ্জু অশোক লাল।
চম্পক পেলব, চূতমুকুল নব,
আনহে, আনহে,
পূর্ণদোহদ-বকুল পুষ্পজাল!
রুণুরুণু ঝন ঝন　বলয় শিঞ্জন
সাথে, আনহে,
চকিত লোচন, মোহন বাহুমৃণাল!
দোলারোহণ, কলভাষণসহ,
আনহে, আনহে
বারিসিঞ্চন লোল আলবাল!
যূথি সুবাসিত উত্তরী পীত
সাথে, আনহে,
বীণাবাদিত ললিত গীত তাল!
প্রিয়-আলেখন, পুষ্পবিরচন
আনহে, আনহে,
কাল-পুরাতন নিখিল মোহজাল!

* অস্মদ্‌গৃহে "বসন্তোৎসব" উপলক্ষ্যে রচিত।

||৪||　র্স^{0} । [স^{2} র্স^{1} র্নো^{1} । নো^{1} ধ^{1} —^{1} প^{1} । পধপ^{1} ম^{1} গর^{1} গ^{1} ।
　　　হে　[সু ন্দ র　ব স — ন্ত　বা রে ক ফি

মঁ৪। —২ মঁ১ গ১। মঁ১ নো১ ধ১ নো১। ধনোধ১ প১ ধ১ নো১। র্স১ ধ১
রা ও আ জি ম ধু র অ তী ত কা ল — হে —

ধনো১ র্স১।] র্স২ র্স১ নো১। নো১ ধ১ —১ প১। পধপ১ মঁ১ গর১ গ১।
— —] সু ন্দ র ব স — ন্ত বা রে ক ফি

মঁ৩ র১। গ৩ র১। স৪। —৪ ॥ [মঁ১ মঁ১ গ১ মঁ১। প১ মঁ১ প১ প১। প১
রা — — — ও — [অ তী — ত উ ৎ স ব আ

শেষ।

নো১ ধ১ নো১। র্স১ ন১ র্স২। { র্স১ ন১ র্র্স২। —২ নো১ ধ১।
ন এ ভা — র তে { আ ন হে — আ ন

র্সনো৩ প১। ধ৩ প১। }] র্স১ ন১ র্র্স২। —২ —১ ধ১। ধনো১ র্স১ পধ১
হে — — — }] আ ন হে — — — — — —

নো১। ধনো১ র্স১ নোধ১ পমঁ১। মঁ১ মঁ১ গ১ মঁ১। পধপ১ মঁ১ প১ প১।
— — — — — অ তী — ত উ ৎ স ব

প১ নো১ ধ১ নো১। র্স১ ন১ র্স২। নর্স১ র্র১ র্স১ র্স১। —১ নো১ নো১ ধ
আ ন এ ভা — র তে ম — ধু মা — সে আ জি

পধ১ প১ মঁ১ গ১। মঁ১ প১ ধ১ নো১। র্স১ ধ১ ধনো১ র্স১ ॥
ম ধু র ই — ন্দ্র জা ল হে — — —

(আ-প্র)

[ধ১ ধ১ ধ১ ধ১। ধ১ —১ ধ১ ধ১। ধ১ ধ১ ধ১ ধ১। ধ১ ধ১ ধ১
[কো — কি ল কূ — জ ন মু খ রি ত উ প ব
রু ণু রু ণু ঝ ন ঝ ন ব ল য় শি — ঞ্জ ন
যূ — থি সু বা — সি ত উ — ত্ত রী — পী —

ধ১। ধনোধ১ প১ নো২। —২ নো১ নো১। ধ১ নো১ র্স২। নো১ ধ১ প১ মঁ১।]
ন মা — ঝে — আ ন হে — — — — — —]
— সা — থে — আ ন হে — — — — — —
ত সা — থে — আ ন হে — — — — — —

প২ র্স১ নো১। নো১ ধ১ ধ১ প১। প১ মঁ১ মঁ১ গ১। গমগ১ র১ গ১ গ১।
ম ঞ্জু ল চ র ণ বি তা — ড় ণ ম — ঞ্জু অ
চ কি ত লো — চ ন মো — হ ণ বা — হু মৃ
বী ণা বা বা — দি ত ল লি ত — গী — — ত

ম৩ র১ । গ৩ র১ । স৪ । —৪ ।। [ম১ ম১ গ১ ম১ । প১ ম১ প১ প১ । প১
শো — — ক লা ল [চ — ম্প ক পে — ল ব চূ
গা — — — ল — দো — লা — রো — হ ণ ক
তা — — — ল — প্রি য় আ — লে — খ ন পূ

নো১ ধ১ নো১ । র্স১ ন১ র্স১ র্স১ । { র্স১ ন১ র্র্স২ । —২ নো১ ধ১ ।
— ত মূ কু ল ন ব { আ ন হে — আ ন
ল ভা — ষ ণ স হ আ ন হে — আ ন
— ষ্প বি র — চ ণ আ ন হে — আ ন

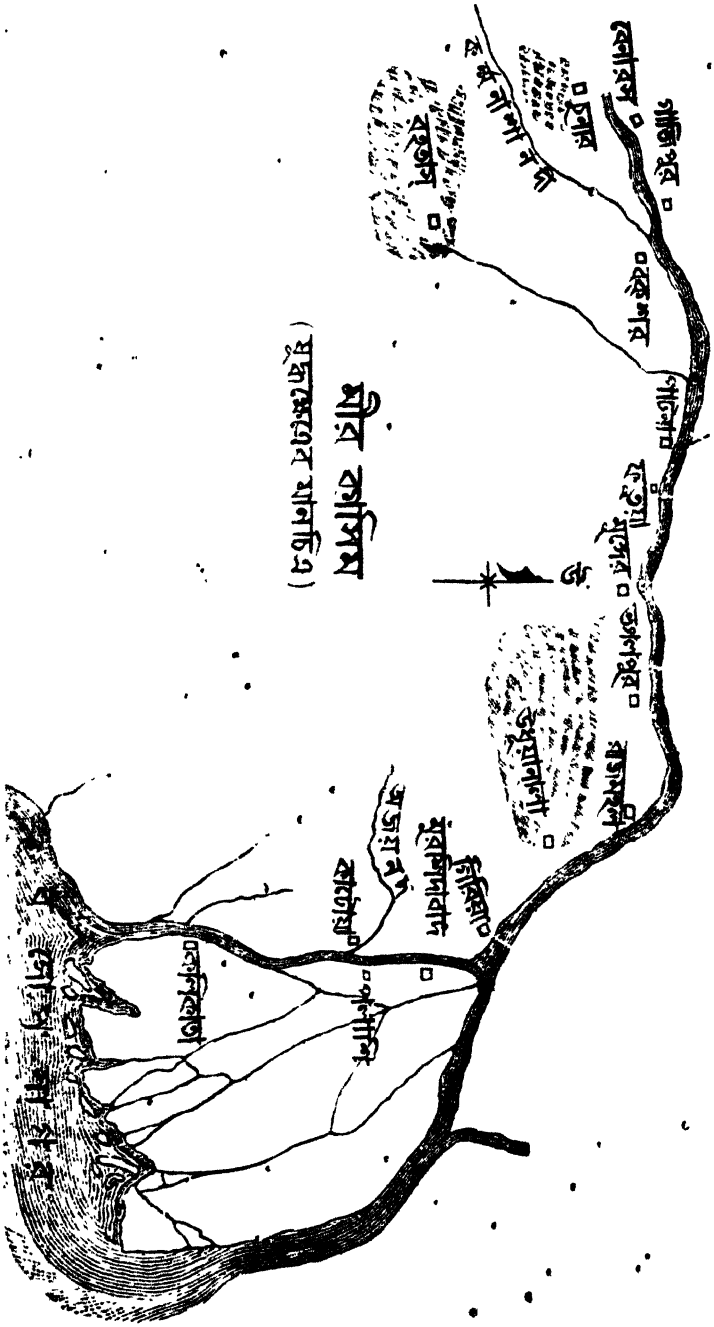
সনো৩ প১ । ধ৩ প১ । }] র্স১ ন১ র্র্স২ । —২ —১ ধ১ । ধনো১ র্স১ পধ১
হে — — — }] আ ন হে — — — — — —
হে — — — আ ন হে — — — — — —
হে — — — আ ন হে — — — — — —

নো১ । ধনো১ র্স১ নোধ১ পম১ । ম১ ম১ গ১ ম১ । পধপ১ ম১ প১ প১
— — — — — চ — ম্প ক পে — ল ব
— — — — — দো — লা — রো — হ ণ
— — — — — প্রি য় আ — লে — খ ন

প১ নো১ ধ১ নো১ । র্স১ ন১ র্স১ র্স১ । নর্স১ র্র১ র্স১ র্স১ । র্স১ নো১ ধ২ ।
চূ — ত মু কু ল ন ব পূ — র্ণ দো — হ দ
ক ণ ভা — ষ ণ স হ বা — রি সি — ঞ্চ ন
পূ — ষ্প বি র — চ ণ কা — ল পু রা — তন

পধ১ প১ ম১ গ১ । ম১ প১ ধ১ নো১ ।। র্স১ ধ১ ধনো১ র্স১ ।
ব কু ল পু — ষ্প জা ল হে — — —
লো — ল আ — ন বা ল হে — — —
নি খি ল মো — হ জা ল হে — — —

(আ—প্র)



মীর কাসিম।

মীর কাসিম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উধুয়ানালার যুদ্ধ।

In one morning, with an army 5000 strong, of whom one fifth only were Europeans, Adams had stormed a position of enormous strength, defeated 40,000 and destroyed 15000 men, captured upwards of a hundred pieces of cannon, and so impressed his power on the enemy that they had no thought but flight.—Col. Malleson.

উধুয়ানালার যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া ম্যালিসন্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজ সেনাপতি মেজর আদাম্‌স পাঁচ সহস্র সেনা লইয়া চল্লিশ সহস্র সিপাহী সুরক্ষিত সুদৃঢ় শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া, পঞ্চদশ সহস্র অরাতি নিধন করিয়া, শত্রু শিবিরে এরূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন যে, উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করা ভিন্ন তাহাদের মনে অন্য চিন্তা উদিত হইতে পারে নাই!

সমসাময়িক ইতিহাসে এই যুদ্ধের যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বাহুবল অপেক্ষা সমর কৌশলেরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে! পরিণাম ফলের মূল্যানুসারে পলাশির যুদ্ধ যেমন ভারতীয় মহাযুদ্ধের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে, উধুয়ানালার যুদ্ধও সেইরূপ! এই যুদ্ধে মীরকাসিমের আশা ভরসা জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইয়া গিয়াছিল; এই যুদ্ধে ইংরাজের প্রাধান্য দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল; এই যুদ্ধে মোগলরাজসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই হিসাবে উধুয়ানালার যুদ্ধ ভারতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রগণ্য।

ভাগীরথীতীরে উধুয়ানালার গিরিসঙ্কটের পার্শ্বে নবাবী আমলে একটি ক্ষুদ্র কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার একপার্শ্বে ভাগীরথী, অন্য পার্শ্বে পার্শ্বে উধুয়া, এবং সুদৃঢ় প্রাচার বেষ্টিত বলিয়া দুরাধিগম্য। এই পুরাতন কেল্লার নিকট দিয়া মুরশিদাবাদ হইতে পাটনা পর্য্যন্ত বাদশাহী রাজপথ চলিয়া গিয়াছিল। ভাগীরথীতীরে সরল রাজপথ, তাহার পার্শ্বদেশেই গভীর জলগণ্ড বা ভাগীরথী "দামস্," তাহার অপর পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে দেহ বিস্তার করিয়া স্থানটিকে সহজেই দুরাধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিল। মীরকাসিম এইস্থানে নূতন দুর্গ প্রাচীর রচনা করিয়া, তদুপরি সারি সারি কামান সাজাইয়া শত্রু-

সেনার গতিরোধ করিবার জন্য বহুসংখ্যক সিপাহী সংস্থাপন করিয়াছিলেন; গিরিয়ার যুদ্ধে যাহারা পরাজিত হইয়াছিল, তাহারাও এইখানে আসিয়া নবাব শিবিরে সম্মিলিত হইয়াছিল। এইরূপে উধুয়ানালার নবাব-শিবির বহু সহস্র সিপাহীর আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর দীর্ঘকাল গোলাবর্ষণেও ভেদ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; বাহুবলে বা সংগ্রাম কৌশলে ইহা যে কদাপি শত্রু কবলে নিপতিত হইবে, এমন কথা স্বপ্নেও লোকে বিশ্বাস করিতে পারিত না।

মেজর আদাম্‌স এইখানে উপনীত হইয়া পাকীপুর নামক দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে শিবির সংস্থাপন করিয়া দুর্গাবরোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে অগ্রসর হইবার সুবিধা নাই, নবাব-সেনাও সর্ব্বদা গুলিবর্ষণ করিয়া ইংরাজের গতিরোধ করিতে তৎপর রহিয়াছে,—এরূপ অবস্থায় ইংরাজ সেনাপতি ভাগীরথী তীরে তিনটি তোপমঞ্চ বাঁধিয়া তথা হইতে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তোপমঞ্চ বাঁধিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না; সুশিক্ষিত শিল্পকারগণ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাহা সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম; তথাপি মেজর আদাম্‌স তিন সপ্তাহে তিনটি মাত্র তোপমঞ্চ রচনা করিতে সক্ষম হইলেন।—ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, নবাবসেনা কিরূপ সতর্ক দৃষ্টিতে গুলিবর্ষণ করিতেছিল!

চতুর্ব্বিংশতি দিবসে ইংরাজের তোপমঞ্চ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা তোপমঞ্চে দুর্গাবরোধের উপযোগী পরাক্রান্ত কামান উত্তোলন করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু তাহার প্রচণ্ড পীড়নেও দুর্গ প্রাচীরের কিছুই হইল না! *

দুর্গাবরোধের সমর কৌশল চিরদিনই একরূপ;—যথাসাধ্য দুর্গমূলের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা। সে চেষ্টা সাধন করিবার জন্য তোপমঞ্চ হইতে নিরন্তর গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিতে হয়, এবং সেনাবল লইয়া সেই রন্ধ্রপথে অথবা প্রাচীরারোহণে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। উধুয়ানালায় আসিয়া মেজর আদাম্‌স ইহার কোন পথেরই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না! জলগড় অতিক্রম করিতে না পারিলে সসৈন্যে দুর্গমূলে সমবেত হওয়া অসম্ভব, দুর্গপ্রাচীর ভেদ করিতে না পারিলে দুর্গপ্রবেশ করা সহজ নহে! মেজর আদাম্‌স যখন উভয়দিকেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন,

* Even when, on the twenty fourth day, he opened fire from the three batteries he had constructed, the nearest of which was about three hundred yards from the enemy's intrenchment, he found, that though manned with seige-guns, the fire produced little or no impression on the massive ramparts which Mir Kasim had thrown up.——Malleson's Decisive Battles of India, P. 167.

তখন তাঁহার শক্তি সামর্থ্য, আশা ভরসা সকলই অবসন্ন হইয়া পড়িল। স্বয়ং ম্যালিসনও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। *

এইরূপ "নযযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় অবস্থান করাই কিন্তু ইংরাজ সেনাপতির সৌভাগ্যের কারণ হইয়া উঠিল। কিছু দিনের মধ্যেই নবাব সেনা বুঝিতে পারিল যে, উধূয়ানালা জয় করা ইংরাজের কার্য্য নহে; তখন তাহারা দুর্গরক্ষায় শিথিলযত্ন হইয়া নৃত্যগীতে চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল; † এ দিকে ইংরাজ সেনাপতি নিশিদিন কেবল দুর্গজয়ের চিন্তা লইয়াই নিপুণভাবে সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ সেনাপতির সৌভাগ্যবলে অল্পদিনের মধ্যেই "গোয়েন্দা" মিলিল; মীরকাসিমের বেতনভোগী পল্টনভুক্ত এক ব্যক্তি এক দিবস নিশাযোগে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া ইংরাজশিবিরে উপনীত হইল। এই ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে কোম্পানীর সরকারে চাকরী করিত, পরে মীরকাসিমের পল্টনভুক্ত হইয়াছিল; সে মীরকাসিমের লবণ খাইয়াও তাহার সর্ব্বনাশ করিতে সম্মত হইল! ইহার নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই, কিন্তু ইহার পরিচয় দিবার সময়ে সকলেই ইহাকে "ইংরাজ-সৈনিক" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন!

মেজর আদাম্‌স উৎফুল্ল চিত্তে বিশ্বাসঘাতক নবাব সৈনিকের গুপ্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন; জলগড়ের সকল স্থান সমান গভীর নহে, একস্থান পারাপারের যোগ্য, এবং তাহার সন্ধান লইয়া সৈনিকের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না। ‡

আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করা হইল না, সেই রাত্রিতেই ইংরাজসেনা অস্ত্র শস্ত্র মাথায় বহিয়া বহুকষ্টে জলগড় উত্তীর্ণ হইয়া নিঃশব্দে দুর্গমূলে সমবেত হইতে লাগিল। প্রাচীরের বাহিরে যে দুই চারিজন নবাবসেনা নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন ছিল, তাহারা বাক্‌নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বেই সঙ্গীণের আঘাতে দেহত্যাগ করিল! ইংরাজ সেনা নিরুদ্বেগে অপ্রতিহত গতিতে প্রাচীরারোহণ করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল; দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র সহস্র সহস্র ইংরাজসেনা জলস্রোতের ন্যায় দুর্গাভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নবাবসেনা যখন নিদ্রা ভঙ্গে উঠিয়া দেখিল দুর্গ মধ্যে শত্রুসেনা, তখন তাহাদের

* Nearer he could not advance his guns, nor on the other face could he move his infantry, for the morass, saturated at that time of the year, covered the position. The difficulties which presented themselves on all sides were, indeed, sufficient to make the bravest despair.—Malleson's Decisive Battles of India, P. 167.

† Scott's History of Bengal.

‡ Scott's History of Bengal.

বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গেল! বিনা যুদ্ধে কেমন করিয়া দুর্গজয় হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সকলেই পলায়নপর হইল। মীর কাসিমের সেনানায়কগণ অনন্যোপায় হইয়া নবাব সেনাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার আশায় পলায়নপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; "যে পলায়ন করিবে তাহাকেই গুলি করিয়া মারিব,—যুদ্ধ করিব, প্রত্যাবর্ত্তন করিব, প্রাণান্তেও পলায়ন করিব না"—এই সঙ্কল্পে তাঁহারা বদ্ধ পরিকর হইলেন, কিন্তু কেহ সে কথায় কর্ণপাত করিল না; তখন তাঁহারা আত্মসেনার উপরেই গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; পলায়ন পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, সেনার উপর সেনা আসিয়া স্তূপে স্তূপে পতিত হইতে লাগিল; এইরূপে পঞ্চদশ সহস্র নবাব-সেনা উধুয়ানালার দুর্গে স্বপক্ষীয় সেনানায়কের কঠোর আদেশে নিহত হইল! * ইহার পর ইংরাজদিগকে আর দুর্গজয়ের জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সুমরু, মারকার, আরাটুন প্রভৃতি বিদেশীয় সেনাপতিরা যুদ্ধ করিলেন না তাঁহারা ইংরাজের হস্তে বিজয়মুকুট সমর্পণ করিয়া মীর কাসিমের জন্য একমুষ্টি চিতাভস্ম লইয়া উধুয়ানালা হইতে পলায়ন করিলেন।

ইংরাজলিখিত সাময়িক ইতিহাসে ইহাকে অশ্রুতপূর্ব্ব মহাসমর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। + মীর কাসিম কিন্তু ইহাকে অন্য রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন এই কলঙ্ক কাহিনী শ্রবণ করিলেন, তখন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ ৯ সেপ্টেম্বর) ইংরাজ সেনাপতিকে নিম্নলিখিতরূপ পত্র প্রেরণ করিলেন :—

"That for these three months you have been laying waste the king's country with your forces, what authority have you? If you are in possession of any Royal Sunned for my dismission you ought to send me either the original, or a copy of it, that having seen it, and shown it to my army, I may quit this country, and repair to the presence of His Majesty. Although I have in no respect intended any breach of public faith, yet Mr. Ellis, regarding not treaties or engagements, in violation of public faith, proceeded against me with treachery and night-assaults. All

* It was yet barely day-light and the enemy Confounded by the suddenness of the attack coming from several quarters, were thrown into inextricable confusion, to add to which, their own guard stationed at the bridge over the Nullah, had orders to fire upon any one attempting to cross, with a view of compelling the troops to resistance,—a duty which was performed with fearful effect; a heap of dead speedily blocked up that passage.—Broome's Bengal Army, Vol. 1. 385.

+ Broome's Bengal Army.

my people then beleived that no peace or terms now remained with the English, and that wherever they could be found, it was their duty to kill them. With this opinion it was that the aumils of Murshidabad killed Mr. Amyatt, but it was by no means agreeable to me that that gentleman should be killed. On this account I write; if you are resolved on your own authority to proceed in this business, know for a certainty that I will cut off the heads of Mr. Ellis and the rest of your chiefs and send them to you.

Exult not upon the success which you have gained merely by treachery and night assaults, in two or three places over a few jamadars sent by me. By the will of God, you shall see in what manner this shall be revenged and retaliated. †

উধূয়ানালার যুদ্ধে মীর কাসিমের সর্ব্বনাশ সুসম্পন্ন হইল। তিনি নিজে তাহা অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিলে কি হইবে; অতঃপর নবাব-সেনা আর ইংরাজের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না!

মীর কাসিমের অনুগ্রহে আরমানী সেনানায়কগণ সবিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আরাটুন অথবা খোজা গ্রেগরী নামক আরমানী সেনাপতি মীর কাসিমের দরবারে গর্গীন খাঁ নামে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মীর কাসিম তাঁহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন বলিয়া তোপখানার সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেন যে, তিনি বীরোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নাই বলিয়াই মীর কাসিমের পরাভব হইয়াছিল। কিন্তু গর্গীন খাঁ আত্মকর্ত্তব্য পালন করিতে শিথিলতা করিলেন কেন, সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে তাহার কোন উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

গর্গীন খাঁর ভ্রাতা খোজা পিক্রু বাংলার ইতিহাসে সুপরিচিত। তিনি সিরাজদ্দৌলার সময় হইতেই ইংরাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক ভ্রাতা ইংরাজ পক্ষে, অপর ভ্রাতা নবাব দরবারে বর্ত্তমান থাকায় মেজর আদাম্‌স খোজা পিক্রুর সহায়তায় গর্গীন খাঁকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ কথা অন্য লোকে জানিত না; মেজর সাহেব খোজা পিক্রুর উপর কোন কারণে অত্যাচার করায় তিনি কলিকাতার ইংরাজদরবারে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতেই ইহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ‡

† Vansittart's Narrative, Vol III, 468—369.

‡ Your petitioner begs leave to observe to this Hon'ble Board, at Ouda Nullah, a place where the enemy had strong works and great forces, your petitioner by direction from Major Adams wrote two letters to Marcan

ইহা লোক পরম্পরায় মীর কাসিমেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল এবং গর্গীন খাঁ তজ্জন্য নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন। গর্গীন খাঁর সঙ্গে ইংরাজদিগের যেরূপ আত্মীয়তার সূত্রপাত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার সহায়তায় উত্তরকালে আরও অনেক উপকার লাভের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাঁহার হত্যাকাণ্ডে সে পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। *

মীর কাসিমের একান্ত বিশ্বাসভাজন খোজা গ্রেগরী ওরফে গর্গীন খাঁ সে সত্য সত্যই ইংরাজদিগের সহায়তা সাধন করিয়াছিলেন, মেজর আদাম্‌স যখন কলিকাতায় তাঁহার হত্যা সংবাদ প্রেরণ করেন, তৎকালে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছিলেন। মেজর সাহেবের সেই পত্রখানি এইরূপ :—

"Dear Sir—We had a report yesterday that Coja Gregory has been wounded some days ago by a party of his Mogul cavalry who mutinied for want of their pay between Sovage Gurree and Nabab Gunj it is just now confirmed by a hurcarra arrived from the enemy, with this addition that he died next day and that 40 principal people concerned were put to death upon the occasion; though it was imagined that the Moguls were induced to affront and assault Coja Gregory by Cossim Ally Khan, who began to be very jealous of him on account of his good behaviour to the English.", †

এই সকল ঘটনা সংঘটিত না হইলে,—কেবল বাহুবলে উধুয়ানালার সমর জয় করিয়া মেজর আদাম্‌স পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে অদ্বিতীয় বীর বলিয়া জয়মাল্য প্রাপ্ত হইতেন। তিনি সামান্য সেনাদল লইয়া প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও যে সকল যুদ্ধ জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাতে নবাবের সেনানায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকিলেও, মেজর আদাম্‌সের যশ কলঙ্কিত হইতে পারে না। "মারি অরি পারি যে কৌশলে"—ইহা সকল দেশেই যুদ্ধনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং আরমানী বণিকের সহায়তায় সমর জয় করিয়া থাকিলেও তাহাতে আরমানী সেনাপতিরই কলঙ্ক হইতে পারে, ইংরাজ সেনাপতির পক্ষে তাহা ইতিহাসে গৌরবের কারণ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে।

and Arratoon two Armenion officers, who, amongst others, commanded the enemy's forces:—Long's Selections, Vol 1 339.

* His brother commanded the artillery of the Nawab at Patna, and was subsequently murdered there, the Nawab suspecting him of being too friendly to the English. Had he been alive the massacre (of patna) might have been prevented through his influence—Revd. Long.

† Long's Selections Vol. 1, 333.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পাটনার হত্যাকাণ্ড!

It is true you have Mr. Ellis, and many other gentlemen in your power; if a hair of their heads is hurt, you can have no title to mercy from the English, and you may depend upon the utmost fury of their resentment, and that they will pursue you to the utmost extremity of the earth; and should we unfortunately not lay hold of you, the vengeance of the Almighty cannot fail overtaking you, if you perpetrate so horrid an act as the murder of the gentlemen in your custody.—Major Adams.

উদুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীর কাসিম হিতাহিত জ্ঞানশূন্য উন্মাদের ন্যায় দুৰ্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার সরল হৃদয় কুটিল পন্থা অবলম্বন করিল; দুই চারি জন বিশ্বাসঘাতকের আচরণে প্রতারিত হইয়া সকলকেই সন্দেহের পাত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; লোকচরিত্র অনুধাবন করিবার শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ইংরাজ সেনাপতি এবং গবর্ণর তাঁহাকে পাপ সংকল্প হইতে নিরস্ত করিবার জন্য পত্র লিখিলেন, বিশ্বস্ত প্রধানামাত্য আলি ইব্রাহিম খাঁ সমুচিত হিতবাক্যে মতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল!

মীর কাসিমের মানসিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উন্মাদ বলিয়া ক্ষমা করিতেই ইচ্ছা হয়। যাহাদের বাহুবলের ভরসায় তিনি স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই তাহারা যখন একে একে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, তখন আর মীর কাসিম আত্ম সংবরণ করিতে পারিলেন না! * প্রতি দিবসের ঘটনা প্রবাহ তাঁহার সন্দেহ প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিতে লাগিল!

আরাব আলি খাঁ নামক একজন বিশ্বাসী সেনানায়কের উপর মুঙ্গের দুর্গের শাসনভার সমর্পণ করিয়া মীর কাসিম পাটনাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। ইংরাজেরা ১লা অক্টোবর তথায় উপনীত হইলে নবম দিবস দুর্গাবরোধের পর কেল্লাদার আরাব আলি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার সহায়তায় কেল্লা জয় করিয়া দুই সহস্র সিপাহী কারারুদ্ধ করিলেন! †

* The recurrence of such serious disasters had rendered Meer Kossim Khan suspicious of all his officers, and more especially of Goorgeen Khan who was reported to be in communication with the English, through the medium of his brother Aga Pedroos.—Broome's Bengal Army Vol. 1. 388

† The English having had Monghyr delivered up to them by the

মুঙ্গেরের নবাব সেনা ইংরাজ পল্টনে প্রবেশ করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিতেও ত্রুটি করিল না! ‡ এই সকল সংবাদ যখন মীর কাসিমের কর্ণগোচর হইল, তখন আর কেহই সাহস করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের আদেশ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন!

রাজা রামনারায়ণ, জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ, রাজনগর নিবাসী বৈদ্যরাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি মান্যগণ্য ইংরাজ হিতৈষী পাত্রমিত্রগণ নির্দ্দয় রূপে নিহত হইলেন! গর্গীন খাঁ পটমণ্ডপের মধ্যে স্বকীয় শরীররক্ষকদিগের অস্ত্রাঘাতেই পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। সেনানায়কদিগের মধ্যে বহুলোকে এইরূপে নিধন প্রাপ্ত হইলে ইংরাজ বন্দীদিগের মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ হইল। সুমরু ভিন্ন কেহ তাহাতে অগ্রসর হইল না; সুমরু খৃষ্টীয়ান,—সে নরাধম দস্যু তস্করকেও বর্ব্বরতায় পরাজিত করিয়া নির্ম্মম হৃদয়ে বন্দীদিগের হত্যাকাণ্ডে অগ্রসর হইল! *

পাটনার লোমহর্ষণ হত্যাকাহিনী বর্ণনা করিবার ভাষা বোধ হয় আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই! একমাত্র ডাক্তার ফুলারটন ভিন্ন ইংরাজ নরনারী বালক বালিকা কেহই পরিত্রাণ লাভ করে নাই;—ডাক্তার ফুলারটান কিছুমাত্র রচনা কৌশল বিকাশ না না করিয়া সরল ভাষায় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণ হইতে যেন আজিও অশ্রুকণা ফাটিয়া বাহির হইতেছে! নবাবের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু অথবা মুসলমান, তাঁহারা যে এই পাশব কার্য্যে বীরবাহু কলঙ্কিত করিতে সম্মত হন নাই, তাহাই একমাত্র সান্ত্বনার সংবাদ!

সুমরুর সেনাদল যখন পাটনার কারাকক্ষের নিকট এই অমানুষিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য সমবেত হইল, তখন প্রভাতের তরুণ তপন পূর্ব্বগগনে লোহিত বর্ণে সমুদিত হইয়াছে; সাহেবেরা তখন কেবল চা-পান করিয়াছেন মাত্র। সেই সময়ে সমরু আসিয়া ইলিশ, হে, এবং লসিংটন সাহেবকে আহ্বান করিল। যিনি বাহিরে আসিতেছেন তিনিই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, অল্পক্ষণের মধ্যে এ কথা অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত

treachery of the Governor, Arab Ali khan, were advancing fast towards Patna,—Scott's History of Bengal, 428—429.

‡ Broome's Bengal Army Vol, 1. 390.

* The intelligence of the fall of Monghyr filled up the measure of Meer Kossim Khan's fury, the surrender being attributed to treachery. He now issued the fatal order for the massacre of his unfortunate prisoners but so strong was the feeling in the Subject, that none amongst his officers could be found to undertake the office, until Sumroo offered his services to execute it. - Broome's Bengal Army. Vol. 1. 390

হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা তখন যাহা নিকটে পাইলেন,—শিশি বোতল, চেয়ার কোচ ছুরি কাঁটা,—কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না, তদ্দ্বারা যথা সম্ভব আত্মরক্ষার আয়োজন করিলেন। তখন সেনাদলের প্রতি আদেশ প্রদত্ত হইল; তাহারা আদেশ পালন করিবার জন্য অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু তাহারাও শিহরিয়া উঠিল, তাহারাও নিরস্ত্র দেহে আত্মাঘাত করিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিল,—"এ কি বীরোচিত ব্যবহার,—এ যে কেবল কশাইখানার হত্যাকাণ্ড,—বন্দীগণকে অস্ত্র শস্ত্র প্রদান কর, আমরা যুদ্ধ না করিলে কাহারও অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না!!"

এ ধিক্কারে নরাধম সুমরুর হৃদয় বিচলিত হইল না, সে রোষকষায়িত-লোচনে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, যে সৈনিক ধিক্কার দিয়াছিল তাহাকে মুষ্ট্যাঘাতে ভূপাতিত করিয়া পুনঃ পুনঃ উত্তেজনাপূর্ণ বচনে আদেশ প্রদান করিতে লাগিল।* তখন আর কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারিল না! পরদিন প্রভাতে এই সকল স্তূপাকার মৃতদেহ কূপ মধ্যে নিপাতিত হইল; তখন পর্য্যন্তও গলষ্টন আহত কলেবরে জীবিত ছিলেন, সিপাহীরা তাঁহাকে রক্ষা করিবার পরামর্শ করিতেছিল, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে জীয়ন্তেই কূপে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল! যাহারা পীড়িত ছিল তাহারাও রক্ষা পাইল না, ইলিশের শিশু সন্তানের সদ্যোজাত প্রফুল্ল কুসুম তুল্য সুকুমার মুখচ্ছবিও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না! †

এই হত্যাকাহিনী যখন কলিকাতার ইংরাজ দরবারের কর্ণগোচর হইল, তখন সমস্ত কলিকাতা যেন গভীর বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! ইংরাজ দরবারের অধিবেশনে কেহ সহসা হৃদয় বেগ প্রকাশ করিতে পারিলেন না; রুদ্ধ কণ্ঠে বাষ্পাকুল-লোচনে হৃদয় নিহিত প্রতিহিংসা সাধনেচ্ছায় সকলেই কিয়ৎকাল হা হুতাশ করিয়া

* Their very executioners, struck with their gallantry, requested that arms might be furnished to them, when they would set upon them and fight them till distroyed, but that this butchery of unarmed men was not the work for Sipahis but for "Hullal Khores." Sumroo enraged, struck down those that objected, and compelled his men to proceed in their diabolical work until the whole were slain.—Broome's Bengal Army, Vol. 1, 391

† Neither age nor sex was spared, and Sumroo consummated his diabolical villany by the murder of Mr. Ellis's infant child.—Ibid

‡ It is therefore agreed and ordered that a general deep mourning shall be observed in the settlement for the space of fourteen days to commence next wednesday, the 2nd of November.

অবশেষে স্থির করিলেন যে, "সে দিবস কেহ আর জলবিন্দুও স্পর্শ করিবেন না, সকলে সায়ংকালে ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইবেন, দুর্গপ্রাকারে, রণতরণীতে ভাগীরথীতীরে সর্ব্বত্র শোকসূচক কামানধ্বনি হইবে, চতুর্দ্দশ দিবস ইংরাজ মাত্রেই শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন, এবং যে কেহ মীরকাসিমকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে পারিবে তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা হইবে।" ‡

যাঁহারা মীর কাসিমের নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞায় এইরূপে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ইংরাজ রাজশক্তি বিস্তারের উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শবরাশির উপর উত্তরকালে স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইয়া অদ্যাপি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে! উক্ত স্মৃতিচিহ্নে যে ফলকলিপি সংযুক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে এখনও হৃদয়মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, এখনও মীর কাসিমের অমানুষিক অত্যাচার যেন নূতন ভাবে জাগরিত হইয়া উঠে,—এখনও যেন মনে হয়, হায়! কতদিনে ধরাপৃষ্ঠ হইতে এই সকল পাশবশক্তির উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার চিরদিনের মত বিদূরিত হইবে!

মীর কাসিম যতদিন রাজধর্ম্ম পালন করিবার জন্য ইংরাজ বণিক সমিতির অন্যায় উৎপীড়ন হইতে প্রজারক্ষার আশায় প্রাণপণে দেশরক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন, ততদিন ইংরাজ গভর্ণর এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস পর্য্যন্তও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছিলেন। মীর কাসিমের পক্ষে ন্যায় এবং সুবিচার লাভ

That the morning of that day shall be set apart and observed as a public fast and humiliation, and that intimation be accordingly given to the chaplains to be prepared with a sermon and forms of prayer suitable to the occasion.

* * * * * * *

After paying this necessary duty to the memory of our countrymen, we are further agreed and determined to use all the means in our power for taking an ample revenge on the persons who may have been concerned in this horrid execution, and with a view of deterring in future all ranks and degrees of people from ordering or executing such acts of barbarity.

Resolved therefore that a Manifesto of the action be published throughout all the country, with a proclamation promising an immediate reward of a Lackof Rupees to any person or persons who shall seige and deliver op to us Cossim Aly Khan and that he or they shall further recieve such other marks of favor and encouragement as may be in our power to show in return for this act of public justice.—Long's Selection, Vol. I. P 335—336.

করিবার কিছুমাত্র বাধা ছিলনা। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থার পরিচয় পাইয়া বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারগণ মীর কাসিমেরই পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং ইলিশ, আমিয়ট প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করিয়া মীর কাসিমের সঙ্গে সখ্য সংস্থাপনের জন্যই আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

* আমিয়টের হত্যাকাণ্ডে সহসা যুদ্ধানল প্রজ্জলিত না হইলে, পাটনায় হত্যাকাণ্ডে মীর কাসিমের নৃশংস স্বভাব পরিব্যক্ত না হইলে, ভান্সিটার্টের ন্যায় শুভানুধ্যায়ী ইংরাজ গভর্ণরের কল্যাণে মীর কাসিমের সকল আশাই পূর্ণ হইত। কিন্তু হায়! ডিরেক্টারগণের উক্ত পত্র ভারতবর্ষে উপনীত হইবার বহু পূর্ব্বেই মীর কাসিমের জীবননাট্যাভিনয়ে দীর্ঘ যবনিকা নিপতিত হইয়া গেল!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দেশ-ত্যাগ!

Conquests are not our aim and if we can secure and preserve our present possessions in Bengal, we shall rest well satisfied—Court's letter.

বিলাতের "কোর্ট অব ডিরেক্টর" রাজ্য বিস্তারের জন্য লালায়িত ছিলেন না। তাঁহারা স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, রাজ্য বিস্তার করা তাঁহাদের লক্ষ্য নহে, বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের বাণিজ্য বিস্তারের যে সকল সুবিধা হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট সন্তোষের কারণ হইবে। কিন্তু এদেশের ইংরাজ মাত্রেই বৈরনির্য্যাতনের জন্য, মীর কাসিমকে সমুচিত শিক্ষাদান করিবার জন্য,—সম্ভব হইলে, তাঁহাকে সশরীরে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার জন্য, এরূপ দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ইংরাজ সেনা মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াই নিবৃত্ত হইতে পারিল না। মুঙ্গের হইতে পাটনা, পাটনা হইতে কর্ম্মনাশার তীর পর্য্যন্ত মীর কাসিমের পশ্চাদ্ধাবন করিবার আয়োজন হইল।

মীর কাসিমের আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। তিনি মহিলাবর্গকে নিরাপদে রক্ষণ করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে রহোতাসের কেল্লায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তথা হইতেও তাহাদিগকে স্থানান্তর করিতে হইল; অবশেষে স্বয়ং সসৈন্যে দেশত্যাগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না।

ইংরাজেরা যখন পাটনা অধিকার করেন, মীর কাসিম তখন বিক্রম সরাই নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন; তথা হইতে তাঁহাকে সাসিরামে গমন করিতে

* Court's letter dated 8 "Feb 1764,, as published in Long's Selections, Vol. 1 370 372.

হইল। সেনানায়কগণের মধ্যে তুমুল গৃহকলহের সূত্রপাত হইল; মীর নজক খাঁর ইচ্ছা তিনি প্রধান সেনাপতি হন। তিনি স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে সেনাচালনার ভার প্রদান করিলে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের অথবা বুন্দেলাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজ কবল হইতে রাজ্যোদ্ধার করিয়া দিবেন। মীর কাসিম আর সেনানায়কের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সাহস পাইলেন না, তিনি সসৈন্যে দিল্লীর বাদসাহ এবং তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী অযোধ্যার উজীরের শরণাগত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে উজীরের নিকট হইতে এক খণ্ড "কোরাণ সরিফ" সহ আশ্রয়দানপত্র সমাগত হওয়ায় মীর কাসিম অবিলম্বে উজীরের রাজ্যে গমন করিবার জন্য বারানশীতে উপনীত হইলেন। বারানশী তৎকালে উজীরের একান্ত বিশ্বাসভাজন বলবন্ত সিংহের রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। মীর কাসিম তথায় বিশ্রাম লাভ করিয়া সম্রাট সদনে উপনীত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজেরা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা যখন দেখিতে পাইলেন যে, মীর কাসিম বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের হাতের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তিনি যাহাতে সম্রাটের নিকট সমাদর ও আশ্রয় লাভ করিতে না পারেন, তদভিপ্রায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে সম্রাটসদনে আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন।

দেশত্যাগের সময় মীর কাসিম ধনরত্নাদি সমস্তই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার সুশিক্ষিত সেনাদল তাঁহার অনুগমন করায়, কাহারও পক্ষে সহসা তাঁহার সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিবার সম্ভাবনা ছিল না। সম্রাট অর্থাভাবে বিড়ম্বিত, তিনি অর্থের সন্ধান পাইলে মীর কাসিমের অর্থভাণ্ডার কাড়িয়া লইবেন, এবং মীর কাসিমের সেনাদল বেতন না পাইলে শীঘ্রই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে, বোধ হয় এরূপ অনুমান করিয়াই ইংরাজ গবর্ণর সম্রাটসদনে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।*

ইহাতে মীর কাসিমের আপাততঃ কোনরূপ অনিষ্ট হইল না। তিনি এলাহাবাদে

* May it please your Majesty, Meer Cassim has carried away with him the money due to the Imperial Court, which was collected in the treasury together with all the riches of the conutry. I hope and trust that your Majesty will take from him the balances due to the Court. From the time of Meer Cassim's expulsion, Meer Jaffier Khan has been heartily ready to obey your commands, and we Englishmen are strict allies to him and obedient Servants to your Majesty, but Mahammud Jaffier Khan is exhausted by the expenses of the present war, and the country is ruined by the violences and oppressions of Meer Cassim.—Letter from Governor to the King of Delhi.

সম্রাট ও উজীরের নিকট উপনীত হইবামাত্র পদোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট এবং উজীর উভয়েই তাঁহার রাজ্যোদ্ধারের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় মীরকাসিম উভয়কেই বহুমূল্য উপঢৌকন দানে আপ্যায়িত করিলেন, এবং উজীর তাঁহাকে ধর্ম্ম ভ্রাতা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করায় তিনি নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। *

উজীর সুজাউদ্দৌলা এই সময়ে বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনি স্বকার্য্য সাধন না করিয়া মীর কাসিমের সহায়তা করিতে পারেন না, এই আভাস প্রাপ্ত হইবামাত্র মীর কাসিম স্বয়ং বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মীর কাসিম স্বয়ং সেনা চালনার ভার গ্রহণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুন্দেলখণ্ড পদানত করিয়া রাজসদনে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার বাহুবল ও সমরকৌশলের প্রশংসাবাদে বাদশাহের দরবার পূর্ণ হইয়া উঠিল। অতঃপর আর তাঁহার সহায়তা সাধন করিবার কোনরূপ আপত্তি উত্থিত হইতে পারিল না।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এইরূপ স্থির হইল যে, উজীরের সেনাদল যতদিন মীর কাসিমের রাজ্যোদ্ধারের জন্য নিযুক্ত থাকিবে, ততদিন মীর কাসিম মাসিক একাদশলক্ষ মুদ্রা তন্‌খা প্রদান করিবেন; ভাগীরথী পার হইয়া বিহার আক্রমণ করিতে পারিলেই সেনাগণ এই তন্‌খ পাইতে আরম্ভ করিবে। †

এইরূপ ব্যবস্থা স্থির হইবার পর উজীর সুজাউদ্দৌলা এবং নবাব মীর কাসিম খাঁ সসৈন্যে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া বিহারে পদার্পণ করিলেন। ইংরাজ সেনা বক্সার হইতে পাটনাভিমুখে পলায়ন করিল; এবং মীর কাসিমের গতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া পাটনাদুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল!

* After a short coversation and the usual ceremony of valuable presents of rich cloths, jewels and elephants on the part of Meer Cassim, they mounted an elephant together, and repaired to visit the Emperor. The day following, Meer Cassim returned the vizier's visit, and encouraged by promises of his utmost efforts to recover Bengal from the hands of the English. A few days after he presented to the vizier, jewels to the amount of some lacs of rupees, a chariot drawn by elephants sumptiously caparisoned with embroidered housings to his Begum, and very valuable gifts to his mother, who had honored Meer Cassim with the appellation of Son.—Scott's History of Bengal, P 430–431.

† It was now agreed to march against the English and the allied armies moved to Benares to make preparations, Meer Cassim promising to pay the vizier eleven lacs of rupees monthly, from the day he should cross the Ganges into the province of Bahar, till the conclusion of the war.—Scott's History of Bengal, P 431.

মুসলমান ইতিহাস লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন খাঁ এবং তাঁহার পিতা উভয়েই এই সময়ে বাদশাহের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইংরাজরা গোলাম হোসেনের সহায়তায় বাদশাহকে হস্তগত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বাদশাহ শাহ আলম স্বভাবতঃ সুখাভিলাষী; মীর কাসিম এবং সুজা উদ্দৌলা উভয়েই সমরকুশল কষ্টসহিষ্ণু যুদ্ধাভিলাষী বীরপুরুষ; সুতরাং তাঁহাদের সহিত বাদশাহের একত্রাবস্থানে তাঁহার ক্লেশের অবধি ছিল না। তিনি গোলাম মহম্মদের নিকট স্বহস্ত লিখিত পত্র প্রদান করিয়া তাঁহাকে গোপনে ইংরাজ শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

এই কথা প্রকাশিত হইবার পর বাদশাহের দরবারে গৃহকলহের সূত্রপাত হইল। অর্থই সকল অনর্থের মূল হইয়া উঠিল। এই সময়ে গোলাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন না; তিনি মীর কাসিমের প্রধানামাত্য আলি ইব্রাহিম খাঁর মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া উত্তরকালে ইতিহাস রচনা করিবার সময়ে যাহা লিখিয়া লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত শোচনীয় কাহিনী! *

মীর কাসিম অধিক দিন তন্‌খা দিতে অশক্ত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, উজীর সুজা উদ্দৌলা অনুমতি করিলে তিনি অনায়াসেই মুরশিদাবাদ অধিকার করিতে পারেন এবং তখন রাজকর সংগ্রহ করিয়া তন্‌খা দান করিতে আর কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিবে না! সুজা উদ্দৌলা ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি মীর কাসিমকে করতলস্ত করিয়া তাঁহার মহিলাবর্গের ও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারিবর্গের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। †

মীর কাসিম হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। তখনও রহোতসগড় তাঁহার কেল্লাদার রাজা শাহমল্লের হস্তগত ছিল। কিন্তু কেহই আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিল না। সুমরু সসৈন্যে সুজা উদ্দৌলার শিবিরে পল্টনভুক্ত হইল, সুজা উদ্দৌলা রহোতাসগড় হস্তগত করিবার আয়োজন করায় রাজা শাহমল্ল ইংরাজ সেনাপতিকে পত্র লিখিয়া তাঁহার হস্তে দুর্গভার সমর্পণ করিলেন! ‡ মীর কাসিমের রাজ্যোদ্ধারের সুখস্বপ্ন

* During my stay at my father's Jaghire, I heard of the Vizier's confining Meer Cassim and confiscating his effects; the particulars of which as given me afterwards by Ali Ibrahim Khan, I shall now relate—Syed gorlam Hossin.

† A strict exaction of the treasures of Meer Cassim was made by the Vizier from his women, ennuchs, and servants to a great amount.—Scott's History of Bengal, P. 438.

‡ For the protection of my Zenahna it is requisite that the troops should be desptched as soon as possible and make long marches. This is your own business. Iam sincerely dsveoted to your service. Was any

ভাঙ্গিয়া গেল! অতঃপর ইতিহাসে আর তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যে দিন দিল্লীর নগরোপকণ্ঠে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব মীর মহম্মদ কাসিম আলি খাঁর জীবন বায়ু দেহ বহির্গত হইল, সে দিন তাঁহার শবদেহ সমাধিস্থ করিবার সঙ্গতি ছিল না; ছিল কেবল অঙ্গাবরণের একখানি মাত্র জরাজীর্ণ কাশ্মিরী শাল; প্রতিবেশীরা তাহাই বিক্রয় করিয়া কোন রূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিল!*

সমাপ্ত।

বিপ্রলব্ধ।

আমি তখন হরিহরপুরের সব-রেজিষ্ট্রার। অনেকদিন ডিপুটী কালেক্টারি কাজ করিয়াছিলাম; শরীর অসুস্থ দেখিয়া পেন্‌সেনের প্রার্থনা করিলাম, প্রার্থনা গ্রাহ্যও হইল; কিন্তু বাড়ীতে বসিয়া অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী গ্রাম্য চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়-গণের নিকট কেবল পরকুৎসা ও স্বীয় গুণাধিক্যের কথা শ্রবণ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইল না। শুনিলাম হরিহরপুরে এক নূতন সব-রেজিষ্ট্রারি আপিস খুলিবে; জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল, কর্ম্মপ্রার্থী দেখিয়া বিনা আপত্তিতে আমাকে হরিহরপুরের সব্-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিলেন।

গ্রামখানি খুব বড় নয়;—একজন ডিপুটী, ও একজন মুন্‌সেফ, এবং উকীল মোক্তার; কাছারির কর্ম্মচারীই গ্রামের ভদ্রলোক;—নদীর ধারে একটা বড় মহাজনের আড়ত ছিল। আমরাও নদীর ধারে একটা বাড়ীতে থাকিতাম। নদীটী ক্ষুদ্র,—গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অনেক স্থান জলশূন্য হইয়া যায়; আবার শ্রাবণের প্রথমেই নদীর জল, তীরবর্ত্তী দীর্ঘ ঘাসের মধ্যদিয়া অলক্ষিতভাবে আসিয়া আমার ক্ষুদ্র বাগানটির বেড়া ও রঙ্গীন্ পাতার গাছগুলির মূল, ধীরে ধীরে স্পর্শ করিত!

সুষমা আমার সঙ্গে ছিল,—সুষমা আমার দ্বিতীয়-পক্ষীয়া স্ত্রী। পেন্‌সেন গ্রহণের দুই বৎসর পূর্ব্বে, আমার প্রথমা পত্নী, একটী দশম বর্ষীয়া কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মনটা সে সময় বড় উদাস হইয়াছিল,—স্থির করিয়াছিলাম কন্যাটী এক সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে অবশিষ্ট জীবনটা

misfortune to befal us the disgrace would be yours. Other matters will be made fully known to you by my letter to Doctor Fullartton.—letter from Show Mull, Killadar of Rotus, to Major Munro.

* Who eventually died in Dilhi in extreme poverty, his last shawl being sold to pay for his winding sheet.—Asiatic Annual Register.

শেষ করিব—আর বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। প্রথম কার্য্যটী বেশ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল, একটী সৎকুল-জাত বি, এ, পাত্রের হস্তে কন্যার্পণ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কন্যার বিবাহে, আমার উপার্জ্জিত ধনের অন্ততঃ কিয়দংশ নিঃশেষিত হইয়া যাইবে; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বৈবাহিক মহাশয় উদারতা প্রকাশ করিয়া, এক পয়সাও গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশটা ছেলের বাপগুলার উৎপাতে উৎসন্ন গেল,—স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দুই একটা সৎ উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।" কিন্তু বেশ মনে পড়িতেছে, আমার কয়েকটী বন্ধু বলিয়াছিলেন,—"ভায়া, বুঝ্‌তে পার্‌লে না; তোমাকে অপুত্রক ও মৃতপত্নীক দেখিয়া, ভবিষ্যতে সেই বাইস্ হাজার টাকার কাগজ ও জমিদারীটী, বৈবাহিকের হস্তগত করিবার ইচ্ছা। যখন সকলই ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্রের প্রাপ্য,—উপস্থিত দুই এক হাজার টাকা লইয়া ফল কি?" যাহা হউক বৈবাহিক মহাশয় প্রকৃতই যদি তাহা মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ একটা খুব ভুল বুঝিয়াছিলেন,—আমি পর বৎসরই দ্বাদশ বর্ষীয়া শ্রীমতী সুষমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম।

হরিহরপুর স্থানটা সুষমার ভারি ভাল লাগিয়াছিল;—নদীর কলধ্বনি, মাঝির গান, কিম্বা নাতিবৃহৎ পুষ্পোদ্যান বেষ্টিত আমাদের "বাঙ্গলো" খানির স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের, জন্য নয়—ইহার প্রকৃত কারণ, নদীর অপর পারে, প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে হৃদয়পুর নামক গ্রামে, সুষমার সই কনকের শ্বশুরালয়। সে হৃদয়পুরেই আছে জানিয়া, আমাদের প্রতিবেশিনী ক্ষেমী বাগ্‌দিনীকে দিয়া সুষমা প্রায়ই কনকের নিকট পত্র পাঠাইত। বাগ্‌দিনী প্রতিদিনই হৃদয়পুরে, মৎস্য বিক্রয় করিতে যাইত,—সুষমা রঙ্গীন্ কাগজে আঁকা বাঁকা অক্ষরে গদ্য পদ্য কত ছাই ভস্ম লিখিয়া পাঠাইত; আর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের শয়ন গৃহের জানালাটী ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, নদীর দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী অনতিপ্রসর রাস্তাটী দিয়া দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপবৃন্দ, বাঁক স্কন্ধে রাখিয়া, তাহার একদিকে শূন্যভাণ্ডের উপরে কতকগুলি বার্ত্তাকু ও অপক্ক কদলী এবং অপরদিকে এক মলিন বস্ত্রখণ্ডে কিঞ্চিৎ তণ্ডুল বাঁধিয়া আহার্য্যের মহার্ঘ্যতা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে 'খেয়া ঘাটের' দিকে শ্রান্তপদে অগ্রসর হইত; আড়তের কুলীরা সারাদিন নৌকায় পাটের বস্তা তুলিয়া স্নানান্তে উচ্চৈঃস্বরে মহা জটলা করিয়া পরস্পর দেনা পাওনার হিসাব করিতে করিতে গ্রামে প্রবেশ করিত;—এই সময়ের সকল আনাগোনা, হাস্যকৌতুক সৌন্দর্য্যের মধ্যে, যেন একটা মৃত্যুর ছায়া দৃষ্ট হইত,—সকলেই যেন দেনা পাওনার খাতায়, একটা পাতের নির্ভুল হিসাব খাড়া করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; সকলেই যেন জীবন-নাট্যের পরবর্ত্তী গর্ভাঙ্কের বিষয়টার একটু আভাষ দিয়া, বর্ত্তমান দৃশ্যপটখানি উত্তোলন করিবার জন্য ব্যস্ত। সুষমা এই সকল দৃশ্য দেখিত কি না, জানি না,—কিন্তু অনেক সময়েই

তাহার দৃষ্টি "খেয়ার" নৌকায় নিবদ্ধ থাকিত ; মৎস্যশূন্য বজ্‌রা কক্ষে ক্ষেমীকে নৌকা হইতে নামিতে দেখিলেই, তাহার চঞ্চল চক্ষু দু'টী আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিত ; তাহার পর-ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের অক্ষরবিশিষ্ট, কালীমাখা কনকের পত্রখানি বাগ্‌দী বধূর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেই, বোধ হইত যেন সুষমার জীবনের একটা দিনের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। সংসারের ছোট বড়, খুঁটিনাটি কাজগুলি এই ব্যাপারে ভাদ্রের ভরা নদীবক্ষস্থ তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া গিয়া, দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া পড়িত।

আমার বাসায় লোকজন কিছু অল্প। দুই একটী বন্ধুবান্ধব বলিতেন, "তুমি বড় কৃপণ, যদি দুই একটি চাকর বাকর রাখিলে অল্প ব্যয়ে একটু অধিক আয়াস ভোগ করিতে পারা যায়, তবে তুমি সে সুবিধাটা ছাড় কেন ?"—বোধ হয় বন্ধুগণ ঐ কথা বলিয়া আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেন। যা'ই হউক বাসায় অধিক লোকসমাগম দেখিলে আমার যেন "হাঁফ" লাগিত,—এ'টাকে কৃপণতা বা স্বভাবের দুর্ব্বলতা যাহা হয় বলিতে পার। লোকের মধ্যে,—সুষমা, ঝি ও রামলাল তেওয়ারি। রামলাল আমার আপিসে চাপ্‌রাসির কাজ করিত, এতদ্ব্যতীত বাসার বাজার করা, আমার বাগানটি পরিচ্ছন্ন রাখা ও বাহিরের ঘরটি ঝাড়া, তাহার কাজ ছিল,—লোকটা খুব কাজের। সুষমা ছেলে-মানুষ, কাযেই রন্ধন কার্য্যটা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে পারিত না ; স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ কন্যা প্রাতে ও সায়াহ্নে আসিয়া পাকাদি করিতেন,—ঝড়বৃষ্টি, বৃদ্ধা মাতার বুকে ব্যথা ধরা, বা গাভীটির নব-বৎস্য প্রসব প্রভৃতি অনিবার্য্য কারণবশতঃ তাহার অনুপস্থিতি ঘটিলে, নরেন ও সুষমাকে রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিতে হইত, আমিও তাহাদের সাহায্য করিতাম। নরেন্দ্রনাথ আমার কিঞ্চিৎ দূর সম্পর্কীয় মাতৃ-পিতৃহীন ভ্রাতা, আমার প্রথমা স্ত্রী তাহাকে বড় স্নেহ করিতেন। যখন যশোহরের ডিপুটি কলেক্টর ছিলাম, তখন সে আমার নিকট থাকিয়া এন্‌ট্রান্স স্কুলে পড়িত ;—লেখাপড়ার অবকাশ অতি অল্পই ছিল, সভাসমিতিতে খুব যাওয়া আসা করিত ; বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠে সময় ব্যয় করা অপেক্ষা সেটা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনের আয়োজনে ক্ষেপণ যে বিশেষ সুফলপ্রদ, ভায়া তাহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। সভাগৃহে বেঞ্চ সাজান, করতালি প্রদান, ও চাঁদার খাতা হস্তে অনাহার অনিদ্রায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ইত্যাদি, স্বদেশ প্রেমিকের সকল লক্ষণই একে একে দৃষ্ট হইতে লাগিল,—কাযেই শিক্ষকের ভ্রূকুটি ও উপস্থিত পরীক্ষার তাড়না হইতে উদ্ধার করিয়া, ভায়াকে পতিতা ভারতের উদ্ধার জন্য একটা সুযোগ দিবার ইচ্ছা হইল,—ভায়ার স্কুলের মাহিয়ানা দেওয়া বন্ধ করিলাম। ইহার পরই একদিন নরেন কাহাকে কিছু না বলিয়া, হঠাৎ যশোহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ;—পরে শুনিয়াছিলাম সে দেওঘরে তাহার মাতুলের নিকট আছে। এই ঘটনার পর, নরেনের সঙ্গে কেবল দুই একবার দেখা হইয়াছিল। আমাদের হরিহরপুর আগমনের পর আত্মীয়জন নিকটে না থাকায় অনু-

বিধা বিলক্ষণ বুঝিতে লাগিলাম ;—কমিসনের কার্য্যে প্রায়ই মফঃস্বল গমনের আবশ্যকতা হইত, কিন্তু সুষমাকে কেমন করিয়া একাকী ফেলিয়া যাই ; গত্যন্তর না দেখিয়া তাই নরেনকে হরিহরপুরে আনাইয়াছিলাম। নরেন্দ্র কোন কোনও দিন আমার সহিত আপিসে যাইত, কারণ তাহাকে বলিয়াছিলাম সুবিধা হইলেই একটা চাকুরী করিয়া দিব। তখন নরেনের আর পূর্ব্বেকার মত স্বদেশহিতৈষিতা ছিল না,—খুব লম্বা লম্বা চুল রাখিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর তেওয়ারিকে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা শুনাইত।

মানুষের জীবনে একটা সময় আছে, যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থার সহিত কিছুতেই মিলিতে চায় না ; প্রাচীন পুরাণকারগণ পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে একটা রাজ্যের কথা বলিয়াছেন,—সেখানে মানুষ আত্মহারা হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়,—আমার বোধ হয় বিধাতা প্রৌঢ়াবস্থায় মানুষকে সেই রাজ্যে নির্ব্বাসিত করেন। বার্দ্ধক্যের চরমসীমায় দাঁড়াইয়া অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—যৌবন বার্দ্ধক্যের মধ্যবর্ত্তী সেই প্রৌঢ় জীবনের জোড়ের দু'টা কাল দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। যৌবনের উৎসাহ সজীবতা সরলবিশ্বাস এবং বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য ধীরতা ও সংযমের মধ্যে পড়িয়া, মানুষ এই সময়ে নানা অর্থহীন কায করিয়া ফেলে,—বোধ হয় দস্যুতা চৌর্য্য বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মহত্যা প্রভৃতি পাপাচরণ অন্য সময় অপেক্ষা প্রৌঢ়াবস্থায় অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে। আমি সেই অবস্থার কার্য্য বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। হৃদয়ের অন্তস্তলে এককণা প্রচ্ছন্নবহ্নি বহুকাল চাপা পড়িয়াছিল, সেটা কখন প্রধূমিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে জানিতে পারি নাই কিন্তু শীঘ্রই তাহার তাপ অনুভব করিতে লাগিলাম। সুষমা ও নরেন অনেক সময় পরস্পর হাস্য-কৌতুক করে, জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ার সহিত দেবরের রহস্যালাপ বঙ্গবাসীর চক্ষে অগর্হিত দেখায় না সত্য,—কিন্তু সে স্বাধীনতার কি সীমা নাই? বাঙ্গালা সমাজনীতিশাস্ত্রের যে পৃষ্ঠায় কুলবধূর এই স্বাধীনতার ব্যবস্থা আছে, সে'টা কাটিয়া তৎস্থানে একটা অতি কঠোর ধারা জুড়িয়া দিবার ইচ্ছা হইল।

তোমরা আমার কথা শুনিয়া মনে করিতেছ,—আমি একটা কাব্যরস-বর্জ্জিত, অতি কঠিন ও শুষ্ক লোক, কিন্তু এ'টা তোমাদের খুব ভুল। আমার তাৎকালিক জীবনে কবিত্বের অভাব ছিল না। প্রাতে উঠিয়া নদীর ধারে ভ্রমণের অভ্যাস ছিল ; ভ্রমণান্তে বারান্দার সেই বেঞ্চের উপর বসিয়া "নিস্পরোয়া" ভাবে তিন চারি ছিলুম তামাক শেষ করিতাম,—পথদিয়া কতলোক, কত সুখ দুঃখের ভার বহিয়া, অর্থশূন্য প্রলাপ বকিতে বকিতে চলিয়া যাইত,—আমার তাহাতে দুঃখ ছিল না, এক উপেক্ষার কটাক্ষে সকলই উড়াইয়া দিতাম ; বরং নানা দৃশ্যের বৈচিত্র্যে আমার সুখই হইত। তা'র পর রামলালের সকালের কাযটা বেশ বুঝিয়া লইয়া, দরদামটার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়া তাহাকে বাজারে পাঠাইতাম,—শেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নানাহার

সমাপন করিয়া আপিস গমনের ব্যবস্থা হইত। পাঁচটায় কাছারি হইতে প্রত্যাগত হইয়া, সুষমার সহিত গল্প করিয়া অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত। ছেলেরা কোনপ্রকারে দেওয়ালগিরির-কাচ পাইলে, একচক্ষু বন্ধ করিয়া সেই ত্রিকোণ কাচফলকখানি ঘুরাইয়া কত রঙ্গ দেখে, সকল রঙ্গই যেন সমান নয়নানন্দকর,—ইচ্ছা সর্ব্বোৎকৃষ্ট রঙ্গটী বাছিয়া লইয়া, সেই রঙ্গে গাছ মাঠ ঘরবাড়ীগুলা একবার দেখিয়া লয়,—কিন্তু পারে না; আমিও সুষমাকে লইয়া কতভাবে দেখিতাম, সকল অবস্থাতেই নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইত,—সকলই বৈচিত্র্যময়, ভালটী নির্ব্বাচন করিতে পারিতাম না। আমি আবাল্য সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলাম; একটী সেতার ও একটী ছোট হার্মোনিয়ম্ ছিল, দুই একটা গানও বেশ কায়দা করিয়া গাইতে পারিতাম,—কিন্তু শাস্ত্রটায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি হয় নাই। কোন কোন দিন শয়নগৃহে বসিয়া সন্ধ্যার পর হার্মোনিয়মের সুরে মৃদুস্বরে গান ধরিতাম, সুষমাকে তাল দিতে শিখাইয়াছিলাম, তিন তালের স্থানে দুইটা তাল দিলেই উভয়ে হাসিয়া অস্থির হইতাম;—এই প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাজাত হাস্যকৌতুকের মধ্যে, কত সৌন্দর্য্য কত কাব্যরসের আস্বাদ পাইতাম।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের উৎসমুখে এক রাক্ষসী আসিয়া একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর চাপাইয়া দিল এবং গমন কালে কুহকিনী হস্তস্থিত সেই মন্ত্রপূত সম্মোহন দণ্ডটী দ্বারা আমার হৃদয়ে এক দারুণ আঘাত করিল,—সে বেদনা, সে কালিমা আর কিছুতেই গেল না।

সুষমার নিকট আমার মানসিকবিকার ও সন্দেহের কথা কিছুই বলিলাম না,—উদাসপূর্ণ হৃদয়ের দীর্ঘ নিশ্বাসগুলা বেশ চাপিয়া রাখিয়া, ঠিক পূর্ব্ববৎ চলাফেরা করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে মনে হইত, তাহার নিকট আবেগপূর্ণ প্রাণের কথাগুলি প্রকাশ করি; আবার মনে করিতাম,—আমিই অপরাধী, জীবনের এক অশুভ মুহূর্ত্তে একটা বৃহৎ ভুল করিয়া সুষমাকে আবদ্ধ রাখিয়াছি; সেই ভ্রমজাত অবশ্যম্ভাবী ফলের অধিকারী একমাত্র আমিই,—এক কোমলহৃদয়া সরলা বালিকার জীবন তদ্দ্বারা তিক্ত করি কেন?

এক দিন সন্ধ্যার সময় হারমোনিয়ম্ লইয়া গান করিতেছিলাম,—সুষমা হঠাৎ হারমোনিয়মটা আমার ক্রোড় হইতে টানিয়া লইল। এ কার্য্যে আমি বিশেষ বিস্মিত হই নাই, কারণ সে প্রায়ই হারমোনিয়মের চাবিগুলি যথেচ্ছা টিপিয়া নানা ঐক্যতানহীন সুর বাহির করিত; কিন্তু সে দিন সুষমা একটা বেশ গৎ বাজাইয়া বলিল,—"ঠাকুরপো কেমন গৎ শিখাইয়াছেন দেখ্‌লে, তুমি আপিসে গেলে, আমি হারমোনিয়ম্ শিখি, ঠাকুরপো দেখাইয়া দেন।" সুষমার এই কথা শুনিয়া আমার পূর্ব্ব সন্দেহ স্থিরবিশ্বাসে পরিণত হইল—সরলহৃদয়া বালিকার ঐ অসঙ্কোচ উক্তিতে কোন প্রচ্ছন্ন কুহক ছিল কিনা জানি না; কিন্তু আমি বেদনাপ্লুত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আর বাঁধিয়া রাখিতে পারি-

লাম না। সুষমার উক্ত কথার কোন উত্তর না দিয়া, নরেনের সহিত তাহার অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ও আমার সন্দেহের কথা বলিতে লাগিলাম। আমার কথা শেষ না হইতেই বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আমার কথায় দোষারোপ করিতে করিতে সুষমা গৃহান্তরে প্রবেশ করিল; আমার উক্তি যে বিদ্রূপাত্মক নয়—এবং তাহার প্রত্যেক অক্ষরগুলি যে ব্যথিত হৃদয়ের অতি গূঢ় স্থান হইতে বহির্গত হইতেছে, সুষমা বুঝি তাহা জানিল না। কক্ষের একপ্রান্তে একটী মৃৎ প্রদীপে ক্ষীণশিখা মিট্ মিট্ জ্বলিতেছিল,—তাই বোধ হয় আমার মুখের যাতনাব্যঞ্জক বিবর্ণতা সুষমা দেখিতে পায় নাই।

আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নদীরধারে পদচারণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হইল না,—কত অদ্ভুত অযাচিত চিন্তা মনটাকে বেশ আয়ত্ত করিয়া পরক্ষণেই আর এক নূতনচিন্তাকে অধিকার প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তখন নদীতীরে সংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ নৌকার সম্মুখে কোন কোন মাঝি উনন নামাইয়া পাক করিতেছিল,—গ্রামের পশ্চিম ঘাট হইতে, কে একজন খুব উচ্চটানাসুরে গান ধরিয়াছিল; সেই-প্রকার জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ কত সন্ধ্যায় নদীর ধারে বেড়াইয়াছি, প্রত্যেক প্রাকৃতিক শোভায়, এক একটা মহান্ ভাবের আভাষ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছি,—কিন্তু সে দিন সকলই যেন অসম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হইল; আমার সহিত যে বাহ্যজগতটার অনু মাত্র সম্বন্ধ ও সহানুভূতি নাই তাহা তীব্ররূপে অনুভব করিতে লাগিলাম,—সেই মাঝির গানও ভয়ানক হাহাকার পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। আহারান্তে শয়নগৃহে আসিয়া দেখিলাম, সুষমা নিদ্রিতা,—সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি, একপ্রকার অনিদ্রায় কাটাইতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিলে, নরেন বলিল,—"দাদা, মনে করছি একবার বৈদ্যনাথ যাব, মাথার মানত চুলগুলা লম্বা হ'য়ে পড়েছে, বড় অসুখ বোধ হয়,—যদি কোন চাক্‌রীর সুযোগ দেখেন ত দেওঘরে মামার ঠিকানায় পত্র লিখলে, আমি তৎক্ষণাৎ এখানে চলে আস্‌ব"।

"পূজার ছুটিটা পর্য্যন্ত থাক, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে" ইত্যাদি বলিয়া, তাহার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই,—"তবে যখন তুমি খুব আবশ্যক বোধ করছ, এ'তে বাধা দিতে চাই না" ইত্যাদি বলিয়া আমি নরেনকে বৈদ্যনাথ যাইবার অনুমতি দিলাম।

একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল,—আমি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম, নরেন ভায়াকে কোন প্রকারে স্থানান্তরিত না করিলে আর শান্তি নাই,—এখন সে কাজটা আপনিই সহজসাধ্য হইতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

যথা সময়ে আহারাদি করিয়া আপিসে যাইতে হইল; কিন্তু কাজকর্ম্মে বড় মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না, কেরাণীর দ্বারা সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া, ছুটীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাসায় ফিরিলাম। আমার সেই বাসাবাড়ীর সদরে দরজা ছিল না, বাটীর মধ্যে যাইতে হইলে বৈঠকখানার মধ্য দিয়া যাইতে হইত,—পশ্চাতে একটা দ্বার ছিল।

স্ত্রীলোক দর সেই দ্বার দিয়া গমনাগমন করিতে হইত। কাছারী যাইবার সময় রামলাল বাহিরের ঘরের দ্বার জানালা দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া, বাহির হইতে চাবি দিয়া আমার পশ্চাৎগমন করিত,—আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে অগ্রবর্ত্তী হইয়া দ্বার খুলিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিত।

ঠিক্ অপর দিনের মত বাসায় আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলাম;—একটা ভয়ানক বিপদ যে আমাকে গ্রাস করিবার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা আমি তখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। সুষমা এই সময়ে জলযোগের আয়োজন করিয়া, শয়নগৃহে আমার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে;—যথারীতি শয়নগৃহাভিমুখে গেলাম,—কিন্তু শয়নগৃহ অর্গলাবদ্ধ এবং তথায় জলযোগেরও কোন আয়োজন দেখিলাম না; তা'র-পর-রন্ধনশালা ভাণ্ডার গৃহ প্রভৃতি সুষমার গন্তব্যস্থান-মাত্রেরই অনুসন্ধান করিলাম, কাহারও সাক্ষাৎ পাইলাম না। "ঝি" "ঝি" করিয়া খুব উচ্চস্বরে ডাকিলাম—তাহারও উত্তর নাই;—খিড়্‌কীর-দ্বার বাহির হইতে আবদ্ধ বলিয়া বোধ হইল;—এই ব্যাপারে আমি একপ্রকার স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল,—আজ নরেন বৈদ্যনাথ যাইবে বলিয়া প্রস্তুত ছিল, সকাল সকাল আহারাদি করিয়া বহির্গত হইবার কথা,—বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। এই ব্যাপার সেই বিশ্বাসঘাতক মহাপাপীর কীর্ত্তি বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। মাথা ঘুরিতে লাগিল, বসিয়া পড়িলাম, রুদ্ধশ্বাসে প্রাণপণে দুই-বার "সুষমা" "সুষমা" বলিয়া ডাকিলাম,—ইচ্ছা ছিল সেই আবেগপূর্ণধ্বনি, বিশ্বাসঘাতিনী পলায়িতার সুষমার কর্ণে প্রবেশ করুক। কেহই উত্তর দিল না—কেবল সুষমার সেই আদরের কাকাতুয়াটী খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত দুই-বার বলিল "কে-গো" "কে-গো" পাখিটী কেবল এই বুলি শিখিয়াছিল।

আমি তখন পূর্ণউন্মাদ,—প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলাম; অনতিদূরে লিখিবার টেবিলের উপর দেখিলাম একখানি পত্র রহিয়াছে,—সেখানি আমার বটে, সুষমার হাতে লেখা। এই ব্যাপারের যাহা কিছু পরিচায়ক চিহ্ন তাহা ক্রমশঃ সকলই দেখিতে পাইলাম। পত্র খানি পড়িতে প্রবৃত্তি হইল না,—স্পর্শও করিলাম না; মনে হইল বিশ্বাসঘাতিনীর পাপচিন্তাপ্রকাশক পত্রও মলিন, ও অস্পৃশ্য।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে,—আমি, তখনও নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিয়াছি; বর্ষাস্নাত চন্দ্রালোক আমার পাদমূলে পড়িয়া ঘরটী ঈষৎ আলোকিত করিয়াছে,—নিম্ন মস্তক হইয়া আমি কেবল সেই অভাবনীয় ঘটনার কথা ভাবিতেছিলাম। সেই জনশূন্য গৃহেও মস্তক উত্তোলন করিতে, আমি ভয়ানক লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলাম,—বোধ হইল যেন গ্রামের চেতনাচেতন পদার্থ মাত্রই আমার ব্যাপার লইয়া রহস্যালাপে নিযুক্ত হইয়া, এক

মহাকলরব করিতেছে এবং তাহাদের হাস্য-প্রবাহ যেন সমগ্রনগর প্লাবিত করিয়া, আমার বৈঠকখানা ঘরের দ্বারে আঘাত করিতেছে। শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল,—মাথার মধ্যে কি এক প্রকার শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিলাম,—শরীরটা কিয়ৎকাল স্নিগ্ধ বাতাসে উন্মুক্ত রাখিয়া সুস্থ হইবার ইচ্ছায় জানালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলাম না—এক ভয়ানক-দৃশ্য গতিরোধ করিল; বোধ হইল যেন গৃহের প্রবেশ দ্বারে একটি রমণীমূর্ত্তি আপাদ শুভ্রবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং একখানি শীর্ণ বাহু উত্তোলন করিয়া, ততোধিক শীর্ণ একটি অঙ্গুলি দ্বারা সেই পত্রখানি নির্দ্দেশ করিতেছে;—এদৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না, ক্রমে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলাম। পরে মনে হইয়াছিল, সেই মূর্ত্তি আরো একদিন দেখিয়াছি;—সেদিন আমার বিবাহ-রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে বাসরগৃহে উৎসব-প্রদীপ সকল একে একে হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে; বধূরূপিণী পট্টবস্ত্রমণ্ডিতা বালিকা সুষমা আমার পার্শ্বে নিদ্রিতা; নিদ্রাতুরা অপরাপর স্ত্রীলোকগণ ক্রমে সকলই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেহ বা বাসরের সুপ্রশস্ত চিত্রিত গালিচার উপর নিদ্রামগ্না,—সেই উৎসবালয়ে একক আমি জাগরিত। কত পুরাতন সুখস্মৃতি, ছায়াবাজির ছবির মত চক্ষের সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল,—সেই সময়ে একবার সেই শুভ্রবসনা রমণীমূর্ত্তি সুষমার দিকে ক্ষীণ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—দেখিয়াছিলাম।

যাহা হউক আমি কতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম জানি না,—চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলাম, তেওয়ারি ঝি ও সুষমা আমার শুশ্রূষা করিতেছে। একি স্বপ্ন?—খুব ভাল করিয়া দেখিলাম সুষমাই বটে!

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সুষমাকে, অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল—"আঃ অদৃষ্ট! তুমি বুঝি চিঠিখানা পড়ে দেখ নি;—যে দিন আমাদের বাসায় সই কনক নিমন্ত্রণে এসেছিল, তখন তুমি তাকেত দেখেছিলে, ছুঁড়ির শরীরে আর কিছুই ছিল না,—কেবল অস্থিসার; তা'র পর আজ পাঁচদিন হ'তে জ্বরবিকার হ'য়েছিল; আমি এ'র কিছুই খবর জানতুম্ না, বাগ্‌দিবৌ বোনের বাড়ী গিয়েছে বলে চিঠিপত্রও দিতে পারি নাই;—আজ তুমি কাছারি গেলে, একখানি চিঠি এল যে কনক কাল রাত্রি হ'তে সইকে দেখ্‌বে ব'লে, ভয়ানক চীৎকার কর্‌ছে, আর নানা প্রলাপ বক্‌ছে; চিঠিখানা মিত্রদের বাড়ির কে তোমাকেই লিখেছিলেন;—ভাগ্যি ঠাকুরপো এখানে ছিলেন, তা' না হইলে হাত পা কাম্‌ড়ে মারা যেতুম্; ঠাকুরপো নৌকা ভাড়া ক'রে দিলেন, আমরা তাড়াতাড়ি হৃদয়পুর যাত্রা করলুম,—কিন্তু সকল তাড়াতাড়ি বৃথা হ'ল, গ্রামের ঘাটে গিয়েই শুনলাম কনক বেলা দু'টার সময় মারা গিয়ছে;—ঠাকুরপো হৃদয়পুরের নিকট কোন্ একটা ষ্টেশনে উঠে পশ্চিম চ'লে গিয়েছেন। বাড়ি পা দিয়েই দেখি, এই বিপদ,—মানুষের কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না। তোমার হয়েছিল কি?—(হোঁচট খেয়েছিলে বুঝি?—এত করে বলি একটু অধিক দুধ ঘি খাবার ব্যবস্থা কর, তা'ত আর শুন্‌বে না।"

বলা বাহুল্য, তা'র পরদিনই গৃহিনীর ইচ্ছানুসারে, ঘৃত দুগ্ধের নূতন ব্যবস্থা হইল এবং খরচের মাত্রাটাও বেশ বৃদ্ধি পাইল।

কৃষি-কার্য্য।

সার।

উদ্ভিদের জন্ত সার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। চাষ করিতে করিতে জমির উদ্ভিদ্-পোষণ-কারী বস্তু সমুদয় ফুরাইয়া যায়, ও জমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে; তজ্জন্ত মধ্যে মধ্যে জমিতে সার দেওয়া আবশুক। কৃষকদিগের অজ্ঞতাবশতঃ আমাদের দেশে জমিতে সার দেওয়ার প্রথা তত অধিক পরিমাণে প্রচলিত না থাকায়, ক্রমশঃ জমি সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। জমিতে লাঙ্গল দিয়া সার দেওয়া আবশুক, এবং সার দিবার পরেও লাঙ্গল দিয়া সারগুলিকে মাটীর সহিত উত্তম রূপে মিশাইয়া ফেলা উচিত। প্রতি বৎসর সার না দিলে ভাল শস্য হয় না—এই কথা সকলেরই উত্তম রূপ মনে রাখা উচিত। জমিতে সাধারণতঃ কিছু না কিছু সার সঞ্চিত থাকে। ক্রমশঃ শস্য উৎপাদনে জমির সেই সঞ্চিত ধন ফুরাইয়া যায়। যাঁহারা প্রতি বৎসর বিনা সারে শস্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদিগকে অবশেষে সেই জমি অনুর্ব্বরাবশতঃ পতিত রাখিতে হয়।

জলই আমাদের দেশের প্রধান সার। কৃষকগণ জল পাইলে অন্য কোন সারের আবশ্যক বিবেচনা করে না। বর্ষাকালে পুষ্করিণী, নালা, ডোবা প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়া সমুদয় ধোয়াট জল মাঠে আসিয়া পড়ে; তাহাতে ঐ জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়।

আমাদের দেশে নিম্নলিখিত সারগুলি অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(ক) গোবর।

এই সারই ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে কৃষকদিগের মধ্যে অধিক ব্যবহৃত হয়। গোয়ালের বাহিরে একটি গর্ত্তে সমুদয় গোবর ও চোনা জমা করিয়া কয়েক মাস তাহাদিগকে পচাইবার পর জমিতে দেওয়া উচিত। বৃষ্টির জলে যাহাতে ঐ গোবর ও চোনা ধুইয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য গর্ত্তটির উপর একখানি চালা বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। টাট্‌কা গোবর গাছে দিলে, পোকা ধরিয়া গাছ মরিয়া যায়। গোবরের মতন, ঘোঁড়া ও ভেড়া ইত্যাদি জন্তুর মল মূত্রেও উত্তম সার হয়। গোবর ও চোনা অপেক্ষা ঘোঁড়ার মল মূত্রে সারের পরিমাণ অধিক থাকে। প্রত্যেক বিঘায় গোবর এক শত হইতে দুই শত মণ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) মনুষ্যের বিষ্ঠা।

মনুষ্যের বিষ্ঠা উত্তম সার। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ইহা অতি অনিষ্টকর; ইহার তেজ এত অধিক যে উত্তম রূপে পচাইয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া গাছে না দিলে গাছ শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। প্রত্যেক বিঘায় এই সার পঞ্চাশ মণ দিতে হয়।

(গ) সহরের আবর্জ্জনা।

সহরের সমুদয় আবর্জ্জনা একত্র করিয়া পুড়াইলে তাহার ছাইও উত্তম সার হয়। পুনা সহরের ডাক্তার কুক্ সাহেব বলেন যে, ইহার সহিত চুণ ও হাড়ের গুঁড়া মিশাইলে উত্তম সার প্রস্তুত হয়।

(ঘ) শিঙ্গের গুঁড়া।

মোষের শিঙ্গ হইতে ছুরির বাঁট, বোতাম, খড়মের বোকলো প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার সময় যে সমুদয় গুঁড়া পড়ে, তাহাতে সার হয়। এই গুঁড়া সকল একটি গর্ত্তে পচাইয়া ব্যবহার করা উচিত।

(ঙ) হাড়ের গুঁড়া।

সারের জন্য হাড় বিবিধ প্রকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। হাড়ের টুক্রা, হাড়ের গুঁড়া, হাড়ের ছাই এ সকল গুলিতেই উত্তম সার হয়। হাড় হইতে 'সুপার' নামক এক প্রকার সার প্রস্তুত হয়। 'সুপার' প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে হাড়ের গুঁড়াতে জল মিশাইয়া কাদার মতন করিয়া লইবে, এবং পরে তাহার সহিত শতকরা পোনের সের সল্‌ফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric acid) মিশাইবে। ছোট ছোট গাছে খইল দিবার মতন ইহা দিতে হয়।

যদিও কোন কোন স্থানের হিন্দু চাষীগণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিতে আপত্তি করেন, কিন্তু ইহার উপকারিতা দেখিতে পাইলেই ক্রমশঃ সে আপত্তি দূর হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হইতে সুলভ মূল্যে হাড়ের গুঁড়া দুই একটি গ্রামে বিক্রয় করাতে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার অনেক জিলাতে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কলের তৈয়ারী হাড়ের গুঁড়া ঠিক ছাতুর মতন। ইহার প্রতি মণ দুই টাকা হইতে আড়াই টাকা মূল্যে কলিকাতায় বিক্রয় হয়। কিন্তু এত অধিক মূল্যে হাড়ের গুঁড়া কিনিলে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা কিন্তু ইচ্ছা করিলে অতি সুলভে হাড়ের গুঁড়া প্রস্তুত করিতে পারি। দেশীয় মুচিদের নিকট হইতে হাড় কিনিয়া পচাইয়া পরে ঢেঁকী দ্বারা গুঁড়া করিয়া লইলে প্রতি মণে এক টাকা হিসাবে খরচ হয়। পুরাতন হাড় হইলে ঢেঁকী দ্বারা সহজেই গুঁড়া হয়, কিন্তু নূতন হাড় গুঁড়া করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তজ্জন্য নূতন হাড়ের সহিত দোঁয়াস্ মাটী, ক্ষার কিম্বা ঘোঁড়ার নাদী সমান অংশে মিশাইয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে পাঁচ ছয় মাস একহাত পুরু মাটী দিয়া পুতিয়া রাখিতে হয়; এবং মধ্যে মধ্যে তাহার উপর চোনা কিম্বা জল দিতে হয়, তাহা হইলে ঐ হাড় সকল শীঘ্র পচিয়া নরম হয় ও ঢেঁকীতে সহজেই গুঁড়া হইয়া যায়।

হাড়ের গুঁড়া গোবর সারের মতন নরম নহে। ইহা জমিতে দিবামাত্র ফল পাওয়া যায় না। জমিতে ফসল জন্মাইবার পূর্ব্বে ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রতি বিঘায়

ধান, পাট, গম, যব ইত্যাদি ফসলের জন্য এক মণ হিসাবে দিলেই যথেষ্ট হয় কিন্তু আলু ও আক্ চাষে দুই মণ হইতে চারি মণ পর্য্যন্ত লাগে।

(চ) খইল।

সর্ষপের বা রেড়ীর খোল আমাদের দেশে সারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রেড়ীর খোল অপেক্ষা সর্ষপের খোল, আক্ ও আলু চাষের পক্ষে অধিক উপকারী। ইহা ছাই ও ধুন্দের মতন পোকার পক্ষেও উপকারী।

(ছ) সোরা।

সোরা উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সকল সার অপেক্ষা ইহাতে ফসলের শীঘ্র উপকার হয়। গম, আক্ প্রভৃতি ফসলে সোরা ব্যবহার করিলে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিঘায় এক মণ সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(জ) চূণ।

স্বভাবতঃ সকল জমিতেই চূণের অংশ অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে থাকে। অন্যান্য বস্তুর ন্যায় চূণও উদ্ভিদের একটি প্রধান খাদ্য। যে সকল জমির আগাছা কুগাছা কিছুতে মারা যায় না, তাহাতে চূণ ছড়াইয়া লাঙ্গল দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা ছাড়া চূণ দিলে গাছে পোকা ধরিতে পারে না। ইহাতে শুষ্ক জমি সরস হয়; কিন্তু অধিক পরিমাণে চূণ ব্যবহার করিলে জমি অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে।

(ঝ) সবুজী সার।

জমিতে ফসল বুনিবার পূর্ব্বে ধনচে, নীল, পাট কিম্বা শণ বুনিয়া সেই গাছ সকল কিছু বড় হইলে তাহার সহিত লাঙ্গল দিতে হয়। এরূপ ভাবে লাঙ্গল দেওয়া আবশ্যক যাহাতে ঐ গাছ সমুদয় মাটীর সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া যায়। এইরূপ চাষের নাম 'সবুজী সার'। ইংরাজীতে ইহাকে 'গ্রিন্ মেনিওর' কহে। ইহাতে জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

উপরোল্লিখিত সার ব্যতীত পুষ্করিণীর পাঁক, ছাই, লবণ, মাছপচা মাটী প্রভৃতিও উত্তম সার। কুক্কুট ও পারাবতের বিষ্ঠায় সারফুল গাছের পক্ষে অতি উত্তম।

যে সকল জমিতে স্বভাবতঃ সোরা, ক্ষার, চূণ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে থাকে, তাহাতে কোন সারই দেওয়া উচিত নয়; কারণ এরূপ জমিতে সার দিলে উপকার না হইয়া অপকারই হয়।

কোন্ ফসলের পক্ষে কোন্ সার উপযুক্ত তাহার একটি মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) যাহার পাতা ব্যবহার করা যায়, তাহাতে পুকুরের মাটী, নীলের সিটী ও চোনা দেওয়া উচিত।

(২) যাহার বীজ ব্যবহার করা হয়, তাহাতে হাড় সংযুক্ত সার ও সোরা দেওয়া উচিত।

(৩) যাহার মূল ব্যবহার করা হয়, তাহাতেও হাড়সংযুক্ত সার দেওয়া উচিত।

(৪) সুঁটী ব্যবহার করা হয়, তাহাতে চূণসংযুক্ত সার দেওয়া উচিত।

আমাদের দেশের কৃষকগণ প্রায়ই কৃষি প্রবাদ মূলক সার কোন কোন ফসলে ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা :—

"ওলে কুটি মানে ছাই।
এরূপ চাষ কর্‌গে ভাই॥"

অর্থাৎ ওল গাছের গোড়ায় খড় ও মানকচুর গোড়ায় ছাই দিলে উত্তম মূল হয়।

"ছাইয়ে লাউ উঠানে ঝাল।
কর বাপু চাষার ছাওয়াল॥"

অর্থাৎ ছাইমাটীতে লাউ ও উঠানের মত জমিতে (অর্থাৎ যে জমি সমতল ও যে স্থানে জল দাঁড়ায় না) লঙ্কা গাছ পুতিবে।

"কচু বনে যদি ছড়াস ছাই।
খনা বলে তার সংখ্যা নাই॥"

অর্থাৎ কচু গাছে ছাই দিলে অত্যন্ত কচু হয়।

"লাউ গাছে মাছের জল।
ধেনো মাটীতে বাড়ে ঝাল॥"

অর্থাৎ লাউগাছে মাছের জল ও লঙ্কাগাছে ধানপচা মাটী দিলে অত্যন্ত ফল হয়।

"নারিকেল গাছে দিলে নুনে মাটী।
শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি॥"

অর্থাৎ নারিকেল গাছের গোড়ায় নোনা মাটী দিলে শীঘ্র শীঘ্র নারিকেল ফলে।

"গোয়ে গোবর বাঁশে মাটী।
অফলা নারিকেলের শিকড় কাটি॥"

অর্থাৎ সুপারী গাছের গোড়ায় গোবর ও বাঁশের গোড়ায় মাটী দিলে, এবং অফলন্ত নারিকেল গাছের শিকড় কাটিয়া দিলে অধিক ফল হয়।

"শুন হে চাষার বেটা।
বাঁশে দিও ধানের চিটা॥
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে।
বিঘে ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে॥"

অর্থাৎ বাঁশের গোড়ায় ধানের আগড়া দিলে বাঁশের ঝাড় বড় হয়।

(৪) বীজ।

"ধর্ম্ম হয় না কর্‌লে উপাস।
কোদাল পাড়্‌লে হয় না চাষ॥

যেরূপ শুদ্ধ উপবাস করিলে ধর্ম্ম হয় না সেইরূপ কেবল জমি খুঁড়িলেই চাষ হয় না।

জমিতে লাঙ্গল ও সার দেওয়া যেরূপ একটি প্রধান কার্য্য, চাষের জন্য উত্তম বীজ ব্যবহার করাও তদ্রূপ। ভারতবর্ষের সমুদয় ফসল ক্রমশঃ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার প্রধান কারণ এই যে, এখানে উত্তম বীজ বাছিয়া লইবার প্রথা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুবীজে শীঘ্র চারা জন্মে ও অধিক ফল হয়। মন্দ বীজে চারা দুর্ব্বল হয় ও ফল ধরিবার পূর্ব্বে প্রায়ই মরিয়া যায়। ফসলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেগুলি সুপক্ক ও সুপুষ্ট বিবেচনা হইবে সেই গুলিকেই বীজ রাখিবে। বীজ অতিশয় শীতল বা উষ্ণ বাতাস পাইলে নষ্ট হইয়া যায়। পর বৎসর চাষের জন্য বীজ রাখিলে মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে রৌদ্রে দিতে হয়। উত্তম বীজও প্রতিবৎসর এক জমিতে চাষ করিলে ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়ে। কৃষকদিগের সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বীজ আনান উচিত; কারণ একস্থানের বীজ ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যায়, ও তাহাতে ফসল ছোট হইয়া পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনীত সুবীজে ফসল বড় ও অধিক হয়। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ গত আট বৎসর ধরিয়া 'বর্দ্ধমান পরীক্ষা চাষে' নৈনিতাল ও দেশী আলুর চাষ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দেশী আলু যে স্থানে প্রতি বিঘায় ত্রিশ মণ হয়, ঠিক সেই স্থানে নৈনিতল আলু ষাইট মণ হইবে। সেই জন্য যাহাতে সকলেই নৈনিতাল আলুর চাষ শিখিতে পারে ও ঐ সম্বন্ধে যাহাতে সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, সেই উদ্দেশে কৃষি বিভাগ হইতে প্রত্যেক বৎসর যথা মূল্যে চাষীদিগকে ঐ আলুর বীজ বিক্রয় করা হয়।

কোন গ্রামে যদি কোন ফসলে পোকা ধরে, তাহা হইলে সে গ্রামের বীজ লইয়া চাষ করা উচিত নহে। এমন কি সে গ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রামেরও বীজ ব্যবহার করা উচিত নহে।

বীজ বুনিবার পূর্ব্বে জমিটি সমতল করা উচিত; কারণ জমি উঁচু-নীচু হইলে বর্ষার জলে সমুদয় বীজ ধুইয়া আসিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে পতিত হয়, সুতরাং বীজ সকল জলে ডুবিয়া গিয়া পচিয়া যায়।

কোন কোন বীজের আচ্ছাদন পুরু, এবং কোন কোন বীজের আচ্ছাদন পাতলা। যে বীজের আবরণ পাতলা তাহাদিগকে জমির উপরে ছড়াইয়া অল্প পরিমাণে মাটী চাপা দিতে হয়। এবং যাহাদের আবরণ পুরু, তাহাদিগকে জমির কিঞ্চিৎ নিম্নে পুতিতে হয়। বীজ বুনিবার পরেই জমি যেরূপ জল ধারণা করিতে পারে সেইরূপ জল দেওয়া

উচিত। বীজ পুরাতন হইলে তাহাদিগকে চূণের জলে ধুইয়া কিম্বা ছাই মাখাইয়া লইলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

বিলাতের প্রসিদ্ধ কৃষিতত্বজ্ঞ হ্যালেট্ সাহেবের মতে ঘন করিয়া বীজ না পুতিয়া পাতলা করিয়া পোতা উচিত, কারণ অল্প পরিমাণ বীজ ও সারের দ্বারা কিছু অধিক পরিশ্রম করিলে অধিক ফসল পাওয়া যায়।

বিলাতে বীজ বুনিবার একপ্রকার যন্ত্র আছে। তাহা ব্যবহার করিলে বীজ অল্প লাগে; বীজগুলি মাটির সমান নীচে পড়ে, ও গাছ সকল শ্রেণীবদ্ধ হয়। গাছ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইলে নিড়ানি দিবার বিশেষ সুবিধা হয়। আমাদের দেশের কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেরই এরূপ যন্ত্র কিনিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু যাহাতে এইরূপ নিয়মে বীজ বুনা যায়, সে বিষয়ের উপর কৃষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। মাটীর সমান নীচে বীজ পুতিলে, গাছ সকল এক সঙ্গে বাহির হয় ও তাহাদের ফসল সকল এক সময়ে পাকে। ফসল উঠাইবার সময় কাঁচা পাকা ফসল এক সঙ্গে মিশাইয়া যায় না। সুতরাং পর বৎসর চাষের জন্য বীজ রাখিবার সুবিধা হয়।

বিহার অঞ্চলে চাষীরা লাঙ্গলের সহিত একটি বাঁশের নল বাঁধিয়া দেয়। লাঙ্গলের দ্বারা চষিবার সময় ঐ নলটি মাটীতে বসিয়া গিয়া একটি দাগ পড়ে। কৃষকেরা ঐ বাঁশের নলের মধ্যে বীজ ফেলিয়া দেয়। এবং বীজ ঐ দাগে দাগে পড়িতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উপর মাটী পড়িয়া বীজ ঢাকা পড়িয়া যায়। বিহারের এ নিয়মটি উত্তম। বাঙ্গালাদেশের নিম্নলিখিত নিয়মটিও বড় মন্দ নহে—যে সময়ে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয় তখন কৃষকেরা লাঙ্গলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ লাঙ্গলের দাগে দাগে বীজ ছড়াইয়া যায়। লাঙ্গল ফিরিয়া যখন পুনরায় সেই স্থানের নিকট দিয়া যায় তখন ঐ বীজের উপর মাটী পড়িয়া ঢাকিয়া যায়।

(৫) শস্য পর্য্যায়।

কৃষকের পক্ষে শস্য পর্য্যায় নিতান্ত আবশ্যক। ইহাতে প্রতি বৎসরই প্রচুর ফসল পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল ফসলের একরূপ আহার নহে। এক রূপ ফসল প্রতিবৎসর এক জমিতে চাষ করিলে সেই ফসলের আহারোপযোগী সমুদয় পদার্থ সেই জমি হইতে ফুরাইয়া যায়। সুতরাং ক্রমশঃ সেই ফসল আর উত্তমরূপ জন্মায় না। কিন্তু অন্যরূপ ফসল সেই জমিতে উত্তমরূপে আবাদ করা যায়। এই জন্য এক প্রকার ফসল ক্রমাগত আবাদ না করিয়া পর্য্যায়ক্রমে তিন চারি প্রকার ফসল আবাদ করিলে জমি অধিক দিন পর্য্যন্ত উর্ব্বরা থাকে।

সকল ফসলের আহার যেরূপ সমান নহে, সেইরূপ সকল ফসলের শিকড়ও সমান নহে। কতকগুলি ফসলের শিকড় 'গুচ্ছ-মূল' ও কতকগুলির 'লম্ব-মূল'। গুচ্ছ-মূল-যুক্ত উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার উপরিভাগ হইতে আহার সংগ্রহ করে ও লম্ব-মূল-যুক্ত উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার

নিম্নভাগ হইতে আহার সংগ্রহ করে। যদি গুচ্ছ-মূল-যুক্ত ফসলের আবাদ করিয়া জমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে তাহাতে লম্ব-মূল-যুক্ত ফসলের আবাদ করা আবশ্যক। এইরূপ চাষে জমি অধিক দিন পর্য্যন্ত উর্ব্বরা থাকে। সকল কৃষকেরই শস্য পর্য্যায়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চাষ করা উচিত।

কখন কখন দুই রকম ফসলও একত্রে বুনিয়া এক জমি হইতে একেবারে দুইটি ফসল পাওয়া যায়।

যথা—"সরিসা বনে কলাই মুগ্।
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক্॥

অর্থাৎ সরিসার সহিত মুগ্কলাই একত্রে বুনিলে দুইটি ফসল লাভ হয়; সুতরাং চাষী অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়।

(৬) কৃষি কার্য্যোপযোগী পশু।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গো জাতির উন্নতি করা উচিত। গোচারণ জমির অভাবে ও গোপালকের অনবধানতা বশতঃ আমাদিগের গরুর অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইয়া আসিতেছে। গোজাতির উন্নতি করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়:—

(ক) গোয়াল ঘর।

চতুর্দ্দিকের জমি অপেক্ষা গোয়াল ঘরের মেজে কিছু উচ্চ হওয়া ও চোনা ও জল বাহির হইবার জন্য উত্তমরূপ নালা রাখা আবশ্যক। কেহ কেহ গোয়ালের মেজে সমতল না করিয়া চোনা গড়াইয়া যাইবার জন্য গরুর পশ্চাৎদিকের জমি কিছু নীচু করিয়া রাখেন। এইরূপ করিলে যদিও চোনা গড়াইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়, কিন্তু গর্ভিনী গরুর পক্ষে ইহা অতিশয় অনিষ্টকর; ইহাতে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং গোয়ালের মেজে সমতল রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে গোয়াল ঘরে প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তজ্জন্য গোয়ালের উচ্চ স্থানে জানালা রাখা আবশ্যক। গরুর মল মূত্রাদি নিয়মিত রূপে পরিষ্কার করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোবর ও চোনা অতি উত্তম সার। গোয়াল ঘরে যে নালা রাখা হয়, সেই নালা দিয়া চোনা বাহির হইয়া আসে। গোয়ালের বাহিরে সেই নালার মুখে একটি গর্ত্ত করিয়া রাখিলে তাহাতে সমুদয় চোনা আসিয়া জমা হয়। গোয়ালের আবর্জ্জনা, গোবর ও চোনা সেই গর্ত্তে পচাইয়া রাখিলে উত্তম সার হয়। সেই গর্ত্তের উপরে একখানি চালা বাঁধিয়া দেওয়া উচিত; কারণ সূর্য্যের উত্তাপ কিম্বা বৃষ্টিতে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয়।

গরুকে অধিক বৃষ্টিতে ভিজাইলে, জলময় স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে এবং প্রখর রৌদ্র কিম্বা হিম হইতে রক্ষা না করিলে, শীঘ্রই তাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে।

"শীতের ঘাস।
বর্ষার বাস।"

অর্থাৎ শীত কালে গরুকে প্রচুর পরিমাণে আহার দিতে হয়, ও বর্ষার সময় তাহা-দিগকে উত্তম স্থানে রাখিতে হয়। গরুকে দিবারাত্রি গৃহের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে এবং তেজস্কর আহার দিলে তাহারা কখনও সহজে প্রসব করিতে পারে না। গরুকে প্রত্যহ একবার করিয়া খোলা স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক।

(খ) আহার।

অধিক কিম্বা অল্প আহারেই গরুসকল রুগ্ন হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ইহার আহারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। গরুর অবস্থার উপর আহারের পরিমাণ নির্ভর করে। গরুকে কাঁচা বেল, কলাই, কাঁটানটে জলে সিদ্ধ করিয়া, সিমুলের ফুল ও কার্পাসের বীজ ও গাছ খাওয়াইলে দুগ্ধ অধিক হয়। গর্ভবতী গাভীর পক্ষে সর্ষপের খৈল অপেক্ষা তিসির খৈল বিশেষ উপকারী। অপরিষ্কৃত জল কোন মতেই গরুকে খাওয়ান উচিত নয়। আহারের ও যত্নের ত্রুটিতেই গরুর নানা রূপ রোগ জন্মায়।

বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর ঘাস জন্মায়, ও গরুর আহারের জন্য কিছুই ভাবিতে হয় না; কিন্তু গ্রীষ্মকালে মাঠের ঘাস সকল শুকাইয়া যায়,—গরুরা খাইতে পায় না। সেই জন্য বর্ষার সময় ঘাস কাটিয়া রাখা কর্ত্তব্য। দুই প্রকারে ঘাস রাখা যায়। প্রথম, শুষ্ক ঘাস—দ্বিতীয়, পোর্তা ঘাস।

(১) শুষ্ক ঘাস।

বর্ষাকালে ঘাস কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গাদা দিয়া রাখিতে হয়। যদিও বিচালি অপেক্ষা ইহাতে খরচ অল্প হয় কিন্তু ইহা অপেক্ষা বিচালিই গরুর পুষ্টিকারক আহার।

(২) পোতা ঘাস।

একটি উচ্চ স্থানে বর্ষার শেষে একটি বড় গর্ত্তে নানা প্রকার ঘাস পুতিতে হয়। ডাক্তার ভোল্‌কার সাহেব বলেন কাঁচা ঘাস মাটীর মধ্যে পুতিলে প্রায়ই পচিয়া যায়। পুতিবার জন্য নরম ও সরস ঘাস ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলেই কাটা উচিত।

একটি ৩০ হাত দীর্ঘ, ১১ হাত প্রস্থ ও ৮ হাত গভীর গর্ত্তে ৬০০ কিম্বা ৭০০ মণ ঘাস পুতিতে পারা যায়। গর্ত্তটির দেয়াল সোজা কিম্বা নীচের দিকে কিছু গড়ানে হওয়া আবশ্যক। জেনারেল্ উইল্‌কিন্ সন সাহেবের মতে গর্ত্তের দেয়াল গড়ানে না করিয়া সোজা করা কর্ত্তব্য। দেয়ালটি পলস্তারা দিয়া প্লেন্ করিতে হয়। গর্ত্তের মধ্যে প্রথমে দুই হাত পরিমাণ ঘাস রাখিয়া উত্তম রূপে চাপ দিতে হয়। তৎপরে পুনরায় দুই হাত পরিমাণ ঘাস রাখিতে হয়। এইরূপে এক স্তবকের উপর আর এক স্তবক ঘাস চাপিয়া পুতিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ গর্ত্তটি পুরিয়া গেলে, উপরে এক স্তবক মাটী লেপিয়া তাহার উপর তক্তা ও কাষ্ঠের গুঁড়ি কিম্বা পাথর চাপা দিতে হয়। গর্ত্তের

মধ্যে যতই বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে, ততই পোতা ঘাস সুমিষ্ট হয়। ঘাস পুতিবার পর যদি বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর একখানি চালা বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘাস পুতিবার দুই মাস পরে সেই ঘাস সকল তুলিয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে।

(গ) গরুচেনা।

"ভুঁয়ের জল ভুঁইতে মরে ঘন ফেলে পা।
যার মা ভাল তার ঝি ভাল বাওরে ভাইবা।"

আমাদের কৃষকদিগের মধ্যে গরু চিনিবার দুই একটি প্রবাদ আছে। তাহারা প্রায়ই সেই প্রবাদানুযায়ী ভাল মন্দ গরু বাছিয়া লয়। যে গরু ঘন ঘন পা ফেলে অর্থাৎ যাহার পা ছোট সেই গরুই উত্তম। শুদ্ধ লক্ষণের উপরও নির্ভর করা উচিত নয়; গরুর বংশ দেখাও উচিত। যে সকল গাভীর ঝোলা পেট, ভারী পালান, লম্বা বাঁট, তেলা গাত্র ও ছোট ছোট পা তাহারাই প্রায় দুগ্ধবতী হয়। ষাঁড়ের মতন যে গাভীর আকার তাহারা কদাচিৎ দুগ্ধবতী হয়।

(৭) জল।

জল উদ্ভিদের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। আমাদের দেশের কৃষকেরা জল পাইলেই সন্তুষ্ট। জল পাইলে সারের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টির জল, বন্যার জল, কূপ, পুষ্করিণী ও নালার জল একত্রে মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের প্রায় সমস্ত আহারোপযোগী বস্তু আনয়ন করে উদ্ভিদ্ বিশেষে শতকরা ৪০ হইতে ৯০ ভাগ জল। পাট পচান জল অতিশয় তেজস্কর ও উদ্ভিদের উপকারী। উদ্ভিদের প্রকৃত সার নাইট্রোজেন্, ফস্‌ফরিক অ্যাসিড্, পটাস্ ইত্যাদি। এ দেশে প্রতিবিঘায় দুই সেরের অধিক নাইট্রোজেন্ বৃষ্টি ও বায়ু হইতে জমিতে প্রবেশ করে।

কেবল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। জল সেচনের ও অতিরিক্ত জল নির্গমের উত্তম-রূপ সুবিধা করা আবশ্যক। অনাবৃষ্টিতে শস্যের যেমন ক্ষতি হয়, অতি বৃষ্টিতে ও বন্যায় ঠিক সেইরূপ ক্ষতি হয়। কিন্তু বন্যার পূর্ব্বে সাবধান থাকিলে ক্ষতি অপেক্ষা লাভ অধিক হয়। বন্যার জলে সারবান্ পদার্থ জমিতে পতিত হইয়া উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। অনেক স্থানে বাঁধ বাঁধাতে এইরূপ উর্ব্বরতা বৃদ্ধির উপায় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জল সেচনের সময় যাহাতে অধিক তেজে জল না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ জোরে জল পড়িলে চারা গাছের গোড়ার মাটী ধুইয়া গিয়া শিকড় বাহির হইয়া পড়ে ও সেই স্থানে একটি গর্ত্ত হইয়া যায়। শিকড় বাহির হইয়া পড়িলে রৌদ্রে শুকাইয়া যায়, এবং গর্ত্ত হইলে ক্রমশঃ জলসেচনে সেই গর্ত্তে জল জমিয়া যায়, ও শিকড় সকল পচিয়া যায়।

অপরাহ্নে গাছে জল দেওয়াই উত্তম নিয়ম; কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণ উভয় সময়েই জলসেচন করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে জলসেচনের কিছুই আবশ্যকতা হয় না।

(৮) শস্যের রোগ, পোকা ও অনিষ্টকারী জন্তু।

উদ্ভিদের দুই প্রকার রোগ আছে। এক প্রকার রোগ পোকা হইতে জন্মায়, অন্য প্রকার রোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে জন্মায়। নিম্নলিখিত চারিটি বস্তুর মধ্যে কোনও একটির সহিত বীজ মিশাইয়া পুঁতিলে গাছে রোগ ধরিবার সম্ভাবনা কম থাকে :—(১) এক ভাগ তুঁতে ও এক শত ভাগ জল, (২) একভাগ করোসিভ্ সাব্লিমেড্ ও এক হাজার ভাগ জল, (৩) এক ভাগ কার্ব্বলিক্ অ্যাসিড্ ও কুড়িভাগ জল, (৪) এক ভাগ চুণ ও পাঁচ ভাগ জল। উদ্ভিদের সকল স্থানেই পোকা লাগিতে পারে। পোকা লাগিলেই উদ্ভিদ্ নিস্তেজ হইয়া পড়ে কিম্বা একেবারে শুকাইয়া যায়।

পোকারা উদ্ভিদের ডাল, পাতা বা ফলের উপর ডিম্ব পাড়িয়া চলিয়া যায়। ঐ ডিম্ব হইতেই ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা জন্মিয়া ডাল, ফল বা মূলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আহার সংগ্রহ করে। পোকা সকল ঐ রূপে ভিতরে প্রবেশ করিলে আর তাহাদিগকে নষ্ট করা যায় না; তজ্জন্য যে সময়ে পোকারা উদ্ভিদের বহির্ভাগে থাকে সেই সময়ে তাহাদিগকে বিনষ্ট করা উচিত।

গাছের ডালে কিম্বা গুঁড়ির ভিতরে পোকা লাগিলে তাহার উপরে আল্কাত্রা লাগাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। মূলে, ডালে, পাতায় কিম্বা ফলে পোকা লাগিলে, তাহার উপর ১০।১২ দিবস অন্তর কেরাসিন তৈলের জল ছড়াইয়া দিতে হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে কেরাসিন তৈলের জল প্রস্তুত করিতে হয় :—অর্দ্ধ বোতল কেরাসিন তৈল ও অর্দ্ধ বোতল টক্ দধি একত্রে মিশাইয়া ৫।৭ মিনিট উত্তম রূপে নাড়িতে হয়। এইরূপ নাড়িবার পর যখন সাদা আরকের মতন হইবে, সেই সময়ে ৫০ বোতল জলের সহিত তাহাকে মিশাইতে হয়।

তামাক সিদ্ধ জল, শেঁকো বিষ, সর্ষপের খৈল, ছাই, হলুদের জল, ফটকিরির জল প্রভৃতিও পোকা লাগিলে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইক্ষু এবং আলু ছাই দিয়া বসাইলে পোকা কম ধরে। গাছের গোড়ায় চুন ছড়াইয়া দিলেও পোকা মরিয়া যায়।

আমাদের দেশে গোলায় চাউল বা ধান্য রাখিলে প্রায় দেখা যায় যে, পোকা লাগিয়া তাহার অনেক অনিষ্ট করিয়া ফেলে। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে গোলায় আর পোকা লাগিতে পারে না। শস্যের গোলা বন্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহার মধ্যে কার্বণ্ বাইসল্ফাইড্ নামক আরক প্রতি ২০ মণ শস্যে অর্দ্ধসের ছড়াইয়া দিলে কিম্বা গোলার মধ্যে একটি অনাবৃত পাত্রে রাখিয়া গোলা বন্ধ করিলে ঐ আরকের গন্ধে সমস্ত পোকার

ডিম্ব ও পোকা মরিয়া যায়। বাহিরের চতুর্দ্দিকের জমি আল্‌কাৎরার দ্বারা সম্মার্জ্জিত করিয়া রাখিলে বাহিরের কোন পোকা ভবিষ্যতে লাগিতে পারে না।

ভারতবর্ষে এই রূপ পোকাতে গম, চাউল্‌ ও ধান্যের বিস্তর ক্ষতি করে। যদিও এই পোকা দেখিতে অতি ক্ষুদ্র, তত্রাচ গোলার মধ্যে থাকিলে এক মণের মধ্যে তিন চারিসের শস্য খাইয়া ফেলে। সুতরাং এই পোকা ছোট বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। বর্ষাকালেই শস্যের গোলা সকল এই ক্ষুদ্র পোকায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। সাধারণতঃ সকলেই মনে করেন যে ইহারা শস্য খাইবার জন্য বাহির হইতে শস্যের গোলার মধ্যে আইসে। কিন্তু ইহারা বাহির হইতে আসে না। ইহারা শস্যের ভিতর হইতেই নির্গত হয়। বর্ষাকালে এক মুঠা ধান কিম্বা গম গোলা হইতে বাড়ী লইয়া গিয়া প্রতিদিন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে শীঘ্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে আহার মধ্য হইতে ঐ সকল ক্ষুদ্র পোকা নির্গত হইতেছে। এক একটি মেয়ে পোকা প্রায় এক শত পঞ্চাশটি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিম রাখিবার জন্য প্রত্যেক শস্যের গাত্রে একটি করিয়া ছিদ্র করে ও ডিম পাড়া হইলে ধূলা দিয়া সেই ছিদ্র এত সাবধানে ঢাকিয়া দেয়, যে উহা সহজে লক্ষিত হয় না। ক্রমশঃ ডিম ফুটিয়া শস্যের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ কীট বাহির হয়। সর্ব্বদা শস্য রৌদ্রে দিলে এই পোকার উপদ্রব কম হয়।

উই পোকায় ইক্ষুর অধিক অনিষ্ট হয়। ইহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা উচিত:—(১) হলুদের জল; (২) কেরাসিন তৈলের জল, (৩) ফটকিরি জল।

উইপোকা ধরিলে জমিতে ক্রমাগত সেচ দিতে হয়, এবং কোদালের দ্বারা খুঁড়িয়া ঐ পোকার বাসা বাহির করিয়া জমির দূরে ফেলিয়া দিতে হয়।

'আলু পচা' নামক আলুর এক প্রকার রোগ আছে। ইহাতে আলু অত্যন্ত নষ্ট হয়। আলু গাছের এই রোগ হইলে শুকাইয়া যায়; ও গোড়া পচিয়া যায়। ক্ষেত্রের একটি আলু কাটিয়া যদি তাহার মধ্যে কাল দাগ্‌ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আলু গাছে 'আলু পচা' রোগ ধরিয়াছে। যে ক্ষেত্রে এই রোগ হয়, পর বৎসর বুনিবার জন্য সে ক্ষেত্রের দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বীজ আনান উচিত। ফ্রান্সের অধ্যাপক গীরার্ড সাহেব বলেন যে, এক হাজার ভাগ জল, কুড়ি ভাগ সল্‌ফেট্‌ অফ্‌ কপার এবং পোনের ভাগ চূণ একত্রে মিশাইয়া ফসলে ছড়াইয়া দিলে এই রোগ বন্ধ হয়।

পঙ্গপাল শস্যের বিস্তর অনিষ্ট করে। বৃষ্টির পর যখন মাটী ভিজে থাকে সেই সময়ে পঙ্গপাল মাটীতে গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়ে। প্রত্যেক গর্ত্তে প্রায় ৫০টা হইতে ১০০টা পর্য্যন্ত ডিম থাকে। প্রায় এক মাসের না হইলে পঙ্গপাল উড়িতে পারে না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ডানা বাহির হয় সে পর্য্যন্ত লাফাইয়া লাফাইয়া নিকটস্থিত ক্ষেত্রে গিয়া শস্যের বিস্তর ক্ষতি করে।

যে সকল স্থানে মনুষ্যের অধিক বসতি ও মরুভূমি নাই, তথায় পঙ্গপাল ডিম পাড়িতে পারে না। শুষ্ক ও বালুকাময় স্থানেই বর্ষার শেষে ইহারা ডিম পাড়ে। ইহাদের উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিত:—বর্ষার শেষে যখন ইহারা ডিম পাড়ে, সেই সময়ে ঐ ডিম সকল মাটীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া নষ্ট করিতে হয়। কিন্তু পঙ্গপাল উড়িতে শিখিলে, আর তাহাদিগকে সহজে বিনষ্ট করিতে পারা যায় না। তাহাদের ঝাঁক আসিবার সময় নানাবিধ শব্দ করিয়া ও মশাল প্রভৃতি জ্বালিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া যায়।

কাক ইত্যাদি পাখীরা বীজ বুনিবার পরে ও শস্য পাকিবার সময় অত্যন্ত অনিষ্ট করে। একটি ধনুক বা একটি খড়ের মানুষ অথবা একটি কাক মারিয়া ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে রাখিলে তাহাদের উপদ্রব কমিয়া যায়। ক্ষেত্রে ইন্দুর লাগিলে তাহাদের গর্ত্তের মধ্যে খড় কুটি পুড়াইয়া ধূম দিলে ইন্দুর মরিয়া যায়।

সীনিয়র মার্কনী।

অল্পদিন হইল অধ্যাপক রেণ্টগেন (Rontgen) একপ্রকার বৈদ্যুতিক আলোকে যে অদ্ভুত ফোটোগ্রাফ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার কথা পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন। সম্প্রতি মার্কনী(Signor Marconi) নামক জনৈক ইটালীয়ান্ যুবক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা, এক ততোধিক বিস্ময়কর তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সাহায্যে, সুবিখ্যাত জর্ম্মাণ পণ্ডিত হার্জ সাহেব, যে বার্ত্তাবহ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—মার্কনী আবিষ্কৃত ব্যাপারে তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। হার্জের তরঙ্গ বিশেষ বাধা অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারে না, কিন্তু মার্কনী আবিষ্কৃত এই অদ্ভুত বৈদ্যুতিক হিল্লোল, শতবাধা অলক্ষিতে ভেদ করিয়া, সহস্রযোজন দূরবর্ত্তীস্থানে মুহূর্ত্তে উপনীত হইতে পারে। ইহারই সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ নগর, বিশাল পর্ব্বত, বিস্তৃত সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করিয়া, কেবল দুইটী ক্ষুদ্র যন্ত্রের দ্বারা যাহাতে ভবিষ্যতে স্বল্পব্যয়ে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা হয়, তাহার উদ্যোগ হইতেছে। যন্ত্রশিল্পে মার্কনীর বিশেষ পারদর্শিতা নাই, তথাপি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সাহায্যে যে ক্ষুদ্র যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সাধারণ টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের ন্যায় সংযোজন তারের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, তদ্দ্বারা চারিটী বিশাল পর্ব্বত ও অসংখ্য অট্টালিকার বাধা অতিক্রম করিয়া দূরব্যবহিত একস্থানে সংবাদ প্রেরণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এপর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মা বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে মহৎ আবিষ্কার সাধন করিয়া, জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আবিষ্কার ও গবেষণার আমূল ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, একটা মহান সত্যের উপলব্ধি হয়। একটা তুচ্ছ ঘটনা দ্বারা চালিত হইয়া, সকলেই অজ্ঞাতসারে মহৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, ও মুক্ত গাল্‌ভনির তাড়িৎ প্রবাহ আবিষ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিকযুগে ফোনোগ্রাফ্‌ ও টেলিফোন ইত্যাদির উদ্ভাবন, সকলই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মার্কনী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, ইটালীর অন্তঃপাতি বোলোগ্না নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন বেশ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। মার্কনী বাল্যে লেগ্‌হর্ন, ফ্লোরেন্স ও বোলোগ্না প্রভৃতি স্থানের প্রাদেশিক বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, গত দশ বৎসর হইতে স্বীয় পিতার নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, এবং পিতার ব্যবসায় কার্য্যে সাহায্যাদি করিয়া, অবকাশকাল প্রায়ই তাড়িৎ বিজ্ঞানের আলোচনায় নিয়োজিত করিতেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু যে প্রকার অধ্যাপক হার্জের আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ সম্বন্ধে, নানা গবেষণা ও পরীক্ষাদি করিতেছেন,—সেই প্রকার মার্কনীও, হার্জের আবিষ্কারবার্ত্তা, শ্রবণ মাত্র, তাড়িৎ তরঙ্গ বিষয়ক নানা পরীক্ষাদিতে নিযুক্ত হন। বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া ছাত্রজীবনে মার্কনীর কোনই প্রতিপত্তি ছিল না, তারপর বহুকালব্যাপী বিজ্ঞানচর্চা করিয়াও সুধীসমাজে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই,—এই সকল দেখিয়া স্বীয় প্রতিভা ও ক্ষমতার উপর মার্কনীর যে বিশেষ আস্থা ছিল, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। কেবল কৌতূহল প্রণোদিত হইয়া, হার্জের বৈদ্যুতিকতরঙ্গের কার্য্য পরীক্ষাকালীন হঠাৎ একদিন ইনি পূর্ব্বোক্ত মহদাবিষ্কারটী সাধন করিয়াছিলেন।

হার্জের নবাবিষ্কৃত প্রথায় দুইটী পৃথক্‌ যন্ত্রদ্বারা বার্ত্তাবহন হয়,—অর্থাৎ সাধারণতঃ একটী যন্ত্রদ্বারা সংবাদপ্রেরণ ও অপরটী সাহায্যে সংবাদ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে; ক্রোশ-ব্যবহিত দুইস্থানে কেবল উক্ত যন্ত্রদ্বয় স্থাপন করিয়া যথেচ্ছা সংবাদ আদান প্রদান করা করা যায়, কিন্তু উভয়স্থান মধ্যে বিশেষ বাধা থাকিলে, প্রেরক যন্ত্র (Transmitter) জাত বৈদ্যুতিকতরঙ্গ, তাহা কিছুতেই ভেদ করিতে পারে না। অল্প দিন হইল কয়েকটী বন্ধুর সহিত মার্কনী নগর হইতে দূরবর্ত্তী একস্থানে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া একটী অনতিউচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশস্থ হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে মার্কনীর এত অনুরাগ যে স্বল্পকালব্যাপী ভ্রমণ সময়েও তিনি দুইএকটী যন্ত্র সঙ্গে লইতে ভুলিতেন না;—এই সময়ে তাঁহাদের সহিত একটী পূর্ব্ববর্ণিত হার্জআবিষ্কৃত যন্ত্র ছিল। কয়েকটি বন্ধুর কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, একদিবস মার্কনী পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতের অপরপার্শ্ব হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যবহিত স্থানের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান করিতে-ছিলেন। বন্ধুগণ ও সমবেত দর্শকবর্গ হার্জের তরঙ্গের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ

হইলেন,—কিন্তু এই পরীক্ষাকালে আর একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে আরো বিস্মিত হইয়াছিলেন।—এই সময়ে পর্ব্বতের অপরপার্শ্বস্থ তাঁহাদের হোটেলে, আর একটি সংবাদগ্রহণযন্ত্র (Reciever) সজ্জিত ছিল;—পরীক্ষাকালীন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবামাত্র উক্ত যন্ত্রটি সুবিস্তৃত পর্ব্বতের ব্যবধানে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন;—হার্জের তরঙ্গ যে কোন ক্রমেই নির্ব্বিঘ্নে পর্ব্বতের বিশাল বাধা অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা সকলেই জানিতেন।

মার্কনি পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এ'টি মুক্তাকাশ বিচরণশীল হার্জের তরঙ্গ ব্যতীত, নিশ্চয়ই অপর আর এক জাতীয় বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; এবং ইহাই যে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতের অপর-পার্শ্বস্থ হোটেলের যন্ত্রটী আন্দোলিত করিয়াছিল, মার্কণী প্রথম হইতেই ইহা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টায় হার্জের যন্ত্র দ্বারা উক্ত অদ্ভুত বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ উৎপন্ন করিতে পারেন নাই, পরে গত বৎসর দুইটী শিল্প চাতুর্য্যপূর্ণ যন্ত্র স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া, এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গের যে হার্জের তরঙ্গের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মার্কণীর এই বিস্ময়কর মহান্ আবিষ্কারের কথা জগতে প্রচারিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। রেন্টগেন ও অধ্যাপক হার্জের তাড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দুইটী অদ্ভুত আবিষ্কারের বৃত্তান্ত, প্রায়ই একই সময়ে জগতে ঘোষিত হওয়ায়, তখনও জয়োল্লাসের তুমুল কোলাহলে বৈজ্ঞানিক জগৎ প্লাবিত;—সুধী সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এক বিংশ বর্ষীয় যুবকের ক্ষীণকণ্ঠে, এক ততোধিক বিস্ময়কর আবিষ্কারের কাহিনী, কাহারও কর্ণগোচর হইবে না ভাবিয়া,—এই আবিষ্কার বৃত্তান্ত কোনও বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে প্রকাশ করিতে, মার্কণীর সাহস হয় নাই। ইংলণ্ডের ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ প্রিস (W. H. Preece) সাহেব, বহুদিবস অবধি তার ব্যবহার না করিয়া, বার্ত্তাবহ যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিতেছিলেন; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সমুদ্র মধ্যে কয়েক মাইল টেলিগ্রাফের তার বিকল হইয়া যাওয়ায়,, ইনি প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে তার ব্যতীত টেলিগ্রাম প্রেরণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। * ইঁহার এই কার্য্যের কথা বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচারিত হইলে, সে'টী একটা অতি পুরাতন বৈদ্যুতিক শক্তি (Induction) সাহায্যে এবং বহু ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া, তদ্দ্বারা আধুনিক বার্ত্তা-বহ-প্রণালীর যে বিশেষ কিছু উন্নতি হইবে, কেহই বিবেচনা করেন নাই; কিন্তু প্রিস্ সাহেব সেই সময় হইতে তন্তুহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট

* প্রিস্ সাহেবের এই বার্ত্তাবহ প্রথা, হার্জ্জ ও মার্কণীর পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্;—ইনি কেবল বৈদ্যুতিক—ইনডকসন্ (Electrical induction) সাহায্যে কার্য্য করিয়াছিলেন। লেখক

ছিলেন। মার্কণীর আবিষ্কারের কথা কোন প্রকারে শুনিয়া, তিনি সচক্ষে ব্যাপারটী দেখিবার জন্য ইটালি যাত্রা করেন, এবং এই বিদ্যুৎ তরঙ্গের অদ্ভুত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, ইনি এত বিস্মিত হইয়াছিলেন, যে স্বয়ং অর্থব্যয় করিয়া এই আবিষ্কারের আমূল ইতিহাস নানা বিজ্ঞানসমাজে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্রিস্ সাহেবের ন্যায় বিজ্ঞানানুরাগী ও উৎসাহশীল ব্যক্তি না থাকিলে, সম্ভবতঃ অদ্যাপিও মার্কণীর আবিষ্কার কাহিনী প্রচারিত হইত না। তুষাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় সত্য বহুকাল গোপন থাকে না সত্য;—কিন্তু মার্কণীর চরিত্রে যেপ্রকার ধীরতা ও শান্তিপ্রিয়তা দেখা যায়, তাহাতে অজ্ঞাতকুলশীল বিংশবর্ষীয় যুবকের উদ্যমে এই আবিষ্কারের মহিমা ইটালির ক্ষুদ্র নগরের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া, এবং শত শত যশঃপ্রার্থী পণ্ডিতের নির্ম্মম তাড়না ও তীব্র বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা সহ্য করিয়া, সুদূর ভবিষ্যতেও যে জগতে প্রচারিত হইত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

মার্কণীর বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্রকৃতি আজও স্থিরীকৃত হয় নাই এবং সাধারণ আলোকতরঙ্গ বা হার্জের তরঙ্গের সহিত, ইহার যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কল্পিত হইতেছে, তাহাও অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মার্কণী বলেন, রেণ্টগেন বা হার্জের তরঙ্গের ন্যায়, এই নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক হিল্লোলও, ঈথরের স্পন্দন হইতে উৎপন্ন,—কম্পনের প্রকার ভেদে সম্ভবতঃ এই তরঙ্গ ভিন্নাকার সম্পন্ন হয় বলিয়া, ইহার শক্তিও পৃথগাকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আকারগত বিসদৃশতা প্রযুক্ত, একই ঈথর কম্পনজাত সাধারণ আলোকতরঙ্গ যেমন কাচ ইত্যাদি কতকগুলি স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া গমন করে, এবং রেণ্টগেন আলোক-তরঙ্গ যে প্রকার অনতিস্থূল ধাতুফলক, জীবশরীর ইত্যাদির বাধা ভেদ করিতে পারে, মার্কণীর তরঙ্গ কেবল আকারগত পার্থক্য প্রযুক্ত তদ্রূপ, পার্থিব পদার্থ মাত্রই অনায়াসে ভেদ করিতে সমর্থ হয়।

আজকাল আবিষ্কার-কর্ত্তা মার্কণী প্রিস্ সাহেবের সহিত ওয়েলস্ প্রদেশে এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং নানা সাংসারিক কার্য্যে যাহাতে এই তরঙ্গের ব্যবহার হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থার জন্য উভয়েই বিশেষ সচেষ্ট আছেন। আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন হইলে, আলোকগৃহ হইতে পথভ্রষ্ট জাহাজের আরোহীগণকে সাবধান করা বড়ই কঠিন ব্যাপার,—তৎকালে অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকও ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া জাহাজে পৌছিতে পারে না, এবং অনেক সময়ই মজ্জমাণ পর্ব্বতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জাহাজ জলমগ্ন হইয়া পড়ে; ... কুজ্ঝটিকাবহুল সমুদ্রস্থ আলোকমঞ্চ হইতে, যাহাতে মার্কণীর তরঙ্গ সাহায্যে বিপন্ন জাহাজে সাবধান সঙ্কেত প্রেরণ করা যাইতে পারে, তাহার উদ্যোগ ...

সুব্যবস্থিত বৃহত্তর যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে, যন্ত্রের আয়তন বৃদ্ধির সহিত, ইহার শক্তি কি অনুপাতে বৃদ্ধি হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব রহিয়াছেন। মার্কনী বলিতেছেন,—একটা বৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, পরে তদনুরূপ সংবাদ গ্রহণোপযোগী আর একটা যন্ত্র (Reciever), পৃথিবীর যে কোন অংশে রাখিলেই অতি সহজে তথায় বার্ত্তা প্রেরণ করা যাইবে। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকপাঠিকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, সাধারণ আলোকের শক্তি দূরত্বানুসারে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে * হ্রাস হইতে থাকে। মার্কণী গণনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহার বৈদ্যুতিক তরঙ্গের শক্তিও, ঠিক আলোক শক্তির নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়,—একথা সত্য হইলে এই তরঙ্গ সাহায্যে তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র যে অনায়াসেই গঠিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং প্রিস্ সাহেব ও অপরাপর বৈজ্ঞানবিদ্‌গণ বিষয়টা লইয়া যে প্রকার পরীক্ষাদি করিতেছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে আধুনিক ব্যয়সাধ্য বার্ত্তাবহ যন্ত্রের পরিবর্ত্তে, যে মার্কণীর প্রথা প্রযুক্ত হইবে, তাহাতেও বিশেষ সংশয় করিতে পারা যায় না। সাময়িক ব্যাপারে এবং নৌযুদ্ধাদি বিষয়ে, ইহার ব্যবহার ইতিমধ্যেই অনেকে অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন।

মার্কণীর আবিষ্কার আজও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই; নানা অসম্পূর্ণতার মধ্যে ইহার একটী বিশেষ দোষ লক্ষিত হয়;—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সংবাদ প্রেরণ করিলে, সমদূরবর্ত্তী নানা স্থানে সংবাদ গ্রহণযোগ্য যন্ত্র সজ্জিত রাখিলে, সকল স্থানের যন্ত্রেই সমভাবে সাঙ্কেতিক চিহ্ন বিকাশ হইয়া থাকে। এই ব্যাপার দেখিয়া অনেকে বলিতেছেন, উক্ত দোষটী সংশোধন করিয়া, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সংযত না করিলে, মার্কণীর পদ্ধতি নবীন ক্রমেই প্রচলিত টেলিগ্রাফের স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। কথাটা বিশেষ প্রণোদিত ব্যক্তির উক্তি নয়,—মার্কণীর আবিষ্কার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থায় সংবাদ-বহন কার্য্যে নিয়োজিত হইলে, বাস্তবিকই বিষম বিভ্রাট হইবার সম্ভাবনা; এই প্রথায় রাজনৈতিক সংবাদাদি প্রেরণকালীন বিপক্ষদিগের নিকট যে কোন স্থানে সংবাদ গ্রহণোপযোগী যন্ত্র থাকিলে, সংবাদ বিপক্ষগণের অবগতির জন্য প্রেরিত না হইলেও, তাহারা সকল সংবাদ অনায়াসে জানিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত মার্কণীর তরঙ্গে, আর একটী বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়;—এই তরঙ্গ উৎপন্ন হইলেই, নিকটবর্ত্তী স্থানের ধাতব পদার্থে, এক প্রকার বৈদ্যুতিক প্রবাহ (Induction Current) স্বতঃই উৎপন্ন হয়। মার্কণী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তরঙ্গ উৎপত্তিকালে, অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে বারুদের মধ্যে এক খণ্ড লৌহ রাখিলে, ধাতু খণ্ডে তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, বারুদ স্বতঃই

* উত্তর [illegible] শক্তি, অর্থাৎ আলোক-জনন শক্তি, দূরত্বের বর্গের বিলোম অনুপাতে।

প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আধুনিক সামরিক ব্যাপারে বিপক্ষের বলক্ষয় নিমিত্ত যে প্রকার নানা যন্ত্রাদি উদ্ভাবনের উদ্যোগ হইতেছে, সম্ভবতঃ উদ্যোগীগণ এই তরঙ্গে শত্রুপক্ষের যুদ্ধভাণ্ডার ধ্বংস করিবার একটা প্রশস্ত উপায় প্রাপ্ত হইবেন;—কিন্তু বলা বাহুল্য, বৈদ্যুতিকতরঙ্গ সংযত করিতে না পারিলে, তৎপ্রয়োগে শত্রু মিত্র উভয়েরই বিপদ্‌পাতের সমান সম্ভাবনা।

মার্কণী এখন নূতন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, কেবল এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যথেচ্ছা প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত আছেন এবং যাহাতে সামরিক ব্যাপারে ইহা নিরাপদে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহারও উদ্যোগ করিতেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বীগণের নিরুৎসাহব্যঞ্জক বিদ্রূপ-হাস্য উপেক্ষা করিয়া প্রিস্ সাহেব ও মার্কণী যে প্রকার সোৎসাহে পরীক্ষাদি করিতেছেন তাহা দেখিলে বাস্তবিকই আশার সঞ্চার হয়, এবং অল্পকাল মধ্যে যে আবিষ্কারটী সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের এক মহান্ বিপ্লব সাধন করিবে, তাহাতেও আর সন্দেহ থাকে না।

এ নহে বিদায়।

এ নহে বিদায়—এত নহে ছাড়াছাড়ি,
এযে শুধু ভালবাসা-ব্রত উদ্‌যাপন;
ছিলে তুমি যতদিন অসহায় দীন,
যতনে করিয়াছিনু লালন পালন।

নিন্দা অপমান ঘৃণা দুঃখ ব্যথা যত,
সকলি লইয়াছিনু আপনার শিরে;
তোমারে রাখিয়াছিনু সন্তর্পণে অতি
সুকোমল স্নেহঘেরা হৃদয়ের নীড়ে।

পল্লবশয়ান মাঝে ক্ষুদ্র পুষ্পকলি,
যেমন নিভৃতে থাকে মুকুল সময়;
সহসা রবির আলো পড়ে যবে গা'য়
ফুটে উঠে অপরূপ রূপ মধুময়।

এ নহে বিদায়।

তোমারি আজিকে তুমি উঠেছ ফুটিয়া
আজ তুমি নহ আর নিতান্ত আমার ;
এত রূপ, এত শোভা, এত মধুরিমা ;
সমস্ত বিশ্বের তরে প্রীতিউপহার।

দাঁড়াও বিশ্বের মাঝে ; চৌদিকে তোমা
উঠুক বন্দনা গান, মঙ্গল আরতি—
কুসুমঅঞ্জলী দিক্ রচি' চারিপাশে
সুবাসের আবরণ মধুময় অতি।

আমিও রহিব কাছে, অলক্ষ্যে থাকিয়া
করিব তোমার সেবা ; শ্রান্ত হ'লে পরে
রচিদিব শয্যাখানি ; করিব ব্যজন,
অঞ্চল লুটায় যদি তুলি দিব করে।

রবি যদি অস্ত যায় আসে অন্ধকার,
তবু রব কাছে ; যদি নিভে যায় হাসি,
ম্লান হয়ে আসে রূপ, কোলে [illegible] নিয়ে
যতনে মুছায়ে দিব [illegible]রাশি।

এ নহে বিদায়—এত নহে ছাড়াছাড়ি,
এযে শুধু ভালবাসা-ব্রত-উদযাপন ;
কি বিপদে কি সম্পদে ছায়ার মতন
সাথে থাকি চিরদিন করিব অর্চ্চন।